হুমায়ুন আজাদ

নারী

হুমায়ুন আজাদ

নারী



আগামী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

উৎসর্গ

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট্‌
বেগম রোকেয়া

সূ চি প ত্র

নিষিদ্ধ *নারী* মুক্ত *নারী*

নারী প্রথম বই আকারে বেরিয়েছিলো ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারির বইমেলায়। বেরোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো, এবং মেলার শেষ দিকে বেরোতে-না-বেরোতেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো প্রথম সংস্করণ। শুরু থেকেই *নারী* উপভোগ করে অশেষ জনপ্রিয়তা, এবং প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় বদ্ধ প্রথাগতদের, ও উল্লসিত অনুপ্রাণিত করে ভবিষ্যৎমুখিদের। বইটি অল্প সময়েই বদলে দেয় নারী সম্পর্কে প্রথাগত ধারণা। তখনও অনেক বাকি ছিলো লেখার, সংস্করণপরম্পরায় আমি যোগ করতে থাকি নতুন নতুন বিষয়; বেরোতে থাকে একের পর এক পুনর্মুদ্রণ। *নারী* নন্দিত হয়েছিলো ব্যাপকভাবে, এবং হয়ে উঠেছিলো মৌলবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্য। আমিও লক্ষ্য হয়ে উঠি আক্রমণের। প্রকাশের তিন বছর পর জানতে পারি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বইটি নিষিদ্ধ করার, তারপর অনেক দিন কিছু শুনি নি; হঠাৎ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫-এ আমার অনুজ টেলিফোনে জানায় যে *নারী* নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী সরকার তখন বিপন্ন, তাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে, চলছে তীব্র আন্দোলন; পতনের আগে তাড়াহুড়ো ক'রে তারা নিষিদ্ধ ক'রে যায় বইটি। বইটিকে যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি পরদিন পত্রিকা প'ড়ে। *নারী* নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে দেশেবিদেশে প্রতিবাদ হয়েছিলো, কিন্তু প্রতিবাদে আমাদের কোনো সরকারই বিচলিত হয় না, অটলতায় তারা অদ্বিতীয়। *বাংলাবাজার পত্রিকা* প্রথম পাতায় প্রকাশ করে দীর্ঘ প্রতিবেদন, যার শিরোনাম ছিলো 'নারী বাজেয়াপ্ত, লেখক হুমায়ুন আজাদ বললেন আমার হাসি পেয়েছে, একদিন ওরাই অনুতপ্ত হবে'; বিভিন্ন পত্রিকায় বেরোতে থাকে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়। *সংবাদ*-এ সম্পাদকীয় বেরোয় 'নারী', *ডেইলি স্টার*-এ সম্পাদকীয় বেরোয় 'এ ফুলিশ ব্যান'; আমেরিকার 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড' দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে 'ঢাকা ব্যান্স হুমায়ুন আজাদস নারী' নামে। এমন বহু সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় বেরিয়ে জানায় যে বইটির নিষিদ্ধকরণ তাঁরা মেনে নেন নি। বিবেকের কাছে আমাদের কোনো সরকার কখনো পরাস্ত হয় নি; জাতীয়তাবাদীরাও হয় নি।

নারী নিষিদ্ধ করা কি ঠিক হয়েছে?– আমার মনে প্রশ্ন জাগে। আমি বিনোদনকারী নই; আমার অনেক কিছুই আপত্তিকর প্রথাগতদের কাছে; আমি তো কিছুই মেনে নিই নি, যা তাদের পুজোর বিষয়। আমার সব বইই কি নিষিদ্ধ হ'তে পারে না? কিন্তু প্রকৃত বইকে কেউ নিষিদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না; যারা নিষিদ্ধ করে, তারা ধ্বংস হয়, বেঁচে থাকে বই। এ-পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছে যতো প্রকৃত বই, সেগুলোর কোনোটিই লুপ্ত হয়ে যায় নি, আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে; দেখিয়ে দিয়েছে যারা নিষিদ্ধ করেছে, তারাই ছিলো ভ্রান্ত। কী অপরাধে নিষিদ্ধ করেছে বইটি? সরকার আমাকে কিছুই জানায় নি; তাই আমি দু-একজন অনুরাগীকে দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করি। কাগজপত্র পেয়ে আমি বেদনার্ত হই; দেখি *নারী* নিষিদ্ধকরণের আদেশ

প্রচারিত হয়েছে একজন সহকারী সচিবের স্বাক্ষরে, যে নারী। আদেশে বলা হয়েছে 'পুস্তকটিতে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি তথা মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী আপত্তিকর বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৯ "ক" ধারার ক্ষমতা বলে বর্ণিত পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত হইল...।' সাথে দু-পাতার একটি সুপারিশ, যা করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দুটি বিশেষজ্ঞ– একটি দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের, আরেকটি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালক;– তারা এ-বিশাল বইটি থেকে ১৪টি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে পরামর্শ দিয়েছে : 'উপরোক্ত উদ্ধৃতি ও মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বইটি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করা যায়।' এতো বড়ো বইটি পড়ার শক্তি ওই দুই মৌলবাদীর ছিলো না; তারা বইটি থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে পরামর্শ দেয় নিষিদ্ধ করার। ওইগুলোর মধ্যে রয়েছে– 'নারীর প্রধান শত্রু এখন মৌলবাদ', '১৯৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে সৌদি আরবের মতো আদিম পিতৃতন্ত্রও নারীদের ঘর থেকে বের ক'রে লাগিয়েছে নানা কাজে' ধরনের বাক্য। *নারীর* নিষিদ্ধকরণ আমি মেনে নিই নি, বইটি নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫-এ আবেদন করি উচ্চবিচারালয়ে; আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, ইদ্রিসুর রহমান, ব্যারিস্টার তানিয়া আমির, শিরীন শারমিন চৌধুরী। বইটি নিষিদ্ধকরণ আদেশকে কেনো অবৈধ ব'লে গণ্য করা হবে না, ৭ দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্যে স্বরাষ্ট্র ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আরো দুজনকে নির্দেশ দেয় উচ্চবিচারালয়। বামন কুৎসিত মৌলবাদী একটি লোক আমার সাথে দেখা করে, সে জানায় তারই আবেদনে নিষিদ্ধ হয়েছে *নারী*; আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর কেটে যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর; কিছুই শোনা যায় না, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, মামলার কথা প্রায় ভুলে যাই।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এক ডিভিশন বেঞ্চে *নারীর* মামলাটি গ্রহণ করার আবেদন করেন; তাঁর আবেদন গৃহীত হয়ে যায়। আমি কৃতজ্ঞ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের কাছে। আমি জানতামও না তিনি আবেদন করেছেন, পরের দিন জানতে পারি; তারপর দ্রুত এগোয় মামলাটি; ৭ মার্চ ২০০০-এ দুজন বিচারপতি রায় দেন যে *নারী* নিষিদ্ধকরণ আদেশ অবৈধ। আমি উপস্থিত ছিলাম, প্রথম বুঝতে পারি নি যে একটি ঐতিহাসিক রায় ঘোষিত হয়ে গেছে। যখন বুঝতে পারি তখন উল্লসিত হয়ে উঠতে পারি নি, আমি বেদনা বোধ করতে থাকি দেশের কথা ভেবে। এ কী বদ্ধ অন্ধ সমাজের লেখক আমি, যেখানে অবৈধভাবে একটি বই নিষিদ্ধ হয়ে থাকে বছরের পর বছর। এটি যে একটি ঐতিহাসিক যুগান্তরকারী রায়, তা বুঝতে পারে নি আমাদের পত্রিকাগুলোও; পরের দিন দেখি তারা মেতে আছে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে, চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের আমাদের রয়েছে যে-সাংবিধানিক অধিকার, যা মেনে চলছিলো না সরকারগুলো, আমাদের উচ্চবিচারালয় যে বক্তব্য প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তা বুঝে উঠতে পারেন নি তাঁরা। অশুভ তাঁরা বোঝেন, শুভ বোঝেন না। *নারী* সম্ভবত বাঙলাদেশে একমাত্র বই যেটি উচ্চবিচারালয়ের আদেশে পেয়েছে পুনপ্রকাশের অধিকার; এটি এক বিরাট ঘটনা– শুধু *নারীর* জন্যে নয়, বাঙলাদেশের

চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতার জন্যেও। কোনো মৌলিক লেখকই মেনে নিতে পারে না প্রথাগত বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত, নির্দেশ; তার কাজ ওসব বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নির্দেশ অতিক্রম ক'রে যাওয়া, যদিও আমাদের লেখকেরা প্রথাগত বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নির্দেশেই স্বস্তি বোধ করেন। রাষ্ট্রের উচিত নয় কোনো ভাবাদর্শ অধিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া; কেননা সমস্ত ভাবাদর্শই ভুল ও অচিরস্থায়ী। ধর্মানুভূতি এক বাজে কথা, এটা বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণ সম্ভব নয়। রাষ্ট্র বিশ্বাস করতে পারে ভুতপ্রেতে, কিন্তু কোনো মননশীল মানুষের পক্ষে তা মেনে নেয়া অসম্ভব। পৃথিবী এখন যেসব বিশ্বাস পোষণ করে, তার সবই ভুল, কেননা সেগুলো পৌরাণিক; রাষ্ট্রগুলো আজো আমাদের পৌরাণিক জগতে বাস করতে বাধ্য করে। আমি পৌরাণিক সংস্কৃতি ও অসভ্যতা থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই; *নারীর* পাতায় পাতায় সেই অভিলাষ রয়েছে। অজস্র পাঠক অপেক্ষা ক'রে ছিলেন *নারীর* জন্যে; আমি সুখী যে বইটি আবার তাদের হাতে পৌঁছোলো।

হুমায়ুন আজাদ

বিশশতকের শেষ দশকেব মাঝামাঝি পৌঁছে আজ খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা;– গ্রহ ভ'রে মানুষ আজ মত্ত পাশবিক আচরণে; মানুষ হনন ক'রে চলছে মানুষ; মানুষ বন্দী আর পীড়ন ক'রে চলছে মানুষকে। কয়েক বছর আগে *নারী* লিখেছিলাম মানুষের পরাভূত লিঙ্গটির মুক্তির প্রস্তাব হিশেবে; এখন দেখছি মানুষের হাত থেকে উদ্ধার করা দরকার নারী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গকেই। আমি পেশাদার নারীউন্নয়নজীবী নই; নারীর উন্নয়নের জন্যে আমি সংস্থা খুলি নি; আমি লিখেছি একটি বই। বইটির খ্যাতি আমাকে যেমন সুখী করে, তেমনি অভিভূত করে এজন্যে যে বইটি নারীসম্পর্কে আমাদের প্রথাগত দৃষ্টি অনেকখানি বদলাতে সাহায্য করেছে। তবে এটি শুধু নারীমুক্তির প্রস্তাব নয়; এটি মানুষ প্রজাতিরই মুক্তির প্রস্তাব। বইটিতে আমি প্রথাগত প্রায়-সমস্ত চিন্তা আর ভাবাদর্শ বাতিল করেছি; কেননা প্রথাগত চিন্তাধারা মানুষের মুক্তির বিরোধী। কোনো কিছুরই শাশ্বত মহত্ত্বে আমার বিশ্বাস বিশ্বাস নেই; কোনো কিছু মহৎ ব'লে প্রচারিত ব'লেই তা বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে হবে, তাও আমি মনে করি না। তাই প্রথাগত সমস্ত কিছু সম্পর্কেই আমি প্রশ্ন তুলেছি; বৈজ্ঞানিক রীতিতে বাতিল করেছি। পৃথিবী জুড়েই মানুষ নিজের কাঠামোতে বাঁচে না; বেঁচে থাকতে বাধ্য হয় অন্যের কাঠামোতে; ওই কাঠামো তাকে বন্দী ক'রে রাখে। অন্যের কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি বাস করে নারী; অন্যের কাঠামোতে বাস ক'রে ক'রে নারী বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

মানুষের এক বড়ো সমস্যা ভাবাদর্শ। মানুষকে বিভিন্ন ভাবাদর্শের মধ্যে বাস করতে হয়; এবং মানুষকে শেখানো হয়েছে যে ভাবাদর্শের মধ্যে বাস করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। তবে মানুষ জন্মেছে মানুষরূপে বাস করার জন্যে, ভাবাদর্শ যাপনের জন্যে নয়। ভাবাদর্শের এক মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে তা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে; যেমন আজকাল দেখা দিচ্ছে মৌলবাদী ভাবাদর্শ। মৌলবাদী ভাবাদর্শ হচ্ছে বন্দী করার ভাবাদর্শ; তা একগোত্র মধ্যযুগীয় মানুষের দখলে আনতে চায় মানবসমাজকে। মৌলবাদ মানুষের বিকাশের বিরোধী; আর মৌলবাদ যেহেতু পীড়নবাদ, তাই পীড়ন করে সব কিছুকে। নারী তার পীড়নের প্রধান লক্ষ্য। মৌলবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'লে নারীর মুখ আর দেখা যাবে না;-তাকে পথে দেখা যাবে না, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাবে না; একেবারেই দেখা যাবে না কোনো কর্মস্থলে। নারী হবে নিষিদ্ধ; আর সব কিছু হবে নারীর জন্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু পৃথিবীটা মানুষের;-নারীর ও পুরুষের; উভয়ে মিলেই বিকাশ ঘটাবে সভ্যতা ও মানুষের। তাই দরকার মৌলবাদ সম্পর্কে সাবধান থাকা; বিশেষ ক'রে নারীকে সাবধান থাকতে হবে; কেননা ওই মতবাদে নারী সত্তাহীন প্রাণী।

বাঙলাদেশ প্রতিমুহূর্তে হয়ে উঠছে পূর্ববর্তী মুহূর্তের থেকে অধিক মধ্যযুগীয়; খুব দ্রুত এখানে লোপ পাচ্ছে মুক্তচিন্তার অধিকার। দিকে দিকে এখন প্রচার পাচ্ছে পুরোনো বুলি; পুরোনো বুলির অসার মহত্ত্বে সবাই এখন মুগ্ধ। সবাই ভয় পাচ্ছে সত্যকে, আর মিথ্যেকেই আঁকড়ে ধরছে সত্য ব'লে। এর মূলে রয়েছে বাঙলাদেশের রাজনীতি, যা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলছে। এ-রাজনীতি নারীকে ঠেলে দিচ্ছে চরম অন্ধকারের দিকে। ষাটের দশকেও নারীরা যতোটা অগ্রসর ছিলো, এখন আর তা নেই; তারা পিছিয়ে পড়ছে-চিন্তা ও জীবনের সব দিকে; শিক্ষিত নারীরাও আজকাল যে-সব বিশ্বাস পোষণ করেন, তার থেকে শোচনীয় অপবিশ্বাস আর হয় না। এমন এক ধারণা প্রচলিত হচ্ছে এখন যেনো পৃথিবীতে সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে; আমাদের কাজ ওই সিদ্ধান্তগুলো মেনে চ'লে জীবন সার্থক করা। কিন্তু সত্য হচ্ছে মানুষ আরো কয়েক কোটি বছর টিকে থাকবে; তার ভবিষ্যৎ গত তিন হাজার বছরের নির্দেশে চলতে পারে না।

অতীত হচ্ছে অতীত;-অতীতকে জানতে হবে, কিন্তু অতীতের বিধানে চলা হাস্যকর ও শোককর। কিন্তু অতীত আমাদের ওপর বোঝার মতো চেপে আছে; দিন দিন তার বোঝা আরো বাড়ছে। মানুষকে আমি ওই বোঝা থেকে মুক্ত দেখতে চাই; তাই *নারী*তে প্রবলভাবে পেশ করা হয়েছে অতীত বিরোধিতা। মানুষ কতোটা মুক্ত তার একটি মানদণ্ড হচ্ছে সে অতীত থেকে কতোটা মুক্ত। বইটি শুধু নারীমুক্তির প্রস্তাব নয়; এটি বর্তমান সভ্যতাকেই বদলে দেয়ার প্রস্তাব। তাই *নারী* যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে; তেমনি, খুবই সচেতন আমি, প্রতিপক্ষও জুটেছে প্রচুর। আমি নিয়মিত প্রগতিবিরোধী প্রতিপক্ষের সদস্যদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করি। কিছু আগে এক মৌলবাদীগোত্র আমাকে *মুরতাদ*, শব্দটির কী অর্থ আমি জানি না, উপাধি দিয়েছে; একটি গোত্র হত্যার সংক্ষিপ্ত তালিকায় রেখে আমাকে সম্মানিত করেছে। আমার

মাতৃভূমি হয়ে উঠেছে এমনই মর্মস্পর্শী ও ভয়াবহ। বাঙালি মুসলমানের এটা এক বড়ো দুর্ভাগ্য; তারা বিকশিত হ'তে চায় না; তারা জীবিত প্রতিভাদের হত্যা করতে চায়,–আমি অবশ্য প্রতিভা নই–, আর মৃতদের মাজারে মোমবাতি জ্বালে। কেউ কেউ কাজ করছে আরো নিপুণভাবে; তারা গোপনে চক্রান্ত করছে বইটির বিরুদ্ধে; যাতে বইটিকে বিলুপ্ত ক'রে দেয়া যায়, তার উপায় খুঁজছে তারা। আমি আশা করবো অমন কলঙ্ক ঘটবে না।

এ-সংস্করণে যোগ করা হলো একটি পরিচ্ছেদ, যার নাম 'ধর্ষণ'। এটি যোগ করার কারণ ধর্ষণ নারীপীড়নের চরম রূপ; এবং এখনকার বাঙলাদেশ ধর্ষণপ্রবণ। যখন পরিচ্ছেদটি লিখছিলাম, তখনই ব্রজমোহনে দলবেঁধে ছাত্ররা ধর্ষণ করে একটি ছাত্রীকে; আর দিনাজপুরে পুলিশ দলবেঁধে ধর্ষণ ও হত্যা করে একটি কিশোরীকে, যার ফলে দেখা দেয় গণঅভ্যুত্থান; নিহত হয় দশজন বিবেকী পুরুষ। এছাড়াও বইটিতেই করা হয়েছে নানা সংশোধন ও সংযোজন, যা বইটিকে দিয়েছে পরিশুদ্ধ রূপ।

হুমায়ুন আজাদ

নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত প্রাণী : কথাটি ভার্জিনিয়া উল্‌ফের, যিনি নিজের বা নারীর জন্যে একটি নিজস্ব কক্ষ চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। ওই আলোচনায় অংশ নিয়েছে প্রতিপক্ষের সবাই; শুধু যার সম্পর্কে আলোচনা, সে-ই বিশেষ সুযোগ পায় নি অংশ নেয়ার। প্রতিপক্ষটির নাম পুরুষ, নিজের বানানো অলীক বিধাতার পার্থিব প্রতিনিধি; আর পুরুষমাত্রই প্রতিভাবান, তার বিধাতার চেয়েও প্রতিভাদীপ্ত;– অন্ধ ও বধির, লম্পট ও ঋষি, পাপী ও প্রেরিতপুরুষ, দালাল ও দার্শনিক, কবি ও কামুক, বালক ও বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ পুরুষপ্রজাতির সবাই অংশ নিয়েছে নারী সম্পর্কে অন্তত একটি শ্লোক রচনায়। ওই সব শ্লোক অশ্লীল আবর্জনার মতো। প্রতিপক্ষ কখনো কারো মূল্য বা অধিকার স্বীকার করে না; এমনকি অস্তিত্বই স্বীকার করে না অনেক সময়। তাই পুরুষেরা নারী সম্পর্কে কয়েক হাজার বছরে রচনা করেছে যে-সব শ্লোক-বিধি-বিধান, তার সবটাই সন্দেহজনক ও আপত্তিকর। পুরুষ নারীকে দেখে দাসীরূপে, ক'রে রেখেছে দাসী; তবে স্বার্থে ও ভয়ে কখনোকখনো স্তব করে দেবীরূপে। পুরুষ এমন প্রাণী, যার নিন্দায় সামান্য সত্য থাকতে পারে; তবে তার স্তব সুপরিকল্পিত প্রতারণা। পুরুষ সাধারণত প্রতারণাই ক'রে এসেছে নারীকে; তবে উনিশশতক থেকে একগোত্র পুরুষ লড়াই করছেন নারীর পক্ষে।

পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য কুৎসিত অভিধায়; তাকে বন্দী করার জন্যে তৈরি করেছে পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্র; উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, নিয়ে এসেছে প্রেরিতপুরুষ;

লিখেছে ধর্মগ্রন্থ, অজস্র দর্শন, কাব্য, মহাকাব্য; সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ও আরো অসংখ্য শাস্ত্র। এতো অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় নি কোনো সেনাবাহিনী। এর কারণ পুরুষের যৌথচেতনায় মহাজাগতিক ভীতির মতো বিরাজ করে নারী। তাই নারীর কোনো স্বাধীনতা স্বীকার করে নি পুরুষ। পুরুষ এমন এক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে, যা নারীকে সম্পূর্ণ বন্দী করতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যাবে ব'লে পুরুষের ভয় রয়েছে। এর নাম পিতৃতান্ত্রিক, বা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার প্রথম শোষকশ্রেণী পুরুষ, প্রথম শোষিতশ্রেণী নারী। এ-সভ্যতার সব কেন্দ্রেই রয়েছে পুরুষ। পুরুষ একে সৃষ্টি করেছে তার স্বার্থ ও স্বপ্ন অনুসারে, এবং কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে। পুরুষতন্ত্রের সৌরলোকের সূর্য পুরুষ; নারী অন্ধকার। পুরুষ সব কিছু তৈরি করেছে নিজের কাঠামোতে;– তার বিধাতা পুরুষ, প্রেরিতপুরুষ পুরুষ, প্রথম সৃষ্টি পুরুষ; নারী ওই পুরুষের সংখ্যাতিরিক্ত অস্থিতে তৈরি পুতুল। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষ মুখ্য, নারী গৌণ; পুরুষ শরীর, নারী ছায়া; পুরুষ প্রভু, নারী দাসী; পুরুষ ব্রাহ্মণ, নারী শূদ্রী। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা পুরুষের জয়গানে ও নারীর নিন্দায় মুখরিত। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় শয়তানের চেয়েও বেশি নিন্দিত নারী; শয়তান পুরুষ ব'লে তার জন্যেও গোপন দরদ রয়েছে পুরুষের, কিন্তু কোনো মায়া নেই নারীর জন্যে।

পৃথিবীতে শুধু নারীই শোষিত নয়, অধিকাংশ পুরুষও এখনো শৃঙ্খলিত ও শোষিত। তবে শোষিতশৃঙ্খলিত নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য : সব শ্রেণীর পুরুষ বন্দী ও শোষিত নয়, কিন্তু সব শ্রেণীর নারীই বন্দী ও শোষিত। নারীশোষণে বুর্জোয়া ও সর্বহারায় কোনো পার্থক্য নেই; বুর্জোয়া পুরুষ শুধু সর্বহারা শ্রেণীটিকে শোষণ করে না, শোষণ করে তার নিজের শ্রেণীর নারীকেও; আর সর্বহারা পুরুষ নিজে শোষিত হয়েও অন্যকে শোষণ করতে দ্বিধা করে না, সে শোষণ করে নিজের শ্রেণীর নারীকে। বিত্তবান শ্রেণীর নারী পরগাছার পরগাছা, বিত্তহীন শ্রেণীর নারী দাসের দাসী। শোষণে সব শ্রেণীর পুরুষ অভিন্ন; শোষণে মিল রয়েছে মার্কিন কোটিপতির সাথে বিকলাঙ্গ বাঙালি ভিখিরির, তারা উভয়েই পুরুষ, মানবপ্রজাতির রত্ন। নারীমাত্রই দ্বিগুণ শোষিত। মাওসেতুং আর গিনির সেকো তোরের দুটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। মাও বলেছেন, 'বিপ্লবের আগে চীনের পুরুষদের বইতে হতো সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, ও সাম্রাজ্যবাদের তিনটি পর্বত, আর চীনের নারীদের বইতে হতো চারটি পর্বত-চতুর্থটি পুরুষ।' সেকো তোরে তীব্র ভাষায় বলেছেন, গিনির নারীরা 'ক্রীতদাসের ক্রীতদাসী' [দ্র নিউল্যান্ড (১৯৭৯, ১১১)]। ওই নারীরা গিনীয় ও ফরাশি উভয় জাতের পুরুষদের দ্বারাই শোষিত। নারীর প্রভু ও শোষক সব পুরুষ: অন্ধও নারীর শোষক, উন্মাদও নারীর প্রভু। পুরুষতন্ত্র সমস্ত জাতিধর্মবর্ণশ্রেণী অতিক্রম ক'রে যায়। কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণী নারীর শোষক নয় ব'লে, পুরুষতন্ত্রই যেহেতু নারীর শোষক, তাই সামাজিক বিপ্লবের ফলে পুরুষ মুক্তি পেলেও নারী মুক্তি পায় না, নারীকে মুক্তি দেয়া হয় না। ফরাশি বিপ্লব ভুলে যায় নারীর কথা; সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা প্রযোজ্য হয় শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে; আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও কিছু দিনের মধ্যেই তার সব প্রতিশ্রুতি ভুলে নারীকে জড়ায় পুরুষতন্ত্রের শেকলে-সর্বহারার একনায়কত্বে একনায়কত্ব করে পুরুষতন্ত্র। তাই নারীই এখন বিশুদ্ধ

শোষিত ও সর্বহারা। তার ন্যূনতম যা দরকার, তা হচ্ছে মুক্তি।

পুরুষতন্ত্র নারীকে নিয়োগ করেছে একরাশ ভূমিকায় বা দায়িত্বে। নারীকে নিয়োগ করেছে কন্যা, মাতা, গৃহিণীর ভূমিকায়; এবং তাকে দেখতে চায় সুকন্যা, সুমাতা, সুগৃহিণীরূপে। কোনো নিম্নপদকে অসার মহিমা দিতে হ'লে পদগুলোকে সুভাষিত করতে হয়; পুরুষতন্ত্রও নারীর ভূমিকাগুলোকে সুভাষিত করেছে, সেগুলোর সাথে জড়িয়ে দিয়েছে বড়ো বড়ো ভাব। তবে ওই ভূমিকাগুলোর গূঢ় তাৎপর্য একটি শব্দেই প্রকাশ পায় : শব্দটি *দাসী*। এ-অঞ্চলে *দেবী* শব্দটি *দাসীর*ই সুভাষণ। পুরুষতন্ত্র শুধু বলপ্রয়োগ ক'রে অধীনে রাখতে চায় নি নারীকে, তাকে স্তবস্তুতিও পান করিয়েছে। পুরুষ কখনো মনে করে নি যে তার জীবনের সার্থকতা পুত্র, পিতা, গৃহস্থ হওয়াতেই; বরং এ-ভূমিকাগুলো পেরিয়ে যাওয়াকেই মনে করেছে পৌরুষ; কিন্তু নারীর সার্থকতা নির্দেশ করেছে কয়েকটি তুচ্ছ ভূমিকাপালনে। পুরুষ নারীকে গৃহে বন্দী করেছে, তাকে সতীত্ব শিখিয়েছে, সতীত্বকে নারীর জীবনের মুকুট ক'রে তুলেছে, যদিও লাম্পট্যকেই ক'রে তুলেছে নিজের গৌরব। পুরুষ উদ্ভাবন করেছে নারী সম্পর্কে একটি বড়ো মিথ্যা, যাকে সে বলেছে *চিরন্তনী নারী*। তাকে বলেছে দেবী, শাশ্বতী, কল্যাণী, গৃহলক্ষ্মী, অর্ধেক কল্পনা; কিন্তু পুরুষ চেয়েছে 'চিরন্তনী দাসী'। পশ্চিমে নারীরা শোষিত, তবে মানুষ-পুরুষ দ্বারা শোষিত; আমাদের অঞ্চলে নারীরা শোষিত পশু-পুরুষ দ্বারা। এখানে পুরুষেরা পশুরই গোত্রীয়, তাই বঙ্গীয়, ভারতীয়, আর পূর্বাঞ্চলীয় নারীরা যে-শোষণপীড়নের শিকার হয়েছে, পশ্চিমের নারীরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। বাঙলায় নারীরা এখনো পশুদের দাসী। পশ্চিমে নারীমুক্তির যে-আন্দোলন চলছে, তার ঢেউ এখানে এসে এখনো ভালোভাবে লাগে নি। উনিশশতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাঙলায় নারীদের শিক্ষার যে-ধারা শুরু হয়, তার উদ্দেশ্য নারীকে স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত করা নয়, তার লক্ষ্য উন্নতজাতের স্ত্রী বা শয্যাসঙ্গিনী উৎপাদন। নারীশিক্ষাও প্রভু পুরুষেরই স্বার্থে। বিবাহ এখানে নারীদের পেশা। বাঙলাদেশে যাঁরা নারীদের কল্যাণ চান, তাঁরা মনে করেন নারীর কল্যাণ শুভবিবাহে, সুখী গৃহে; স্বামীর একটি মাংসল পুতুল হওয়াকেই তাঁরা মনে করেন নারীজীবনের সার্থকতা। স্বামী যদি ভাতকাপড় দেয়, তার ওপর দেয় লিপস্টিক নখপালিশ ইত্যাদি, এবং আর বিয়ে না করে, করলেও অনুমতি নিয়ে করে, বা তালাক না দিয়ে চার স্ত্রীকেই দেখে 'সমান চোখে', তাহলেই নারীকল্যাণপিপাসুরা পরিতৃপ্ত, ও তাঁদের আন্দোলন সফল ভেবে ধন্য বোধ করেন। তাঁরা আসলে পুরুষতন্ত্রের শিকার; তাঁরা নারীকে দেখতে চান সচ্ছল দাসীরূপে। নারীর জন্যে এর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু হ'তে পারে না। তাঁরা মানুষ হিশেবে নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন করেন না, তাঁদের আন্দোলন হচ্ছে স্বামীতন্ত্রের কাছে স্ত্রীতন্ত্রের আবেদননিবেদন। বিয়ে, স্বামী, সন্তান, গৃহ, সুখ, প্রেম মধুর বাজে কথা; এগুলোতে নারীর মুক্তি নেই, এগুলোতেই বন্দী নারী। পশ্চিমের নারীবাদীরা প্রত্যাখ্যান করেছে এসব। নারীবাদীরা পশ্চিমের পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতাকে দিয়েছে একটা বড়ো নাড়া, ও বদলে দিয়েছে অনেকটা, যদিও তাদের চূড়ান্ত সাফল্য আজো সুদূরে। পুরুষতন্ত্রের মতো

কয়েক হাজার বছরের একটি বড়ো রকমের চক্রান্তকে, পীড়নযন্ত্রকে, দু-চার দশকে, বা দু-এক শতকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়া অসম্ভব।

পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার বয়স কয়েক সহস্রক; কিন্তু পৃথিবী ও মানবপ্রজাতি, যদি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, টিকে থাকবে আরো কয়েক কোটি বছর। তাই পুরুষতন্ত্রই শাশ্বত ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ, এটা ভাবার কারণ নেই। বাঙলাদেশের এক অবরুদ্ধ সুলতানা নারীস্থানের বা নারীতন্ত্রের যে-স্বপ্ন দেখেছিলো, তা যে ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে না, বা নারীপুরুষের সাম্যভিত্তিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে না, এমন ধারণা অযৌক্তিক। পশ্চিমের নারীবাদীরা গত চার দশকে, সিমোন দ্য বোভোয়ার-এর *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এর (১৯৪৯) প্রকাশকাল থেকে, নারীবিষয়ক যে-সব গ্রন্থ লিখেছেন, সেগুলোর অসাধারণত্ব স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। তাঁদের ব্যাখ্যা, ভাষ্য, প্রস্তাব মেধাপ্রতিভা, ও সাহসের উজ্জ্বল উদাহরণ। নারী সম্পর্কে তাঁদের মূল বক্তব্য এখনো আমাদের এখানে এসে পৌঁছে নি; বা মধ্যযুগের অধিবাসী আমরা এখনো এতোটা সাহসী হ'তে পারি নি যে তাঁদের বক্তব্য নির্ভয়ে পেশ করবো। পুরুষতন্ত্রের নানা রকম পুলিশ এখানে নানাভাবে সক্রিয়। নারীবাদের ঠিক সংবাদ আমরা পাই নি, তবে বিকৃত সংবাদ পেয়েছি অনেক; এবং এখানকার পুরুষতন্ত্র একথা প্রচার করতে সফল হয়েছে যে নারীবাদ হচ্ছে বিকার। নারী–অধিকারবাদীরাও এখানে নারীবাদের কথা শুনলে ভয় পান, নিজেদের নারীবাদী বলতে নববধুর মতো লজ্জা বোধ করেন। তাঁদের কাছে নারীবাদী এক কামুক নারী, যার কাজ পুরুষ থেকে পুরুষে ছোটা। এটা সত্যের চরম অপলাপ, নারীবাদের বিরুদ্ধে পুরুষতন্ত্রের অশ্লীল অপপ্রচার। যিনি নারীপুরুষের সাম্যে ও সমান অধিকারে বিশ্বাস করেন, তিনিই নারীবাদী। আমাদের নারী-অধিকারবাদীরা নারীর অধিকারের চেয়ে স্ত্রীর অধিকার নিয়েই বেশি ব্যস্ত, তাঁরা স্ত্রীবাদী বা ভদ্রমহিলাবাদী। আমাদের অঞ্চলের দুটি গোত্র–হিন্দু ও মুসলমান–পুরুষতন্ত্রের প্রচণ্ড পুরোধা। পশ্চিমের নারীবাদীরা খুব ভদ্র মহিলা নন, তিরস্কারকে আর তাঁরা পুরুষতন্ত্রের একচেটে সম্পত্তি ব'লে মনে করেন না; তাই তাঁরা নিয়মিতভাবে তিরস্কার করেন পুরুষদের। এক জাতের পুরুষদের তাঁরা বলেন *মেল শভিনিস্ট পিগ* বা *আত্মম্ভরী পুংশুয়োর* বা *পুংগর্বী শুয়োর*, আমাদের অঞ্চলে সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থ, ধর্মীয় কারণে পুংগর্বীদেরই প্রাধান্য। তাই নারীবাদ যে এখানে নারীর মতোই নিষিদ্ধ থাকবে, এটা স্বাভাবিক। আমি এ-বইতে প্রকাশ করতে চেয়েছি নারীবাদীদের মূল বক্তব্য ও প্রস্তাবগুলো; বাঙলা ভাষা ও বাঙলাদেশের নারীদের পরিচয় থাকা দরকার এর সাথে।

বইটি লেখার জন্যে আমি নির্ভর করেছি বহু বিদেশি বইয়ের ওপর। অনেক বই থেকে সরাসরি নিয়েছি : দ্য বোভোয়ার ও কেইট মিলেটির কাছে আমি বিশেষ ঋণী। তথ্যবিশ্লেষণের উৎস নির্দেশ করেছি ব্যাপকভাবেই, তবে বইটিকে উৎসনির্দেশভারক্লান্ত না করার কথাও মনে রেখেছি। ব্যবহার করেছি উৎসনির্দেশের সাম্প্রতিক রীতি, পাদটীকার বদলে বইয়ের শরীরেই নির্দেশ করা হয়েছে উৎস। যেমন : [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ৫৪০)] বোঝায় সিমোন দ্য বোভোয়ারের ১৯৪৯-এ প্রকাশিত বইয়ের ৫৪০

পৃষ্ঠায় মিলবে তথ্য বা বিশ্লেষণটি; এবং ওই বই সম্পর্কে সব তথ্য পাওয়া যাবে রচনাপঞ্জিতে। এ-বইয়ে গ্রন্থনাম ছাপা হয়েছে বাঁকা অক্ষরে, আর প্রবন্ধ, গল্প, কবিতার নাম ছাপা হয়েছে একক উদ্ধৃতিচিহ্নের ভেতরে। *নারীর* অর্ধেকের বেশি ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিলো সাপ্তাহিক *পূর্বাভাস*, ও *খবরের কাগজ*-এ।

নারীর প্রকাশ যে-সাড়া জাগিয়েছে, তা আমাকে অভিভূত করেছে। ১৯৯২-এর একুশের বইমেলায় এক সপ্তাহে এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়; বহু পাঠক বইটি সংগ্রহ করতে এসে হতাশ হয়ে ফিরেছেন। বইটিতে সম্ভবত প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের মনের কথা, ঘোষিত হয়েছে তাঁদের ইশতেহার।

হুমায়ুন আজাদ

অবতরণিকা : দ্বিতীয় সংস্করণ

নারী পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার সবচেয়ে নিষিদ্ধ সপ্রাণ বস্তু। পুরুষ নারীকে আজো বস্তু, উপভোগ্যতম বস্তু, ব'লেই গণ্য করে; দিকে দিকে তাকে নিষিদ্ধ ক'রে রাখতে চায়, এবং তার জন্যে নিষিদ্ধ ক'রে রাখতে চায় সব কিছু। এক উগ্র পিতৃতন্ত্রের মধ্যে বাস করি আমরা, যেখানে নারী অতিনিষিদ্ধ, নারীর অধিকার দাবি যেখানে দ্রোহিতা, নারী যেখানে দাসী ও ভোগ্যসামগ্রী। আমরা আজো আছি প্রথা, মধ্যযুগ ও তার নির্মম বিধিবিধানের মধ্যে। আমি প্রথাবিরোধী; প্রথা মানুষকে পশুস্তরে আটকে রাখে, বিকশিত হ'তে দেয় না; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নিরন্তর বিকশিত হওয়াই মনুষ্যত্ব। আজ প্রচণ্ডভাবে প্রথার প্রত্যাবর্তন ঘটানো হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে; প্রথার পক্ষে কথা বললে এখন অজস্র মুকুট মেলে, প্রথার বিরুদ্ধে গেলে জোটে অপমৃত্যু। রাষ্ট্রলিপ্সু রাজনীতিকেরা মানুষকে আজ উৎসর্গ ক'রে দিচ্ছে প্রথার পায়ে; ক্ষমতার জন্যে তারা মানুষকে পশুতে পরিণত করতেও প্রস্তুত। তবে মানুষ প্রথার মধ্যে বাঁচতে পারে না, পশুও পারে না। প্রথা চিরজীবী নয়, কোনো প্রথা হাজার বছর ধ'রে চ'লে এসেছে ব'লেই তা শাশ্বত নয়; কোনো প্রথা মহাকাশ থেকে নামে নি, পুরুষতন্ত্রই সৃষ্টি করেছে সমস্ত প্রথা। তবে প্রথার স্বেচ্ছামৃত্যু ঘটে না, প্রগতিশীল মানুষেরাই অবসান ঘটায় প্রথার। পৃথিবীতে কিছুই শাশ্বত চিরকালীন নয়। পৃথিবী টিকে থাকবে আরো কয়েক কোটি বছর, প্রথা আর পঞ্চাশ বছরও হয়তো টিকবে না; এক শতাব্দী পর উত্তরপুরুষদের কাছে আমাদের সমস্ত বিশ্বাসকে মনে হবে হাস্যকর অপবিশ্বাস। *নারী* বইটি আমি লিখেছি মানুষের এক বড়ো অংশের ওপর থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমস্ত নিষেধ তুলে নেয়ার জন্যে, নারীকে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে মানুষের অধিকার দেয়ার জন্যে; আমাদের অন্ধকার অঞ্চলের সমস্ত প্রথার অবসান ঘটানোর জন্যে। নারী এখন এ-অঞ্চলে বিপন্ন; তার যে-সামান্য অধিকার কয়েক শতকে

স্বীকার করা হয়েছে, তাও বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। চারপাশে প্রতিক্রিয়াশীলতা আজ প্রবল; প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রথম শিকার নারী। প্রতিক্রিয়াশীলেরা সমাজ দখল ক'রে প্রথমেই সমাজ থেকে বের ক'রে দেয় নারীকে, অর্থাৎ তার সব অধিকার বাতিল ক'রে ঘরে ঢুকিয়ে তাকে ক'রে তুলে পুরুষের দাসী ও ভোগ্যবস্তু। বাঙলাদেশে নারী মুক্তি পায় নি, তবে তাকে শক্ত শেকল পরানোর আয়োজন চলছে আজ। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কাজ ক'রে চলছে নারীর বিরুদ্ধে; এবং রয়েছে মধ্যযুগীয় মৌলবাদীরা, যারা নারীর দীক্ষিত শত্রু। আমাদের অঞ্চলের প্রগতিশীলেরাও প্রথাগত, তাঁদের ভেতরেও কুসংস্কারের অন্ত নেই; নারীবাদের কথা শুনলে তাঁরাও মৌলবাদীদের মতো আচরণ করেন। তাঁদের প্রগতিশীলতা পুরুষপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রগতিশীলতা, সেখান থেকে নারী নির্বাসিত। এ-বইটি প্রথা ও পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আমি চাই নারীপুরুষের সার্বিক সাম্য।

নারী যে-সাড়া জাগিয়েছে, তা অভূতপর্ব; তবে এটাই স্বাভাবিক। তরুণবাঙলা আজ প্রথা পেরিয়ে যেতে চায়। প্রথাভাঙার কোনো পদ্ধতিকে আমরা সুস্থ সজীব রাখতে পারি নি; এখন প্রথাভাঙার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নারী। *নারী* সহজ সুখকর বই নয়, তবুও যে এর প্রথম সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ অল্প সময়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তার কারণ প্রথাভাঙার সময় এসে গেছে। বইটিতে আমাদের বদ্ধ সমাজের পাঠকেরা বোধ করেছেন মুক্তি : যে-বিষয়ে অপরাধবোধ, দ্বিধা ও কপটতার সাথে কথা বলা বাঙালির স্বভাব, সে-বিষয়ের সমস্ত দরোজা আমি খুলে দিয়েছি। নারী নামক নিষিদ্ধ ও রুদ্ধ গৃহটি সম্ভবত বাঙলা ভাষায় এই প্রথম সম্পূর্ণ খুলে দেয়া হলো। অনেক তরুণী আমাকে জানিয়েছে এ-বই প'ড়েই তারা জেনেছে তাদের একটি শরীর আছে, শরীরে নানা প্রত্যঙ্গ রয়েছে। এ ছাড়া আর যা জেনেছে তা জানার কথা কখনো স্বপ্নেও ভাবে নি। এখন তাদের জন্মান্তর ঘটেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে বইটির আয়তন বাড়লো, তবে যতোটা বাড়ানোর ইচ্ছে ছিলো ততোটা বাডলো না : যুক্ত হলো দুটি নতুন পরিচ্ছেদ–'নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা', এবং 'নারীদের নারীরা : নারীদের উপন্যাসে নারীভাবমূর্তি'; আর 'নির্ঘণ্ট'। প্রথম সংস্করণের মুদ্রণত্রুটি সংশোধিত হলো, তবু কয়েকটি তুচ্ছ ত্রুটি চোখ এড়িয়ে রয়েই গেলো। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে কিছুটা সংযোজনবর্জনও করা হয়েছে। ইচ্ছে ছিলো 'মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্ : অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দু' পরিচ্ছেদটি বাড়ানোর; তাঁর অন্যান্য বই, বিশেষ ক'রে, *লেটার্স রিটেন ডিউরিং এ শর্ট রেসিডেন্স ইন সুইডেন, নরওয়ে অ্যান্ড ডেনমার্ক* সম্পর্কে আলোচনার; কিন্তু তা আর হলো না। শুধু এটুকু জানানো যেতে পারে যে এ-পত্রগুচ্ছের কাছে ঋণী রোম্যান্টিক কবিরা; আর কোলরিজের বিখ্যাত 'কুবলা খান' লেখা হয়েছিলো ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের পত্রগুচ্ছের ভাব ও কিছু শব্দ সরাসরি নকল ক'রে।

হুমায়ুন আজাদ

নারী, ও তার বিধাতা : পুরুষ

কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে। পুরুষের এক মহৎ প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনাথ, বলেছেন, 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।/পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি।' রোম্যানটিকের চোখে নারীমাত্রই দয়িতা বা মানসসুন্দরী, তাই তাঁর চোখে পড়েছে শুধু নারীর চারপাশের বর্ণ, গন্ধ, ভূষণ, যাতে নারীকে সাজিয়েছে পুরুষ। নারীর জন্যে পুরুষসুলভ করুণা, এবং পুরুষ হওয়ার গর্বও তিনি বোধ করেছেন গভীরভাবে। পুরুষ প্রেম আর আলিঙ্গনেও ভুলতে পারে না সে প্রভু, নারীর স্রষ্টা। পুরুষের অহমিকা এখানে প্রকাশ পেয়েছে চমৎকারভাবে, নারীসৃষ্টিতে তিনি বিধাতার সাথে পুরুষের ভাগ দাবি করেছেন; এবং অস্বীকার করেছেন নারীর সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা' ব'লে। তাঁর চোখে নারীর অর্ধেক তো কল্পনা বটেই, আর ওই 'মানবী'টুকুও কল্পনা; অর্থাৎ নারী এক সম্পূর্ণ অবাস্তব সত্তা বা ভাব। তাঁর চোখে নারীর কোনো জৈব অস্তিত্ব নেই। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা নারী সৃষ্টি না করলেও নারী ধারণাটি পুরোপুরি পুরুষের সৃষ্টি : পুরুষ নারীকে নানা শব্দে শনাক্ত করেছে, নারীর সংজ্ঞা রচনা করেছে, সংজ্ঞার ভাব ব্যাখ্যা করেছে, নারীর অবস্থান নির্দেশ করেছে, নারীর জন্যে বিধি প্রণয়ন করেছে, এবং নিযুক্ত করেছে নিজের কামসঙ্গী ও পরিচারিকার পদে। পুরুষের চোখে নারী বিকৃত মানুষ, অসম্পূর্ণ সৃষ্টি, একরাশ বিকারের সমষ্টি, এক আপেক্ষিক প্রাণী; অর্থাৎ নারীর অস্তিত্ব নিরপেক্ষ স্বায়ত্তশাসিত নয়, নারীকে নির্দেশ করা সম্ভব শুধু কোনো ধ্রুব সত্তার সাথে তুলনা ক'রে। পুরুষ হচ্ছে ওই নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্তা। পুরুষ নারীকে মানুষ হিশেবেই স্বীকার করে না। অধিকাংশ ভাষায় 'মানুষ' বা 'মানুষজাতি' বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয় যে-সব শব্দ, সেগুলো 'পুরুষ' বোঝায়। 'ম্যান' বা 'ম্যানকাইন্ড' পুরুষবাচক; আর 'ওম্যান' বেশ নিন্দাসূচক। বাঙলায় 'মানুষ', 'লোক' পুরুষ বোঝায় না ব'লে মনে হ'তে পারে; কিন্তু 'মেয়েমানুষ', 'মেয়েলোক' বললে বোঝা যায় আপাতঅলিঙ্গবাদী বাঙলা ভাষাও লিঙ্গবাদী, পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ এতেও প্রচণ্ড। বাঙলায় 'নারী'বাচক সমস্ত শব্দই কদর্থক, বা নির্দেশ করে কামশোষণ। নারী, স্ত্রী, রমণী, ললনা, অঙ্গনা, কামিনী, বনিতা, মহিলা, বামা, নিতম্বিনী, সুন্দরী প্রভৃতি শব্দে কামক্ষুধার দাগ স্পষ্ট। 'মেয়েমানুষ', 'মেয়েলোক', 'মেয়েছেলে' বললে বোঝায় একটি স্ত্রীলিঙ্গ পশু। পুরুষতন্ত্র নারীর যে-ভাবমূর্তি তৈরি করেছে কয়েক সহস্রকের সাধনায়, তাতে 'নারী' বললে মানুষ বোঝায় না; বোঝায় একধরনের মানুষ, যা বিকৃত, বিকলাঙ্গ, অতিরিক্ত, বা না-পুরুষ।

নারী কাকে বলে? দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ৩৫) বলেছেন, এর উত্তরে একধরনের পুরুষ বলে, 'নারী হচ্ছে জরায়ু, ডিম্বকোষ; নারী হচ্ছে স্ত্রীলোক।' পুরুষ এমন অসংখ্য

সংজ্ঞা দেয় নারীর, যার সবটাই নিন্দাসূচক। কোনো কোনো নারীকে দেখিয়ে তারা বলে, সে নারী নয় যদিও তার জরায়ু-স্তন-যোনি সবই রয়েছে। ওই নারীর মধ্যে তারা দেখতে পায় নারীত্বের অভাব, চিরন্তন নারীত্বের উনতা। তারা চায় নারী হবে নারী, থাকবে নারী, আর হয়ে উঠবে নারী। পুরুষ চায় শাশ্বতী নারী, যার কোনো অস্তিত্ব নেই। চিরন্তনী বা শাশ্বতী হচ্ছে পুরুষের এক চিরকালীন চক্রান্ত বা ক্ষুধা। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে/চিরন্তনীর অভাব মেটাতে হবে', তবে কোটি মন্বন্তরেও তিনি ভুলতে পারবেন না শাশ্বতীকে; পুরুষের কামনার সাথে না মিললে নারীমাত্রই পুরুষের কাছে সামান্যা : জরায়ু-যোনি-স্তনের সমষ্টি, নিজের লিঙ্গে ও যৌনতায় বন্দী পশু। পুরুষ ও স্ত্রী বা নর ও নারী ব্যাকরণে দুটি সুষম রূপ বোঝালেও জীবনে বোঝায় দুটি ভিন্ন মেরু। পুরুষ ও নারী নির্দেশ করে দ্বিমুখি বৈপরীত্য : পুরুষ বোঝায় সমস্ত সদর্থক বা অস্তিবাচক গুণ, আর নারী বোঝায় কদর্থক বা নঞর্থক বৈশিষ্ট্য। পুরুষ বোঝায় স্বাভাবিকত্ব, আদর্শ রূপ; নারী বোঝায় অস্বাভাবিকত্ব, বিকৃত রূপ। এলেন সিক্সো পুরুষ-নারীর দ্বিমুখি বৈপরীত্যের একটি তালিকা রচনা করেছেন, যাতে ধরা পড়েছে পুরুষ-নারী সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক দ্বিমুখি চিন্তাধারা। তালিকাটি নিম্নরূপ [দ্র মোই (১৯৮৫, ১০৪)] :

পুরুষ		নারী
সক্রিয়	:	অক্রিয়
সূর্য	:	চন্দ্র
সংস্কৃতি	:	প্রকৃতি
দিন	:	রাত্রি
পিতা	:	মাতা
বুদ্ধি	:	আবেগ
বোধগম্য	:	দুর্বোধ্য, স্পর্শকাতর
বিশ্বনিয়ন্ত্রক	:	করুণ

এ-তালিকার দ্বিমুখি বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়েছে পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধ। ওই বোধে পুরুষ সব সময় নির্দেশ করে মানুষের সদগুণগুলো, আর নারী নির্দেশ করে নঞর্থকগুলো। তালিকাটি আরো বাড়ানো যেতে পারে, এবং তাতেও দেখা যাবে পুরুষতন্ত্র যাকে ভালো মনে করে, অনেক সময়ই খামখেয়ালিভাবে, তাই হচ্ছে পুরুষের গুণ; আর যা কিছুকে ভালো মনে করে না, তাই নারীর বৈশিষ্ট্য। 'পৌরুষ' হচ্ছে মহাজাগতিক সদগুণের সমষ্টি, এর বিপরীত 'নারীত্ব' হচ্ছে অনন্ত নঞার্থকতা। যে-কোনো সাধারণ অভিধানে, যে-কোনো ভাষায়, 'পুরুষ', 'নারী' বা 'স্ত্রী' অন্তর্ভুক্তিগুলো দেখলে বোঝা যায় পুরুষ কতো স্বর্গীয় আর নারী কতো নারকীয়। 'পুরুষ' হচ্ছে 'নর, মনুষ্য, আত্মা, ঈশ্বর, পরমব্রহ্ম'; 'পুরুষত্ব' হচ্ছে 'পৌরুষ, উদ্যম, তেজ, পুরুষের রতিশক্তি'। 'নারী' হচ্ছে 'রমণী, স্ত্রীলোক, পত্নী'; 'নারীধর্ম' হচ্ছে 'সতীত্ব মমতা বাৎসল্য প্রভৃতি নারীসুলভ গুণ'; 'স্ত্রী' হচ্ছে 'পত্নী, জায়া, নারী, রমণী, বামা, কামিনী'; 'স্ত্রীচরিত্র' হচ্ছে

'নারীজাতির প্রকৃতি বা স্বভাব'; 'স্ত্রীধর্ম' হচ্ছে 'রজঃ, ঋতু, স্ত্রীলোকের কর্তব্য' [দ্র শৈলেন্দ্র (১৯৬৪)]।

ইংরেজি ভাষা নারীপুরুষের দ্বিমেরুত্ব নির্দেশে আরো দক্ষ। ওয়েবস্টারের তৃতীয় নতুন আন্তর্জাতিক অভিধান (১৯৬৬) অনুসারে 'manly' হচ্ছে 'having qualities appropriate to a man : not effeminate or timorous; bold, resolute, open in conduct or bearing', 'belonging or appropriate in character to a man', 'of undaunted courage : gallant, bold'; আর একই অভিধানে 'womanly'র অর্থ দেয়া হয়েছে 'marked by qualities characteristic of a woman', 'possessed of the character or behavior befitting a grown woman', 'characteristic of, belonging to, or suitable to a woman's nature and attitudes rather than to a man's'। র‍্যানডম হাউজের ইংরেজি ভাষার অভিধানে (১৯৬৭) 'manly'র অর্থ দেয়া হয়েছে 'strong, brave, honorable, resolute, virile' as 'qualities usually considered desirable in a man' আর 'womanly'র অর্থ দেয়া হয়েছে 'like or befitting a woman; feminine; not masculine or girlish', 'in the manner of, or befitting, a woman' [দ্র মিলার ও সুইফ্‌ট্‌ (১৯৭৬)]। এসব সংজ্ঞায় দেখা যায় পুরুষ বোঝায় মানুষের সব সদগুণ, আর নারী বোঝায় নঞার্থক বৈশিষ্ট্য। তাই পুরুষের সবচেয়ে বেশি অপমান বোধ হয় তাকে লম্পট, চোর, পশু, বদমাশ, গাধা-ধরনের কিছু বললে নয়, তাকে নারী বা মেয়েমানুষ বলা হ'লে।

পুরুষ শুধু নিজেকে নয়, নিজের দেহকেও মনে করে বিশুদ্ধ, উন্নত, আদর্শ কাঠামো; আর নারীদেহকে গণ্য করে বিকৃত, একধরনের প্রতিবন্ধকতা বা কারাগার, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'কুসুমের কারাগার'। ওই দেহের কোনো মাংসবৃত্ত তার কাছে বিশুদ্ধ বৃত্ত, কোনো ত্রিভূজ বিশুদ্ধ ত্রিভুজ, কোনো রন্ধ্র বিশুদ্ধ রন্ধ্র কিন্তু তা কামনার সময়ে; উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পর ওই দেহকে তার মনে হয় প্রতিবন্ধী। আরিস্ততল বলেছেন, 'নারী কিছু গুণের অভাববশতই নারী; আমরা মনে করি নারীস্বভাব স্বাভাবিকভাবেই বিকারগ্রস্ত।' সন্ত টমাসের মতে, নারী হচ্ছে 'বিকৃত পুরুষ', 'এক আকস্মিক সত্তা' [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ১৫)]। ইহুদি-খ্রিস্টান-ইসলাম ধর্মে নারীসৃষ্টির যে-উপাখ্যান বলা হয়েছে, তাতে নারীশরীর হয়ে উঠেছে পুরুষশরীরেব একটি 'অতিরিক্ত অস্থি'র পুনর্বিন্যাস। তাই তার দেহ পুরুষের কামনা জাগালেও শুরু থেকেই নিন্দিত। বাইবেলের *আদিপুস্তক*-এ নারীসৃষ্টির বিজ্ঞানটুকু এমন : 'সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পূরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার [হইয়াছে]; ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহাঁর নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন।' নিজের শরীরের জন্যে নারী ঋণী পুরুষের কাছে, আর যে-হাড়ে সে গঠিত ব'লে কথিত. তাও অপরিহার্য, সম্মানজনক নয়। পুরুষ নারীমূর্তি তৈরি করেছে নিজের কল্পনার বক্র হাড়ে, এবং যুগ যুগ ধ'রে তার নিন্দা করছে। একটি হাদিসে আছে : 'স্ত্রীগণকে সদুপদেশ দাও,

কেননা পাঁজরের হাড় দ্বারা তারা সৃষ্ট। পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ওপরের হাড় সর্বাপেক্ষা বাঁকা– যদি ওকে সোজা করতে যাও তবে ও ভেঙ্গে যাবে, যদি ছেড়ে দাও তবে আরো বাঁকা হবে' [দ্র রফিকউল্লাহ (১৯৭৯, ১৮২)]। প্রতিটি ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমানের চেতনায় নারী হচ্ছে একটি অশীল বক্র হাড়। বলা হয়ে থাকে যে হাওয়া বা ইভ মানবজাতির মাতা, কিন্তু ধর্মগ্রন্থেও– যেহেতু এগুলো পুরুষতন্ত্রেরই অনুশাসন বই– থাকে মারাত্মক স্ববিরোধিতা। ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমানের ধর্মগ্রন্থে হাওয়া বা ইভের আগেই আদমকে তৈরি ক'রে উল্টে দেয়া হয়েছে মানুষজন্মের স্বাভাবিক রীতি; নারীকে জন্ম দেয়া হয়েছে পুরুষের দেহ থেকে, অর্থাৎ পুরুষই হয়ে উঠেছে নারীজাতির মাতা! হাওয়া বা ইভের ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে আদি-বাইবেলেরও আগে, ইহুদিদের প্রাচীন পুরাণে। ইহুদিদের প্রাচীন পুরাণ অনুসারে বিধাতা আদমের জন্যে একটি 'সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, পতিপরায়ণা, সতীসাধ্বী' ভার্যা সৃষ্টির জন্যে তিন-তিনবার উদ্যোগ নেয়; এবং প্রতিবারই কোনো-না-কোনো বিপত্তি ঘটে। আদমের প্রথম ভার্যার নাম লিলিথ, এমন এক করালী নারী যার ওপর আরোহণের সাধ্য নেই কোনো পুরুষের। আদমের সাথে তার একেবারেই মিল হয় নি, কেননা লিলিথ সঙ্গমের সময় আদমের নিচে শুতে রাজি হয় নি। তার যুক্তি ছিলো, সে আর আদম দুজনেই ধুলোয় তৈরি, তাই সমান; সুতরাং সে কেনো আদমের নিচে শোবে? উত্তেজিত আদম তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে সে মন্ত্র উচ্চারণ করে হাওয়ায় মিশে যায়। এরপর বিধাতা আদমের দ্বিতীয় ভার্যা (প্রথম হাওয়া) তৈরি করা শুরু করে। কিন্তু আকস্মিকভাবে আদম ওই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দেখে ফেলে, এবং সৃষ্টির দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড ঘেন্না বোধ করে। এতে বিধাতা প্রথম হাওয়াকে নিরুদ্দেশ ক'রে ফেলে, এবং আদমের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করে দ্বিতীয় হাওয়াকে যে এখন বিখ্যাত [দ্র ফিজেস (১৯৭০, ২৭)]। পৃথিবীর তিনটি প্রধান পিতৃতন্ত্রের বদ্ধমূল কুসংস্কার হচ্ছে যে নারী বিকলাঙ্গ, পুরুষের অতিরিক্ত অস্থিতে নির্মিত।

পুরোনো কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছেন আদিম পিতৃতন্ত্রের এক প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী উত্তরপুরুষ। তাঁর নাম সিগমুন্ড ফ্রয়েড। তিনি অর্জন করেছেন আধুনিক কালের অন্যতম স্রষ্টার মহিমা; উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নিজের সমস্ত কালো কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়ে উপস্থিত করেছেন তিনি, তাই তাঁকে কেউ হেসে উড়িয়ে দিতে পারে নি, বরং কুসংস্কারের বৈজ্ঞানিক রূপ দেখে শান্তি বোধ করেছে। ফ্রয়েডের মতে, নারী হচ্ছে এমন মানুষ যার কোনো একটি প্রত্যঙ্গ হারিয়ে গেছে। একে তিনি বলেছেন 'খোজাগূঢ়ৈষা'। কোন মহান প্রত্যঙ্গটি হারিয়েছে? নারী হারিয়ে ফেলেছে তার 'শিশ্ন'। প্রায় সব আদিম সমাজই শিশ্নের মহিমায় বিশ্বাস করে; পুরুষের শিশ্ন তাদের চোখে লাঙ্গল, যা কর্ষণ করে, আর নারীর যোনি হচ্ছে জমিতে লাঙলের দাগ। সংস্কৃতে 'লাঙ্গল' আর 'লিঙ্গ' একই ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ। 'সীতা' ও 'রাম'-এর মতো পবিত্র শব্দও আসলে যোনি ও লিঙ্গের ধারণা বহন করে। 'সীতা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'হলরেখা' বা 'লাঙ্গলের ফলার দাগ', আর 'রাম' শব্দটি এসেছে 'রম্' ধাতু থেকে, যার

এক অর্থ 'চাষ করা, কর্ষণ করা', ও আরেক অর্থ 'রমণ' [দ্র নরেন্দ্রনাথ (১৯৭৫, ১০০, ১১০)]। তাই আদিম কাল থেকেই পুরুষের চোখে লিঙ্গই সম্রাট। পুরুষের বড়ো গৌরবের ধন তার দু-উরুর মধ্যস্থলে আন্দোলিত প্রত্যঙ্গটি, যার সাহায্যে সে পৃথিবীকে পর্যুদস্ত ক'রে আসছে। সে রাজা, ওটি তার রাজদণ্ড। নারী যেহেতু হারিয়ে ফেলেছে রাজদণ্ড, তাই ফ্রয়েডের মতে নারীস্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'শিশ্নাসূয়া'; অর্থাৎ নারীর জীবন কাটে নিরন্তর পুরুষাঙ্গটিকে ঈর্ষা ক'রে। শিশ্নাসূয়া ধারণার মধ্য দিয়ে আদিম বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানরূপে। ফ্রয়েড যাকে নির্দেশ করেছিলেন নারীর শাশ্বত বৈশিষ্ট্য ব'লে, সে-খোজাগূঢ়ৈষার উৎপত্তি তাঁর ধর্মীয় কুসংস্কারে, এবং ভিয়েনায় তিনি যে-রোগিনীদের চিকিৎসা করতেন, তাদের পারিবারিক-সামাজিক জীবনে। ফ্রয়েড নারীর যে-সব বৈশিষ্ট্যকে জৈবিক, সহজাত ও শাশ্বত ব'লে স্থির করেছিলেন, সেগুলো মূলত বিশেষ সাংস্কৃতিক কারণের পরিণতি। 'শিশ্নাসূয়া' বলতে তিনি যা বুঝতেন, তা হচ্ছে পুরুষ-অসূয়া। পুরুষ যে-সব সুযোগসুবিধা ভোগ করে, তাতে পুরুষকে ঈর্ষা করা স্বাভাবিক; কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে নারী ঈর্ষা করে পুরুষের নির্বোধ প্রত্যঙ্গটিকে। রোকেয়া, বাঙলার একমাত্র শুদ্ধ নারীবাদী, নানা রচনায় পুরুষকে আক্রমণ করেছেন, দাবি করেছেন পুরুষের সমান অধিকার। ফ্রয়েড তাঁকে পেলে সুখী বোধ করতেন; এবং শনাক্ত করতেন একজন শিশ্নাসূয়াগ্রস্ত রোগিণীরূপে। যা বোঝেন নি বৈজ্ঞানিক, তা ঠিকমতো বুঝেছিলেন রোকেয়া (১৯৭৩, ২৯, পাদটীকা) : 'আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ।' ফ্রয়েডের খোজা গূঢ়ৈষা ও শিশ্নাসূয়া ধারণা দুটির উদ্ভব ঘটেছে এ-বিশ্বাস থেকে যে নারী পুরুষের থেকে জৈবিকভাবে নিকৃষ্ট। তিনি পুরোনো কুসংস্কারকে পরিণত করেছেন আধুনিক অপবিজ্ঞানে। নারীকে ক'রে তুলেছেন নিজেরই শরীরের শিকার। জিহোভার মতো বলেছেন,'অ্যানাটমি ইজ হার ডেস্টিনি–শরীরই তার নিয়তি।' কুসংস্কার ও বিজ্ঞানের প্রতিভাবান এ-মিশ্রণকারী যে নারীকে বোঝেন নি, তা তিনি স্বীকার করেছেন নিজেই; বলেছেন,'নারী-আত্মা সম্পর্কে আমার তিরিশ বছরের গবেষণা সত্ত্বেও একটি মহাপ্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি নি; প্রশ্নটি হচ্ছে নারী কী চায়?'

যে-পুরুষতন্ত্র নারীকে 'সৃষ্টি' করেছে, নির্দেশ করেছে প্রতিবন্ধীরূপে, তাকে যে সে কোনো মূল্য দেবে না, বিবেচনা করবে না স্বায়ত্তশাসিত মানুষরূপে, তা অবধারিত। তাই পুরুষ নারীকে সংজ্ঞায়িত করেছে, নারীর অবস্থান নির্দেশ করেছে নিজেকে মানদণ্ড ক'রে। পুরুষ ধ্রুব, নারী আপেক্ষিক। মিশলে বলেছেন, 'নারী, এক আপেক্ষিক সত্তা।' পুরুষের মতে, পুরুষ নারীকে ছাড়াই ভাবতে পারে নিজের কথা; কিন্তু নারী পারে না পুরুষকে ছাড়া নিজেকে ভাবতে। তাই নারী হচ্ছে তা, পুরুষ তাকে যা মনে করে : পুরুষ তাকে মনে করে যৌনসামগ্রী। পুরুষের কাছে নারী হচ্ছে যোনি, যৌনবস্তু, কামের পরিতৃপ্তি; এর বেশি নয়, কম নয়। পুরুষ নারীকে নির্দেশ করে, নারীর স্বাতন্ত্র্য বোঝায় নিজের সাথে তুলনা ক'রে। পুরুষ হচ্ছে অনিবার্য, অপরিহার্য, অবধারিত; আর নারী হচ্ছে আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়, সংখ্যাতিরিক্ত [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ১৬)]। নারী

যে মানুষ, কোনো কিছুর সম্পর্কে না এসেও তার একটি নিজস্ব সত্তা আছে, এটা পুরুষতন্ত্র স্বীকার করে নি। নারীর মূল্য তার মাংসের জন্যে, তার ভূমিকার জন্যে–স্ত্রী, মাতা, দাসী হিশেবে; এর বেশি নয়। সারা এলিস লিখেছেন, 'তারা (নারীরা) তাদের গঠনে ও পৃথিবীতে তাদের অবস্থান অনুসারে আপেক্ষিক প্রাণী' [দ্র বাঙ্ক (১৯৭৪, ৫)]। নারীর মাংস চিরকালই পুরুষের কাছে সবচেয়ে সুস্বাদু; বাঙলার রাধা চিৎকার করেছে,'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'; আর বিলেতের রাজকবি টেনিসন পুরুষের সমস্ত ক্ষুধায় উত্তেজিত হয়ে লিখেছেন, 'পুরুষ শিকারী, নারী শিকার' [*দি প্রিন্সেস,* ১৮৪৭]। তাই পুরুষ অন্য যা-কিছু হ'তে প্রস্তুত, শুধু নারী ছাড়া।

পুরুষ গৌরব বোধ করে যে সে পুরুষ, কারণ সে সব কিছুর প্রভু। অন্ধ, বিকলাঙ্গ, নির্বোধ পুরুষও অধিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ নারীর ওপরে; একটি অন্ধ বিকল নির্বোধ পুরুষও অসহায় ক'রে তুলতে পারে শ্রেষ্ঠ নারীকে। ইহুদিরা ভোরবেলা প্রার্থনা করে, 'বিধাতাকে ধন্যবাদ, যেহেতু তিনি আমাকে নারী করেন নি'; আর একই সময়ে তাদের নারীরা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে, 'বিধাতাকে ধন্যবাদ, যিনি আমাকে তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করেছেন।' প্লাতো দু-কারণে তাঁর দেবতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন; প্রথমত তারা তাঁকে স্বাধীন মানুষ করেছে, ক্রীতদাস করে নি; দ্বিতীয়ত তাঁকে পুরুষ করেছে, নারী করে নি। কোরানে আছে : 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এ জন্যে যে পুরুষ ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে' [দ্র ৪ : ৩৪]। পুরুষ তার সুবিধা শান্তির সাথে ভোগ করার জন্যে দিয়েছে তাকে শাশ্বত ধ্রুব ভিত্তি; তারা তাদের প্রাধান্যকে পরিণত করেছে ঐশী অধিকারে। শুধু পার্থিব পুরুষের শক্তিতে তারা সন্তুষ্ট থাকে নি, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আবিষ্কার করেছে ও কাজে লাগিয়েছে অলৌকিক পরমপুরুষকে। পুরুষেরা বিধান প্রণয়ন করেছে, তাতে একচেটে সুবিধা দেয়া হয়েছে পুরুষকে; তারপর তারা নিজেদের বানানো বিধানকে উন্নীত করেছে চিরন্তন নীতিমালায়। তারা মুখর হয়েছে নারীনিন্দায়। তারতুলিয়ান লিখেছেন, 'নারী, তুমি শয়তানের দ্বার। তুমি তাঁকে বিপথগামী করেছো যাঁকে শয়তানও সরাসরি আক্রমণের সাহস করে নি। তোমার কারণেই ঈশ্বরের পুত্রকে মরতে হয়েছে; তুমি সব সময় শোকাকুল ও ছিন্নবস্ত্রে থাকবে।' সন্ত জন ক্রাইসোসটম বলেছেন, 'সমস্ত বর্বর পশুর মধ্যেও নারীর মতো ক্ষতিকর আর কিছু নেই।' হাদিসে আছে : 'নারীর চেয়ে ক্ষতিকর কোনো দুর্যোগ আমি রেখে যাচ্ছি না' [দ্র হিউয়েজ (১৮৮৫)] বা 'পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রাখিয়া যাইতেছি না' [দ্র নূর মোহাম্মদ (১৯৮৭, ১৮৭)]। কোঁৎ বলেছেন, নারীত্ব হচ্ছে 'প্রলম্বিত শৈশব', যা নারীর মনকে দুর্বল করে রেখেছে। বালজাক লিখেছেন, 'নারীর নিয়তি ও পরম গৌরব হচ্ছে পুরুষের হৃদয়ে স্পন্দন জাগানো...নারী অস্থাবর সম্পত্তি এবং ঠিকমতো বলতে গেলে নারী হচ্ছে পুরুষের সহায়ক।' তিনি আরো বলেছেন, 'বিবাহিত নারী হচ্ছে ক্রীতদাসী, যাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখতে হবে' [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ১৪২)]। খুব কম নারীকেই পুরুষ সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছে, কিন্তু দাসী ক'রে রেখেছে সবাইকে। এমনকি ক্ষমতাশালী রানীরাও তাদের স্বামীদের কাছে পরিচারিকার মতোই

আচরণ করেছে, যেমন রানী ভিক্টোরিয়া। নারীদের মধ্যে কোনো দান্তে নেই, শেক্সপিয়র নেই, মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ নেই, নিউটন-আইনস্টাইন নেই, ভিঞ্চি-পিকাসো নেই, প্লাতো-আরিস্ততল-মার্ক্স নেই, কোনো প্রেরিতপুরুষ তো নেই-ই; কিন্তু সত্য হচ্ছে পুরুষদের মধ্যেও এঁদের মানের লোক বেশি নেই; এবং প্রশ্ন হচ্ছে থাকবে কী ক'রে? নারীরা আজো পুরুষদের থেকে নিকৃষ্ট; এর কারণ এ নয় যে তারা সহজাতভাবেই নিকৃষ্ট, এর কারণ তাদের নিকৃষ্ট হয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের পরিস্থিতিই তাদের নিকৃষ্ট ক'রে রেখেছে। শূদ্রদের ক'রে রাখা হয়েছে শূদ্র, তাদের বাধ্য করা হয়েছে নিম্নবৃত্তিতে; কিন্তু এ থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় না যে শূদ্ররা শুধু নিম্নবৃত্তিরই উপযুক্ত। নারীকে শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বলা যায় না নারী অশিক্ষিত; তাকে বিজ্ঞান থেকে বহিষ্কার ক'রে বলা যায় না নারী বিজ্ঞানের অনুপযুক্ত। তাকে শাসনকার্য থেকে নির্বাসিত ক'রে বলা যায় না নারী শাসনের যোগ্যতাহীন। নারীর কোনো সহজাত অযোগ্যতা নেই, তার সমস্ত অযোগ্যতাই পরিস্থিতিগত, যা পুরুষের সৃষ্টি বা সুপরিকল্পিত এক রাজনীতিক ষড়যন্ত্র।

লৈঙ্গিক রাজনীতি

নারীপুরুষের অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক হচ্ছে সঙ্গম, যাতে একজনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আরেকজন। সব কিছুই রাজনীতি ব'লে যাঁরা মনে করেন, তাঁরাও মাংসের ভেতরে মাংসের অনুপ্রবেশকে রাজনীতি ব'লে মনে করেন না। সঙ্গমক্রিয়াকে দ্য বোভোয়ার (১৯৪, ৫৩-৫৪) বর্ণনা করেছেন এভাবে : নারী যখন ইচ্ছুকও হয়, তখনো পুরুষই নারীকে অধিকার করে, নারী অধিকৃত হয়। এটা হয় আক্ষরিকার্থেই, বিশেষ কোনো প্রত্যঙ্গের সাহায্যে বা বলপ্রয়োগে পুরুষ নারীকে কাবু করে, তাকে ঠিকমতো আটকে ধরে; পুরুষই সম্পন্ন করে সঙ্গমের প্রয়োজনীয় অঙ্গসঞ্চালন। পতঙ্গ, পাখি, ও স্তন্যপায়ীদের মাঝে পুরুষ বিদ্ধ করে নারীকে। বিদ্ধকরণের ফলে নারীর আভ্যন্তরতা ধর্ষিত হয়। পুরুষের আধিপত্য প্রকাশ পায় সঙ্গমের আসনেই;– অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রেই পুরুষ থাকে নারীর ওপরে। পুরুষ যে-প্রত্যঙ্গটি ব্যবহার করে সেটি একটি বস্তু, তবে উত্তেজিত অবস্থায় সেটি হয়ে ওঠে হাতিয়ার, কিন্তু নারীর প্রত্যঙ্গটি থাকে এক নিষ্ক্রিয় আধার। বোভোয়ারের বর্ণনায় সঙ্গম হয়ে উঠেছে একধরনের সমর। কিন্তু বোভোয়ার একে যুদ্ধ বলেন নি, বা নারীপুরুষের অন্তরঙ্গতম সম্পর্কের প্রকৃতি বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করেন নি এর চেয়েও ভয়ানক শব্দটি– রাজনীতি। কিন্তু সঙ্গমও একধরনের রাজনীতি, তাতে শক্তির আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। সঙ্গম থেকে নারীপুরুষের সমস্ত সম্পর্ককে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোতে ব্যাখ্যা করেছেন কেইট মিলেট তাঁর *সেক্সুয়াল পলিটিক্স* (১৯৬৯) বা *লৈঙ্গিক রাজনীতি* গ্রন্থে। দ্য বোভোয়ার *দ্বিতীয় লিঙ্গ* (১৯৪৯) গ্রন্থে অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন নারীকে, বিশ্বাসও করেছেন তিনি সমাজতন্ত্রে, আশা করেছেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হ'লে নারী তার স্বাধিকার পাবে। পরে হতাশ হয়েছেন, দেখেছেন সমাজতন্ত্রও পুরুষতন্ত্র। বোভোয়ারের বইয়ের ঠিক দু-দশক পরে বেরোয় কেইট মিলেটের *লৈঙ্গিক রাজনীতি*, যেটি সম্ভবত সব সময়ের সবচেয়ে সাহসী, এবং একমাত্র বেস্টসেলার, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ। মিলেট সাহিত্য-সমাজ-সভ্যতা ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে নারীপুরুষের অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক থেকে চরম বাহ্যিক সম্পর্ক হচ্ছে শক্তির সম্পর্ক, যার নাম তিনি দিয়েছেন *লৈঙ্গিক রাজনীতি*। কেইট মিলেট তীব্র, তীক্ষ্ণ, প্রখর ও প্রচণ্ড; এবং বিস্ময়করভাবে মননশীল।

শুরুতেই মিলেট হেনরি মিলারের *সেক্সাস*, নরম্যান মেইলারের *অ্যান আমেরিকান ড্রিম*, জাঁ জোনের *দি থিফস্ জর্নাল* ও *আওয়ার লেডি অফ দি ফ্লাওয়ার্স* থেকে নারীপুরুষের অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক সঙ্গমে লৈঙ্গিক রাজনীতির পরিচয় দিয়েছেন; দেখিয়েছেন সঙ্গমেও সক্রিয় থাকে আধিপত্য ও ক্ষমতা (বা শক্তি)। এটা শুধু জৈব ও

শারীরিক ক্রিয়া নয়, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সঙ্গম হচ্ছে লৈঙ্গিক রাজনীতি। প্রশ্ন উঠবে সঙ্গমের মতো অন্তরঙ্গ মিলনকে এবং নারীপুরুষের সম্পর্ককে রাজনীতির সীমার মধ্যে আনা যায় কিনা? এটা নির্ভর করে 'রাজনীতি' বলতে কী বুঝি আমরা, তার ওপর। রাজনীতি বলতে মিলেট বুঝিয়েছেন ক্ষমতাসংগঠন বা বিন্যাসকে, যার সাহায্যে একদল মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে আরেক দল মানুষকে। শুধু এ-রাজনীতি ধারণার সাহায্যেই বোঝা সম্ভব নারীপুরুষের ঐতিহাসিক ও বর্তমান অবস্থান বা মর্যাদা। 'রাজনীতি' বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দ, তবে নারীপুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আপত্তিকর বা অশ্লীল মনে হ'তে পারে অনেকের কাছে; কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে যে অশ্লীল এখন সত্য আর সত্য এখন অশ্লীল। আগে জন্মসূত্রেই একদল আধিপত্য করতো আরেক দলের ওপর, এখন করে না; কিন্তু এখনো, পুরোনো কাল থেকেই, চলছে জন্মাধিকারবশতই মানুষের একদলের ওপর আরেক দলের আধিপত্য; সেটা লিঙ্গের, নারীপুরুষের, এলাকায়। এখন, ও ঐতিহাসিকভাবে, নারীপুরুষের সম্পর্ক হচ্ছে আধিপত্য ও অধীনতার। পৃথিবী জুড়েই চলছে, কিন্তু চোখে পড়ে না বা স্বীকার করা হয় না যে জন্মাধিকার বলেই পুরুষেরা শাসন করছে নারীদের। এ-পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে চমৎকার একধরনের 'আভ্যন্তর ঔপনিবেশিকতা'। এর কারণ হচ্ছে সমস্ত পুরোনো ও আমাদের 'সভ্যতা' পিতৃতান্ত্রিক। এটা এতো স্পষ্ট যে চোখে পড়ে না : সামরিক, শিল্পকারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান, রাজনীতিক কার্যালয়, পুলিশ,–সমাজের ক্ষমতার সমস্ত এলাকাই পুরুষের হাতে। রাজনীতির মূলকথা হচ্ছে ক্ষমতা। ওই ক্ষমতা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে; আর অলৌকিক ঈশ্বর, রাষ্ট্রপতি ও তার মন্ত্রণালয়, সমস্ত নীতি ও মূল্যবোধ, দর্শন ও শিল্পকলা সবই পুরুষের তৈরি। পিতৃতন্ত্রের বড়ো ষড়যন্ত্র হচ্ছে যে পুরুষ আধিপত্য করবে নারীর ওপর। আবহমান কাল ধ'রে পৃথিবী জুড়ে এটা চলছে। পিতৃতন্ত্র নারীর ওপর আধিপত্য করার জন্যে গ্রহণ করেছে সার্বিক পরিকল্পনা। মিলেট (১৯৬৯, ২৬-৫৮) সেগুলোকে ভাগ করেছেন : [এক] ভাবাদর্শগত, [দুই] জৈবিক, [তিন] সমাজতাত্ত্বিক [চার] শ্রেণী, [পাঁচ] আর্থ ও শিক্ষাগত, [ছয়] বলপ্রয়োগ, [সাত] নৃতাত্ত্বিক : পুরাণ ও ধর্ম, ও [আট] মনস্তাত্ত্বিক ভাগে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিলে বোঝা যাবে পিতৃতন্ত্রের পুরুষাধিপত্যের ক্রূর পরিকল্পনা কতো ব্যাপক।

[এক] ভাবাদর্শ

কোনো সরকার ক্ষমতায় আসে দু-উপায়ে; সকলের সম্মতিতে, বা বলপ্রয়োগে। মানুষকে কোনো একটি ভাবাদর্শে দীক্ষিত করতে পারলে তাদের সম্মতি পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে। লৈঙ্গিক রাজনীতি পুরুষ-নারী দু-লিঙ্গেরই সম্মতি আদায় করে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পিতৃতন্ত্র পুরুষ ও নারীর জন্যে যে-মেজাজ, ভূমিকা, ও অবস্থান স্থির করে, সামাজিকীকরণের ফলে তা মেনে নেয় তারা। পুরুষই শ্রেষ্ঠ, এমন একটি কুসংস্কার বদ্ধমূল ক'রে তোলে পুরুষতন্ত্র, তাই অবস্থানগতভাবে পুরুষ পায় উচ্চ মর্যাদা, নারী পায় নিম্ন মর্যাদা। পুরুষ তা মেনে নেয় ও ভোগ করে তার জন্ম-অধিকার ব'লে, আর নারীও তা বিশ্বাস ও স্বীকার করে। মেজাজ গ'ড়ে তোলে মানুষের ব্যক্তিত্ব। পুরুষতন্ত্র আপন

স্বার্থে লিঙ্গ-অনুসারে পরিকল্পিত বিশেষ ছকে বেঁধে দিয়েছে নারীপুরুষের ব্যক্তিত্বকে; স্থির হয়ে গেছে যে পুরুষ হবে আক্রমণাত্মক, বুদ্ধিমান, বলশালী, ফলপ্রদ, আর নারী হবে নিষ্ক্রিয়, মূর্খ, বশমানা, সতী ও অপদার্থ। এর প্রকাশ দেখা যায় নারীপুরুষের লৈঙ্গিক ভূমিকায়। পিতৃতন্ত্র তাদের জন্যে তৈরি করেছে বিশদ বিধিমালা, স্থির ক'রে দিয়েছে কীভাবে আচরণ করবে নারীপুরুষ : কেমন অঙ্গভঙ্গি করবে, ও পোষণ করবে কী প্রবণতা। স্থির ক'রে দিয়েছে যে নারী দেখবে ঘরসংসার, পালন করবে সন্তান; আর পুরুষ অর্জন করবে অন্যান্য সাফল্য। এতে নারী রয়ে গেছে পশুর স্তরেই, পশুরাও সন্তান লালনপালন করে; আর পুরুষ উন্নীত হয়েছে মানুষের স্তরে;–যে-সব কাজ বিশেষভাবেই মানবিক, তার সবই বাখা হয়েছে পুরুষের জন্যে। পুরুষকে দেয়া হয়েছে উচ্চ অবস্থান, যা তাকে করেছে প্রভু; আর তার ভূমিকা যেহেতু প্রভুর, তাই তার মেজাজও হয়ে উঠেছে পুভুর অর্থাৎ আধিপত্যবাদী। নারীর ভূমিকা দাসীর, তাই তার মেজাজও অধীনস্থের। পুরুষের চোখে নারীর ভূমিকা চারটি : মাতা, কন্যা, বধু; এ-তিনটির কোনোটি না হ'লে নারী হয় উর্বশী অর্থাৎ পতিতা। শুধু নারীরূপে নারী কোনো মর্যাদা পায় না।

[দুই] জৈবিক

পিতৃতান্ত্রিক ধর্ম, সাধারণ বিশ্বাস, এবং অনেকাংশে বিজ্ঞানও, মনে করে যে নারীপুরুষের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যের মূলে রয়েছে তাদের শারীরিক পার্থক্য। সংস্কৃতি যে মানুষের স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা গোপন ক'রে পুরুষতন্ত্র প্রচার যে সংস্কৃতি বিকাশ ঘটায় স্বভাবের। এমন ধারণা তৈরি করা হয়ে গেছে যে পৌরুষ ও নারীত্ব সহজাত; কিন্তু নারীপুরুষের নারীত্ব ও পৌরুষ কোনো সহজাত ব্যাপার নয়, তাদের অবস্থান ও মর্যাদা পুরোপুরি অস্বাভাবিক। পুরুষের শরীর পেশল হয়, এটা অনেকটা জৈবিক; তবে সাংস্কৃতিকভাবেই খাদ্য, ব্যায়াম প্রভৃতির সাহায্যে নিজের পেশি গঠনে উৎসাহ দেয়া হয় পুরুষকে। যদি ধ'রেও নেয়া হয় যে পেশিতে পুরুষের অধিকার জন্মগত, তবু পেশি কোনো রাজনীতিক অধিকারের ভিত্তি হ'তে পারে না। পুরুষাধিপত্য পেশিশক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়; নির্ভরশীল কিছু অজৈবিক মূল্যবোধের ওপর। আধুনিক কালে পেশির মূল্য বেশ ক'মে গেছে। চিরকাল পেশির ওপর নির্ভর করেছে গরিবেরা, তাদের পেশিতে শক্তি না থাকলেও। পিতৃতন্ত্র শরীরের ওপর দেয় বিশেষ গুরুত্ব; আর পিতৃতন্ত্রের প্রবক্তারা মনে করেন মানুষের শারীরিক কারণেই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ছিলো অনিবার্য। তবে এটা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে মানবসমাজের শুরুতেই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে নি; এর আগে ছিলো প্রাকপিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, যাতে নারীরই গুরুত্ব ছিলো বেশি; কারণ নারী সন্তান জন্ম দেয়। প্রথমে জন্ম দেয়ার ব্যাপারটিই ছিলো বড়ো; কিন্তু পরে পিতৃত্বের ব্যাপারটি বড়ো হয়ে উঠলে সমাজ পিতৃতন্ত্রের দিকে বাঁক নেয়। সন্তান জন্মদানে নারীর ভূমিকাকে গৌণ ক'রে সন্তান উৎপাদনের গৌরব দেয়া হয় শুধু পুরুষলিঙ্গকে। পিতৃতান্ত্রিক ধর্ম পিতৃতন্ত্রকে সুগঠিত করে পুরুষ ঈশ্বর বা দেবতা সৃষ্টি ক'রে; এ-ধর্ম বিতাড়িত বা বিচ্যুত করে আগের দেবীদের। পিতৃতান্ত্রিক ধর্মশাস্ত্র

পুরোপুরি পুরুষাধিপত্যবাদী; এর মূল দায়িত্বই হচ্ছে পিতৃতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষা করা। ভূমিকা, মেজাজ, ও বিশেষ ক'রে অবস্থানের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্যের মূলে কোনো জৈব কারণ নেই, রয়েছে সাংস্কৃতিক কারণ। কিন্তু যুগেযুগে বহু পুরুষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে জৈব কারণেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ। অনেক চতুর পুরুষ আবার শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট তত্ত্বের বদলে পেশ করে পার্থক্যতত্ত্ব। যেমন, বাকলে নামক এক পুরুষ প্রবন্ধ লিখেছেন 'বিজ্ঞানের ওপর নারীর প্রভাব' নামে। তিনি প্রকাশ্যে পুরুষাধিপত্যবাদী নন, তাই তিনি পুরুষকে উৎকৃষ্ট নারীকে নিকৃষ্ট না ব'লে 'বৈজ্ঞানিক'ভাবে দেখিয়েছেন যে নারীপুরুষ একে অন্যের থেকে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট নয়, তারা 'পৃথক'! তিনি নারীর মন কেটেছেটে দেখিয়েছেন যে নারীর পক্ষে পুরুষের আর পুরুষের পক্ষে নারীর সমস্ত যোগ্যতা আয়ত্ত করা অসম্ভব। তিনি 'প্রমাণ' করেন যে প্রকৃতি নারীকে করেছে বোধিবাদী আর পুরুষকে উপাত্তবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী। প্রকৃতি নারীকে দিয়েছে বোধি আর পুরুষকে বুদ্ধি; তাই নারী যদিও পুরুষের মতো স্পষ্ট ক'রে কিছুই দেখতে-বুঝতে পারে না, তবে নারী অনুভব করে খুব তাড়াতাড়ি [দ্র ব্রুক (১৯৫৮, ৫৮)]! কিন্তু পুরুষের জগতে অনুভবের কোনো মূল্য নেই, সব মূল্য দেখার আর বোঝার।

পুরুষনারীর মধ্যে যদি থাকে কোনো সহজাত অসাম্য, তা প্রমাণ করার উপায় হচ্ছে তাদের সমান সুযোগসুবিধা দেয়া ও দেখা কোথায় রয়েছে কোন লিঙ্গের সহজাত অপকর্ষ। এমন পরিবেশ এখন কোথাও নেই। এখন নারীপুরুষের স্বভাব নিয়ে যে-সব গবেষণা হচ্ছে, তাতে দেখা যায় মেয়েলি-পুরুষালি হিশেবে যা-কিছুকে শাশ্বত ব'লে ধ'রে নেয়া হয়েছে, সে-সব আসলে সাংস্কৃতিক। বাঙলায় একটিই শব্দ আছে : লিঙ্গ; ইংরেজিতে আছে দুটি : *সেক্স*, ও *জেন্ডার*। সাম্প্রতিক লিঙ্গবিশেষজ্ঞরা, যেমন কালিফোর্নিয়া লিঙ্গশনাক্তি কেন্দ্রের রবার্ট জে স্টোলার, নির্দেশ করেছেন 'সেক্স' ও 'জেন্ডার'-এর পার্থক্য। 'সেক্স' জৈব, আর 'জেন্ডার' মনস্তাত্ত্বিক, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক। 'পুরুষ', 'নারী' বললে বোঝায় জৈবলিঙ্গ [সেক্স], আর 'পুরুষালি', 'মেয়েলি', 'পুরুষসুলভ', 'নারীসুলভ' বোঝায় সাংস্কৃতিক লিঙ্গ [জেন্ডার]। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ ও জৈবলিঙ্গ অবিচ্ছেদ্য নয়; পুরুষ হ'তে পারে মেয়েলি, নারী হ'তে পারে পুরুষালি। স্টোলার বলেছেন, 'বাহ্যিক জননেন্দ্রিয়গুলো (শিশ্ন, অণ্ডকোষ, মুষ্ক) যদিও সাহায্য করে পৌরুষবোধে, তবে এর জন্যে কোনোটিই প্রয়োজনীয় নয়, সবগুলোর একত্রে প্রয়োজন তো নেই-ই।... সাংস্কৃতিক লিঙ্গ নির্ধারিত হয় জন্মোত্তর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা, বাহ্যিক জননেন্দ্রিয়গুলোর গঠন যাই-হোক-না কেনো' [দ্র মিলেট (১৯৬৯, ৩০)]। এখন তো মনে করাই হয় যে মানবভ্রূণ আদিতে থাকে নারী; গর্ভধারণের কিছু পরেই শুধু মাত্র একটি ওয়াই ক্রোমোসোমের ক্রিয়ায় ভ্রূণটি পুরুষে পরিণত হয়। নারীপুরুষ মেয়েলি বা পুরুষালি গুণ নিয়ে জন্ম নেয় না; জন্মের পরে সমাজসংস্কৃতির চাপে তারা অর্জন করে মনোলৈঙ্গিক ব্যক্তিত্ব।

জন্মের পরে মানুষকে আবার জন্ম দেয়া হয়; মানুষমাত্রই দ্বিজ। জন্মের পর থেকে শুরু হয় পুত্রকে পুরুষ আর কন্যাকে নারীরূপে দ্বিতীয় জন্ম দেয়া: এবং নারী ও পুরুষ

হয়ে ওঠে দুই সংস্কৃতির অধিবাসী। তাদের জীবন, জগৎ, অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। শৈশব থেকেই বাবা-মা, সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা শেখায় মেজাজ কেমন হবে তাদের; তারা হাসবে, দাঁড়াবে, বসবে কীভাবে; পালন করবে তারা কী ভূমিকা, আর কার হবে কী মর্যাদা বা অবস্থান। তাই নারী ও পুরুষ নারী ও পুরুষ হয়ে জন্ম নেয় না, সামাজিকীকরণপ্রক্রিয়ায় তাদের নারী ও পুরুষ ক'রে তোলা হয়। পিতৃতন্ত্রের জৈবিক ভিত্তি দুর্বল; তাই নারীকে নারী ও পুরুষকে পুরুষ ক'রে তোলার জন্যে চলে ধারাবাহিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। তাদের, শৈশব থেকেই, অভ্যস্ত ক'রে তোলা হয় নারী বা পুরুষের ভূমিকায়। প্রতিটি সংস্কৃতি চায় ছেলেরা হবে সক্রিয় বা আক্রমণাত্মক, আর মেয়েরা হবে নিষ্ক্রিয়, অন্তর্মুখি বা আত্মসমর্পণাত্মক; তাই ছেলেরা হয় মাস্তান আর মেয়েরা থাকে একটি রন্ধ্র নিয়ে বিব্রত। এটা যে সাংস্কৃতিক ব্যাপার, তা স্বীকার না ক'রে পিতৃতন্ত্র মনে করে পুরুষের পৌরুষ বাস করে তার একটি ঝুলন্ত নির্বোধ প্রত্যঙ্গে ও তার নিচে থলের ভেতরের একজোড়া অণ্ডকোষে! আধুনিক সব সংস্কৃতিই ধ'রে নেয় সক্রিয়তা বা আক্রমণাত্মকতা হচ্ছে পৌরুষ, নিষ্ক্রিয়তা বা ভীরুতা হচ্ছে নারীত্ব। তবে মার্গারেট মিড *তিনটি আদিম সমাজে লিঙ্গ ও মেজাজ* (১৯৩৫), *দক্ষিণ সমুদ্র থেকে* (১৯৩৯), *নর ও নারী* (১৯৫৫) প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিয়েছেন এটা সব সংস্কৃতির জন্যেও সত্য নয়। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারীপুরুষের প্রকৃতি সম্পর্কিত গবেষণায় দেখিয়েছেন নারীপুরুষের সক্রিয়তা/নিষ্ক্রিয়তা ধ্রুব বিশ্বজনীন ব্যাপার নয়। ওই এলাকার আরাপেশদের নারীপুরুষ উভয়ই 'মেয়েলি' ও 'মাতৃসুলভ' এবং নিষ্ক্রিয়; এর কারণ তাদের ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয় একে অন্যকে সহায়তা করতে। আবার মুন্ডুগুমরদের নারীপুরুষ উভয়ই প্রচণ্ড, আক্রমণাত্মক, 'পুরুষালি'; এবং চামবুলিদের নারীরা আধিপত্যপরায়ণ, আর পুরুষেরা অধীনতাপরায়ণ [দ্র ফ্রাইডান (১৯৬৩, ১২০)]। তাই পুরুষের পৌরুষ আর নারীর নারীত্ব বা মেয়েলিপনা জৈবিক তো নয়ই, এমনকি সর্বজনীনও নয়।

[তিন] সমাজতাত্ত্বিক

পিতৃতন্ত্র সৃষ্টি করেছে নানা রকম সংস্থা, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে পরিবার। সমাজ ও রাষ্ট্র নরনারীদের সব সময় সরাসরি শাসন করতে পারে না, তাই পিতৃতন্ত্র পরিবারের সাহায্যে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি ব্যক্তিকে। তাদের বাধ্য করে পিতৃতন্ত্রের বিধি মেনে চলতে। পরিবার কাজ করে বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধিরূপে; পরিবার তার সদস্যদের খাপ খাওয়ায় পিতৃতন্ত্রের আদর্শের সাথে। পরিবার অনেকটা পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র; আর পরিবার-রাষ্ট্রের পতি হচ্ছে পরিবারের প্রধান পুরুষটি। রাষ্ট্র পরিবারের প্রধান পুরুষটির মাধ্যমে শাসন করে নাগরিকদের। এ-শাসনের বিশেষ শিকার নারীরা। যে-সব পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের আইনসঙ্গত নাগরিক অধিকারও দেয়া হয়েছে, সেখানেও দেখা যায় নারী শাসিত হয় পরিবারের দ্বারাই। রাষ্ট্রের সাথে সাধারণত নারীদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না, বা থাকে খুবই সামান্য।

পিতৃতন্ত্রের তিনটি সংস্থা– পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্র একে অন্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত, ও পরস্পরনির্ভরশীল। টিকে থাকার জন্যে পিতৃতন্ত্র পরিবারের প্রধান পুরুষটিকেই দিয়েছে সমস্ত কর্তৃত্ব; এবং তা ধর্মীয় বিধানের সাহায্যে বিধিবদ্ধ করেছে। *মনুসংহিতায়* [৯:৩] বলা হয়েছে, 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি' : কুমারীকালে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করবে নারীকে; নারী স্বাধীনতার অযোগ্য। ইহুদিধর্মে পিতা পেয়ে থাকে পুরোহিতের অধিকার; বাইবেলে সদাপ্রভু নারীকে বলে, 'সে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে' [মানবজাতির পাপে পতন : *আদিপুস্তক];* ক্যাথলিকদের বিধান হচ্ছে 'পিতাই পরিবারের কর্তা'; কোরানে আছে : 'পুরুষ নারীর কর্তা' [৪:৩৪]; এবং হাদিসে পুরুষকে দ্বিতীয় বিধাতায় পরিণত করা হয়েছে : 'যদি আমি অন্য কাউকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে' [দ্র রফিক (১৯৭৯, ১৮১)]। আধুনিক সরকারগুলো মেনে চলে এসব বিধানই; সব ক্ষেত্রেই পুরুষকে গণ্য করে পরিবারের প্রধানরূপে।

পিতৃতন্ত্রে পিতা কুলপতি; তিনিই সব কিছুর মালিক। পিতা মালিক তার স্ত্রীর বা স্ত্রীদের, সন্তানদের; পিতার অধিকার রয়েছে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রহারের, এমনকি বিক্রি ও হত্যার! পিতৃতন্ত্রে আত্মীয়তার ধারা পুরুষপরম্পরায় প্রবাহিত হয়; উত্তরাধিকার নির্ণয় করা হয় পুত্রপৌত্রক্রমে। দুহিতা ও দৌহিত্রক্রম এক সময় হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। গোত্রতা অনুসারে নারীপরম্পরার উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তিব অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ক্রিয়াকলাপ, রোমের *পত্রিয়া পোতেসতেস* অনুসারে, প্রথম নির্দেশ করেছিলেন হেনরি মেইন। তাঁর মতে পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুরুষটি সার্বভৌম। তার আধিপত্য জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রসারিত; আর ওই আধিপত্য তার সন্তানাদি, তাদের ঘরবাড়ি থেকে দাসদাসীর ওপর বিস্তৃত। আদিম পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে জ্যেষ্ঠ পুরুষটির একনায়কত্বের অধীনে সবাই ও সব কিছু-স্ত্রী, সন্তান, জমিজমা, সজীব বা অজীব সম্পত্তি, দাসদাসী প্রভৃতি। মেইন অবশ্য মনে কবতেন যে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বিশ্বজনীন ব্যাপার, কিন্তু তা নয়। অনেকেই মনে করেন যে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বেশ পরে, নারীদের অধিকার ধীরেধীরে হরণ ক'রে। সাম্প্রতিক পিতৃতন্ত্রে পুরুষের আধিপত্য কিছুটা কমানো হয়ছে নারীদের কিছুটা অধিকার দিয়ে; যেমন দেয়া হয়েছে নারীদের বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার, নাগরিকত্ব, সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার। তবে তারা এখনো স্বামীদের অস্থাবর সম্পত্তিই রয়ে গেছে। পিতৃতন্ত্র পরিবারকে দেয় একটি বড়ো দায়িত্ব, আর পরিবার সেটি পালন করে চমৎকারভাবে। পরিবারকে দেয়া হয় তার সন্তানসন্ততিদের সামাজিকীকরণের ভার। পরিবার পিতৃতন্ত্রের আদর্শানুসারে গ'ড়ে তোলে পুত্র ও কন্যাদের, শিখিয়ে দেয় তারা পালন করবে কোন ভূমিকা, কার মেজাজ হবে কেমন, আর অবস্থান হবে কোথায়। রয়েছে পিতৃতন্ত্রের আরো নানা সংস্থা-বিদ্যালয়, পুরোহিত, প্রচারমাধ্যম, এবং কী নয়? প্রতিষ্ঠা করা হয় জীবনের সমস্ত এলাকায় পুরুষাধিপত্য, নারীকে করা হয় অধীন। পিতৃতন্ত্র নারীর সতীত্বের ও সন্তানের বৈধতার ওপর দিয়ে থাকে চরম গুরুত্ব: এর কারণও পুরুষাধিপত্য

অক্ষুণ্ন রাখা। এর সাহায্যে সন্তান ও মাতাকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ক'রে তোলা হয় পুরুষের ওপর।

[চার] শ্রেণী

লিঙ্গের ক্ষেত্রে বর্ণ দুটি : ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। পুরুষ ব্রাহ্মণ, নারী শূদ্র; বা পুরুষ বুর্জোয়া, নারী প্রলেতারিয়েত। তবে লিঙ্গের এলাকায় শ্রেণী ব্যাপারটি ঢাকা থাকে ধুঁয়োজালে, তাই সত্য সহজে চোখে পড়ে না। যে-সমাজে মানুষের অবস্থান বা মর্যাদা নির্ভর করে সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাগত পরিস্থিতির ওপর, সেখানে কিছু নারী কিছু পুরুষের ওপরে মর্যাদা পায়; এ-কারণেই ঘোলাটে হয়ে ওঠে লিঙ্গগত শ্রেণীর ব্যাপারটি। একটি উদাহরণ দিই। হিন্দুসমাজের একজন শূদ্র চিকিৎসক বা আইনজীবী শিক্ষা ও অর্থের কারণে একজন ব্রাহ্মণ চাষীর থেকে বেশি গুরুত্ব পায়, কিন্তু ব্রাহ্মণটি বর্ণের কারণেই ভোগ করে বেশি মর্যাদা। নিম্নবর্ণের চিকিৎসক বা আইনজীবী অর্থ ও শিক্ষা দিয়েও ওই মর্যাদা আয়ত্ত করতে পারে না, বরং ভোগ করে মানসিক যন্ত্রণা। ঠিক তেমনই একটি শ্রমিক বা রিকশাঅলা নিজের পৌরুষের জন্যেই উচ্চ শ্রেণীর নারীর থেকেও বেশি মর্যাদা পায় বা দাবি করে। *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* আছে, 'সর্বগুণান্বিতা নারীও অধমতম পুরুষের থেকে হীন।' ইসলামে একজন পুরুষ দুজন নারীর সমান; ওই পুরুষটি যে-ই হোক, ওই দুই নারী যারাই হোক। কোরানে আছে : 'তোমাদের পছন্দ মতো দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক' [২ : ২৮২]; তাই একটি বিকলাঙ্গ ভিখিরিও একজন মহিলা রাষ্ট্রপতির দ্বিগুণ মর্যাদাসম্পন্ন। পাকিস্তানে একটি পুরুষ চোরকে শনাক্ত করতে দরকার হয় দুটি নারীপুলিশ! জনহীন কক্ষে নারী প্রধান মন্ত্রীও অসহায় হয়ে উঠতে পারে তার ভৃত্যের কাছে; ভৃত্য হয়ে উঠতে পারে প্রভু আর নারী প্রধান মন্ত্রী দাসী। যে-অঞ্চলে পিতৃতন্ত্র যতো উগ্র, সেখানে নারীর শ্রেণী-অবস্থান ততো নিচে ও ততো স্পষ্ট। পাশ্চাত্যে পিতৃতন্ত্র কিছুটা নমনীয় ব'লে সেখানে নারীর শ্রেণীগত অবস্থান ততোটা নিচে নয়, কিন্তু প্রাচ্যে উগ্র অনমনীয় পিতৃতন্ত্র নারীকে শূদ্র ক'রে রেখেছে। হিন্দু আর মুসলমানদের একটি বড়ো অংশ উগ্র পিতৃতন্ত্রের ধারক ব'লে এ-দু-সমাজে আজো নারীদের শ্রেণীগত অবস্থান অত্যন্ত নিচে।

পিতৃতন্ত্রের একটি সুন্দর ষড়যন্ত্র হচ্ছে নারীদের এক শ্রেণীকে লাগিয়ে রাখা আরেক শ্রেণীর বিরুদ্ধে; বেশ্যার বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখা সতীকে, কর্মজীবী নারীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখা গৃহিণীকে। একদল ঈর্ষা করে আরেক দলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তাকে; আবার আরেক দল নিরাপত্তা মর্যাদার অবরোধের মধ্যে বাস ক'রে ঈর্ষা করে অন্য দলের স্বাধীনতা ও মুক্তিকে। পুরুষ বিচরণ করে ঘরে-বাইরের দু-জগতেই; আর নিজের সামাজিক আর্থনীতিক ক্ষমতার সাহায্যে নারীদের দু-দলকে লিপ্ত রাখে চিরশত্রুতায়। নারী জন্মসূত্রে কোনো এক বিশেষ পরিবার ও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু আসলে নারী কোনো পরিবার বা শ্রেণীর সাথেই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়। নারী যেহেতু আর্থিকভাবে পুরুষনির্ভর, তাই যে-কোনো শ্রেণীর সাথে তার সম্পর্ক অস্থির ও অনিশ্চিত,

যে-কোনো সময় তা ছিন্ন হয়ে নারী নেমে যেতে পারে নিম্নতম শ্রেণীতে। নারীর কখনোই শ্রেণী-উন্নতি ঘটে না; যদি জন্মশ্রেণীতে থাকতে না পারে, তাহলে ঘটে তার শ্রেণী-অবনতি। হিন্দুসমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ ব'লে দু-রকম বিয়ে রয়েছে। নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের নারীর বিয়ে প্রতিলোম বিবাহ; এবং উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের নারীর বিয়ে অনুলোম বিবাহ। অনুলোম বিবাহে উচ্চবর্ণের পুরুষকে বিয়ে ক'রেও নারীর বর্ণোন্নতি ঘটে না, আর প্রতিলোম বিবাহের ফলে নারীর ঘটে বর্ণচ্যুতি; অর্থাৎ সমাজচ্যুতি। জর্মনিতেও ছিলো একই রীতি। মধ্যযুগে জর্মনিতে একজন নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যখন উচ্চশ্রেণীর নারীকে বিয়ে করতো, প্রতিলোম বিয়ের মতো নারীটি থাকতো জাতিচ্যুত; আবার নিম্নশ্রেণীর নারী যখন কোনো উচ্চশ্রেণীর পুরুষকে বিয়ে করতো তখন সে স্বামীর শ্রেণীতে উঠতো না [দ্র ভূপেন্দ্রনাথ (১৯৪৬, ৮৬-৮৯)]। মুসলমানদের মধ্যেও একই রকম ঘটে; উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা দাসীসম্ভোগে উৎসাহ বোধ করে, ধর্মে তার বিধানও রয়েছে, এবং বাধ্য হয়ে বিয়েও করে; কিন্তু ওই নারীটির শ্রেণী-উন্নতি ঘটে না। এখনো শিক্ষিত কোনো নারী যদি বিয়ে করে কোনো অশিক্ষিত পুরুষকে, তবে পুরুষটির উন্নতি ঘটে না; সৃষ্টি হয় এক কেলেঙ্কারি, নারীটি সমাজের তলদেশে নেমে যায়। তার কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না। শুধু নিজের ওপর নির্ভর করতে হ'লে খুব কম নারীই শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে কোনো উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। কোটিপতির স্ত্রী একদিনে দাসী হয়ে উঠতে পারে। তাই তারা পরগাছার মতো জীবন ধারণ করে-তারা হয় পরগাছার পরগাছা; এবং নিজেদের রক্ষার জন্যেই হয়ে ওঠে রক্ষণশীল, যারা তাদের ভরণপোষণ করে তাদের সমৃদ্ধির সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেদের জীবনকে জড়িয়ে রাখার। দাস যেমন প্রভুর সমৃদ্ধিকে মনে করে নিজের সমৃদ্ধি নারীও স্বামীর বা পুত্রের, অর্থাৎ পুরুষের, সমৃদ্ধিকে মনে করে নিজের সমৃদ্ধি। তারা নিজেদের মুক্তির কথা ভাবতেও পারে না।

[পাঁচ] আর্থ ও শিক্ষা

নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পিতৃতন্ত্র সমস্ত আর্থ কর্তৃত্ব রেখেছে পুরুষের হাতে। সমস্ত পিতৃতন্ত্রেই, হিন্দু-ইহুদি-খ্রিস্টান-মুসলমান, নারীর কোনো আর্থ অস্তিত্ব নেই। কোরানে আছে : 'পুরুষ নারীর কর্তা,... আর এজন্যে যে পুরুষ ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে' [৪:৩৪]। নারী নিজের অধিকারে কোনো সম্পত্তি অর্জন করতে বা সম্পত্তির মালিক হ'তে পারতো না। এখন এ-বিধি কিছুটা শিথিল হয়েছে, কিন্তু তাতে নারীর আর্থভিত্তি শক্ত হয় নি। নারী চিরকালই খেটেছে, পুরুষের চেয়ে বেশিই খেটেছে; কিন্তু তার পারিশ্রমিক পায় নি। আধুনিক ভদ্র পিতৃতন্ত্রে নারী কিছুটা আর্থ অধিকার পেয়েছে, কিন্তু সেখানেও নারীরা পুরুষের সমান পারিশ্রমিক পায় না। অর্থের ওপরই যেখানে নির্ভর করে সম্মান ও স্বাধীনতা, সেখানে এর অভাবের পরিণতি মারাত্মক। তারই শিকার নারী। নারীদের অধীনতার মূল কারণ আর্থিক পরনির্ভরতা; অর্থের অভাবেই তারা পরাশ্রিত। নারীরা যেখানে কোনো পেশায় নিযুক্ত হয়, বেতন পায় পুরুষদের থেকে কম; উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন নারীরাও কম যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষদের থেকে কম বেতন পায়।

চাকুরিতে তাদের উন্নতিও ঘটে না। আধুনিক পুঁজিবাদী দেশগুলোতে নারীদের রাখা হয় সংরক্ষিত শ্রমশক্তি হিশেবে। বিপদে পড়লে উগ্র পিতৃতান্ত্রিক দেশগুলোও অবরোধ ও বোরখার ভেতর থেকে বের ক'রে আনে তাদের সতীসাধ্বী নারীদের। যুদ্ধ বা সংকটের সময় পুরুষতন্ত্র ঘর থেকে বের ক'রে এনে নানা কাজে লাগায় নারীদের, আবার শান্তির সময় তাদের দলবেঁধে ঢোকোনো হয় ঘরে। তখন বলা হয় গৃহই নারীর নিজের ভুবন, নারীই গৃহের শান্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিমের দেশগুলো নারীদের লাগায় সমস্ত কাজে—এমনকি সৈনিকদের চিত্ত ও শরীরবিনোদনের কাজে, এবং যদ্ধের পর ঢোকায় ঘরে। ১৯৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ঘটে যুদ্ধের থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা। যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে সৌদি আরবের মতো কঠোর পিতৃতন্ত্রও নারীদের ঘর থেকে বের ক'রে লাগায় নানা 'সেবামূলক' কাজে। যুদ্ধের সময় গৌণ হয়ে যায় পিতৃতন্ত্রের বিধান; কিন্তু যুদ্ধশেষেই তা আবার প্রবলভাবে জেগে ওঠে, নারীদের পালে পালে ঢোকানো হয় ঘরে। যুদ্ধের পরে সৌদি পিতৃতন্ত্র নারীদের সাথে আদিম আচরণ করতে ভোলে নি; তাদের এমনকি গাড়ি চালানোর অধিকারও দেয় নি। কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত নারী বিদ্রোহ করেন, নিজেরা গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়েন; সৌদি পিতৃতন্ত্র তাঁদের গ্রেফতার করে, চাকুরিচ্যুত করে, এবং আরো নানা হিংস্র শাস্তি দেয়, যা বাইরের জগত আজো জানতে পারে নি। সমাজতান্ত্রিক দেশে নারীদের অধিকাংশই নিয়োজিত নিচের শ্রেণীর কাজে, তবে কিছু পেশায় সেখানে নারীদের আধিক্য রয়েছে, যেমন চিকিৎসায়। কিন্তু এখানেও পিতৃতন্ত্র কৌতুক করে নারীদের নিয়ে। যে-পেশায়ই নারীরা ঢোকে, হ্রাস পায় সে-পেশারই মূল্য, ক'মে যায় বেতন। নারীরা যেমন বিনাবেতনে পরিবারের সেবা করে, তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজও মনে করে যে নারীর চাকুরি হচ্ছে সেবা। পুরুষের কাছে সেবা প্রত্যাশা করা হয় না, কিন্তু নারী যেখানেই কাজ করে সেখানেই তার কাছে সেবা চাওয়া হয়, যেনো টাকার তার কোনো দরকার নেই। নারীকে অসহায় ক'রে রাখার জন্যে এটা এক সুন্দব চক্রান্ত।

নারীর আর্থ স্বাধীনতাকে দেখা হয় কুটিল সন্দেহের চোখে। তাই পিতৃতন্ত্রের সমস্ত সংস্থা প্রচার চালায় নারীর, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীর, পেশাগ্রহণের বিরুদ্ধে। নিম্নবিত্ত নারী নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, তারা তো নিম্নকাজের জন্যেই জন্মেছে, খুব শস্তায় পাওয়া যায় তাদের; কিন্তু বড়োই উদ্বিগ্ন তারা মধ্যবিত্ত নারীকে নিয়ে। পরিবার, ধর্ম, মনোবিজ্ঞান, প্রচারমাধ্যম ও আরো নানা সংস্থা তিরস্কার করতে থাকে পেশাজীবী নারীদের। বাঙলার প্রথম উচ্চশিক্ষিত নারীরা পিতা, বা স্বামীর পরিবারের আদেশে, বা সামাজিক নিন্দায় পেশাগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন বা পেশাগ্রহণে বিলম্ব করেছেন; অনেকে বিয়ের পর বিয়েকেই পেশারূপে গণ্য ক'রে আর্থিক চাকুরি ছেড়ে দিয়েছেন। নিম্নশ্রেণীর নারীদের কাজ নিয়ে পিতৃতন্ত্রের দুশ্চিন্তা নেই, বরং তারা কাজ না করলেই আতংকিত বোধ করে করে পিতৃতন্ত্র; কারণ তারা শস্তা। তারা মধ্যবিত্ত নারীদের মতো ভয়াবহ নয়, তাদের নিয়ে কোনো ভয় নেই। মধ্যবিত্ত নারীরা যদি কাজ করে-বিচার, চিকিৎসা, অধ্যাপনা করে, আমলা হয়, তাহলে তা পিতৃতন্ত্রের বা পুরুষতন্ত্রের আর্থ ও

মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটাকেই ভেঙে দিতে পারে। পেশাজীবী নারীরা আসলে নিযুক্ত থাকে দুটি পেশায়;– তাদের ঘরসংসার দেখতে ও সন্তান পালন করতে হয়, আর পালন করতে হয় পেশার দায়িত্ব। পেশাকে তারা পুরোপুরি পেশা হিশেবে নিতে পারে না, পরিবারই হয়ে থাকে তাদের মূলপেশা। পৃথিবী জুড়ে নারীরা যে-সব পেশায় এখন জড়িত, তা শ্রমিকের পেশা; তাই তাদের নির্দেশ করা যায় সাম্প্রতিক বিশ্বের প্রধান শ্রমিক শ্রেণীরূপে।

পৃথিবী জুড়ে নারী এখনো শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে; আর যারা শিক্ষা পাচ্ছে, তারাও ঠিক শিক্ষা পাচ্ছে না। পুরুষতন্ত্র তাদের সে-শিক্ষাই দিতে আগ্রহী, যা নারীদের নারী ক'রে রাখে, যা পরিশেষে কল্যাণে আসে পুরুষের। পুরুষ প্রথমে নারীদের লেখাপড়া শেখাতেই রাজি হয় নি, বা মূর্খের মতো কিছুটা ধর্মশাস্ত্র শিখিয়েছে; পরে যখন বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে, তখনো বের করেছে বিশেষ একধরনের নারীশিক্ষা। উনিশশতকের বাঙলার নারীশিক্ষার এ-রূপ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু (১৮৭৪, ৪৭-৪৮) বলেছেন, 'স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা তাহাদিগকে কেবল অশ্লীল গল্প ও নাটক পাঠে পারগ ক'রে', আর 'তাহারা কেবল কার্পেটই বুনছে, কার্পেটই বুনছে। যদি তাহা না করিয়া পিরাণ শিলাই করিতে শিখে, তাহা হইলেও জানিলাম যে, কিছু উপকারে আইল।' পুরুষ নিজের স্বার্থে নারীদের যে শিক্ষা দেয়, তা হয়ে ওঠে এমনই নিরর্থক ও হাস্যকর। পুরুষদের একটি যুক্তি হচ্ছে নারীর দেহ সব রকম শিক্ষার উপযুক্ত নয়। ক্রীতদাস একসময় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে প্রভুর দর্শনে, নারীরাও প্রচার করে পুরুষের দর্শন। এর পরিচয় পাওয়া যায় শিক্ষিতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর উক্তিতে। এ-আধুনিকাও মনে করেন, 'গৃহধর্ম নারীজীবনের সারবস্তু, যাহার জন্য সমাজে নারীর স্থান ও মান', আর নারীর দেহ খুবই পেলব, তাই তিনি 'বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে' বলেছেন যে 'পরীক্ষা দেওয়াই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে।' এ-আধুনিকার মতে,'বঙ্গরমণীর শরীর মন ও ভবিষ্যৎ জীবনের গঠন স্মরণ রাখিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কঠিন সংগ্রামে তাহাদের যোগ দিতে না দেওয়াই ভালো।' কারণ 'স্ত্রীলোক ও পুরুষের ভবিষ্যৎ জীবন এমন স্বতন্ত্র ছাঁচে ভগবান ঢালিয়াছেন, তখন শেষ পর্যন্ত তাহাদের একই রকম শিক্ষা দেওয়া কখনই সমীচীন নহে' [দ্র ইন্দিরা (১৯২০, ১৩-১৫)]। এ হচ্ছে নারীর কণ্ঠে পুরুষতন্ত্রের উক্তি, বা দাসীর মুখে প্রভুর ভাষা। আধুনিক পিতৃতন্ত্রগুলো এখন নারীদের জন্যে উচ্চশিক্ষার সমস্ত দরোজা খুলে দিয়েছে; তবে নারীপুরুষের উচ্চশিক্ষার বিষয় ও মানে পরিকল্পিত পার্থক্য রাখতে তারা ভোলে নি। শৈশব থেকেই পিতৃতন্ত্র ঠিক ক'রে দেয় ছেলেরা ঢুকবে কোন দরোজা দিয়ে আর মেয়েরা কোন দরোজা দিয়ে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও রয়েছে কিছু নারীর বিষয় কিছু পুরুষের বিষয়। মনে করা হয় যে নারীরা পড়বে মানববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার কিছু গৌণ বিষয়; আর পুরুষেরা পড়বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রকৌশল, ব্যবসাশাস্ত্র প্রভৃতি। আজকের পৃথিবীতে মান-সম্মান-অর্থ রয়েছে পুরুষের বিদ্যাগুলোতে; আর এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণের অর্থ হচ্ছে রাজনীতিক আধিপত্য বা শক্তি। পিতৃতন্ত্র লিঙ্গানুসারে মর্যাদা স্থির করে; যে-সমস্ত এলাকায় পুরুষের আধিপত্য সেগুলো ভোগ করে অবিমিশ্র মর্যাদা, আর যেগুলোতে পুরুষের প্রাধান্য নেই বা রয়েছে নারীর অংশ, সেগুলোর মর্যাদা কম।

তাই মানববিদ্যা পায় কম মর্যাদা, কেননা এগুলোতে পুরুষাধিপত্য নেই; আর বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, ব্যবসা, সামরিক বাহিনী পায় নিরঙ্কুশ মর্যাদা, কেননা এগুলোতে পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ অপ্রতিহত।

[ছয়] বলপ্রয়োগ

পিতৃতন্ত্র নিজের আদর্শ বিশ্বজনীনভাবে বাস্তবায়নের জন্যে প্রধানত আশ্রয় নেয় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার; কিন্তু দরকার হ'লে বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করে না। সামাজিকীকরণের পেছনে বলপ্রয়োগের ভয়টাকে সব সময়ই জাগিয়ে রাখে; ত্রস্ত ক'রে রাখে সবাইকে, যাতে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয় পিতৃতন্ত্রের অনুশাসন। অধিকাংশ পিতৃতন্ত্র বলপ্রয়োগ ক'রে থাকে তার আইনপদ্ধতির মাধ্যমে; আইনপদ্ধতি হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের বলপ্রয়োগসংস্থা। যেমন, ইসলামে যৌনবিধি লংঘনের শাস্তি খুব কঠোর। বিধান হচ্ছে পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড; সৌদি আরবে এখনো একজন মোল্লার নেতৃত্বে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয় ব্যভিচারিণীদের। আগে অনেক সমাজে পুরুষের ব্যভিচারকে কোনো অপরাধ ব'লেই ধরা হতো না। যখন অপরাধ গণ্য করা হতো, তখন সেটাকে মনে করা হতো কোনো পুরুষের সম্পত্তির ওপর অন্য পুরুষের হস্তক্ষেপ ব'লে। ব্যভিচারের শাস্তির বিধিও ছিলো একক শ্রেণীর জন্যে একেক রকম; যেমন জাপানে সামুরাইরা নিজেদের মহিমা রাখার জন্যে হত্যা করতে বাধ্য হতো তাদের ব্যভিচারিণী স্ত্রীদের; কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের তেমন বাধ্যবাধকতা ছিলো না। প্রায় সব সমাজেই দেখা গেছে নিম্নশ্রেণীর কোনো পুরুষ যখন উচ্চ শ্রেণীর নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, তখন শিরচ্ছেদ করা হয়েছে দুজনেরই; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর পুরুষ যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে নিম্নশ্রেণীর নারীর সাথে, তখন নারীটি অসতী ব'লে সমাজচ্যুত হ'লেও পুরুষটির কোনো শাস্তি হয় নি। এখনো এই নিয়ম। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যখন উচ্চশ্রেণীর নারীর সাথে ব্যভিচারে জড়িত হয়, তখন তারা অপরাধ করে উচ্চশ্রেণীটির বিরুদ্ধে, তাই তারা দুজনেই পায় চরম শাস্তি। এটা দ্রোহিতার শাস্তি, চলে ব্যভিচারের নামে।

পিতৃতন্ত্র তার বলপ্রয়োগের অধিকার অর্পণ করেছে পুরুষের ওপর। সমাজের নিম্নশ্রেণীর পুরুষেরা তাদের এ-অধিকার নিয়মিত প্রয়োগ ক'রে থাকে; আর উচ্চশ্রেণীর পুরুষেরা তা শারীরিকভাবে প্রয়োগ না করলেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রয়োগ করে ভালোভাবেই। পুরুষ মানেই সে পীড়নের অধিকার রাখে, যদিও সে পীড়ন নাও করতে পারে-এটা তার স্বাধীনতা; আর পিতৃতন্ত্র নারীকে এমনভাবে দীক্ষা দেয় যেনো সে পীড়নের শিকার হ'তে বাধ্য থাকে, পীড়নকে সঙ্গত ব'লে মেনে নেয়। কোনো পুরুষ যখন কোনো নারীকে আক্রমণ করে, নারীটি সশস্ত্র হ'লেও সহজেই অসহায় হয়ে পড়ে, কেননা পিতৃতন্ত্র তাকে শারীরিক মানসিকভাবে এভাবেই তৈরি করেছে। পিতৃতন্ত্রের নারীর ওপর বলপ্রয়োগের হিংস্র রূপ হচ্ছে বলাৎকার বা ধর্ষণ। আমাদের দেশে বলা ৎকার নিয়মিত ঘটনা, যাতে প্রকাশ পায় আমাদের পিতৃতান্ত্রিক হিংস্রতা। অধিকাংশ বলাৎকারের ঘটনাই লোকলজ্জার ভয়ে নারীরা প্রকাশ করে না। আগে অনেক সমাজে

বলাৎকারকে কোনো নারীর ওপর পীড়ন ব'লেও গণ্য করা হতো না, গণ্য করা হতো এক পুরুষের কাছে আরেক পুরুষের অপরাধ ব'লে, যাতে একটি পুরুষ দূষিত করেছে আরেকটি পুরুষের নারীসম্পত্তি। ফ্রয়েড তো এমন সিদ্ধান্তেই তাঁর অনুসারীদের পৌঁছে দেন যে বলাৎকার নারীর জন্যে এক ধরনের সুখ! ধর্ষণ লিঙ্গরাজনীতির এক চরম রূপ। সাহিত্যেও বলাৎকার ব্যাপারটি পুরুষেরা উপভোগ ক'রে থাকে, লেখকেরাও ধর্ষণ বর্ণনার সময় উপভোগ করেন নারীকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করার সুখ।

বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসেও মুক্তি ও যুদ্ধের থেকে অনেক সময় বড়ো হয়ে উঠেছে ধর্ষণ। সৈয়দ শামসুল হকের *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১, ১৫১) থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। পাকিস্তানি মেজরটি বিলকিসকে শারীরিক ধর্ষণের আগে ধর্ষণ করে মানসিকভাবে, যা শারীরিক ধর্ষণের থেকে অনেক বেশি হিংস্র। মানসিক ধর্ষণের রূপটি এমন :

'আমাকে একটা কথা বলো, হিন্দুরা কি প্রতিদিন গোসল করে?'
নীরবতা।
'হিন্দু মেয়েদের গায়ে নাকি কটু গন্ধ?'
নীরবতা।
'তাদের জায়গাটা পরিষ্কার?'
নীরবতা।
'আমি শুনেছি, মাদী কুকুরের মতো। সত্যি?'
নীরবতা।
'শুনেছি, হয়ে যাবার পর সহজে বের করে নেয়া যায় না?'
নীরবতা।
'আমাকে কতক্ষণ ওভাবে ধরে রাখতে পারবে?'

ধর্ষণের আগে এই যে মানসিক ধর্ষণ ও জাতিবিদ্বেষ, এতে শুধু পাকিস্তানি মেজরটি অংশ নেয় নি, অংশ নিয়েছেন লেখক নিজে ও সমগ্র পিতৃতন্ত্র। এমন পুরুষ পাওয়া যাবে না যে বাস্তবে না হ'লেও মনে মনে কোনো নারীকে বলাৎকার করে নি। পিতৃতন্ত্রের নারীবিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে বিপুল পরিমাণে রচিত নারীবিদ্বেষমূলক সাহিত্যে। ভারতে, চীনে, জাপানে ও ইউরোপে লেখা হয়েছে এ-ধরনের বিপুল সাহিত্য। পিতৃতন্ত্র নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে নানাভাবে : ভারতে সতীদাহ, চীনে কাঠের জুতো, আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে মেয়েদের ভগাঙ্কুর কেটে ফেলা নিষ্ঠুরতার উদাহরণ। নারীর ওপর পুরুষের বলপ্রয়োগের শেষ নেই। পুরুষ চায় নারীকে সব সময় ত্রাসের মধ্যে রাখতে।

[সাত] নৃতাত্ত্বিক : পুরাণ ও ধর্ম

পিতৃতন্ত্র নারী সম্পর্কে পোষণ করে যে-সব বদ্ধমূল ধারণা, নারী তার কোনোটিরই স্রষ্টা নয়। ওই সব ধারণা সৃষ্টি করেছে পুরুষ। নারীর যে-ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে কয়েক হাজার বছরে, তার শিল্পীও পুরুষ। নারীর ওই ভাবমূর্তি পুরুষ সেভাবেই তৈরি করেছে, যা পুরুষের চাহিদা মেটায়। নৃতত্ত্ব, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক পুরাণে রূপায়িত হয়ে আছে নারী

সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রের বিচিত্র ধারণা। পুরুষতন্ত্রের নারীধারণার মূলকথা নারী নিকৃষ্ট; কেননা নারীর শরীর ভিন্ন। নারীকে পুরুষ নিজের গোত্রের ব'লে মনে করে নি, মনে করেছে 'অপর' বা শত্রু; তাই তাকে পীড়ন করার জন্যে তার ওপর বিস্তার করেছে ব্যাপক আধিপত্য। তাকে বলেছে বিকলাঙ্গ, ঘেন্না করেছে তাকে কলুষিত বা অশুচি ব'লে; রেখেছে নিজের পবিত্র সীমা থেকে দূরে। নারীর যৌন বা শারীর ব্যাপারগুলোকে বিশ্বজনীনভাবেই গণ্য করা হয় অশুচি ব'লে, যার পরিচয় পাওয়া যায় পুরাণে, ধর্মগ্রন্থে, সাহিত্যে। নারীদের সৃষ্টিশীল পর্বের একটি নিয়মিত ব্যাপার ঋতুস্রাব। পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থে একে অত্যন্ত অশুচি ব'লে বার বার উল্লেখ ক'রে নারীকে দেখানো হয়েছে একটি অসুস্থ অশুচি প্রাণীরূপে, যদিও ব্যাপারটি রোগও নয় অশুচিতাও নয়। আদিম সমাজে ঋতুকালে নারীদের গ্রামের প্রান্তে কুঁড়েঘরে রাখা হয়; এবং সভ্য সমাজেও এ-সময় নারীকে গণ্য করা হয় অস্পৃশ্য। নারী ঋতূকালে যে-যন্ত্রণা বোধ করে, তার অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক, কিন্তু তা-ই পুরুষতন্ত্রের বিধিবিধানের ফলে শারীরিক হয়ে ওঠে।

আদিম সমাজে নারীর যোনিকে মনে করা হয় একটি ক্ষত। তারা বিশ্বাস করে ওই স্থানে কোনো পাখি বা সাপ গর্ত খুঁড়ে ক্ষত সৃষ্টি ক'রে গেছে; তাই মাসে মাসে ওই ঘা থেকে রক্ত চোয়ায়। ফ্রয়েডীয়রাও মনে করেন নারী হচ্ছে খোজা। অর্থাৎ পুরুষতন্ত্র নারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে দেখে ঘৃণার চোখে; কিন্তু নিজের অঙ্গটিকে দেখে গর্ব ও গৌরবের চোখে। আদিম ও আধুনিক সব সমাজেই শিশ্ন বা পুরুষাঙ্গকে মনে করা হয় পৌরুষের অপরাজেয় ঝাণ্ডা। একে নিয়ে পুরুষের গর্ব গৌরব ও উদ্বেগ অশেষ। বাঙলা 'পুরুষাঙ্গ' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, শব্দটিতে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির জাতীয় বিশ্বাস : পুরুষের সব অঙ্গই পুরুষাঙ্গ, কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বাদ দিয়ে নির্বোধ প্রত্যঙ্গটিকেই দেয়া হয়েছে পুরুষের সম্মান ও গৌরব। এতে বোঝা যায় বাঙালি একে কতো মহৎ মনে করে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এর যে-সব নাম রয়েছে, যেমন 'সোনা', 'ধন', সেগুলোও নির্দেশ করে এটি কতো অমূল্য। সব পিতৃতন্ত্রই নারীকে নিষিদ্ধ ক'রে রেখেছে পবিত্র এলাকা থেকে; তারা যুদ্ধ ও ধর্মীয় অনেক বস্তু ছুঁতে পারে না, এমনকি খাদ্যও স্পর্শ করেতে পারে না। আদিম সমাজে, এবং আমাদের সমাজেও, পুরুষের সাথে নারীদের খাওয়া নিষেধ। এ-বিধানের মূলে রয়েছে এমন ভয় যে দূষিত নারী থেকে কোনো ব্যাধি সংক্রমিত হবে পুরুষের দেহে। নারী খাদ্য প্রস্তুত করে, কিন্তু পুরুষের সাথে খেতে পারে না; অনেক সমাজে খাবার পরিবেশনও করতে পারে না। প্রত্যেক পিতৃতন্ত্রেই পুরুষ আগে, বেশি ক'রে, ও ভালোটা খায়; আর যেখানে তারা একসাথে খায়, সেখানেও নারী পরিবেশন করে, পুরুষ খায়।

প্রত্যেক পুরুষতন্ত্র কুমারীত্ব ও কুমারীত্বমোচনকে ঘিরে রেখেছে একরাশ আচার ও নিষেধে। অনেক আদিম সমাজে কুমারীত্ব নিয়ে রয়েছে চমৎকার বিপরীত মনোভাব। একদিকে প্রত্যেক পিতৃতন্ত্র একটি অক্ষত যোনি পাওয়ার জন্যে ব্যগ্র, কেননা পুরুষেরা নিজের জিনিশ অব্যবহৃত টাটকা অবস্থায় পেতে চায়; আবার অনেক সমাজ সতীচ্ছদসম্পন্ন অক্ষত যোনিকে ভয়ঙ্কর ভয়ও পায়। কোনোকোনো সমাজে

কুমারীত্বমোচনকে এমন ভয়ঙ্কর শুভ কাজ ব'লে মনে করা হয় যে পুরুষটি তার নারীর সতীচ্ছদ ছিন্ন করতে ভয় পায়, সে ওই পবিত্র কাজের দায়িত্ব তুলে দেয় তার চেয়ে শক্তিমান বা বয়স্ক কারো ওপর। পুরুষতান্ত্রিক পুরাণ এমন এক সোনালি যুগের কথাও বলে যখন আবির্ভাব ঘটে নি নারীর। বাস্তবে এটা রূপ নেয় নারীসঙ্গ পরিহারের। পুরুষের পৃথিবীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী নিষিদ্ধ; সাম্প্রতিক পিতৃতন্ত্রে সমস্ত শক্তিমান সংঘই পুরুষ সংঘ। পুরুষ সংঘগুলো হচ্ছে পুরুষপ্রাধান্য রক্ষার দুর্গ।

আদিম সমাজের নারীবিদ্বেষ এক সময় রূপ পায় পৌরাণিক উপাখ্যানে; এবং আরো পরে তাকে দেয়া হয় নৈতিক, সাহিত্যিক, এমনকি বৈজ্ঞানিক রূপ। অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান নারীর বিরুদ্ধে সরাসরি অপপ্রচার। পশ্চিমের দুটি বিখ্যাত পৌরাণিক উপাখ্যান হচ্ছে প্যান্ডোরার সিন্দুক ও বাইবেলের মানুষের পতনের কাহিনী। এ-দুটিই নারীবিদ্বেষের অসামান্য উপাখ্যান। নারী অশুভ; এমন একটি আদিম বিশ্বাস এ-উপাখ্যান দুটিতে সাহিত্যিক ও ধর্মীয় রূপ পেয়ে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত প্রভাবশালী। প্যান্ডোরা সম্ভবত ছিলো ভূমধ্যসাগরীয় কোনো উর্বরতার দেবী, যে পরে মহিমাচ্যুত ও নিন্দিত হয়। কবি হেসিয়ডের মতে প্যান্ডোরাই প্রথম সূচনা করে কাম বা যৌনতার, এবং ওই কামের পাপেই পৃথিবী থেকে লোপ পায় সে-স্বর্ণযুগ, 'যখন মানবজাতি পৃথিবীতে যাপন করছিলো নিষ্পাপ জীবন, যখন মানুষকে করতে হতো না কোনো শ্রমসাধ্য কাজ, এবং ভুগতে হতো না রোগে' [দ্র মিলেট (১৯৬৯, ৫১)]। হেসিয়ডের মতে, প্যান্ডোরাই 'সূচনা নারকীয় নারীজাতির, যে-মহামারীকে নিয়ে বাস করতে হচ্ছে পুরুষদের।' নারীকে দায়ী করা হয়েছে পুরুষের দুর্দশার জন্যে; এ-দুর্দশার মূল কারণরূপে দেখানো হয়েছে কামকে, যা হচ্ছে নারীর একান্ত অনন্য জিনিশ। হেসিয়ড আরো বলেছেন, প্যান্ডোরা বা নারী এক ভয়াবহ প্রলোভন, 'যার আত্মা কুকুরীর, যার কামনাবাসনার নৃশংসতায় দেহ জীর্ণ হয়।' জিউস ওই ফাঁদকে পাঠায় 'পুরুষকে ধ্বংস করার জন্যে।' পিতৃতন্ত্র সৃষ্টি করেছে বিধাতা, এবং রেখেছে নিজের পক্ষে। নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে পিতৃতন্ত্র রচনা করেছে নারীর উদ্ভবের ও তার স্বভাব সম্পর্কে অশালীন উপাখ্যান; এবং তার ওপরই চাপিয়ে দিয়েছে কামের সমস্ত কলুষ, যৌনতার সমস্ত পাপ। পুরুষতন্ত্র কামকে যখন মহিমান্বিত করে, তখন শিশ্নকে দেবতায় পরিণত করে; আর যখন নিন্দা করে, তখন যোনির কুৎসায় মুখর হয়। গ্রিকরা যখন কামকে গৌরব দেয়, তখন তারা উর্বরতার উৎসরূপে পুজো করে পুরুষাঙ্গের; যখন তারা কামকে নিন্দা করে তখন তিরস্কার করে প্যান্ডোরোকে। পিতৃতন্ত্র কামের সমস্ত পাপ, কলুষতা, অপরাধ চাপিয়ে দেয় নারীর ওপর। পিতৃতন্ত্রের চোখে নারী যৌনপ্রাণী, পুরুষ হচ্ছে মানুষ। প্যান্ডোরার উপাখ্যানের সাহায্যে নারীকে দণ্ডিত করার হয়েছে যৌনতার অপরাধে। নারী যেনো মানুষ জাতিকে পাপিষ্ট করেছে তার কামে, তাই পুরুষতন্ত্র তার শাস্তিও বিধান করেছে। নারী তার পাপের ফল ভোগ করছে জীবন দিয়ে। 'প্যান্ডোরার সিন্দুক' নামে যে-পৌরাণিক গল্পটি রয়েছে, তাতে সিন্দুকটি যোনির প্রতীক। পিতৃতন্ত্রের চোখে ওই কামনাজাগানো সিন্দুক থেকে জন্ম নিয়েছে জগতের সমস্ত দুঃখ।

বাইবেলের আদম-হাওয়ার পতনের উপাখ্যান প্যান্ডোরার উপাখ্যানেরই সংস্কৃত রূপ। এ-পল্পের অসীম প্রভাব রয়েছে ইহুদি-খ্রিস্টান-মুসলমানের ওপর; অর্থাৎ সাম্প্রতিক সভ্যতার অধিকাংশ মানুষের ওপর। তারা বিশ্বাস করে নারীই সমস্ত পাপের মূল, সমস্ত দুঃখের উৎস। হাওয়া সম্ভবত ছিলো, প্যান্ডোরার মতোই, এক উর্বরতার দেবী; তবে পুরুষতন্ত্র তাকে উৎখাত করে তার মর্যাদার অবস্থান থেকে। এর কিছুটা পরিচয় বাইবেলে রয়ে গেছে। তাদের পতনের আগে, বাইবেলে বলা হয়েছে, 'আদম আপন স্ত্রীর নাম হবা [জীবিত] রাখিলেন, কেননা তিনি জীবিত সকলের মাতা হইলেন' [*আদিপুস্তক* : মানবজাতির পাপে পতন]। এ-উপাখ্যান প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর রূপান্তর ব'লে হাওয়াকে সৃষ্টি করার দুটি বিরোধী কাহিনী বাইবেলে রয়ে গেছে। একটিতে নারীপুরুষকে একই সাথে সৃষ্টি করা হয়, আরেকটিতে নারীকে সৃষ্টি করা হয় পুরুষের অস্থি থেকে। আদম-হাওয়ার কাহিনী মানুষের সঙ্গম আবিষ্কারের কাহিনীও। এ-কাহিনীতে আরো নানা বিষয় রয়েছে, যেমন মানুষ কী ভাবে হারায় তার আদিম সারল্য, জ্ঞান কীভাবে আসে, বা আসে মৃত্যু। তবে এ-সবই আবর্তিত কামকে ঘিরে। বিধাতা আদমকে জানিয়েছিলো যে নিষিদ্ধ ফল খেলে তারা মারা যাবে, কিন্তু দেখা যায় বিধাতা সত্য কথা বলে নি, বরং শয়তানই বলেছিলো সত্য যে তারা মরবে না। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ফলে তারা মারা যায় নি, শুধু বুঝতে পেরেছে যে তারা নগ্ন; এবং সে-জন্যে লজ্জা বোধ করেছে। এতে যৌনতা সুস্পষ্ট। হিব্রু ভাষায় 'খাওয়া' বলতে সঙ্গমও বোঝাতে পারে। বাইবেলে 'জানা' আর যৌনতা একই অর্থ বোঝায়; আর বাইবেলের সাপটি শিশ্নেরই প্রতীক। বাইবেলে মানুষের দুঃখকষ্ট ও স্বর্গ হারানোর জন্যে দায়ী করা হয়েছে কামকে। ওই নিষিদ্ধ কামের অপরাধে পুরুষের ভালো রকমেরই অংশ রয়েছে; কিন্তু ওই অপরাধ থেকে পুরুষকে মুক্তি দিয়ে সব অপরাধ চাপানো হয়েছে হাওয়া বা নারীর ওপর। বলা হয়েছে তারই জন্যে পতন ঘটেছে পুরুষের অর্থাৎ মানবজাতির।

প্রথম পুরুষটিও দোষ চাপিয়েছে নারীরই ওপর; বলেছে, 'তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে *ঐ* বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি' [*আদিপুস্তক* : মানবজাতির পাপে পতন]। হাওয়া দণ্ডিত হয়েছে কামে আদমের অংশ গ্রহণের অপরাধে। তারা দুজনে শাস্তি পেয়েছে দু-রকম। আদম বা পুরুষকে যে-শাস্তি দেয়া হয়েছে, তা শাস্তিই নয়। বিধাতা আদমকে বলেছে, 'তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে'; অর্থাৎ পুরুষ পেয়েছে সভ্যতা সৃষ্টির ভার। হাওয়াকে যে-শাস্তি দেয়া হয়, তা রাজনীতিক। তার দণ্ড হচ্ছে : 'আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব; তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।' নারীকে সাপের বা কামের সাথে চিরদ্বন্দ্বেও লিপ্ত ক'রে দেয়া হয় : 'সদাপ্রভু সর্পকে কহিলেন,'...আমি তোমাতে ও নারীতে...পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে' [*আদিপুস্তক* : মানবজাতির পাপে পতন]। পুরুষতন্ত্র

নারীকে ক'রে তোলে কাম ও পাপের আধার; এবং নারীকে পুরুষের রাজনীতিক অধীনতায় নিয়ে আসে তার কল্পিত স্বর্গেই। পিতৃতন্ত্রের চোখে নারী অশুভ; অশুভের পায়ে নিবেদিত। পিথাগোরাস বলেছেন, 'রয়েছে এক শুভ নীতি, যা সৃষ্টি করেছে শৃঙ্খলা, আলোক, ও পুরুষ; এবং রয়েছে এক অশুভ নীতি, যা সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা, অন্ধকার, ও নারী' [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ১১২)]। পুরুষের প্রয়োজন নারী; তাই নারীকে সমাজে স্থান দিয়েছে পুরুষ, কিন্তু তাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে বশ্যতা।

[আট] মনস্তাত্ত্বিক

পিতৃতন্ত্র শুধু নরনারীর বাইরের জগতটিকেই নিয়ন্ত্রণ করে নি, নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের মনোজগতকেও। নারী ও পুরুষ মনের মধ্যে গ্রহণ করেছে অর্থাৎ অন্তরীকরণ করেছে পিতৃতন্ত্রের ভাবাদর্শ। নারীপুরুষের অবস্থান (মর্যাদা), মেজাজ, ও ভূমিকার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তাদের ওপর অত্যন্ত ব্যাপক। বিবাহরীতি, পুরুষের আর্থিক প্রভুত্ব নারীর মনকে মারাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তার ওপর রয়েছে নারীর যৌন অপরাধবোধ, যেনো নারীই সব যৌনতার মূলে। এর ফলে নারী ব্যক্তি না থেকে হয়ে ওঠে যৌনসামগ্রী। নারী বিবেচিত হয় অস্থাবর সম্পত্তি হিশেবে। নারীর কোনো যৌন স্বাধীনতা নেই। নারীর কুমারীত্ব বা সতীত্বের ওপর পিতৃতন্ত্র এতো জোর দেয় যে নারীর নিজের শরীরও তার নিজের থাকে না; তার শরীর পুরুষের জন্যে। নারীর ওপর এতো অভিভাবকত্ব করা হয় যে তাকে অনেকটা চিরশিশু ক'রে রাখা হয়। নারী তার জীবনধারণের জন্যে বা উন্নতির জন্যে নির্ভর করতে বাধ্য হয় পুরুষের ওপর। নারীর কোনো ক্ষমতা নেই, পুরুষের রয়েছে ক্ষমতা। পিতৃতন্ত্রে নারীকে দেয়া হয় তুচ্ছ মর্যাদা। এতো পীড়নের ফলে নারীর স্বভাবে এমন লক্ষণ দেখা দেয়, যা সংখ্যালঘুদের বৈশিষ্ট্য। সমাজ তাদের দেখে অশ্রদ্ধার চোখে, তাই তারাও নিজেদের দেখে অশ্রদ্ধার চোখে। তারা নিজেদের কারো কৃতিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। ফিলিপ গোল্ডবার্গ 'নারীরা কি নারীদের বিরুদ্ধে সংস্কারগ্রস্ত' নামের একটি গবেষণায় দেখান যে নারীরা নারীদের সম্বন্ধে পোষে খুবই নিম্ন ধারণা। তিনি একই লেখার লেখক হিশেবে দেন দুটি নাম : জন ম্যাককে, ও জোয়ান ম্যাককে; এবং ছাত্রীদের ওই লেখা দুটির মূল্যায়ন করতে বলেন। ছাত্রীরা জনের মৌলিকতা ও পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, আর জোয়ানকে নিন্দা করে তার মেধাহীনতার জন্যে [দ্র মিলেট (১৯৬৯, ৫৫)]। দুটি লেখাই ছিলো অবিকল এক, তবু নারীদের কাছেও পুরুষের লেখাটি হয়ে ওঠে অসাধারণ, নারীর লেখাটি তুচ্ছ।

পিতৃতন্ত্রে নারীরা নাগরিক অধিকারই পায় না, যেখানে পায় সেখানেও থাকে প্রান্তিক নাগরিক। সংখ্যায় তারা সংখ্যাগুরু, কিন্তু মর্যাদা পায় সংখ্যালঘুর। তাই তাদের মানসিকতাও হয়ে ওঠে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানসিকতা। তারা নিজেদের ঘেন্না ও অবজ্ঞা করে, ও নিজের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করে। কয়েক হাজার বছর ধ'রে শুনে আসছে তারা নিকৃষ্ট, দেখে আসছে তাদের নিকৃষ্ট অবস্থান; তাই তারাও মনে করে নিজেদের নিকৃষ্ট। তাদের যে-কোনো অপরাধকে বাড়িয়ে দেখে সমাজ; সমান অপরাধের জন্যে তারা পুরুষের থেকে অনেক কঠোর শাস্তি পায়। সংখ্যালঘুরা যেমন নিজের বা নিজ

সম্প্রদায়ের কারো অপরাধকে বাড়িয়ে দেখে, অনাবশ্যক ক্ষমা চায়, নারীরা তেমনি। নারীদের অনেকেই পুরুষ হ'তে চায়; বেগম রোকেয়ার মধ্যে এটা বেশ প্রবল ছিলো। পুরুষ হ'তে চায়, কেননা নারী হিশেবে তারা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই অনিশ্চয়তায় ভোগে। তারা মনে করে পুরুষ হ'লে তারা নিশ্চয়তা পাবে। মার্কিন গবেষকেরা দেখেছেন কৃষ্ণকায়েরা ও নারীরা মানসিকতায় একই রকম। তারা বুদ্ধিতে খাটো, তাদের স্বভাব আদিম ও শিশুর মতো আবেগপরায়ণ; তারা নিজেদের ভাগ্যে সন্তুষ্ট, ছলনাপরায়ণ, ও লুকিয়ে রাখে নিজেদের অনুভূতি। পুরুষ এসবই পছন্দ করে নারীর। শাণিত নারীর থেকে নির্বোধ নারীকে বেশি পছন্দ করে, আর নির্বুদ্ধিতাকে রমণীয় ব'লে প্রশংসা করে। ইংরেজি উপন্যাসে নির্বোধ স্বর্ণকেশিনীর কাছে হেরে যায় তীক্ষ্ণ কৃষ্ণকেশিনী; বাঙলা উপন্যাসেও মাংসস্তূপের কাছে পরাজিত হয় ব্যক্তিত্ব। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মতো নারীদেরও এক-আধজনকে অন্যদের থেকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। এটা নারীদের উপকারে আসে না, কেননা পুরুষতন্ত্রের স্বীকৃত নারীরা কাজ করে পুরুষতন্ত্রের পক্ষে। এ-নারীরা গ্রহণ করে 'নারীত্ব' ও পুরুষের প্রাধান্য রক্ষার দায়িত্ব। পশ্চিমে এ-ভূমিকায় রাখা হয় সাধারণত গায়িকানায়িকাদের, যারা বিরাজ করে জনগণের যৌনসামগ্রীরূপে। সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভাগ্যবান দু-একজনকে সুযোগ দেয়া হয় তাদের প্রভুদের চিত্তবিনোদনের। নারীরা তাদের কাম দিয়ে পুরুষদের বিনোদ যোগায়, সুখী করে, এবং একেই মনে করে তারা গৌরবের কাজ। 'রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রানী' ব'লে নজরুল নারীর শক্তির অসাধারণত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন; তিনি বুঝতে পারেন নি রাজাকে শাসন নারীর শক্তির অসাধারণত্ব নয়, শোচনীয়তা। নজরুল, বাহ্যিক সদিচ্ছাসত্ত্বেও, ছিলেন পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিনিধি; এবং তিনিও পুরুষতন্ত্রের শিকাররূপেই দেখতে চেয়েছেন নারীকে। রানী রাজাকে যেটুকু শাসন করে, সেটুকু রক্ষিতার শাসন। এর বেশি নয়। পুরুষতন্ত্র খুবই আনন্দ বোধ করে 'রাজারে শাসিছে রানী'তে; কিন্তু তার প্রবল আপত্তি নারীর শাসনে। পিতৃতন্ত্র রাজাকে বা স্বামীকে শাসন করা শিখিয়ে নারীকে ক'রে রেখেছে চিরন্তন রক্ষিতা। তাই নারীর মানসিকতাও হয়ে উঠেছে রক্ষিতার। পুরুষতন্ত্রের প্রিয় নারীমাত্রই পুরুষতন্ত্রের রক্ষিতা, তারা পুরুষতন্ত্রকে গ্রহণযোগ্য করার সাধনা করে তাদের সমস্ত কাজে।

দেবী ও দানবী

পুরুষের কাছে নারী এক অনন্ত অস্বস্তি; নারী তার চোখে দুই বিপরীত মেরু-- আলো ও অন্ধকার; সুখ ও ব্যাধি। পুরুষের চোখে নারী দেবী ও দানবী; প্রথমে দানবী, তারপর দেবী। নারী করালী দানবী পুরুষের কাছে. যে তাকে পাপিষ্ঠ ও স্বর্গচ্যুত করেছে; যে তাকে প্রলুব্ধ প্ররোচিত প্রতারিত ক'রে চলেছে। পুরুষ সারাক্ষণ ভয়ে থাকে যে ওই পাপীয়সী তার মতো দেবতাকে নামিয়ে দিতে পারে যে-কোনো রসাতলে। পুরুষ তাকে ভয় করে, তবে এড়িয়ে চলতে পারে না; কাম ও পার্থিব প্রয়োজনে সে নারীর সাথে জড়িয়ে আছে : তাকে আলিঙ্গনে বাঁধে, চুমো খায়, তার ঐন্দ্রজালিক মাংসকে নিয়তির মতো মানে, কিন্তু অবচেতন ও সচেতনভাবে নারীকে ভাবে দানবী। পুরুষের চোখে নারী দেবীও; তবে নারীর দেবীত্ব তাকে যতোটা সুখী করে, বরাভয় দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি তাকে সন্ত্রস্ত করে নারীর দানবীত্ব। ওই অপ্রতিরোধ্য দানবীর কাছে পুরুষ বোধ করে অসহায়। নারী যখন দেবী তখন পুরুষ তাকে ভয় পায় না, কেননা দেবীকে পুরুষ দাসীও ক'রে তুলতে পারে; কিন্তু তার ভয় দানবীকে। দেবীও পুরুষের কাছে সম্ভোগের অসম্ভব সামগ্রী। 'দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে/অনেক অর্ঘ্য আনি;/আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে/ব্যর্থ সাধনখানি', বা 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' বলে যে-পুরুষ, তার বাসনা হচ্ছে মন্দিরের বেদীতলে বা মালঞ্চের পুষ্পিত পরিবেশে দেবীর দেহখানি উপভোগ। পুরুষ কখনো নারী হ'তে চায় না, কিন্তু সব পুরুষই চায় পৃথিবীতে নারী থাকুক; নারীর জন্যে পুরুষ কৃতজ্ঞ প্রকৃতির কাছে। পুরুষের কাছে নারী এক সুখকর দুর্ঘটনা, যে-দুর্ঘটনা তাকে অমরত্বের আস্বাদ দিয়েছে; কিন্তু নারীকে নিয়ে তার মহাজাগতিক দুঃস্বপ্নের শেষ নেই। নারীকে ঘিরে পুরুষ সৃষ্টি করেছে নানা কিংবদন্তি বা পুরাণ, যাতে প্রকাশ পেয়েছে পুরুষের আশা ও ভয়। পুরুষের চোখে নারী মাংস, মাংসের অবর্ণনীয় সুখ ও আতঙ্ক। পুরুষের কাছে নারী দেবী ও দানবী, খ্রিস্টানের কাছে সে পাপীয়সী হাওয়া ও পবিত্র মেরিমাতা। দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯. ১৭৫) বলেছেন, 'সে হচ্ছে মূর্তি, পরিচারিকা, জীবনের উৎস, অন্ধকারের শক্তি, সে হচ্ছে সত্যের মৌল নিঃশব্দতা, সে কৃত্রিম সামগ্রী, গুজব, এবং মিথ্যা; সে শুশ্রূষা ও অভিচারিণী; সে পুরুষের শিকার, তার পতন, পুরুষ যা নয় এবং যা কিছু কামনা করে নারী তার সব কিছু; সে পুরুষের নঞর্থকতা।' পুরুষতান্ত্রিক পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ও সভ্যতা নারীকে দেখেছে ভয়ের চোখে; আজো সে ভয় কাটে নি।

ছোটো বালিকা কোনো ভয় জাগায় না, কিন্তু যেই সে হয়ে ওঠে প্রজননপ্রস্তুত, নারী, সে হয় অশুচি। তার শরীর জুড়ে বিকশিত হয় পুরুষের আকর্ষণ ও আতঙ্ক। ওই শরীরের একটি বড়ো ঘটনার নাম ঋতুস্রাব। পুরুষতন্ত্র তার ঋতুস্রাবকে ঘিরে দিয়েছে একরাশ

বিধিনিষেধ। অনেক সমাজ তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয় অন্যদের থেকে, তাকে ঘোষণা করে অশুচি ব'লে। ঋতুক্ষরণকে প্রতিটি ধর্ম ও আদিম সমাজ দেখেছে দানবিক ব্যাপার রূপে। পিতৃতন্ত্রের সূচনা থেকেই নারীর স্রাবকে অশুভ ধারারূপে দেখা হচ্ছে; এবং একে এতো বিধিনিষেধে ঘিরে দেয়া হয়েছে যে আজো পুরুষেরা এর নামে শিউরে ওঠে। পশ্চিমে এক সময় বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিলো যে ঋতুকালে নারীদের সংস্পর্শে শস্য নষ্ট হয়, বাগান ধ্বংস হয়, মৌমাছি মারা যায়; এ-সময়ে নারীর ছোঁয়ায় মদ হয় ভিনেগার, দুধ টক, এবং ঘটে আরো নানা অঘটন। উনিশশতকের শেষভাগেও চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'এটা নিশ্চিত যে ঋতুমতী নারীর ছোঁয়ায় মাংস পচে।' এ-শতকের শুরুতেও ফ্রান্সে মদের কারখানায় ঢুকতে দেয়া হতো না ঋতুমতী নারীদের; বিশ্বাস ছিলো যে ওই অভিশপ্ত নারীদের, ঋতুস্রাবকে ইউরোপের অনেকাংশে 'অভিশাপ'ই বলা হয়, প্রভাবে চিনি কালো হয়ে যায়। নারীর ক্ষরণ সম্পর্কে কুসংস্কারের মূলে রয়েছে অলৌকিক ভীতি। রক্ত পবিত্র, কিন্তু ঋতুকালে যে-রক্ত বেরিয়ে আসে তা অপবিত্র, কেননা এ-রক্তেই রয়েছে নারীর নারীত্ব। আদিম সমাজে রজঃস্রাবভীতি খুবই প্রবল; সেখানে ঋতুকালে নারীদের বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা হয়, রাখা হয় পল্লীর প্রান্তে একলা কুটিরে। তাদের দুধ খেতে দেয়া হয় না, দুধের পাত্র ছুঁতে দেয়া হয় না, তারা স্বামীর কোনো কিছুই ছুঁতে পারে না। তারা মনে করে ঋতুমতী কোনো নারী যদি স্বামীর কোনো সামগ্রী স্পর্শ করে, তবে স্বামীটি অসুস্থ হয়ে পড়বে; আর সে যদি স্বামীর কোনো অস্ত্র স্পর্শ করে তবে স্বামীটি নিহত হবে যুদ্ধে। কোনো কোনো সমাজে ঋতুকালে নারীদের চাঁদতারাসূর্যের দিকে তাকানোও নিষিদ্ধ।

বাইবেলে ও কোরানে ও সব ধর্মপুস্তকে ঋতুকে দেখা হয়েছে ভয়ের চোখে, এবং ঋতুমতী নারীদের নির্দেশ করা হয়েছে নিষিদ্ধ ও দূষিত প্রাণীরূপে। বাইবেলে বলা হয়েছে : 'যে স্ত্রী রজঃস্বলা হয়, তাহার শরীরস্থ রক্ত ক্ষরিলে সাত দিবস তাহার অশৌচ থাকিবে, এবং যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকিবে' এবং 'অশৌচকালে যে পুরুষ তাহার সহিত শয়ন করে, ও তাহার রজঃ তাহার গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি থাকিবে' [*লেবীয় পুস্তক* : ১৫]। কোরানে আছে : 'লোকে তোমাকে রজঃক্ষরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো, তা অশুচি। তাই রজঃক্ষরণকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, আর যতোদিন না তারা পবিত্র হয়, তাদের কাছে যেও না' [২:২২২]। হিন্দুধর্মের ঋষিরা ঋতুক্ষরণের নামে শিউরে উঠে প্রণয়ন করেছেন শ্লোকের পর শ্লোক ও অজস্র বিধি। তাঁরা বিধান দিয়েছেন যে ঋতুকালে নারী অস্পৃশ্য থাকবে, তাকে কেউ স্পর্শ করবে না। নারী এমনভাবে থাকবে যাতে ভোজনরত কোনো ব্রাহ্মণের চোখে সে না পড়ে। ক্ষরণের প্রথম দিনে নারীকে গণ্য করতে হবে চণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয় দিনে রজকী; এবং তাকে কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিতে দেয়া হবে না [দ্র নরেন্দ্রনাথ (১৯৭৫, ৮৬)]। মনু, অঙ্গিরা, পরাশর ও আরো অনেকে নারীদানবীর ক্ষরণ নিয়ে মূল্যবান সময় ব্যয় ক'রে তৈরি করেছেন অনেক পবিত্র বিধি। মনু বলেছেন, 'রজস্বলা নারীতে যে-পুরুষ

সঙ্গত হয়, তার বুদ্ধি, তেজ, বল, আয়ু, ও চক্ষু ক্ষয় পায়' [*মনুসংহিতা*, ৪:৪১]। এর সবটাই বাজেকথা, তবে হাজার হাজার বছর ধ'রে এ-শ্লোকটি ভয় দেখিয়ে আসছে পুরুষদের। বরাহপুরাণের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদই রয়েছে দানবীর ভয়ংকর রক্তপাত ও বিধিনিষেধ সম্পর্কে। বিধান দেয়া হয়েছে রজস্বলা নারীর সাথে কেউ কথা বলবে না, তার হাতের কোনো খাদ্য গ্রহণ করবে না; তার সামনে মন্ত্র উচ্চারণ করা যাবে না; আর বামন বলেছেন ওই নারীর সাথে সঙ্গম মহাপাপ। ঋতুমতী নারী যদি কাউকে স্পর্শ করে, তবে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ছাত্রদেরও নিষেধ করা হয়েছে ঋতুমতী নারীর কাছাকাছি না আসার। কোনো ঋতুমতী নারীকে দেখা ছাত্রদের নিষেধ; আর সমাবর্তনের পর কমপক্ষে তিন দিন তারা কোনো রজস্বলা নারীকে দেখতে পারবে না। এই যে রক্ত তা যে অশুচি, এমন নয়; আসলে পুরুষের চোখে নারী এক দানবী, নারীর প্রতিমাসের রক্তধারা নারীর আপন অশুচিতার চিহ্ন।

নারীর দেবী ও দানবী রূপ, নারীর প্রতি পুরুষের ভীতি ও কামনা প্রকাশ পায় কুমারীত্ব সম্পর্কে পুরুষের আগ্রহ ও আতঙ্কে। কুমারী, অক্ষতযোনি, পুরুষ কামনা করে, ভয়ও পায়। কুমারী পুরুষের চোখে এক চরম রহস্য। পুরুষের কাছে কুমারী, কুমারীর দেহ, তার রন্ধ্রের অদৃশ্য আবরণঝিল্লি একই সাথে ভীতিকর, ও পরম কামনার বস্তু। পুরুষ যখন মনে করে নারীর শক্তি তাকে পরাভূত করবে, সে হেরে যাবে ওই রহস্যের কাছে, তখন সে ভয় পায়; যখন পুরুষ ভাবে ওই শক্তিকে সে জয় করবে, আধিপত্য বিস্তার করবে ওই রহস্যের ওপর, তখন সে দাবি করে অক্ষত কুমারী। আদিম সমাজে যেখানে নারীশক্তি প্রবল, সেখানে পুরুষ আতঙ্কে থাকে; তাই সেখানে বিয়ের আগের রাত্রেই কনের কুমারীত্ব মোচন করে শক্তিমান কেউ, পুরোহিত বা সমাজপতি। মার্কো পলো জানিয়েছে যে তিব্বতি পুরুষেরা কেউ কুমারী নারী বিয়ে করতে রাজি নয়। কুমারীর সতীচ্ছদ ছিন্ন করাকে মনে করা হয় এক অতীন্দ্রিয় ভীতির কাজ, যা সকলের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অনেক সমাজে মনে করা হয় যে যোনিতে লুকিয়ে রয়েছে সাপ, যা পর্দা ছেঁড়ার সাথেসাথে দংশন করবে পুরুষাঙ্গে; কোনো কোনো সমাজে মনে করা হয় যে রক্তপাতের ফলে হানি ঘটবে পুরুষের বীর্যের। ধাতু বা বীর্যকে সব সমাজেই অত্যন্ত দামি মনে করা হয়। পুরুষ এতো যে ভয় পায় তা নারীকে দানবী রূপে দেখারই ফল। অনেক সমাজে সতীচ্ছদ ছেঁড়ারই প্রশ্ন ওঠে না; সেখানে মেয়েরা কুমারী থাকে শুধু শিশুকালে। শৈশব থেকেই তারা সঙ্গমের অনুমতি পায়, সঙ্গম সেখানে বাল্যক্রীড়া। কোনো কোনো সমাজে মা, বড়ো বোন, ধাত্রী মেয়েদের সতীচ্ছদ ছিন্ন করে। কোনো কোনো সমাজে পুরুষেরা জোর ক'রে মেয়েদের গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক বা অন্য কোনো উপায়ে ছিন্ন করে কুমারীর আবরণ। কোনোকোনো সমাজে মেয়েদের তুলে দেয়া হয় অচেনা পুরুষদের হাতে, যারা মোচন করে তাদের কুমারীত্ব। ওই সমাজ বিশ্বাস করে অচেনা পুরুষদের এতে কোনো ক্ষতি হবে না, বা হ'লেও কোনো ক্ষতি নেই। কোনো কোনো সমাজে পুরোহিত বা সমাজপতি বা গ্রাম্য চিকিৎসক বিয়ের আগের রাতে মোচন করে কুমারীত্ব। মালাবার উপকূলে বিয়ের আগের রাতে কুমারীত্ব মোচনের দায়িত্ব পায় ব্রাহ্মণেরা; তারা এমনভাবে মোচন করে

কুমারীর কুমারীত্ব যেনো একটি অসম্ভব কঠিন কাজ সম্পন্ন করছে। এ-কাজের জন্যে তারা মোটা পারিশ্রমিকও নিয়ে থাকে। সব সমাজেই পবিত্র কাজ অপবিত্রের করা নিষেধ: স্বামী পবিত্র নয়, শক্তিমান নয়; সমাজপতি বা পুরোহিত শক্তিমান বা পবিত্র, তাই তাদের পক্ষেই ওই কাজ সম্ভব। সামোয়ায় রীতি হচ্ছে স্বামী তার স্ত্রীর সতীচ্ছদ স্বাভাবিক উপায়ে ছিন্ন করবে, তবে বীর্যপাত করতে পারবে না; কেননা তাতে যোনির রক্তে দূষিত হবে তার বীর্য। দানবীর নানা ভয়ে ভ'রে আছে পুরুষতন্ত্রের মন।

পুরুষ কুমারীকে ভয় পায়, তবে কামনাই করে বেশি। পুরুষ কুমারী কামনা করে, চায় কোমল কুমারী দেহলতা। কুমারীর তনু পুরুষের কাছে অনাবাদী জমি, ঘুমের দেশ, অনাঘ্রাত গোলাপ। ওই দেহে আছে গোপন ঝরনার জলের স্বাদ, ওই উদ্যানে পত্রপুটে ঢাকা অনাঘ্রাত দুটি পুজোর ফুল। পুরুষ তীব্র আকর্ষণ বোধ করে গোপন উদ্যান, মন্দির, ও নানা রকমের রুদ্ধ ও ছায়াসুনিবিড় এলাকার প্রতি; তার প্রতি পুরুষের আকর্ষণ, যার এখনো ঘুম ভাঙে নি। পুরুষ রুদ্ধগৃহ খুলতে চায়, ঢুকতে চায় ওই গৃহে; পুরুষ তার ঘুম ভাঙাতে ও তাকে প্রাণ দিতে চায়; চায় তাকে অধিকার ও খনন করতে। পুরুষের রয়েছে ধ্বংসাত্মক প্রবণতা। সতীচ্ছদ ছিন্ন ক'রে পুরুষ নারীকে পায় অন্তরঙ্গতমভাবে; লোকশ্রুত পর্দাটি ছিঁড়ে পুরুষ নারীর দেহটিকে পরিণত করে অক্রিয় বস্তুতে ও তার ওপর ওড়ায় নিজের পতাকা, স্থাপন করে সাম্রাজ্য। পুরুষ অবশ্য নারীর কুমারীত্বের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে যতোদিন নারীর যৌবন থাকে, তারপর কুমারীত্ব তার কাছে হয়ে ওঠে পীড়াদায়ক ভীতিকর। যে-নারীর শরীরে কোনো পুরুষ প্রবেশ করে নি, সে যখন আইবুড়ো হয় তখন পুরুষ তাকে মনে করে ডাইনি, অভিচারিণী। অনেকে বিশ্বাস করে আইবুড়ো অক্ষত মেয়েরা সহবাস করে শয়তানের সাথে। যেহেতু ওই নারী পুরুষের কাছে দেহ সমর্পণ করে নি, পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে নি, তাই পুরুষের চোখে সে শয়তানী। পুরুষের কাছে পোষ-না-মানা, বিদ্রোহী, নারীমাত্রই দানবী বা ডাইনি; কেননা সে পুরুষের সূত্র ও অনুশাসন মেনে নেয় নি। পুরুষ বিশ্বাস করে এ-দানবীরা এতো অশুভ যে ঘুমের মধ্যেও তারা পুরুষের শরীর নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন স্বপ্নদোষে। আমাদের দেশে এমন বিশ্বাস রয়েছে যে স্বপ্নে পুরুষকে প্রলুব্ধ করে কোনো অভিচারিণী নারী, তাই ঘটে নৈশস্খলন; এবং হানি ঘটে স্বাস্থ্যের। ইহুদিপুরাণের লিলিথ এমন এক দানবী। রুডউইন লিলিথ সম্পর্কে লিখেছেন, 'লিলিথের করাল প্রভাব শুধু শিশুদের ওপরেই পড়ে না। সে আরো ভয়াবহ পুরুষের জন্যে, বিশেষ ক'রে তরুণদের জন্যে। লিলিথ পুরুষসম্মোহনকারিণী। লিলিথ হচ্ছে রূপসী ব্যভিচারিণী অবিবাহিতা বেশ্যার সেমেটীয় নাম, যে হাটেমাঠেঘাটে পুরুষদের সম্ভোগ করে' [দ্র প্রাৎস (১৯৩৩, ২৮২)]। ডাইনিদের বীভৎস ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে উপকথা রয়েছে সব জাতির ভাণ্ডারেই; এবং সব জাতির ডাইনিদেরই রয়েছে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ডাইনিদের মূল বৈশিষ্ট্য তারা কামার্ত পুরুষখেকো: তারা সম্ভোগের মধ্য দিয়ে পুরুষদের পরিণত করে নিজেদের খাদ্যে। তারা সঙ্গম করে শয়তানের সাথে, শয়তান পানপাত্র ভ'রে পান করে তাদের ক্ষরিত রক্ত। এদিকে ম্যালিনোস্কির ট্রোব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের বর্বরদের সাথে কোনো পার্থক্য নেই সভ্য ইউরোপীয় বা ভারতীয়দের। বর্বরদের কল্পনায় ডাইনিরা বেরোয় রাতে,

নিজেদের রূপান্তরিত করে জোনাকি বা উড়ন্ত শেয়ালে, শব খায়, ও শয়তানের সাথে রমণ করে। ইউরোপে কয়েক শতক ধ'রে চলেছিলো ডাইনিশিকার; ওই হিংস্র শিকারীদের দুজন, জ্যাকব স্প্রেংগার ও হেনরি ক্র্যামার, একটি বই লিখেছিলেন *ডাইনিদের হাতুড়ি* নামে পনেরোশতকের শেষাংশে। তাঁরা লিখেছিলেন, 'সব রকম ডাকিনীবিদ্যার মূলে রয়েছে কামক্ষুধা, নারীরা যাতে তৃপ্তিহীন। তিনটি জিনিশ রয়েছে যাদের ক্ষুধার শেষ নেই; না, আছে চতুর্থ একটি, যেটি কখনো বলে না, যথেষ্ট হয়েছে; সেটি হচ্ছে জরায়ুর মুখ। তাই নারীরা নিজেদের কামতৃপ্তির জন্যে এমনকি শয়তানের সাথেও সঙ্গমরত হয়' [দ্র নেলসন (১৯৭৫, ৩৩৯)]। ডাইনি নাম দিয়ে ১৪০০ থেকে ১৭০০ অব্দের মধ্যে ইউরোপে পাঁচ লাখ নিরপরাধ নারীকে পুড়িয়ে মারে ঈশ্বরের পুরোহিতেরা। ওই নারীরা ডাইনি ছিলো না, তাদের অধিকাংশ শয়তান কেনো কোনো পুরুষের সাথেও সঙ্গমের সুযোগ পায় নি। তারা ছিলো কর্মজীবী নারী, যারা আর্থনীতিক কারণেই সমাজের প্রথাগত বিধি অমান্য করতে বাধ্য হয়েছিলো। তারা ছিলো অবিবাহিত; পুরুষ ও অর্থের অভাবে তারা বিয়ে করতে পারে নি, তারা নিয়েছিলো নানা পেশা জীবনধারণের জন্যে। অর্থাৎ তারা অমান্য করেছিলো সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি; তারা ছিলো বিদ্রোহী, তাই তারা পুরুষের চোখে হয়েছিলো ডাইনি; এবং আগুনে ছাই হয়ে গিয়েছিলো। আজো যে-নারী সামাজিক বিধি অমান্য করে, পুরুষকে পাত্তা দেয় না, যাপন করে স্বায়ত্তশাসিত জীবন, তাকে মনে করা হয় আধুনিক ডাইনি বা দানবী। ডাইনির ভয়ে আধুনিক সভ্যতার হৃৎপিণ্ডও কম্পমান।

নারীকে অভিচারিণী বা ডাইনিরূপে দেখা হচ্ছে আবহমান কাল ধ'রে, আজো দেখা হয় সেভাবেই। যেনো তার কাজ ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পুরুষকে মেষ বানানো। নারী যাদুকর। যাদুকর ভয়ানক মানুষ, সে কাজ করে দেবতা ও রীতির বিরুদ্ধে, নিজের স্বার্থে। নারী সমাজের সাথে জড়িয়ে গেছে, কিন্তু পুরুষের মনে ভয় রয়ে গেছে যে নারী তাকে যে-কোনো সময় নিজের যাদুতে মজাবে। পাশের বাসার মেয়েটিকেও মনে হয় অভিচারিণী, যে চোখের পলকে সুবোধ ছেলেটিকে নির্বোধ মেষে পরিণত করতে পারে। তার চোখে ইন্দ্রজাল, ঠোঁটে যাদু, আঙুলে রহস্য, শরীরের বাঁকে বাঁকে ফাঁদ। পশ্চিমি পুরাণে পাওয়া যায় অনেক অভিচারিণী। যেমন সাইরেন। নারী হচ্ছে সাইরেন, যার গানে মুগ্ধ নাবিকেরা জাহাজসহ আছড়ে পড়ে পাথরের ওপর; নারী হচ্ছে কির্কি, যে তার প্রেমিকদের রূপান্তরিত করে পশুতে। পুরুষ তার যাদুপাশে জড়িয়ে হারায় নিজেকে, নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে। নারী পুরুষকে পান করায় বিস্মৃতির পানীয়। ফ্রয়েড *সভ্যতা ও তার অতৃপ্তি*তে এ-কুসংস্কারকেই বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়ে দেখিয়েছেন নারী শুধু পুরুষ নয়, সভ্যতারই শত্রু। এ-দানবীর কাজ সভ্যতাকে বিচলিত করা। খ্রিস্টান ধর্মে যৌনতাকে ভয়ের চোখে দেখা হয়, কারণ তারা নারীকে দেখে দানবীরূপে। ওই ধর্মে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়া হয়েছে দেহ থেকে আত্মাকে; এবং শরীরকে করে তোলা হয়ছে আত্মার শত্রু। ওই বিশ্বাসে শরীরের সাথে সমস্ত সম্পর্কই পাপ ও অশুভ। খ্রিস্টানের কাছে দেহ আর মাংস পাপ; তবে পুরুষের দেহ পাপ নয়, নারীর দেহই পাপ। খ্রিস্টানের চোখে নারীর শরীর প্রলোভনের সোনার কলস, তার দেহ শয়তান। নারীই পাপের পথে নিয়ে

গেছে আদমকে; তাই খ্রিস্টান সাহিত্য নারীঘৃণায় ও তিরস্কারে মুখর। তারতুলিয়ানের চোখে নারী 'পয়ঃপ্রণালির ওপর নির্মিত প্রাসাদ'; অগাস্টিন বলেছেন, 'আমাদের জন্ম হয়েছে মলমূত্র থেকে' [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ২১৯-২২০)]। খ্রিস্টানের চোখে নারীর শরীর এতোই পাপীয়সী যে তারা ক্রাইস্টকে জন্ম দিয়েছে কুমারীর গর্ভ থেকে। ওই ধর্মের অনেক সন্তের মতে মেরি নারীদের মতো স্বাভাবিক রীতিতে জন্ম দেয় নি ক্রাইস্টকে; অ্যামব্রোস, অগাস্টিনের মতে মেরির রুদ্ধ দেহ থেকেই জন্ম হয়েছিলো জেসাসের। খ্রিস্টানের কাছে নারীর দেহ কলঙ্ক, কাম হচ্ছে পাপ; তাই তারা দেহ ও কামের নিন্দায় মুখর থেকেছে, এবং উদ্ভাবন করেছে নিরন্তর নতুন নতুন শাস্তি। তারা পবিত্র মেরির দেহ থেকে নিঃশেষে বের ক'রে দিয়েছে অপবিত্র কামকে; তাকে পরিণত করেছে এক কামশূন্য বিদেহী নারীতে বা বিমূর্ত যন্ত্রে।

শুধু পুরোহিতেরা নন, বিজ্ঞানীরাও ঘেন্না করেছেন নারীর দেহের কথা ভাবতে। লিনাউস প্রকৃতিবিষয়ক সন্দর্ভে ঘেন্নায় নারীর যৌনাঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। আজো অনেকেই নারীর দেহ, এমনকি নারী সম্পর্কে আলোচনাকেই মনে করে অশ্লীল। ফরাশি বিজ্ঞানী দ্য লরেঁ ঘেন্নায় প্রশ্ন করেছেন, 'কী ক'রে এই স্বর্গীয় প্রাণী, যার রয়েছে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি, আকর্ষণ বোধ করে নারীর গোপন অঙ্গের প্রতি, যা ভরা থাকে রসে, আর যা লজ্জাজনকভাবে অবস্থিত শরীরের নিম্নতম স্থলে?' [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ২০০)]। খ্রিস্টানেরা তাই দানবীকে রূপান্তরিত করেছে দেবীতে; তারা পাপী প্রলোভনকারিণী হাওয়াকে ধুয়েমুছে তৈরি করেছে পাপহর মেরিকে। নারীকে তারা ক'রে তুলেছে গৃহগির্জার থাম। এ-প্রক্রিয়ায় নারীর শরীর থেকে ছেঁকে ফেলা দেয়া হয়েছে কাম। একজন লিখেছেন, 'পুরুষের মাঝে যৌনকামনা সহজাত ও স্বতস্ফূর্ত, নারীর মধ্যে গুপ্ত, যদিও একেবারে অনুপস্থিত নয়।' অ্যাকটন ছিলেন উনিশশতকের এক বিখ্যাত বিলেতি চিকিৎসক, বই লিখেছিলেন *জননেন্দ্রিয়ের ভূমিকা ও রোগ* নামে। ওই বইতে তিনি নারীর যৌনাঙ্গ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই করেন নি; তাঁর মনোভাব হচ্ছে নারীর ওই সব প্রত্যঙ্গ নেই, থাকলেও সেগুলোর কোনো ভূমিকা নেই! তিনি ভিক্টোরীয় তরুণ স্বামীদের অভয়ও দিয়েছেন যে নারীরা তাদের গিলে খাবে না, কেননা 'প্রেম, গৃহ, সন্তানই নারীর সব। সঙ্গম ঘটে খুবই কম' [দ্র বাস্ক (১৯৭৪,৮-৯)]। যে-সঙ্গম পুরুষের দিবারাত্রির স্বপ্ন, তাকেও ভয় করে পুরুষ। ওই দানবীর অঙ্গটিকে তার মনে হয় ক্ষত; নিজের ধাতুক্ষরণকে মনে হয় মৃত্যু। সব সমাজেই বিশ্বাস করা হয় সঙ্গমে পুরুষের বীর্য ক্ষয় হয়, শক্তি নষ্ট হয়; ফরাশিরা পুরুষের পুলককে বলে 'ছোটো মৃত্যু'। নারীকে পুরুষ মনে করে ডাইনি, রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়ার, যে তাকে পান করে, খায়। ফ্রয়েড পুরুষের এ-ভয়কে বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়েছিলেন যে নারী সঙ্গমের সময় পুরুষকে খোজা করার সুখ পায়, অধিকার করে নেয় সম্রাট শিশ্নটি। পুরুষ নারীকে ততোটুকু ভালোবাসে ও দেবী মনে করে যতোটুকু নারী তার অধিকারে; আর ভয় করে ও দানবী মনে করে যতোটুকু নারী তার অধিকারের বাইরে।

নারী দানবী, তাই তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। পুরুষের সমস্ত শাস্ত্র রটনা করেছে

নারীকে বিশ্বাস করলে ঘটবে পুরুষের পতন; তার শৌর্য নষ্ট হবে, রাজ্য ধ্বংস হবে, সমস্ত কীর্তি ধুলোয় লুটোবে। নারীকে বিশ্বাস ক'রে পুরুষের শোচনীয় পতনের কাহিনীতে ভ'রে আছে সমস্ত পুরাণ ও সাহিত্য। হাদিসে আছে : 'যদি বিবি হাওয়া না হইত তবে কখনো কোনো নারী স্বামীর ক্ষতি করিত না', এবং 'পুরুষের পরে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিসি আমি আমার পরে আর কিছু রাখিয়া যাইতেছি না', এবং 'তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। কেননা, বনি ইস্রাইলের প্রতি যে প্রথম বিপদ আসিয়াছিল তাহা নারীদের ভিতর দিয়াই আসিয়াছিল', এবং 'নারী হইল আওরত বা আবরণীয় জিনিস। যখন সে বাহির হয় শয়তান তাহাকে চোখ তুলিয়া দেখে' [দ্র নূর মোহাম্মদ (১৯৮৭, ২৮১, ১৮৭, ১৮৮, ২০১)]; এবং 'পুরুষ নারীর বাধ্য হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়' [দ্র রফিক (১৯৭৯, ১৮৩)]। নারীর বশীভূত হ'লে বীরের কী দুর্দশা ঘটে, বাইবেলের প্রণেতারা তা লিখেছেন স্যামসন ও ডেলাইলার উপাখ্যানে। স্যামসন শাস্তি পায় নারীর বশীভূত হওয়ার অপরাধে। মিল্টনের *স্যামসন আগোনিসটিজ*-এ স্যামসন বিশ্বাসই করে সে পেয়েছে উচিত শাস্তি; কেননা সে করেছে তুচ্ছ নারীর বশীভূত হওয়ার মতো গর্হিত অপরাধ। নারীর মতো সামান্যার বশীভূত হওয়ার থেকে অনেক ভালো যুদ্ধে মরা, ঘৃণ্য শত্রুর দাস হওয়া। স্যামসনের বিলাপে বাজে নারীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন ধিক্কার :

> ঘৃণ্য কাপুরুষতা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ক'রে
> রেখেছিলো তার দাস; হে অসম্মান,
> হে মর্যাদা, ধর্মের কলঙ্ক! ক্রীতদাস মন
> পুরস্কৃত হয়েছে দাসের যোগ্য শাস্তিতে!
> যে-রসাতলে এখন পড়েছি আমি,
> এই ছিন্নবাস, এই ঘানিটানা, এও তুচ্ছ
> আগের ঘৃণ্য, অপৌরুষেয়, কলঙ্ককর, কুখ্যাত,
> যথার্থ গোলামির কাছে। সেদিনের অন্ধদশা ছিলো অনেক নিকৃষ্ট,
> যা দেখতে পায় নি আমার বশ্যতা ছিলো কতো শোচনীয়।

পুরুষতন্ত্র বিশ্বাস করে নারী হচ্ছে অনন্ত কামক্ষুধা, যা পুরুষকে শুষে নিঃশেষ করে। পুরুষের কাছে নারী হচ্ছে কাম। যে-নারী নিচে অসার প'ড়ে থেকে পুরুষকে সম্ভোগ করতে দেয়, পুরুষ তাকে সতী ভাবে; আর যে-নারী সাড়া দেয়, পুরুষকে মথিত করে, পুরুষের কাছে সে দানবী। জাঁ জাক রুশোর কথা ধরা যাক। রোম্যানটিকতার পুরোধা এ-দার্শনিক ঘোষণা করেছিলেন, 'মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত।' তাঁর কাছে 'মানুষ' হচ্ছে 'পুরুষ'। তিনি আসলে বলেছিলেন, 'পুরুষ জন্ম নেয় স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত।' রুশোর বিশ্বাস ছিলো নারীরা বাঁচবে পুরুষের বিনোদের জন্যে; তবে পুরুষের অপেক্ষায় না থেকে কামেপ্রেমে নারীর উদ্যোগ নেয়ার প্রবল বিরোধী রুশো। যে-নারী উদ্যোগ নেয়, সে দানবী। রুশোর মতে, নারী থাকবে লাজুক লতা; সে নিজের দেহের সুখের কথা ভাববে না; যদি ভাবে তবে মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে সে-প্রক্রিয়ায় যে-প্রক্রিয়ায় তার টিকে থাকার কথা। অর্থাৎ পুরুষের কাম

মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্যে, আর নারীর কাম হচ্ছে মানবজাতির বিনাশ। পুরুষ তার আজগর কামক্ষুধায় ছুটতে পারে নারী থেকে নারীতে; নিজের ক্ষুধা তৃপ্ত করার জন্যে জাগিয়ে তোলে অলৌকিক ভীতি, কিন্তু নারীর ক্ষুধা তার কাছে আপত্তিকর। নারী হচ্ছে পুরুষের কামক্ষুধার খাদ্য; পুরুষ এটা শুধু বিশ্বাসই করে না, নারী যাতে অবলীলায় খাদ্য হয়, পুরুষ তার বিধানও তৈরি করে। আরব অঞ্চলে নারীকে মনে করা হয় 'ফিৎনা', যে নিজের কামে ঘটাতে পারে সামাজিক বিশৃঙ্খলা; কিন্তু সেখানে নারীকে অবরুদ্ধ ক'রে নানা ব্যবস্থা নেয়া হয় পুরুষের কামতৃপ্তির। একটি হাদিসে রয়েছে : 'যখন কোনো রমণীকে তার স্বামী শয্যায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকাব করে এবং তার জন্য তার স্বামী ক্ষোভে রাত কাটায়–সেই রমণীকে প্রভাত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ অভিশাপ দেয়' [দ্র রফিক (১৯৭৯, ১৮১)]। নারী সম্পর্কে ডাইনিশিকারী স্প্রেংগার [দ্র ফিজেস (১৯৭০, ৬৪)] লিখেছেন :

> নারী হচ্ছে অমৃতভাষিণী গোপন শত্রু। সে শিকারীদের ফাঁদেব থেকে বিপজ্জনক ফাঁদ, সে শযতানের ফাঁদ। পুরুষ যখন নারীদের দেখে বা তাদেব কথা শোনে, তখন পুরুষ ধরা পড়ে তাদেব কামজালে : যেমন সন্ত বার্নার্ড বলেন : তাদের মুখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাব মতো, তাদের স্বর সর্পের শোঁশোঁ ধ্বনির মতো; তাছাড়াও তারা দুষ্ট সম্মোহন ছড়ায় অসংখ্য পুরুষ ও প্রাণীর ওপর। তাদেব মন বিদ্বেষের রাষ্ট্র। তাদেব হাত হচ্ছে বেড়ি; তারা যখন কারো গায়ে হাত বাখে, তখন তারা শয়তানের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত করে নিজেদের পবিকল্পনা।

ভারতীয় ত্রিকালদর্শীরা নারীর দানবীরূপ আঁকায় ও ছন্দোবদ্ধ ধিক্কার রচনায় পরিচয় দিয়েছেন লোকোত্তর প্রতিভার। ওই ঋষিরা লকলকে কামুক ও নারীবিদ্বেষী। নারী দেখলেই লক্ষ বছরেব ধ্যান আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে তাঁরা অসুস্থের মতো উত্তেজিত হন, প্রকাশ্যে বা কুয়াশা ছড়িয়ে ধর্ষণ-রমণ করেন, যোনি না পেলে যেখানে সেখানে বীর্যপাত ক'রে শান্তি পান; এবং রচনা করেন শ্লোকের পর শ্লোক নারীনিন্দা। তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধ্যান হচ্ছে কামধ্যান; আর তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন অকালস্খলনগ্রস্ত, যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের সামান্য উত্তেজনায় রতিস্খলনের মধ্যে। তাঁদের চোখে নারী কামদানবী। নারীনিন্দায় বৌদ্ধহিন্দু সবাই সমান। *জাতক, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, রামায়ণ, মহাভারত,* বিভিন্ন পুরাণ, *মনুসংহিতা* ও কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* ভ'রে আছে নারীর দানবীরূপে ও নারীবিদ্বেষে; মুক্তকণ্ঠ ঋষিদের রচিত অশ্লীল উপাখ্যান ও শ্লোকে। জাতকের গল্পে ফিরে ফিরে আসে কামচণ্ডালী নারীরা, যারা কাম ছাড়া কোনো নীতি জানে না । জাতকের একটি গল্পে আছে নারীরা বুড়ী জরতী হয়ে গেলেও থেকে যায় কামদাসী দানবী। বোধিসত্ত্বের মায়ের বয়স একশো বিশ, যাকে বোধিসত্ত্ব নিজে সেবাযত্ন করে। ওই মাও কামার্ত হয়ে ওঠে এক যুবকের জন্যে এবং উদ্যত হয় নিজের পুত্রকে হত্যা করতে। আরেকটি গল্পে রাজা শত্রু দমনের জন্যে রাজধানী ছেড়ে দূরে যায়; এবং যাওয়ার পথেপথে এক-এক ক'রে বত্রিশজন দূত পাঠায় রানীর কুশল জানার জন্যে। রানী বত্রিশজনের সাথেই লিপ্ত হয় কামে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাজা রানীর কুশল জানার জন্যে পাঠায় আবার বত্রিশজন দূত; রানী তাদের সাথেও কামে জড়িত হয়। এমনই দানবিক কামক্ষুধা নারীদের! নারীদের ক্ষুধার নানা উপাখ্যান রয়েছে

পঞ্চতন্ত্র ও *কথাসরিৎসাগর*-এ। আর্য ঋষিদের চোখে নারী হচ্ছে সমস্ত অশুভ ও দোষের সমষ্টি। নারীকে দেখেছেন তাঁরা একটি বিশাল অতৃপ্ত যোনিরূপে; নারী হচ্ছে আপাদমস্তক যোনি, যে কাম ছাড়া আর কোনো সুখ বা নীতি জানে না। মনু [*মনুসংহিতা*, ৯:১৪; দ্র মুরারিমোহন (১৯৮৫)] বলেছেন :

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ। সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে।।

তারা রূপ বিচার করে না, বয়সও বিচার করে না; সুরূপ বা কুরূপ যাই হোক, পুরুষ পেলেই তারা সম্ভোগের জন্যে অধীর হয়ে ওঠে।

পরের শ্লোকেই [৯:১৫] এ-মহর্ষি বলেছেন :

পুরুষ দেখামাত্রই তারা ভোগে মেতে ওঠে ব'লে তারা চঞ্চলচিত্ত ও স্নেহশূন্য; তাই সুরক্ষিত রাখা হ'লেও তারা স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

মহাভারত-এ [অনুশাসনপর্ব : ৩৮] বলা হয়েছে নারী জন্মাদুশ্চরিত্র : 'নারীরা শুধু পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্তার বশীভূত হয়ে থাকে।' তার কামক্ষুধার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় আর সব কিছু। মহাভারতের [অনুশাসনপর্ব : ১৯]। ঋষি বলেছেন :

স্ত্রীলোক স্বভাবতই রতিপ্রিয়। পুরুষসংসর্গ তাদের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও তাদের কাছে ততো প্রীতিকর নয়। সমস্ত স্ত্রীলোকের মাঝে পতিব্রতা চোখে পড়ে মাত্র এক-আধটি। যখন তাদের কামপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হয়, তখন তারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কর্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। নিজের অভিলাষ পূর্ণ করতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে।

বলা হয়েছে, 'তারা অনায়াসে লজ্জা ছেড়ে পরপুরুষদের সাথে সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হয়ে তার কাছে গিয়ে অল্প চাটুবাক্য প্রয়োগ করলেই সে তখনি তার প্রতি অনুরক্ত হয় [অনুশাসনপর্ব : ৩৮]। *দেবীভাগবত*-এ [৯:১৮] বলা হয়েছে :

স্ত্রীজাতি স্বভাবত নিরন্তর অভিলাষিণী—কামচারিণী, কামের আধারস্বরূপা ও মনোহারিণী হয়ে থাকে। তারা অন্তরের কামলালসা ছলক্রমে গোপন করে। নারী প্রকাশ্যে অতি লজ্জাশীলা কিন্তু গোপনে কান্তকে পেলে যেনো তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। রমণী কোপশীলা, কলহের অঙ্কুর ও মৈথুনাভাবে সর্বদা মানিনী, বহু সম্ভোগে ভীতা ও অল্পসম্ভোগে অত্যন্ত দুঃখিতা হয়। স্ত্রীজাতি সুমিষ্টান্ন ও সুশীতল জলের চেয়েও সুন্দর সুরসিক গুণবান ও মনোহর যুবাপুরুষকে সর্বদা মনেমনে কামনা করে। তারা রতিদাতা পুরুষকে নিজের পুত্রের থেকেও বেশি স্নেহ করে এবং সম্ভোগপারদর্শী পুরুষই তাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম।

এসব শ্লোক থেকে ধারণা করতে পারি এ-শ্লোককারেরা কী ভয়াবহ কামদানবীরূপে দেখতেন ও কতোটা অবিশ্বাস করতেন নারীকে। তাই ঋষিগুরুরা কোথাও গেলে উদ্বিগ্ন থাকতেন ভার্যাদের রন্ধ্র সম্পর্কে, প্রহরী হিশেবে রেখে যেতেন শিষ্যদের; এবং শিষ্যদের সম্পর্কেও নিশ্চিতবোধ করতেন না। তাই বিধান দেন যে পঞ্চমহাপাতকের একটি হচ্ছে গুরুপত্নীতে উপগমন। ঋষি [*দেবীভাগবত*, ৯:১] আরো বলেছেন :

কামিনীগণ জলৌকার মতো সতত পুরুষের রক্ত পান ক'রে থাকে, মূর্খেরা তা বুঝতে পারে না; কেননা তারা নারীদের হাবভাবে মোহিত হয়ে পড়ে। পুরুষ যাকে কান্তা মনে করে, সে-কান্তা

সুখসম্ভোগ দিয়ে বীর্য, এবং কুটিল প্রেমালাপে মন ও ধন সবই হরণ করে। তাই নারীর মতো চোর আর কে আছে? রমণীরা কখনো সুখের নয়, তারা শুধু দুঃখেরই কারণ।

আরেকজন বলেছেন, 'রমণীরা যে-পর্যন্ত কোনো নির্জন স্থান না পায় এবং কোনো পুরুষের সাথে বিশেষ আলাপ করতে না পারে, সে-পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব থাকে' [*শিবপুরাণ*, ধর্মসংহিতা : ৪৪]। এ-ঋষিদেব একজনের পুনর্জন্ম নেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে; তিনি সৃষ্টি করেন একটি দানবী– রোহিণী। উপপ্রেমিকাতুর রোহিণীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্কিম [*কৃষ্ণকান্তের উইল* : ৭] এভাবে :

রোহিণী দেখিয়াছিল যে, নিশাকর রূপবান–পটলচেরা চোখ।...ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে,–সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে–কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য।

ঋষিরা পরিমাপও করেছেন দানবীর দুঃশীলতা; নির্দেশ করেছেন দুঃশীলতার ওজন। ঋষিদের পরিমাপে নারী [*মহাভারত*, অনুশাসনপর্ব : ৩৮] :

তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প, ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করলে স্ত্রীজাতি কখনোই ভয়ানকত্বে ওগুলোর থেকে ন্যূন হবে না। বিধাতা যখন সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে মহাভূত সমুদয় ও স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করেন, সে-সময়ই স্ত্রীদের দোষের সৃষ্টি করেছেন।

শুধু একবার ওজন করেন নি, করেছেন বারবার; দেখেছেন পরিমাপে তাঁরা নির্ভুল : 'ইহলোকে স্ত্রীলোকের থেকে পাপশীল পদার্থ আর কিছু নেই। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এর সবগুলোর সাথে তাদের তুলনা করা যায়' [ওই : ৪০; দ্র রবীন্দ্রনাথ (১২৯৪), অশোক (১৯৮৩, ৯১-১০৩), অনন্যা (১৩৯৪, ৩৬-৩৭)]। *পদ্মপুরাণ*-এ বলা হয়েছে :

ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমাঃ পুমান্।
তস্মাদ্‌ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকস্থানে চ ধারয়েৎ।।
যথৈব মত্ত মাতঙ্গ সৃণিমুদগর যোগতঃ।
স্ববশং কুরুতে যন্তা তথা স্ত্রীণাং প্ররক্ষকঃ।।

নারী ঘৃতকুম্ভসম, পুরুষ তপ্ত অঙ্গারসমান;
তাই ঘৃত ও অগ্নিকে একস্থানে রাখা উচিত নয়।
মাহুত যেমন মুগুর দিয়ে মত্ত হস্তীকে বশ করে,
তেমনি বশ করতে হবে নারীকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ আছে,'দুর্নিবার্যশ্চ সর্বেষাং স্ত্রীস্বভাবশ্চ চাপলঃ', অর্থাৎ 'স্ত্রীস্বভাব এতো চঞ্চল যে কারো পক্ষে সহজে নিবারণ করা অসম্ভব।' এ-পুরাণপ্রণেতা আরো বলেছেন, 'নারী মোক্ষদ্বারের কবাট, হরিভক্তির বিরোধী। সংসারবন্ধনস্তম্ভের রজ্জু, যা ছিন্ন করা যায় না। নারী বৈরাগ্যনাশের বীজ, সর্বদা অনুরাগবর্ধনকারিণী, সাহসের ভিত্তি ও দোষের গৃহ। নারী অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, মূর্তিমতী কপটতা; অহঙ্কারের আশ্রয়, নারীর মুখে

মধু ও অন্তরে বিষ।' *পঞ্চতন্ত্র*-এ বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশ দিয়েছেন : 'নারীর মুখে মধু, অন্তরে শুধুই বিষ; তাই এদের মুখ পান করবে কিন্তু হৃদয় মুষ্টাঘাতে আহত করবে।' এমন দানবী কি ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন? এক ঋষি প্রশ্ন করেছেন : 'বিষ ও অমৃতযুক্ত স্ত্রীরূপ যন্ত্র ধর্মনাশের জন্যে কার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে?' আরেক ঋষি বিধান দিয়েছেন, 'নার্য শ্মশানঘটিকা ইব বর্জনীয়াঃ' : 'নারী শ্মশানের ঘটিকার মতো বর্জনীয়' [দ্র নারায়ণ (১৩৭৪, ৫৩-৫৪)]। নজরুল *দোলন-চাঁপার* 'পূজারিণী' কবিতায় চিৎকার ক'রে বলেছেন, 'নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো, / এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো। /ইহাদের অতিলোভী মন/একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়, যাচে বহু জন।' প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের গলা স্পষ্ট শোনা যায় এ-বিদ্বেষ ও হাহাকারে।

কিন্তু নারীকে পুরুষ বর্জন করতে পারে নি, দানবীকে সে প্রয়োজনে, কামে ও আবেগে কখনোকখনো দেবী ক'রে তুলেছে। বন্দনা করেছে তার দেবীরূপের–মাতা, স্ত্রী ও দয়িতার। তবে দেবীরূপে নারী পুরুষের অধীন, সামান্য ও অসহায়; তাই দেবী অনেক স্বস্তিকর, পুরুষের প্রিয় পুতুল। পুরুষ যখন নারীকে দেবীরূপেও কল্পনা করে, তখন তার ওপরে থাকে পুরুষ ও পুরুষ দেবতারা; দেবীকে ক'রে তোলে তারা বাহ্যিক শোভাময়, এবং অন্তঃসারশূন্য। হিন্দু পুরাণে চণ্ডী বা দুর্গা মহাশক্তি, কিন্তু তার শক্তিও তার নিজের নয়; পুরুষ দেবতাদের কৃপায় সে শক্তিময়ী : 'শিবের তেজে দেবীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহুসমূহ, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জংঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল...। মহাদেব দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, শঙ্খ দিলেন বরুণ, অগ্নি দিলেন শক্তি...' [দ্র হংসনারায়ণ (১৯৮০, ১৭৫)]। আদমের বক্র হাড় থেকে যেমন সৃষ্টি করা হয়েছে হাওয়াকে, তেমনি পুরুষ দেবতাদের শক্তির সংকলন হচ্ছে এ-দেবী, যার নিজস্ব অস্তিত্বই নেই।

পুরুষতন্ত্র বহু শতাব্দী ধ'রে নারীকে ভূমি আর ভূমিকে নারীরূপে দেখে আসছে; পৃথিবীকে মাতৃদেবীরূপে পুজোও করছে; কিন্তু তার শক্তিকে করছে অস্বীকার। এস্কিলুস, আরিস্ততল, হিপপোক্রেতিস ঘোষণা করেছেন অলিম্পাস থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবখানে প্রধান পুরুষ; পুরুষই সৃষ্টিশীল, নারী নয়। নারী ভূমি, নারী উর্বর; তবে ওই উর্বরতা সৃষ্টিশীল নয়, তাকে সৃষ্টিশীল করে পুরুষের বীর্য। নারী মৃত্তিকা, পুরুষ বীজ; পুরুষ অগ্নি, নারী জল। মনু বলেছেন, 'নারী জাতি ক্ষেত্রস্বরূপ এবং পুরুষ বীজস্বরূপ; ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগেই সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকে' [৯:৩৩]; তিনি আরো বলেছেন,'ঠিক সময়ে কর্ষিত ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করা হয়, ক্ষেত্রে সে-বীজগুণসম্পন্ন অঙ্কুরই উদগত হয়ে থাকে' [৯:৩৬]। কোরানে আছে : 'তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। তাই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে যেতে পারো' [২:২২৩]। পুরুষ নারীকে দরকারে দেবী করেছে, ধরণী করেছে; কিন্তু তাকে ক'রে রেখেছে অসার। প্রজননে নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার ক'রে তাকে পরিণত করেছে একটি অক্রিয় বীজধারণের পাত্রে। পিতৃতন্ত্র পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বীজকেই দিয়েছে গুরুত্ব। হিন্দু পুরাণে দেখা

যায় দেবতা ও ঋষিরা যেখানেসেখানে বীর্যপাত করছে, জন্ম দিচ্ছে অজস্র সন্তান; অর্থাৎ তারা নারীর জরায়ুকে প্রত্যাখ্যান ক'রে নারীকে তার একান্ত অধিকার থেকেও বহিষ্কার করেছে। পিতৃতন্ত্রের নারীর জরায়ুকে অস্বীকারের প্রায় রাজনীতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এস্কিলুসের *অরেসতেইয়া* নাটকে। অ্যাপোলো পেশ করে জন্মদানের পিতৃতান্ত্রিক ভাষ্য :

মা নয় শিশুর মাতা, যাকে তার বলা হয়।
সে সেবিকামাত্র, তার কাজ তার ভেতরে বপন করা
শিশুর প্রকৃত জন্মদাতা পুরুষের বীজ লালনপালন।
যদি দেবতার বরে বেঁচে থাকে শিশু,
সে তাকে পালন করে, যেমন সখার জন্যে
কেউ দেখাশোনা করে বেড়ে-ওঠা চারা...
মা ছাড়াও পিতা পারে জন্ম দিতে .

পুরুষের প্রাধান্য রাখার জন্যে পিতৃতন্ত্র সব পারে : জন্মের স্বাভাবিক রীতিকেও উল্টে দিতে পারে। অ্যাপেলো এর উদাহরণও হাজির করেছে; নিয়ে এসেছে অ্যাথেনাকে, যে সম্পূর্ণ যুবতীরূপে জন্ম নিয়েছিলো পিতা জিউসের শির থেকে। সে এসেই ঘোষণা করে পিতৃতন্ত্রের জয় : 'কোনো মাতা জন্ম দেয় নি আমাকে। তাই পিতার দাবি ও পুরুষাধিপত্যকে আমি শিরোধার্য করি।' পুরুষতন্ত্রের একটি চমৎকার কৌশল হচ্ছে নারীর মুখে পুরুষের জয় ঘোষণা ও নারীনিন্দা করা। *মহাভারত*-এর নারীনিন্দার অধিকাংশ শ্লোক বলা হয়েছে নারীরই মুখে। পুরুষতন্ত্রে পুরুষই দেবতা; সে সব পারে, একলা নিজেই জন্ম দিতে পারে, দেবীকে পরিণত করতে পারে দাসীতে; মাকে শেখাতে পারে নীতিশাস্ত্র। বাঙলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনো বিশ্বাস রয়েছে যে নারী ঘট মাত্র; পুরুষের বীজেই ওই ঘট ভ'রে ওঠে। পুরুষ যখন নারীকে দেবী ব'লে, ভূমি বলে, মা বলে, তখনো তার মহিমা অস্বীকার করে।

নারীর দেবীরূপের একটি হচ্ছে বধু, যে পরম কাম্য শিকার পুরুষের । নববধুকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে পুরুষ লাভ করে জীবনের সমস্ত ধন। তার টাটকা শরীরের ছোঁয়ায় পুরুষের শরীরে ও মনে জাগে কবিতা, বাজে সঙ্গীতের সুর, সে ঢেকে যায় নিসর্গের বর্ণিল শোভায়। পুরুষের কাছে সে তখন কপোত ময়না কোকিল, গোলাপ পদ্ম রজনীগন্ধা, অমৃত, সন্ধ্যার মেঘমালা, হীরেচুনিপান্না, বসন্তের বাতাস, নীলিমা, সমুদ্র। কবিরা এ-দেবীর স্তব করেছেন উৎকৃষ্টতম শব্দের উৎকৃষ্টতম বিন্যাসে। বধু দেবী, কেননা সে পুরুষের রঙিন কামের রক্তিমতম পরিতৃপ্তি। কবি গেয়ে ওঠেন, 'ওগো বধু সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী, পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন– /পর্ণের পাত্রে ফাল্গুনরাত্রে মুকুলিত মল্লিকামাল্যের বন্ধন।/এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের; পলাশের কুঙ্কুম চাঁদিনির চন্দন– /পারুলের হিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল, মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ' [রবীন্দ্রনাথ]; আর এর সুরে ও ছবিতে প্রবলভাবে বয়ে চলে পুরুষের কামের প্রবাহ। দেবীকে ঘিরে আবর্তিত হয় পুরুষের থরোথরো কামনা। কামই ঘিরে থাকে দেবীকে বুদ্ধদেব বসু যখন বলেন,

'যাও, মেয়ে জীবনের খাদ্য হও'; বা বিষ্ণু দে বলেন, 'তুমি যেন এক পর্দায় ঢাকা বাড়ি, / আমি অঘ্রাণ-শিশিরে সিক্ত হাওয়া, /বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ঘিরে'; বা 'শলোমনের পরমগীত'-এর দয়িত বলে :

অয়ি মম প্রিয়ে! দেখ, তুমি সুন্দরী,
  দেখ, তুমি সুন্দরী,
ঘোমটার মধ্যে তোমাব নয়নযুগল কপোতের ন্যায়;
তোমার কেশপাশ এমন ছাগপালের ন্যায়,
যাহাবা গিলিয়দ-পর্ব্বতের পার্শ্বে শুইয়া থাকে।
তোমার দন্তশ্রেণী ছিন্নলোমা মেষীর পালবৎ,
যাহারা স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে,...
তোমার ওষ্ঠাধর সিন্দুরবর্ণ সূত্রের ন্যায়,
তোমার গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়।...
তোমার কুচযুগল দুই হবিণ-শাবকের,
  হরিণীব দুই যমজ বৎসের ন্যায়...
তোমার প্রেম দ্রাক্ষাবস হইতে কত উৎকৃষ্ট!
তোমার তৈলের সৌরভ সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট'
কান্তে! তোমার ওষ্ঠাধর হইতে ফোঁটা ফোঁটা মধু ক্ষরে,
তোমাব জিহ্বার তলে মধু ও দুগ্ধ আছে;...
মম ভগিনি, মম কান্তা অর্গলবদ্ধ উপবন,
অর্গলবদ্ধ জলাকর, মুদ্রাঙ্কিত উৎস।...
তোমার গোলাকার উরুদ্বয় স্বর্ণহারস্বরূপ।
নিপুণ শিল্পীর হস্তনির্মিত স্বর্ণহারস্বরূপ।
তোমার দেহ এমন গোল বাটির ন্যায়,
যাহাতে মিশ্রিত দ্রাক্ষারসের অভাব নাই।
তোমার কটিদেশ এমন গোধূমরাশির ন্যায়,
যাহা শোশন-পুষ্পশ্রেণীতে শোভিত।...
তোমার কুচযুগ দ্রাক্ষাগুচ্ছস্বরূপ।

বধুর এ-অসামান্য রূপ শুধু যৌবনের, যখন সে প্রেমিকা; যখন সে গার্হস্থ্য স্ত্রী হয়ে ওঠে নি। স্ত্রী হয়ে ওঠার পরও কখনোকখনো তাকে দেবী ক'রে তোলে পুরুষ, সন্তানের জননী গৃহলক্ষ্মীরূপে; কিন্তু সে নিজে তখন দেবতা। দেবতাই প্রভু, গৃহের দেবী তার পরিচারিকামাত্র।

কোনো কোনো ধর্মে নারীকে তার রক্তমাংস থেকে উত্তীর্ণ ক'রে অতীন্দ্রিয় ক'রে তোলা হয়। যেমন খ্রিস্টধর্মে, বা সুফিদের সাধনায়, কিছুটা হিন্দুধর্মে। ইসলামে নারীকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে সমস্ত অতীন্দ্রিয়তা ও রহস্য থেকে, মুসলমানের কোনো দেবী নেই; মুসলমানের কাছে নারী সম্ভোগের সামগ্রী;– পৃথিবীতে এবং ইন্দ্রিয়ভারাতুর বেহেশতে। খ্রিস্টানরা নারীকে মনে করে পরিবার ও গৃহের আত্মা। প্রায় সমস্ত ভাষায়ই দেশ, নগর, নদী প্রভৃতি নারী; নানা বিমূর্ত ভাবনাও নারী। সাহিত্যে নারীই বারবার ব্যবহৃত হয়েছে রূপকরূপে; কাবণ নারী হচ্ছে ভাব ও আত্মা। খ্রিস্টানের কাছে নারী স্বর্গের সৌন্দর্য, যে

তাকে ঈশ্বরের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, যেমন *ডিভাইন কমেডিতে* দান্তেকে পথ দেখায় বিয়াত্রিসে। অনেক তত্ত্বে নারী হচ্ছে সুষমা, যুক্তি, সত্য। বিহারীলাল, হিন্দুধর্মের প্রভাবেই, বিশ্বসৌন্দর্যের সারসত্তাকে দেখেছেন নারীরূপে, সারদারূপে, এবং তাকে গৃহে দেখতে পেয়েছেন স্ত্রীরূপে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাও অনেক সময় নারী। নারী যখন ভাব, রূপক, প্রতীক, তখন সে আর মাংস নয়; সে তখন অলৌকিক সত্তা। নারী তখন, যেমন জীবনানন্দের কাছে, অনন্ত নক্ষত্রবীথি অন্ধকারে জ্বলে যার পবিত্র শিখা। তখন সে কারো সম্পত্তি নয়, সম্ভোগসামগ্রী নয়, তখন সে আরাধ্য। তখন সে অতীন্দ্রিয়, বায়বীয়; তখন অশুভ রূপান্তরিত হয় শুভ ও শুদ্ধতায়। তবে এ-নারী বাস্তব নারী নয়; তাকে নিয়ে বাস করে না পুরুষ; নারীর অতীন্দ্রিয় মূর্তি রচনা প্রকাশ করে পুরুষেরই প্রতিভা, তাতে নারীর অবস্থার কোনোই উন্নতি ঘটে না।

নারীজাতির ঐতিহাসিক মহাপরাজয়

দ্য বোভোয়ার বলেছেন নারী মনুষ্যপ্রজাতির শিকার; পুরুষ তার শরীরকে অতিক্রম ক'রে গেছে, কিন্তু নারী পশুর মতো, শুধু জন্ম দেয়াই যার একান্ত ধর্ম, বন্দী হয়ে রয়েছে নিজের শরীরের শেকলে। নারী পরাভূত হয়েছে : মনুষ্যপ্রজাতির পরাজিত লিঙ্গের নাম নারী। নারী তার শরীরমনে বয়ে চলছে ওই পরাজয়; বিজয়ী পুরুষকে অভিবাদন জানিয়ে, তার সামনে নত থেকে, শুরু ও শেষ হয় তার জীবন। নারী পরাজিত হয় পুরুষের কাছে, নারীতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে পিতৃ-বা পুরুষ-তন্ত্রের রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে। নারীর পরাজয়ের তত্ত্ব রচনা করেছেন অনেকে : চেরনিশেভস্কি *[কী করণীয়?]*, মিল *[নারী-অধীনতা]*, বেবেল *[নারী ও সমাজতন্ত্র]*, ভেবলেন *[সুবিধাভোগী শ্রেণীর তত্ত্ব]* প্রমুখ, তবে এঙ্গেলস লেখেন সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক রচনাটি, যার নাম *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* (১৮৮৪)। এঙ্গেলস এটি লিখেছিলেন হেনরি মর্গানের *আদিম সমাজ* (১৮৭৭) ও বাখোফেনের *মাতৃ-অধিকার* (১৮৬১) অবলম্বনে, কিন্তু তিনি এতে পেশ করেন পিতৃতন্ত্রের ইতিহাস ও অর্থনীতির এক সংহত বিবরণ; এবং একমাত্র তিনিই আক্রমণ করেন পিতৃতন্ত্রের বহুনন্দিত একটি সংস্থাকে, যাকে বলা হয় পরিবার। পিতৃতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন পিতৃতন্ত্র ও পরিবারসংস্থা মানুষের সমাজসংস্থাগুলোর মধ্যে অনাদি; তাঁরা মনে করেন এগুলোর উদ্ভব ঘটেছিলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পুরুষের জৈবিক শক্তি ও সহজাত প্রাধান্য ভিত্তি ক'রে। যেনো এটিই বিধির স্বর্গীয় বিধান। তাঁরা মনে করেন দেহই নারীর নিয়তি; তার শারীরিক অশক্তি, ঋতুস্রাব, গর্ভ ও প্রসব তাকে বাধ্য করে পরাজিত লিঙ্গে পরিণত হ'তে।

নারীবাদীদেরও অনেকে দ্বিধাভরে মেনে নিয়েছেন একথা; যেমন দ্য বোভোয়ার *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ নারীর অশক্তির, মনুষ্যপ্রজাতির শিকার হওয়ার, দিয়েছেন বিশদ বিবরণ; কিন্তু কেইট মিলেট (১৯৬৯, ১০৯) এটা মেনে নেন নি। মিলেটের মতে সামাজিক রাজনীতিক সংস্থা দেহবল ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠে না, গ'ড়ে ওঠে সমাজের মূল্যবোধ ও উৎপাদন পদ্ধতি ভিত্তি ক'রে। পিতৃতন্ত্র একটি সংস্থা; মানুষের বিকাশের বিশেষ সময়ে এর উদ্ভব ঘটে, উদ্ভবের পেছনে রয়েছে বিশেষ পরিস্থিতি। তার উদ্ভবের প্রক্রিয়া আজ পুরোপুরি জানা না গেলেও সে-সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। অনেকেই মনে করেন পিতৃতন্ত্রের আগে ছিলো অন্য কোনো তন্ত্র। ম্যাথিয়াস ও ম্যাথিলডা ভ্যারটুং [*আধিপত্যশীল লিঙ্গ*, ১৯২৩] মনে করেন পিতৃতন্ত্রের আগে ছিলো মাতৃতন্ত্র বা নারীতন্ত্র, যেখানে নারীরাই ছিলো আধিপত্যশীল, যেমন পিতৃতন্ত্রে আধিপত্যশীল পুরুষেরা; আর বাখোফেন [*মাতৃ-অধিকার*, ১৮৬১], ম্যাকলেনন [*আদিম বিবাহ*, ১৮৭৫], মর্গান [*আদিম সমাজ*, ১৮৭৭], ব্রিফল্ট [*মাতারা*, ১৯২৭] মনে করেন পিতৃতন্ত্রের আগে ঠিক

মাতৃতন্ত্র না থাকলেও তার মতোই কিছু একটা ছিলো। সেখানে হয়তো সামাজিক আর ধর্মীয় এলাকায় প্রধান মূল্য পেতো মাতৃ-অধিকার, বা নারীনীতি, বা নারীর উর্বরতা। পিতৃতন্ত্রবাদীরা এটা মানতে রাজি নন; তাঁরা মনে করেন বর্তমান ও ঐতিহাসিক কালটি সম্পূর্ণরূপে পিতৃতন্ত্রের; শুধু তাই নয়, তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রাগৈতিহাসিক কালটিও পিতৃতন্ত্রের, এবং বিপুল ভবিষ্যৎও থাকবে পুরুষতন্ত্রের অধিকারে। নারীবাদীরা অস্বীকার করেন দাবি; তাঁরা মনে করেন না যে পিতৃতন্ত্র অনাদি ও শাশ্বত; তাঁদের মতে পিতৃতন্ত্রের আগামী বিপুল ভবিষ্যৎ জুড়ে টিকে থাকার কোনো জৈবিক সামাজিক কারণ বা প্রয়োজন নেই। আজ যা আছে, তাকে সনাতন শাশ্বত ভাবা হাস্যকর।

পিতৃতন্ত্র মানুষের ইতিহাসের একটি পর্বমাত্র; তাই তার সমাপ্তি ঘ'টে শুরু হ'তে পারে নরনারীর সম্পর্কের আরেক, ও উন্নত, পর্ব। জন স্টুয়ার্ট মিল উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছিলেন *নারী-অধীনতা* (১৮৬৯) নামে একটি প্রভাবশালী বই। স্টুয়ার্ট মিল ধ'রে নিয়েছিলেন নারীজাতির অধীনতা ঘটেছে পুরুষের বলপ্রয়োগের বিশ্বজনীন নীতিতে, তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে নারীজাতির অধীনতা দূর হবে প্রগতি ও নৈতিকতার ক্রমাগ্রগতির ফলে। তাঁর বিশ্বাস ছিলো মানুষের প্রগতি ও নৈতিকতার অগ্রগতি অবধারিত, কেননা মানুষ আর পেছনের দিকে যেতে পারে না। এঙ্গেলস মানুষের ওপর পোষণ করতে পারেন নি এতোটা আস্থা। মিলের মতো তিনি এমন আশাবাদ পুষতে পারেন নি যে মানবসমাজ প্রগতিশীল থেকে প্রগতিশীলতর হবেই, কেননা প্রগতিশীল আদিম সাম্যবাদের পর প্রতিক্রিয়াশীল দাসপ্রথার আবির্ভাব তিনি দেখেছেন। বিপ্লবী ছিলেন তিনি; তাই তাঁর পক্ষে কোনো সংস্থার জৈবিক উদ্ভবতত্ত্বে বিশ্বাস করাও ছিলো অসম্ভব। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংস্থামাত্রই মানুষের তৈরি। তাই বদলে দেয়া যেতে পারে যে-কোনো সংস্থাকে, এমনকি দরকার হ'লে তাকে হঠাৎ প্রচণ্ড বিপ্লবাত্মক প্রক্রিয়ায়ও উচ্ছেদ করা সম্ভব। তিনি দেখেন যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও সম্পত্তির মধ্যে; সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা ও নারীর অধীনতার ভিত্তির ওপরই স্থাপিত পিতৃতন্ত্র। তাই পিতৃতন্ত্র ও পরিবার দাঁড়িয়ে আছে শোষণের ওপর; মানুষের একটি লিঙ্গ শোষণ করছে আরেকটি লিঙ্গকে– নারীশোষণের মহত্তম যন্ত্রটির নাম পিতৃতন্ত্র। তিনি অনুরক্ত ছিলেন বাখোফেনের *মাতৃ-অধিকার* গ্রন্থে প্রস্তাবিত তত্ত্বের প্রতি : মাতৃ-অধিকারে এঙ্গেলস দেখতে পান এক ধরনের আদিম সাম্যবাদ, যেখানে ছিলো না কোনো ব্যক্তিমালিকানা। পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে একরাশ সামাজিক রোগ নিয়ে; দেখা দেয় সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার, নারী-অধীনতা ও দাসপ্রথা, সমাজ ভাগ হয়ে যায় নানা শ্রেণী ও বর্ণে, দেখা দেয় শাসক ও সম্পত্তিশীল শ্রেণী, শুরু হয় সম্পত্তির অসম বণ্টন, এবং শেষে শোষণের নির্মম বিকট যন্ত্ররূপে দেখা দেয় রাষ্ট্র। এঙ্গেলস বাখোফেন ও মর্গানের সাথে নিজের সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের সমন্বয় ক'রে রচনা করেন সমাজবিবর্তনের এক বিশ্বজনীন ইতিহাস, যাতে তিনি নির্দেশ করেন কীভাবে উদ্ভূত হয় পরিবার, বিভিন্ন সমাজসংস্থা; মানুষ কীভাবে সম্পদ উৎপাদনের জন্যে হাতিয়ার তৈরি করে, কৃষিকাজ শুরু করে, ব্যবসায়ী হয়, এবং শেষে হয় শিল্পপতি।

পরিবারের ইতিহাসকে তিনি ভাগ করেন কয়েকটি স্তরে; দেখান কীভাবে মাতৃতন্ত্র বা মাতৃ-অধিকারের স্তর থেকে নির্বিচার বা মুক্ত যৌনসম্পর্ক, সমষ্টি বিয়ে, জোড়বাঁধা বিয়ে, একরক্তসম্পর্কের বিয়ে, পুনালুয়া বিয়ে প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত হয় পিতৃতান্ত্রিক একপতিপত্নী বিয়ে (বা একপতিবহুপত্নী বিয়ে), এবং নারী হয়ে ওঠে পুরুষের সম্ভোগসামগ্রী ও পরিচারিকা।

মানুষের ইতিহাসের প্রথমে আরণ্যপর্ব, তারপর বর্বরতার পর্ব. এবং তারপর ও এখন সভ্যতার পর্ব। আরণ্যপর্বে মানুষ ছিলো অরণ্যের সন্তান; মানুষ তখন প্রকৃতি থেকে আহরণ করেছে তার অবিলম্বে ব্যবহার্য সম্পদগুলো, যা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হাতিয়ার বলতে কিছুই তার ছিলো না, বা ছিলো সে-সব যা তাকে সাহায্য করেছে প্রকৃতি থেকে ফলমূল আহরণে। এ-সময় নারীর অবস্থা কেমন ছিলো, তা নিশ্চিত জানার উপায় নেই। নারীকে নিশ্চয়ই তখন করতে হতো নানা কঠিন কাজ; স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার সময় ভারবহনের ভারটা হয়তো পড়তো তখন নারীরই ওপর, কেননা পুরুষকে নিজের হাত দুটি মুক্ত রাখতে হতো পশুর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে। অর্থাৎ নারী ভার বইতো, কিন্তু পুরুষ করতো আরো ভয়ঙ্কর কাজ। তবে ওই নারীরা আজকের বুর্জোয়া নারীদের মতো ভঙ্গুর ছিলো না। কিন্তু তারা বাঁধা ছিলো ঋতুস্রাব, গর্ভধারণ ও প্রসবের জৈব শেকলে, যা তাদের তখনো ক'রে রেখেছিলো বিরূপ বিশ্বে অসহায়। তাই অন্ন ও আশ্রয়ের জন্যে তাদের নির্ভর করতেই হতো মুক্ত পুরুষের ওপর। নারী পুরুষের মতো সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করে নি, সে গর্ভবতী হয়েছে ও প্রসব করেছে। গর্ভ ও প্রসব কোনো কাজ নয়, তা জৈব ব্যাপার; তাই নারীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে নিজেরই জৈবনিয়তির কাছে। পুরুষ গেছে ভিন্ন পথে; সে তার জৈব ও পাশব স্বভাব পেরিয়ে হয়ে উঠেছে স্রষ্টা বা উদ্ভাবক। আদিম মানুষ মর্যাদাসম্পন্ন হয়েছে আরেক কারণে, তার পৌরুষ বা বীরত্বের জন্যে। সে বেছে নিয়েছে বিপজ্জনক কাজ: সে শিকার করেছে, ভয়ঙ্কর জন্তুদের সাথে লড়াই ক'রে বিপন্ন করেছে জীবন, এবং পরেছে জয়মাল্য। পুরুষ শোষক, স্বার্থপরায়ণ, পীড়ক, কিন্তু শক্তিমান; আর শক্তির কাছে গৌণ হয়ে যায় অন্য সব কিছু। নারী জীবন সৃষ্টি করে, এটা মানুষকে রেখে দেয় পশুরই স্তরে: পুরুষ জীবন বিপন্ন করে, এটা মানুষকে পশুর পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ করে মানুষের পর্যায়ে। নারী টিকিয়ে রেখেছে মানুষ প্রজাতিকে, আর পুরুষ বদলে দিয়েছে পৃথিবীকে; নারীর নিয়তি, অন্তত এখন পর্যন্ত, হয়ে রয়েছে জীবনের পুনরাবৃত্তি করা; কিন্তু জীবনের পুনরাবৃত্তি ক'রে কেউ পৃথিবীর প্রভু হ'তে পারে না। জৈবিক ও আর্থ কারণে পুরুষ হয়েছে পৃথিবী ও নারীর প্রভু। আরণ্যপর্বে নরনারীর যৌনসম্পর্কের রীতি কী ছিলো? এ-পর্বে ছিলো নির্বিচার বা মুক্ত যৌনসম্পর্ক, যে-কোনো নারী মিলিত হতো যে-কোনো পুরুষের সাথে। এটা মেনে নিতে অনেকের লজ্জা লাগতে পারে; কিন্তু আরণ্য মানুষ আজকের ভণ্ডামো আয়ত্ত ক'রে ওঠে নি। এঙ্গেলস (১৮৮৪, ১৯১) বলেছেন, 'যদি কঠোর একপতিপত্নী বিধিই সর্বপ্রধান পুণ্য বলে মনে করা হয় তাহলে টেপওয়ার্মকেই শ্রেষ্ঠ মানতে হয়, কারণ তার পঞ্চাশ থেকে দু'শ খণ্ডে বিভক্ত শরীরের প্রত্যেকটি খণ্ডে একজোড়া পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ আছে এবং সারা জীবন ধরে এই কৃমিকীট শরীরের

প্রত্যেকটি খণ্ডে আত্মসঙ্গম করে কাটায়।' আরণ্য নরনারী টেপওয়ার্ম ছিলো না; এবং ছিলো না তার উত্তরাধিকারীর মতো ভণ্ড।

মানুষের আরণ্যপর্বের পর আসে কৃষি বা বর্বরতার পর্ব। যাযাবর মানুষ স্থির হয় কোনো উর্বর অঞ্চলে, হয় কৃষক; এবং পশু হয় তার প্রধান সম্পদ, মানুষ হয় গোস্বামী। ভূমিকা বদলায় নারীরও। যাযাবর আরণ্য মানুষের ছিলো শুধু বর্তমান; কিন্তু কৃষিসমাজের মানুষের বর্তমান তো রয়েছেই, রয়েছে অতীত ও ভবিষ্যৎ। তার কাছে উর্বরতা দেখা দেয় একটি বড়ো বিস্ময়রূপে। কৃষক অনুভব করে নারী ও জমি একই প্রকৃতির, উভয়ই উর্বর; চাষ করলে উভয়ই সোনা ফলায়। কিন্তু সম্পূর্ণটা তখনো বুঝে উঠতে পারে নি তারা, নারী ও জমিতে দেখেছে তারা ইন্দ্রজাল, যেনো কোনো অলৌকিক যাদুতে নারী হয় সন্তানবতী, জমি ফসলভারাবনত। এ-সময় সন্তান ও ফসলের দায়িত্বও ছিলো নারীর;– নারী শুধু সন্তান ধারণ করতো না, চাষের কাজও করতো। তাই তার মূল্য ছিলো, গৌরব ছিলো। এ-সময়ই দিকেদিকে দেখা দেয় উর্বরতার মহাদেবী; –মহামাতা, যে জীবন দেয়, জীবন হরণ করে, আবার পুনর্জীবন দেয়। ব্যাবিলোনিয়ায় তার নাম ইশতার, সেমেটীয় অঞ্চলে আসতারতে, গ্রিকদের সে রিআ্যা, মিশরীয়দের আইসিস। এ-সময়ে নারীপুরুষের যৌনসম্পর্কের কয়েকটি রূপ দেখা দেয়, উন্মেষ ঘটে পরিবারের আদিরূপটির। পরিবারের আদি রূপটি হচ্ছে একরক্তসম্পর্কের পরিবার। একরক্ত পরিবারে বিয়ে হতো প্রজন্মক্রমে : পিতামহ ও পিতামহী পরস্পরের ভাইবোন ও স্বামীস্ত্রী, তাদের পুত্রকন্যারা একে-অন্যের ভাইবোন ও স্বামীস্ত্রী, তাদের পুত্রকন্যারা ভাইবোন ও স্বামীস্ত্রী। ক্রমে নিষিদ্ধ হয় একরক্তসম্পর্কিতদের মধ্যে বিয়ে, উদ্ভূত হয় এমন একধরনের পরিবার, মর্গান ও এঙ্গেলস যাকে বলেছেন 'পুনালুয়া পরিবার'। পুনালুয়া পরিবারে আপন বা সমান্তরবর্তী কজন বোন হতো তাদের সাধারণ স্বামীদের সাধারণ স্ত্রী, বাদ পড়তো তাদের ভাইয়েরা। এ-পরিবারে স্বামীরা পরস্পরের ভাই হতো না, তারা হতো একে-অন্যের ঘনিষ্ঠ সাথী বা পুনালুয়া। ঠিক একইভাবে একদল আপন বা সমান্তরবর্তী ভাইয়েরা মিলিতভাবে বিয়ে করতো একদল নারীকে, এবং স্ত্রীরা হতো একে-অন্যের সাথী। এটা ছিলো সমষ্টি বিয়ে, যা থেকে উৎপত্তি হয়েছিলো গোত্রের।

সমষ্টি বিয়ের পরিবারে বাপের ঠিক ছিলো না, কিন্তু মা ছিলো সুনিশ্চিত। সমষ্টি মায়েরা পরিবারের সব সন্তানকেই নিজের সন্তান মনে করতো, তবে নিজের পেটের সন্তানদের চিনতো পৃথক ক'রে। সমষ্টি বিয়েতে শুধু মায়ের দিক থেকেই সম্ভব ছিলো বংশপরম্পরা ঠিক করা; তাই তাতে স্বীকৃতি পেতো শুধু মাতৃধারা। সমষ্টি বিয়ের কালে বা তারও আগে কিছু সময়ের জন্যে দেখা দিয়েছিলো জোড়বাঁধা পরিবার, যাতে বহু স্ত্রীর মধ্যে একটি পুরুষের থাকতো একটি মুখ্য স্ত্রী। আবার ওই পুরুষটি হতো ওই নারীর বহু পতির মধ্যে মুখ্য পতি। মহাভারতে বিয়ের প্রচলন সম্পর্কে একটি কাহিনী রয়েছে। শ্বেতকেতু তার পিতা উদ্দালক ও মায়ের সাথে ব'সে ছিলো; এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে শ্বেতকেতুর মাকে নিয়ে যায়। শ্বেতকেতু এর কারণ জানতে চাইলে তার

পিতা তাকে জানায় যে তার মায়ের ওপর তার একান্ত অধিকার নেই; যে-কেউ তার মাকে নিয়ে ভোগ করতে পারে। এ-উপাখ্যান নির্দেশ করে সম্ভবত জোড়বাঁধা পরিবার। এর আগে পুরুষের জন্যে নারীর অভাব ঘটতো না, কারণ তখনো রক্তসম্পর্কিতদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ হয় নি, তাই প্রচুর নারী পাওয়া যেতো বিয়ের জন্যে; কিন্তু এখন নারী দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। নারীর অভাবে জোড়বাঁধা বিয়ের সাথেসাথে শুরু হয় নারীহরণ ও নারীকেনা। জোড়বাঁধা বিয়ে ছিলো অস্থায়ী ও দুর্বল; তাই এর ফলে আগের সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালি ভেঙে যায় নি। সমষ্টি বিয়ের সাম্যতন্ত্রী পরিবারে ছিলো নারীদের আধিপত্য; কেননা তখন জনককে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হতো না, তাই মা-ই ছিলো স্বীকৃত, পিতা তখনো স্বীকৃতি পায় নি। সমাজের সূচনাকালে নারীরা পুরুষের দাসী ছিলো না; আরণ্য ও বর্বর নারীরা ছিলো স্বাধীন ও সম্মানিত। সাম্যতন্ত্রী পরিবারে নারীরা বা বেশির ভাগ নারী হতো একই গোত্রের, পুরুষেরা বিভিন্ন গোত্রের; তাই আদিম যুগে ছিলো নারীর আধিপত্য। নারীরা তখন বিচ্ছিন্ন ছিলো না শ্রম থেকে, শ্রমই তাদের সত্যিকার মর্যাদার আসনে বসাতো; তারা আধুনিক সুবিধাভোগী শ্রেণীর শ্রমবিচ্ছিন্ন নারীদের মতো অসার আরাম আর মর্যাদা ভোগ করতো না।

সমষ্টি বিয়েতে এক নারীর ছিলো বহু পতি, পরে তা একপতিতে সমাপ্তি পায়। পাতিব্রত্য এখন গুণ, কিন্তু একপতিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার প্রথম দিকে পাতিব্রত্য হয়ে ওঠে নারীর অপরাধ; আর এ-অপরাধের জন্যে প্রায়শ্চিত্তও করতে হয় নারীদের। এটা নেয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আত্মদানের রূপ, নারীদের বিশেষ সময়ের জন্যে স্বামী ছাড়া অন্যদের দান করতে হয় দেহ। ব্যাবিলনের নারীদের বছরে একবার দেহদান করতে হতো মিলিট্টার মন্দিরে. মধ্যপ্রাচ্যের নানা উপজাতির মেয়েদের কয়েক বছর দেহদানের জন্যে পাঠানো হতো আনাইটিসের মন্দিরে। পরে প্রায়শ্চিত্তমূলক দেহদানের সময় কমানো হয়। বাখোফেন বলেছেন : 'বৎসরে একবার করে আত্মদানের বদলে মাত্র একবার আত্মদান চালু হয়, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের হেটায়ারিজমের (গণিকাবৃত্তি) জায়গায় দেখা দেয় কুমারীদের হেটায়ারিজম, বিবাহিত অবস্থায় তার আচরণের বদলে বিবাহের পূর্বে আচরণ, সকলের কাছে নির্বিচারে আত্মদানের বদলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে আত্মদান' [দ্র এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২০৮)]। ভূমধ্যসাগর থেকে গঙ্গার কূল পর্যন্ত ধর্মের আবরণে, এবং কোনোকোনো জাতির মধ্যে ধর্মের আবরণ ছাড়াই চলে এ-প্রথা। পুরোনো দিনের থ্রেসিয়ান, কেল্টিক, ভারতের বহু আদিম অধিবাসী, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার অনেক আদিবাসীদের মধ্যে মেয়েরা বিয়ের আগে ভোগ করতো প্রচুর যৌনস্বাধীনতা। কোনোকোনো জাতির মধ্যে বরের বন্ধু বা আত্মীয়রা বা বরযাত্রীরা বিয়ের রাতেই কনের দেহের ওপর খাটাতো নিজেদের সনাতন অধিকার, সবশেষে আসতো বরের পালা। পুরাকালে এর চল ছিলো বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে, ও আফ্রিকার অগিলাদের মধ্যে। কোনোকোনো জাতির মধ্যে কনের ওপর 'প্রথম রাত্রির অধিকার' উপভোগ করতো গোত্রপ্রধান, কাসিক, শামান, পুরোহিত, রাজপুত্র ইত্যাদি বরেণ্যরা। বাঙলায়ও একসময় ছিলো এ-প্রথা, যার নাম *গুরুপ্রসাদী*; এতে গুরু বা পুরোহিত মোচন করতো বধুর কৌমার্য। গুরুর প্রসাদগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর বরের

ভাগ্যে জুটতো নববধুর দেহপ্রসাদ।

ক্রমে ক্রমে সম্পদ বাড়তে থাকে, আর সম্পদই শত্রু হয়ে দেখা দেয় নারীদের। পুরুষ যখন জমির মালিক হয়, সে তখন নারীর মালিকানাও দাবি করে। জমি আর নারী পুরুষের কাছে এক। আরণ্যপর্ব থেকে মানুষ যখন পৌঁছোয় কৃষিপর্বে তখন সম্পদশালী হয়ে ওঠে বিভিন্ন গোত্র। একসময় ওই সম্পদ অধিকারে চ'লে আসে গোত্রপতিদের; তারা হয়ে ওঠে সম্পদশালী। আগে, মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী, গোত্রের কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তি পেতো গোত্রভুক্তরা। সম্পদ যতো বাড়তে থাকে পরিবারে নারীদের থেকে গুরুত্ব বাড়তে থাকে পুরুষদের, এবং পুরুষেরা উদ্যোগ নেয় উত্তরাধিকারের সূত্র বদলানোর। পুরুষ মাতৃধারার প্রথা ভেঙে সৃষ্টি করে পিতৃধারার প্রথা। এটা এক বিপ্লব, কিন্তু এ-বিপ্লবে কোনো রক্তপাত ঘটে নি; নীরবেই সম্পন্ন হয় পুরুষের অভ্যুত্থান। স্থির হয় পুরুষের সন্তানসন্ততি হবে তার গোত্রভুক্ত, নারীর সন্তানেরা বাদ পড়বে গোত্র থেকে, অন্তর্ভুক্ত হবে পিতার গোত্রের। এভাবে উচ্ছেদ হয় মায়েদের দিক দিয়ে বংশপরম্পরার হিশেব ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার; তার স্থানে আসে পিতার দিক থেকে বংশপরম্পরার হিশেব ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার। ঠিক কখন এ-বিপ্লব ঘটেছিলো, অভ্যুত্থান ঘটেছিলো পুরুষের, এবং কীভাবে ঘটেছিলো, তা আজ বলার উপায় নেই, কিন্তু এটা সত্য যে মানুষ প্রজাতির মধ্যে পুংলিঙ্গের উত্থানে অধিকার হারিয়েছিলো স্ত্রীলিঙ্গ। মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদকে এঙ্গেলস বলেছেন 'স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়', যার ভার এখনো বইছে নারী। সত্যিই কি একসময় একটা আশ্চর্য সোনালি যুগ ছিলো নারীদের, যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো পুরুষের অভ্যুত্থানে? বাখোফেন এতে বিশ্বাস করেন, তাঁর অনুসরণে এতে বিশ্বাস করেন এঙ্গেলস; কিন্তু দ্য বোভোয়ার মনে করেন নারীদের ওই সোনালি যুগ একটি সুন্দর কিংবদন্তি। তাঁর মতে সমাজ সব সময়ই পুরুষের, রাজনীতিক শক্তিও সব সময় ছিলো ও আছে পুরুষের মুঠোতে। তবে বাখোফেন নারীর সোনালি দিনের, পুরুষতন্ত্রের অভ্যুত্থানের যে কথা বলেছেন, তা তাঁর কল্পনা নয়; তিনি পুরুষের অভ্যুত্থানের কিছু চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন পুরাণে ও সাহিত্যে।

কখন ঘটে এ-অভ্যুত্থান? সম্ভবত এটা ঘটে যখন জানা হয়ে যায় পিতৃত্বের রহস্য। আগে মনে করা হতো নারীদের গর্ভে দৈবপ্রক্রিয়ায় পুনরায় শিশু হয়ে জন্ম নেয় পূর্বপুরুষেরা; কিন্তু পিতৃত্বের রহস্য যখন জানা হয়, যখন পুরুষ বুঝতে পারে সন্তান জন্ম দেয়ায় রয়েছে তার ভূমিকা, তখন পুরুষ প্রজননে নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার ক'রে নিজের ভূমিকাকেই গুরুত্বপূর্ণ ব'লে ঘোষণা করে। পিতৃত্বের রহস্যটি যখন জানা হয়, তখনই ঘটে পুরুষতান্ত্রিক বিপ্লব। বাখোফেন এর পরিচয় দেখতে পেয়েছেন এস্কিলুসের *অরেসতেইয়া* ত্রিনাটকে। এ-ত্রিনাটকের তৃতীয়টির নাম *অয়মেনিদেস* [সুভাষিত অর্থ : *দয়াবতী দেবীগণ*, আসলে বোঝায় *প্রতিহিংসার দেবীগণ*], যাতে রূপায়িত হয়েছে জয়ী পিতৃতন্ত্র ও পরাজিত মাতৃতন্ত্রের শেষ রাজনীতিক সংঘর্ষ। ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে বিজয়ী সেনাপতি আগামেমনন, সাথে নিয়ে এসেছে অনেক নারীর মধ্যে ট্রয়ের রাজকন্যা কাসান্দ্রাকে, ধর্ষণেধর্ষণে যে পাগল হয়ে গেছে। ফেরার পর এ-বিজয়ী বীরকে

হত্যা করে তার স্ত্রী ক্লাইতেমনেস্ত্রা। হত্যার পেছনে রয়েছে দুটি কারণ; স্বামীর দশ বছরের অনুপস্থিতির সময় সে একটি দয়িত পেয়েছে, এবং সে তার কন্যা ইফিজিনিয়ার হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়।ট্রয়যাত্রার আগে আগামেমনন কন্যা ইফিজিনিয়াকে একিলিসের সাথে বিয়ে দেয়ার কথা ব'লে নিয়ে বলি দেয় দেবতার উদ্দেশে, যাতে দেবতার বরে অনুকূল বায়ুতে সে যেতে পারে ট্রয়ে। পরে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অরেসতেস খুন করে মা ক্লাইতেমনেস্ত্রাকে। কিন্তু মাকে খুন ক'রে অরেসতেস রুষ্ট করে প্রতিহিংসার দেবীদেব, যারা তাকে তাড়িয়ে ফেরে শহর থেকে শহরে।

প্রতিহিংসার দেবী কারা? তারা আর কেউ নয়, তারা মাতৃতন্ত্র বা মাতৃ-অধিকারের পরাভূত শক্তিরাশি, যারা এখন পরিণত হয়েছে কলহপরায়ণ নারীতে। তারা যখন চিৎকার ক'রে অরেসতেসের শাস্তি চায়, তখন তাদের চিৎকারে শোনা যায় মাতৃ-অধিকারের শেষ দাবি। অরেসতেস তাদের জানায় তার কোনো দোষ নেই, অ্যাপোলোর নির্দেশেই সে মাতৃহত্যা করেছে। দৈববাণীর দেবতা এমন নির্দেশ দেবে, এটা তাদের বিশ্বাস হয় না; তাই তারা বিচারের জন্যে অ্যাথেনাকে মধ্যস্থ মানে। অরেসতেস জানতে চায় তারা কেনো স্বামীঘাতক ক্লাইতেমনেস্ত্রাকে তাড়া করে নি? তারা উত্তর দেয় : 'যে-পুরুষকে সে করেছে হত্যা তার সাথে ছিলো না তার রক্তের সম্পর্ক।' এতে প্রকাশ পায় মাতৃ-অধিকারের ন্যায়। অরেসতেস প্রশ্ন করে : 'কিন্তু আমি কি আমার মায়ের?' এ-প্রশ্নে ক্ষুব্ধ হয় দেবীরা; কিন্তু অ্যাপোলো সত্যকে অস্বীকার ক'রে, পিতৃতান্ত্রিক দাপটে, জানায়, 'মা ছাড়াও পিতা পারে জন্ম দিতে'। সে প্রমাণ হিশেবে দাঁড় করায় অ্যাথেনাকে, যার জন্ম হয়েছিলো পিতা জিউসের মাথা থেকে। অ্যাথেনা উঁচু গলায় ঘোষণা করে পুরুষতন্ত্রের জয়। প্রতিহিংসার দেবীরা 'হে মাতা, হে অন্ধকার' ব'লে কান্নায় ভেঙে পড়ে। হেরে যায় আগের উর্বরতার দেবীরা. সেখানে দেখা দেয় পুরুষ দেবতারা; মাতৃতন্ত্রকে উচ্ছেদ ক'রে প্রতিষ্ঠা পায় পিতৃতন্ত্র। পুরুষের জয় ঘোষিত হয় দিকেদিকে, এবং হাজার হাজার বছরে কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি। নারী হয়ে থাকে মানুষপ্রজাতির পরাভূত লিঙ্গ।

আগে নারী ছিলো গৃহের প্রধান; মাতৃ-অধিকার উচ্ছেদের পর পুরুষ দখল করে গৃহের কর্তৃত্ব। পুরুষ নারীকে করে নিজের দাসী, শৃঙ্খলিত, লালসার শিকার ও সন্তান (বিশেষ ক'রে পুত্র) উৎপাদনের যন্ত্র। দেখা দেয় পিতৃপ্রধান একপতিপত্নী পরিবার। আরো দুটি প্রথা ছিলো বিয়ের, এর একটি এখনো টিকে আছে মুসলমানদের মধ্যে। একটি বহুপত্নীত্ব ও অন্যটি বহুস্বামীত্ব। বহুপত্নীত্ব হচ্ছে সম্ভোগের চরম রূপ। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে ও তিব্বতে বহুস্বামীত্বও এক সময় ছিলো, হয়তো এখনো আছে। এখন চলছে, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, একপতিপত্নী প্রথা; কিন্তু একপতিপত্নী প্রথার সূচনা হয় কখন, এবং কাদের উদ্যোগে? বাখোফেন বলেছেন, তার কথিত 'হেটায়ারিজম' থেকে চালু হয়েছিলো একপতিপত্নীপ্রথা নারীদেরই চেষ্টায়। তাঁর মতকে এঙ্গেলস বলেছেন 'সম্পূর্ণ নির্ভুল'। এ-বদলের কারণ ব্যাখ্যা ক'রে এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২১০) বলেছেন যে আর্থনীতিক বিকাশের ফলে আদিম সাম্যতন্ত্রী ব্যবস্থার ঘটে অবনতি,

আগের যৌনসম্পর্কগুলো আরণ্যক চরিত্র হারিয়ে নারীদের কাছে মনে হতে থাকে হীন ও পীড়নমূলক, তাই 'আগ্রহের সঙ্গে পরিত্রাণ হিসাবে তারা অবশ্য পাতিব্রত্যের অধিকার, একটি পুরুষের সঙ্গে অস্থায়ী বা স্থায়ী বিবাহ চেয়ে থাকবে।' এঙ্গেলস মনে করেন এ-অগ্রগতি পুরুষ চাইতে পারে না, কেননা পুরুষ 'আজও পর্যন্ত স্বপ্নেও কখনও আসল সমষ্টি-বিবাহের সুবিধা ছাড়তে চায় নি।' নারীরাই চেয়েছিলো পাতিব্রত্য, বহুযৌনসম্পর্ক নারীদের কাছে মনে হয়েছিলো পীড়াদায়ক, এবং তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নারীরা চেয়েছিলো একপতির পবিত্র শয্যায় সতীত্বের অধিকার? সমষ্টি বিয়ে পুরুষের জন্যে সুবিধাজনক, নারীদের জন্যে অসুবিধাজনক? মিলেট (১৯৬৯, ১১৬) এঙ্গেলসের সিদ্ধান্তে দেখেছেন 'অ্যাবসারডিটি'; কেননা এঙ্গেলস ধ'রে নিয়েছেন যে নারীরা কাম অপছন্দ করে। হাজার হাজার বছর ধ'রে পুবপশ্চিমের ঋষিরা রটিয়েছেন নারীরা কামচণ্ডালী, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* (২৩:৩২) বলেছে 'পুরুষের থেকে নারীদের কাম আটগুণ', সন্তরা বলেছেন জরায়ুর ক্ষুধা আগুনের মতোই অশেষ ; আর এঙ্গেলস ধ'রে নিয়েছেন কাম নারীদের কাছে পীড়াদায়ক, অপ্রিয়। সঙ্গমকে তিনি হয়তো মনে করেছিলেন নারীর একধরনের রাজনীতিক পরাজয়, কেননা নারী যেনো তাতে আত্মসমর্পণ করে পুরুষের কাছে; এবং তাঁর ভিক্টোরীয় মানসিকতাও কাজ করেছিলো এর পেছনে। ওই সময়ে এমন একটি ধারণা তৈরি, প্রচার ও জনপ্রিয় ক'রে তোলা হয়েছিলো যে নারী কামকে ঘেন্না করে, কাম নারীর প্রিয় নয়। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভিক্টোরীয় সংস্কৃতি নারীকে কামবোধহীন ক'রে তুলেছিলো, শীতল নারীকেই তারা মনে করতো সতী; তাই সে-সময় নারীরা শীতল হয়ে উঠেছিলো; কিন্তু কাম নারীদের কাছে অপ্রিয় নয়। নারীদের কামপ্রবলতা সম্পর্কে প্রাচীন উপাখ্যানের শেষ নেই : *মহাভারত*-এ একটি উপাখ্যান রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে পুরুষদের থেকে নারীরাই সঙ্গম উপভোগ করে বেশি। রাজর্ষি ভঙ্গাসন ইন্দ্রের ক্রোধে নারীতে পরিণত হয়, এবং এক তাপসের ঔরষে নিজের গর্ভে একশো পুত্র জন্ম দেয়। পরে ইন্দ্র তাকে পুরুষত্ব ও নারীত্বের মধ্যে একটি বেছে নিতে বললে সে নারীই থাকতে চায়। কারণ হিশেবে সে বলে, 'স্ত্রীপুরুষের সংযোগকালে স্ত্রীরই অধিক সুখ হয়।' ভঙ্গাসনের মতো নারীপুরুষ দু-রূপেই অভিজ্ঞতা অর্জন এখন অসম্ভব, কিন্তু মিলনের সময় নারীর আচরণ দেখে মনে হ'তে পারে কাম উদ্ভাবিতই হয়েছিলো নারীর জন্যে। কাম পুরুষের একটি প্রত্যঙ্গের, আর নারীর সমগ্র শরীর ও চৈতনার ব্যাপার। আধুনিক গবেষণা তাই প্রমাণ করেছে।

আধুনিক গবেষণা দেখিয়েছে সহজাত ও জৈবিকভাবে নারী পুরুষের থেকে অনেক বেশি উপভোগ করে কাম : পৌনপুনিকতায় ও পুলকানুভূতিতে নারী অনেক বেশি সমর্থ পুরুষের থেকে। মাস্টারস ও জনসন সাড়াজাগানো *মানুষের যৌন সাড়া* (১৯৬৬) গ্রন্থে দেখিয়েছেন নারী খুব দ্রুত একের পর এক পুলক অনুভব করতে পারে, যা পুরুষ কখনো পারে না। নারীর পুলক সম্পর্কে ধারণাও বদলে গেছে একালে। আগে শুধু রন্ধ্রটিকেই সুখের খনি মনে করা হতো; কিন্তু নারীর আসল সুখের বেদি ভগাঙ্কুর। মানুষের অন্য কামাঙ্গগুলোর আরো কাজ আছে, কিন্তু নারীরই শুধু রয়েছে একটি বিশেষ প্রত্যঙ্গ যার

একমাত্র কাজ যৌনসুখ অনুভব। সেটি ভগাঙ্কুর। পুরুষের এমন কোনো প্রত্যঙ্গ নেই। পুরুষের যৌনশক্তি সীমিত, নারীর অমিত, তাতে শুধু বাধা দিতে পারে শারীরিক ক্লান্তি বা মানসিক অবস্থা। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীকে ও তার কামকে দমন ক'রে রেখেছে নানা বিধিনিষেধে; এবং পুরুষের কামকে ক'রে তুলেছে নিবৃত্তিহীন। পুরুষতন্ত্র পুরুষের কামশক্তির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করেছে বহুবিবাহ ও দ্বৈতমানের সুযোগ। এটা জৈব সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ। পুরুষতন্ত্র ভোগে স্ববিরোধিতায়ও : পুরুষতন্ত্র নারীকে কামসামগ্রীতে পরিণত করতে চায়, আবার চায় যে নারী হবে কামবিমুখ। মুসলমান দেশগুলোতে এটা প্রবল; ওই দেশের পুরুষেরা চায় স্বামীদের শয্যায় নারীরা হবে মেরেলিন মনরো, শয্যার বাইরে হবে সতীসাধ্বী বিবি। এঙ্গেলসের ধারণা ঠিক নয় যে নারীরাই চেয়েছিলো একপতির অধীনে পতিব্রতা হয়ে থাকতে, কেননা কাম তাদের কাছে পীড়াদায়ক। পুরুষই চেয়েছিলো, তাই এটা হয়েছে; যদি নারী চাইতো আর পুরুষ না চাইতো, তাহলে কখনো এটা ঘটতো না। পুরুষ নারীকে ক'রে তুলেছিলো তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, আর ওই সম্পত্তিতে ভাগ বসাক অন্য কেউ, এটা তারা চায় নি। তারা নিজেদের জন্যে রেখেছে বহুবিবাহ, বা বহুনারীসংসর্গের সুযোগ; আর নারীকে ক'রে রেখেছে একজনের একান্ত ভোগ্যবস্তু। নারী বহু কাল ধ'রে বাধ্য হয়ে যুগিয়ে আসছে পুরুষের কামতৃপ্তি এবং পশুর মতো প্রসব ক'রে আসছে মনুষ্যশাবক।

বর্বরতার মধ্য স্তর থেকে শেষ স্তরে ওঠার সময় জোড়বাঁধা বিয়ে থেকে উদ্ভব ঘটে একপতিপত্নী বিয়ের। সভ্যতার সূচনার সময় একপতিপত্নী বিয়েই রীতি হয়ে ওঠে। এর ভিত্তি পুরুষাধিপত্য, লক্ষ্য সুনিশ্চিত পিতৃত্বে সন্তান উৎপাদন। তখন বাপই সমস্ত সম্পত্তির মালিক; আর বাপ এমন কাউকে সম্পত্তি দেবে না, যে তার ঔরষে জন্ম নেয় নি : বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে সন্তান, বিশেষ ক'রে পুত্র। এ-বিয়েতে স্বামীস্ত্রীর খেয়ালে বিয়ে ভাঙা সম্ভব নয়, তবে স্বামী তা পারে বেশ সহজে। এ-বিয়েতে দাম্পত্যজীবনে পুরুষের বিশ্বাসভঙ্গের অধিকারও থাকে খুবই বেশি; কিন্তু নারীর কোনো অধিকার থাকে না। এমন একপতিপত্নী পরিবারের কঠোর রূপ দেখা দেয় গ্রিকদের মধ্যে। সেখানে পুরোনো দেবীদের যে-প্রতিষ্ঠা, তা থেকে বোঝা যায় নারীরা তখন সম্মানিত ছিলো, কিন্তু বীরযুগে পতন ঘটে নারীদের অবস্থার। তখন দেখা যায় পুরুষেরা বিয়ের বাইরে যৌনসম্পর্ক রাখছে, কিন্তু নারীরা বাধ্য হচ্ছে কঠোর সতীত্ব বা পাতিব্রত্য পালন করতে। সভ্যতার যুগে নারী হয়ে ওঠে পুরুষের বৈধ উত্তরাধিকারীর জননী, তার প্রধান গৃহকর্ত্রী, দাসীদের প্রধান। স্বামীরা দাসীদের নিয়মিত সম্ভোগ করতো, বাইরে গণিকা উপভোগ করতো; কিন্তু স্ত্রীদের থাকতে হতো আপাদমস্তক সতী। তাই একপতিপত্নী বিয়ে নির্মমভাবে সত্য হয় শুধু নারীর জন্যে, পুরুষের জন্যে নয়। ডেমোসথেনেস বলেছেন, 'চেতনার সুখের জন্যে আমাদের আছে গণিকা, ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে রক্ষিতা, এবং পুত্রলাভের জন্যে স্ত্রী' [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ১১৯)]। পুরোনো ভারতে পুরুষ বিয়ে করতো বহু, তার ওপরে ছিলো বিচিত্র ধরনের বেশ্যা, যাদের শ্রেষ্ঠ ছিলো 'গণিকা'। বাৎস্যায়ন লিখেছেন, 'চৌষট্টিকলায় উৎকর্ষ লাভ ক'রে শীল, রূপ ও গুণান্বিতা বেশ্যা 'গণিকা' সংজ্ঞা লাভ করে এবং গুণগ্রাহীদের সমাজে স্থান

লাভ করে। রাজা সর্বদা তাকে সম্মান করেন, গুণবানেরা তার স্তুতি করেন এবং সে সকলের প্রার্থনীয়া, অভিগম্যা ও লক্ষীভূতা হয়ে থাকে' [*কামসূত্র* : দ্র মহেশচন্দ্র (১৯৮০)]। কিন্তু স্ত্রীরা রাজা কেনো স্বামীদের কাছেও সম্মানিত ছিলো না।

একপতিপত্নী বিয়ে দেখা দেয় নি নারীপুরুষের সদ্ভাবের ফলে, বা বিয়ের একটি আদর্শ রূপ হিশেবে। এটি দেখা দিয়েছিলো নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যরূপে; এবং এখনো তাই আছে। এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২২২) বলেছেন, 'ইতিহাসে শ্রেণীবিরোধ প্রথম যা দেখা দেয় সেটা মিলে যায় একপতিপত্নী বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিরোধের বিকাশের সঙ্গে এবং প্রথম শ্রেণীপীড়ন মেলে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির ওপর পীড়নের সঙ্গে।' একপতিপত্নী বিয়ে অগ্রগতি, কিন্তু পেছনে ফেরাও, কেননা এর ভিত্তি নারীর ওপর পুরুষের শোষণ। পবিত্র একপতিপত্নী বিয়ের সাথে দেখা দেয় দুটি অপবিত্র ব্যাপার, যা আগে ছিলো না; একটি গণিকাবৃত্তি, অন্যটি ব্যভিচার। গণিকাবৃত্তির শুরু হয়েছিলো প্রায়শ্চিত্তমূলক দেহদানে, যখন নারীরা প্রণয়দেবীর মন্দিরে অর্থের বিনিময়ে আত্মদান ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতো সতীত্বের। অর্থ জমতো মন্দিরের কোষে। আর্মেনিয়ার আনাইটিসের মন্দির ও করিন্থের আফ্রোদিতির মন্দিরের পরিচারিকারা ও ভারতের মন্দিরের দেবদাসীরা ছিলো প্রথম গণিকা। সম্পত্তির বৈষম্য শুরু হওয়ার পর ক্রীতদাসীরা যখন বাধ্য হয় প্রভুকে দেহদানে, তখন শুরু হয় স্বাধীন নারীদের পতিতাবৃত্তি। স্বামীরা পতিতা সম্ভোগ করতো, তাতে কোনো বাধা ছিলো না; কিন্তু স্ত্রীরা ছিলো অবহেলিত। স্ত্রীরা শুধু চোখ বুজে দেখে যাবে স্বামীদের লাম্পট্য, থাকবে সতীসাধ্বী, এটা আশা করা যায় না; তারাও যে হাত বাড়াবে নিষিদ্ধ গন্ধমের দিকে, এটাই স্বাভাবিক। তাই দেখা দেয় একটি নতুন প্রপঞ্চ, যার নাম স্ত্রীর উপপতি; শুরু হয় নারীর ব্যভিচার। একপতিপত্নী বিয়ের মধ্যে স্বামীর দিক থেকে থাকে গণিকাসম্ভোগ, আর স্ত্রীর দিক থেকে থাকে, এঙ্গেলসের মতে, 'ঢালাও ব্যভিচার'। বাইবেলের হিতোপদেশ বলেছে, 'পরকীয়া স্ত্রীর ওষ্ঠ হইতে মধু ক্ষরে, তাহার তালু তৈল অপেক্ষাও স্নিগ্ধ'; এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২২৬) বলেছেন, 'মৃত্যুর মতোই ব্যভিচারের কোন চিকিৎসা নেই।' এ-বিয়ের সুখ কেমন? এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২২৬) বলেছেন, 'একপতিপত্নী বিবাহের উত্তম দৃষ্টান্তগুলির গড়পড়তা ধরলেও তা পরিণত হয় এক নিরেট একঘেঁয়েমির দাম্পত্য-জীবনে, যাকে বলা হয় দাম্পত্য সুখ।' এ-বিয়ে পরিণত হয়, এঙ্গেলসের মতে, স্থূল বেশ্যাবৃত্তিতে, বিশেষ ক'রে স্ত্রীর বেলা। স্ত্রী আর পতিতা কি এক? এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২২৭) বলেছেন, 'স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এইটুকু যে সে ফুরনের মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না, পরন্তু সে দেহটা বিক্রি করে চিরকালের মতো দাসত্বে'; এবং ফুরিয়ের [দ্র এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২২৭)] বলেছেন, 'ব্যাকরণে যেমন দুটি নেতিবাচক শব্দে একটি ইতিবাচক শব্দ হয়, তেমনই বিবাহের নীতিশাস্ত্রে দুটি বেশ্যাবৃত্তি মিলে পুণ্যধর্ম হয়ে ওঠে।' সাম্যবাদী এঙ্গেলস বুর্জোয়াদের দাম্পত্যজীবনকে পতিতাবৃত্তি মনে করলেও প্রলেতারিয়েতদের সম্পর্কে তাঁর উঁচু ধারণা ছিলো; তিনি মনে করেছেন তাদের মধ্যে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক সুস্থ হ'তে পারে। কিন্তু

এটা এক সাম্যবাদী ভ্রান্তি। প্রলেতারিয়েতদের স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক আরো অসুস্থ; তা একেবারেই শস্তা পতিতাবৃত্তি। পতিতার খদ্দের হিশেবে প্রলেতারিয়েতের থেকে বুর্জোয়া উৎকৃষ্ট।

উৎপাদন বা আর্থ ক্রিয়াকাণ্ডে যার অংশ নেই, দুরবস্থা তার কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। নারীর দুরবস্থার কারণ তাই; নারী বহুকাল ধ'রে আর্থ ক্রিয়াকলাপ থেকে নির্বাসিত হয়ে পরগাছায় পরিণত হয়েছে। নারী আর্থনীতিকভাবে শোষিত, তাই সব দিকেই শোষিত। আদিম সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালিতে নারীর ওপর অর্পিত ছিলো গৃহস্থালি, তা আজকের পরিবার সেবা ছিলো না, ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি। কিন্তু পিতৃপ্রধান পরিবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গৃহস্থালির কাজের মূল্য ক'মে যায়; বৃত্তির বদলে তা হয়ে ওঠে সেবা, যার দরকার আছে কিন্তু মূল্য নেই। সামাজিক উৎপাদনের এলাকা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্ত্রী হয়ে ওঠে প্রথম ঘরোয়া ঝি। আধুনিক পরিবার দাঁড়িয়ে আছে নারীর প্রকাশ্য বা গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ওপর; এঙ্গেলস বলেছেন, পরিবারের মধ্যে স্বামী হচ্ছে বুর্জোয়া, স্ত্রী প্রলেতারিয়েত। কারণ বিত্তবান শ্রেণীগুলোতে পুরুষ উপার্জন করে, নারী কোনো কিছু উপার্জন করে না; তাকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়া হয়েছে যাতে সে হয়ে উঠেছে আপাদমস্তক অপদার্থ। ধনী শ্রেণীগুলোতে নারীদের ক'রে তোলা হয়েছে অপদার্থতার প্রতিমূর্তি; পুরুষের বিনোদ যোগানোর বেশি আর কিছু তারা করতে পারে না। মানুষের হাতেপায়ে শেকল পরানো সহজ, কঠিন হচ্ছে শেকলমুক্ত করা; আর ওই শেকল যদি সুবিধাজনক হয়, তবে মানুষ মুক্তির চেয়ে শেকলকেই বেশি প্রিয় মনে করে। এটা ঘটেছে বুর্জোয়া নারীদের বেলা; তারা কারুকার্যখচিত শেকলকেই বরণ ক'রে নিয়েছে। ওই শেকল তাদের স্বাধীনতা ও সম্মান হরণ করেছে, কিন্তু নানা সুবিধা এনে দিয়েছে ব'লে শেকলে তারা নিজেদের আরো শক্ত ক'রে বেঁধে রাখতে চায়। একপতি-পত্নী বিয়েতে নারী সব স্বাধীনতা হারিয়েছে, দাসী হয়ে উঠেছে; তার সমষ্টি বিয়ের যৌন স্বাধীনতা হারিয়েছে, কিন্তু পুরুষ সমষ্টি বিয়ের সুবিধা হারায় নি। পুরুষদের জন্যে আজো রয়ে গেছে সমষ্টি বিয়ে। মুসলমানেরা বহু বিয়ে করতে পারে, মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় সবাই বহু বিয়ে ক'রে থাকে; এবং পৃথিবী জুড়েই পুরুষেরা উপভোগ করে বিয়ের বাইরে জাঁকালো যৌনসম্পর্ক। নারীর পক্ষে যা মারাত্মক অপরাধ, পুরুষের বেলা তা অনেক সময় গৌরবের বা আনন্দের সাথে উপভোগ্য নিন্দার ব্যাপার। একই পুরুষের অধিকারে প্রচুর সম্পত্তি জড়ো হওয়ার ফলে, এবং তার সন্তানসন্ততিকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার বাসনা থেকে উদ্ভূত হয় একপতিপত্নী বা একপতি-একাধিক পত্নী বিয়ে;– সম্পূর্ণ পুরুষের স্বার্থে। এজন্যে নারীর পক্ষে একপতিত্ব বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্যে নয়।

এঙ্গেলস পিতৃতান্ত্রিক বিয়ে ও পরিবারের উদ্ভব ও প্রকৃতির যে-ব্যাখ্যা দেন, তা বিপ্লবাত্মক; কেননা তিনি দেখান যে এর কোনোটিই শাশ্বত নয়। যা বহুকাল ধ'রে চ'লে এসেছে, তাই যে চিরকাল চলবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। পিতৃতান্ত্রিক বিয়ে, পরিবার ও আর সমস্ত কিছু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত-বিবর্তিত হয়েছে, এখনো

বিবর্তন চলছে; এমনকি এর আমূল পরিবর্তনও ঘটানো অসম্ভব নয়। তিনি দেখান যে পিতৃতান্ত্রিক বিয়ে ও পরিবার গ'ড়ে উঠেছে নারীকে পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত করে। নারীশোষণই পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি, যার সাথে যুক্ত আরো নানা ধরনের শোষণ। এ-সমস্ত শোষণের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে রাষ্ট্র, যার কাজ বিচিত্র ধরনের শোষণ ও বৈষম্যকে বৈধ ক'রে তোলা। তাই সমস্ত মানবিক বৈষম্যের মূলে রয়েছে পুরুষাধিপত্য ও নারীর অধীনতা, লৈঙ্গিক রাজনীতির ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থ সংগঠন। এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২২২) বলেছেন :

> ইতিহাসে শ্রেণী-বিরোধ প্রথম যা দেখা দেয় সেটা মিলে যায় একপতিপত্নী বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিরোধের বিকাশের সঙ্গে এবং প্রথম শ্রেণী পীড়ন মেলে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির ওপর পীড়নের সঙ্গে। একপতিপত্নী বিবাহ ইতিহাসের একটি বড় অগ্রসর পদক্ষেপ, কিন্তু সেই সঙ্গেই দাসপ্রথা ও ব্যক্তিগত সম্পদসহ তা এমন এক যুগের পত্তন করে যা আজও পর্যন্ত চলছে এবং যাতে প্রত্যেকটি অগ্রগতিই হচ্ছে সেই সঙ্গে একটা আপেক্ষিক পশ্চাদগতি, যেখানে জনসমষ্টির একাংশের সচ্ছলতা ও উন্নতি হয় অপর এক অংশের দুঃখ ও পীড়নেব মধ্য দিয়ে। একপতিপত্নী বিবাহ হচ্ছে সভ্য সমাজের কোষ-রূপ, এখানে আমরা সেই সব বৈরিতা ও বিরোধের প্রকৃতি লক্ষ্য কবতে পারি যেগুলি শেষোক্তের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

বৈরিতা ও বিরোধের ভিত্তির ওপর যা দাঁড়িয়ে আছে, তা কি ধ'সে পড়বে না? এঙ্গেলস স্বপ্ন দেখেছেন এক শোষণহীন সমাজের; তাই যে-আর্থনীতিক শোষণের ওপর দাঁড়ানো একপতিপত্নী বিয়ে ও পরিবার, যদি সে-শোষণ চ'লে যায়, তবে কি থাকবে এ-বিয়ে ও পরিবার? এর চমকপ্রদ উত্তর দিয়েছেন এঙ্গেলস; বলেছেন, 'এই প্রথা লোপ না পেয়ে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই।' ওই সমাজে সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে আবার ফিরে আসবে নারী-এটাই তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত; এবং ওই সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলো হবে সমাজের সম্পত্তি, সেখানে কেউ সুবিধাভোগী কেউ সর্বহারা হবে না। তাই নারী হবে স্বাধীন, সেখানে পতিতা থাকবে না কেউ; এবং একপতিপত্নী প্রথা সত্য হয়ে উঠবে পুরুষনারী উভয়ের জন্যে। পরিবারের রূপ থাকবে না এখনকার মতো, এখন পরিবার হচ্ছে সমাজের অর্থনীতির একক, এঙ্গেলসের সমাজে তা হবে না। সেখানে 'ব্যক্তিগত গৃহস্থালি পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে।' শিশুপালন ও শিক্ষা হবে সামাজিক ব্যাপার, বিয়ে বা বিয়ের বাইরে যেভাবেই জন্ম হোক শিশুর, পুরো সমাজ নেবে তার দায়িত্ব, সে হবে সমাজের সন্তান। একপতিপত্নী বিয়েকে শুদ্ধ পবিত্র স্বর্গীয় ক'রে তোলা এঙ্গেলসের লক্ষ্য নয়; তার লক্ষ্য নারীর ওপর পুরুষের শোষণ এবং সার্বিক শোষণ দূর করা। তা কিছুতেই বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সম্ভব নয়। আমাদের উগ্র পুরুষতান্ত্রিক, মধ্যযুগীয়, দরিদ্র, অশিক্ষিত সমাজে নারীশোষণ বন্ধ করা বিশেষভাবেই কঠিন; নারীর মুক্তি তো সুদূর ব্যাপার। এখানে একটি ভালো বিয়েকেই নারীর জীবনের পরম সাফল্য ব'লে গণ্য কবা হয়; এর বেশি এখনো ভাবা হয় না; বরং মুক্তিকে মনে করা হয় বিপজ্জনক ও ব্যর্থতা। পশ্চিমের নারীবাদীরা এঙ্গেলসকেও ছাড়িয়ে গেছেন; তাঁরা একপতিপত্নী বিয়ের পবিত্রতাকে বিশেষ মূল্যবান মনে করেন না, তারা নারীর সামাজিক-আর্থ-যৌন সব ধরনের মুক্তি চান। গত তিন দশকে পশ্চিমের

নারীবাদীরা বদলে দিয়েছেন তাঁদের সমাজের বহু এলাকা; এবং যৌন এলাকায় যে-পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তাকে বিপ্লব বলা যায়। তবে পৃথিবী এখনো পুরুষের, নারী এখনো পরাজিত, বন্দী। নারীর মুক্তির জন্যে দরকার বড়ো ধরনের সামাজিক বিপ্লব; যতোদিন ওই বিপ্লব না ঘটে ততোদিন নারী থাকবে পুরুষের অধীনে, থাকবে দাসী ও যৌনসামগ্রী।

পিতৃতন্ত্রের খড়্গ : আইন বা বিধিবিধান

পিতৃতন্ত্র প্রণয়ন করেছে বিপুল পরিমাণ আইন বা বিধিবিধান, যার এক নৃশংস অংশ সুপরিকল্পিতভাবে বানানো হয়েছে নারীদের পীড়নের জন্যে। পিতৃতন্ত্রের আইনসংশ্রয়টি তার বলপ্রয়োগ সংস্থা, যার বিধিগুলো এক বহুমুখি হিংস্র খড়্গ, যা নারীর জীবনের দিকে উদ্যত হয়ে আছে কয়েক হাজার বছর ধ'রে, এবং ওই খড়্গের ধারাবাহিক বলি নারী। ওই বিধিগুলো তৈরি করেছে পুরুষ, তৈরির সময় নারীর কোনো বক্তব্য শোনে নি; নারী সম্পর্কে প্রথম থেকে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরুষ, তার শাস্তির সব বিধি প্রণয়ন করেছে নারীবিরোধী পুরুষতন্ত্র। পুরুষ নিজে প্রণয়ণ করেছে ওই নিষ্ঠুর সংহিতাগুলো, নারীকে স্থান দিয়েছে দণ্ডিতের শ্রেণীতে; ওই বিধিগুলোকে প্রচার করেছে ঐশী ব'লে। পুরুষ তার পুরুষ বিধাতার হাতে লিখিয়ে নিয়েছে নিজের রচনা; বিধাতা হয়ে উঠেছে পুরুষের প্রস্তুত বিধানের শ্রুতিলিপিকর। পুরুষ একই সাথে নারীর বিরুদ্ধে বাদী, বিধিরচয়িতা ও বিচারক; নারীর তাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারও নেই। পলাঁ দ্য লা বার বলেছেন, 'পুরুষেরাই প্রণয়ন করেছে সমস্ত আইন, তাই তারা পক্ষপাত দেখিয়েছে নিজেদের লিঙ্গের প্রতি, আর বিচারকেরা ওই সমস্ত বিধিবিধানকে উন্নীত করেছে নীতির স্তরে' [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ২২)]। পুরুষ জানে তার তৈরি বিধি নারীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, নারী মেনে নেবে না ওই দণ্ডাদেশ; তাই পুরুষ সেগুলোকে ঘোষণা ক'রেছে ঐশী, এবং পুরুষাধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের স্বর্গীয় শাশ্বত অধিকার ব'লে। পুরুষের লেখা বিধিবিধানে নারী চিরদণ্ডিত। পৃথিবীর নারীসমাজ এখন প্রধানত পাঁচ ধরনের আইনের অধীনে জীবনদণ্ড ভোগ করছে, যার মাঝে চারটিকে বলা যায় সনাতন, যেগুলোর উৎস ধর্ম : হিন্দু আইন, ইংরেজি সাধারণ আইন [*ইংলিশ কমন ল*], রোমান আইন [*রোমান ল*], ইসলামি আইন [*শরিয়া*]; আর পঞ্চম ধরনের আইনগুলো প্রণীত হয়েছে এ-শতকে, যেগুলো চলছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে। পুরোনো সমস্ত আইন নারীকে পীড়নের জন্যেই তৈরি করা হয়েছিলো, ওগুলোর লক্ষ্য ছিলো নারীকে মানুষের স্তরে উঠতে না দেয়া; আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিধিবিধান যদিও নারীকে দিয়েছে প্রচুর স্বাধীনতা ও অধিকার, তবু নারী সেখানেও মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার পায় নি। পুরুষের তৈরি আইনে পুরুষের সুবিধার শেষ নেই, পুরুষের সুবিধার সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না; আর নারীর অসুবিধার অমারাত্রিও কখনো কাটে না। পিতৃতন্ত্রের বিধিবিধানের খড়্গের নিচে বেঁচে আছে চিরদণ্ডিত নারী।

নারীর প্রতিদিনের জীবন শৃঙ্খলিত যে-আইনের শেকলে, তা হচ্ছে ব্যবহারিক বা অধিকার বিধিগুলো [সিভিল ল], বিশেষ ক'রে বিবাহ ও পারিবারিক বিধিগুলো। এর

কিছু প্রথা হিশেবে চ'লে এসেছে, কিছু বিধিবদ্ধ হয়েছে; তবে এগুলো নারীর জীবনকে পরিণত করেছে নরকে। অধিকার আইনেই বিধিবদ্ধ হয়ে আছে নারী কখন কীভাবে বিয়ে বসতে বা করতে পারবে, কীভাবে বিয়ে ভাঙতে পারবে না বা পারবে, সন্তানের ওপর তার অধিকার কতোটা, সে কী ধরনের সম্পত্তির মালিক হ'তে পারে না বা পারে, ওই সম্পত্তির ওপর তার কতোটা অধিকার থাকবে, কী কী শর্তে সে ব্যবসাবাণিজ্যে জড়িত হ'তে পারে, বিধবা অবস্থায় সে হ'তে পারে কতোটা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, বিয়ে ভেঙে গেলে সে কতোটা ধন দাবি করতে পারে প্রভৃতি। এর সব এলাকায়ই পুরোনো আইন নারীর জন্যে ভয়াবহ, তা সাধারণত নারীর কোনো অধিকার স্বীকার করে না, যদিও এখন নানা সংস্কার করা হচ্ছে। অধিকার আইনগুলো কোনো সুসংবদ্ধ সংহত বিধি নয়, এগুলো বিচিত্র বিভীষিকাজাগানো বিধির সমষ্টি। এগুলোর ভেতরে রয়েছে নানা স্ববিরোধিতা; হয়তো সংবিধানে উচ্চকণ্ঠে নারীকে দেয়া হয়েছে পুরুষের সমান অধিকার, কিন্তু বিয়ের আইনে চুপচাপ বিধিবদ্ধ হয়েছে যে স্ত্রী স্বামীর দাসী, বা নারীকে দেয়া হয় নি ভোটাধিকার, এমনকি নিজের ইচ্ছেমতো বাইরে বেরোনোর অধিকার। নারীর আইনগত অধিকার এখনো অনেক কম পুরুষের তুলনায়। ওই পুরোনো আইনগুলো বিভিন্ন ব্যাপারে পোষণ করে বিভিন্ন বিরোধী বিশ্বাস, কিন্তু এক ব্যাপারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে গভীর ঐক্য, সেটা নারীপীড়নে; নারীপীড়নে সব বিধিই সমান নির্মম। কয়েক হাজার বছর ধ'রে এ-বিধিপুঞ্জ নারীকে যেভাবে পীড়ন করেছে, ক্রীতদাসদেরও ততোখানি পীড়ন করা হয় নি। ওই আইনে কেড়ে নেয়া হয়েছে নারীর সব মানবিক ও সামাজিক অধিকার, এমনকি নিজের শরীরের ওপর তার নিজের অধিকার। পুরুষতন্ত্রের খড়্গের নিচে নারী যাপন করেছে রক্তাক্ত জীবন, কিন্তু তাকে হাহাকার করার আইনগত অধিকারও দেয়া হয় নি।

পিতৃতন্ত্রগুলোর মধ্যে মানুষ ও নারীর বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে নিপুণ হিন্দু পিতৃতন্ত্র। অন্যরা যা করেছে বলপ্রয়োগে, হিন্দু পিতৃতন্ত্র করেছে যেনো মন্ত্রপ্রয়োগে; নিষ্ঠুরতম শোষণপীড়নকেও তারা ব্রহ্মার বিধান ব'লে গ্রহণযোগ্য ক'রে তুলেছে। হিন্দু পিতৃতন্ত্রে সমাজের অধিকাংশ মানুষই বলি; এবং নারী ওই খড়্গের নৃশংসতম বলি। যে-সমস্ত বিধি দিয়ে কয়েক হাজার বছর ধ'রে হিন্দুনারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার অধিকাংশই প্রথাগত; ওই সমাজে ঋষির পর ঋষি জন্ম নিয়েছে, ব্রহ্মার সাথে আলাপ ক'রে এসে তারা বিধান লিখেছে, এবং সবাই মিলে নারীকে ক'রে তুলেছে পুরুষের শিকার। হিন্দু বিধানগুলো নারীপীড়নের স্বর্গীয় অনুমতিপত্র। হিন্দু আইনের প্রধান উৎস বেদ; হিন্দুরা যেমন পুরুষের তৈরি সমস্ত কিছুকেই ব্রহ্মার মুখনিসৃত ব'লে প্রচার করেছে, তেমনি আইনকেও ক'রে তুলেছে ঐশ্বরিক, চিরন্তন, শাশ্বত, অবিনাশী। হিন্দু আইনের প্রথম ও প্রধান প্রণেতা মনু। মনু দাবি করেছেন যে ব্রহ্মা প্রথম আইন প্রণয়ন ক'রে তাঁকে শেখায়, এবং তিনি সে-আইন শেখান মরীচি ও অন্য ন-জন ঋষিকে [দ্র *মনুসংহিতা*, ১:৫৮]। বেদ, শ্রুতি, ভাষ্য, প্রথার সমষ্টি হচ্ছে হিন্দু আইন। হিন্দু আইনে নারীর কোনো মূল্য নেই, নারী অস্থাবর সম্পত্তিমাত্র; নারী কোনো সম্পত্তির মালিক হ'তে পারে না, পারে না সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে। পিতৃতন্ত্র নারীকে

অস্তিত্বহীন করার জন্যে যে-ফাঁদটি পেতেছে, এবং যাতে ঢুকতে বাধ্য করেছে, তার নাম বিবাহ। মনু [৯:২২] বলেছেন, 'নদী যেমন সমুদ্রমিলনে লবণাম্বু হয়, নারীও তেমন; যেমন পুরুষের সাথে বিবাহিত হয় তেমন গুণযুক্ত হয়।' নারী নির্গুণ, আর পুরুষ গুণের মহাসাগর, যেখানে অস্তিত্ব হারিয়ে নারী ধন্য হয়। বিয়ে হচ্ছে নারীর অস্তিত্বলোপ; এ-বিষয়ে হিন্দু ও খ্রিস্টান একমত। হিন্দু পিতৃতন্ত্রে নারীকে বিয়ের ফাঁদে আটকে রাখার সুপরিকল্পিত বিধি তৈরি করা হয়েছে। মনু [২:৬৭] বিধান দিয়েছেন :

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া॥

বিয়েই নারীর বৈদিক উপনয়ন,
পতিসেবা হচ্ছে গুরুগৃহবাস, এবং গৃহকর্মই
প্রভাত ও সন্ধ্যায় হোমস্বরূপ অগ্নিপরিচর্যা।

হিন্দুনারীর অধিকার নেই কোনো কিছুতে; মন্ত্রে নেই, শিক্ষায় নেই, ধর্মে নেই। ব্রাহ্মণ বালকের জীবনে উপনয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, উপনয়ন তার সামনে বিদ্যা ও ধর্মের পথ খুলে দেয়; কিন্তু নারীর উপনয়নের অধিকার নেই, তাই নারী বেদপাঠ করতে পারে না, পুজোয় উৎসর্গ করতে পারে না [দ্র দ্বারকানাথ (১৯১৩, ৯৬-৯৭)]। বিয়েই তার জীবনকারাগার। বঙ্কিম 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন' [*লোকরহস্য*, ১৮৭৪] নামে একটি কৌতুককর রচনা লিখেছিলেন, কিন্তু নারীর চোখে দেখলে রচনাটিকে মনে হয় বেদনাদায়ক; পুরুষের জন্যে যা কৌতুক, নারীর জন্যে তা মৃত্যু। 'পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চিত্তবিশেষকে বিবাহ বলে' সংজ্ঞাটিকে একটু বদলে 'পুরুষের' জায়গায় 'নারীর' বসালেই সংজ্ঞাটি হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর সত্য। বঙ্কিম বলেছেন, 'অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়' : উনিশশতকের ঋষির সংজ্ঞা কৌতুক; কিন্তু সনাতন ঋষিদের সংজ্ঞায় স্ত্রী স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তিই। তা লোকরহস্য নয়, কয়েক হাজার বছরের মর্মান্তিক সত্য। নারী অসম্পূর্ণ মানুষ, যার শক্তি নেই নিজেকে রক্ষার। হিন্দু ঋষিরা ও বাইবেলের সন্তরা এ-বিষয়ে একমত; নারীকে তারা বিন্যস্ত করেছেন শিশু ও উন্মাদের শ্রেণীতে। মনুর [৯:৩] বিধানে নারী চিরস্বাধিকারহীন অসহায় শিশু:

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।

নারীকে কুমারীকালে পিতা, যৌবনে স্বামী
ও বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করবে,
নারী কখনোই স্বাধীন থাকার যোগ্য নয়।

হিন্দুবিধানে বিয়ে বাধ্যতামূলক নারীর জন্যে, যে-প্রক্রিয়ায় নারীকে পরিণত করা হয় দাসীতে। কোনো নারী যদি অবিবাহিত থাকতে চায়, তবে হিন্দু পিতৃতন্ত্র তার ওপর চরম প্রতিশোধ নেয়; নারী ম'রেও বিয়ের শেকল থেকে মুক্তি পায় না।

মহাভারত-এ সুভ্রূ, ঋষি কুণির কন্যা, চিরকুমারী থাকে; মৃত্যুশয্যায় সে জানতে পারে যে সারাজীবন ধর্মপালন ক'রেও সে স্বর্গে যেতে পারবে না, কেননা বিয়ের দ্বারা তার দেহ পবিত্র হয় নি। তাই অসহায় মুমূর্ষু কুমারীটি এক ঋষিকে বিয়েতে রাজি করিয়ে একরাত্রি তার সাথে কাটিয়ে স্বর্গে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। একটি সূত্রে রয়েছে কুমারী নারী মারা গেলেও তার লাশকে বিয়ে দিতে হবে, তারপরই হবে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া [দ্র আলতেকার (১৯৫৯, ৩৩)]। পুরুষ দ্বারা দূষিত না হওয়া পর্যন্ত নারী পরিশুদ্ধ হয় না। বিয়ে দিতেই হবে, মানুষ না হ'লে বস্তুর সঙ্গে; যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির প্রতিভাবান বিদ্রোহী তরুণী সরলা যখন কুমারী থাকার সিদ্ধান্ত নেন, তখন আলোড়ন তৈরি হয়ে যায়। স্বামী ছাড়া কী ক'রে থাকতে পারে একটি নারী, যতোই মেধাবী হোক? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পুরুষতন্ত্রের মহিমা রক্ষার জন্যে মেয়েটিকে বিয়ে দিতে চান একটি খাপখোলা তলোয়ারের সাথে। তলোয়ারের সাথে পুরুষের বা পুরুষাঙ্গের মিল খুবই স্পষ্ট। হিন্দু বিয়ের অর্থ হচ্ছে নারীটির জন্যে জন্মজন্মান্তর ধ'রে একটি পুরুষ, এবং পুরুষটির জন্যে জন্মজন্মান্তর ধ'রে বহু নারী। হিন্দুপুরাণে বহুপতির কথা আছে, নারীদের কামোত্তেজনার মুহূর্তে যাকেতাকে আহ্বান ক'রে গর্ভবতী হওয়ার কথাও আছে, কিন্তু হিন্দু বিয়ে হচ্ছে স্বামীর অধীনে নারীর কঠোর দাসীত্ব। স্বামীব প্রভুত্ব নিশ্চিত করার জন্যে ঋষিরা শ্লোকের পর শ্লোক লিখে স্বামীকে উত্তীর্ণ করেছেন ঈশ্বরের পর্যায়ে। স্বামী শব্দটিই বোঝায় ঈশ্বর। মনু [৫:১৫২] বলেছেন : 'বিয়েতে যে বাগদান করা হয়, তাতেই নারীর ওপর পতির স্বামিত্ব জন্মে; সুতরাং স্বামীর সেবা করা নারীর কর্তব্য।' এক শ্লোক পরেই তিনি বিধান দিয়েছেন :

> পতি সদাচারহীন, পরদাররত বা গুণহীন হ'লেও সাধ্বী স্ত্রী পতিকে দেবতার মতো পুজো করবে [৫:১৫৪]
>
> স্ত্রীদের স্বামী ছাড়া পৃথক যজ্ঞ নেই, পতির অনুমতি ছাড়া কোনো ব্রত বা উপবাস নেই। শুধু স্বামীসেবার সাহায্যেই নারী স্বর্গে যাবে [৫:১৫৫]।

স্বামীকে ক'রে তোলা হয়েছে গৃহের দেবতা, তবে গৃহে কোনো দেবী নেই, রয়েছে দাসী; দাসী স্ত্রীটি। স্বামীগৃহে নারীকে দাসী ক'রে রাখার বিধান দিয়েছেন মনু [৯:৩] সুচিন্তিত বাক্যে : 'স্বামী ও স্বজনগণ স্ত্রীলোকদের দিবারাত্রির মধ্যে কখনো স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না; কাজে ব্যস্ত রেখে সব সময় তাদের নিজেদের বশে রাখবেন।' হিন্দুবিধানে স্বামী কখনো মারা যায় না, স্বর্গলোকে যায়; তাই তার স্বর্গযাত্রার পরও নারী আর কোনো পুরুষের কথা ভাবতে পারবে না। মনু বলেছেন : 'পতির মৃত্যু হ'লে স্ত্রী পবিত্র পুষ্পফলমূল দিয়ে অল্পাহারে দেহ ক্ষয় করবে, তবু পরপুরুষের নাম করবে না' [৫:১৫৭]; এবং যদি পরপুরুষের নাম নেয়, তাহলে রয়েছে শাস্তি : 'পরপুরুষ উপভোগের ফলে নারী ইহকালে নিন্দিত হয়, পরকালে শৃগালযোনিতে জন্ম নেয় ও নানা পাপরোগে আক্রান্ত হয়' [৫:১৬৪]। নারীটি তো আর পরপুরুষের নাম নেবে না, কিন্তু পুরুষটি কী করবে? মনু [৫:১৬৮] নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজ বিধান দিয়েছেন : 'ভার্যার মৃত্যু হ'লে দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ ক'রে পুরুষ আবার বিয়ে ও অগ্ন্যাধ্যান

করবে।' পুরুষ কখনো কামবিরহিত থাকবে না, থাকবে নারী।

হিন্দুবিধানে নারীর মূল্য নারী হিশেবে নেই, স্ত্রী হিশেবেও নেই। তবে নারী দরকারী, কেননা সে সম্ভোগের বস্তু– 'রতিরুত্তমা'; এবং দরকারী কেননা এ-জন্তুটি উত্তরাধিকারী প্রসব করে। মনু [৯:২৬] বলেছেন : 'সন্তান উৎপাদনের জন্যে স্ত্রীরা বহুকল্যাণভাগিণী, গৃহের দীপ্তি ও পূজনীয়া।' স্ত্রীর সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে প্রজনন। তাদের কাজ পিতার উত্তরাধিকারী, এবং পুত নরক থেকে ত্রাণকারী, পুত্র জন্ম দেয়া; কন্যা জন্ম দেয়া অপরাধ। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে : 'পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়াই নারীর প্রধান কর্তব্য'; মৈত্রায়নী সংহিতায় বলা হয়েছে : 'নারীর প্রকৃষ্ট কর্তব্য হচ্ছে পুত্র উৎপাদন করা' [দ্র সুকুমারী (১৯৮৯)]। কন্যা শুধু হিন্দুসমাজেই নয়, সব সমাজেই অবাঞ্ছিত; তবে হিন্দু পিতৃতন্ত্র কন্যাকে ভয় পেয়েছে ও অসহায় ক'রে রেখেছে সবচেয়ে বেশি। *অথর্ববেদ*-এ পুত্রলাভের ও কন্যানিরোধের মন্ত্র রয়েছে। কন্যানিরোধ না ক'রে কোনো উপায় ছিলো না; হিন্দু পিতৃতন্ত্র তার বিধিবিধানে নারীর জীবনকে এমন নারকীয় ক'রে তুলেছিলো যে কন্যা কামনাই ছিলো নিষ্ঠুরতা। মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো যাবে না, বিয়ে দিতে হবে শৈশবে [তিরিশ বছরের পুরুষ বারো বছরের কন্যাকে বিয়ে করবে; চব্বিশ বছরের পুরুষ আট বছর বয়সের কন্যাকে বিয়ে করবে, নইলে ধর্ম নষ্ট হয়: *মনুসংহিতা*, ৯:৪], কিন্তু আন্তবর্ণ বিয়ে নিষিদ্ধ ব'লে বর পাওয়া যাবে না, সে কোনো কিছুর উত্তরাধিকারী হবে না, স্বামীর মৃত্যু হ'লে তাকে আর বিয়ে দেয়া যাবে না, তাকে তুলে দিতে হবে স্বামীর চিতায়, হিন্দু পিতৃতন্ত্রে এ হচ্ছে নারীর সম্পূর্ণ জীবনী।

হিন্দু পিতৃতন্ত্রে তিন প্রধান পিতা, স্বামী, ও প্রভু; তাদের বর্তমানে কেউ সম্পত্তির মালিক হ'তে পারে না। মনু [৮:৪১৬] বলেছেন : 'ভার্যা, পুত্র, ও দাস শাস্ত্রানুসারে অধম, তাই তারা যে-ধন উপার্জন করবে, তাতে তাদের অধিকার থাকবে না; তারা যার, ওই ধন হবে তার।' স্ত্রী, পুত্র, দাস হচ্ছে স্বামী, পিতা, প্রভুর সম্পত্তি; তাই তারা সম্পত্তির মালিক হ'তে পারে না মালিকের জীবনকালে; এবং স্ত্রী ও দাস মালিক হ'তে পারে না কখনোই। পুত্রই যখন পিতার বর্তমানে নিজেরই অর্জিত ধনের মালিক হ'তে পারে না, তখন কন্যার ধনে অধিকারের কথাই ওঠে না ব'লে শ্লোকে মনু কন্যার উল্লেখও করেন নি। কন্যা উল্লেখযোগ্যও নয়। সে কোনো ধন উপার্জন করতে পারতো না; তবে পিতা তাকে স্বামীর কাছে বিক্রি ক'রে ধন অর্জন করতে পারতো। কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য নয়, যদি পিতার কোনো পুত্র থাকে। আদিকালে কোনো ভাই না থাকলে বোন উত্তরাধিকারী হ'তে পারতো পিতার সম্পত্তির। তবে ভাইহীন নারীটি পিতার সম্পত্তি পেয়ে যে সুখের সাগরে ভাসতো, তা নয়; ওই ধন অভিশাপ হিশেবে দেখা দিতো তার জীবনে, কেননা অধিকাংশ সময় ভাইহীন নারীর বিয়েই হতো না। অপুত্রক পিতা পুত্রের শোকে কন্যাটিকেই ঘোষণা ক'রে যেতো পুত্র হিশেবে; এবং নিজের বংশ রক্ষার জন্যে এমন ব্যবস্থা ক'রে যেতো যে ওই মেয়েটির প্রথম পুত্র চ'লে আসবে মাতামহের বাড়ি, রক্ষা করবে তার বংশ। পুত্র ও স্বর্গ হারানোর ভয়ে পুরুষেরা অমন মেয়েকে বিয়ে করতেই রাজি হতো না। তবে পুত্র থাকুক বা না থাকুক

মনু, বশিষ্ঠ, গৌতম কন্যার উত্তরাধিকার একেবারেই স্বীকার করেন নি। যাজ্ঞবল্ক, বৃহস্পতি, নারদ কন্যার কিছুটা উত্তরাধিকার স্বীকার করেছেন। ভাই থাকলে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকারের কথাই ওঠে না, খ্রিপূ ৩০০ অব্দ থেকে হিন্দু আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোনো অধিকার নেই। পিতার বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নারী যায় স্বামীগৃহে; এবং সেখানে সে পরিণত হয় আরেকজনের সম্পত্তিতে। স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি, তাই স্ত্রীর কোনো সম্পত্তির অধিকার নেই, সে কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। মৈত্রায়নী সংহিতায় বিধান দেয়া হয়েছে : 'সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার থাকবে না'; বলা হয়েছে : 'স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোনো অধিকার থাকবে না।' হিন্দু স্ত্রীর শোচনীয় পরিণতি হচ্ছে বিধবা, যার জীবনেরই অধিকার ছিলো না, তাই তার সম্পত্তিতে অধিকারের কথা ভাবাও হাস্যকর। খ্রিপূ ৩০০ অব্দ থেকে কন্যা ও বিধবা পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত। বেদ আর অধিকাংশ ধর্মসূত্র বিধবার উত্তরাধিকার অস্বীকার করেছে। বৌধায়ন বিধবার উত্তরাধিকার অস্বীকার করেছে; আপস্তম্ব সাত স্তরের উত্তরাধিকারী বের করেছেন, এমনকি রাজাকে এবং ছাত্রকে উত্তরাধিকারী করেছেন, কিন্তু বিধবাকে করেন নি [দ্র আলতেকার (১৯৫৯, ২৫০-২৭০)]। বিধবার উত্তরাধিকার হচ্ছে সহমরণ, স্বামীর চিতার আগুনে ছাই হওয়া, বা দুর্গত কলঙ্কিত জীবন।

বিধবা হিন্দু পিতৃতন্ত্রের দুঃস্বপ্ন, তার খড়্গের শোচনীয়তম বলি। ঋষিরা বিধবার জীবনকে অস্বীকার করেছে, আর যখন সে বেঁচে থেকেছে তখন তাকে চূড়ান্ত অপমান করেছে। বিধবাকে সতী নাম দিয়ে দাহ করার ব্যবস্থা করেছে হিন্দুবিধি। জেসাসের জন্মের অনেক আগে থেকেই একটি-দুটি ক'রে হিন্দু বিধবা সহমরণে ও অনুমরণে গেছে, বা যেতে বাধ্য হয়েছে। ৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সতীদাহ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আঙ্গিরা বলেছেন, বিধবার ধর্ম হচ্ছে সহমরণ; হারীত বলেছেন, সহমরণ বরণ ক'রে স্ত্রী স্বামীকে চরম পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারে। সতীদাহবাদীদের পবিত্র যুক্তি রামমোহন রায় *সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ*-এ (১৮১৮, ৩-৪) দিয়েছেন প্রবর্তকের মুখে :

> স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী এ পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে বাস করে।...যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামিকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে।...পতি যদি ব্রহ্মহত্যা করেন কিম্বা কৃতঘ্ন হয়েন কিম্বা মিত্রহত্যা করেন তথাপি ঐ পতিকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করে ইহা অঙ্গিরা মুনি কহিয়াছেন।

সব বিধবা স্বামীর চিতায় ওঠে নি; কিন্তু এক সময় দাবানলের মতো জ্ব'লে উঠেছিলো সতীদাহের চিতা। এটা প্রথম ব্যাপক আকারে দেখা দেয় উত্তর ভারতে ও কাশ্মীরে, প্রধানত রাজপরিবারে। রানীরা, এমনকি উপপত্নীরা, দলেদলে রাজাদের চিতায় উঠে সতী হ'তে থাকে। উত্তর ভারতের রাজপুতদের মধ্যে সতীদাহের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো বর্ণাঢ্য মড়করূপে। মারওয়ারের রাজা অজিত সিংহের চিতায় (১৭২৪)

উঠেছিলো ৬৪টি সতী, পানিতে ডুবে বুন্দির রাজা বুধ সিং মারা গেলে তার চিতায় ওঠে ৮৪টি; ১৬২০ অব্দে এক রাজপুত রাজা মারা গেলে তার চিতায় উঠেছিলো ৭০০ সতী। হুমায়ুন ও আকবর সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনো কাজ হয় নি। বাঙলায়ও সতীদাহ ছিলো হিন্দুসমাজের স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখের ব্যাপার। ১৮১৫-১৮২৮ সালের মধ্যে বাঙলায় ৩৭৮+৪৪২+৭০৭+৮৩৯+৬৫০+৫৯৮+ ৬৫৪+৫৮৩+৫৭৫+ ৫৭২+৬৩৯+৫১৮+৫১৭+৪৬৩=৮১৩৫ জন নারী সতী হয়। এ-সময়ে এতো সতী আর কোথাও হয় নি; বোম্বাই, মাদ্রাজ, এমনকি রক্ষণশীল বেনারসেও হয় নি। হিন্দুবিধি বিধবাকে সম্পত্তির অধিকার দেয় নি, আর নিয়তির পরিহাস হচ্ছে বাঙলায় একটি বিধিই বিধবাকে সম্পত্তির অধিকার দিয়ে তাকে ঠেলে দেয় চিতার আগুনে। দায়ভাগ আইনে বাঙলায় নিঃসন্তান বিধবারাও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো; তাই স্বজনেরা সম্পত্তির লোভে বিধবাদের ঠেলে দিতো স্বামীর চিতায়। সতীদাহের চিতার আগুনের রূপে কিন্তু মুগ্ধ ছিলেন কবিরা; কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'; এবং চল্লিশোত্তর বয়সে চিতার আগুনের শোভায় ভ'রে উঠেছিলো তাঁর মন : 'দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ; চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ' [*বিচিত্র প্রবন্ধ*, 'মা ভৈঃ', ১৩০৯]। পিতৃতন্ত্রের খড়গের ক্রোধ থেকে নারীদের বাঁচানোর প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় উনিশশতকে, যার সূচনাকারী রামমোহন রায় [১৭৭২-১৮৩৩]। নারীদের মর্মান্তিক পরিণতি ছিলো বিধবা, তাই বিধবাকে বাঁচিয়েই রামমোহন শুরু করেন নারীবাঁচানোর আন্দোলন। ১৮২৯ সালে বেন্টিংক সতীদাহ নিষিদ্ধ ক'রে আইন পাশ করেন। সতীদাহ নিবারণে বেন্টিংক যে-ভূমিকা নেন, তার জন্যে হিন্দুবিধবার কৃতজ্ঞতা বেন্টিংকের বিশেষভাবেই প্রাপ্য।

রামমোহন ও বেন্টিংক হিন্দু বিধবাকে প্রাণ দিয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০-১৮৯১] দেয়ার চেষ্টা করেন জীবন। সব বিধবা সহমরণে যেতো না, তবে যারা বেঁচে থাকতো তারা বাঁচতো চরম লাঞ্ছনা, অপমান, কলঙ্কের মধ্যে। বিদ্যাসাগর বিধবাদের বিয়ে দেয়ার আন্দোলন শুরু করেন; অশ্লীল রক্ষণশীলেরা প্রথমে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, পরে মেতে ওঠে বিধবার যোনির ক্ষতাক্ষত বিচারে; তবে ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। বিদ্যাসাগর কিছু বিধবাকে বিয়েও দেন; তবু আজো হিন্দুসমাজ বিধবার বিয়ে মেনে নেয় নি। বিধবার বিয়ের কথা ভাবতে এখনো হিন্দুসমাজের রক্ত জ'মে বরফ হয়ে যায়; এমনকি নারীরাও বিধবা বিয়ের কথা শুনলে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম করে। সতীদাহ বন্ধ হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য নৃশংসতা বন্ধ করা সহজ; বিধবার এখনো বিয়ে হয় না, কেননা গোপন নৃশংসতা বন্ধ করা কঠিন। বিধবাকে বোঝার মতো সংবেদনশীলতা বা মনুষ্যত্ব হিন্দুসমাজ আজো আয়ত্ত করে নি। অধিকাংশ হিন্দু বিধবার জীবনে দুর্গতির শেষ নেই; শ্বশুর বা পিতার পরিবারে তারা

যাপন করে লাঞ্ছিত জীবন। তাদের যে-ভাবমূর্তি গ'ড়ে তুলেছে পুরুষতন্ত্র, তা পতিতার; যেনো হিন্দু বিধবা কামক্ষুধার্ত নারী, যার দিবসরজনী কাটে নিরন্তর কামযন্ত্রণায়, পুরুষ পেলেই যে লিপ্ত হয় রতিক্রিয়ায়। বালবিধবাদের শারীরিক জ্বালার কথা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তারা পুরুষখেকো ডাইনি নয়, পুরুষেরাই বিধবাখোর দানব। কোনো পাড়ায় একটি তরুণী বিধবা থাকলে ওই এলাকার সব পুরুষের কাম তাকে ঘিরে জ্বলতে থাকে; এক সময় তা পোড়ায় বিধবাটিকে। বিদ্যাসাগর *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*-এ (১৮৫৫) লিখেছিলেন :

> বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিণী, পুত্রবধু প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্যনির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।

বিদ্যাসাগর বিধবার বৈধব্যযন্ত্রণার, এবং তিনটি পাপের কথা বলেছেন : ব্রহ্মচর্যনির্বাহে অসামর্থ, ব্যভিচারদোষ, ও ভ্রূণহত্যাপাপ। যন্ত্রণাটি সত্যিই বিধবার, কিন্তু পাপ তিনটি বিধবার নয়, নারীলোলুপ পুরুষের। পুরুষেরাই বিধবাদের পরিণত করে সহজ শিকারে। বিধবা মানেই সম্ভাব্য কলঙ্ক, এমন ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো সমাজে; সে যে একদিন কুলত্যাগিনী হবে, এ-বিষয়ে সমাজ ছিলো নিশ্চিত। প্রতিটি বিধবাকে বইতে হয় এমন কলঙ্কের বোঝা, যার জন্যে সে দায়ী নয়। বিধবা সম্পর্কে সমাজের এ-হীন ধারণার প্রতিবাদ করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *নারীর মূল্য*-এ (১৯২৪)। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য কিছুটা তরল ক'রে প্রচার করা হয়েছিলো যে বিধবাদের বিয়ে দেয়া হয় না ব'লে কুলত্যাগিনীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, 'কথাটা প্রচার করিবার সময়, বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া লইবার সময়, একবারও সে মনে করিয়াছে কি, কি গভীর কলঙ্কের ছাপ সে নারীত্বের উপর বিনা দোষে ঢালিয়া দিতেছে?' বিধবারা কেনো কুলত্যাগ করে? শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন কামজ্বালায় নয়, বাস্তব দুর্গতি সহ্য করতে না পেরেই তারা কুলত্যাগ করে :

> ভদ্র-ঘরের বিধবার অবস্থা ঠিক নীচজাতীয়া সধবার অনুরূপ। তাহাকেও স্বাধীনভাবে কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহাতে পিতৃকুলের বা শ্বশুরকুলের মর্যাদা হানি হয়, অথচ বাড়ির মধ্যে ভদ্র-বিধবার অবস্থা কাহারো অবিদিত নাই।...শতকরা সত্তরজন হতভাগিনী অন্ন-বস্ত্রের অভাবে এবং আত্মীয়-স্বজনের অনাদর, উপেক্ষা, উৎপীড়নেই গৃহত্যাগ করে, কামের পীড়নে করে না।

ভারতের স্বাধীনতার পর হিন্দুতন্ত্রের খড়্গ কিছুটা কোমল হয়েছে। ১৯৫৫ সালে গৃহীত হয় *হিন্দুবিবাহ অ্যাক্ট*, যাতে দুটি মৌলিক পরিবর্তন সম্পন্ন করা হয়। এতে পুরুষের একবিবাহ, নারীর তো চিরকালই ছিলো, বিধিবদ্ধ করা হয়, এবং বিবাহবিচ্ছেদ

স্বীকৃত হয়। সম্পত্তিতে এখন কিছুটা অধিকার এসেছে হিন্দুনারীর : ১৯৫৬র *হিন্দু উত্তরাধিকার অ্যাক্ট* ও ১৯৫৯এর *বিবাহিত নারীর সম্পত্তি (পরিবর্ধিত) অ্যাক্ট* নারীকে কিছুটা অধিকার দিয়েছে সম্পত্তির [দ্র আলমেনাস-লিপোস্কি (১৯৭৫, ৪৫-৫২)]। তবু আজো হিন্দুনারী পুরোনো বিধিবিধানের শিকার, এখনো স্বামীর পায়ের নিচে তার স্বর্গ

হিন্দুবিধি পৃথিবীর একটি বিশেষ খণ্ডে সীমাবদ্ধ; কিন্তু যে-দুটি আইনের জগতে সূ কখনো ডোবে না, সে-দুটি হচ্ছে 'ইংরেজি সাধারণ আইন', ও 'রোমান আইন', পরে যার নাম হয় 'কোড নেপোলিয়ন' বা 'নেপোলিয়নি বিধি'। দুটি বিধিই নারীর জন্যে নৃশংস; দুটিরই প্রণেতা নারীবিদ্বেষীরা, যারা নারীকে দেখছে প্রচণ্ড ঘৃণার চোখে, এবং আইনের নামে বিধিবদ্ধ করেছে বিনাবিচারে চরম দণ্ড। এ-দুটি বিধির পেছনে হিংস্র পিতৃতান্ত্রিকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইবেল; প্রাণভ'রে শাস্তি দিয়েছে নারীকে। খ্রিস্টা সন্তরা নারীবিদ্বেষে হিন্দু ঋষিদেরও ছাড়িয়ে গেছেন; তাঁদের চোখে একটি নারী, মেরি, ছাড়া আর সব নারীই পাপিষ্ঠা; তাই তাঁরা নারীদের জন্যে যে-সব বিধি রচনা করেছেন সেগুলো পাপিষ্ঠাদের জন্যে রচিত বিধি। ইহুদি ও খ্রিস্টান সন্তদের কাছে নারী হচ্ছে 'শয়তানের খেলার মাঠ', 'বিষ্ঠার ছালা'; লুথার বলেছেন,'নারী কখনো নিজের প্রভু নয় ঈশ্বর তার দেহ তৈরি করেছে পুরুষের জন্যে, সন্তান ধারণ ও লালনের জন্যে; নারীকে সন্তান বিয়োতে বিয়োতে মরতে দাও, এজন্যেই তাদের তৈরি করা হয়েছে' [দ্র মাইলস (১৯৮৮, ৭৬, ৮০)]।

ইংরেজি সাধারণ আইন ও রোমান আইনে প্রকাশ পেয়েছে পিতৃতন্ত্রের এ-মনোভাবই; এ-দু-আইনেই নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন। নারীকে পুরুষের বাধ্যতামূলক ক্রীতদাসী করার একটি নিপুণ কৌশলের নাম হচ্ছে বিবাহ, যার কবলে প'ড়ে নারী হারায় তার অস্তিত্ব ও অধিকার। ইংরেজি সাধারণ আইনে স্ত্রীকে স্বামীর রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে হ'লে পালন করতে হয় কতকগুলো শর্ত [কোভেরচার], যেগুলোর কাজ হচ্ছে নারীকে অস্তিত্বহীন করা। এ-শর্তের উৎস বাইবেলের একটি অনুশাসন : 'মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এব তাহারা একাঙ্গ হইবে' [*আদিপুস্তক*, ২.২৪]। শুনতে সুখকর শোনালেও আইনে এর তাৎপর্য হচ্ছে স্ত্রীর 'ব্যবহারিক মৃত্যু'। আইনের ভাষায় এ-অনুশাসন বোঝায় স্বামী-স্ত্রী এক ব্যক্তি; অর্থাৎ স্ত্রীর কোনো ভিন্ন সত্তা নেই। ধর্মের এক কথায় স্বামীর শরীরে বিলীন হয়ে গেছে স্ত্রীর সমগ্র অস্তিত্ব। বিচারক ব্ল্যাকস্টোন এর আইনগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন : 'আইনে, বিয়ের ফলে, স্বামী ও স্ত্রী অভিন্ন ব্যক্তি : অর্থাৎ বিবাহিত অবস্থায় নারীর সত্তা বা আইনগত অস্তিত্ব বাতিল, বা অন্তত নারীর অস্তিত্ব স্বামীর অস্তিত্বে গৃহীত ও সংহত' [দ্র মিলেট (১৯৬৯, ৬৮)]; রিস বলেছেন,'আইনে নারী তার বিবাহিত পুরুষের সম্পত্তি; সে তার অস্থাবর মাল'; এলিজা কুক লিখেছেন,'স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রীর সম্পত্তির, ও স্ত্রীর সন্তানের নিরঙ্কুশ প্রভু' [দ্র বাঙ্ক (১৯৭৪, ১৭)]। হিন্দুবিধানেও স্ত্রীর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় স্বামীর অস্তিত্বের মহাসমুদ্রে [*মনুসংহিতা*, ৯:২২]। স্বামীস্ত্রীর একদেহে বিলীন হওয়া কাম ও কাব্যিকভাবে চমৎকার, কিন্তু আইনের দিকে

ভয়াবহ। এতে স্বামীর শরীর বা অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, বিলুপ্ত হয় নারীর শরীর ও অস্তিত্ব; এ-বিলুপ্তির মূল্য দিতে হয় নারীকে তার মাত্র একটি সামান্য জীবন দিয়ে। স্বামী হয় প্রভু, স্ত্রী ভূমিদাসী। বিয়ের অনুষ্ঠানেই বধুটিকে দীক্ষা দেয়া হয় সন্ত পলের অনুশাসনে : ঈশ্বরের প্রতি সে যেমন অনুগত থাকবে তেমনই অনুগত থাকবে স্বামীর প্রতি।

ইংরেজি সাধারণ আইনে স্ত্রীকে ফেলা হয় শিশু, নির্বোধ ও বদ্ধপাগলের দলে, যে অক্ষম নিজের দায়িত্ব নিতে; যার নেই কোনো বিবেচনাশক্তি। অস্তিত্বলোপের অর্থ খুবই ভীতিকর; এতে স্বামীকে দেয়া হয় স্ত্রীর শরীরের সম্পূর্ণ মালিকানা, স্বামী ওই সম্পত্তি ভোগ করতে পারে যথেচ্ছভাবে। বেকন এ-মালিকানার মানে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : 'স্বামী পিটোতে পারে স্ত্রীকে, তবে খুব ভয়ঙ্কর বা নিষ্ঠুরভাবে নয়; দরকার মনে করলে স্বামী স্ত্রীকে আটকে রাখতে পারে, তবে সে স্ত্রীকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না' [দ্র বাস্ক (১৯৭৪, ১৭)]। অস্তিত্বলীনের মানে হচ্ছে স্বামী বা কারো বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার কোনো অধিকার তার নেই; সে কারো সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদনের অধিকারী নয়; ঋণ আদায়ের জন্যে সে মামলা করতে পারে না; কারো বিরুদ্ধে সে পারে না মানহানির অভিযোগ আনতে, এবং তার বিরুদ্ধেও পারে না কেউ। অর্থাৎ বিয়েতে বাতিল হয়ে যায় তার নাগরিক অধিকার; আইনের চোখে সে নিরস্তিত্ব। তার হাতপা বাঁধা: তার অস্তিত্ব নেই, গৃহ নেই, সহায় নেই, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নেই। সে নিজেই তো নেই : বিয়ে হচ্ছে নারীর অস্তিত্বহীনতা- কিছুদিনও আগেও ইংরেজি সাধারণ আইনে বিয়ে ছিলো এতোই মধুর ও মর্মান্তিক। বিয়েতে নারীর অস্তিত্বলীনের ব্যাপারটি মোটেই আধ্যাত্মিক নয়, সম্পূর্ণ বৈষয়িক; ওই আইনে বিয়ের পর নারীর নিজের অধিকারে কিছুই থাকে না। সে নিজের মালিক নয়, সে নিজের আঁকাবাঁকা দেহখানির মালিক নয়, সে মালিক নয় কিছুরই। যে কোনো কিছুর মালিক হ'তে পারে না, তার আবার কিসের অস্তিত্বস্বাতন্ত্র্য? একই কারণে হিন্দুবিধানেও বারবার বলা হয়েছে 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' [*মনুসংহিতা*, ৯:৩]।

স্বামীস্ত্রীর একাঙ্গ হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে বিয়ের পর স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির, এমনকি তার নিজের, মালিক হয় স্বামী। এর বিনিময়ে স্বামী তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, তার ভরণপোষণ করে। বিয়ের সময় নারীর যা-কিছু স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তা হয়ে ওঠে স্বামীর সম্পত্তি, আর স্ত্রী হয় স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি! এমনকি বিয়ের পরও সে যা কিছুর মালিক হয়, তাও তার থাকে না, অবলীলায় হয়ে ওঠে স্বামীর। স্বামীর এ-অধিকার শুধু বিবাহিত কালের নয়, ১৮৫৭র আগে বিবাহবিচ্ছেদের পরও স্বামী ভোগ করতো স্ত্রীর ওপর এ-অধিকার। ১৮৩৭-এর আগে সন্তানের ওপরও নারীর ছিলো না অধিকার, সব অধিকার ছিলো স্বামীর। আইন, পিতৃতান্ত্রিক রীতিতে, মাকে স্বীকারই করতো না; স্বীকার করতো শুধু পিতাকে। পিতার জীবনকালে মায়ের কোনো অধিকার ছিলো না; তার প্রাপ্য ছিলো শুধু 'সম্মান', আর তখন একেই মনে করা হতো নারীর গৌরব। পিতা সন্তানদের শাস্তি দিতে পারতো, মায়ের কাছে থেকে কেড়ে

নিতে পারতো, নিজের রক্ষিতার কাছে রাখতে পারতো; এবং মাকে নিষিদ্ধ ক'রে দিতে পারতো। কুমারী অবস্থায় তার বেশ কিছু অধিকার ছিলো, কিন্তু একাঙ্গ হওয়ার পর সে হারায় সব কিছু। ইংরেজি আইন ছিলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিধি; তাই এ-আইন ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা পৃথিবীতে। এ-আইন কোনো কোনো দেশে নারীকে প্রথাগত নিষ্ঠুরতর আইনের কবল থেকে কিছুটা উদ্ধার করে, যেমন ভারতে; আবার কোনোকোনো দেশে এ-আইন নারীর বহুদিনের অধিকার হরণ করে, যেমন ব্রহ্মদেশে। ব্রহ্মদেশে স্বামীস্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি পালন করতে হতো 'পাঁচটি আনুগত্য', কিন্তু এ-আইন স্বামীর আনুগত্য লোপ ক'রে স্ত্রীকে করে স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি ও দাসী।

রোমান আইনে ইংরেজি সাধারণ আইনের থেকে পিতৃতান্ত্রিক হিংস্রতা আরো প্রচণ্ড। ইংরেজি আইনে অবিবাহিত নারীদের কিছু অধিকার আছে, কিন্তু রোমান আইনে কোনো অধিকার নেই অবিবাহিতাদেরও। তাদের চিরকাল বাস করতে হয়, কোনো রোমান মনুর বিধানেই যেনো, কোনো পুরুষ অভিভাবকের অধীনে। রোমান আইন কোনো অবস্থায়ই নারীকে স্বাধীনতার যোগ্য মনে করে না। নেপোলিয়ন রোমান আইনকে মান-ও বিধি-বদ্ধ ক'রে গ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের আইনরূপে। এর নতুন নাম হয় নেপোলিয়নি বিধি [কোড নেপোলিয়ন]। একনায়কের বিধিবদ্ধ আইনে চরমভাবে প্রকাশ পায় একনায়কের স্বৈরাচার। নেপোলিয়নের কাছে নারী এমন একটি রাজ্য, যাকে শুধু জয় করলেই চলবে না, তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত পর্যুদস্ত পদদলিত করতে হবে। তার বিধি নারীকে তাই করে; এ-বিধিতে নারী হয়ে ওঠে সবচেয়ে লণ্ডভণ্ড রাজ্য। নারী সম্পর্কে তার ধারণা খ্রিস্টান সন্তদেরই মতো। এ-একনায়ক বলেছে, 'প্রকৃতি চেয়েছে যে নারী হবে আমাদের দাসী। তারা আমাদের সম্পত্তি, আমরা তাদের সম্পত্তি নই। ফলবান গাছের মালিক যেমন মালি, আমরাও তেমনি তাদের মালিক। নারীর সমানাধিকার দাবি নিছক পাগলামো! নারী সন্তান উৎপাদনের কল ছাড়া আর কিছু নয়' [দ্র নিউল্যান্ড (১৯৭৯, ১৩)]। এ-বিধি পশ্চিম ইউরোপে ও ফরাশি উপনিবেশে চাপিয়ে দেয়া হয়, এবং হঠাৎ অনেক দেশে নারী নিজেকে দেখতে পায় গৃহদাসীরূপে। এ-আইনেও নারী শিশু আর নির্বোধদের শ্রেণীভুক্ত; তাই তারা কোনো চুক্তি করতে পারে না, স্বামীর স্বাক্ষর ছাড়া স্বাধীনভাবে আইনসম্মত লেনদেন করতে পারে না, বাকিতে কিছু কিনতে পারে না, ব্যাংকে একটি হিশেবও খুলতে পারে না। এ-আইনে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির এবং জীবনের পরিচালক। স্ত্রী যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায় বা চাকুরি করতে চায়, তাহলেও স্বামীর অনুমতি নিতে হয়। এ-আইনে স্বামীর প্রতি আনুগত্য শুধু সামাজিক বা ধর্মীয় নয়, তা আইনগত।

এখন উগ্রতম পিতৃতন্ত্র মুসলমান পিতৃতন্ত্র, এর বিকাশ ঘটেছে কম। ইসলাম কনিষ্ঠ ধর্ম, এটি যে-অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে সে-অঞ্চলের দুটি পুরোনো ধর্মের উত্তরাধিকার বহন করে অনেকখানি; এ-ধর্ম নারীকে দিয়েছে কিছু অধিকার, যা আগের পিতৃতন্ত্রগুলো দেয় নি। তবে মুসলমান দেশগুলোতেই নারী এখন সবচেয়ে শৃঙ্খলিত, কেননা অন্যান্য পিতৃতন্ত্রগুলোর বিবর্তন ঘটেছে, আর এটি বিবর্তন রোধ ক'রে চলছে। এখন অনেক দেশে

এর অবলম্বনকারীদের সহনশীলতাও এতো কম যে এর সম্পর্কে নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ কিছু লেখাও বিপজ্জনক। প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে জন্মেছে এমন এক বদ্ধমূল ধারণা যে ইসলামপূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিলো শোচনীয়; ইসলাম উদ্ধার করে তাদের। প্রতিটি ব্যবস্থা পূর্ববর্তী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়; তবে তা ঐতিহাসিকভাবে সাধারণত সত্য হয় না। আরব নারীদের নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে; সবগুলোতেই স্বীকার করা হয় যে ইসলামপূর্ব আরবে অনেক বেশি ছিলো নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার। তারা অবরোধে থাকতো না, অংশ নিতো সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে: এমনকি তাদের প্রাধান্য ছিলো সমাজে। শিশুকন্যা হত্যার জন্যে আরবরা খুব নিন্দিত ইতিহাসে, কিন্তু তারা সব শিশুকন্যা হত্যা করতো না, করলে জাতিটিই লুপ্ত হয়ে যেতো। শিশুকন্যা হত্যা একান্ত আরবি রীতি ছিলো না, পৃথিবীর নানাদেশে, যেমন ভারতেও, ছিলো। এ-ধর্ম শিশুকন্যাদের বাঁচিয়েছে, তবে নারীদের মুক্ত সমাজ থেকে স্থানান্তরিত করেছে অবরোধে [দ্র সোহা আবদেল কাদের (১৯৮৪, ১৪০)]।

কোরান-এ আছে :

হে নবীপত্নীগণ,... তোমরা নিজের গৃহে থাকবে; প্রাচীন যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন ক'রে বেড়িও না [আহজাব : ৩২-৩৩]।

*বোখারি*তে [দ্র নূর মোহাম্মদ (১৯৮৭, ১৯৬)] আছে :

বিবি আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন : নারীগণ এখন যে ধরনের চালচলন এখতেয়ার করিয়াছে তাহা যদি রছুলুল্লাহ (ছঃ) দেখিতেন, তবে নিশ্চয় তাহাদিগকে মসজিদে যাইতে বাধা দিতেন ।

এ থেকে বোঝা যায় ইসলামের আগে ও প্রথম পর্যায়ে নারীদের যে-অধিকার ও স্বাধীনতা ছিলো, তা পরে হরণ করা হয়। ফাতনা এ সাব্বাহ [ফাতিমা মেরনিস্‌সির ছদ্মনাম] নামক এক নারী ও মুসলমান ঐতিহাসিক *মুসলমানের অবচেতনায় নারী* (১৯৮৪) গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইসলামে নারী হচ্ছে বিকলাঙ্গ প্রাণী'; তিনি আরো লিখেছেন, 'যতোবারই আমি সেই ক্লান্তিকর ভণিতাটি শুনি যে সপ্তম শতাব্দী থেকে ইসলাম নারীকে দিয়েছে উচ্চ স্থান, ততোবারই আমি বিবমিষা বোধ করি' [দ্র মাইলস (১৯৮৮, ৭৫)। নারীকে ইসলাম কতোটা অধিকার দিয়েছে বা দিতে পারে, তা বোঝার জন্যে নারী সম্পর্কে ইসলামি ধারণার সাথে কিছুটা পরিচয় থাকা দরকার।

ইসলামি শাস্ত্রে নারী ও কাম সম্পর্কে ধারণার পরিচয় দিয়েছেন ফাতিমা মেরনিস্‌সি তাঁর *বোরখা পেরিয়ে* (১৯৭৫) গ্রন্থে। তিনি দেখিয়েছেন, ইসলামে কামকে দেখা হয় এক আদিম শক্তিরূপে, যা শুভও নয় অশুভও নয়। তার শুভাশুভ নির্ভর করে ব্যবহারের ওপর। ইসলামে মনে করা হয় যে নারীপুরুষের মধ্যে নারীর কামই প্রচণ্ড, তাই তা দারুণ সামাজিক উদ্বেগের ব্যাপার। নারীর ওই কামকে যদি বশে রাখা না হয়, তবে তা সৃষ্টি করবে *ফিৎনা* বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা, যা নষ্ট ক'রে দেবে সমাজকে। ইসলাম মনে করে নারীর পক্ষে নিজের কামকে বশে রাখা সম্ভব নয়, কেননা নারীর সে-চারিত্রিক শক্তি নেই; কিন্তু পুরুষের আছে, কেননা পুরুষ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে নারীর

থেকে উৎকৃষ্ট। তাই স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ পেয়েছে নারীর ওপর প্রভুত্বের ও নারীকে রক্ষার অধিকার। নারীকে যে বোরখায় মুড়ে বা অবরোধে আটকে রাখা হয়, তা সমাজকে নারীর অনিবার কামের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্যে [দ্র আমল রাসসম (১৯৮৪, ১২৯)]। পুরুষ সম্পর্কে উচ্চ ও নারী সম্পর্কে নিম্ন ধারণা ইসলাম পেয়েছে ইহুদি-খ্রিস্টান ঐতিহ্য থেকে; এবং তাকে বদ্ধমূল ক'রে তুলেছে। পুরুষকে যে-চারিত্রিক শক্তির অধিকারী ব'লে মনে করা হয়, তা আসলে পুরুষের নেই; আর নারীর মধ্যে চারিত্রিক শক্তির যে-অভাব রয়েছে ব'লে মনে করা হয়, তাও ভুল। কামের বেলা তা অত্যন্ত স্পষ্ট : নারীর কামসংযমের পাশে পুরুষ কামইতর প্রাণী। ইসলামে নারী সম্পর্কে রয়েছে যে-অবিশ্বাস, তা বিশেষভাবেই আরববিশ্বাস; আরবরা সম্ভোগপরায়ণ, তারা নারী থেকে নারীতে ছোটে, কিন্তু কলঙ্ক দেয় নারীদের। *আরব্য রজনী*র উপাখ্যানগুলোতে রয়েছে এর বিশ্বস্ত পরিচয় : উপাখ্যানগুলোতে পুরুষেরা সম্ভোগে অক্লান্ত, কিন্তু অসতী অবিশ্বাসিনীর অপবাদ বইতে হয়েছে নারীদের। আরব্য রজনীর কবি পুরুষদের শিখিয়েছেন [দ্র ক্ষিতীশ (১৯৮২, ১০)] :

> ওগো বন্ধু, বিশ্বাস করো না তাকে।
> মুচকি হেসে উপেক্ষা করো তার ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা
> দয়িতের জন্যে ছলাকলা,
> আর প্রতারণা– কিছুই অসাধ্য নয় তার।
> একান্ত নিবিষ্ট মনে যখন সে পশমের কারুকার্যে রত,
> তখনো আচ্ছন্ন থাকে পরকীয়া প্রেমে
> মনে রেখো সেই কথা– ইউসুফের,
> কান পেতে শোনো সেই আদমের মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন–
> আজও শোনা যায়...

সব ধর্মেই নারী অশুভ, দূষিত, কামদানবী। নারীর কাজ নিষ্পাপ স্বর্গীয় পুরুষদের পাপবিদ্ধ করা; এবং সব ধর্মেই নারী অসম্পূর্ণ মানুষ। নারী কামকূপ, তবে সব ধর্মই নির্দেশ দিয়েছে যে নারী নিজে কাম উপভোগ করবে না, রেখে দেবে পুরুষের জন্যে; সে নিজের রন্ধ্রটিকে একটি অক্ষত টাটকা সতীচ্ছদে মুড়ে তুলে দেবে পুরুষের হাতে। পুরুষ সেটি ইচ্ছেমতো ভোগ করবে, নিজের জমি যেভাবে ইচ্ছে চষবে। ইসলাম নারী সম্পর্কে এ-ধারণাই পোষণ করে। ইসলামে একজন নারী, সে যতোই অসাধারণ হোক, একজন পুরুষের, সে যতোই তুচ্ছ অপদার্থ পাশবিক হোক, অর্ধেক। গাজ্জালি বলেছেন, 'হাওয়া নিষিদ্ধ ফল খেয়েছে ব'লে আল্লা তাকে আঠারো রকমের শাস্তি দিয়েছে।' এর মাঝে রয়েছে ঋতুস্রাব, গর্ভ, নিজের পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্নতা, অচেনা পুরুষের সাথে বিয়ে ও তার বাড়িতে বন্দীজীবন কাটানো প্রভৃতি, এবং নারীকে দেয়া হয়েছে মেধার ১০০০ উপাদানের মধ্যে মাত্র একটি, আর পুরুষকে, সে যতোই দুশ্চরিত্র হোক, দেয়া হয়েছে বাকি ৯৯৯টি [দ্র মাইলস (১৯৮৮, ৬৯-৭০)]। ইসলামে পুরুষ নারীর থেকে তুলনাহীনভাবে শ্রেষ্ঠ, এবং নারী হচ্ছে কামসামগ্রী– পৃথিবী থেকে বেহেশত পর্যন্ত।

কোরান-এ আছে :

পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্যে যে পুরুষ ধনসম্পদ ব্যয় করে।... স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদের প্রহার করো [সুরা নিসা : ৩৪]।

হাদিসে রয়েছে [*মিশকাত,* দ্র রফিক (১৯৭৯, ১৮১)] :

যদি আমি অন্য কাউকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা কবতে।

পুরুষ ও নারী ইসলামে ব্যক্তি হিশেবে প্রভু ও দাসী। পুরুষের প্রতিনিধিরূপে প্রতিটি পরিবারে কাজ করে স্বামী, নারীর প্রতিনিধিরূপে স্ত্রী। নারী দাসী, তবে সম্ভোগের বস্তুও। সব রকম সম্ভোগের চূড়ান্তরূপ হচ্ছে নারীসম্ভোগ; এবং এ-ধর্মেও নারীকে নির্দেশ করা হয়েছে কামসামগ্রীরূপে; পুরুষের কামকে পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আর নারীর কামকে ক'রে দেয়া হয়েছে নিষিদ্ধ।

কোরান-এ আছে :

তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র; তাই তোমবা তোমাদেব শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে প্রবেশ কবতে পারো [সুরা বাকারা : ২২৩];

হাদিসে আছে [দ্র নূর মোহাম্মদ (১৯৮৭, ১৮৭-২০১); রফিক (১৯৭৯, ১৮১-১৮৩)] :

পুরুষের পক্ষে নাবী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমাব পরে আব কিছু রাখিয়া যাইতেছি না।

সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। কেননা বনি ইস্রাইলের প্রতি যে প্রথম বিপদ আসিয়াছিল তাহা নারীদের ভিতর দিয়াই আসিয়াছিল।

অকল্যাণ রহিয়াছে তিন জিনিসে নাবী, বাসস্থান ও পশুতে।

নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়।

নারী হইল আওরত বা আবরণীয় জিনিস। যখন সে বাহির হয় শয়তান তাহাকে চোখ তুলিয়া দেখে।

যখন কোনো রমণীকে তার স্বামী শয্যায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে এবং তার জন্য তার স্বামী ক্ষোভে রাত কাটায়–সেই রমণীকে প্রভাত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ অভিশাপ দেয়।

স্ত্রীগণকে সদুপদেশ দাও, কেননা পাঁজরের হাড় দ্বারা তারা সৃষ্ট। পাঁজবেব হাড়ের মধ্যে ওপরের হাড় সবচেয়ে বাঁকা–যদি ওকে সোজা করতে যাও তবে ও ভেঙে যাবে, যদি ছেড়ে দাও তবে আরো বাঁকা হবে।

পুরুষ নারীর বাধ্য হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এর সারকথা হচ্ছে নারী অবাধ্য, অশুভ, ও কামুক। তবে নারী তার কাম চরিতার্থ করতে পারবে না, পুরুষ নারীতে চরিতার্থ করবে কাম। ইসলামে কামসামগ্রী নারীর চরম রূপ হূর বা স্বর্গের উর্বশী। পুরুষের কামকল্পনা চূড়ান্ত রূপ ধরেছে হূর-এ। বেহেশত সম্পূর্ণরূপে পুরুষের প্রমোদপল্লী; অধিকাংশ নারী জ্বলবে দোজখে [হাদিসে

আছে : 'দোজখ পরিদর্শনকালে আমি দোজখের দ্বারে দাঁড়ালাম এবং জানতে পারলাম যে দোজখীদের মধ্যে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ' : হাদিস, দ্র *বোখারী শরীফ*, ২১৬], আর পুরুষেরা বেহেশতে রত থাকবে নিরন্তর ইন্দ্রিয়চর্চায়। হুররা চূড়ান্ত যৌনাবেদনময়ী নারী, যাদের দেহ হচ্ছে পুরুষের আদিম কামকল্পনার প্রতিমূর্তি।

কোরান-এ আছে :

ওদের সঙ্গিনী দেবো আয়তলোচনা হূর [সুরা দুখান : ৫৪]।

সাবধানীদের জন্যে রয়েছে সাফল্য উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র [সুরা নাবা : ৩১-৩৪]।

সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না যাদের এর আগে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নি [সুরা রাহমান : ৫৬]।

আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়তলোচনা হূরের সঙ্গে [সুরা তূর : ২০]।

হাদিসে আছে [দ্র রফিক (১৯৭৯, ৩০১)] :

হরিণনয়না স্বর্গসুন্দরীগণ তাদের পত্নী হবে। তারা সবাই (৩৩/৩৪ বছরের পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত) সমবয়স্ক হবে।

যদি বেহেশতের কোনো নারী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতো তবে তার দেহভরা মৃগনাভির সৌরভে পৃথিবী ভরপুর হয়ে যেতো এবং তার সৌন্দর্যে সূর্য ও চন্দ্র মলিন হতো।

গাজ্জালি নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়ভারাতুর কল্পনা প্রয়োগ ক'রে দিয়েছেন এ-নারীদের রূপের ইন্দ্রিয়উত্তেজক, আধুনিক দৃষ্টিতে হাস্যকর, বর্ণনা [দ্র রফিক (১৯৭৯, ৩০২)]:

সেখানে অপ্সরাসদৃশ পুণ্যময়ী নারীরা রয়েছে, আল্লাহ তাদের আলোকের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারা যেন মরকত ও প্রবালের মতো। আনতনয়না সে-নারীরা তাদের স্বামী ব্যতীত আর কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, জ্বিন ও মানবদের মধ্যে কেউই তাদের ইতিপূর্বে স্পর্শ করে নি, তাদের স্বামীরা যখনই তাদের সাথে মিলিত হবে তখনই তাদের কুমারী দেখতে পাবে; তাদের গলায় থাকবে নানা রঙের সত্তরটা ক'রে হার, কিন্তু সেগুলো তাদের শরীরে একটা কেশের মতোও ভারী মনে হবে না। যেমন কাঁচের গেলাসের লাল শরাব বাইরে থেকে দেখা যায় তেমনি তাদের অস্থি, মাংস, চর্ম, কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়ে তাদের সর্বাঙ্গ দেখা যাবে। তাদের মাথায় চুল মুক্তা ও পদ্মরাগমণি দ্বারা সুশোভিত থাকবে।

বেহেশত পুরুষের বিলাসস্থল, সেখানে পার্থিব নারী বা স্ত্রীদের স্থান নেই। পৃথিবীতে তারা চুক্তিবদ্ধ দাসী, স্বর্গে অনুপস্থিত বা উপেক্ষিত। ইসলামি আইনে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এ-দৃষ্টিকোণ থেকেই।

শরিয়া আইনের উৎস কোরান ও সুন্নাহ; এ-আইনও ঐশী। তবে এতে প্রাকইসলাম আরবের নানা রীতির মধ্য থেকে বিশেষ কিছু রীতিকে বেছে নিয়ে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ইসলামি রীতি বা আইনরূপে। প্রাকইসলাম আরবের সে-সমস্ত রীতিই গৃহীত হয়েছে ইসলামে, যা খর্ব করে নারীর অধিকার; যা আগের স্বাধীন নারীকে পরিণত করে পুরুষের দাসীতে। ইসলামি আইন বিবর্তনশীল নয়, তাই দেশেদেশে মুসলমান নারীর মৌলিক অধিকার চোদ্দো শো বছর আগে যা ছিলো, এখনো তাই আছে; তবে নানা

দেশে নারীকে দেয়া হয়েছে এমন কিছু অধিকার, যা ইসলামসম্মত নয়। বাঙলাদেশি ও সৌদি নারীর মূল অধিকার একই, যদিও বাঙলাদেশি নারী সৌদি নারীর থেকে কিছুটা বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে, ধর্মের বিধি অনুসারে যা তার প্রাপ্য নয়। এ-আইন নারীকে দিয়েছে কিছুটা সম্পত্তির অধিকার, যা অন্য কোনো সনাতন আইন দেয় নি; তবে এ-আইনে দুটি নারী একটি পুরুষের সমান, আর স্বামী হচ্ছে নারীর প্রভু। অনেক মুসলমান দেশে এখন সংবিধানে বলা হয় নারীপুরুষের অধিকার সমান, কিন্তু বিশেষ আইনে এসে দেখা যায় ওই সাম্য সংবিধানের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে, কিন্তু নারীকে রাখা হয়েছে পুরুষের অধীনে। যেমন, কাতারের সংবিধানে (১৯৭০ : বিধি ৯) বলা হয়েছে : 'জাতি, লিঙ্গ বা ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক ভোগ করবে সমানাধিকার'; তবে কাতারে, ও আরো নানা মুসলমান রাষ্ট্রে, নারীর ভোটাধিকারই নেই। মরক্কোর সংবিধানে এক জায়গায় নারীদের আইনগত, রাজনীতিক, ও আর্থনীতিক সমানাধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু একটু পরেই আরেক বিধিতে নারীকে ক'রে তোলা হয়েছে স্বামীর আইনসঙ্গত দাসী। এ-বিধিতে বলা হয়েছে : স্ত্রী বাধ্য ও বিশ্বস্ত থাকবে স্বামীর কাছে, স্বামীর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের সম্মান করবে, এবং স্ত্রী যদি নিজের বাপমাকেও দেখতে যেতে চায়, তখনো স্বামীর অনুমতি নিতে হবে [দ্র নিউল্যান্ড (১৯৭৯, ২৪)]। ইসলামি আইনে স্বামীর বাধ্য থাকা স্ত্রীর আইসঙ্গত দায়িত্ব। এ-আইন স্ত্রীকে কিছুটা আর্থ অধিকার দিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছে বহু ব্যক্তিগত অসুবিধার শেকলে।

পিতৃতান্ত্রিক আইনে বিয়ে হচ্ছে নারীবলি, শরিয়ায়ও তাই। ইসলামে বিয়ে ঐশী ধর্মানুষ্ঠান নয়, বিয়ে একটি রসকসহীন কর্কশ চুক্তি [দ্র এম হিদায়াতুল্লাহ ১৯০৬, ২৮২)]। এ-চুক্তি দুটি সমমানুষের মধ্যে নয়, অসম মানুষের মধ্যে; তাই ইসলামে বিয়ে এক অসম চুক্তি, যাতে পুরুষটি ভোগ করে চুক্তির সুবিধা, আর নারীটি ভোগ করে পীড়ন। এ-আইনে স্ত্রী হয়ে ওঠে চুক্তিবদ্ধ দাসী; সে নিজেকে চুক্তি ক'রে সমর্পণ করে একটি পুরুষের খেয়ালখুশির কাছে। বিয়ের চুক্তিকে এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২২৮) তুলনা করেছিলেন মালিক ও শ্রমিকের অসম চুক্তির সাথে। তিনি দেখান যে মালিক ও শ্রমিক যখন চুক্তি করে, তখন কাগজেকলমে মনে হয় যেনো তারা স্বেচ্ছামূলক চুক্তি করেছে; আইন এ-নিয়েই খুশি থাকে। মালিক পক্ষ যে বেশি শক্তিশালী, তার চাপ যে মারাত্মক, আইন মাথা ঘামায় না তা নিয়ে; যতোক্ষণ চুক্তি বলবৎ থাকে ততোক্ষণ মনে করা হয় যে তারা ভোগ করছে সমান অধিকার। বিয়ের চুক্তিও এমনি; আইন এটুকুতেই সন্তুষ্ট যে দু-পক্ষই সম্মতি জানিয়েছে। বাস্তব জীবনে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে আইনের উদ্বেগ নেই। ইসলামি আইনে বিয়ের চুক্তি মালিক-শ্রমিকের চুক্তির থেকেও ভয়াবহ ও শোষণমূলক, কেননা এখানে চুক্তি ক'রেই একজনকে দেয়া হয় অশেষ অধিকার এবং আরেকজনের প্রায় সমস্ত অধিকার বাতিল হয় কিছু সুযোগসুবিধার বিনিময়ে। ইসলামি আইনে স্ত্রী হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ দাসী, যে স্বামীকে দেবে যৌনতৃপ্তি ও বৈধ সন্তান, কিন্তু স্বামী যখন ইচ্ছে মনের খেয়ালে শুধু তিনবার 'তালাক' ব'লে ছেড়ে দিতে পারবে তাকে। চুক্তির কথা বলা হ'লেও ইসলামি বিয়েতে পুরুষ ও নারীটি চুক্তিতে আসে না, চুক্তিতে

আসে পুরুষ ও নারীর অভিভাবক। বিয়েতে নারীর সম্মতির কথাও বলা হয়, কিন্তু তা সম্মতির অভিনয়। ইসলামি বিয়ের চুক্তির ব্যাখ্যা আনোয়ার আহমদ কাদরির বই থেকে, কিম্ভূত বাঙলায়, অনুবাদ করেছেন এক ভাষ্যকার। তাঁর অনুবাদ : 'ইহা এমন এক চুক্তি যাহার দ্বারা একজন পুরুষ কর্তৃক একজন নারীকে সম্ভোগের অধিকার দ্বারা দখল করা বুঝায়' [দ্র মোঃ মজিবর (১৯৮৯, ৫৩)]। ইসলামি বিবাহচুক্তির নৃশংসতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে উৎকট বাঙলায় অনুদিত ভাষ্যটিতে। বিয়েতে একটি পুরুষ 'দখল করে' একটি নারীকে; দখল করে 'সম্ভোগের অধিকার দ্বারা'! 'সম্ভোগ' ও 'দখল' দুটিই নৃশংস প্রভুর কাজ। এ-চুক্তির অনন্ত সুফল উপভোগ করে পুরুষ, নারী হয় শিকার। ক্রীতদাসীও এমনভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে না প্রভুর কাছে যেভাবে করে মুসলমান স্ত্রী। ইসলামে বিয়ে যেহেতু চুক্তি, তাই তা চিরস্থায়ী নয়; যে-কোনো সময় স্বামী তা বাতিল করতে পারে। তবে এতেও পুরুষ সুখ পায় নি, তারা নিয়েছে একেবারে অস্থায়ী চুক্তির সুবিধাও, যা দেখা যায় শিয়াসম্প্রদায়ের 'মুতা' বিয়েতে। মুতা বিয়ে হচ্ছে এক বিশেষ সময়ের জন্যে, একদিনের বা একরাতের জন্যেও হ'তে পারে, বিয়ে বা যৌনচুক্তি। এ-বিয়ের চুক্তিতে নারী হয়ে ওঠে শুধুই উপভোগ্য মাংস।

ইসলাম নারীকে কিছু আর্থ সুবিধা দেয়, যা অন্য কোনো ধর্ম দেয় না। বিয়ের চুক্তির ফলে স্ত্রী স্বামীর কাছে থেকে পায় দেনমোহর : কিছু টাকা বা সম্পত্তির লিখিত প্রতিশ্রুতি। ওই দেনমোহর শুধু কাবিনে লেখা থাকে, স্ত্রী তা সাধারণত পায় না, এমনকি বিচ্ছেদ হ'লেও দেনমোহর সাধারণত আদায় করতে পারে না। দেনমোহর পরিমাণে হয় খুবই কম : হানাফি আইনে কমপক্ষে ১০ দিরহাম, মালিকি আইনে কমপক্ষে ৩ দিরহাম, আর হাদিস অনুসারে কমপক্ষে ১টি লোহার আংটি! বিয়ে স্ত্রীকে খোরপোষের অধিকার দেয়; স্ত্রীটির ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। ভরণপোষণের অধিকারের জন্যে স্ত্রীকে থাকতে হবে স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত, মেনে চলতে হবে স্বামীর নির্দেশ। স্বামী যেখানে থাকবে বা যেখানে থাকার জন্যে স্ত্রীকে নির্দেশ দেবে, সেখানেই থাকতে হবে স্ত্রীকে; স্ত্রী তা অমান্য করলে ভরণপোষণের অধিকারী হবে না। ইসলামে কন্যা পিতার সম্পত্তির ও স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে; কিন্তু তাদের অংশ খুবই কম। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার রয়েছে। পিতা যদি শুধুই একটি কন্যা রেখে মারা যায়, তবে সে পায় পিতার সম্পত্তির ১/২; আর ভাই থাকলে বোনের অংশ ভাইয়ের অংশের ১/২। স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির কতোটা পায়? সামান্য। স্বামী কিন্তু পায় স্ত্রীর সম্পত্তির একটি বড়ো অংশ। স্ত্রী কোনো সন্তান না রেখে মারা গেলে স্বামী তার সম্পত্তির ১/২ পায়, কিন্তু স্বামী কোনো সন্তান না রেখে মারা গেলে স্ত্রী পায় স্বামীর সম্পত্তির ১/২; আর সন্তান রেখে গেলে পায় স্বামীর সম্পত্তির ১/৮। তাই কন্যা বা স্ত্রী অর্থাৎ নারী আর্থিকভাবেও প্রতারিত, যদিও অর্থের প্রয়োজন তারই বেশি।

শরিয়া নারীকে কিছু আর্থ ও সম্পত্তির অধিকার দিয়ে কেড়ে নিয়েছে তার অন্যান্য অধিকার। মুসলমান পুরুষ বিয়ে করতে পারে ঐশীগ্রন্থে বিশ্বাসী যে-কোনো ধর্মের নারী;

অগ্নি বা মূর্তিপূজারিণীও বিয়ে করতে পারে, কিন্তু মুসলমান নারী অমুসলমান বিয়ে করার অধিকারী নয়। তবে শরিয়া আইনে নারীর প্রধান সংকট হচ্ছে স্বামীর বহুবিবাহের ও স্বেচ্ছাচারী তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার। তালাক মুসলমান নারীর জীবনে সবচেয়ে ভয়ংকর শব্দ, ওই বজ্র যে-কোনো সময় নীলাকাশ থেকে তার মাথায় এসে ফাটতে পারে। মুসলমান পুরুষ চারটি বৈধ বিয়ে করতে পারে, পঞ্চম একটিও করতে পারে। পঞ্চম বিয়ে করলে বিয়েটি বাতিল হয় না, শুধু তার দরকার পড়ে আগের একটি স্ত্রীকে এক-দুই-তিন ক'রে তালাক দেয়া। মুসলমান পুরুষের জন্যে তার চারটি স্ত্রী সম্ভোগই শুধু বৈধ নয়, সে তার ক্রীতদাসীদের সাথেও সঙ্গম করার অধিকারী। মোহাম্মদ ইবনে সাদ *এল তবকত এল কোবরা*-য় (১৯৭০) ক্রীতদাসী সম্ভোগের একটি আকর্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন [দ্র নওঅল (১৯৮০, ১৯৭)]।

কোরান-এ আছে :

> বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাদের তোমাদের ভালো লাগে, দুই তিন, অথবা চার, আর যদি আশংকা করো যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে [সুরা নিসা : ৩]।

হাদিসে আছে [দ্র নুর মোহাম্মদ (১৯৮৭, ২৪৬)] :

> হজরত জাবের (রাঃ) বলেন : এক ব্যক্তি রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল : হুজুর, আমার একটি দাসী আছে; সে আমাদের খেদমত করে। আমি তাহাকে উপভোগ করি অথচ তাহার গর্ভধারণ করাকে আমি পছন্দ করি না। হুজুর বলিলেন : ইচ্ছা থাকিলে 'আজল' করিতে পার।
>
> হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন : আমরা রছুলুল্লাহর (ছঃ) সাথে বনি মুস্তালিক যুদ্ধে বাহির হইলাম এবং তথায় আমরা বহু যুদ্ধবন্দী লাভ করিলাম। এ সময় আমাদের নারী সঙ্গমের আকাঙ্খা জাগিল এবং নারীবিহীন থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল কিন্তু আমরা (যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে) 'আজল' করাকেই পছন্দ করিলাম;...আমরা তাঁহাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন : না করিলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি হইবে না।

শরিয়া আইনে প্রতিটি নারীর ভাগে পড়ে একচতুর্থাংশ স্বামী, যদিও এ-ধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে যে নারীর কাম অত্যন্ত প্রবল। মিলেট (১৯৬৯, ১১৯) হিশেব ক'রে দেখিয়েছেন এক স্বামীর চারটি স্ত্রী থাকলে স্বামী ও প্রতিটি স্ত্রীর সঙ্গমসুযোগের অনুপাত হয় ১:১৬; প্রতিটি নারী যেখানে পায় তার স্বামীর যৌনপ্রতিভার সিকিভাগ, সেখানে স্বামীটি ভোগ করে চারটি স্ত্রীর প্রবল কাম। তবু আরবি চেতনায় নারী হচ্ছে *ফিৎনা*, যার কাম এলোমেলো ক'রে দিতে পারে সমাজ। বলা হয় চারটি বিয়ে সে-পুরুষই করার অধিকারী, যে সমান আচরণ করতে পারবে স্ত্রীদের সাথে। সমান আচরণ নারীকে সম্মানিত করে না, শুধু জানিয়ে দেয় তারা পুরুষের সম্ভোগের সামগ্রী। ওই সাম্য চুক্তিবদ্ধ দাসীদের বা শয্যাসঙ্গিনীদের মধ্যে মৌখিক বা চুক্তির সাম্য; কিন্তু কামে আর আবেগে সাম্য কখনোই সম্ভব নয়।

শরিয়ায় বিয়ে হচ্ছে পুরুষাধিপত্যের চুক্তি; পুরুষ ওই চুক্তি রদ করতে পারে

স্বেচ্ছাচারিতার সাথে। ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক গেলাশ থেকে জল ঢালার থেকেও সহজ– স্বামীর জন্যে; আর স্ত্রীর জন্যে ফাঁসির রজ্জু খোলার মতোই কঠিন। অধিকাংশ মুসলমান রাষ্ট্রেই নারী জীবন কাটায় তালাকের খড়্গের নিচে, যে-কোনো সময় ওই খড়্গ নেমে আসতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে তালাক সাধারণ ঘটনা, সেখানে সম্পদশালীরা নিয়মিতভাবে তরুণী স্ত্রী গ্রহণ ক'রে বেহেশতের কিছুটা স্বাদ পেতে চায় ব'লে ব্যবহৃতাদের বাতিল না করলে চলে না। মুসলমানের এক সাথে চারটি স্ত্রী রাখার অধিকার রয়েছে, তবে তাতেও তার ক্ষুধা মিটতে নাও পারে; এবং সাধারণত মেটে না। ইসলামে স্বামীর পক্ষে তালাক দেয়া এতো সহজ ও সুবিধাজনক যে ওই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তার পক্ষে একই সাথে অসংখ্য স্ত্রী রাখা সম্ভব; এবং আরব অঞ্চলে ধনীরা এ-সুবিধা নিয়ে থাকে। আরব অঞ্চলে 'ইদ্দা' নামক একটি বিধান রয়েছে। ওই বিধান অনুসারে স্বামী তিন মাসের জন্যে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে; এবং তারপর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। এ-সময়ে স্বামীটি আরেকটি বিয়ে করতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে স্বামীটি ঘরে চারটি স্ত্রী রাখতে পারে, এবং আরো চারটি রাখতে পারে 'ইদ্দা' তালাকে বেঁধে। অর্থাৎ এ-সময়ে তার থাকে চারটি সক্রিয় স্ত্রী, আর চারটি ছুটিভোগরত স্ত্রী। এভাবে সে চারটিকে ঘরে ও চারটিকে তালাক-ছুটিতে রেখে সম্ভোগ করতে পারে অসংখ্য নারী। এ হচ্ছে ইসলামে নারীর মর্যাদা [দ্র নওঅল (১৯৮০, ২০৬)]। মুসলমান স্বামী কোনো কারণ না দেখিয়েই যে-কোনো সময় শুধু তিনবার 'তালাক' উচ্চারণ ক'রে স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পারে; তবে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। স্ত্রীর তালাক দেয়ার সহজাত স্বাধীন অধিকার নেই। তবে স্ত্রীও স্বামীকে তালাক দিতে পারে, যদি বিয়ের কর্কশ কাবিনে স্বামী তাকে সে-অধিকার দিয়ে থাকে! তালাক দেয়ার প্রভু হচ্ছে পুরুষ, সে কোনো কারণ না দেখিয়ে একের পর এক স্ত্রী তালাক দিতে পারে; আর নারীকে ওই অধিকার পেতে হয় প্রভুরই কাছে থেকে। স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিলে দেনমোহরটুকুও সে পায় না, আর স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্ত্রী শুধু দেনমোহর ছাড়া স্বামীর সম্পত্তির একরত্তিও পায় না. দেনমোহর আদায় করাই হয়ে ওঠে কঠিন কাজ। বাঙলাদেশে বহুবিবাহ ও তালাকরীতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ* (১৯৬১) গৃহীত হওয়ার পর। তবে এ-আইনও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে নি, শুধু সামান্য নিয়ন্ত্রণের, এবং তালাকে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাসের চেষ্টা করেছে। নারী এখনো হয়ে আছে শরিয়ার শিকার।

নারীর শত্রুমিত্র : রুশো, রাসকিন, রবীন্দ্রনাথ, এবং জন স্টুয়ার্ট মিল

পিতৃতন্ত্র সৃষ্টি করেছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা; তৈরি করেছে ধর্ম, দর্শন, আইন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা; এবং পৃথিবী ভ'রে জন্ম দিয়েছে তার প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ প্রতিভাদের। ওই প্রতিভারা মনীষী, মানুষপ্রজাতির গৌরব; অমর তাঁরা। তাঁদের স্তবে মুখর মানুষ; পুরুষেরা মুখর, পুরুষের কাছে শুনে শিখে নারীরাও মুখর। পুরুষ নারীদের এমনভাবে ছাঁচে ফেলে নিজেদের উপযুক্ত ক'রে নিয়েছে যে নারীরা স্তব করে নিজেদের শত্রুদেরও। পুরুষ প্রতিভারা বিকাশ ঘটিয়েছেন সভ্যতার, মানুষপ্রজাতির অনন্ত সম্ভাবনার প্রতিমূর্তি তাঁরা; তাঁদের ছাড়া মানুষের কয়েক হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস অন্ধকার। মহাকালের আলোকশিখা তাঁরা : বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, সফোক্লিস, প্লাতো, আরিস্ততল, দান্তে, শেক্সপিয়র, কনফুসিয়াস, রুশো, রবীন্দ্রনাথের মতো অজস্র শিখায় উজ্জ্বল সৌরলোক। ওই শিখারা পুরুষের শিখা. ওই প্রতিভারা পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি, ওই মনীষীরা সবাই পুরুষতন্ত্রের পুরোহিত। তাঁরা, প্রায়-সবাই, মানুষ বলতে বুঝেছেন নিজেদের লিঙ্গকে অর্থাৎ পুরুষকে; নারীকে মনে করেছেন শুধুই নারী, মানুষ নয় বা বিকলাঙ্গ মানুষ। পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে জন্মেছেন যতো মহাপুরুষ, তাঁরা সবাই মগজ চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে ভেবেছেন পুরুষের বিকাশ, প্রতিষ্ঠা ও মহিমার কথা, নারীকে করেছেন উপেক্ষা; আর যখন নারীর কথা ভেবেছেন, তখন তাকে দেখেছেন অবিকশিত মানুষরূপে, যার কোনো স্বায়ত্তশাসিত অস্তিত্ব নেই। তাঁদের কাছে নারী হচ্ছে পুরুষের পাদটীকা। তাঁরা রচনা ক'রে গেছেন বহু বাণী, ওই বাণী পৃথিবীকে এগিয়ে দিয়েছে এবং পেছনের দিকে টেনে ধরেছে; তাঁদের উদঘাটিত অনেক সত্য আলো দিয়েছে, আবার তাঁদের অজস্র মিথ্যা অন্ধকার ক'রে রেখেছে মানুষের চারপাশ। ওই অন্ধকার কেটে নতুন আলো সৃষ্টি করতে লাগছে দীর্ঘ সময়, ওই অন্ধকার এখনো কাটে নি। নারী সম্পর্কে তাঁরা ছড়িয়েছেন অন্ধকার, রচনা করেছেন অভিনব অনন্ত কুসংস্কার; আর পুরুষতন্ত্র তাঁদের অন্ধকার ও কুসংস্কারে ঢেকে রেখেছে নারীকে। প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পুরুষতন্ত্রের মনীষীদের নারীবিষয়ক সমস্ত সিদ্ধান্ত ভুল ও প্রতিক্রিয়াশীল, এবং নারীদের জন্যে অশেষ ক্ষতিকর। নারীদের সম্পর্কে পুরুষরা বইয়ের পর বই লেখে, বিধানের পর বিধান দেয়। ভার্জিনিয়া উল্ফ্ (১৯২৯, ৪০-৪১) নারীদের সম্বোধন ক'রে বলেছেন :

> আপনাদের কি ধারণা আছে প্রত্যেক বছর নারীদের নিয়ে কতো বই লেখা হয়? আপনাদের কোনো ধারণা আছে তার কতোগুলো পুরুষের লেখা? আপনারা কি অবগত যে আপনারা, সম্ভবত,

মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত প্রাণী?...নারী আকর্ষণ ক'রে সাধারণ প্রাবন্ধিকদের, লঘু ঔপন্যাসিকদের, এমএ ডিগ্রিপ্রাপ্ত তরুণদের; এবং সে-সব পুরুষদের যাদের কোনো ডিগ্রি নেই; যাদের একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে তারা নারী নয়।

পুরুষতন্ত্রের প্রতিভাদের চোখে পুরুষ সূর্য; ওই পুরুষ-সৌরলোকে নারী তুচ্ছ অবজ্ঞেয় গ্রহের মতো, যে জীবন পেয়েছে পুরুষসূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হওয়ার জন্যে। তাঁরা কখনো মুখর হয়েছেন নারীনিন্দায়, নারীর মুখে মেখে দিয়েছেন সবচেয়ে কালো কলঙ্ক, এমন কোনো অপবিশেষণ নেই যাতে তাঁরা নারীকে তিরস্কার করেন নি। তাঁরা তৈরি করেছেন নারীকে বেঁধে রাখার শক্ত শেকল; আর যাঁরা একটু নারী ও আবেগকাতর, নৃশংস হ'তে যাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেছেন, তাঁরা নারীকে পরিণত করেছেন পোষা আদুরে বেড়ালে। তাঁদের কাছে নারী বিশেষ উপযোগী প্রাণী, যাকে সম্ভোগ করা যায়, যে সন্তান জন্ম দিয়ে টিকিয়ে রাখে পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রকে; এ ছাড়া নারীর আর কোনো উপযোগিতা নেই তাঁদের কাছে। নারী যে মানুষ, পুরুষের মতোই মানুষ বা পুরুষ তারই মতো মানুষ, পুরুষের মতোই যে নারী সম্ভাবনাময়, এটা মনে হয় নি তাঁদের : নারীকে তাঁরা ক'রে রাখতে চেয়েছেন পুরুষের দাসী, ভোগ্যপণ্য, তৃষ্ণার শান্তি। এ-লক্ষ্য থেকে তাঁরা যা-কিছু লিখেছেন, সে-সবকে বলা হয় দর্শন, কাব্য, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা! ওই প্রতিভারা সবাই নারীর শত্রু, কেউ হিংস্রভাবে, মনোরমভাবে কেউ; কেউ নারীর দিকে পাথর ছুঁড়েছেন, কেউ আলিঙ্গন করতে গিয়ে পিশে মেরেছেন নারীকে। নারীর শত্রুতে ভ'রে আছে সময় ও সভ্যতা; নারীর মিত্র বেশি নেই, উনিশশতকের আগে মিত্ররা দেখা দেন নি। পুরুষতন্ত্রের প্রতিভারা নারীদের বিরুদ্ধে ও বশে রাখার জন্যে লিখেছেন হাজারহাজার পৃষ্ঠা, খণ্ডখণ্ড রচনাবলি, পেয়েছেন অমরতা; তাঁরা নারী সম্পর্কে সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা, যদিও ওগুলোকে পরম সত্য ব'লে পুজো করা হয়েছে শতকের পর শতক। এখনো করা হয়। তাঁদের সবার মত বিচার করা অসম্ভব ও নিরর্থক; খুব পুরোনো মনীষীদেব মতও বিচার করার দরকার নেই। আধুনিক সময়ের পুরুষতন্ত্রের প্রতিভাদের কয়েকজনের মত বিচার করলেই আধুনিক পিতৃতন্ত্রের নারীদর্শনের রূপটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমি বেছে নিচ্ছি চারজনকে : রুশো [১৭১২-১৭৭৮], রাসকিন [১৮১৯-১৯০০], রবীন্দ্রনাথ [১৮৬১-১৯৪১], যাঁরা পড়েন নারীদের শত্রুগোত্রে; এবং মিলকে [১৮০৬-১৮৭৩], যিনি নারীদের মহান মিত্র।

এ-চারজনকে অকারণে নিচ্ছি না, নিচ্ছি বিশেষ কারণে। মানবমুক্তি ও সাম্যের রোম্যানটিক দার্শনিক জাঁ-জাক রুশোর প্রভাব পড়েছে পৃথিবী জুড়ে, তাঁর চোখেই তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তরা নারীর মুখ দেখছে দু-শো বছর ধ'রে। রুশো সম্বন্ধে ভুল ধারণা রয়েছে অধিকাংশের;– যেহেতু তিনি চেয়েছিলেন মানুষের মুক্তি, তাই অনেকেরই ধারণা যে তিনি চেয়েছিলেন নারীরও মুক্তি, কেননা নারী মানুষেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিস্ময়কর ও শোকাবহ সত্য হচ্ছে যে মানুষের সাম্যমুক্তির এ-দার্শনিক চেয়েছিলেন পুরুষের সাম্যমুক্তি। নারীকে তিনি প্রবল উৎসাহে ধার্মিকের মতো বলি দিয়েছিলেন

পুরুষের যূপকাঠে। নারীর বেলায় রুশো পাঁড় প্রতিক্রিয়াশীল, নারীর তিনি অদ্বিতীয় শত্রু। জন রাসকিন ছিলেন ভিক্টোরীয় কপট নৈতিকতার এক বড়ো প্রবক্তা; নারীকে 'রানী' ব'লে ডেকেডেকে বেঁধে রাখার কৌশল বের করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল নারীবিষয়ক বক্তব্য নারীমুক্তির বাধারূপে কাজ করেছিলো পশ্চিমে; এবং তাঁর প্রভাব পড়েছিলো উনিশশতকের শেষভাগের শিক্ষিত বাঙালির ওপরও। তাঁরা নারীকে দেখেছিলেন কপট রাসকিনের চোখে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আধুনিক বাঙালির ওপর অশেষ। রোম্যানটিক এ-মহাকবিকেও মনে করা হয় মানুষের মুক্তির মহাপুরুষ ব'লে, কিন্তু তিনিও পুরুষেরই মহাপুরুষ। তিনিও নারীকে সম্পূর্ণ মানুষরূপে গণ্য করেন নি; নারীকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিসর্জন দিয়েছেন নারী নামক এক ভুল ধারণার পায়ে। রবীন্দ্রনাথ রুশো ও রাসকিনের মিশ্রণ, আবার তাতে লাগিয়েছেন ভারতীয় ভেজাল; এবং হয়ে উঠেছেন নারীর মুক্তির এক বড়ো প্রতিপক্ষ। পশ্চিমে প্রথম নারীদের পক্ষে যে-পুরুষ যুদ্ধে নেমেছিলেন, পুরুষতন্ত্রের সমস্ত কপটতা ও মিথ্যাচার উদঘাটন ক'রে নারীমুক্তির পথটিকে প্রশস্ত করেছিলেন, তিনি জন স্টুয়ার্ট মিল। স্টুয়ার্ট মিলের পথ ধ'রেই দেড় দশক পরে এসেছিলেন এঙ্গেলস, যিনি সম্পূর্ণ প্রগতিশীল, এবং যাঁর পিতৃতন্ত্রের ভাষ্যের পরিচয় আমি আগেই দিয়েছি। এ-চারজনের পরিচয়েই ধরা পড়ে নারীর সাথে আধুনিক পিতৃতন্ত্রের শত্রুমিত্রতার রূপটি।

জাঁ-জাক রুশো

মার্ক্স-পূর্ব কালের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক জাঁ-জাক রুশো, যাঁর রচনা অন্তত একটি বিপ্লব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলো। সাম্যবাদী মার্ক্সের রচনায় যেমন শ্রেণীসংগ্রাম, রোম্যানটিক রুশোর রচনায় তেমনি প্রকৃতি; এবং প্রকৃতি নামক মিথ্যার শেকলে রুশো বন্দী করেছেন নারীকে। রুশো বিভিন্ন রচনায় বিচার করেছেন নারীর প্রকৃতি বা স্বভাব, শিক্ষা, ও সামাজিক-রাজনীতিক ক্ষেত্রে নারীর স্থান। নারী সম্পর্কে তাঁর আবেগতাড়িত মত পশ্চিমকে বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়েছিলো, পশ্চিমের দেশেদেশে তাঁর মতকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছিলো উগ্রভাবে, কেননা পশ্চিম রুশোর মধ্যে পেয়েছিলো এক নতুন বিধানকর্তাকে। রুশো, ফরাশি বিপ্লবের দার্শনিক, বিরোধী ছিলেন সমস্ত শৃঙ্খলের, ভাঙতে চেয়েছিলেন সমস্ত শেকল ও মূর্তি; কিন্তু নারীর জন্যে তিনি তৈরি করেছিলেন অনেকগুলো শক্ত শেকল, এবং অবিনশ্বর ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন পিতৃতন্ত্রের তৈরি নারীমূর্তিটি। তাঁর বিখ্যাততম উক্তি : 'মানুষ জন্মে স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলিত'–সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য শুধু পুরুষ-মানুষের ক্ষেত্রে। 'মানুষ' বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন 'পুরুষ', নারী রুশোর কাছে মানুষ ছিলো না। নারী পরাধীনভাবে জন্ম নিলেও তাঁর কোনো আপত্তি থাকতো না, খুবই সুখী বোধ করতেন তিনি, কেননা তাহলে নারীকে সুচারুরূপে পুরুষাধীন করার জন্যে এতোগুলো বই তাঁকে লিখতে হতো না। নারী সম্পর্কে রুশোর দর্শনের সম্পূর্ণটাই ভ্রান্ত, যার সারকথা হচ্ছে : 'নারী জন্মে পুরুষাধীন, এবং তাকে চিরকাল পুরুষাধীন

রাখতে হবে' বা 'নারী জন্মে পুরুষাধীন, তবে কোনো নারী যদি স্বাধীনভাবে জন্ম নেয়, তবে পুরুষের কাজ হচ্ছে তাকে পুরুষাধীন করা।' মানুষ ও রুশোর জন্যে বিশেষ মর্মান্তিক যে সাম্যমুক্তির এ-দার্শনিক রচনা করেছিলেন নারীকে বন্দী করার দর্শন, যা বাতিল ক'রে দেয় তাঁর মূল দার্শনিক প্রতিপাদ্যকে। রুশো ছিলেন পিতৃতন্ত্রের এক বড়ো পুরোহিত। পিতৃতন্ত্র সৃষ্টি করেছে নারীপুরুষের যে-বিভেদ ও চালিয়েছে যে-পীড়ন, রুশো তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। নারী ও পুরুষের জন্যে তিনি নির্দেশ করেন সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন ও বিপরীত স্থান ও ভূমিকা। তবে তিনি নারীপুরুষের ভিন্ন স্থান ও ভূমিকাকে দাবি করেছেন ধ্রুব সত্যরূপে; তাঁর মতে, নারীপুরুষের প্রথাগত স্থান ও ভূমিকা কোনো প্রথা বা সামাজিক ব্যাপার নয়, তা প্রাকৃতিক। তবে তাঁর কাছে পুরুষের জন্যে যা প্রাকৃতিক নারীর জন্যে তা প্রাকৃতিক নয়, নারীপুরুষ রুশোর দর্শনে দুই প্রকৃতির অন্তর্গত। তাই প্রকৃতির এ-দার্শনিক সম্পূর্ণ ভিন্ন যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন কী প্রাকৃতিক নারীর জন্যে, আর কী প্রাকৃতিক পুরুষের জন্যে। নারীর প্রকৃতি রুশো নির্দেশ করেন নারীর ভূমিকা বা উপযোগিতা অনুসারে, অর্থাৎ নারীর যৌন ও সন্তান জন্ম দানের উদ্দেশ্য দিয়ে; আর পুরুষের প্রকৃতি নির্দেশ করেন পুরুষের চিন্তাশক্তি ও সৃষ্টিশীলতার অশেষ সম্ভাবনা দিয়ে। রুশোর নারী জৈবিক, পুরুষ অজৈবিক; নারী মাংস, পুরুষ দেবদূত। রুশোর নারী শারীরিক ও ইন্দ্রিয়গত; আর পুরুষ সৃষ্টিশীল ও মননশীল। এসব ধারণা রুশো পেয়েছেন প্রথা থেকে; এবং প্রথা থেকে পেয়েছেন নারী সম্পর্কে আরো অনেক অশীল ধারণা। পশ্চিমের পিতৃতন্ত্র যেমন নারীকে মনে করে সমস্ত অশুভর উৎস, রুশোর চোখেও নারী পৃথিবীর সমস্ত অশুভর প্রধান উৎস। নারী সম্পর্কে রুশোর সমগ্র দর্শনই ভ্রান্ত; তিনি তাঁর চারপাশে যা দেখেছেন, তাকেই ধ্রুবসত্য ব'লে গণ্য ক'রে চর্চা করেছেন দর্শনের।

রুশোর দর্শনে নারী হচ্ছে পুরুষের কামসামগ্রী, এবং তার স্থান পুরুষের অধীনে। নারী পুরুষের কামের তৃপ্তি যোগাবে, কিন্তু নিজে থাকবে কামবাসনাহীন। রুশোর মতে পুরুষের কাম অত্যন্ত মূল্যবান; নারীর কাজ হচ্ছে পুরুষের মূল্যবান কামকে চূড়ান্তরূপে পরিতৃপ্ত করা। রুশোর দর্শন হচ্ছে পুরুষ তার প্রবল কামাবেগ ও প্রমোদের জন্যে চায় যে নারী হবে পরম কামাবেদনময়ী ও চরম কামোত্তেজক; এবং একই সাথে পুরুষ আরো চায় যে নারী নিয়ন্ত্রণে রাখবে পুরুষের অনন্ত কামাবেগকে; তাই নারী হবে অযৌন ও শীতল সতী। নারীকে, একই সাথে ও শরীরে, হ'তে হবে তীব্র কামজাগানো অগ্নিগিরি ও তুষারের মতো পরিশুদ্ধ; অতিকামময়ী ও নিষ্কাম। নারীর কাছে রুশো চান যে নারী একই সাথে পরিপূর্ণ থাকবে লাজনম্র সতীত্বে ও চিত্রতারকার প্রচণ্ড যৌনাবেদনে; নারী হবে মর্মরের মতো শুদ্ধ, আবার তীব্রতম সুরার মতো কামোদ্দীপক, সবার জন্যে নয় শুধু স্বামীর জন্যে। একই শরীরে একই সাথে নারী হবে শুদ্ধতমা কুমারী ও বিলোল বেশ্যা। রুশো নিজে ছিলেন কামার্ত লম্পট, অনেক অবৈধ সন্তানের দায়িত্বহীন জনক, যিনি অনুরাগিণীদের গর্ভবতী ক'রে ফেলে যেতে দ্বিধা করেন নি, কিন্তু তিনিই আবার দর্শনচর্চার সময় খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন সঠিক পিতৃত্বের ব্যাপারে। বারবার

তিনি বলেছেন যে স্বামীদের নিশ্চিত হ'তে হবে তাদের স্ত্রীদের সতীত্বে, যাতে তাদের সন্তানেরা আসলেই হয় তাদের নিজেদের সন্তান। সাবধান থাকতে হবে যাতে তাদের পুকুরে মাছ না ধরে অন্য কেউ। রুশো নারী ও পুরুষের জন্যে প্রস্তাব করেছেন ভিন্ন নৈতিকতা। নারীদের সতী রাখার জন্যে আবদ্ধ ক'রে রাখতে চেয়েছেন বাড়িতে, যাতে নারীরা অন্য পুরুষের সংসর্গে এসে হারিয়ে না ফেলে তাদের সতীত্বের হীরের টুকরোটি। রুশোর কাছে সতীই শ্রেষ্ঠ নারী; সতীত্ব ছাড়া নারীর আর কোনো গুণ থাকতে পারে না। সাম্য ও মুক্তির এ-দার্শনিক নারীপুরুষকে এক মানদণ্ডে বিচার করেন নি, এটা বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক। রুশো বিখ্যাত মূর্তিভগ্নকারীরূপে, কিন্তু নারীর ব্যাপারে তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের চূড়ামণি।

রুশো নারীর বিরুদ্ধে পিতৃতন্ত্রের সমস্ত চক্রান্তকে, নারীর অধীন অবস্থা ও পীড়নকে, শুধু প্রথা হিশেবেই মানেন নি, একেই তিনি মনে করেছেন সত্য বা ধ্রুব। রুশো অবশ্য পিতৃতন্ত্র, পরিবার ও রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রক্রিয়া ঠিকমতো বোঝেন নি; রোম্যানটিক হিশেবে তিনি যা কল্পনা করেছেন, যা তাঁর আবেগকে তৃপ্ত করেছে, তাকেই তিনি ধ্রুব বা প্রাকৃতিক ব'লে মনে করেছেন। তাঁর মতে পুরুষাধিপত্য ও নারীর অধীনতা একান্তভাবেই প্রাকৃতিক। তিনি বিশ্বাস করেন পিতৃতান্ত্রিক প্রথা ও আইনে নারীপুরুষের যে-অসাম্য, তা মানুষের সৃষ্টি নয়; তা শাশ্বত, প্রাকৃতিক, এবং যুক্তিসঙ্গত। রুশো মনে করেন প্রকৃতিই নারীপুরুষকে ভিন্ন ক'রে সৃষ্টি করেছে, পুরুষকে দিয়েছে যুক্তি ও শক্তি, নারীকে দিয়েছে রূপ; পুরুষ যে কামে সাহসী আর নারী লাজনম্র, তা স্থির ক'রে দিয়েছে প্রকৃতিই। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক শব্দ দুটি পুরোনো কাল থেকেই বারবার ব্যবহৃত হয়েছে নারীর অধীন অবস্থাকে শোভন ও গ্রহণযোগ্য, এবং নারীকে বশীভূত করার জন্যে। রুশো, রোম্যানটিকতার পুরোধা, পুরোধা ছিলেন প্রকৃতিতত্ত্বের। নারী অক্রিয়, অধীন, সতী, যুক্তিরহিত, স্পর্শকাতর, লাজুক, ছলনাময়ী, ও আরো বহু কিছু : একথা পুরুষতন্ত্র রটাচ্ছে অনেক শতাব্দী ধ'রে; আর রুশো এগুলোকে ক'রে তোলেন তাঁর দার্শনিকতার ভিত্তি। নারীর এ-বৈশিষ্ট্যগুলো যে বিশেষ সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি, তা না মেনে বা না বুঝে রুশো ধ'রে নিয়েছেন যে প্রকৃতিই নারীকে নির্ভুলভাবে সাজিয়ে দিয়েছে এসব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে। রুশো প্রকৃতিকে ব্যবহার ক'রে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছেন নারীর পুরুষাধীন শেকলপরা অবস্থা। তাঁর লেখায় পাওয়া যায় 'প্রকৃতি, প্রকৃতি, এবং প্রকৃতি', এবং 'প্রকৃতি কখনো মিথ্যা বলে না'র মতো ধ্রুবপদ · যা কিছু রুশো যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি বা চান নি, তাতেই সহায়তা নিয়েছেন তিনি প্রকৃতি নামক অবৈজ্ঞানিকতার। প্রকৃতি রুশোর ও রোম্যানটিকদের একটি বড়ো কুসংস্কার; ওই কুসংস্কারের মন্দিরে রুশো বলি দিয়েছেন নারীদের। নারী সম্পর্কে রুশোর ধারণা দু-শো বছর আগেই বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন নারীবাদের প্রথম পুরোহিত, ফরাশি বিপ্লবের থেকেও বিপ্লবাত্মক, মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌, তাঁর *এ ভিনডিকেশন অফ দি রাইটস অফ ওম্যান* (১৭৯২, পঞ্চম পরিচ্ছেদ) গ্রন্থে।

নারীর প্রকৃতি, ভূমিকা, অবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি নির্দেশ ও ব্যাখ্যা করার জন্যে রুশো লিখেছেন একটি উপন্যাস : *জুলি বা ল্য নোভেল এলোইজ* (১৭৬১) ও একটি উপন্যাসসন্দর্ভ *এমিল বা শিক্ষা* (১৭৬২) , এবং নানা সন্দর্ভ। রুশো সভ্যতাবিরোধী, কেননা সভ্যতা নষ্ট করে মানুষকে। *এমিল*-এর (খণ্ড ১, ৫) শুরুতেই রুশো বলেছেন, 'বিধাতা সব কিছু সৃষ্টি করে শুভরূপে; মানুষ তাতে হাত দেয় আর সে-সব হয়ে ওঠে অশুভ।' তাঁর কাছে শুভ হচ্ছে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক থাকা; রুশো প্রকৃতির দোহাই দিয়েছেন মানুষ, ক্রীতদাস, এমনকি কুকুর, আর ঘোড়ার মুক্তির জন্যে, শুধু নারীকে ছাড়া। তিনি নারীর অধীন অবস্থাকে স্থায়ী করার জন্যে এসব রচনা জুড়ে ব্যবহার করেছেন প্রকৃতিকে। তিনি নারীকে ক'রে তুলতে চেয়েছেন প্রাকৃতিক নারী, আর পুরুষকে প্রাকৃতিক পুরুষ; কিন্তু পুরুষকে প্রাকৃতিক করার জন্যে যে-রীতি অবলম্বন করেছেন নারীকে প্রাকৃতিক করার জন্যে অবলম্বন করেছেন তার বিপরীত রীতি। নারীকে প্রাকৃতিক করার নামে তিনি করেছেন পুরুষের দাসী। তাঁর *এমিল* উপন্যাসসন্দর্ভের নায়ক এমিল, আর নায়িকা সোফি, যাদের তিনি দূষিত পৃথিবীর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে ক'রে তুলতে চেয়েছের প্রাকৃতিক নরনারী। কিন্তু তাদের তিনি দিয়েছেন সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা। এ-উপন্যাসে মানুষরূপে বিকশিত করা হয়েছে এমিলকে, যে হবে স্বামী; আর নারীরূপে তৈরি করা হয়েছে সোফিকে, যে হবে প্রাকৃতিক পুরুষের অধীনস্থ প্রাকৃতিক স্ত্রী। এমিলকে শেখানো হয়েছে যে 'পিতৃতান্ত্রিক পল্লীজীবনই মানুষের আসল জীবন, যা সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ আর সবচেয়ে প্রাকৃতিক'; আর সোফিকে দীক্ষা দেয়া হয়েছে : 'যখন এমিল তোমার স্বামী হবে, তখন সে হবে তোমার প্রভু; প্রকৃতির অভিলাষ হচ্ছে যে তুমি অনুগত থাকবে তার' [দ্র ওকিন (১৯৭৯, ১১৪)]। রুশোর কাছে নারীর অধীনতা প্রাকৃতিক ও ধ্রুব (*এমিল*, ৫:৩২৪) :

> নারীপুরুষের আপেক্ষিক দায়িত্ব এক নয়, ও এক হ'তে পারে না। যখন নারী তার ওপর পুরুষের চাপিয়ে দেয়া অন্যায় অসাম্য সম্পর্কে অভিযোগ করে, তখন নারী ভুল করে; এ-অসাম্য কোনো মানবিক প্রথা নয়, অন্তত এটা কোনো কুসংস্কারের ক্রিয়া নয়, বরং যুক্তিরই ক্রিয়া : যে-লিঙ্গের ওপর প্রকৃতি ভার দিয়েছে সন্তান ধারণের, সে-লিঙ্গ অবশ্যই সে-জন্যে জবাবদিহি করবে অন্য লিঙ্গের কাছে।

স্ত্রীকে হ'তে হবে নিখুঁত সতী, কেননা সে স্বামীর সন্তান ধারণ করে গর্ভে; তবে, রুশোর মতে, স্বামীকে সৎ হওয়ার বিশেষ দরকার নেই। পুরুষকে একশো ভাগ নিশ্চিত হ'তে হবে তার নারীর গর্ভে জন্মেছে যে-সন্তান, যে হবে তার উত্তরাধিকারী, সে আর কারো নয়, তার। রুশো কাকের বাসায় কোকিলের বাচ্চা সহ্য করেন না। এ-কারণে রুশো নারী ও পুরুষের জন্যে স্থির করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন নৈতিকতা ও নৈতিক শিক্ষা।

রুশো তাঁর প্রাকৃতিক নারী শনাক্ত করার জন্যে জোর দিয়েছেন লিঙ্গ বা কামের ওপর। *এমিল*-এ (৫.৩২১) সোফির শিক্ষা সম্পর্কে রুশো বলেছেন, 'তার লিঙ্গ ছাড়া, নারী হচ্ছে পুরুষ; তার আছে একই প্রত্যঙ্গ, একই প্রয়োজন, একই গুণ'; এবং একটু পরেই রুশো বলেছেন, 'তবে যেখানে কাম বা লিঙ্গ জড়িত, সেখানে পুরুষ ও নারী ভিন্ন;

তারা পরস্পরের পরিপূরক।' রুশোর কাছে নারী হচ্ছে নিজের লিঙ্গনিয়ন্ত্রিত; এবং তাঁর মতে, 'একটি খাঁটি নারী ও একটি খাঁটি পুরুষের মধ্যে মুখে যতোখানি মিল রয়েছে মনেও তার চেয়ে একটুকুও বেশি মিল নেই' (*এমিল* , ৫:৩২২)। রুশো প্রথম দিকে, *অসাম্য সম্পর্কে প্রবন্ধ*-এ (১৭৫৫), মনে করেছেন যে সঙ্গম একটি সহজাত দরকারি ক্রিয়া, যাতে নারীপুরুষ অংশ নেয় স্বাধীনভাবে; কিন্তু পরে কাম উপভোগ রাখেন তিনি পুরুষের জন্যে, নারীকে দেন পুরুষের কাম পরিতৃপ্ত করার দায়িত্ব। পুরুষ হয়ে ওঠে আক্রমণকারী, নারী আক্রান্ত। তবে নারীর কাজ হচ্ছে পুরুষের কাম জাগিয়ে তোলা, তাকে আক্রমণকারী ক'রে তোলা; তাই নারীকে হ'তে হবে পুরুষের কাছে আবেদনময়ী; নারীকে হ'তে হবে লাজনম্র সতী, কিন্তু তার থাকতে হবে সুখকর ছেনালিপনা। কারণ পুরুষ সতী চায়, আবার নারীর ছলাকলা না থাকলে পুরুষ উদ্দীপ্ত হয় না। রুশো প্রকৃতির দোহাই দিয়েছেন, কিন্তু আসলে তিনি প্রকৃতিকে বিদায় জানিয়ে প্রাকৃতিক ব'লে মনে করেছেন তাঁর সময়ের ফরাশিদের কামাচরণকে। নারীকে সতী হ'তে হবে, তবে তা নারীর নিজের জন্যে নয়; পুরুষের কাম জাগানোর জন্যে, কেননা নারীর 'সতীত্ব প্রজ্জ্বলিত করে পুরুষদের'। রুশোর মতে নারীকে তৃপ্ত করা পুরুষের কাজ নয়, তবে 'নারীকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে পুরুষের প্রমোদের জন্যে' (*এমিল*, ৫:৩২২)। রুশো প্রকৃতিকে পরিণত করেছেন ছেনাল পতিতায়। নারী পুরুষের কাম জাগাবে, পুরুষের কামকে পরমভাবে পরিতৃপ্ত করবে, আবার নারীকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অতিকামে পুরুষ ধ্বংস হয়ে না যায়। কেননা তাতে- 'ধ্বংস হয়ে যাবে উভয়েই, আর মানবজাতি লুপ্ত হয়ে যাবে সে-প্রক্রিয়ায় যে-প্রক্রিয়ায় তার টিকে থাকার কথা' (*এমিল*, ৫:৩২২)। নারীকে দিয়েছেন রুশো দুটি বিপরীত দায়িত্ব : নারী হবে উর্বশী ও সীতা; নারী প্রলুব্ধ করবে পুরুষকে, আবার নিবৃত্ত করবে তাকে; নারী হবে কামোদ্দীপক, রূপসী, সংরাগপূর্ণ, আবার হবে সুচারু সতী– এক দেহে মেরি ও মেরেলিন মনরো।

রুশোর মতে পুরুষের জীবনে তার লিঙ্গের প্রভাব কম, আর নারীর সম্পূর্ণ জীবনই তার লিঙ্গের পরিণতি; অর্থাৎ পুরুষ হচ্ছে মানুষ, কিন্তু নারী সব সময়ই নারী। রুশো বলেছেন (*এমিল*, ৫:৩২৪): 'পুরুষ কখনো কখনো পুরুষ, নারী সব সময়ই নারী, অন্তত তার যৌবনকাল ভ'রেই নারী; তার সব কিছুই মনে করিয়ে দেয় তার লিঙ্গকে।' তাঁর মতে সন্তানধারণই হচ্ছে নারীর 'প্রকৃত কর্তব্য'। তাই নারীকে শিক্ষা দিতে হবে এমনভাবে, যাতে 'নারী পরিতৃপ্ত করতে পারে পুরুষকে ও অধীনে থাকতে পারে পুরুষের'; কেননা 'প্রকৃতির অভিলাষ হচ্ছে নারী অনুগত থাকবে পুরুষের।' রুশো প্রকৃতির কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন প্রতারণারূপে; তাঁর নারীদর্শনে প্রাকৃতিক কিছু নেই, এর সবটাই পিতৃতান্ত্রিক। রুশো পিতৃতন্ত্রকেই মনে করেছিলেন প্রকৃতি, যদিও তা একটি সুপরিকল্পিত শোষণমূলক ব্যবস্থা। রুশোর অনেক আগে প্লাতো নারীপুরুষকে দিতে চেয়েছিলেন একই শিক্ষা; রুশো তার প্রতিবাদ করেছেন। নায়িকা জুলিকে দিয়ে রুশো বলিয়েছেন [দ্র ওকিন (১৯৭৯, ১১৮)]: 'আক্রমণ ও প্রতিরোধ, পুরুষের সাহস আর নারীর লাজনম্রতা, তোমাদের দার্শনিকেরা

যেমন ভাবেন তেমন প্রথা নয়, এগুলো প্রাকৃতিক ব্যাপার। এগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় সহজেই, এবং এগুলো থেকে বের করা যায় আর সমস্ত নৈতিক ভিন্নতা।' তাই রুশো *এমিল*-এর নায়ক এমিলের জন্যে উদ্ভাবন করেছেন এক রকম প্রাকৃতিক শিক্ষা, আর নায়িকা সোফির জন্যে আরেক রকম প্রাকৃতিক শিক্ষা। সোফিকে তৈরি করেছেন তিনি পুরুষের কামসামগ্রী, পতির অনুগত সতী স্ত্রী ও সন্তানবৎসল মাতারূপে। এমিলকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে স্বাধীন পুরুষরূপে বিকশিত হওয়ার, সোফিকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এমিলের নারী হওয়ার : এ হচ্ছে রুশোর প্রকৃতির নির্দেশ। রুশো পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁর 'প্রাকৃতিক নারী'র অবস্থান নির্দেশ করেছেন পুরুষের পদতলে (*এমিল*, ৫:৩২৮) :

> নারীপুরুষ সৃষ্টি হয়েছে পরস্পবের জন্যে, তবে তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা সমান নয় : পুরুষ নারীর ওপব নির্ভবশীল তার কামনার জন্যে; নারী পুরুষের ওপব নির্ভরশীল তার কামনা ও প্রয়োজন দুয়েরই জন্যে; পুরুষ নারী ছাড়া চমৎকার চলতে পারে কিন্তু নারী পুরুষ ছাড়া চলতে পারে না। পুরুষের সাহায্য, সদিচ্ছা, শ্রদ্ধা ছাড়া নারী তার জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ করতে পারে না; তারা আমাদের অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল, তা নির্ভর করে আমাদের কাছে তাদের যোগ্যতা, তাদের রূপ আর সতীত্ব কতোটা মূল্যবান ব'লে মনে হয়, তার ওপব। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে নারীরা, তাদের নিজেদের ও তাদের সন্তানদের জন্যে, পুরুষের বিচারবিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।

রুশো শোষণমূলক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে প্রাকৃতিক মনে ক'রে নারীর জন্যে এমন দর্শন ও ব্যবস্থা রচনা করেছিলেন, যা মানুষ সম্পর্কে তাঁর দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। রুশো ঘেন্না করতেন তাঁর সময়ের পুরুষদের, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন তাদের সহজাত অনন্ত শক্তিতে; মনে করতেন প্রতিবেশ ও শিক্ষার দোষেই বিকাশ ঘটতে পারছে না তাদের শক্তির। তিনি বিশ্বাস করতেন নারীও রয়েছে পুরুষের নষ্টের মূলে; নারী কাম দিয়ে নষ্ট করছে পুরুষদের। নারীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়েই পুরুষ ব্যর্থ হচ্ছে মহান সব অর্জনে, হারাচ্ছে জ্যোতির্ময় পৌরুষ ও প্রতিভা!

রুশো নারীর বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি করেছেন *এমিল*-এ (৫:৩৩২-৩৪৫), এবং দাবি করেছেন নারীর ওই সব বৈশিষ্ট্য সহজাত। লজ্জা, নম্রতা, সাজসজ্জা ও অলঙ্কারপ্রিয়তা, অন্যদের খুশি করার স্বভাব, বিনয়, চতুরতা রুশোর মতে নারীর সহজাত; এমনকি অন্যায় সহ্য করারও নারীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। রুশো মনে করেন দাসীত্ব নারীর জন্যে প্রাকৃতিক; এবং এসব থাকলেই নারী হয়ে ওঠে খাঁটি নারী। রুশোর মতে,'নারীকে যেহেতু পুরুষের অনুগত থাকতে হবে, এমনকি অবিচার সহ্য ক'রে বাঁচতে হবে', তাই নারীর থাকা দরকাব সহজাত মাধুর্য। নারীর যে রয়েছে মেধা, রুশো তা স্বীকারই করেন না। তিনি বলেন [দ্র ওকিন (১৯৭৯, ১২৯)], 'নারী সাধারণত কোনো শিল্পকলা পছন্দ করে না, সেগুলোর কিছু জানে না, এবং তাদের কোনো প্রতিভা নেই। যে-সমস্ত তুচ্ছ কাজে লাগে ত্বরিৎ বোধ, রুচি, শোভা, কখনোকখনো লাগে সামান্য দর্শন ও যুক্তি, সেগুলো তারা পারে।' কিন্তু তাদের নেই প্রতিভার 'অলৌকিক শিখা'। রুশোর নারীর কোনো মেধা নেই, সে কামসামগ্রী; নারী হবে স্ত্রী ও মা, তাই তার থাকতে হবে মেধা ছাড়া সমস্ত মেয়েলি গুণ। নারীর মেধাহীনতা সম্পর্কে রুশোর প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য পুরোপুরি উদ্ধৃত ক'রে, একবার 'কী ছাইপাশ' ব'লে, রুশোকে

বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ (১৭৯২, ১২৪, ও *পঞ্চম পরিচ্ছেদ*)। নারীর মেধাশূন্যতা সম্পর্কে রুশোর সারকথা (*এমিল*, ৫: ৩৪৯-৩৫০) :

> বিমূর্ত ও প্রাকল্পনিক সত্য অনুসন্ধান, বিজ্ঞানের নীতি ও সূত্র উদঘাটন. যা কিছুতে দরকার পড়ে চিন্তার সাধারণীকরণ, তা নারীর আয়ত্তের বাইরে; তাদেব বিদ্যা হবে ব্যবহারিক; তাদের কাজ হচ্ছে পুরুষের আবিষ্কৃত সুত্র প্রয়োগ করা, এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সে-সব পর্যবেক্ষণ করা, যা ভিত্তি ক'রে পুরুষ রচনা করবে সাধারণ সূত্র। নারীর সমস্ত ভাবনা চলবে পুরুষকে ঘিরে, এবং তারা আয়ত্ত করার করার চেষ্টা করবে সে-সব সুখকর সাফল্য, যা সুন্দর; কেননা প্রতিভার কাজ তাদের আয়ত্তের বাইরে। তাদের নেই বিজ্ঞানে সফল হওয়ার মতো যথেষ্ট যথাযথতা বা মনোযোগশক্তি, আর পদার্থবিদ্যায় সফল হ'তে পাবে তারাই, যারা সক্রিয়তম, চবম অনুসন্ধিৎসু, যাবা অনুধাবন ক‌‌ তে পারে বিচিত্র ধরনের বস্তু; এটা তাদের এলাকা, যাদের রয়েছে তীব্রতম শক্তি, যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা ও প্রকৃতির নিয়মের সম্পর্ক বিচাবের জন্যে চরমভাবে প্রয়োগ করে তাদেব শক্তি। নারী প্রাকৃতিকভাবেই দুর্বল,এবং নিজেব চিন্তাভাবনা নিয়ে বেশি দূর এগোতে পারে না।... নারীব আছে বোধশক্তি, পুরুষের আছে প্রতিভা; নারী পর্যবেক্ষণ করে. পুরুষ প্রয়োগ করে যুক্তি।

রুশোর মতে,'চিন্তার ব্যাপারটি নারীদের অচেনা নয়, তবে তাদের উচিত যুক্তির ওপরে শুধু চোখ বুলিয়ে যাওয়া'; তাই রুশোর কাছে নারীর মানসিক শক্তির কোনো মূল্য নেই। রুশোর বিধান হচ্ছে নারীকে শরীর-মনে হ'তে হবে তাই, পুরুষ তাকে যা হওয়াতে চায় : নারী হবে পুরুষের সহচরী বা সহকারী বা রক্ষিতা। গবেষণাগারে পুরুষ হবে বৈজ্ঞানিক, আর নারী, বড়োজোর, হবে তার গবেষণা সহকারী।

নারী স্বায়ত্তশাসিত নয়, নারীর কোনো দরকার ছিলো না, পুরুষ আছে ব'লেই নারী দরকার। বাইবেলের বিধাতা ও রুশোর মধ্যে রয়েছে সুন্দর মিল; বিধাতা স্বর্গে একটি পুরুষ সৃষ্টির পর তার সহচরী বা পত্নীরূপে সৃষ্টি করে একটি নারী। রুশোও এমিলকে সৃষ্টি করার পর, বইয়ের চারখণ্ড জুড়ে তাকে বিকশিত ক'রে, পঞ্চম খণ্ডে এসে এমিলের জন্যে সৃষ্টি করেন একটি নারী, যার নাম সোফি। *এমিল*-এর পঞ্চম খণ্ডের নাম 'সোফি, বা নারী'। এ-খণ্ডের (৫:৩২১) শুরুতেই বিধাতার স্বরে রুশো বলেন,'পুরুষের একলা থাকো ভালো নয়। এমিল এখন পুরুষ, এবং তাকে আমাদের দিতে হবে তার প্রতিশ্রুত পত্নী [হেল্‌প্‌মিট : সহচরী]। সে-পত্নী হচ্ছে সোফি।' রুশো নারীকে দেখেছেন পুরুষের পত্নী বা সহকারী-সহচরীরূপে, নারীকে হ'তে হবে এই; অন্য কিছু হওয়া নারীর জন্যে অশুভ। রুশো তাঁর *জুলি বা ল্য নভেল এলোইজ*-এর নায়িকা জুলিকে করেছেন নিজের কণ্ঠস্বর; ওই নারী তার প্রেমিককে উচ্চকণ্ঠে জানায় যে নারীপুরুষের সমশিক্ষা সম্বন্ধে প্লাতো যা ব'লে গেছেন, তা ভুল; কারণ 'প্রকৃতির উদ্দেশ্য' ও 'স্রষ্টার অভিলাষ' থেকে স্পষ্ট যে নারীপুরুষ একধরনের নয় [দ্র ওকিন (১৯৭৯, ১৩২)]। প্রকৃতি আর স্রষ্টা নারীর নিয়তিই করেছে মাতৃত্ব, সন্তানলালন ও ঘরকন্না; পুরুষের জন্যে রেখেছে বাইরের জগতের সাফল্য; তাই 'এক লিঙ্গের আরেক লিঙ্গকে অনুকরণ করা চরম নির্বুদ্ধিতা'। রুশোর কোনো উৎসাহ ছিলো না নারীর শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে; তিনি চেয়েছেন নারীকে পুরুষের অধীনে পুরুষের পরিপূরক ক'রে গ'ড়ে তুলতে। বালিকাদের মধ্যে তিনি মাঝেমাঝে পরিচয় পেয়েছেন বুদ্ধির, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে বালিকাদের ওই

বুদ্ধিটুকু বিধাতা দিয়েছেন তাদের সতীত্বের দামি রত্নটিকে রক্ষা করার জন্যে। জুলি বলেছে, নারীর রয়েছে একটি ভয়ঙ্কর সম্পদ, যার নাম সতীত্ব, আর তাদের বুদ্ধি দরকার শুধু ওই সম্পদটিকে রক্ষার জন্যে। রুশোর কাছে নারীপুরুষ, নৈতিক ও মননগতভাবে, পরস্পরের পরিপূরক; একা তারা অসম্পূর্ণ, কিন্তু একত্রে তারা গ'ড়ে তোলে এক সম্পূর্ণ সুষম সত্তা। নারীর আছে সামান্য স্ত্রীবুদ্ধি, পুরুষের আছে প্রতিভা; নারী শুধু দেখে, পুরুষ রচনা করে আভ্যন্তর সূত্র। রুশোর মতে, নারীপুরুষ পরস্পরের পরিপূরক না হ'লে বিয়ে ব্যাপারটি হবে বিপদসঙ্কুল, এবং বিপদগ্রস্ত হবে সামাজিক স্থায়িত্ব। পরিপূরক শব্দটি বেশ প্রতারক; নারী ও পুরুষ ঠিক তেমন পরিপূরক পরস্পরের যেমন পরিপূরক প্রভু ও দাস, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।

রুশো নারী ও পুরুষের জন্যে দু-রকম শিক্ষার প্রস্তাব করেছেন। পুরুষকে দিয়েছেন তিনি এমন শিক্ষা, যাতে সে হয়ে ওঠে নাগরিক বা স্বাধীন-প্রাকৃতিক মানুষ, আর নারীকে দিয়েছেন এমন শিক্ষা, যাতে নারী স্বাধীন বা প্রাকৃতিক হওয়ার বদলে হয়ে ওঠে পুরুষের অনুগত স্ত্রী। তাকে শেখাতে হবে লাজনম্রতা, গৃহপালন, আর প্রথার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। রুশোর প্রাকৃতিক পুরুষ বেড়ে ওঠে মুক্ত মানুষরূপে, নারী বেড়ে ওঠে নিয়ন্ত্রিতভাবে, তার জীবনের *উদ্দেশ্য* অনুসারে। তাই এমিল বেড়ে উঠেছে তার অজানা সম্ভাবনা অনুসারে, আর সোফি বেড়ে উঠেছে নারীর ভূমিকা অনুসারে, স্ত্রী ও মাতারূপে। রুশো নারীর জন্যে প্রস্তাব করেছেন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত উপযোগিতামূলক শিক্ষা, যা আসলে কোনো শিক্ষাই নয় (*এমিল : ৫*) :

> নারীর সমস্ত শিক্ষা হবে পুরুষের আপেক্ষিক। তাদের খুশি করা, তাদের কাছে উপকারী হওয়া, তাদের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত হওয়া, শিশুকালে তাদের লালন করা, বয়স্ককালে তাদের যত্ন করা, তাদের পরামর্শ ও সান্ত্বনা দেয়া, তাদের জীবনকে মধুর ও সুন্দর করা হচ্ছে নারীর সব সময়ের দায়িত্ব, এবং শিশুকালেই তাদের এসব শেখাতে হবে। এ-নীতি আমরা যতোটা অমান্য করবো, ততোটা বিচ্যুত হবো আমাদের লক্ষ্য থেকে, এবং এছাড়া আর যে-শিক্ষাই নারীদের দেয়া হোক-না-কেনো, তা তাদের বা আমাদের জন্যে সুখের হবে না।

তাই নারীকে কোনো মননগত শিক্ষা দেয়া যাবে না, তাদের দিতে হবে নারীশিক্ষা। নারী মেনে চলবে স্বামীর অধীনতা, লালন করবে সন্তানদের। সতী নারী থাকবে কোথায়? রুশোর উত্তর হচ্ছে, নারী জীবন কাটাবে অবরোধের মধ্যে। রুশোর মতে, সম্পূর্ণ অবরোধ ও গৃহিণীপনার মধ্যে জীবন কাটানোই 'নারীর জন্যে প্রকৃতি ও যুক্তির বিধান'। পেরিক্লেসের আদর্শে তিনি আস্থা পোষণ করেন যে সেই উৎকৃষ্ট নারী, যার সম্পর্কে কেউ কখনো কোনো কথা বলে না। রুশো শিক্ষা দিয়ে নারীকে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে চেয়েছেন অধীনতার মধ্যে বাস করতে। এ-উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেছেন মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়াশীল বিধান (*এমিল*, ৫:৩৩৩) :

> নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ নারীর মধ্যে সৃষ্টি করে একরকম বশমানা ভাব, যা নারীর দরকার সারা জীবনভর, কেননা সে সারা জীবন থাকবে পুরুষের অধীনে, বা পুরুষের বিচারবিবেচনার অধীনে, এবং সে কখনো পুরুষের মতের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না নিজের মত। নারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দরকার ভদ্রতা; নারী তৈরি হয়েছে পুরুষ নামক এমন এক ত্রুটিপূর্ণ, এমন এক দুশ্চরিত্র ও ভ্রান্তিপূর্ণ

প্রাণীর কাছে অনুগত থাকার জন্যে যে নারীকে শিশুকালেই শিখতে হবে অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এবং বিনাপ্রতিবাদে স্বামীর সমস্ত অন্যায় সহ্য করতে।

অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মন্ত্রণামূলক দর্শন রচনা করেছেন যে-দার্শনিক, তিনি নারীর জন্যে বিধান তৈরি করেছেন পুরুষের অধীনে থাকার, অন্যায়ে অভ্যস্ত হওয়ার। তবে রুশো বিপদে পড়েছেন তাঁর নারী নিয়ে। নারীকে তিনি একই দেহে করতে চেয়েছেন কামোদ্দীপক যৌনসামগ্রী ও পরম সতী; কিন্তু দেখেছেন এমন নারী তাঁর প্রাকৃতিক পুরুষের প্রাত্যহিক সাথী হ'তে পারে না। রুশোর প্রাকৃতিক পুরুষ ও আবেদনময়ী সতীর নিয়তি হচ্ছে অধিকাংশ সময় পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা!

রুশোর প্রাকৃতিক নারী প্রাকৃতিক নয়, বানানো; রুশোর নারী পুরুষতন্ত্রের কলে উৎপাদিত সবচেয়ে আকর্ষণীয় সামগ্রী। রুশো প্রবক্তা সাম্যমুক্তির; তবে তাঁর দর্শনে সাম্যমুক্তির মতো মানবিক ব্যাপারগুলো পুরুষের জন্যে, নারীর জন্যে নয়। মানুষের অসাম্যে ক্ষুব্ধ রুশো উদ্ভাবন করতে চেয়েছেন এমন সামাজিক-রাজনীতিক পদ্ধতি, যাতে দূর হবে মানুষের অসাম্য। রুশো অবশ্য বৈজ্ঞানিকের বস্তুনিষ্ঠ চোখে, মার্ক্সের মতো, অসাম্যকে দেখেন নি, দেখেছেন ব্যক্তিগত মন্ময় দৃষ্টিতে; অসাম্য সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা জন্মেছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। রুশো *অসাম্যবিষয়ক প্রবন্ধ*-এ (১৭৫৫) দেখিয়েছেন কীভাবে আদিম স্বাধীন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ ধনীদের দ্বারা গরিবদের শোষণের ফলে সমাজে উৎপত্তি ঘটে অসাম্যের। রুশো বলেছেন [দ্র ওকিন (১৯৭৯, ১৪২)] :

অগণন মানুষ বলি হবে মুষ্টিমেয়র কাছে, আর সাধারণের সুবিধা বলি হবে ব্যক্তিগত সুবিধার কাছে। সুবিচার ও অধীনতার মতো আপাতসুন্দর শব্দগুলো সব সময় কাজ করবে সন্ত্রাসের উপকরণ ও অবিচারের অস্ত্ররূপে; এভাবে উচ্চশ্রেণীগুলো, যারা নিজেদের দাবি করে অন্যদের জন্যে উপকারী ব'লে, আসলে অন্যদের শুষে সেবা করছে নিজেদের।

রুশোর মতে বেশি শক্তি বা সম্পদ কাউকে বৈধ অধিকার দিতে পারে না। তাঁর বিশ্বাস প্রকৃতি একজনকে দেয় নি অন্যের ওপর প্রভুত্বের অধিকার, এবং কেউই বলপ্রয়োগে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। রাজনীতিক আধিপত্যের সমস্যাটির বৈধ সমাধান হ'তে পারে শুধু সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে, যাতে মানুষের অভিলাষ হয়ে ওঠে সার্বভৌম। এমন চুক্তি ছাড়া রাজনীতিক ব্যবস্থা হয় 'উদ্ভট, স্বৈরাচারী'। রুশো পুরুষের জন্যে চান সার্বভৌম অভিলাষ, কিন্তু নারীকে রাখেন পুরুষের উদ্ভট স্বৈরাচারের অধীনে।

রুশো বিশ্বাস করেন সব পুরুষের অসীম সম্ভাবনায়; তিনি মনে করেন সুযোগ পেলে ভূমিদাসও ভূষিত হ'তে পারে জমিদারের সমস্ত গুণে। রুশোর কাছে ক্রীতদাসত্ব সম্পূর্ণ অবৈধ; কেননা ক্রীতদাসত্ব মনুষ্যত্বের অবমাননা; এতে একটি মানুষ নিজের জীবন, স্বাধীনতা, অধিকার সমর্পণ করে আরেকটি মানুষের কাছে। প্রকৃতি মানুষের এমন স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার বিরোধী। কিন্তু সাম্যমুক্তির এ-প্রচণ্ড প্রবক্তা নারীর ক্ষেত্রে ভুলে যান সাম্যমুক্তির কথা; তিনি সাম্যমুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান নারীকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে।

তিনি নারীর ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ করেন অসাম্য ও অধীনতা। রুশোর মতে, নারী অধীনে থাকবে পুরুষের, আর পুরুষকে বশে রাখার জন্যে ব্যবহার ক'রে যাবে তার রূপ, বুদ্ধি, বোধি; এর সাহায্যেই নারী ক্ষতিপূরণ ক'রে নেবে নিজের অসাম্য ও অধীনতার। রুশোর কাছে পুরুষ শক্তিমান আর নারী পুরুষের অধীন, এ হচ্ছে ধ্রুব সত্য; নারী জীবনযাপন করবে এ-সত্য মেনে নিয়ে। রুশোর চিন্তায় নারীর রাজনীতিক অধিকারের কথাই ওঠে নি; নারীর ভোটাধিকারের কথা তিনি ভাবেন নি। 'জেনেভার মধুর ও সতী নারীদের' তিনি বলেছেন যে তাদের নিয়তি হচ্ছে পুরুষদের শাসন করা, অর্থাৎ তারা প্রভাব বিস্তার করবে স্বামীদের মাধ্যমে। রুশোর রাজ্যে পুরুষ রাজা শাসন করবে, আর রাজাকে নিজের 'সতীত্বের শক্তি'তে শাসন করবে নারী! নারী সতী আর অনুগত হয়ে পুরুষের ওপর বিস্তার করবে 'আনুগত্যমূলক আধিপত্য'! এই হচ্ছে নারীর রাজনীতিক অধিকার। শুধু রাষ্ট্রে নয়, রুশোর বিধানে পরিবারের মধ্যেও নারীর কোনো কর্তৃত্ব নেই, স্বামীই পরিবারের প্রভু। রুশোর কাছে পরিবার একটি প্রাকৃতিক সংস্থা, তার প্রাকৃতিক প্রভু স্বামী। রুশো বলেছেন [দ্র ওকিন (১৯৭৯, ১৪৬)], 'প্রকৃতির বিধান হচ্ছে নারী অনুগত থাকবে পুরুষের'; আর 'জীবন ধারণ করবে তার স্বামীর নিরঙ্কুশ আইনের অধীনে।' পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে ছলেবলে খুশি রেখে অর্জন করবে সামান্য ক্ষমতা। রুশো যে-পরিবার প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা মোটেই প্রাকৃতিক নয়; তা একটি সুশৃঙ্খল, সম্পদভিত্তিক, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। রুশোর মতে, পরিবারে কর্তৃত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই থাকতে পারে না, কেননা পরিবারে থাকা দরকার একজন প্রধান, যে নেবে সমস্ত সিদ্ধান্ত। সাধারণ অভিলাষের এ-প্রবক্তা পরিবারের মতো একটি সংস্থায়ও সাধারণ অভিলাষের মূল্য দেন নি। রুশো নারীকে পুরুষের অধীনে রাখতে চেয়েছেন নারীর গর্ভধারণের জন্যেও, কারণ তখন নারী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; রুশোর মতে, 'নারীকে কর্তৃত্ব না দেয়ার এ-ই যথেষ্ট কারণ।' আরেকটি কারণেও পুরুষের অধীনে রেখেছেন তিনি নারীকে, তা হচ্ছে নিশ্চিত পিতৃত্বের পরিচয় : পুরুষকে ঠিকমতো বুঝে নিতে হবে তার নারীর গর্ভে যারা জন্মাচ্ছে তারা তার কিনা? নারীপুরুষের সাম্য স্বীকার না করার পেছনে ছিলো রুশোর একটি গোপন ভীতি। রুশোর ভয় হচ্ছে যদি পুরুষের অধীনে না রাখা হয় নারীকে, তাহলে নারী পুরুষের ওপর স্থাপন করবে নিরঙ্কুশ আধিপত্য। রুশোর বিশ্বাস ছিলো যে নারীকে প্রকৃতি দিয়েছে এমন কামক্ষমতা, যা দিয়ে নারী বশীভূত পরাভূত ক'রে রাখতে পারে পুরুষকে; নারী পুরুষকে ক'রে তুলতে পারে অসহায়। অর্থাৎ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারী নিয়ন্ত্রক। রুশো নারীভীতি পেয়েছেন ঐতিহ্য থেকে; নারীকে দেখেছেন তিনি কামদানবী অশুভ শক্তিরূপে। একটি কবিতায় নারীকে সম্বোধন ক'রে রুশো লিখেছিলেন, 'সম্মোহিনী ও ভয়ঙ্করী, যাকে আমি পুজো আর ঘৃণা করি,... পুরুষকে যে পরিণত করে ক্রীতদাসে।'

রুশোর দর্শনে সাম্যের মতোই মূল্যবান মুক্তি বা স্বাধীনতা; তবে সাম্য যেমন পুরুষের ব্যাপার, মুক্তিও পুরুষেরই ব্যাপার, নারীর নয়। নারীর মুক্তি খুঁজেছেন রুশো পুরুষের পায়ে; মুক্তি নারীর জন্যে নয়, নারীকে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করেছেন

পুরুষের অধীনে। *রাজনীতিক অর্থনীতিবিষয়ক প্রবন্ধ*-এ (১৭৫৫) রুশো [দ্র ওকিন (১৯৭৯, ১৫৪)] বলেছেন, 'শুধু স্বাধীন মানুষের মধ্যেই মনুষ্যত্ব স্পষ্ট; স্বাধীনতা মানুষের গুণাবলির মধ্যে মহত্তম'; এবং 'স্বাধীনতা অস্বীকার করা মনুষ্যত্ব অস্বীকার করা, মনুষ্যত্বের অধিকার, এমনকি তার দায়িত্ব, বর্জন করা। এমন অস্বীকার অসমঞ্জস মানুষের প্রকৃতির সাথে, এবং তার স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে তার নৈতিকতা হরণ করা।' তবে রুশো হরণ করেছেন নারীর স্বাধীনতা ও নৈতিকতা দু-ই, কেননা রুশোর চোখে নারী মানুষ নয়, মেয়েমানুষ। রুশো বলেছেন (*এমিল* , ৫:৩২২), 'দু-লিঙ্গের মিলনে প্রত্যেকে কাজ করে একই উদ্দেশ্যে, তবে ভিন্ন উপায়ে।' তারা 'ভিন্ন উপায়ে' কাজ করে, কেননা তারা ভিন্ন; একজন প্রভু, আরেকজন তার দাসী। 'ভিন্নতা' ধারণাটিও প্রতারক, নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন বলার অর্থ হচ্ছে নারী 'নিকৃষ্ট'। রুশোর কাছে পুরুষ হচ্ছে শক্তিমান ও সক্রিয়, নারী দুর্বল ও অক্রিয়। তাই নারী থাকবে পুরুষের অধীনে, কেননা পুরুষ শক্তিমান; রুশোর কাছে শক্তিমানের অধীনে থাকাই প্রকৃতির বিধান। কিন্তু ফরাশি বিপ্লবেও নারী পালন করেছিলো অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা, যদিও ওই বিপ্লবের দার্শনিক বলেছেন নারী দুর্বল ও অক্রিয়! নারী রুশোর দর্শনের জন্যে শোচনীয় এলাকা, এ-এলাকায়ই রুশো এমনভাবে পদস্খলিত হয়েছেন যে তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর দর্শনের মূল বক্তব্য বাতিল হয়ে গেছে। রুশো নারীর স্বাধীনতা পুরোপুরি অস্বীকার ক'রে নারীকে করেছেন পুরুষের ক্রীতদাসী, যার কাজ পুরুষের বিনোদ যোগানো ও সেবা করা। রুশোর নারী প্রাকৃতিক নয়, স্বাধীন নয়, তা পুরুষতন্ত্রের ছাঁচে বানানো পুরুষভোগ্যা সামগ্রী। রুশো নারী সম্পর্কে যা বলেছেন, তার সামান্যও অভিনব নয়; পিতৃতন্ত্রের সমস্ত পুরোনো গ্রন্থে এসব বিধিবিধান অনেক আগেই প্রণীত হয়েছিলো; রুশো শুধু সেগুলোকে রোম্যানটিক রীতিতে প্রকাশ ক'রে আঠারো-উনিশশতকের মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছিলেন, এবং নারীকে বেঁধেছিলেন নতুন শক্ত শেকলে।

জন রাসকিন

পুরুষাধিপত্যের প্রতিক্রিয়াশীল রোম্যানটিক রূপটি পাওয়া যায় রুশোর রচনায়; চাটুকারিতাপূর্ণ ভিক্টোরীয় ভণ্ডামোর রূপটি পাওয়া যায় জন রাসকিনের *সিসেম অ্যান্ড লিলিজ* (১৮৬৫) গ্রন্থের 'লিলিজ : অফ কুইন্স গার্ডেন্স্' (১৮৬৪) নামের বক্তৃতাপ্রবন্ধে। রাসকিনের বক্তব্যে মৌলিক কিছুই নেই, তিনি নারী সম্পর্কে সব কিছু পেয়েছেন প্রথা, সাহিত্য, ও চারপাশ থেকে; তবে তিনি নারী সম্পর্কে ভিক্টোরীয় পর্বের কপট, প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকাশ করেছিলেন খুবই বীরত্বের সাথে। ভিক্টোরীয়রা তাঁর কাছে যা শুনতে চেয়েছিলো, তিনি তাদের তা শুনিয়েছিলেন উদ্দীপনার সাথে, এবং অর্জন করেছিলেন অশেষ জনপ্রিয়তা। সব জনপ্রিয় বস্তুই এক সময় হাস্যকর হয়ে ওঠে, রাসকিনের বক্তৃতাটিও তাই; কিন্তু দুঃখ লাগে রাসকিনের আবর্জনা প্রভাব বিস্তার করেছিলো বিপুলভাবে; তিনি প্রভাবিত করেছিলেন এমনকি উনিশশতকের শেষাংশের শিক্ষিত বাঙালিদেরও, যাঁরা রাসকিনের পরামর্শে নিজেদের নারীদের ডাকতে শুরু

করেছিলেন 'ভদ্রমহিলা' বা 'লেডি'। রাসকিনের 'পদ্ম : রানীর বাগানের'-এর প্রকাশের চার বছর পর বেরিয়েছিলো জন স্টুয়ার্ট মিলের *দি সাবজেকশন অফ উইমেন* (১৮৬৯); কিন্তু ওই সত্যনিষ্ঠ বইয়ের ভাগ্যে জুটেছিলো তিরস্কার। মিলেট (১৯৬৯, ৮৯) বলেছেন, 'মিলে পাওয়া যায় লৈঙ্গিক রাজনীতির বাস্তবতা, আর রাসকিনে পাওয়া যায় রোমান্স ও রূপকথা।' রাসকিন বাস্তবতার থেকে বাগ্মিতায়, সত্যের থেকে রূপকথায় বেশি আগ্রহী; তোষামোদে তিনি নির্লজ্জ, পুরুষাধিপত্যে একনিষ্ঠ। নারীদের ডেকেছেন তিনি 'লিলি' বা 'পদ্ম' ব'লে, 'রানী' ব'লে, কিন্তু বন্দী করতে চেয়েছেন গৃহকূপে। 'পদ্ম' বা 'রানী' ডাকে রয়েছে বেশখানিকটা কাম; 'পদ্ম' স্মরণ করিয়ে দেয় অক্ষত শুভ্র সতীত্বের ব্যাপারটিকে, 'রানী'ও আশ্লেষজাগানো ডাক। রাসকিনকে অনেকখানি নষ্ট করেছে সাহিত্য : তিনি দান্তে, শেক্সপিয়র, ও রোম্যানটিক কবিতার নারীদের ভেবেছেন বাস্তব, কিন্তু ওই নারীরা যে বাস্তব নারী থেকে সুদূরে, তা বোঝেন নি। রোম্যানটিক কবিতা নারীকে দেবী ক'রে শেষ পর্যন্ত পরিণত করে পুরুষের সেবিকায়, তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে; এখানে দুটি কবিতা উল্লেখযোগ্য, কেননা কবিতা দুটি রাসকিন ও ভিক্টোরীয়দের মনে বদ্ধমূল করেছিলো নারীর বিশেষ রূপ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি কবিতার নাম 'শি ওয়াজ এ ফ্যান্টম অফ ডেলাইট'। কবি বলছেন : যখন সে প্রথম আমার চোখে পড়লো, সে ছিলো আনন্দের মায়ামূর্তি। আবেগের তীব্র মুহূর্তে সে দেবী; কিন্তু আবেগ কেটে গেলে কবি দেখতে পান : সে দেবী, কিন্তু নারীও বটে! তাই আনন্দের মায়ামূর্তি হয়ে ওঠে পুরুষের গৃহিণী, যার কাজ সংসার দেখাশোনা, মানসসুন্দরী শুরু করে মাছ কোটা। কভেন্ট্রি প্যাটমোরের 'দি অ্যাঞ্জেল ইন দি হাউজ' বা 'গৃহলক্ষ্মী' কবিতায় বিয়ে ও নারীত্ব সম্পর্কে ভিক্টোরীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ভালোভাবে। রাসকিনের বক্তৃতায় প্রকাশ পায় ওই 'দেবী, কিন্তু নারীও বটে' এবং 'গৃহলক্ষ্মী'র ধারণা।

রাসকিন ১৮৬৪ অব্দে ম্যানচেস্টার শহরের টাউন হলে মধ্যবিত্ত নরনারীদের সামনে দিয়েছিলেন বক্তৃতাটি। বক্তৃতাটিতে পাওয়া যায় এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি পরিপূর্ণ মধ্যযুগীয় শিভালরি ও প্রতিক্রিয়াশীলতায়; যার চোখে নারীমাত্রই নাবালিকা। চাটুবাক্যে শুরু করেছেন তিনি বক্তৃতাটি; শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বসিয়েছেন 'বিপথগামী ও অশিক্ষিতদের' রাজার আসনে, এবং নারীদের বসিয়েছেন 'রানী'র অসার সিংহাসনে। পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেছেন তিনি সে-সময়ের নারীবাদীদের, যাঁরা বলছিলেন নারীর অধিকারের কথা; কেননা রাসকিন নারীর অধিকারে বিশ্বাস করেন না। সে-সময় জনপ্রিয় ছিলো *স্যাপারেট স্ফেয়ারস* বা *পৃথক এলাকা*, অর্থাৎ *ঘরে-বাইরেতত্ত্ব*, যা তখন সুচতুরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিলো নারীদের পোষমানানোর জন্যে। রাজকবি টেনিসন *প্রিন্সেস* (১৮৪৭, ১৮৫৩) কাব্যে বলেছিলেন : 'নারী অসম্পূর্ণ পুরুষ নয়,/ তবে ভিন্ন... অভিন্নরূপে এক নয়, তবে বিভিন্নরূপে এক', 'প্রতিটি লিঙ্গ একলা/ অর্ধেক, আর খাঁটি বিয়েতে কেউ/ সমান বা অসমান নয়, প্রতিটি পূরণ করে/ অন্যটির ত্রুটি।' টেনিসনের এ-কাব্যিক ভিন্নতার মধ্যে অভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এমন এক

শোভন কৌশল, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শোষণকে সুখকর ক'রে তোলা। রাসকিন *ঘরে-বাইরে* ও *পরিপূরকতত্ত্ব* নানাভাবে পেশ ক'রে নারীকে তার অধিকারের কথা ভুলিয়ে চেয়েছেন পুরুষের সেবিকা ক'রে রাখতে। নারীদের 'রানী' ব'লে কপট সম্বোধনের পর রাসকিনের কাজ হচ্ছে ওই রানীরা কোথায় থাকবে, কী করবে, কী শিখবে তার বিধান রচনা। তিনি নতুন কিছু বলেন নি, পুরুষতন্ত্র যা ব'লে এসেছে কয়েক হাজার ধ'রে, আর তাঁর একশো বছর আগে রুশো, এবং রোম্যানটিক কবিরা যা বলেছেন, তিনি তাই বলেছেন ভিক্টোরীয় নাইটের ভঙ্গিতে।

নারীরা রাসকিনের চোখে রানী, কী ক্ষমতা ওই রানীদের, এবং কীভাবে প্রয়োগ করবে তারা তাদের রানীসুলভ ক্ষমতা? কিন্তু রাসকিন ক্ষমতার কথা বলতে গিয়েই দ'মে গেছেন, তাঁর মনে প'ড়ে গেছে নারীরা রানী, তবে আসলে তো তারা নারী! তাই আগে ঠিক করতে হবে কী হবে তাদের ক্ষমতা নারী হিশেবে? রাসকিন (১৮৬৫, ৬১) এখন দেখা দেন মুখোশ খুলে; বলেন, 'নারীদের রানীসুলভ ক্ষমতা কী হবে তা স্থির করতে পারি না, যদি না আমরা একমত হই তাদের সাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে।' বিপত্তি ঘটে এখানেই, কেননা রাসকিনের বিধানে নারীদের সাধারণ ক্ষমতা খুবই তুচ্ছ, নারীর ক্ষমতা হচ্ছে নারীর ভূমিকা পালন করা। নারী পুরুষের সমান হবে না, নারী হবে পুরুষের সহায়ক। উনিশশতকে পুরুষতন্ত্রীরা বের করেছিলেন পৃথক এলাকার ধারণা, রাসকিন তা নিজের ক'রে নিয়েছিলেন, এবং একেই ঘোষণা করেছিলেন *প্রাকৃতিক* ব'লে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পুরুষ ও শোষকতন্ত্রের বড়ো প্রতারণা; রুশো প্রতারণা করেছেন প্রকৃতি দিয়ে, রাসকিনও প্রতারণা করেছেন প্রকৃতি দিয়ে। উনিশশতকে *প্রকৃতি* শুধু আবেগাতুর শব্দ ছিলো না, শোষকতন্ত্র এ-শব্দটিতে পেয়েছিলো সমস্ত সমস্যার সমাধান। তারা যা কিছু বুঝতে পারতো না, বা যা কিছু নিজেদের সুবিধার জন্যে তারা বিধিবদ্ধ করতে চাইতো, তাকেই বলতো তারা 'প্রাকৃতিক' : শ্রেণী, স্বৈরাচার, শোষণ সব কিছুই প্রাকৃতিক! রাসকিন যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে পুরুষকে উৎকৃষ্ট নারীকে নিকৃষ্ট বলা শোভন ছিলো না, তাই তাঁদের সুভাষণ বের করতে হয়েছিলো। টেনিসনের *প্রিন্সেস*-এ মেলে নারীপুরুষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও পরিপূরকতত্ত্ব :

> For Woman is not underdevelopt man
> But diverse:..
> Not like to like, but like in difference...
> either sex alone
> Is half itself, and in true marriage lies
> Nor equal, nor unequal · each fulfills
> Defect in each

> নারী নয় অবিকশিত পুরুষমানুষ
> তবে ভিন্ন...
> একজন নয় অপরজনের মতো, কিন্তু ভিন্নতার মধ্যে একরূপ...
> দু-লিঙ্গের মধ্যে একটি একলা

শুধুই অর্ধেক, আর প্রকৃত বিবাহে
কেউ সমান বা অসমান নয়; প্রত্যেকে পূরণ করে
অপরের ত্রুটি

ভিক্টোরীয় রাজকবির মতে নারী অবিকশিত মানুষ বা পুরুষ নয়, ভিন্ন ধরনের মানুষ; শুনতে এটা ভালো শোনালেও কবি আর ভিক্টোরীয়রা নারীকে অসম্পূর্ণ মানুষই মনে করতো। এ-কবিতার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও পরিপূরকতত্ত্বের প্রতিধ্বনি ক'রে রাসকিন (১৮৬৫, ৭২) বলেন :

আমরা নির্বোধ, ক্ষমাহীনভাবে নির্বোধ, যখন আমরা এক লিঙ্গের ওপর আরেক লিঙ্গের শ্রেষ্ঠতার কথা বলি, যেন তাদের তুলনা কবা সম্ভব অভিন্ন বিষয়ে। একটির যা আছে অন্যটির তা নেই; একটি পূর্ণতা দেয় অন্যটিকে, এবং পূর্ণতা পায় অন্যটি দিয়ে : তারা কোনো কিছুতেই একরকম নয়, উভয়ের সুখ ও উৎকর্ষ নির্ভর করে অন্যের যা আছে তা চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে, যা শুধু দিতে পারে অন্যটি।

রাসকিনের এ-নাইটপনা হচ্ছে নারীপুরুষের সামাজিক ও মেজাজগত পার্থক্যকে জৈবিক যুক্তির সাহায্যে বৈধ করার কূটকৌশল। তিনি উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টতে না গিয়ে গেছেন টেনিসনি ভিন্নতায় ও পরিপূরকতায়, শয্যা থেকে সাম্রাজ্য পর্যন্ত যার সুফল পাবে পুরুষ আর দুর্ভোগ পোহাবে নারী। পুরুষ : নারী ভিন্ন ও পরিপূরক, যেমন ভিন্ন ও পরিপূরক ব্রাহ্মণ : শূদ্র, শোষক : শোষিত, যারা সৃষ্টি করে সামাজিক বৈচিত্র্যের সঙ্গীত! নারীপুরুষের কোনো মৌল পার্থক্য নেই; যোনিলিঙ্গস্তন প্রভৃতি পার্থক্যের নেই কোনো সামাজিক-রাজনীতিক মূল্য, কিন্তু রাসকিনেরা এসবের জন্যেই পুরুষকে প্রভু আর নারীকে দাসী ক'রে রাখার কৌশল বের করেছেন চিরকাল।

রাসকিন নারীপুরুষের দ্বিমেরুত্ব ও পরিপূরকত্ব প্রস্তাব ক'রেই ধ'রে নিয়েছেন যে তা প্রমাণ হয়ে গেছে; এবং সাথেসাথেই তিনি আঁকা শুরু করেছেন নারীপুরুষের ভিন্ন ও পরিপূরক জগতের মানচিত্র। তিনি পুরুষকে দিয়েছেন মুক্ত পৃথিবী, নারীকে ঢুকিয়েছেন বদ্ধ ঘরে; সৃষ্টি করেছেন *ঘরে-বাইরের* ভিন্ন ও বিপরীত পরিপূরক বিশ্ব। রাসকিনের রাজারা পুরুষ, তাই তারা দায়িত্ব পেয়েছে সমস্ত মানবিক কাজের, আরা রাসকিনের রানীরা নারী, তাই তারা পেয়েছে গৃহপরিচারিকার দায়িত্ব : এই হচ্ছে রাজারানীর পরিপূরকতা! নারীপরুষের ভিন্নতা সম্পর্কে আবহমান পুরুষতন্ত্র যা বলেছে, রুশো যা বলেছেন, যা বলেছে ভিক্টোরীয়রা, তাই বলেছেন রাসকিন (১৮৬৫, ৭২-৭৩) :

তাদের চাবিত্রিক ভিন্নতা সংক্ষেপে এগুলো। পুরুষের শক্তি সক্রিয়, প্রগতিশীল, প্রতিরোধাত্মক। সে প্রধানত কর্তা, স্রষ্টা, আবিষ্কারক, রক্ষক। তার মেধা প্রকল্পনার ও আবিষ্কারের; তার শক্তি অভিযাত্রার, যুদ্ধের, বিজয়ের, যেখানে যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত, যেখানে বিজয় দরকার। কিন্তু নাবীর শক্তি শৃঙ্খলার, যুদ্ধের নয়; আব তার মেধা আবিষ্কার বা সৃষ্টির নয়, তা মধুর শৃঙ্খলার, বিন্যাসের, এবং সিদ্ধান্তের। তার কাজ প্রশংসার : সে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় না, কিন্তু কার শিরে মুকুট পরানো হবে সে তার রায় দেয়। তার কাজ ও স্থান দিয়ে সে সব রকম বিপদ ও প্রলোভন থেকে সুরক্ষিত। পুরুষ, মুক্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন কর্কশ কাজে, মুখোমুখি হয় বিপদ ও বিচারেব;–তাই পুরুষেবই জন্যে রয়েছে ব্যর্থতা, অপরাধ, অনিবার্য ভুল: মাঝেমাঝেই সে আহত বা পরাভূত হবে, বিপথে যাবে, এবং সব সময় কঠিনতর হবে। কিন্তু সে নারীকে বক্ষা করে এসব থেকে; তার গৃহের মধ্যে, যা শাসন করে

নারী, যদি নারী নিজে না চায়, তবে নারীকে ঢুকতে হবে না কোনো বিপদ, প্রলোভন, ভুল বা অপরাধের মধ্যে। এ হচ্ছে গৃহের আসল প্রকৃতি- এটা শান্তির এলাকা।

রাসকিনের বুলির সারকথা : পুরুষ প্রভু, নারী তার সেবিকা। গৃহে থাকা, সংসার শাসন করা, পুরুষের সেবা করাই রাসকিনের মতে 'নারীর প্রকৃত স্থান ও শক্তি'। নারীকে হ'তে হবে গৃহের উপযুক্ত, ওই বদ্ধকূপে থেকেই সে সফল ক'রে তুলবে তার জীবন। নারী হবে আপাদমস্তকআত্মা এমন নারী যে সে যেখানেই রাখবে তার পা দুখানি, তাই হয়ে উঠবে গৃহ। তাঁর, ও তাঁর পুরুষাধিপত্যবাদী গোত্রের, কাছে এই প্রাকৃতিক। রাসকিনের ও ভিক্টোরীয়দের কাছে প্রথাই প্রাকৃতিক; যা চ'লে এসেছে, তা যতোই নিষ্ঠুর অমানবিক অস্বাভাবিক হোক-না-কেনো, তাঁদের কাছে তাই প্রাকৃতিক শাশ্বত। নারীকে তার জীবন সফল করার জন্যে আয়ত্ত করতে হবে নানা রমনীয় গুণ। রাসকিন (১৮৬৫,৭৩-৭৪) তাঁর রানীদের ভূষিত দেখতে চেয়েছে আত্মবিনাশী গুণে :

সে হবে স্থায়ীভাবে, অটলভাবে ভালো; সহজাতভাবে, অভ্রান্তভাবে জ্ঞানী-জ্ঞানী, আত্মবিকাশের জন্যে নয়, বরং আত্মোৎসর্গের জন্যে : জ্ঞানী, এজন্যে নয় যে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে স্বামীর ওপরে, ববং এজন্যে যাতে সে ব্যর্থ না হয় স্বামীর পাশে থাকতে।

রাসকিন পুরোপুরি বাতিল ক'রে দিয়েছেন নারীদের অস্তিত্ব, কেননা নারীর কিছুই নারীর নিজের জন্যে নয়। নারীকে ভালো হ'তে হবে স্থায়ীভাবে, অটলভাবে; জ্ঞানীও হ'তে হবে সহজাতভাবে, অভ্রান্তভাবে; কিন্তু সে আত্মবিকাশ ঘটাতে পারবে না, সে নিজেকে তৈরি করবে পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রের পায়ে আত্মোৎসর্গের জন্যে। এ হচ্ছে একধরনের সতীদাহ। রাসকিন নারীদের পরিণত করেছেন শোচনীয় প্রাণীতে, অথচ ভিক্টোরীয় কপটতায় তাদের ডেকেছেন 'রানী' বলে।

পুরুষতন্ত্র শুধু পীড়ন ক'রে নারীদের নারী ক'রে তোলে নি, তাদের দীক্ষিত করেছে ইতিহাসের সবচেয়ে বিষাক্ত মন্ত্রে, যার নাম নারীমন্ত্র। নারীমন্ত্রে দীক্ষা দেয়ার জন্যে পুরুষতন্ত্র উদ্ভাবন করেছে বিশেষ ধরনের নারীশিক্ষা, যা প্রকৃতপক্ষে কোনো শিক্ষাই নয়। রুশোর *এমিল*-এর বিকল্প নাম *শিক্ষা*, কিন্তু ওই শিক্ষা নারীদের জন্যে অশিক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। রাসকিনও ওই শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থাৎ অশিক্ষায় অশিক্ষিত করতে চেয়েছেন নারীদের। রাসকিন নারীদের জন্যে রেখেছেন স্বামী ও সংসার, তাই তাদের দিতে চেয়েছেন সে-শিক্ষা যাতে নারীরা সম্পূর্ণরূপে খাপ খায় স্বামী ও সংসারের অন্ধকূপে। রাসকিন বলেছেন, 'আমি নারীদের স্থান ও শক্তি দেখিয়েছি'; তারপর প্রশ্ন করেছেন নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে, 'এর সাথে খাপ খাবে কী ধরনের শিক্ষা?' নারীদের জন্যে তিনি বিধিবদ্ধ করেছেন খাপ-খাওয়ানোর শিক্ষা, যার লক্ষ্য নারীদের পুরুষাধীনতায় অভ্যস্ত ক'রে তোলা। রাসকিন (১৮৬৫,৭৬) বলেন, 'প্রথমে নারীর দেহখানিকে ছাঁচে ফেলে ঢালাই করতে হবে'; তারপর ওই নমনীয় ভঙ্গুর দেহখানির ভেতর যে-মনটি থাকবে, সেটিকে 'বদলে দিতে হবে ও ভ'রে তুলতে হবে' আত্মোৎসর্গের শিক্ষায়। রাসকিনের মতে নারীর জ্ঞান যেমন আত্মবিকাশের জন্যে নয়,

তেমনি শিক্ষাও আত্মবিকাশের জন্যে নয়;– নারীর শিক্ষা পুরুষের সেবা করার জন্যে, পুরুষের সহচরী হয়ে ওঠার জন্যে। এ-শিক্ষায় নারী বড়োজোর হয়ে উঠবে সখি, সচিব ও প্রিয়শিষ্যা, যা তাকে ক'রে তুলবে পুরুষের কাছে আকর্ষণীয়, কিন্তু সে কখনো স্বাধীন ব্যক্তি হয়ে উঠবে না।

রাসকিন (১৮৬৫, ৭৬-৭৯) নারীকে দিতে চেয়েছেন পুরুষের সহচরী হয়ে ওঠার শিক্ষা। নারীকে দিতে হবে সে-সব জ্ঞান, যা নারীকে সাহায্য করবে 'পুরুষের কাজ বুঝতে, এমনকি সহায়তা করতে'। অর্থাৎ পুরুষ হবে ঔপন্যাসিক, আর তাঁর স্ত্রী হবে পাণ্ডুলিপিপ্রস্তুতকারক ও প্রুফসংশোধক, পুরুষ বিশ্ববিখ্যাত হবে আর নারী স্বামীর খ্যাতিতে ধন্য বোধ করবে! এ-প্রসঙ্গে টলস্টয় ও তাঁর স্ত্রী সোফিয়া স্মরণীয়। টলস্টয় পুরুষতন্ত্রের মহাপুরুষের স্থান পেয়েছেন, আর নিন্দিত হয়ে আছেন সোফিয়া, যদিও ওই নারী সহচরীরূপে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেছেন টলস্টয়ের বিখ্যাত নিষ্ঠুর পায়ে। টলস্টয় দুশ্চরিত্র ছিলেন, নিজের অবৈধ পুত্রদের লাগিয়েছেন ভূমিদাসের কাজে, পরিচারিকাদের গর্ভবতী করেছেন, আর শেষ জীবনে যখন ধর্ম ও নিষ্কামতা প্রচার করছিলেন তখনও জড়িত ছিলেন চেরট্‌কভের সাথে সমকামে; এবং নিয়মিতভাবে গর্ভবতী ক'রে চলছিলেন সোফিয়াকে, আর সোফিয়া ক'রে চলছিলেন স্বামীর সহকারীর কাজ। টলস্টয় তাঁকে তেরোবার গর্ভবতী করেন, ওই নারী নটি জীবিত সন্তান লালনপালন করেন, জমিদারি দেখাশোনা করেন, প্রকাশ করেন স্বামীর রচনাবলি, এবং বারবার অনুলিপি প্রস্তুত করেন স্বামীর পাণ্ডুলিপির। টলস্টয়ের অপাঠ্য হস্তাক্ষরে লেখা *যুদ্ধ ও শান্তি* উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির অনুলিপি তৈরি করেন তিনি সাতবার, রাত জেগেজেগে বিবর্ধক কাচ দিয়ে দেখে, এবং নষ্ট করেন নিজের জীবন [দ্র ফিজেস (১৯৭০, ১৬৩-১৬৪)]। রাসকিন এভাবেই নষ্ট করতে চান নারীকে। রাসকিন বলেন, নারীকে 'জ্ঞান দেয়া যাবে না জ্ঞান হিশেবে', নারীদের জ্ঞান দিতে হবে এমনভাবে যাতে নারী শুধু 'অনুভব ও বিচার করতে পারে'। নারীর মাথাটি নষ্ট ক'রে দিয়ে তার বুকের ভেতরে সৃষ্টি করতে হবে স্যাঁতসেঁতে ভাবালুতা। নারীর জ্ঞান 'নারীর গর্ব বা বিশুদ্ধির জন্যে নয়'; তা শুধু তাকে দয়াবতী ক'রে তোলার জন্যে। রাসকিনের বিধান হচ্ছে নারীকে বিজ্ঞান শেখানোর দরকার নেই, তাকে শুধু বিজ্ঞানের দু-একটি খবর জানানো যেতে পারে। নারীকে জ্ঞানের 'অভিধানে পরিণত করার দরকার নেই'; তবে তাকে ক'রে তুলতে হবে ভাবালুতার ঝরনাধারা। নারীকে ধর্মতত্ত্বও শেখানো যাবে না, এটা বিশেষভাবেই বারণ করেছেন রাসকিন, কেননা এটা এক 'ভয়ঙ্কর বিজ্ঞান', যেখানে পদস্খলন ঘটেছে শ্রেষ্ঠ পুরুষদেরও। নারীরা ধর্ম সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না, তবে তাদের ভ'রে তুলতে হবে ধর্মভাবে, যাতে তারা হয়ে ওঠে বিনীত ও করুণাময়ী।

স্ববিরোধিতা ক'রে এক সময় রাসকিন বলেন, 'এটা (ধর্মতত্ত্ব) বাদে, ছেলে ও মেয়ের শিক্ষা, পাঠে ও বিষয়ে, হবে প্রায় একই'; তবে তাদের 'শিক্ষার লক্ষ্য হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন'। 'প্রায় একই' অবশ্য অভিন্নতা বোঝায় না, বোঝায় সম্পূর্ণ ভিন্নতা; আর লক্ষ্য তো 'সম্পূর্ণ ভিন্ন'। রাসকিন চান পুরুষের জন্যে শিক্ষা, আর নারীর জন্যে অশিক্ষা :

নারীর শিক্ষা হবে স্বামীমুখি। স্বামী যা কিছু জানে স্ত্রীকে জানতে হবে সে-সব, তবে ভিন্নভাবে; ওই জ্ঞানে স্বামীর 'অধিকার হবে মৌলিক ও অগ্রসর'; আর স্ত্রীর অধিকার হবে 'সাধারণ, যাতে তা প্রাত্যহিক জীবনে উপকারে আসে'। রাসকিনের বিধান হচ্ছে 'পুরুষ তার জানা ভাষা বা জ্ঞান আয়ত্ত করবে ব্যাপকভাবে, আর নারী ওই ভাষা বা জ্ঞান জানবে ততোটুকু, যতোটুকু হ'লে সে তার স্বামীর আনন্দের সঙ্গে তাল দিতে পারে'। সারকথা হচ্ছে নারীকে কোনো যথার্থ শিক্ষাই দেয়া হবে না, তাদের দিতে হবে নারী হয়ে ওঠার, স্বামীর সহচরী হয়ে ওঠার সবক। তারা হয়ে উঠবে উন্নত জাতের দাসী ও শয্যাসঙ্গিনী। রাসকিনের নারীশিক্ষা হচ্ছে পুরুষের সাথে খাপ-খাওয়ানোর শিক্ষা। তিনি বিশ্বাস করেন নারী-অধীনতায়; তার শিক্ষাও নারীকে পুরুষের অধীন করার মন্ত্র। নারীশিক্ষা পুরুষতন্ত্রের একটি বড়ো ভীতির ব্যাপার, কেননা শিক্ষা নারীকে পরিচয় করিয়ে দেয় নিজের সাথে, তাকে বুঝিয়ে দেয় তার পতনের শোচনীয়তা ও সম্ভাবনাকে।

ভিক্টোরীয় যুগে নানা চক্রান্ত হয়েছে নারীর শিক্ষা নিয়ে, যে-চক্রান্তের একটি আদর্শ রূপ পাওয়া যায় টেনিসনের *প্রিন্সেস*-এ (১৮৪৭, ১৮৫৩), যার দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত ছিলেন রাসকিন। *প্রিন্সেস* একটি শিক্ষাবিতর্কমূলক কাব্য। ভিক্টোরীয় যুগে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিলো; এমনকি এর প্রভাব পড়েছিলো রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদার* ওপরও, যার ফলে একটি বিদ্রোহী স্বায়ত্তশাসিত রাজকন্যা হয়ে ওঠে পুরুষের শোচনীয় সহচরী। *প্রিন্সেস*-এ বিবাহবিরোধী রাজকন্যা আইডা নারীশিক্ষার জন্যে স্থাপন করে একটি নারী-বিশ্ববিদ্যালয়; সেখানে ছাত্রীর ছদ্মবেশে ভর্তি হয় আইডার অনুরাগী মৃগীরোগগ্রস্ত এক রাজপুত্র ও তার বন্ধু। রাজপুত্র যখন ধরা পড়তে যাচ্ছিলো, তখন একদিন সে জলমগ্ন আইডাকে উদ্ধার ক'রে প্রাণে বাঁচায়, এবং প্রেম নিবেদন করে। আইডা তা প্রত্যাখ্যান করে। এক সময় যুদ্ধ বাধে আইডা ও রাজপুত্রের দলের মধ্যে; যুদ্ধে আহত হয় রাজপুত্র। আইডা আহত রাজপুত্রের সেবা ক'রে নিজেকে সমর্পণ করে তার কাছে; বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ক'রে সেখানে সে স্থাপন করে হাসপাতাল। বিশ্ববিদ্যালয়কে হাসপাতালে ও শিক্ষানুরাগী বিবাহবিরোধী রাজকন্যাকে নার্সে পরিণত করে পুরুষতন্ত্র প্রতিশোধ গ্রহণ করে নারীবাদ ও নারীশিক্ষার ওপর।

প্রিন্সেস-এ প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে নারীবাদের ওপর; দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে নারীর স্থান হচ্ছে গৃহ, নারীর কাজ পুরুষের সেবা করা। নারীর শিক্ষা হচ্ছে বাজে কথা, আর নারীপুরুষ কখনো সমান হ'তে পারে না। *প্রিন্সেস*-এর নায়ক আইডাকে বিয়ে করতে চায়, তবে সে এমন কাউকে বিয়ে করতে পারে না যে তার সমকক্ষ। নারীর সমকক্ষতা দাবি দ্রোহিতা, তাই তাকে পেতে হবে উপযুক্ত শাস্তি। দ্রোহী নারীকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যাতে সে হয়ে ওঠে অনুগত স্বামীপরায়ণ দাসীস্বভাব স্ত্রী। নারী যদি সমান হয়ে ওঠে পুরুষের, তাহলে কি বিয়ে টিকতে পারে, সুখের হ'তে পারে সংসার? ভিক্টোরীয়রা বিশ্বাস করতো সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে; আর রমণীর শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে পুরুষের নিচে থাকা। শিক্ষা হচ্ছে সে-শক্তি যাতে নারী সমান হয়ে উঠতে পারে

পুরুষের, তাই নারীকে সরিয়ে নিতে হবে শিক্ষার দরোজা থেকে। নারীকে থাকতে হবে ঘরে, তাই *প্রিন্সেস*-এ গানেগানে প্রচার চালানো হয়েছে ঘর আর চুলোর সপক্ষে; হিটলার যেমন প্রচার চালিয়েছে 'কিন্ডের, কুচে উন্ট কিরচে'র [শিশু, রান্নাঘর ও গির্জা] পক্ষে। তাদের কাছে প্রেম/বিবাহ ও শিক্ষা ছিলো পরস্পরবিরোধী; একটি করা যাবে, একসাথে দুটি করা যাবে না। এ-কাব্যে পুরুষাধিপত্যবাদী ভিক্টোরীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে প্রচণ্ডভাবে [দ্র মিলেট (১৯৬৯, ৭৮-৭৯)]:

মাঠের জন্যে পুরুষ আর চুলোর জন্যে নারী;
তলোয়ারের জন্যে পুরুষ সূচের জন্যে নারী;
পুরুষের আছে মগজ, নারীর আছে হৃদয়;
পুরুষ দেবে আদেশ, আর পালন করবে নারী;
...
পুরুষ শিকারী; নারীরা শিকার।
মৃগয়ার চকচকে ঝলমলে মৃগ,
আমরা শিকার করি তাদের চামড়ার সৌন্দর্যের জন্যে;
এজন্যেই তারা ভালোবাসে আমাদের
এবং আমরা অশ্ব ছুটিয়ে তাদের ভূপাতিত করি।

হিংস্র পুরুষাধিপত্যের কোমল চতুর রূপ হচ্ছে নারীপুরুষের পরিপূরক পার্থক্যের তত্ত্ব। নারীপুরুষের সাংস্কৃতিক আপাতপার্থক্যকে ভিক্টোরীয় রীতিতে জৈবিক ক'রে তুলেছেন টেনিসন 'প্রতিটি লিঙ্গ একলা অর্ধেক' ব'লে। তাঁর মতে নারীপুরুষ দুজনে মিলে গ'ড়ে তোলে 'বিশুদ্ধ সঙ্গীত'; তবে এ-দ্বৈত সঙ্গীতে পুরুষই প্রধান সুর। টেনিসন বিশ্ববিদ্যালয়কে হাসপাতালে, জ্ঞানার্থী তরুণীকে নার্সে পরিণত ক'রে ঘরে ঢুকিয়ে সৃষ্টি করেছেন ভিক্টোরীয় বিবাহের বিশুদ্ধ সঙ্গীত; রাসকিন করেছেন একই কাজ। নারীকে শিক্ষার নামে দিয়েছেন অশিক্ষা, নারীর পুরুষাধীনতাকে ক'রে তুলেছেন মহিমান্বিত।

রাসকিনের রানীদের রাজ্য গৃহ, সংসারই তাদের রাজদরবার; তবে শিভালরিতে তিনি অদ্বিতীয়, তাই তিনি রাষ্ট্রের সাথে তাঁর রানীদের/নারীদের কী সম্পর্ক হবে, তাও দেখাতে ভোলেন নি। তিনি বলেছেন (১৮৬৫, ৮৭), 'আমাদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে পুরুষের দায়িত্ব বাইরে, আর নারীর দায়িত্ব ঘরে। তবে আসলে তা নয়।' তাঁর মতে নারীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব রয়েছে সংসারের প্রতি, তবে বাইরের প্রতিও রয়েছে তার দায়িত্ব। নারীর বাইরের জগত, রাসকিনের মতে, তার সংসারেরই সম্প্রসারণ। পুরুষের নিজের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব 'ভরণপোষণ, উন্নতি ও নিরাপত্তা' নিশ্চিত করা, আর নারীর কাজ হচ্ছে সংসারকে 'সাজানোগোছানো, আরামপ্রদ ও মনোরম করা'। রাসকিন রাষ্ট্রের প্রতি নারীপুরুষের যে-দায়িত্ব নির্দেশ করেছেন, তাতে পুরুষ প্রভু, নারী তার সহায়ক অলঙ্কার। পুরুষের দায়িত্ব 'রাষ্ট্রকে সচল রাখা, তার উন্নতি করা, তার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা'; আর নারীর দায়িত্ব হচ্ছে 'রাষ্ট্রকে সাজিয়েগুছিয়ে, আরামপ্রদ ও সুন্দর ক'রে রাখা'। এরপর রাসকিন পুরুষকে 'ভদ্রলোক'-এর বদলে ভূষিত করেন 'লর্ড' উপাধিতে, নারীকে 'ভদ্রমহিলা'র বদলে 'লেডি'তে। তবে তিনি 'লর্ড' ও 'লেডি' শব্দের

যে-অর্থ নির্দেশ করেন, তাতে নারীর সব মহিমা লুটিয়ে পড়ে। 'লেডি' শব্দের অর্থ 'রুটিদানকারিণী', অর্থাৎ যে ভিক্ষা দেয়; আর 'লর্ড' শব্দের অর্থ 'আইনরক্ষাকারী' বা 'প্রভু'। সমস্ত ক্ষমতা থাকছে পুরুষের হাতে, নারী শুধু পালন করবে দান বা ভিক্ষা দেয়ার কাজ। কিন্তু নারী দান করবে কার ধন? সে নিজেই তো সর্বহারা, ভিখিরি; পুরুষের ধন ছাড়া দেয়ার মতো কোনো ধন তার নেই। তাহলে কি তার কাজ প্রভুর ধন থেকে মাঝেমাঝে কিছু ভিক্ষে দিয়ে প্রভুর শোষণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা? রাসকিনের 'পদ্ম : রানীর বাগানের' হচ্ছে পুরুষাধিপত্যের ভিক্টোরীয় মন্ত্র ও চক্রান্ত, যার থেকে এখনো উদ্ধার পায় নি মধ্যবিত্ত নারীরা। নিম্নবিত্ত নারীদের কথা তিনি ভাবেনই নি, তাঁর চোখে তারা রানী নয়, নারীও নয়, সম্ভবত মানুষও নয়।

জন স্টুয়ার্ট মিল

রুশো-রাসকিন পুরুষতন্ত্রের মহাপুরোহিত; নারীর জন্যে তাঁরা বিধিবদ্ধ করেছেন বিনোদযোগানো দাসীর ভূমিকা। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁদের বিপরীত; পুরুষের মধ্যে তিনিই প্রথম নারীকে দেখেছেন মানুষরূপে, এবং নারীর জন্যে খুলে দিতে চেয়েছেন মানবিক সমস্ত এলাকা। ১৮৬৯-এ বেরোয় মিলের *দি সাবজেকশন অফ উইমেন* [*নারী-অধীনতা*]। মিল ছিলেন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তির অধিকারের দার্শনিক; তিনিই প্রথম পুরুষ, যিনি একটি সম্পূর্ণ বই লেখেন নারীর অধিকারের সমর্থনে। তাঁর আগে কোনো পুরুষ নারীর দুর্দশার কথা ভাবে নি বা দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে চায় নি নারীদের, তা নয়; তাঁর আগে বাঙলায়ই আমরা পেয়েছি দুজন মানবিক নারীবাদী : রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে; তবে মিলই প্রথম বিস্তৃতভাবে দেখান পুরুষতন্ত্রের নারীশোষণের রূপটি। মিল রুশো বা রাসকিনের মতো ভাবালুতাগ্রস্ত নন, তাঁর মধ্যে নেই রুশোর স্ববিরোধিতা; মিল তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে, মাঝেমাঝে ক্ষোভ মিশিয়ে, পেশ করেছেন নিজের বক্তব্য। মিল দেখান নারীর জীবনের শোচনীয় বাস্তবতা, পুরুষের অধীনে নারীর দুরবস্থা। তাঁর দেড় দশক পরে এঙ্গেলস *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে* (১৮৮৪) উদঘাটন করেন শোষণের বিশ্বজনীন সূত্র। মিলের লেখায় পাওয়া যায় ভিক্টোরীয় পর্বের লৈঙ্গিক রাজনীতির বাস্তবতার দিকটি; ভিক্টোরীয় পুরুষ ও মহাপুরুষদের মতো নারী সম্পর্কে তিনি পরীর গল্প বলেন নি, বলেছেন নির্মম সত্য। মিলের *নারী-অধীনতা* প্রথাবিরোধী রচনা, তাতে প্রথার সমস্ত শেকড় তুলে ফেলা হয়েছে অকাট্য যুক্তির সাহায্যে। মানুষের অগ্রগতি ও স্বাধীনতার বড়ো বাধা হচ্ছে প্রথা, সুবিধাভোগীরা ওই প্রথাকেই ঐশ্বরিক, শাশ্বত, প্রাকৃতিক ব'লে প্রচার ক'রে টিকিয়ে রাখতে চায় নিজেদের স্বার্থ। নারী প্রথার প্রধান শিকার। যিনি প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেন, প্রথাবাদীরা তাঁর নিন্দা রটায়; নিন্দা রটানো হয়েছিলো মিলের বিরুদ্ধেও। মিল বইটি লিখেছিলেন ১৮৬১তে; বইটি লেখায় তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন স্ত্রী হ্যারিয়েট টেইলর, এবং সহায়তা করেছিলেন সৎকন্যা হেলেন টেইলর। হ্যারিয়েট নারীবাদী আন্দোলনকারী ছিলেন, মিল তাঁকে বিয়ে করার সময় খ্রিস্টান স্বামীর সমস্ত আইনসঙ্গত অধিকার লিখিতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কেননা তা স্বামীস্ত্রীর সাম্যের বিরোধী।

তাই মিলের *নারী-অধীনতা* পারিবারিক আবেগ থেকেই জন্মেছিলো, যদিও বইটিতে আবেগের কোনো চিহ্ন নেই। মিলের *নারী-অধীনতায়* উপস্থাপিত হয়েছে কালকালান্তর ধ'রে নারীর শোচনীয় অবস্থার বাস্তবতা; তিনি আক্রমণ করেছেন নারীর আইনগত দাসীত্বকে, শিক্ষার নামে অশিক্ষাকে, ভিক্টোরীয় যুগের স্ত্রীসুলভ অধীনতাকে। তাঁর বক্তব্য বিপ্লবাত্মক, যখন নারীর জন্যে দাসীর দর্শন রচনা করাই ছিলো মহাপুরুষত্ব, তখন তিনি দাবি করেছিলেন নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও পুরুষের সাথে বিশুদ্ধ সাম্য। মিলের মূল প্রতিপাদ্য (১৮৬৯, ১) :

> যে-নীতি নিয়ন্ত্রণ করে দু-লিঙ্গের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক–এক লিঙ্গের কাছে আরেক লিঙ্গের আইনগত অধীনতা–তা সম্পূর্ণ ভুল; এবং এখন মানুষের অগ্রগতির এক প্রধান বাধা; এর জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশুদ্ধ সাম্যের নীতি, এতে একপক্ষের থাকবে না বিশেষ কোনো ক্ষমতা বা সুবিধা, অন্যপক্ষেরও থাকবে না কোনো অসুবিধা।

পুরুষতন্ত্রের কাছে তখন এমন বক্তব্য ছিলো পুরুষতন্ত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি জানতেন তাঁর বক্তব্য কলহ বাধাবে, এবং তা বেধেছিলো প্রচণ্ডভাবে। তাঁর বক্তব্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলো ভিক্টোরীয় পুরুষতন্ত্র; এবং মিলকে দিয়েছিলো উন্মাদ আর অনৈতিকের অপবাদ।

পুরুষতন্ত্রের কোনো যুক্তি ছিলো না, কিন্তু ছিলো প্রথা, আর গোঁড়ামি। মিল জানতেন, যাঁরা আক্রমণ করেন কোনো বিশ্বজনীন বিশ্বাস বা প্রথাকে, তাঁদের ভাগ্যে জোটে দুঃসহ দুর্দশা, কখনো সুপরিকল্পিত অবহেলা। মিলের *নারী-অধীনতা* প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তির আক্রমণ; এতে নেই ভাবাবেগ বা মিথ্যার দোহাই, যদিও যে-সময় তিনি লিখছিলেন তখন প্রথাবদ্ধ গোঁড়াদের শক্তির প্রকাশ ঘটতো প্রথাগত ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে, যেমন আজো ঘটে। মিল (১৮৬৯, ৫) বলেছেন,'আমি কলহ করতে চাই না তাঁদের সাথে, যাঁদের বিশ্বাস নেই যুক্তিতে, কিন্তু অতিবিশ্বাস রয়েছে প্রথায় ও সাধারণ আবেগে।' নারী পুরুষের অধীনে, এ-সম্পর্কে মিল (১৮৬৯, ৮) বলেছেন, যারা মনে করে নারীদের থাকতে হবে পুরুষদেরই অধীনে, তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে বিশেষ এক তত্ত্ব। ওই তত্ত্বটি তারা গোঁড়ামির সাথে পোষণ ক'রে আসছে, তাই ওই তত্ত্বের বিরোধী আর কিছু কখনো পরীক্ষা ক'রে দেখতে দেয়া হয় নি। নারীপুরুষের অসাম্য, মিলের মতে, বিশেষ বিচারবিবেচনার ফল নয়; এর উদ্ভব ঘটেছে পুরুষের শারীরিক শক্তির ফলে। পুরুষ শক্তিবশত নারীকে নিজের অধীন করেছে, পরে আইন বিধিবদ্ধ করেছে তাই। মিল দেখিয়েছেন শক্তিপ্রয়োগের ফলেই সূচনা ঘটেছে সব রকম আধিপত্য ও অধীনতার, তারপর আধিপত্য ও অধীনতাকেই পরিণত করা হয়েছে বিধানে। নারীর অধীনতাকে মিল তুলনা করেছেন দাসত্বপ্রথার সাথে। মিল দেখিয়েছেন দাসত্ব শুরুতে ছিলো প্রভু ও দাসের মধ্যে শক্তির ব্যাপার; কিন্তু পরে তা বিধানে পরিণত করা হয়। প্রভুরা একত্র হয়ে দাসত্বকে পরিণত করে বিধানে। মিলের মতে প্রাচীন কালে অধিকাংশ নরনারীই ছিলো দাস; পরে মুক্তি লাভ করে পুরুষ দাসেরা, আর নারীকে বিন্যস্ত করা হয় একটু কোমল ধরনের অধীনতার ভেতরে। বর্তমানে নারীপুরুষের যে-অসাম্য, তার মূলে

রয়েছে শক্তিমানের আইন। মিলের মনে করেন শক্তিমানের আইন এখন পরিত্যক্ত হ'লেও তা রয়ে গেছে নানা এলাকায়. যেমন নারীর বেলা। শক্তিমানের বিধি অনুসারে নারী পরিণত হয়েছে গৃহদাসীতে।

পুরুষতন্ত্র প্রচার করে যে পুরুষের প্রভুত্ব ও নারীর অধীনতা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক। কোনো কিছুকে প্রাকৃতিক/স্বাভাবিক বলার অর্থ হচ্ছে তা মানুষের তৈরি নয়, তা কোনো শাশ্বত বিধানের ফল। তাই তা প্রশ্নের ওপরে, তা অসংশোধনীয়। কিন্তু মানুষের জীবনে কোনো কিছুই শাশ্বত নয় : বিধাতা, ধর্ম, রাজা, প্রজা. ধনী, দরিদ্র সবই মানুষের তৈরি। সুবিধাভোগীরা চিরকালই দোহাই দেয় ঈশ্বরের, প্রকৃতির, স্বভাবের; কেননা তাতে রক্ষা পায় তাদের স্বার্থ। মিল (১৮৬৯, ২১) প্রশ্ন করেছেন, 'এমন কি কোনো আধিপত্য রয়েছে, যা প্রাকৃতিক মনে হয় নি প্রভুদের কাছে?' তিনি দেখিয়েছেন এক সময় মানবসমাজকে ভাগ করা হতো দুটি ভাগে : ছোটো ভাগটিতে পড়তো প্রভুরা আর বড়ো ভাগটিতে দাসেরা, এবং তাকেই মনে করা হতো প্রাকৃতিক; এমনকি শ্রেষ্ঠ পুরুষেরাও তাই মনে করতো। জ্ঞানী আরিস্তলের কাছেও প্রভু ও দাসের বিভাগকে মনে হয়েছিলো প্রাকৃতিক। তিনি মনে করতেন মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই রয়েছে দুটি ভাগ : একটি স্বাধীন প্রকৃতির, যেমন গ্রিকরা; আরেকটি দাসপ্রকৃতির, যেমন থ্রেসীয় ও এশীয়রা। মার্কিন দাসমালিকেরাও প্রাকৃতিক ব'লে মনে করতো শাদার প্রভুত্ব ও কালোর দাসত্বকে। রাজতন্ত্রবাদীরা সব সময়ই মনে করেছে যে রাজতন্ত্রই প্রাকৃতিক। এসবের মূলকথা হচ্ছে যারা জোর ক'রে ক্ষমতা দখল করেছে, যারা প্রভু হয়ে উঠেছে. তাদের কাছে প্রভুত্ব মানেই প্রাকৃতিক। চিরকাল বিজয়ীরা মনে করেছে যে প্রকৃতির নির্দেশ হচ্ছে বিজিতরা অধীনে থাকবে বিজয়ীদের। মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুরা নিজেদের প্রভুত্বকে মনে করতো প্রাকৃতিক; নিম্নশ্রেণীর মানষেরা তাদের সমান হবে এমন ভাবনাকে তারা মনে করতো সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক। তা-ই মানুষের কাছে অস্বাভাবিক/ অপ্রাকৃতিক ব'লে মনে হয়, যা অপ্রথাগত; যা প্রথায় পরিণত হয়েছে, তা যতোই অস্বাভাবিক উৎকট পাশবিক হোক-না-কেনো, তা-ই মানুষের কাছে স্বাভাবিক। মিল (১৮৬৯, ২২-২৩) তথাকথিত প্রাকৃতিককে নির্দেশ করেছেন প্রথা ব'লে :

> এটা এতো সত্য যে অস্বাভাবিক বলতে সাধারণত বোঝানো হয় শুধু অপ্রথাগতকে, আর যা কিছু প্রথাগত তাকেই মনে করা হয় প্রাকৃতিক/স্বাভাবিক। নারীর পুরুষাধীনতা যেহেতু বিশ্বজনীন প্রথা, তাই এর থেকে সামান্য স'রে যাওয়াকে মনে হয় অস্বাভাবিক।

অপ্রথাগত ব'লে অস্বাভাবিক মনে হওয়ার নানা উদাহরণ দিয়েছেন মিল। বিলেতের শাসক একজন নারী, এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার ব'লে মনে হয় পৃথিবীর নানাদেশের মানুষের কাছে; রানীর শাসন তাদের কাছে অবিশ্বাস্যরূপে অস্বাভাবিক। ইংরেজের কাছে এটা অস্বাভাবিক নয়, কেননা এতে তারা অভ্যস্ত; কিন্তু নারীদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া বা সংসদসদস্য হওয়া তাদের কাছে অস্বাভাবিক। চিরকালই সুবিধাবাদী শোষকেরা নিজেদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ রাখার জন্যে দোহাই দেয় প্রকৃতির। নারীকে বশে রাখার

জন্যে তারা দোহাই দিয়েছে প্রকৃতির। মিল 'প্রাকৃতিক' ধারণাকেই বাতিল ক'রে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে নারীপুরুষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা এবং তাদের সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক অবস্থাকে প্রাকৃতিক ব'লে দাবি করা একধরনের রাজনীতি। মিলের কাছে কোনো কিছুই প্রাকৃতিক নয়। পুরুষতন্ত্র মনে করে পুরুষের প্রভুত্ব ও নারীর দাসীত্ব প্রাকৃতিক; মিল দেখিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম।

পুরুষতন্ত্রের প্রবক্তারা ব'লে থাকে যে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য ভিন্ন অন্যান্য আধিপত্য থেকে, কেননা এটা শক্তির আধিপত্য নয়; নারী এ-আধিপত্য মেনে নিয়েছে, গ্রহণ করেছে স্বেচ্ছায়। এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই নারীর, নারী স্বীকৃতি দিয়েছে এ-আধিপত্যকে। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হ'তে পারে; এখনকার নারীপুরুষের অবস্থা দেখে মনে হ'তে পারে যে পুরুষাধিপত্য নারীর কাছে আকর্ষণীয়। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে চোখে পড়ে প্রকৃত সত্যটি যে নারী পুরুষাধীনতা মেনে নেয় নি। মিল বলেছেন, বহু নারী পুরুষাধিপত্যকে স্বীকার করে না; অনেকে লেখার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে তাঁদের মনোভাব, এবং এখন নারীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে প্রকাশ্যে। নারীরা ভোটাধিকার চায়, চায় পুরুষের সাথে সমান শিক্ষা ও পেশা। মিলের সময় পর্যন্ত নারীবাদীরা স্পষ্টভাবে বলে নি যে তারা পুরুষাধিপত্য মানে না, তারা সম্পূর্ণ মুক্তি চায়; কিন্তু মিল তাদের আন্দোলনে দেখেছেন পূর্ণ মুক্তির অভিলাষ। মিল বলেছেন, কোনো পরাধীন শ্রেণীই একবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে না। যারা বহুদিন প্রচলিত কোনো শক্তির অধীনে থাকে, তারা শুরুতেই ওই শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় না, প্রতিবাদ জানায় শুধু তার পীড়নের বিরুদ্ধে। অসংখ্য নারী প্রতিবাদ জানায় তাদের স্বামীদের পীড়নের বিরুদ্ধে। মিল বলেছেন, নারীরা একযোগে নানা কারণে পুরুষের ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে না। তারা অন্য সমস্ত অধীন-শ্রেণী থেকে ভিন্ন; তাদের প্রভুরা তাদের কাছে শুধু শ্রম চায় না, প্রভুরা তাদের কাছে শ্রমের থেকে কিছুটা বেশি চায়। পুরুষ শুধু নারীদের আনুগত্য চায় না, পুরুষ চায় নারীদের আবেগানুভূতি। শুধু বর্বর ছাড়া কোনো পুরুষই নারীকে একটি বাধ্য ক্রীতদাসী হিশেবে পেতে চায় না, চায় একটি স্বেচ্ছাদাসী; পুরুষ তার নারীর কাছে শুধু দাসী চায় না, চায় প্রিয়দাসী। তাই পুরুষ সব রকমের চেষ্টা চালায় নারীর মনকে দাসীতে পরিণত করার। অন্য ধরনের দাসদের প্রভুরা ভয় জাগিয়ে আনুগত্য আদায় করে দাসদের কাছ থেকে, আর নারীর প্রভুরা যেহেতু শুধু আনুগত্যে সুখী নয়, যেহেতু তারা নারীর কাছে চায় আবেগানুভূতি, তাই তারা নারীকে দেয় এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা। পীড়ন ক'রে নয়, শিক্ষা দিয়ে পুরুষ নারীকে ক'রে তোলে প্রিয় ক্রীতদাসী। পুরুষতন্ত্রের উদ্ভাবিত নারীশিক্ষা হচ্ছে নারীকে পুরুষের দাসী করার শিক্ষা। শিশুকাল থেকেই নারীদের শেখানো হয় যে তাদের প্রকৃতি পুরুষের বিপরীত; নারীরা নিয়ন্ত্রণ করবে না, তারা আত্মসমর্পণ করবে অন্যের নিয়ন্ত্রণের কাছে; সব ধরনের নীতিশাস্ত্র শেখায় যে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণই তাদের কর্তব্য; আর সব ধরনের ভাবালুতা তাদের শেখায় যে নারীর প্রকৃতি হচ্ছে অন্যের জন্যে বেঁচে থাকা, নিজেদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা। বঞ্চিত হওয়াই নারীত্ব! নিজের স্বার্থে নিজের অধীনে

রাখার জন্যে পুরুষ নারীকে এমন শিক্ষা দিয়েছে হাজার হাজার বছর ধ'রে. যাতে নারী হয়ে উঠেছে বিনম্র, বশ্যতাপরায়ণ. এবং নিজের অভিলাষ ছেড়ে দিয়েছে সে পুরুষের হাতে।

পুরুষতন্ত্রের মতে বর্তমানে নারীপুরুষের যে-অবস্থা, পুরুষের আধিপত্য ও নারীর অধীনতা, ঘটেছে নারীপুরুষের স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে। মিল একে বাতিল ক'রে দিয়েছেন, কেননা তাঁর মতে নারীপুরুষের স্বভাব বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানার মতো উপায় তখনো উদ্ভাবিত হয় নি। তাই তাদের স্বভাব ব'লে যা নির্দেশ করা হয়, তা বানানো জিনিশ। মিল (১৮৬৯,৩৮) বলেছেন :

> একথা বলা যাবে না যে এ-দু-লিঙ্গের প্রকৃতি অনুসারেই তাদের বর্তমান ভূমিকা ও অবস্থান নির্ণীত হয়েছে, এবং এ-ই তাদের জন্যে উপযুক্ত। সাধারণ বুদ্ধি ও মানবমনের ভিত্তিব ওপর দাঁড়িয়ে আমি একথা স্বীকার করি না যে এ-দু-লিঙ্গের প্রকৃতি কেউ জানে বা জানতে পারে, বিশেষ ক'রে যখন তাদের দেখা হয় তাদের বর্তমান পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসাবে।.. এখন যাকে নারীপ্রকৃতি বলা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম জিনিশ-- একদিকে তা পীড়নের. আরেক দিকে তা অস্বাভাবিক প্ররোচনার ফল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আর কোনো অধীন-শ্রেণীর চবিত্র তাদের প্রভুদের সাথে সম্পর্কের ফলে এতো অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত হয় নি।

পুরুষ শিক্ষা দিয়ে বদলে, বিকৃত ক'রে দিয়েছে নারীর স্বভাবকে; নারীকে ক'রে তুলেছে বশ্যতাপরায়ণ, ভীরু, ভাবালুতাগ্রস্ত, এবং এর ফলে নারীকে আর যোগ্য মনে হয় না কোনো মানবিক কাজের। নারীপুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্য কোথায়? পুরুষতন্ত্রের প্রবক্তারা বলে যে তারা তা জেনে গেছে সম্পূর্ণরূপে; কিন্তু মিলের মতে সমাজের বর্তমান অবস্থায় তা জানা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মিল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্বভাবের ওপর প্রতিবেশের প্রভাবের দিকে। নারীপুরুষের নৈতিক ও মননগত পার্থক্য যতো ব্যাপকই মনে হোক-না-কেনো এখন, মিল তাকে কিছুতেই স্বাভাবিক পার্থক্য ব'লে মেনে নিতে রাজি নন। কেননা শিক্ষা ও প্রতিবেশের প্রভাবে নারী তার প্রকৃত স্বভাব হারিয়ে ফেলেছে, গ্রহণ করেছে কৃত্রিম স্বভাব। মিলের মতে, পুরুষ নারীকে যা মনে করে নারী তা নয়। পুরুষ নারী সম্পর্কে যা বলে তা ঠিক নয়, নারীর কথা বলতে পারে শুধু নারী।

পুরুষ সাধারণত ধারণা করে যে নারীর ভূমিকা হচ্ছে স্ত্রী ও মাতার। মিল একে শুধু *ধারণা* ব'লেই মনে করেন, ধ্রুব সত্য ব'লে মনে করেন না, কেননা সমাজের বর্তমান অবস্থায় জানার কোনো উপায় নেই নারী নিজেকে দেখতে পছন্দ করে কোন ভূমিকায়। এমনও হ'তে পারে স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকাকে ঘেন্না করে তারা; তবে নারীদের যেহেতু স্বাধীনভাবে কোনো ভূমিকা বা পেশা বেছে নিতে দেয়া হয় নি, তাদের ওপর যেহেতু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকা, তাই তারা বাধ্য হয়ে তা পালন করে; কিন্তু একে তাদের স্বাভাবিক ভূমিকা মনে করার কোনো কারণ নেই। মিলের মতে দাসদের যেমন বাধ্য করা হতো বিশেষবিশেষ কাজ করতে, কারণ ওই কাজ সমাজের জন্যে দরকার, তেমনি নারীদের বাধ্য করা হয় বিয়েতে ও সন্তান লালনে, কেননা সমাজের তা দরকার। পুরুষ নারীর সমস্ত পথ বন্ধ ক'রে খোলা রেখেছে শুধু বিয়ের গলিটি, তাই ওই কানাগলিতে নারীকে ঢুকতেই হয়। মিলের মতে বিয়ে হচ্ছে নারীর সমাজনির্ধারিত

নিয়তি। মিল দেখিয়েছেন এক সময় খ্রিস্টানদের মধ্যে স্বামী ছিলো স্ত্রীর জীবনমৃত্যুর অধিপতি। মিল (১৮৬৯, ৫৫) বলেছেন :

> এখন স্ত্রী হচ্ছে তার স্বামীর দাসখত দেয়া দাসী : আইনের চোখে তারা ক্রীতদাসদের থেকে একটুও কম দাস নয়। বেদীতে সে স্বামীর প্রতি জীবনব্যাপী আনুগত্যের শপথ নেয়।...স্ত্রী নিজের জন্যে কোনো সম্পত্তি অর্জন করতে পারে না, স্বামীর জন্যে পারে; তার সম্পত্তি অবলীলায় স্বামীর সম্পত্তি হয়ে ওঠে। বিলেতের সাধারণ আইনে স্ত্রীর অবস্থা অনেক দেশের ক্রীতদাসের অবস্থার থেকেও খারাপ।

মিল অবশ্য দেখিয়েছেন যে আইনের চেয়ে মানুষ, এমনকি পুরুষও অনেক ভালো; যদি তা না হতো তবে পৃথিবীটা বেশ একটা নরক হয়ে উঠতো। আইন পুরুষকে যতোটা নিষ্ঠুরতার অধিকার দিয়েছে পুরুষ ততোটা নিষ্ঠুর নয়, বা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব ততোটা নিষ্ঠুর হওয়া। তবে আইনে নারী পুরুষের দাসীই।

নারী পুরুষের ওপর নানা প্রভাব খাটাতে পারে, মেষ বানিয়ে রাখতে পারে পুরুষকে; কিন্তু নারীর ওই শক্তির কোনো কোনো মূল্য নেই। মিলের মতে নারীর এ-শক্তি কিছুতেই নারীর স্বাধীনতাহীনতার ক্ষতি পূরণ করতে পারে না। নারীর এ-শক্তি নারীকে অবৈধ অধিকার দিতে পারে, কিন্তু তাকে তার বৈধ অধিকার দাবি করার অধিকার দেয় না। মিল (১৮৬৯,৭০) বলেছেন, সুলতানের প্রিয় ক্রীতদাসীর অধীনেও থাকে অনেক দাসদাসী, তাদের ওপর সে উৎপীড়নও চালিয়ে থাকে; কিন্তু তাতে সে স্বাধীন মানুষ হয়ে ওঠে না, সে থাকে ক্রীতদাসীই। যা কাম্য তা হচ্ছে সে নিজেও দাসী হবে না, আর তার অধীনেও থাকবে না দাসদাসী। কোনোকোনো নারী থাকে অশেষ সুখ ও শক্তির মধ্যে, তবে তা দাসীর সুখ ও শক্তি; সে ওই সুখশক্তি পায় প্রভুকে সেবার ও প্রমোদ দেয়ার বিনিময়ে। মিল ভিক্টোরীয় সমাজের একটি ভণ্ডামোরও সমালোচনা করেছেন। ভিক্টোরীয়রা বারবার বলতো যে নারী পুরুষের থেকে অনেক উৎকৃষ্ট, আর একথা বেশি বলতো তারা, যারা নারীদের আসলেই মনে করতো দাসী। এটা কি এক পরিহাস নয় যে উৎকৃষ্টরা থাকবে নিকৃষ্টদের অধীনে? ভিক্টোরীয়রা নারীদের উৎকৃষ্টতায় বিশ্বাস করতো না, তবে তাদের বশে রাখার জন্যে করতো এ-তোষামোদটুকু। মিল প্রশ্ন করেছেন, নারীরা উৎকৃষ্ট কিসে, এবং দেখিয়েছেন নারীরা পুরুষের থেকে উৎকৃষ্ট শুধু আত্মোৎসর্গপরায়ণতায়! কেননা পৃথিবী জুড়েই শিশুকাল থেকেই নারীদের শেখানো হয় যে তারা জন্ম নেয় আত্মোৎসর্গের জন্যে; তারা নিজেদের যতো বঞ্চিত করবে ততোই উন্নতি ঘটবে পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার! নারী বেঁচে থাকে নিজেকে বঞ্চনা ক'রে, কেননা আত্মবঞ্চনাই পুরুষতন্ত্রের মতে নারীত্ব। মিল মনে করেন নারীপুরুষ যদি সমানাধিকার পায়, তবে লোপ পাবে নারীর এ-আত্মঘাতী প্রবণতা। ভিক্টোরীয়রা বড়াই করতো নৈতিকতার, মিল তাদের নৈতিকতার ভেতরে লুকোনো অনৈতিকতার রূপটিও তুলে ধরেছেন। মিল মনে করেন সাম্যই নৈতিকতা, আর সে-সমাজই নৈতিক যেখানে রয়েছে সাম্য। এতোদিন ধ'রে যে-সমাজ চ'লে এসেছে, সেটা বলতান্ত্রিক সমাজ; সেখানে সমান হওয়ার অর্থই হচ্ছে শত্রু হওয়া। ওই সমাজ ওপর থেকে নিচ

পর্যন্ত শেকল বা মইয়ের মতো, সেখানে কেউ ওপরে কেউ নিচে; তাতে কেউ আধিপত্য করে কেউ থাকে অধীনে। তাই প্রচলিত নৈতিকতা হচ্ছে আধিপত্য ও অধীনতার নৈতিকতা। মিল মনে করেন আধিপত্য ও অধীনতা হচ্ছে সমাজের বিকার; সমাজের স্বাভাবিক রূপ হচ্ছে পারস্পরিক সাম্য। তিনি মনে করেন মনুষ্যত্ব নিহিত পরস্পরের সাথে সমভাবে বসবাসের মধ্যে। তিনি দেখিয়েছেন বর্তমান ব্যবস্থায় পরিবার হচ্ছে স্বৈরাচারের রাজ্য; তবে তিনি মনে করেন ঠিক মতো গ'ড়ে উঠলে পরিবার হবে স্বাধীনতার রাজ্য। মিল আক্রমণ করেছেন পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে, যেখানে পুরুষ প্রভু নারী তার অধীন। মিল দাবি করেছেন নারীপুরুষের আইনগত সমানাধিকার, পরিবারে কেউ প্রভু বা দাসদাসী হবে না; স্বামীস্ত্রী হবে সমান।

পুরুষতন্ত্র নারীপুরুষের বিশ্বকে দুটি পরিচ্ছন্ন ভাগে ভাগ করে; নারীর জন্যে বরাদ্দ করে *ঘর*, পুরুষের জন্যে *বাইর*। ভিক্টোরীয়রা ছিলো *ঘরেবাইরে* তত্ত্বের একনিষ্ঠ উপাসক। পুরুষ নারীকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে, তাকে মা-স্ত্রী-কন্যার ভূমিকা দিয়ে কেড়ে নেয় তার সমস্ত মানবিক অধিকার। মানবিক প্রায় সব পেশাই তারা নিষিদ্ধ করে নারীর জন্যে। নারী যে ওই সব পেশার অযোগ্য, তা নয়; তবে পুরুষ জোর ক'রেই নারীকে ঘোষণা করে ওইসব পেশার অযোগ্য ব'লে। পুরুষের সমান হয়ে ওঠার জন্যে নারীর ফিরে পাওয়া দরকার সমস্ত মানবিক পেশা। নারীপুরুষের সাম্যের জন্যে মিল নারীর জন্যে চেয়েছেন সে-সব ভূমিকা ও পেশা, যা এতোদিন ধ'রে রয়েছে পুরুষের অধিকারে। তিনি দেখিয়েছেন নারীকে সব পেশা ও ভূমিকা থেকে দূরে রাখা হয়েছে, যাতে নারী পরিবারের মধ্যে সহজে মেনে নেয় পুরুষের আধিপত্য। তাঁর মতে অধিকাংশ পুরুষ সমান কারো সাথে বসবাসের কথা ভাবতেই পারে না। তাই পুরুষ নারীকে দূরে রেখেছে সমস্ত আকর্ষণীয় পেশা থেকে, যা নারীকে ক'রে তুলবে পুরুষের সমান। পুরুষ অবশ্য যুক্তি দেয় যে নারী ওই সব কাজের উপযুক্ত নয়, নারীর নেই ওই সব কাজের প্রতিভা বা যোগ্যতা। মিল ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে নারী সম্পর্কে এ-ধারণা সত্য নয়; সত্য হচ্ছে নারী সব কাজই যোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে। তবে নারীকে অনেক কাজ করতেই দেয়া হয় নি, তাই তারা যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পায় নি। তাদের যে-কাজ করতেই দেয়া হয় নি, সে-কাজে তাদের অযোগ্যতা প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও বলা হয় তারা সে-কাজের উপযুক্ত নয়। মিল বলেছেন, এখনো কোনো নারী হোমার, আরিস্ততল বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো দেখা দেয় নি; তাই ব'লে মনে করা যায় না যে কোনো কালে ওই মাপের কোনো নারী দেখা দেবে না। তবে নারীরা এলিজাবেথ বা জোয়ান অফ আর্ক হয়েছে। মিল দেখিয়েছেন এখনকার আইনের এক বিস্ময়কর বিধান হচ্ছে যে-কাজে নারীরা দক্ষতা দেখিয়েছে, সে-কাজ থেকেই বহিষ্কার করা হয়েছে নারীদের। এমন কোনো আইন নেই, যাতে নারীদের শেক্সপিয়র বা মোৎসার্ট হওয়া নিষেধ; তবে নারীরা রাজ্যশাসনে দক্ষতা দেখালেও তাদের রাজনীতিক ক্ষমতা লাভ নিষিদ্ধ। এলিজাবেথ বা ভিক্টোরিয়া ক্ষমতা পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে, নইলে তাদের রাজনীতিক ক্ষমতা পাওয়ার কোনো পথ ছিলো না। পুরুষতন্ত্র নারীর বিরুদ্ধে তোলে যে-সব অভিযোগ, মিল সেগুলোর উত্তর দি[illegible] এক-এক ক'রে, এবং

দেখিয়েছেন সব অভিযোগই বানানো; সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। নারীর মেধা কম নয়, শক্তিও কম নয়; নারী কোনো কিছুতেই নিকৃষ্ট নয় পুরুষের থেকে; নারী পুরুষের সমান। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার পরিপূর্ণ সাম্য। স্টুয়ার্ট মিল নারীপুরুষের সাম্য চেয়েছেন শুধু নারীর কল্যাণের জন্যে নয়, চেয়েছেন মানবজাতি ও সভ্যতার কল্যাণের জন্যে। মিলের বইটিকে সে-সময়ের নারীবাদীরা নিজেদের পবিত্র বই হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন; এবং তাঁর বিভিন্ন যুক্তি গত একশতকের বেশি সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে বই থেকে বইয়ে। নারীর মুক্তিতে মিল ও *নারী-অধীনতার* ভূমিকা অশেষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ, রুশো-রাসকিনের মতোই, পুরুষতন্ত্রের মহাপুরুষ; এবং প্রভাবিত ছিলেন ওই দুজন, ও আরো অনেককে, দিয়ে। রোম্যানটিক ছিলেন তিনি, এবং ছিলেন ভিক্টোরীয়; নারী, প্রেম, কবিতা, সমাজ, সংসার, রাজনীতি, জীবন, এবং আর সমস্ত কিছু সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন তিনি পশ্চিমের রোম্যানটিকদের ও ভিক্টোরীয়দের কাছে; এবং সে-সবের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ভারতীয় ভাববাদ বা ভেজাল। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় মৌলিকতা খুবই কম; তাঁর সমাজ ও রাজনীতিবিষয়ক চিন্তার সবটাই বাতিল হওয়ার যোগ্য। রুশো ও রাসকিনের নারীবিষয়ক লেখার সাথে পরিচিত ছিলেন তিনি, বোঝা যায়; নারী সম্পর্কে তাঁর অনেক উক্তিই রুশো-রাসকিনের প্রতিধ্বনি। মিলের সাথেও পরিচিত ছিলেন, যদিও মিলের সাথে তাঁর মিল ছিলো না; তাঁর মিল ছিলো টেনিসনের সাথে, এবং *প্রিন্সেস*-এর নারীবিষয়ক ধারণা তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন *চিত্রাঙ্গদায়*। তাঁর নারীধারণা রোম্যানটিক; বাস্তব নারী তিনি দেখেছেন, তবে অনেক বেশি দেখেছেন স্বপ্নের নারী। রোম্যানটিকের চোখে নারীমাত্রই তরুণী, রূপসী, মানসসুন্দরী, দেবী; আর তারা নিজেরা দেবতা। তারা অবাস্তব নারীর উপাসক, তারা জন্মজন্মান্তর ধ'রে স্তব ক'রে যেতে পারে লোকোত্তর নারীর; তবে বাস্তবে নারী তাদের কাছে গৃহিণী, সুন্দর ক'রে যাকে বলা হতো 'গৃহলক্ষ্মী'। রোম্যানটিকেরা অহমিকায় ছাড়িয়ে যায় বিধাতাকেও, তারা মানসসুন্দরীর স্তব করলেও নিজেদের দেখে নারীর স্রষ্টারূপে। রবীন্দ্রনাথও তাই দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ অপরূপ রূপসী নারীর স্তবগান করেছেন, কিন্তু নারীর বাস্তব অস্তিত্বও অনেক সময় স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ নারীকে দেখতে পছন্দ করতেন স্বপ্নে ও ঘরে, নারী স্বপ্নে থাকবে নইলে থাকবে ঘরে; বাস্তবের অন্য কোথাও থাকবে না। *দুই বোন* (১৩৩৯) উপন্যাসের শুরুতে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।' কোনোকোনো পণ্ডিতের কাছে এটা তাঁর শোনার দরকার ছিলো না, এটা তাঁর নিজেরই কথা; একটি পুরো উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি একথা প্রমাণ করার জন্যেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না নারীমুক্তিতে, যদিও তাঁর কোনো কোনো পংক্তি নারীবাদের ইশতেহারের মতো শোনায়; তিনি বিশ্বাসী ছিলেন পুরুষতন্ত্রে ও পুরুষাধিপত্যে। ভিক্টোরীয় *ঘরেবাইরে* তত্ত্বে তাঁর আস্থা ছিলো দৃঢ়,

এ-নামে একটি উপন্যাস লিখে তিনি তা দেখিয়েছেন; এবং নারীপ্রকৃতি ব'লে পুরুষতন্ত্র যে-উপকথা তৈরি করেছিলো, তিনি ছিলেন তাতে অন্ধ বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের নারীধারণা রুশো-রাসকিন-টেনিসনের নারীধারণারই বাঙালি রূপ; তাঁদের মতই তিনি ভিন্ন ভাষায় কিছুটা ভারতীয় ভাবাবেগ মিশিয়ে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন না নারীর, ছিলেন নারীর প্রতিপক্ষের এক বড়ো সেনাপতি। তিনি চেয়েছিলেন নারীরা ঘরে থাকবে, স্বামীর সেবা করবে, সন্তান পালন করবে; তবে কিছু নারী থাকবে, যারা কবিতা পড়বে, আর হবে তাঁর মতো কবির একান্ত অনুরাগিনী।

নারী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন প্রচুর; কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ভাষণ, ভ্রমণকাহিনীতে বারবার তিনি কথা বলেছেন নারী সম্পর্কে–বাঙালি, ভারতি, বিদেশি, এবং সনাতনী, শাশ্বতী, চিরন্তনী, কল্যাণী সম্পর্কে। তাঁর কথা ধাঁধায় ভরা, অনেক সময় কথা বলার জন্যেই কথা বলা। ঘুরিয়েপেঁচিয়ে সুন্দর কথা অনেক বলেছেন, যা প্রথম মনে হয় চমৎকার; কিন্তু একটু ভাবলেই ধরা পড়ে যে নারীকে তিনি মনে করেন অসম্পূর্ণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের চোখে পুরুষের বিকাশ ঘটেছে, বিবর্তন ঘটেছে সব কিছুর; শুধু বিকাশবিবর্তন ঘটে নি নারীর; এবং তিনি চান নারীর কোনো বিকাশ না ঘটুক, নারী থেকে যাক আদিমতমা বা চিরন্তনী। পুরুষ মহাজগত পেরিয়ে চ'লে যাক, কিন্তু নারী থাকুক ঘরের কোণে কল্যাণী হয়ে। পুরোনো ভারতের ঋষিদের মতো আধুনিক ভারতের এ-ঋষি কুৎসা রটান নি নারীর নামে, বরং প্রতিবাদ করেছেন ওই সব অশীল কুৎসার; তবে পুরোনো ঋষিরা নারীদের যেখানে ও যে-ভূমিকায় দেখতে পছন্দ করতো, তিনিও পছন্দ করতেন তাই। বাস্তব নারী তাঁর চোখে গৃহিণী, আর অবাস্তব নারী মানসসুন্দরী, এমনকি জীবনদেবতা। পুরোনো ঋষিদের মানসসুন্দরীর মোহ ছিলো না, তবে রোম্যানটিক রবীন্দ্রনাথের সে-মোহ ছিলো প্রবল; ওই মোহটুকু বাদ দিলে নারী হচ্ছে গৃহিণী : জায়া ও জননী। নারী যে খাঁচায় বন্দী, এটা তাঁর চোখে পড়েছে; তবে তিনি খাঁচার রূপেই মুগ্ধ হয়েছেন, মনে করেছেন নারী আছে 'যেন সোনার খাঁচায়'। নারী যে শেকলে বন্দী, তাও তাঁর চোখে পড়েছে; তবে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন শেকলের রূপেই, মনে করেছেন শেকলটি সোনার। নারী যখন বন্দী, রবীন্দ্রনাথের চোখে নারী তখন 'কল্যাণী'! রবীন্দ্রনাথের নারীধারণার বিবর্তন পরে আলোচনা করবো; শুরুতে তাঁর দুটি কবিতা প'ড়ে নিতে চাই, কেননা ওই কবিতা দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নারীধারণার সম্পূর্ণ রূপ : নারীর বাস্তবতা ও অবাস্তবতা। *সোনার তরী* (১৩০০) কাব্যে আছে একটি কবিতা, যার নাম 'সোনার বাঁধন' (১২৯৯) :

বন্দী হয়ে আছো তুমি সুমধুর স্নেহে
অয়ি গৃহলক্ষ্মী, এই করুণ ক্রন্দন
এই দুঃখদৈন্যে-ভরা মানবের গেহে।
তাই দুটি বাহু'পরে সুন্দরবন্ধন
সোনার কঙ্কন দুটি বহিতেছ দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়ননন্দন।
পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন

সংসারসংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে—
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন দুখানি।

ভিক্টোরীয় ইংরেজ, বা উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি ভদ্রলোক গৃহিণীকে যেভাবে আদর্শায়িত ক'রে সুখ পেতো, এতে রূপায়িত হয়েছে সে-ছবিটিই। এর সাথে বাস্তবের মিল নেই। ভদ্রলোক বাঙালির চোখে যা 'গৃহলক্ষ্মী', ভিক্টোরীয়দের চোখে তা 'অ্যাঞ্জেল ইন দি হাউজ', দুটিই সুভাষণ। কবিতাটি বাস্তবভাবে পড়লে বোঝা যায় যে একটি স্বাধীন দেবীকে বন্দী করা হয়েছে বা বেঁধে ফেলা হয়েছে, বাঁধনটি অবশ্য সোনার। বন্দী ওই দেবীর কোনো দুঃখ আছে কিনা, তাতে কবির উৎসাহ নেই; তাকে যে বন্দী করা গেছে, এটাই বেশ স্বস্তিকর। এতে স্তব করা হচ্ছে শেকলটিরই। নারী বন্দী, বন্দীত্বই তার সুখ। পুরুষ স্বাধীন বীর, সব সময় সংগ্রাম ক'রে চলছে; পুরুষ এতোই বীর যে সে বন্ধনহীন দেবীকেও বেঁধে ফেলেছে। এখন দেবীর কাজ শুধু 'শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন'। যদি ওই শুভকর্ম ও নিশিদিন সেবার একটি তালিকা তৈরি করা যায়, তাহলে দেবী আর দেবী থাকে না, হয়ে ওঠে গৃহপরিচারিকা। ওই দেবী ঘুম থেকে উঠেই কাজে লেগে যায়, বাসন মাজে, স্বামীর খাবার তৈরি করে, শাশুড়ীর তিরস্কার শোনে, স্বামীর জামার বোতাম শেলাই করে, বছরে বছরে নোংরা আঁতুড়ঘরে বাচ্চা বিয়োয়, বিয়োতে গিয়ে মারা যায় অনেকেই, আর যারা বেঁচে থাকে তাদের আর যা-ই থাক, রূপ নামের কিছু থাকে না, যা টানতে পারে কোনো রোম্যানটিক কবিকে বা মাংসাশী স্বামীকে। তখন পুরুষ পুরোনো দেবীকে ছেড়ে নতুন দেবী খোঁজে। রবীন্দ্রনাথ যখন গৃহিণীর দিকে তাকিয়েছেন, তখন তাকিয়েছেন রোম্যানটিকের চোখে, তাকে আদর্শায়িত করেছেন, যদিও তিনি নিজের ঘরেও অমন কোনো দেবী দেখেন নি। তবে তিনি চান বাস্তবে নারী হবে গৃহিণী। রোম্যানটিকের চোখে নারীর আরেক রূপ মানসী, তিন বছর পরে লেখা 'মানসী' (১৩০২) কবিতায় যার পরিচয় পাওয়া যায় :

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত-না—
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে, খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।

লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা–
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।।

এ-কবিতায় পুরুষ নারীর দ্বিতীয় বিধাতা, যে অনেক শক্তিশালী প্রথম বিধাতার থেকে। প্রথমটি নারীকে সৃষ্টি করেছে, আর দ্বিতীয়টি সৃষ্টির নামে বন্দী করেছে নারীকে। কবিতাটিতে পুরুষ সক্রিয় : পুরুষ স্রষ্টা, স্থপতি, ভাস্কর, কবি, শিল্পী; নারী নিষ্ক্রিয় : নারী পুরুষের তৈরি মূর্তি; আর সম্ভোগসামগ্রী। কবিতাটিতে নারীর বাস্তব অস্তিত্বকেই অনেকটা অস্বীকার করা হয়েছে; নারী 'অর্ধেক মানবী', বা অর্ধেক বাস্তব; তার 'অর্ধেক কল্পনা' বা অর্ধেক অবাস্তব। এটি নারীর রোম্যানটিক স্টেরিওটাইপ। পুরুষের চোখে যদি নারী অর্ধেক কল্পনা হয়, তবে নারীর চোখেও পুরুষ অর্ধেক কল্পনা হওয়ার কথা; এবং পুরুষও তথাকথিত একলা বিধাতার সৃষ্টি নয়, নারীরও সৃষ্টি। তবে এ-কবিতায় বলা হয়েছে যে-নারীর কথা, সে সম্পূর্ণ কল্পনা; যার বাস পুরুষের ক্ষণায়ু উন্মাদনার মধ্যে। ওই মানসী যদি কবি বা পুরুষের স্ত্রী হয়, তবে দেখা যাবে মানসসুন্দরী মাছ কুটছে রান্নাঘরে, বোতাম শেলাই করছে, আর অস্বাস্থ্যকর আঁতুড়ঘরে প্রসব ক'রে চলেছে বাচ্চাকাচ্চা। কবিতা হিশেবে চমৎকার এটি, তবে এটিতে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে পুরুষতন্ত্র ও পুরুষাধিপত্যের অহমিকা। পুরুষ নারীকে সৃষ্টি করার নামে যে বন্দী করেছে, তাকে লজ্জা-সজ্জা-আবরণ দিয়ে যে ঘরের মাঝে আটকে ফেলেছে, এটা চোখে পড়ে নি পড়ে নি রোম্যানটিকের।

রবীন্দ্রনাথ নারী সম্পর্কে গদ্যে প্রথম কথা বলেন বিলেতে গিয়ে [১৮৭৮-১৮৮০] *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* -এ (১৮৮১)। একটি বদ্ধ সমাজ থেকে মুক্ত সমাজে গিয়ে সতেরো-আঠারো বছরের এক নারীসঙ্গকাতর রোম্যানটিক তরুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন তরুণীদের দেখে, তাদের সংস্পর্শে এসে, তাদের সাথে হাতে হাত ধ'রে গালে গাল লাগিয়ে নেচে। *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* ছেয়ে আছে নারী আর নাচের বিবরণে। তাঁর বিবরণে পাওয়া যায় উচ্চবিত্ত বিলেতি সমাজের যে-নারীদের, তারা 'রাসকিনের মেয়ে' বা 'রানীর বাগানের পদ্ম', যারা আপাদমস্তক অপদার্থ : তারা নাচ, গান, ফ্লার্ট করা ছাড়া আর কিছু জানে না। বিলেতে গিয়েই তিনি তাদের সাথে মিশে যেতে পারেন নি, তাদের দেখেছেন দূর থেকে, এবং খুঁত খুঁজেছেন তাদের; তবে তাদের কাছাকাছি আসার পর উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তাদের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর চোখে পড়েছে বিলেতে যাওয়ার সাথে সাথেই : 'মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে...মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে, তুমি নাচে গিয়েছিলে কি না, কনসর্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাক্টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী* : ১, ৫৪২)। এ-বর্ণনায় রয়েছে উনিশশতকের দ্বিতীয় ভাগের জন্যে গৌরবজনক নারীবিদ্বেষ, যখন নারীবিদ্বেষই ছিলো অনেকটা বুদ্ধিজীবিতার লক্ষণ। সতেরো-আঠারো বছরের তুলনায় একটু বেশি পাকাই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তবে তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন যে নারীমাত্রই লঘু, যারা বেশভূষা, নাচ, অ্যাকটর প্রভৃতির ওপরে উঠতে পারে না।

ভিক্টোরীয় সমাজ যে নারীদের তৈরি করেছে ওভাবেই, সেটা তার চোখে পড়ে নি। ওই নারীদের প্রাত্যহিক জীবন কর্মহীন প্রমোদের : 'এ দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোহায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে' (*রর* : ১, ৫৪২)। রবীন্দ্রনাথ 'এ দেশের মেয়ে' যাদের বলেছেন, তারা উচ্চবিত্ত অপদার্থ নারী, সাধারণ নারীদের সাথে তাদের কোনো মিল নেই। এ-অকর্মা নারীদের তিনি সমালোচনা করেছেন, এমনকি যে-মেয়েরা বিয়ে না ক'রে কিছু একটা করছে, তাদের কাজেরও বিদ্রুপ করেছেন : 'এ দেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। টেম্‌পারেন্স মীটিং, ওয়ার্কি মেন্‌স্ সোসাইটি প্রভৃতি যতপ্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাদের কণ্ঠ আছে' (*রর* : ১, ৫৪২)। ওই উচ্চবিত্ত নারীরা ওই সব ছাড়া আর কী করতে পারে, এমন প্রশ্ন করা হ'লে তিনি অবশ্য বিপদে পড়তেন; এবং ওই সব ছাড়া তারা অন্য কিছু করলেও তিনি হয়তো তাদের সমালোচনা করতেন। তিনি ক্রমশ ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন পিয়ানোবাজানো মেয়েদের সাথে, দেখেছেন 'এক-একটা মেয়ের নাচের বিরাম নেই, দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে' , সুখ পেয়েছেন 'শত রমণীর রূপের আলোকে গ্যাসের আলো ম্রিয়মাণ' (*রর* : ১, ৫৪৪-৫৪৫) দেখে। তখনি তাঁর মনে পড়েছে 'আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাই নে' (*রর* : ১, ৫৫৫)। নারীদের সাথে মুক্তভাবে মিশতে পাওয়াটা তাঁর নিজের জন্যে, নারীর জন্যে নয়; নারীর সাথে মুক্তভাবে মিশতে পাওয়ার বেশি স্বাধীনতা তিনি নারীর জন্যে চান না।

ভিক্টোরীয় সমাজে মেয়েদের জীবনের লক্ষ্য যে বিয়ে, সেখানে পুরুষই যে সর্বময়, ওই সমাজের সাথে বাঙালি সমাজের পার্থক্য যে গুণের নয় মাত্রার তা চোখে পড়েছে তাঁর (*রর* : ১, ৫৭০) :

> আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, যথেষ্ট লেখাপড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না; এখানেও তেমনি মাগ্‌গি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্যে যতটুকু লেখাপড়া দরকার ততটুকু যথেষ্ট। একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা, খানিকটা ফরাশি ভাষা বিকৃত উচ্চারণ, একটু বোনা ও সেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রঙচঙে পুতুল গড়ে তোলা যায়। এ-বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত, আমাদের ও এ-দেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত মাত্র।...আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার দরকার করে না, বিলিতি মেয়েদেরও অল্পসল্প লেখাপড়া শিখতে হয়, কিন্তু দুই-ই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি। এখানেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা; স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন।

তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য সমাজ ও নারী দু-ই, তবে মেয়েদের ওপরই আক্রমণটা একটু বেশি; তিনি মনে করেছেন যেনো মেয়েরা নিজেরাই পুতুল হওয়ার জন্যে পাগল। অন্য ধরনের নারীও তিনি দেখেছেন ওই সমাজে : 'ফ্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো

অনেকরকম মেয়ে আছে, নইলে সংসার চলত না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়, বাবুয়ানা করলে চলে না।...এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গিন্নিরা সাদাসিদে। যদিও তাঁরা ভালো করে লেখাপড়া শেখেন নি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার' (*রর* : ১, ৫৭০-৫৭১)। তিনি কিছুটা শ্রদ্ধাশীল সে-নারীদের প্রতি, যারা ফ্যাশনমত্ত নয়, যারা কর্মী, মধ্যবিত্ত, যারা আছে ব'লে 'সংসার চলে'। তবে ওই ফ্যাশনমত্তরাই কিছুদিনের জন্যে তাঁকে ক'রে তুলেছিলো সীমিত নারীস্বাধীনতাবাদী, কেননা ওই স্বাধীনতাটুকু ছাড়া মেয়েদের নাচের আসরে পাওয়া অসম্ভব। মেয়েরা অবাধে নাচের আসরে আসতে না পারলে মেয়েদের থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাঁর মতো তরুণেরা, যারা গালে গাল ঘ'ষে নাচতে চায়। *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে* তিনি নারীস্বাধীনতার অর্থাৎ নারীপুরুষের মেলামেশার পক্ষে কিছু মত প্রকাশ করেছিলেন, বাঙালি নারীকে ঘরে আটকে রাখার অপরাধে অভিযুক্ত করেছিলেন পুরুষদের। বলেছিলেন, 'একজন বুদ্ধি ও হৃদয়বিশিষ্ট মানুষকে জন্তুর মতো, এমন কি তার চেয়ে অধম, একটা জড়পদার্থের মতো সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিষ করে তোলা... এ-সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়' [*য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* থেকে বর্জিত, উদ্ধৃত অনন্যা (১৩৯৪, ২০)]। এমন কয়েকটি স্ত্রীস্বাধীনতাবাদী অংশ বইটি থেকে বর্জনের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন স্ত্রীস্বাধীনতার ধারণাটিও। রবীন্দ্রনাথের ওই 'স্ত্রীস্বাধীনতা'য় বিশ্বাস ছিলো বিলেতি তরুণীদের সাথে মেশার ফলে তরুণ রক্তমাংসের ভেতর থেকে বেরোনো অস্থায়ী উচ্ছ্বাস, যা মিলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে নি। বাঙালি নারীকে অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দেয়া সম্পর্কে যে-কয়েক পংক্তি লিখেছিলেন তিনি আঠারো-উনিশ বছর বয়সে, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তা বই থেকে মুছে ফেলে তারুণ্যের অশিষ্ট উচ্ছ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি দ্বিধা করেন নি।

এর পর দু-বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ নিজে হন স্বামী (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩), এবং এক দশক কাটার আগেই হয়ে ওঠেন নারীমুক্তিবিরোধী, সম্ভবত তখন তাঁর তরুণীদের সাথে মেলামেশার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ব'লে। পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে তিনি আয়ত্ত ক'রে ফেলেন নারী সম্পর্কে ভিক্টোরীয় ও ভারতীয় দর্শন : প্রবক্তা হয়ে ওঠেন *ঘরেবাইরেতত্ত্বের, প্রকৃতিতত্ত্বের, নারীপুরুষের অসাম্যতত্ত্বের, পরিপূরকতত্ত্বের*, এবং আপন ক'রে নেন পুরুষতন্ত্রের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা। এর পরিচয় প্রথম ধরা পড়ে 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে' (১২৯৬, *রর* : ১২, ৪৫০-৪৫৫) নামের পত্রপ্রবন্ধে। মহারাষ্ট্রি নারীবাদী রমাবাই নারীমুক্তি সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন পুনায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬), তবে শেষ করতে পারেন নি বক্তৃতাটি; পুরুষাধিপত্যবাদীদের প্রচণ্ড উৎপাতে তিনি স্থগিত করতে বাধ্য হন তাঁর বক্তৃতা। আটাশ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনো উৎপাত করেন নি, তবে ওই বক্তৃতা সম্পর্কে তিনি যে-মত দিয়েছেন তাতে তাঁর পুরুষাধিপত্যবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে প্রবলভাবে। তিনি রুশো-রাসকিন, ভিক্টোরীয় ও সমগ্র পুরুষতন্ত্রের মতো বিশ্বাস করেন যে নারীপুরুষ সমকক্ষ নয়, নারী প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট। একজন চমৎকার ভিক্টোরীয়

হিশেবে তিনি নারীদের মধ্যে দেখেছেন শুধু রূপ আর আবেগ, দেখেছেন নারীদের শক্তিহীনতা, প্রতিভাহীনতা, আর এ-সবই তাঁর মতে প্রাকৃতিক। তিনি বলেন, 'মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তাহলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় অবিচার বলতে হয়।' তাঁর চোখে নারীপুরুষের অসাম্যই ন্যায়সঙ্গত, আর সাম্য অন্যায়; প্রকৃতি বা বিধাতা এমন অন্যায় করতে পারে না। ভিক্টোরীয়দের মতো তিনি নারীপুরুষকে প্রাকৃতিকভাবেই দুটি বিপরীত ও পরিপূরক জাতির সদস্য ব'লে মনে করেন :

> আমবা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েবা তেমনই রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমবা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েবা তেমনই হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ; তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প ব'লে...স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকেব বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান এ কথা গায়েব জোরে তোলবার কোনো দরকার নেই।

রুশো-রাসকিন-টেনিসন ও সমগ্র পুরুষতন্ত্র এখানে কথা বলছে রবীন্দ্রনাথের মুখে। তাঁর কিছু বিশ্বাস বেশ ভয়ঙ্কর, যেমন বিশ্বাস করেন তিনি প্রাকৃতিক ও সামাজিক অসাম্যে। তিনি বিশ্বাস করেন পরস্পরকে অবলম্বন করতে হ'লে সমান হ'লে চলে না, হ'তে হয় অসম; এটা শুধু পারিবারিকভাবেই ভয়ঙ্কর তত্ত্ব নয়, সামাজিকভাবেও ভয়ঙ্কর। পুরুষের বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে তিনি এতো নিশ্চিত যে সে-সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুললে তিনি রুষ্ট হন। তিনি বিশ্বাস করেন একটি বানানো উপকথায় যে নারী বুদ্ধিতে পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট: এবং ঘোষণা করেন 'মেয়েরা কখনোই পুরুষদের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না।' পুরুষাধিপত্যবাদীরা বারবার যুক্তি দেয় নারীর প্রতিভা নেই, পৃথিবীতে কোনো বড়ো নারীপ্রতিভা জন্মে নি, মিল যা খণ্ডন করেছেন *নারী-অধীনতায়* (১৮৬৯); কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯-এ পেশ করেছেন পুরুষাধিপত্যবাদীদের পুরোনো যুক্তি আর উদাহরণ :

> মেয়েবা এতদিন যেরকম শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল।...স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবির আবির্ভাব এখনো হয় নি। মনে ক'রে দেখো, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সংগীতবিদ্যা শিখছে এত পুরুষ শেখে নি। য়ুরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডোরেমিফা চেঁচিয়ে মরছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা Mozart কিংবা Beethoven জন্মাল।

পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন ব'লেই তিনি বলতে পেরেছেন মেয়েরা যে-শিক্ষা পেয়েছে, তাই যথেষ্ট। মেয়েদের যে-শিক্ষা দেয়া হয়েছে এতোদিন, তা কোনো শিক্ষাই নয়; তা পুরোপুরি অশিক্ষা। ওই অশিক্ষার মধ্যে থেকে যে কারো পক্ষে ভিঞ্চি, দান্তে বা বিটোফেন হওয়া সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথ, একজন প্রবল পুরুষাধিপত্যবাদী, মানেন নি; এও তাঁর মনে পড়ে নি যে পৃথিবীতে মোৎসার্ট-বিটোফেন দুটির বেশি জন্মে নি— পুরুষমাত্রই একেকটি সম্ভাব্য মোৎসার্ট বা নিউটন বা রবীন্দ্রনাথ নয়; এবং রুশোর মতো বলেছেন, 'প্রতিভা একটা শক্তি (ঋভণবথহ), তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল

নেই', বা 'মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণত পুরুষদের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই।' উগ্র পুরুষাধিপত্যবাদী রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন, 'মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পারবে না।' মেয়েদের পড়াশুনোয় তাঁর বিশেষ আপত্তি নেই, বা তিনি মনে করেন মেয়েদের পড়াশুনো বিশেষ কাজে লাগে না; তবে তাঁর আপত্তি 'কার্যক্ষেত্র' দখলে। পুরুষ যে-সমস্ত পেশা দখল ক'রে রেখেছে, সেগুলোতে নারী ঢুকুক তা তিনি চান না ; নারী যদি নিষেধ না শুনে সেখানে ঢুকে পড়ে তাহলে তিনি চান তার ব্যর্থতা।

নারীপুরুষের অসাম্যকে শাশ্বত করার জন্যে এর পর তিনি সাহায্য নিয়েছেন রুশো-রাসকিন ও ভিক্টোরীয়দের প্রকৃতিতত্ত্বে। সুবিধা ও আধিপত্যবাদীরা, এবং পুরুষতন্ত্র প্রকৃতিকে চিরকাল ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে। রবীন্দ্রনাথও নারীদের ঘরে আটকে রাখার জন্যে দোহাই দিয়েছেন প্রকৃতির, যদিও প্রকৃতি নয় সমাজের চক্রান্তেই নারীরা বন্দী হয়ে আছে ঘরে। প্রকৃতির কণ্ঠস্বর শুনে তিনি তা বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন এভাবে :

> যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাহিরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সে-রকম অভিপ্রায় না হত তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাত। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজেরই কথা নয়।

প্রকৃতির স্বর শোনা প্রথাবাদীদের স্বভাব, কেননা তাতে যুক্তি ও সত্যের বদলে উপস্থিত করা যায় অলৌকিক শক্তিকে, এবং সব কিছু চাপিয়ে দেয়া যায় শোষিতদের ওপর। প্রকৃতি স্থির ক'রে দিয়েছে যে মানুষ স্বামীস্ত্রী হবে, সংসার করবে, সমাজ বানাবে, রাষ্ট্র তৈরি করবে, একদল শোষণ করবে আরেকদল শোষিত হবে, এটা খুবই হাস্যকর ও সুবিধাবাদী বিশ্বাস; রবীন্দ্রনাথ প্রথা-ও সুবিধা-বাদীদের মতো দোহাই দিয়েছেন প্রকৃতিরই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন নারীদের থাকতে হবে ঘরে, আর জীবনধারণের জন্যে নির্ভর করতে হবে পুরুষের ওপর : 'যখন শারীরিক দুর্বলতা এবং অলঙঘনীয় অবস্থাভেদে মেয়েদের সেই গৃহের মধ্যে থাকতেই হবে তখন কাজে- কাজেই প্রাণধারণের জন্যে পুরুষদের প্রতি তাদের নির্ভর করতেই হবে।' মেয়েরা যে ঘরের ভেতরে থাকে, এটাও এক উপকথা। সুবিধাভোগী শ্রেণীর নারীরাই ঘরে বন্দী থাকে, পুরুষকে সেবা ও দেহ দিয়ে ব্যবস্থা করে নিজেদের জীবিকার; কিন্তু অধিকাংশ নারী কাজ করে ঘরে ও বাইরে, যদিও তাদের বাইরের কাজ স্বীকৃতি পায় না, আর মূল্য পায় না ঘরের কাজ। রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত উচ্চবর্ণের নারীদের সম্পর্কেই, এবং প্রকৃতির দোহাই দিয়ে তাদেরই আটকে রাখতে চান ঘরে। নিম্নশ্রেণীর নারীরা নরকে যাক, সেটা তাঁর ভাবনার ব্যাপার নয়। নারীর দুরবস্থা যে পুরুষতন্ত্রেরই চক্রান্তের ফল, একথার প্রতিবাদ করেছেন তিনি সমস্ত পুরুষতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে।

রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির আন্দোলনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে তাকে বলেছেন 'কোলাহল', এবং নারী-অধীনতাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন এমন কথা, যা শুধু নারীমুক্তির বিরুদ্ধেই যায় না, যায় মানুষের সব রকমের মুক্তির বিরুদ্ধেই :

> আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসংগত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে, চরিত্রের ওপর অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমন-কি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তা হলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।

এর অর্থ হচ্ছে অধীনতা মেনে নেয়াই মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব; অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ অন্যায়। এ-ধরনের বিশ্বাস অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; এমন প্রতিক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্য সব রকমের শোষণকে তরল আধ্যাত্মিকতা দিয়ে গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলা। নারী-আন্দোলন তাঁর কাছে অমঙ্গলজনক, তা হ'তে পারে; কিন্তু তা মঙ্গলজনক নারীদের ও অধিকাংশ মানুষের জন্যে, যারা বিশ্বাস করে সাম্যে। নারী-আন্দোলন 'অসংগত' হবে কেনো? তাঁর বিশ্বাস পরাধীন থাকাই সঙ্গত; এ-ধরনের বিশ্বাসের সীমা বাড়িয়ে দিলে দাঁড়ায় যে রাজনীতিক স্বাধীনতা চাওয়াও অসঙ্গত, যা সব সময়ই বলে সাম্রাজ্যবাদীরা। 'পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত' ব'লে যে-সত্যে তিনি বিশ্বাস করেন, তাও সত্য নয়। মেয়েরা পুরুষাধীনতাকে ধর্ম মনে করতো না, পুরুষেরাই ওটাকে ধর্ম ব'লে চাপিয়ে দিয়েছিলো নারীদের ওপর, যেমন বর্ণভেদকেও ধর্ম ব'লে চাপিয়ে দিয়েছে শক্তিমানেরা। প্রতিক্রিয়াশীলতার পক্ষে খুব বিশ্রী যুক্তি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : তাঁর মতে অধীনতা মেনে নিলে চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদিত হয়! এর অর্থ হচ্ছে খাঁটি দাসের চরিত্রই মহত্ত্বসম্পন্ন, বিদ্রোহী দাসেরা মহত্ত্বহীন। ভৃত্যের চরিত্রের মহত্ত্ব রক্ষার উপায় হচ্ছে জন্মজন্মান্তর ধ'রে ভৃত্য থাকা! রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে মনে করা হয় নিজের সময়ের থেকে অনেক অগ্রসর, পিছিয়ে ছিলেন নিজের সময়ের থেকে হাজার বছর।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস কিছু মানুষ জন্মে প্রভু হয়ে, আর কিছু মানুষ জন্মে দাস হয়ে; তাই তিনি মনে করেন, 'কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয়।' নারীর পুরুষাধীনতা, তাঁর মতে, অবশ্যম্ভাবী, নারীকে তা সহ্য করতেই হবে; শুধু তা-ই নয়, পুরুষাধীনতাই নারীর জন্যে ধর্ম। পুরুষতন্ত্রের অবিচল অনুসারী রবীন্দ্রনাথ স্বামীকে দেখেন নারীর দেবতারূপে, যাকে ভক্তি করা নারীর জন্যে ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের চোখে পরিবার, সামাজিক সংস্থা নয়, দেবমন্দির, যার অধিষ্ঠিত দেবতার নাম স্বামী; স্ত্রী তার, জন্মজন্মান্তরের, ভক্ত:

> পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে-স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।

ধর্ম যে বড়ো প্রতারণা ও পুরুষতন্ত্রের বলপ্রয়োগসংস্থা, তা মনে জাগার কথা নয় প্রথা ও পুরুষাধিপত্যবাদী রবীন্দ্রনাথের; তিনি বরং দাসত্বকেই মহিমান্বিত করেছেন ধর্মরূপে। স্বামীস্ত্রী মিলে গ'ড়ে তোলে একটি সামাজিক সংস্থা–পরিবার, তাতে ভক্তির কথা ওঠে

না; তবে পুরুষ নারীকে দাসী ক'রেই স্বস্তি পায় নি, নিজেকে দেবতার স্তরে উঠিয়ে স্ত্রীর আনুগত্যকে ক'রে তুলেছে ঐশ্বরিক। শুধু আনুগত্যে নিশ্চিন্ত বোধ করেন না রবীন্দ্রনাথ, তিনি চান নিশ্চিত ভক্তি, কেননা ভক্তি হচ্ছে আত্মসমর্পণের বা সত্তাবিলোপের চূড়ান্তরূপ। 'পতিভক্তি'র মতো একটি মধ্যযুগীয় ধারণা ও শব্দ যে তিনি ব্যবহার করেছেন, তা আমাদের খুব বিস্মিত করে। স্বামীর অধীনতাকে তিনি বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক দু-রকম যুক্তি দিয়েই : স্বামীর অধীনে থাকা নারীর জন্যে একদিকে আধ্যাত্মিক ধর্ম, আরেক দিকে ইহজাগতিক কর্তব্য! দু-ধরনের শিকলেই নারীকে বেঁধেছেন তিনি। মনে রাখা দরকার যে এ-রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ নন, এঁর বয়স উনত্রিশ! সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়ার জন্যে তিনি দোষী করেছেন আজকালকার 'একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষা'কে। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'নিষ্ফল ঔদ্ধত্য' বলেছেন, তা ঔদ্ধত্য নয়, অধিকার দাবি; এবং গত একশো বছরে প্রমাণিত হয়েছে যে তা নিষ্ফল নয়, বেশ সফল। তিনি যাকে 'অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষা' বলেছেন, তাও অগভীর নয়, ভ্রান্ত তো নয়ই; তা-ই প্রকৃত শিক্ষা; আর রবীন্দ্রনাথ নারীর জন্যে যে-শিক্ষার কথা ভেবেছেন, তার গভীরতা- অগভীরতার কথাই ওঠে না, কেননা তা আসলে কোনো শিক্ষাই নয়।

স্বামীকে যিনি মনে করেন নারীর দেবতা, তিনি যে অবধারিতভাবে হবেন নারীমুক্তির বিরোধী, এটা আগে থেকেই ধ'রে নিতে পারি; আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাই। তিনি নারীমুক্তিব বিরোধী হয়ে ওঠেন বিলেত থেকে ফেরার পরপরই; তাই তিনি মেনে নিতে পারেন নি নারীমুক্তি-আন্দোলনকারীদের। নারীদের আধুনিক শিক্ষা দেয়ারও তিনি ছিলেন বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ জীবনে নানা ধরনের প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করেছেন, তারা সবাই যে তাঁর সত্যিকার প্রতিপক্ষ ছিলো, এমন নয়; অনেক সময় তিনি নিজেই ছিলেন প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের সাথে রবীন্দ্রনাথের লড়াইয়ের রীতি হচ্ছে তিনি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেন, তারপর উপহাস আর ব্যঙ্গ করেন। যদিও নারীমুক্তি-আন্দোলনকারীরা তাঁর সাথে কোনো লড়াইয়ে লিপ্ত হন নি, তবুও তিনিই এগিয়ে গিয়ে লড়াইয়ে নামেন তাঁদের সাথে; এবং উপচে পড়ে তাঁর উগ্র পুরুষতান্ত্রিক ঘেন্না :

> আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকী সুরে বলছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষেব আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবন্ধন হীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে; অথচ সে-বন্ধন ছেদন করবার কোনো উপায় নেই।

তাঁর অবজ্ঞা আর ঘেন্না দেখে মনে হয় তিনি কোনো আসন্ন বিপর্যয়ের মুখে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন শেষ খড়কুটো। তাঁর সংবেদনশীলতার অভাবও শোচনীয়; নারীমুক্তির দাবি তাঁর কাছে উপহাসের ব্যাপার– 'নাকী সুরে' বিলাপ। মনে হচ্ছে আদি-মধ্য-আধুনিক সমস্ত পুরুষতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি ঠেকাবেন নারীমুক্তি। তিনি ধ'রে নিয়েছেন নারীদের মুক্তি কখনো ঘটবে না, বা নারীদের মুক্তি ঘটা অনুচিত ও ক্ষতিকর। তিনি যাকে বলেছেন 'স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবন্ধন', তা প্রভু ও এক বা একাধিক দাসীর বন্ধন, যাতে বাঁধা নারী। তিনি ওই বন্ধনের হীনতাপ্রাপ্তির ভয়ে উদ্বিগ্ন, যদিও সত্য

হচ্ছে আন্তরিকভাবে ওই বন্ধন কখনোই উন্নত ছিলো না। নারীমুক্তির ব্যাপারটিকে ভুলও বুঝেছেন রবীন্দ্রনাথ; তিনি মনে করেছেন নারীমুক্তির অর্থ হচ্ছে নারীরা বিয়ে করবে না। এমন একটা ভয় অবশ্য ছিলো ভিক্টোরীয়দের মনে; তারা মনে করতো নারী যদি মুক্তি পায়, পুরুষের পেশা অধিকার করে, সমান হয়ে ওঠে পুরুষের, তবে তারা বিয়ে করতেই অস্বীকার করবে। এটাও নারী সম্পর্কে পুরুষের ভুল ধারণার ফল : পুরুষ নিজের কামকেই প্রধান ক'রে দেখে দমিয়ে রেখেছে নারীর কাম, মনে করেছে কাম নারীর জন্যে খুবই গৌণ ব্যাপার, ওটা না হ'লেও চলে নারীর। তাই নারী যদি স্বায়ত্তশাসিত হয়, তবে নারীর বিয়ের কোনো দরকার পড়বে না; তখন পুরুষ তার মহৎ কামের অগ্নিতে জ্বলবে একলা। নারী মুক্তি চেয়েছে পুরুষের অধীনতা থেকে, বিয়ে থেকে নয়; তবে বিয়ে যে করতেই হবে, মাংসকে সুখী করার জন্যে বিয়েই যে বিকল্পহীন উপায়, তাও নয়। বিয়ে একটি প্রথা।

তিনি ভিক্টোরীয়দের মতো প্রকৃতির দোহাই দেন বারবার, ঘোষণা করেন প্রকৃতির বিধান বা নারীর নিয়তি হচ্ছে পুরুষাধীনতা :

> নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনো পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনই আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য পৃথিবীতে এমন অনেক মেয়ে আছে পুরুষের আশ্রয় যাদের আবশ্যক করে না, কিন্তু তাদের জন্যে সমস্ত মেয়ে-সাধাবণের ক্ষতি করা যায় না।

নারীকে পুরুষের অধীনে থাকতে হবে 'সংসারের কল্যাণ অব্যাহত' রাখার জন্যে, ও নারীর বিবেকের আদেশে; তবে নির্বোধ নারী সংসারকল্যাণেব কথা প্রাজ্ঞ পুরুষের মতো অতোটা ভাবতে নাও পারে, আর বিবেক বা 'ধর্মবুদ্ধি' নাও থাকতে পারে তার; তাই রাবীন্দ্রিক প্রকৃতি আগে থেকেই নিয়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থা;– পুরুষের অধীনে রাখার জন্যে প্রাকৃতিক শেকলে বেঁধে নারীকে পাঠিয়েছে পুরুষের কারাগারে! প্রকৃতি পুরুষের ধর্মবুদ্ধির ওপর আস্থাশীল, তাই আটঘাট বেঁধে পুরুষকে পাঠায় নি; কিন্তু প্রকৃতি নারীকে বিশ্বাস করে না, প্রকৃতির আস্থা নেই নারীর ধর্মবুদ্ধিতে, তাই নারীকে করেছে দুর্বল, তাকে দিয়েছে প্রতি মাসের বিশ্রী ব্যাপার, দিয়েছে নিজের ভেতরে মানুষ জন্মানোর শাস্তি! তাই উদ্ধার নেই নারীর, তাকে মেনে নিতেই হবে পুরুষের অধীনতা! নারীকে থাকতে হবে পুরুষের আশ্রয়ে; রবীন্দ্রনাথের মতে নারীর জন্যে এটাই লাভজনক, মুক্তি নারীর জন্যে ক্ষতিকর। প্রগতিবিরোধী হিন্দু ও ভিক্টোরীয় মানসিকতার মিশ্ররূপ মূর্ত দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তিনি অবশ্য বলেছেন যে তাঁর মতের সাথে 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই'; তবে বিরোধ রয়েছে প্রচণ্ড, কেননা তিনি 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা' বলতে যা বোঝেন, তা শিক্ষাও নয়, স্বাধীনতাও নয়।

রবীন্দ্রনাথ আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সে হয়ে ওঠেন চমৎকারভাবে প্রগতিবিরোধী। উনত্রিশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার বিলেতে যান তিনি, তবে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয়

বিলেতযাত্রার মধ্যে রয়েছে দু-মেরুর বৈপরীত্য : প্রথমবার তিনি গিয়েছিলেন ইউরোপের কাছে শিখতে, দ্বিতীয়বার যান ইউরোপকে শেখাতে, যদিও ইউরোপকে শেখানোর কাজটি করেন তিনি মনে মনে। নিজেকে তিনি গণ্য করেন এক তরুণ ভারতীয় গুরু ব'লে, যিনি ইউরোপ সম্পর্কে তৈরি ক'রে ফেলেছেন বা আহরণ করেছেন এমন এক ভুল দর্শন যে কর্ম-আবিষ্কার-উন্নতি মানুষকে অসুখী করে, আর ইউরোপ যেহেতু ওইসব করছে, তাই ইউরোপ খুব অসুখী! দ্বিতীয়বারের বিলেতযাত্রার বিবরণ লেখেন তিনি *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে* (১৮৯১), যার খসড়া অংশে প্রকাশ পায় ইউরোপ ও নারী সম্পর্কে তাঁর পুরোনো ভারতীয় বদ্ধ মানসিকতা। তিনি পরে তা বাদ দেন বই থেকে; তবে নারী সম্পর্কে তাঁর ওই সময়ের মত মেলে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (১২৯৮, *রর* : ১২, ২৩৬-২৫০) প্রবন্ধে। তিনি বলেন, 'য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে স্ত্রীলোক ততই অসুখী হচ্ছে', যা শুনলে মনে হয় সুখ সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ এক মহর্ষি বলছেন জীবনের সারকথা। এখানে অবশ্য কথা বলছেন রুশো, যাঁর মতে সভ্যতা কৃত্রিম ব্যাপার, যা মানুষের সুখ নষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ একে একটু সংশোধন ক'রে প্রয়োগ করেন ইউরোপি নারীর ক্ষেত্রে। তাঁর উক্তি পুরোপুরি ভুল ধারণার ফল : 'সুখ' ব্যাপারটিই বিভ্রান্তিকর, কেননা তা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত; আর সভ্যতার অগ্রসরতা নারীপুরুষ উভয়েরই জন্যে হয়েছে কল্যাণকর। তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে এক গোপন তুলনাও;– তিনি বলতে চান ভারতে সভ্যতা এগোচ্ছে না ব'লে ভারতীয় নারীরা খুব সুখে আছে!

রবীন্দ্রনাথ নারীকে পুরুষের অধীনে ও ঘরে আটকে রাখার জন্যে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক কোনো অস্ত্রই অব্যবহৃত রাখেন নি; এবং শেষ অস্ত্রটি, আধুনিক কালে যার মহিমার শেষ নেই, সে-বৈজ্ঞানিক অস্ত্রটিও ব্যবহার করতে ভোলেন নি। তিনি নিউটনীয় সৌরলোকের দু-রকম শক্তির রূপ দেখেছেন নারীপুরুষের মধ্যে :

> স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি; সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে-পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে-পরিমাণে আকর্ষণ করে আনতে পারছে না।...স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

'কেন্দ্রানুগ : কেন্দ্রাতিগ' পরিভাষা ব্যবহার ক'রে রবীন্দ্রনাথ যে-কথাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করেছেন, তার সরল বাঙলা অনুবাদ হচ্ছে যে নারীর জগত ঘর, আর পুরুষের জগত বাইর। নিউটনীয় সৌরজগতের সাথে ভিক্টোরীয়দের মতো তিনি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন পরিবারের, এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নারীপুরুষের পৃথক জগত ও ভূমিকা। তবে এটা বিজ্ঞান নয়, অপবিজ্ঞান। সভ্যতার সংকটের জন্যে তিনি দায়ী করেছেন নারীকে : পুরুষ তার সাফল্যের জন্যে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে, শেষ নেই তার কর্ম-উত্তেজনার, কিন্তু নারী ঘরকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারছে না ব'লে পুরুষ ঘরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে না। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ছন্দ, দেখা দিচ্ছে সভ্যতার সংকট। এর জন্যে দায়ী নারী। পুরুষ তো বেরিয়ে পড়বেই, নারীর কাজ তাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে সুখশান্তিতে ভ'রে

দেয়া, কিন্তু নারী তা আর পারছে না। রাসকিনও নারীপুরুষকে দেখেছেন এভাবেই। রুশো, রাসকিন ও আরো অসংখ্য ভিক্টোরীয়র মতো রবীন্দ্রনাথ নারীকে দেখছেন ঘরের সম্রাজ্ঞীরূপে, তিনি চান নারী থাকুক সেখানেই; নারী ঘরে না থাকলেই নষ্ট হয় সমাজের সামঞ্জস্য। নারীপুরুষকে এমন কেন্দ্রানুগ : কেন্দ্রাতিগ, ঘর : বাইর ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকায় ও ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য একটিই : নারীকে পুরুষের অধীনে রাখা। নারী কেনো হবে কেন্দ্রানুগ, তার কেন্দ্রাতিগ হওয়ার কোনো বাধা নেই; পুরুষ কেনো হবে শুধু কেন্দ্রাতিগ, তার কেন্দ্রানুগ হওয়ার কোনো বাধা নেই। নারীপুরুষ একই সাথে হ'তে পারে ঘর ও বাইর, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ; কিন্তু পুরুষতন্ত্র তা ভাবতে পারে না। প্রথা হিশেবে যা চ'লে এসেছে, তাকেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন পদার্থবিজ্ঞানের ধ্রুব সূত্র!

রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের নারীমুক্তির আন্দোলনকে মনে করেছেন সমাজের সামঞ্জস্যনাশের পরিণতি। যদি পশ্চিমি সভ্যতার কেন্দ্রানুগ-কেন্দ্রাতিগ শক্তি ঠিক মতো কাজ করতো, অর্থাৎ নারী থাকতো ঘরে আর পুরুষ বাইরে, তাহলে, তাঁর বিশ্বাস, এমন নারীমুক্তির আন্দোলন দেখা দিতো না। ধ'রে নিতে পারি যে তখন যেহেতু ভারতে ইউরোপীয় ধরনের নারীমুক্তির আন্দোলন দেখা দেয় নি, তাই ভারতীয় সমাজের সামঞ্জস্য ছিলো অটুট; বা ভারতীয় পুরুষেরা সমাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করতো সে-উপায়ে যেভাবে তারা পুনায় থামিয়ে দিয়েছিলো নারীমুক্তিবাদী রমাবাইর বক্তৃতা! নারীমুক্তির ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারপ্রাপ্তির যে-চেষ্টা করছে সমাজের এই সামঞ্জস্যনাশই তার কারণ বলে বোধ হয়। নরোয়েদেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন-রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায়, নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে, অথচ পুরুষেরা সমাজপ্রথার অনুকূলে। এইরকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে আমার মনে হল, বাস্তবিক, বর্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসংগত।

রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রস্তাব করেছেন এক ভয়ঙ্কর প্রগতিবিরোধী তত্ত্ব যে সমান অধিকার পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সমাজের সামঞ্জস্যনাশ। তাঁর কাছে অসাম্য হচ্ছে সামাজিক সামঞ্জস্য, আর সাম্যের অধিকার দাবি হচ্ছে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট করা। তাঁর তত্ত্বানুসারে দরিদ্র সাম্য দাবি করতে পারবে না ধনীর সাথে, শোষিত সাম্য দাবি করতে পারবে না শোষকের সাথে, নারীও সাম্য দাবি করতে পারবে না পুরুষের সাথে; তাতে নষ্ট হয়ে যাবে সামাজিক সঙ্গীতের সুর, বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য। অসাম্যই যে সামঞ্জস্যহীনতা, বিভিন্ন ধরনের অসাম্যের জন্যেই যে মানবসমাজ আজো সামঞ্জস্যহীন, তাই অসাম্য দূর ক'রেই যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রকৃত সামঞ্জস্য বা সৌন্দর্য, তা মনে পড়ে নি তাঁর। নারীমুক্তিবাদীরা চাইছিলো সমাজের বিশুদ্ধ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে, তা তিনি বোঝেন নি, কেননা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করছিলো প্রথা। তিনি ইবসেনের *পুতুলের খেলাঘর* (১৮৭৯) নাটকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তবে তিনি নোরা হেলমারের বিদ্রোহের প্রকৃতি অনুভব করার মতো সংবেদনশীল ছিলেন না। ইবসেন

নাটকটিতে সরলভাবে বলেছেন যে নারী মানুষ। নোরা, লৈঙ্গিক বিপ্লবের প্রথম নায়িকা, যা প্রকাশ করে তা 'অসহিষ্ণুতা' নয়, সে সূচনা করে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের। নোরা তার স্বামীকে বলে :

> তুমি আমার প্রতি সব সময়ই সদয় ছিলে। তবে তোমার গৃহটি ছিলো খেলাঘর। আমি ছিলাম তোমার পুতুল বউ, যেমন আমাদের বাড়িতে আমি ছিলাম বাবার পুতুল মেয়ে; আর এখানে শিশুরা আমার পুতুল। তুমি যখন আমাকে নিয়ে খেলতে তখন আমার খুব মজা লাগতো, যেমন শিশুদের নিয়ে আমি যখন খেলতাম তখন তারা খুব মজা পেতো। টোরভাল্ড, এই হচ্ছে আমাদের বিয়ে ..
>
> সন্তানদেব মানুষ করার জন্যে আমি কীভাবে উপযুক্ত? তার আগে আমার আরেক কাজ আছে। আমি প্রথম শিক্ষা দেবো নিজেকে-তুমি আমাকে তাতে সহায়তা করাব মতো মানুষ নও। আমার নিজেকেই তা করতে হবে। আর সে-জন্যেই আমি ছেড়ে যাচ্ছি তোমাকে...নিজেকে আর আমার চাবপাশের সব কিছু বোঝার জন্যে আমাকে দাঁড়াতে হবে সম্পূর্ণ একলা। সে-জন্যেই আমি আব তোমার সাথে থাকতে পারি না...

এমন কথায় সমগ্র পুরুষতন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ আহত বোধ করবেন, এবং আহত বোধ করে নোরার স্বামীও। খাঁটি পুরুষাধিপত্যবাদী স্বামী হিশেবে সে নোরাকে বোঝায় স্বামী ও সন্তানের প্রতি নারীর রয়েছে 'পবিত্র দায়িত্ব'; সবার আগে নোরা হচ্ছে 'স্ত্রী ও মা'। কিন্তু নোরা মনে করে অন্যরকম :

> আমার বিশ্বাস সবার আগে আমি একজন মানুষ, ঠিক তুমি যেমন; বা আমি চেষ্টা করবো একজন মানুষ হয়ে উঠতে। টোরভাল্ড, আমি জানি অধিকাংশ মানুষই মনে করবে যে তুমিই ঠিক, আর ওই ধরনের কথা পাওয়া যাবে বইপুস্তকে; তবে অধিকাংশ মানুষ কী বলে আর বইতে কী পাওয়া যায়, তা নিয়ে আমি খুশি থাকতে পারি না। নিজের জন্যে সব কিছু আমার নিজেকেই ভাবতে হবে, বুঝতে হবে ..

নোরা, ও পশ্চিমের নারীমুক্তিবাদীরা, নারীর জন্যে চেয়েছে মানুষের অধিকার; তারা অভিনয় করতে চায় নি পুরুষতন্ত্রের দেয়া স্ত্রী বা মায়ের পার্টে। এটা কোনো অসঙ্গত ব্যাপার না হ'লেও রবীন্দ্রনাথের কাছে তা 'অসংগত'। বৈষম্য আর নারীর পুরুষাধীনতা সঙ্গত তাঁর কাছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ইউরোপের 'স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের স্ত্রীস্বভাবের জন্যে লজ্জিত।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন 'স্ত্রীস্বভাব' ব'লে একটা কৃত্রিম বিকৃত জিনিশে, যা মিল বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন *নারী-অধীনতায়* (১৮৬৯)।

এক দশক আগে প্রথমবার বিলেতে গিয়ে সেখানকার নারীদের স্বাধীনতা দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো যে ভারতীয়রা নিজেদের প্রয়োজনে নারীদের ক'রে তুলেছে 'জন্তু' আর 'জড়পদার্থ'। এক দশকের মধ্যে তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন একজন আদর্শ ভারতীয়, যিনি নারীদের ক'রে রাখতে চান ওই জন্তু আর জড়পদার্থ, যিনি বিশ্বাস করেন না নারীমুক্তিতে, যিনি প্রচার করেন ভারতীয় নারীর সুখের রূপকথা :

> আমরা তো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু-গাছি বালা প'রে সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্ন মুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের মধুর করে রেখেছেন। কখনো কখনো অভিমানের অশ্রুজলে তাঁদের নয়নপল্লব আর্দ্র হয়ে আসে, কখনো-বা ভালবাসার গুরুতর অত্যাচারে তাঁদের সরল সুন্দর সুখশ্রী ধৈর্যগম্ভীর সকরুণ বিষাদে ম্লানকান্তি ধারণ

> করে;...যা হোক, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা যে বড়ো অসুখে আছেন এমনতরো আমাদের কাছে তো কখনো প্রকাশ করেন নি, মাঝের থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে লোকেব অনর্থক হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় কেন।

যে-চোখে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এখানে ভারতীয় নারীদের, সে-চোখকে অন্ধ বললে ভুল বলা হয় না। তিনি নারীদের দেখেছেন পুরুষতন্ত্রের চোখে, আর রোম্যানটিকের দৃষ্টিতে; তাঁর চোখে পড়েছে নারীর সুগোল কোমল বাহু, দু-গাছি বালা, স্নেহ প্রেম কল্যাণের মতো কল্পিত ব্যাপারগুলো। এ-বর্ণনা প'ড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বাস্তব নারীদের কখনো দেখেন নি, বা দেখেছেন সামন্ত সচ্ছল পরিবারের অবাস্তব নারীদের, যাদের ছিলো সুগোল বাহু, এবং তা কোমলও, আর তাতে বালাও ছিলো; কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় নারীর রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতীয় নারীর দুর্দশা থেকে গেছে তাঁর চোখের আড়ালে। 'আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি', তাঁর এ-স্বীকারোক্তি হয়তো সত্য; তবে 'তাঁরা যে বড়ো অসুখে আছেন এমনতরো আমাদের কাছে তো কখনো প্রকাশ করেন নি', একথা সত্য নয়। নারীরা তাদের অসুখের কথা বলেছে বা জানিয়েছে বারবার, কিন্তু পুরুষতন্ত্র তাতে কান দেয় নি, বা তাদের স্তব্ধ ক'রে দিয়েছে যেমন স্তব্ধ করেছে তারা রমাবাইকে। নারী যে অসুখী হ'তে পারে, তা-ই বিশ্বাস করতে পারে নি পুরুষাধিপত্যবাদীরা। রবীন্দ্রনাথ তাদেরই একজন।

তিনি ঘোষণা করেছেন, 'আমাদের সমাজের যেরকম গঠন, তাতে সমাজের ভালোমন্দ যা-ই হোক আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ রকম সুখে আছেন। ইংরেজেরা মনে করতে পারেন লনটেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কার হতেও পারে।' একজন খাঁটি প্রথাবাদী ভারতীয় হিশেবে রবীন্দ্রনাথ জোর ক'রেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সুখে আছে ভারতীয় নারীরা। সুখ ব্যাপারটি খুবই মানসিক, সুখে থাকতে পারে রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য আর অসুখে থাকতে পারেন প্রভু রবীন্দ্রনাথ, তবে ভারতীয় নারীরা আসলে বেশ রকম সুখে ছিলো না। তিনি লনটেনিস খেলা আর বল নাচাকে নিন্দা করেছেন, তিনি মনে করেন ওগুলো নারীর সুখের জন্যে দরকার নয়; কিন্তু তিনি যদি ভারতীয় নারীদের কাছে জানতে চাইতেন এ-সম্পর্কে, তাহলে যে-উত্তর পেতেন তাতে ক্ষুব্ধ বোধ করতেন। দেখতেন খেলতে আর নাচতে চায় ভারতীয় নারীরাও! তিনি বিশ্বাস করেন, 'ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ।' তাঁর উপলব্ধি চমৎকার, তবে প্রশ্ন হচ্ছে পুরুষের সুখ কীসে;–ভালো না বেসে, ভালোবাসা না পেয়ে? পুরুষের জন্যে কি ভালোবাসা নিরর্থক? পুরুষ কি এমন জন্তু, যার দরকার নেই ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাওয়ার? রবীন্দ্রনাথ নারীকে মনে করেছেন খেলার পুতুল, টৌরভাল্ডের মতো তিনিও পছন্দ করেন পুতুল খেলতে; মনে করেন নারীর কাজ হচ্ছে পুরুষকে ভালোবাসা, আর কখনোকখনো পুরুষের আদর পাওয়া। পুরুষের এ-ভালোবাসা যে অপমান, তা বুঝেছিলো রবীন্দ্রনাথের 'নারীর উক্তি'র নারীটি; সে জানিয়েছিলো, 'আছি যেন সোনার খাঁচায় /একখানি পোষ-মানা প্রাণ। /এও কি বুঝাতে হয়– /প্রেম যদি নাহি রয়

/হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান।' ভারতীয় নারী হয়তো প্রাণভ'রে ভালোবেসেছে তাদের পুরুষদের, কিন্তু তারা ভালোবাসা পায় নি, পেয়েছে সোহাগের নামে অপমান। তবে ওই সোহাগও জোটে নি অধিকাংশ নারীর ভাগ্যে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, 'আমাদের পরিবারে নারীহৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংরেজ-পরিবারে অসম্ভব।' ইংরেজ পরিবারের তুলনায় হিন্দু/ব্রাহ্ম পরিবারে নারীহৃদয়ের বিচিত্রভাবে চরিতার্থ লাভের যে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তা চূড়ান্তরূপে মর্মস্পর্শী। নারীর ধারাবাহিক লাঞ্ছনাকে তিনি বলেছেন নারীহৃদয়ের চরিতার্থতা। ভারতীয় নারীহৃদয়ের চরিতার্থতা প্রমাণের জন্যে তিনি তুলনা করেছেন ইংরেজ চিরকুমারী ও ভারতীয় বিধবার মধ্যে :

> বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নাবীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্মণ্য থাকে না হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো জননী কখনো দুহিতা কখনো সখী। এইজন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল হয়ে থাকেন। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহুকালের সুখদুঃখময় প্রীতির সখিত্ববন্ধন, বাড়ির পুরুষদেব সঙ্গে স্নেহভক্তিপরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ; গৃহকার্যেব ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁব অভাব নেই।...বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্‌বৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের মতো একজন স্পর্শকাতর রোম্যানটিক কবি কী ক'রে এতো সংবেদনহীন হয়ে উঠতে পারেন, তা ভাবতেও শোক জাগে। তিনি স্তব করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে শোচনীয় মর্মান্তিক এক ব্যাপারের। হিন্দু বিধবা সব ধরনের বিধবার মধ্যে শোচনীয়তম, তার জীবন হচ্ছে ধারাবাহিক সতীদাহ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'হৃদয়ের চরিতার্থতা'। যার জীবন সম্পূর্ণ শূন্য শুষ্ক পতিত অনুর্বর, তার জীবনকে কতকগুলো নিরর্থক শব্দে পূর্ণ ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কি মনে করেন যে বিধবার জীবন ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু তার নারীপ্রকৃতি হয়ে ওঠে বিচিত্রভাবে চরিতার্থ, কেননা তার আশ্রয়দাতা পরিবারটি তাকে এতো কাজ দেয় যে তাতেই সে ভ'রে ওঠে? রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা বাস্তবভাবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় যে বিধবার নিজের সন্তান না থাকলেও পরের সন্তান পালন করতে করতে কাটে তার সকাল থেকে সন্ধ্যা। পরের সন্তান পালন কী কঠিন কাজ, তা জানে শুধু বিধবারাই। 'তিনি কখনো জননী কখনো দুহিতা কখনো সখী';– এটা মধুর শোনালেও মধুর ব্যাপার নয়, খুবই বিষাক্ত ব্যাপার। এর বাস্তব অনুবাদ হচ্ছে বিধবা এমন মানুষ, যার নিজের কোনো সত্তা নেই জীবন নেই, সে ঘোরে অন্যদের কেন্দ্র ক'রে; তার জীবন নিরবচ্ছিন্ন লাঞ্ছনার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই মধুর। 'গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁর অভাব নেই', এর প্রথমাংশ সত্য না হ'লেও দ্বিতীয়াংশ খুবই সত্য যে বিধবা ক'রে থাকে দাসীর কাজ, আর তার কাজের কোনো শেষ নেই। ওই কাজের জন্যে সে পারিশ্রমিক পায় না, তার ভাগ্যে জোটে লাঞ্ছনা। 'একজন বিবাহিত রমণীর

বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে', কিন্তু তা থাকে না বিধবার; এর কারণ এ নয় যে তার হৃদয়পাত্র থেকে অমৃত উপচে পড়েছে, এসব তুচ্ছ কাজ করার মতো অবসর তার নেই। এর কারণ হচ্ছে দাসীর কোনো সুযোগ নেই ওই সব সামন্ত শখের। বিধবা হচ্ছে দণ্ডিত নারী, যে কোনো অপরাধ করে নি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিরপরাধ নারীর ওই দণ্ডকেই মনে করেন হৃদয়ের চরিতার্থতা!

এ-সময়ে (১৮৯১) তিনি নারীমুক্তি সম্পর্কে স্বেচ্ছায় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন নারীমুক্তিবাদী কৃষ্ণভাবিনী দাসের সাথে। কৃষ্ণভাবিনী 'শিক্ষিতা নারী' (১২৯৮) নামের একটি প্রবন্ধে দাবি করেন নারীশিক্ষা, চান কিছুটা স্বাধীনতা। নারীকে ঘরছাড়া করার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না, তিনিও চেয়েছিলেন শিক্ষার সাহায্যে উন্নতজাতের নারী উৎপাদন করতে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যগ্র হয়ে পড়েন নারীকে ঘরে আটকে রাখার জন্যে। তিনি নিজেকে দেখেন পুরুষতন্ত্রের মুখপাত্ররূপে, যাকে বাঁচানো তাঁর কাজ, যার মহিমা রক্ষা করা তাঁর দায়িত্ব। পুরুষই যে নারীকে আটকে রেখেছে ঘরে, কৃষ্ণভাবিনীর এ-অভিযোগ কাটানোর জন্যে তিনি আবার দোহাই দেন প্রকৃতির [উদ্ধৃত, অনন্যা (১৩৯৪, ১৯)] :

> প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্য্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন–পুরুষের সার্ব্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে–অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না।

উনিশশতকের বাঙালি নারীরা নিজেদের অবস্থা বর্ণনার জন্যে দুটি রূপক ব্যবহার করেছেন বারবার : পিঞ্জর ও কারাগার। গৃহকে তারা দেখেছেন ওই রূপকে, তাঁরা দাবি করেছেন নারীকে সেখানে ঢুকিয়েছে পুরুষেরাই। কৃষ্ণভাবিনীও তা-ই বলেন. কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে মনে করেন প্রকৃতির শাশ্বত বিধান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস প্রকৃতিই বিকলাঙ্গ ক'রে তৈরি করেছে নারীকে, তাই তাকে থাকতে হবে ঘরে, মানতে হবে পুরুষাধিপত্য। ভিক্টোরীয়দের মতো রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নিজেকে উৎসর্গ করাই নারীত্ব। এ-সম্পর্কে কৃষ্ণভাবিনী যা বলেন, তা অবিস্মরণীয় [(উদ্ধৃত, অনন্যা (১৩৯৪, ২০)] :

> পরোপকার ও অন্যের জন্যে জীবন ধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।

কৃষ্ণভাবিনীর উক্তির প্রথমাংশ উগ্র পুরুষতন্ত্রের সাথে আপোষ, আর দ্বিতীয়াংশ নিজেকে আবিষ্কার। নোরার মতো কৃষ্ণভাবিনী শুধু নিজের জন্যে বাঁচতে চান নি, জীবন ধারণ করতে চেয়েছেন প্রধানত পরেরই জন্যে, একটুকু শুধু বেঁচে থাকতে চেয়েছেন নিজের জন্যে। পুরুষতন্ত্র আর রবীন্দ্রনাথ তাতে রাজি নন; তিনি চান নারী হবে ক্রুশবিদ্ধ জিসাস, ত্যাগ স্বীকার ক'রে যাবে আমরণ। নারীর যে-স্তব করেন তিনি, তা পুরুষ করেছে বারবার নারীকে নিজের বশে রাখার জন্যে [উদ্ধৃত, অনন্যা (১৩৯৪, ২১)] :

নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ। তিনি পুরুষের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীত ঘটিতে পারে, তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সমাঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

ভিক্টোরীয়রা নারীকে পুরুষের থেকে উৎকৃষ্ট ব'লে অবিরাম প্রশংসা করেছে, কিন্তু তাকে অধীনে রাখার সব রকম কৌশল নিয়েছে; 'উৎকৃষ্ট' কথাটি ছিলো এক নিরর্থক সুভাষণ। সে-নারীই ছিলো তাদের কাছে উৎকৃষ্ট, যে পুরুষের অধীনে থাকে। একে বিদ্রূপ ক'রে উনিশশতকের এক বিলেতি ব্যঙ্গচিত্রকর একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন, যাতে একটি পুরুষ চেয়ারে ব'সে তার স্ত্রীর দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে বলছে, 'হে নারী, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, মানবতার সম্রাজ্ঞী, মানবজাতির জননী, আমার জুতো খোলো' [দ্র ট্যানাহিল (১৯৮০, চিত্র ১৯)]। মিল বলেছিলেন এটা এক পরিহাস যে উৎকৃষ্টরা থাকবে নিকৃষ্টদের অধীনে! 'নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ' এক শূন্য বুলি। রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই বিশ্বাস করেন ভিক্টোরীয় *ঘরেবাইরে* বা *ভিন্ন এলাকাতত্ত্বে*, এবং বিশেষ ধরনের নারীস্বভাবে। তিনি নারীকে মনে করেন প্রকৃতির হাতে তৈরি বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যাতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে যদি নারী চেষ্টা করে বাইরে আসার। ওই দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে যাবে নারীর স্বভাব-কোমলতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা! নারীর স্বভাব যে পুরুষতন্ত্রেরই তৈবি, তা ভাবেন নি রবীন্দ্রনাথ।

নারী সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি ও বদ্ধমূল ক'রে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশ-একুশ বছর বয়সে, যা তিনি পুষেছেন আশি বছর বয়স পর্যন্ত। নারীর দুটি বিপরীত ধ্রুবরূপে বিশ্বাস করেছেন তিনি : প্রিয়া ও জননী, উর্বশী ও কল্যাণী, বা পতিতা ও গৃহিণী। প্রিয়া-উর্বশী-পতিতা নারীর একরূপ, জননী-কল্যাণী-গৃহিণী আরেক রূপ। প্রথম রূপটির স্বপ্ন দেখেছেন তিনি কবিতার জন্যে, দ্বিতীয় রূপটিকে তিনি চেয়েছেন বাস্তবে। তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাসে এ-রূপ দুটি ফিরেফিরে এসেছে। এ-রূপ দুটি তিনি পেয়েছেন হিন্দুপুরাণের সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানে, এবং এদের মনে করেছেন শাশ্বত, চিরন্তন। নারীকে তিনি স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত, আর্থনীতিকভাবে স্বনির্ভর দেখতে চান নি। তাঁর কয়েকটি কবিতা প'ড়ে দেখতে চাই তিনি নারীকে দেখেছেন কী রূপে, আর কোন রূপ চেয়েছেন স্বপ্নে ও বাস্তবে। 'উর্বশী' [১৩০২, *চিত্রা*] কবিতাটিতে পাওয়া যায় নারীর এক রূপ, যে 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু', সে 'সুন্দরী রূপসী'। তার জন্ম হয়েছিলো 'মন্থিত সাগরে'। সে সৌন্দর্য, কিন্তু সে 'বৃন্তহীন পুষ্প', তার জীবন ট্র্যাজিক বেদনাপূর্ণ, কেননা সে কল্যাণী নয়। নারীর ওই রূপের জন্যে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে পারেন, কিন্তু তাকে গৃহে কামনা করেন না। *বলাকার* (১৩২১) ২৩-সংখ্যক কবিতায়ও মেলে নারীর দুই রূপ :

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,

বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
  স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী.
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
  স্বর্গের ঈশ্বরী।

রবীন্দ্রচিন্তায় এ-দু-নারী আদিম, চিরন্তনী, শাশ্বতী; এদের পরিবর্তন নেই, এরা রবীন্দ্রনাথ ও পুরুষতন্ত্রের দুই নারী স্টেরিওটাইপ। তাই নারী চিরকালই থেকে যাবে পৌরাণিক উর্বশী, যে কামনার তৃপ্তি যোগাবে পুরুষের, আর কল্যাণী, যে পুরুষের গৃহকে ক'রে তুলবে স্বর্গের মতো সুখকর। এরা পরস্পরের বিপরীত : উর্বশী রূপসী, সে বেশ্যা, তাকে দেবদানব আর পুরুষ কেউ গ্রহণ করে নি; আর কল্যাণীকে পুরুষ বন্দী করেছে নিজের গৃহে। নারীর দু-রূপকে পুরুষ ও রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখেছেন, তাতে নারী হয়ে উঠেছে এক শোচনীয় প্রাণী : যাকে গৃহে গ্রহণ করা হয় নি, সে হয়েছে বেশ্যা–তার কাজ সকলের চিত্ত ও শরীরবিনোদন; আর যাকে গ্রহণ করা হয়েছে, সে হয়েছে দাসী। নারীর এ-দু-রূপই কাজ করেছে তাঁর কবিতার প্রেরণারূপে, সম্ভবত উর্বশী রূপটিই তাঁকে বেশি প্রেরণা দিয়েছে, তবে তিনি স্তব করেছেন নারীর কল্যাণী বা দাসী রূপটির। কল্যাণীর ভবনখানি, রবীন্দ্রনাথের 'কল্যাণী' [১৩০৭, *ক্ষণিকা*] কবিতার পরিকল্পনা অনুসারে, পুষ্পকানন-মাঝে সাধারণত থাকে না, তবে একথা ঠিক যে 'কল্যাণী, নিত্য আছ আপন গৃহকাজে।' ভিক্টোরীয়দের 'অ্যাঞ্জেল ইন দি হাউজ' আর রবীন্দ্রনাথের 'কল্যাণী' দেবী, তাই ভাবতেই বিবমিষায় ধরে যে দেবী সারক্ষণ করছে গৃহকাজ, অর্থাৎ দাসীবৃত্তি। পুরুষ দেবীকে ক'রে তুলেছে গৃহপরিচারিকা! এ-দাসীর নামে তিনি 'সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ' গানটি উৎসর্গ করেছেন, তাকে উপাধি দিয়েছেন 'স্বর্গের ঈশ্বরী', এবং তাকে করেছেন পার্থিব নারীর অনুসরণীয় আদর্শ : 'রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা,/বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা।' রূপসীরা ওই দাসীকে পুজো করে, বিদুষীরা তাকে অভিনন্দিত করে! অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সারকথা হচ্ছে নারীর রূপের মূল্য নেই, জ্ঞানের মূল্য নেই আরো, নারীর মহিমা তার গৃহকাজে বা দাসীত্বে; এবং তাকে বন্দী ক'রে রাখতে হবে গৃহে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীকে হ'তে হবে নারী; পুরুষ হবে কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, শাসক প্রভৃতি, অর্থাৎ প্রভু বা স্রষ্টা। পুরুষতন্ত্র যে-ছকে তৈরি করেছে ও দেখতে চায় নারীকে, তিনি নারীকে দেখেন সে-ছক অনুসারেই; নারী যখন ছক ভেঙে ফেলে, তখন দেখা দেয় বিপর্যয়। এমনকি তিনি নিজেও যখন ছক ভেঙে নারীকে ব্যক্তি ক'রে তোলেন, তখন অবিলম্বে তাকে পুনর্বিন্যস্ত করেন ছকের মধ্যে। 'সাধারণ মেয়ে' [১৩৩৯, *পুনশ্চ*] কবিতাটিতে মেলে এর পরিচয়। মালতী এ-কবিতায় নিতে চেয়েছে মহৎ প্রতিশোধ। দেবযানীর মতো অভিশাপ দেয়ার সুযোগ সে পায় নি, তাই সে গণিতে হ'তে চেয়েছে প্রথম, বিলেতে গিয়ে সম্ভবত করতে চেয়েছে ডক্টরেট। নরেশ যদি তাকে বিয়ে করতো, তবে সে ঢাকাই শাড়ি প'রে কপালে সিঁদুর মেখে হয়ে উঠতো প্রথাগত কল্যাণী-তার নাম হতো শ্রীমতি মালতী দাসী; তবে ব্যর্থতা যেমন অনেক মহৎ কাজের

প্রেরণা, মালতীর প্রেমের ব্যর্থতাও মালতীকে অনুপ্রাণিত করে মহৎ প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখতে। মালতী ছক ভেঙে বেরিয়ে পড়ে; প্রতারিত প্রেমিকা দিবাস্বপ্নে হয়ে ওঠে মেধাবী ছাত্রী;– সাহিত্যের নয়, গণিতের! সে বিলেতে যায়, তার কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে পড়ে চারপাশ। তবে মালতী ছক ভাঙতে-না-ভাঙতেই রবীন্দ্রনাথ তাকে ফিরিয়ে আনেন পুরুষতন্ত্রের চিরন্তন ছকের মধ্যে :

মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চার দিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে–
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে;
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য–

যদি নারীত্বই হয় তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তাহলে গণিতে প্রথম শ্রেণী আর বিলেতে গবেষণা হয়ে ওঠে শোচনীয় পণ্ডশ্রম। মালতী এতো কিছু ক'রেও অর্জন করে নি কোনো সাফল্যই, তার পরম সাফল্য পরনে ঢাকাই শাড়ি আর কপালে সিঁদুরে! জ্ঞানী, বিদ্বান, বীর, কবি, শিল্পী, রাজারা ওর মাঝে আবিষ্কার করবে এক ছক-বাঁধা নারীকে, আর বিদুষী মালতী, রবীন্দ্রনাথের 'কল্যাণী' কবিতা অনুসারে, বরণমালা পরাবে কল্যাণী বা দাসীর কণ্ঠে। এ-ছকের মধ্যেই নারীকে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমনকি তাঁর বিদ্রোহী নারী, যে উদ্ধত প্রশ্ন করে : 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার /কেন নাহি দিবে অধিকার /হে বিধাতা?', যে ঘোষণা করে, 'যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী', সেও ছকের মধ্যেই থেকে বলে : 'যাহা মোর অনির্বচনীয় /তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয়' ['সবলা' (১৩৩৫): *মহুয়া*]। ওই অনির্বচনীয়টুকু হচ্ছে নারীত্ব, যা পুরুষতন্ত্রের অত্যন্ত প্রিয়।

ছক-ভাঙা নারীকে ছকের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত করার সফল উদাহরণ *চিত্রাঙ্গদা* (১২৯৯)। *চিত্রাঙ্গদা* ভিক্টোরীয় *ঘরেবাইরে* বা *পৃথক এলাকা* বা *সহচরীতত্ত্বের* এক নিরীক্ষা, যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে নারী স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার অযোগ্য; সে হ'তে পারে বড়োজোর পুরুষের সহচরী। ভিক্টোরীয়রা নারীকে ততোটুকু শিক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলো, যতোটুকুতে তারা হ'তে পারে স্বামীর যোগ্য সহচরী;– নারী নিজে প্রধান হয়ে উঠবে না, পুরুষই থাকবে প্রধান, নারী পালন করবে সহকারী সহচরীর ভূমিকা। নারী যদি ছক ভেঙে বেরিয়ে পড়ে, তবে তাকে ছকের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে যে-কোনো কৌশলে, বা ঠেলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে ঘরের কারাগারে। টেনিসনের *প্রিন্সেস* (১৮৪৭, ১৮৫৩) কাব্যে পাওয়া যায় এর আদর্শ ভিক্টোরীয় রূপ। ওই কাব্যে বিদ্রোহী স্বায়ত্তশাসনলিপ্সু রাজকন্যা আইডাকে ক'রে তোলা হয় স্বামীর পদানত, তার প্রতিষ্ঠিত নারী-বিশ্বাবদ্যালয়কে হাসপাতালে রূপান্তরিত ক'রে ওই বিদ্রোহিনীকে পরিণত করা হয় পুরুষের সেবিকা ও স্বামীর সহচরীতে। পুরুষতন্ত্র প্রতিশোধ নেয় চরমভাবে।

চিত্রাঙ্গদার কাঠামো অভিন্ন, একটি বিদ্রোহী স্বাধীন রাজকন্যাকে এতে কামের সহযোগিতায় রূপান্তরিত করা হয় পুরুষের সহচরীতে। চিত্রাঙ্গদার শুরু ছক-ভাঙা নারীরূপে, আর তার বিলুপ্তি ঘটে ছকবদ্ধ নারীতে; ভিক্টোরীয় পুরুষতন্ত্রের তৈরি ছকে তাকে চমৎকারভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ, যাতে মুগ্ধ হয় পুরুষেরা, এবং উন্নতজাতের নারী-উৎপাদনবাদীরা। কাব্যনাটকটির যে-অংশ নারী-স্বাধীনতার বিভ্রান্তিকর শ্লোগান হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেছে, তা হচ্ছে [*চিত্রাঙ্গদা* : ১১] :

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

এখানে পাওয়া যাচ্ছে এক ভিক্টোরীয় চিত্রাঙ্গদাকে, যে স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার সমস্ত স্বপ্ন বাতিল ক'রে বেছে নিয়েছে সহচরীর ভূমিকা। সে দেবী নয়, দাসী নয়, তবে স্বাধীন সত্তাও নয়; সে পুরুষের সহচরী বা প্রিয় পরগাছা। সে নিজে যাবে না কোনো সংকটের পথে, নিজে করবে না কোনো দুরূহ চিন্তা, নিজে গ্রহণ করবে না কোনো কঠিন ব্রত; ওই সমস্ত কাজ পুরুষের, সে-সব করবে তার স্বামী, সে হয়ে থাকবে স্বামীর সহচরী, বা শিক্ষিত দাসী। রুশো-রাসকিন নারীকে দিতে চেয়েছিলেন এ-ধরনের শিক্ষাই। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিলো *রঘুবংশ*-এর 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' শ্লোকটি, পছন্দ ছিলো স্ত্রীর সখি, সচিব, মিত্রের ভূমিকা; এর সাথে মিলে গিয়েছিলো ভিক্টোরীয় মতবাদ যে নারী হবে স্বামীর সহচরী। *চিত্রাঙ্গদায়* সহচরী নামের সুভাষিত দাসীর ভূমিকায় বিলুপ্তি ঘটে এক স্বায়ত্তশাসিত তরুণীর। চিত্রাঙ্গদার সাথে মিল আছে *শেষের কবিতার* (১৩৩৬) লাবণ্যের; তাকেও চিত্রাঙ্গদার মতো ছকের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। লাবণ্যের বাবা অধ্যক্ষ অবনীশ দত্ত মেয়েকে বিদুষী ক'রে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলো; কিন্তু মেয়েটি একদিন জ্ঞান বাদ দিয়ে জেগে ওঠে কামের মধ্যে, যেমন জেগে উঠেছিলো চিত্রাঙ্গদাও। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের জ্ঞান সহ্য করেন না, তাদের জাগিয়ে তোলেন কামে বা প্রেমে-নারীত্বে; এবং মনে করেন এখানেই নারীর জীবনের সার্থকতা। তবে ওই প্রেমই নারীর জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দেয়, নারী হয়ে ওঠে পুরুষের দাসী বা সহচরী। পুরুষতন্ত্রের শেখানো প্রেম নারীর জন্যে এক বড়ো সমস্যা।

রবীন্দ্রচিন্তায় পুরুষ অনন্য সত্তা, পুরুষ স্রষ্টা, ধ্যানী, শিল্পী; নারী গৌণ। সাতাত্তর বছর বয়সে লেখা 'নারী' [১৯৩৭, *সানাই*] নামের একটি কবিতার উল্লেখযোগ্য

অংশ এমন :

স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে-আনন্দরসরূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরণীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল
রক্তিম হিল্লোল,
সেই আদি ধ্যানমূর্তিটিরে
সন্ধান কবিছে ফিরে ফিরে
রূপকার মনে-মনে
বিধাতার তপস্যার সংগোপনে।...
পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্তের মদিরা-মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ।..
আদিস্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
উদ্ভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণ লোকে–
সেই ছবি আনিতেছ ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্যসহচরী।

এর অর্থ আদিতে ছিলো পুরুষ, যে স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধী, স্বর্গের অধিবাসী। তখন নারী ছিলো না। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো পুরুষের অনন্ত স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা নিয়ন্ত্রণের জন্যে, নারী দেখা দিয়েছিলো আনন্দরূপে। কে সৃষ্টি করেছিলো নারীকে? সৃষ্টি করেছিলো সম্ভবত পুরুষ নিজেই, পুরুষই নারীর বিধাতা, নারী পুরুষের ধ্যানলব্ধ মূর্তি। তবে নারী সে-মূর্তি আর আনন্দ ধ'রে রাখতে পারে নি, তাই পুরুষ শিল্পী হয়ে বারবার সৃষ্টি করছে সে-মূর্তি। পৃথিবীতে নারী আছে, কিন্তু তারা পৃথিবীর শস্তা মদ, পুরুষ এ-মর্ত্যের মদেই আস্বাদ করার চেষ্টা করছে স্বর্গের সুধা। পুরুষ স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়ে নানা শিল্পকলায় সৃষ্টি করছে আদিনারীকে। পৃথিবীতে যে-নারীরা আছে, তারা একদা অপূর্ব আলোতে উদ্ভাসিত ছিলো, এখন নেই। পুরুষ তাই চিরবিরহী, তার স্বপ্নে আছে আদিনারী; পার্থিব নারী পুরুষের সহচরী মাত্র। এ-নারী পুরুষের সেবা করবে, গৃহকাজ করবে, পুরুষ একে সম্ভোগ করতে করতে স্বপ্ন দেখবে আদি ধ্যানমূর্তিটির! কাব্যিকভাবে একে স্বর্গীয় মনে হ'তে পারে, তবে গদ্যে বা বাস্তবে এ খুবই শোচনীয় ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো গল্প-উপন্যাসও কল্যাণী বা গৃহবন্দী নারীর স্তব। নারীর বেদনা স্থান পেয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে, তবে তা প্রেমহীনতার বেদনা, নারীর স্বায়ত্তশাসনহীনতার বেদনা নয়। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নারীর রূপও এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাকে তিনি স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তাঁর কোনোকোনো উপন্যাস, যেমন *দুই বোন* (১৩৩৯), লেখা হয়েছে *দুই নারীতত্ত্ব* – নারীর এক রূপ উর্বশী আরেক রূপ কল্যাণী-প্রমাণের জন্যে; কোনো কোনো উপন্যাস, যেমন

ঘরে-বাইরে (১৩২৩), *চার অধ্যায়* (১৩৪১), লেখা হয়েছে *পৃথক এলাকাতত্ত্ব* প্রমাণ করার জন্যে। তিনি বিশ্বাস করেন গৃহ আর ভালোবাসা পেলে এবং ভালোবাসতে পারলেই চরিতার্থ নারীর জীবন। বাইরের জগত নারীর জগত নয়, সেখানে নারী প্রবেশ করলে শুভকে গ্রাস করে অশুভ, দেখা দেয় সর্বনাশ। প্রেমের ওপর চরম গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নষ্ট করেছেন নারীদের সম্ভাবনা। প্রেম নামক ভাবাবেগ নারীপুরুষ উভয়ের জীবনেরই খণ্ডকালীন সত্য, কিন্তু প্রেমই জীবনের সাফল্য নয়; ভাবাবেগকাতর একটা সময় কেটে যাওয়ার পর পুরুষ প্রেমের জন্যে কাতরতা বোধ করে না, কিন্তু নারী কেনো আত্মবিনাশ ঘটাবে ওই প্রেমেই? প্রেমকে কিংবদন্তিতে পরিণত করেছে পুরুষতন্ত্রই, তবে পুরুষ নিজেকে তার গ্রাস থেকে মুক্ত রেখে নারীকে ঠেলে দিয়েছে প্রেমের করাল গ্রাসে। বাইরের জগত প্রেমের নয়, তা স্বাধীনতা ও সাফল্যের। ওই স্বাধীনতা ও সাফল্য রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন পুরুষের জন্যে, আর নারীকে গ্রস্ত ক'রে রেখেছেন প্রেমের ভাবালুতার মধ্যে। নারী হবে বাইরে সফল পুরুষের অনুরাগিণী। রবীন্দ্রনাথের নারীদের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিদ্রোহী 'স্ত্রীর পত্র'-এর (১৯১৪) মৃণাল। সে তার স্বামীকে জানিয়েছে, 'আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না'; কারণ সে জেনেছে 'সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা' কী। তবে সংসার ছেড়ে মৃণাল গিয়েছে শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রের ধারে জগদীশ্বরের কাছে। পুরুষ যে ওই জগদীশ্বরের নামেই তাকে মেয়েমানুষ ক'রে রেখেছে, তা জানে না মৃণাল। মৃণাল স্বামীর ঘরে ফিরে নাও আসতে পারে, তবে সে বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা পাবে না; তার বিদ্রোহ বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠালাভের নয়। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে *পৃথক এলাকাতত্ত্ব* প্রমাণের জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিরীক্ষা চালিয়েছেন বিমলার ওপর; এবং দেখিয়েছেন বাইরে গেলে নারী সর্বনাশ করে বাইরের ও ঘরের। বিমলার জীবন তখনি সার্থক যখন সে অবনত স্বামীপ্রেমে, আর ব্যর্থ যখন সে সাড়া দেয় বাইরের হাতছানিতে। *চার অধ্যায়* এ-তত্ত্বের আরেক নিরীক্ষা ও প্রমাণ। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি রবীন্দ্রনাথের চোখে খুবই জঘন্য, আর তা চরম জঘন্য হয়ে ওঠে যখন তাতে যোগ দেয় নারী। নারী সন্ত্রাসে যাবে না, তারা যাবে প্রেমে; আর প্রেমের পবিত্র জায়গা হচ্ছে গৃহ, যেখানে নারী হবে তার স্বামীর খণ্ডকালীন খেলার পুতুল ও আমরণ দাসী।

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় (১৯১৭) প্রদত্ত বক্তৃতার একগুচ্ছ প্রকাশিত হয় *পারসনালিটি* (১৯১৭) গ্রন্থে। বইটির শেষ নিবন্ধের নাম 'নারী'। বইটি বাঙলাদেশে দুষ্প্রাপ্য ব'লে আমি পড়ার সুযোগ পাই নি, তবে কেতকী কুশারী (১৯৮৫, ২৪৮-২৫৩) পশ্চিম ও নারী সম্পর্কে এ-বইতে রবীন্দ্রমতের যে-পরিচয় দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় এতে পশ্চিম ও নারী সম্পর্কে তাঁর পুরোনো ধারণারই (১৮৯১) পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি। দ্বিতীয়বার তিনি যখন ইউরোপে গিয়েছিলেন, তখন তিনি মনে মনে নিজেকে গণ্য করেছিলেন এক তরুণ ভারতীয় ঋষি ব'লে, এবং ইউরোপ সম্পর্কে উচ্চারণ করেছিলেন অনেক গ্রহণঅযোগ্য বাণী, তবে তখন পশ্চিম তাঁর বাণী শোনার জন্যে প্রস্তুত

হয় নি। আমেরিকায় বক্তৃতার সময় তিনি নোবেলপ্রাপ্ত প্রাচ্যের পুরোহিত, যাঁর কথা টিকেট কেটে শুনতে চায় আমেরিকা, এবং তিনি পশ্চিমকে শোনান প্রচুর ভারতীয় কথামৃত। তিনি বলেন, পশ্চিমা সভ্যতা বড়ো বেশি পুরুষালি হয়ে উঠেছে ব'লেই ভ'রে গেছে সংকটে। এ-সংকটের সমাধান হচ্ছে নারী : 'অবশেষে সে-সময় এসেছে, যখন প্রবেশ করতে হবে নারীকে, ক্ষমতার এ-বেপরোয়া গতির মধ্যে নারীকে সঞ্চারিত করতে হবে আপন জীবনছন্দ' [দ্র কেতকী (১৯৮৫, ২৪৮)]। রবীন্দ্রনাথ তিরস্কার করছেন পুরুষ ও পশ্চিমের পুরুষালি সভ্যতাকে, কেননা পশ্চিমকে সমালোচনা করাই ছিলো তখন প্রাচ্য ঋষিত্ব; তবে তিনি তা করতে পারেন না, কেননা 'পুরুষ' বলতে তিনি বোঝেন যে অসামান্য ভাবকে, পশ্চিমের পুরুষ তা-ই। পুরুষ, রবীন্দ্রচেতনায়, কল্পনাপ্রতিভা, সৃষ্টি, গতি, অনন্ত অস্থিরতা, উদ্ভাবন, বিধাতা যাকে সম্পূর্ণ সৃষ্টি করতে পারে নি ব'লে যে নিরন্তর সৃষ্টি ক'রে চলছে নিজেকে। তাই তিনি পশ্চিমের পুরুষদের নিন্দা করতে পারেন না, কেননা তারা করেছে পুরুষেরই কাজ। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু পশ্চিমকে বাণী শোনাতে গেছেন, তাই পশ্চিমের যে-পুরুষ কাজ করেছে তাঁরই আদর্শ অনুসারে, তাকেই তিনি আক্রমণ করেছেন। তবে এ-বাহ্যিক আক্রমণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে দেখি রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছেন আসলে নারীকেই, যারা নিজেদের জীবনছন্দ সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছে সভ্যতায়, তাই পশ্চিমের সভ্যতা ভ'রে গেছে সংকটে। রবীন্দ্রনাথের পুরুষধারণা 'নারী' (১৯৩৭) কবিতায় যেমন, গদ্যেও তেমনি; *পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে* (১৩৩৬) পুরুষ এমন :

> পুরুষের কর্মপথে এখনো তার সন্ধানচেষ্টার শেষ হয় নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে, কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানে নি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে (*রর* : ১৯, ৩৭৯)।
>
> গতিবেগমত্ত পুরুষের চলমান সৃষ্টি সর্বদাই স্থিতির একটা মূল সুরকে কানে রাখতে চায়; পুরুষের শক্তি তার অসমাপ্ত সাধনার ভার বহন ক'রে চলবার সময় সুন্দরের প্রবর্তনার অপেক্ষা রাখে (*রর* : ১৯, ৩৮০)।

রবীন্দ্রনাথের পুরুষধারণার সাথে পশ্চিমের পুরুষকে মিলিয়ে নিলে দেখি পাশ্চাত্য পুরুষ অন্যায় করে নি কোনো; তারা যা করছে, তাকেই পুরুষের কাজ ব'লে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। পুরুষ সন্ধান করবে, গতিবেগমত্ত হয়ে ছুটে চলবে, উদ্ভাবন করবে, নিজের অসম্পূর্ণ রূপটিকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলবে। তাই পশ্চিমে যদি কোনো সংকট সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা পুরুষের দোষ নয়, দোষ নারীরই; কেননা নারীই তার রবীন্দ্রকথিত 'জীবনছন্দ' সঞ্চার করতে পারে নি সভ্যতায়, গতিবেগমত্ত পুরুষকে শোনাতে পারে নি তার 'স্থিতির মূল সুর'। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নারীকে দোষী করতে চান না, দোষী করেন পশ্চিমের পুরুষকেই, কেননা তিনি দণ্ড দিতে চান পশ্চিমা সভ্যতাকে। এটা খুবই অন্যায় দণ্ড। রাসকিন বলেছিলেন পুরুষ যখন যুদ্ধ বাধায়, তার জন্যে পুরুষের চেয়ে নারীই বেশি দোষী; কেননা নারী তার নারীত্ব দিয়ে পুরুষকে শান্তির দিকে টেনে রাখতে পারে নি! রবীন্দ্রনাথও অনেকটা তাই বলেন, নারী সম্পর্কে তাঁর ধারণা রাসকিনের ধারণার

মতোই। পুরুষ যোগাবে সভ্যতার গতি, নারী যোগাবে স্থিতি; তাহলেই সভ্যতা হয়ে উঠবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতার মতো ছন্দোবদ্ধ। পুরুষ গতি, তাই সে তার স্বাভাবিক গতিকে সঞ্চার করবেই সভ্যতায়; নারীর কাজ যদি হয় সভ্যতায় স্থিতি সঞ্চার করা, আর তা যদি না পারে নারী, তবে দণ্ড প্রাপ্য নারীরই। তাই রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের সভ্যতার সংকটের জন্যে মূল দোষী করেছেন নারীকে, যদিও রবীন্দ্রনাথ তা অবধান করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতায় নারীর যে-ভূমিকা নির্দেশ করেন, তা হচ্ছে ছক-বাঁধা কল্যাণীর ভূমিকা, যার কাজ পুরুষকে গৃহের স্থিতির মধ্যে মাঝেমাঝে স্থিত ক'রে পুরুষের অনন্ত গতিকে ছন্দোবদ্ধ করা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'স্থিতির আদর্শ নারীর প্রকৃতি-দ্বারা গভীরভাবে সমাদৃত', নারীর কাজ হচ্ছে 'জীবনের পোষণ, সংরক্ষণ ও আরোগ্যসাধন'। নারীর যে-প্রকৃতি ও ভূমিকা তিনি নির্দেশ করেছেন, তা নারীকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখে গৃহে, আর তাকে পংক্তিভুক্ত ক'রে রাখে আদিম পশুরই সাথে। তিনি মনে করেন, নারীর দায়িত্ব ছিলো পশ্চিমা সভ্যতার সেবিকারূপে আবির্ভূত হওয়া, নারী হবে সভ্যতার ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, কিন্তু নারী তা পারে নি। রবীন্দ্রনাথ নারীকে প্রকাশ্যে দোষী করেন নি; কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার সংকটের দায়ভার, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনছন্দ' ও 'স্থিতির মূল সুর' তত্ত্বানুসারে, বইতে হচ্ছে নারীকেই। রবীন্দ্রনাথ আগের মতো এ-প্রবন্ধেও বলেন যে নারীর স্থান হচ্ছে গৃহ। রাসকিনের মতোই গৃহকে একটু সম্প্রসারিত করে বলেন, 'মানবিক জগতই নারীর জগত' [দ্র কেতকী (১৯৮৫, ২৮৪-২৮৫)]। তবে ওই মানবিক জগত গৃহেরই সম্প্রসারিত রূপ; সেখানে সেবা আছে, প্রীতি আছে, কল্পনাপ্রতিভা নেই, আবিষ্কার বা সৃষ্টি নেই।

রবীন্দ্রনাথের নারী জৈবিক। জৈবিক হওয়ার অর্থ হচ্ছে নারী মানুষ হয়ে ওঠে নি; তার কাজ সন্তান ধারণ আর লালন ক'রে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা। পুরুষের কাজ সভ্যতা সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথের নারীর মূল কাজ যেখানে গর্ভধারণ আর প্রসব, সেখানে পুরুষের কাজ হচ্ছে সভ্যতা সৃষ্টি; মৃণালিনী দেবীরা গর্ভধারণ করবে, টিকিয়ে রাখবে মানবপ্রজাতিকে, আর রবীন্দ্রনাথেরা সৃষ্টি ক'রে চলবেন সভ্যতা। প্রাণসৃষ্টি এক দরকারি আদিম কাজ, সেটা সভ্যতাসৃষ্টি নয়, ওই কাজটি নারীর; ওই কাজ কাউকে মহৎ বা মানুষ করে না। পুরুষ করে সভ্যতাসৃষ্টির মহৎ কাজ; রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এই প্রাণসৃষ্টি-বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এইজন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে ব'লেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি' (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি*, *রর* : ১৯, ৩৮০)। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন 'জীবনের পোষণ, সংরক্ষণ', তা কোনো কৃতিত্বের ব্যাপার নয়, তাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীর প্রধান সীমাবদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতা থেকেই বহিষ্কার ক'রে দিয়েছেন নারীকে, তিনি মনে করেন সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের সৃষ্টি; এবং পুরুষ তা পেরেছে, কেননা পুরুষকে জীবন পোষণ আর সংরক্ষণ করতে হয় নি। এ-সভ্যতা যে পুরুষতান্ত্রিক, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সভ্যতা

শুধু পুরুষের সৃষ্টি নয়, নারী আছে এর ভিত্তিতে আর ওপরকাঠামোতে, কিন্তু পুরুষাধিপত্যবাদীদের মতো রবীন্দ্রনাথের তা মনে পড়ে নি। তিনি বলেন, 'প্রাণের টানে মেয়ে আটকা পড়েছে আর পুরুষ ছুটেছে মনের তাড়ায়' (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর* : ১৯, ৩৮২)। দুটি বিপরীত বস্তু পাচ্ছি এখানে : প্রাণ আর মন; নারী ওই প্রাণসৃষ্টি করতে গিয়ে চিরকালের জন্যে আটকে পড়েছে আঁতুড়ঘরে, আর মন-চালিত হয়ে পুরুষ সৃষ্টি ক'রে চলছে সভ্যতা। এর অর্থ হচ্ছে নারী মনহীন প্রাণী, যার কাজ নিজের অভ্যন্তরে নতুন প্রাণ সৃষ্টি করা। নারী যেখানে জৈবস্তরে রয়ে গেছে, সেখানে পুরুষ উত্তীর্ণ হয়েছে অভিনব দেবতার স্তরে :

> মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। We are the dreamers of dreams–এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপ পরিগ্রহ করছে।... নারীর সৃষ্টি ঘরে, এই জন্যে সব-কিছুকেই সে যত্ন করে জমিয়ে রাখতে পারে; তার ধৈর্য বেশি কেননা, তার ধারণার জায়গাটা বড়ো। পুরুষের সৃষ্টি পথে পথে, এই জন্যে সব-কিছুর ভার লাঘব করে দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে ও রাখতে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি, নির্মম পুরুষের কত শত কীর্তিকে বহুব্যয়, বহুত্যাগ, বহু পীড়নের উপর স্থাপিত করেছে।...পুরুষের কল্পনাবৃত্তির সাহস এত অত্যন্ত বেশি তার কারণ, স্থিতির ক্ষেত্রে স্থির হয়ে বসে বিচিত্রের সহস্র খুঁটিনাটিকে মমত্বের আঁকড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরবার দীর্ঘ সময় তার কখনো ছিল না। এই জন্যে সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রলয় করতে তার দ্বিধা নেই (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর* : ১৯, ৩৮৫-৩৮৬)।

এ-বর্ণনায় নারী সামান্য প্রাণী পুরুষের তুলনায়; নারীর রয়েছে তুচ্ছ প্রেম আর গৃহ, তাও পুরুষেরই জন্যে; আর পুরুষের রয়েছে 'কল্পনাবৃত্তি', রয়েছে 'ধ্যানের দৃষ্টি', সে সৃষ্টি করে 'ধ্যানের শক্তি দিয়ে'। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিলো ও'শনেসির 'আমরা সঙ্গীতরচয়িতা, /এবং আমরা স্বপ্নের স্বাপ্নিক' পংক্তিগুচ্ছ, অনেক স্থানে তিনি এগুলো উল্লেখ করেছেন কবির নাম না নিয়ে– মূল কবির নাম না নেয়া তাঁর স্বভাব (যেমন *The Religion of Man* -এ 'The Music Maker' পরিচ্ছেদে), এখানেও উল্লেখ করেছেন; এবং রবীন্দ্রনাথের পুরুষ হচ্ছে সঙ্গীতরচয়িতা, স্বপ্নের স্বাপ্নিক, তার ধ্যান রূপ পরিগ্রহ করছে নানা কীর্তির মধ্যে। পুরুষ তৈরি ক'রে চলছে নতুন পথ, সমগ্রের তৃষ্ণায় আর্ত তার প্রকৃতি, এবং সৃষ্টির জন্যে ধ্বংস করতেও পুরুষ দ্বিধাহীন [তাই দু-দুটি মহাযুদ্ধ এবং সভ্যতার সংকটের জন্যে রবীন্দ্রনাথ দায়ী করতে পারেন না পশ্চিমের পুরুষকে, কেননা তারা সৃষ্টির প্রয়োজনে আয়োজন করেছিলো প্রলয়ের]। এ-পুরুষের তুলনায় নারী একটি জরায়ু। পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক ভাববাদী মহত্ত্ব বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত :

> [ক] পুরুষের অধ্যবসায়ের কোথাও সমাপ্তি নেই, এইজন্যেই সুসমাপ্তির সুধারসের জন্যে তার অধ্যবসায়ের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা আছে। মেয়েদের হৃদয়ের মাধুর্য এই রসই তাকে পান করায়। পুরুষের সংসারে কেবলই চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়ের দোলা, তর্কের সংঘাত, ভাঙাগড়ার আবর্তন–এই নিরন্তর প্রয়াসে তার ক্ষুব্ধ দোলায়িত চিত্ত প্রাণলোকের সরল পরিপূর্ণতার জন্যে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে থাকে (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর* : ১৯, ৩৮১)।

[খ] পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নূতন আগন্তুক। আজ পর্যন্ত কতবার সে গড়ে তুলেছে আপন বিধিবিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেন নি; কত দেশে কত কালে তাকে আপন *পথ* বানিয়ে নিতে হল ('নারী', *কালান্তর, রর* : ২৪, ৩৭৮)।

[গ] পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন করে বাঁধতে হয় তার কীর্তির ভূমিকা।... পুরুষের রচিত সভ্যতায় আদিকাল থেকে এইরকম ভাঙা-গড়া চলছে ('নারী', *কালান্তর, রর* : ২৪, ৩৭৮)।

[ঘ] নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্যের দ্বারা নিজের অনুগত করে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে ('নারী', *কালান্তর, রর* : ২৪, ৩৭৯)।

রবীন্দ্রনাথের পুরুষ নিরন্তর সক্রিয় দেবতা, সে বিধাতার থেকেও শক্তিমান; সে অবিরাম সৃষ্টি ক'রে চলছে নিজেকে, সম্পূর্ণ করছে বিধাতার অসম্পূর্ণ কাজ। রাসকিনের মতোই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ যে পুরুষের কেবলই চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়, সংঘাত, ভাঙাগড়া; নারী হচ্ছে ওই দেবতার শান্তির পানীয়। রবীন্দ্রবিশ্বে নারীর প্রয়োজন বেশি নয়, পুরুষকে সন্তান ও প্রেম দেয়ার জন্যেই দরকার নারী। পুরুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ভাববাদী ও পুরুষতান্ত্রিক।

পুরুষ, রবীন্দ্রনাথের ধারণা, পুরুষ হয়েছে এজন্যে যে প্রাণসৃষ্টিতে পুরুষের ভূমিকা ক্ষণউত্তেজনার; আর নারী নারী হয়েছে ওই প্রাণ সৃষ্টি, পোষণ আর সংরক্ষণ করতে গিয়েই। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন আদিম শেকলে নারীকে বেঁধেছে প্রকৃতি, তাই নারী রয়ে গেছে প্রাকৃতিক আদিম স্তরে। নারীর এ-আদিমতার কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, এমনকি ১৩৪৩-এ নিখিলবঙ্গ-মহিলা কর্মীসম্মিলনে যখন তিনি 'নারী' বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েন, তখনও নারীদের তাদের আদিমতার কথা স্মরণ করাতে ভোলেন নি। রবীন্দ্রচেতনায় নারী :

[ক] জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র *ঐশ্বর্য* তার দেহে মনে পর্যাপ্ত (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর* : ১৯, ৩৮০)।

[খ] প্রকৃতির ব্যবস্থায় মেয়েরা একটা জায়গা পাকা করে পেয়েছে, পুরুষরা তা পায় নি (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর* : ১৯, ৩৮৩)।

[গ] মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নারীসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।...প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্তভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্যে। মানবসংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি ('নারী', *কালান্তর, রর* : ২৪, ৩৭৭)।

[ঘ] তাই গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যেমনি কোলে এল মা তখনই প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে ('নারী', *কালান্তর, রর* : ২৪, ৩৭৮)।

পারসন্যালিটিতে (১৯১৭) রবীন্দ্রনাথের যে-কথা কেতকী কুশারীর (১৯৮৫, ২৪৮)

অনুবাদে হয়েছে 'জীবনের পোষণ, সংরক্ষণ ও আরোগ্যসাধন', তাকে রবীন্দ্রনাথ *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে* (১৩৩৬) বলেছেন, 'প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণ'; এবং এ-ই হচ্ছে নারীর মৌল কাজ। নারীর এ-কাজটি আদিম জৈবিক, এবং রবীন্দ্রনাথের মতে এটা উদ্দেশ্যহীন ঘটনা নয় : 'জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায়' নারীর মধ্যে 'চরম পরিণতি পেয়েছে'। নারী হচ্ছে প্রকৃতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জরায়ুসম্বলিত জীব। প্রকৃতি দ্বিধাহীনভাবে প্রাণসৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছে নারীকে। একথা তিনি ১৯১৭তে, ১৯১৯-এ, ১৯৩৬-এ বলেছেন; এবং এতে বিশ্বাস করেন তিনি যৌবনকাল থেকেই। ১৯৩৬-এ তিনি নারীদের সভায়ই বলেছেন, 'মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী'; নারী 'জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে', 'প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে', এবং 'জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে।' নারী সন্তানধারণ করে, প্রসব করে এটা সত্য; তবে রবীন্দ্রনাথ এখানে নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে যেভাবে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে প্রকাশ পেয়েছে নারী সম্পর্কে তাঁর ভাববাদী পুরুষতান্ত্রিক ধারণা। পুরুষতন্ত্র এমন ধারণা পোষণ করে যে নারী পুরুষের থেকে অনেক বেশি 'প্রাকৃতিক'; ভারতীয় অঞ্চলে প্রকৃতি ও নারীর ভেদ অস্বীকার ক'রে নারীকে 'প্রকৃতি'ই বলা হয়। পুরুষতন্ত্র মনে করে যে নারী অচ্ছেদরূপে জড়িত প্রকৃতির সাথে, তাই নারীর পক্ষে অসম্ভব প্রকৃতি থেকে উত্তীর্ণ হওয়া। অন্যদিকে পুরুষের রয়েছে দ্বৈত প্রকৃতি : পুরুষ তার দ্বিতীয় প্রকৃতির সাহায্যেই সৃষ্টি করে সভ্যতা। পুরুষ সম্বন্ধে ভাববাদী ধারণা জোর দেয় পুরুষের এ-দ্বিতীয় প্রকৃতির ওপর, যেমন জোর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং পুরুষকে ক'রে তুলেছেন দেবতা। পুরুষতন্ত্র নারীব জন্যে নির্দেশ করেছে একক প্রকৃতি. যা জড়িত আদিম জৈবিকতার সাথে; আর পুরুষের জন্যে দ্বৈত প্রকৃতি, যার দ্বিতীয়টি পুরুষকে করেছে জৈবিকতা-পেরিয়ে-যাওয়া মানুষ। এটা শুধু পুরুষতন্ত্রের দার্শনিকতা নয়, এর রয়েছে বাস্তব রূপ : এটা জীবনকে ভাগ করেছে দুটি পৃথক এলাকায়, একটি গার্হস্থ্য ও অন্যটি সামাজিক জীবন। পুরুষ জীবন যাপন করে দু-এলাকায়ই, তবে সামাজিক এলাকায়ই পুরুষ যাপন করে তার 'মানবিক' জীবন। গার্হস্থ্য জীবন হচ্ছে পুরুষের জৈবিক জীবন, আর সামাজিকটি তার মানবিক জীবন। গার্হস্থ্য জীবন হচ্ছে প্রকৃতির, প্রয়োজনের, অস্বাধীনতার জীবন, যেখানে বাস করে নারী; আর পুরুষ এ-জীবনকে পেরিয়ে সামাজিক জীবনে লাভ করে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা। নারী গার্হস্থ্য জৈবিকতার জীবনে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রকথিত 'প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের' জন্যে, এবং এটাকে তিনি ও পুরুষতন্ত্র একটা পাশবিক কাজ ব'লেই মনে করেন। এর প্রভাব এতো প্রবল যে নারীবাদী দ্য বোভোয়ারও মনে করেছেন যে সন্তানধারণ ও প্রসব একটি হীন পাশবিক কাজ; এবং নারী অভিশপ্ত এ-জৈবিক অভিশাপে। এ-অভিশাপের ফলেই নারী বন্দী হয়ে আছে গৃহে, আদিম প্রকৃতির শেকলে জড়িয়ে আছে; তার মুক্তি নেই। নারী বন্দী হয়ে আছে মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার অমানবিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই। শুলামিথ ফায়ারস্টোন এ-তত্ত্বটিকে তার যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, নারী-অধীনতার মূল কারণ হয় যদি সন্তানপ্রজনন, তাহলে নারীমুক্তির জন্যে

দরকার নারীর সন্তানধারণ করতে অস্বীবার করা [দ্র ওব্রিয়েন (১৯৮২, ১০৪)]। মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নারীর নয়; পুরুষ যদি চায় যে টিকে থাকুক মানবপ্রজাতি, তাহলে তাকে উদ্ভাবন করতে হবে সে-প্রযুক্তি, যা টিকিয়ে রাখবে মানবপ্রজাতিকে।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে গৃহে দেখতে চান, এবং সব সময় মনে করেছেন প্রকৃতিই নারীর মধ্যে নিজের অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করার জন্যে নিয়েছে এ-ব্যবস্থা। পুরুষই যে নারীকে ঢুকিয়েছে ঘরে. একথা তিনি স্বীকার করতে চান নি। ১৯৩৬-এ নারীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি এ-মত কিছুটা বদলান; স্বীকার করেন, 'মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারার বেড়া দিয়ে রেখেছে' ('নারী', *কালান্তর, রর* : ২৪, ৩৭৯)। পুরুষকে এবার তিনি স্নেহের সাথে দায়ী করেন; এবং সাথেসাথে উচ্চারণ করেন এক সাংঘাতিক কথা : 'মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে, সেইজন্যে এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে' (ওই, ৩৭৯)। অর্থাৎ নারীদের মধ্যে রয়েছে জন্মক্রীতদাসের বৈশিষ্ট্য, তাই পুরুষ পেরেছে নারীকে বন্দী করতে। পুরুষ যে-জন্যে গৃহে অবরুদ্ধ করেছে নারীকে, তা হচ্ছে 'হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্য', বা নারীত্ব, যা নারী পেয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীর থাকতেই হবে ওই গুণ : 'প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে, কোনো শিক্ষায়, কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংসারক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না (ওই, ৩৭৯)। রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে ছকবাঁধা নারীত্ব নামের 'সহজ রসটি', যার অভাবকে তিনি মনে করেন 'দুর্ভাগ্য'। কোনো শিক্ষাই ওই রসাভাবের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না; নারী কবি, বৈজ্ঞানিক, প্রধান মন্ত্রী হ'লেও বা নোবেল পুরস্কার পেলেও কিছু যায়-আসে না, ওই সব নারীর দুর্ভাগ্য মাত্র। তার সব সাফল্যই, রবীন্দ্রমতে. চরম ব্যর্থতা. যদি তার না থাকে ওই সহজ রসটি।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীর পক্ষে কবি-বৈজ্ঞানিক-প্রধান মন্ত্রী হওয়া অস্বাভাবিক, কেননা নারী সহজাতভাবেই পায় নি মানুষের সে-গুণ, যা দরকার ওই সব সামাজিক-মানবিক সাফল্যের জন্যে। 'পুরুষের আছে বীর্য আর মেয়েদের আছে মাধুর্য'; আর 'মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি' (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর* : ১৯, ৩৭৯, ৩৮৫)। প্রেম-মাধুর্য নারীকে গৃহে আটকে রাখে, তা মধুর ও আলোকিত করে ঘরকে; আর পুরুষের বীর্য ও প্রতিভা উপভোগ ও আলোকিত করে বিশ্ব ও সভ্যতাকে। নারীর ব্যর্থতার মূলে তার জরায়ু: রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বস্তুত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের কোঠায় পড়ে না, সেই কারণে তার আনন্দ বৃহৎ তত্ত্বের আনন্দ নয়; এমন-কি, মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও বহন করেছে রস, কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট সার্থক হয় নি ('নারী', *কালান্তর, রর* : ২৪, ৩৭৯)। পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধিরা এমন বিশ্বাস পোষণ ও প্রচার

করেছেন ধর্মগ্রন্থে, দর্শনশাস্ত্রে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ও তাঁদের সব কিছুতে; নারীর প্রতিভার সৃষ্টিকে তাঁরা শুধু অবহেলাই করেন নি, নারীর প্রতিভা থাকতে পারে ব'লেই বিশ্বাস করেন নি তাঁরা। নারীর প্রতিভাহীনতার কারণ তার জরায়ু, তার অপরাধ সে পালন করে মানুষকে গর্ভে ধারণের মতো অমানবিক কাজ। নারী কীভাবে কাটাবে তার এ-প্রতিবন্ধিতা? যদি জরায়ুই তার শত্রু হয়, তাহলে জরায়ুকেই বাতিল ক'রে দিতে হবে তার। নারীকে যদি সৃষ্টিশীল হ'তে হয়, তাহলে সন্তানধারণ ও লালনের ব্যক্তিগত কাজ অস্বীকার ক'রে মন দিতে হবে নৈর্ব্যক্তিক কাজে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ নারীকে নৈর্ব্যক্তিক কাজের এলাকায় ঢোকার অনুমতি দিতে রাজি নন।

নারী কী কাজের উপযুক্ত, ঘরের বাইরে গেলে নারীকে মানায় কোন কাজে? নারীর মানানসই কাজের নমুনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন *জাপানযাত্রী*তে (১৯১৯)। বর্মীনারীদের কর্মের হিল্লোল দেখে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাদের দিয়েছেন এ-প্রশংসাপত্র :

> লোকের কাছে শুনতে পাই এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়. অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে। হঠাৎ মনে আসে, এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু, ফলে তো তার উলটোই দেখতে পাচ্ছি—এই কাজকর্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো যেন বেশি করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সব চেয়ে বড়ো বন্ধন নয়, কাজের সংকীর্ণতাই হচ্ছে সব চেয়ে কঠোর খাঁচা।
>
> এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সংকুচিত হয়ে নেই; রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজেই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্তিটিকে সুব্যক্ত করে তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এখন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে; তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গিতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায় (*জাপানযাত্রী, রর* : ১৯, ৩১০)।

কী কাজ করতে দেখেছেন তিনি ওই নারীদের? অধ্যাপকের, চিকিৎসকের, প্রকৌশলীর, বিজ্ঞানীর, পৌরপতির, সেনাপতির, মন্ত্রীর? এমন কোনো কাজে তিনি দেখেন নি তাদের; দেখেছেন হয়তো মেয়েরা বাজারে যাচ্ছে, চাষ করছে, পানি আনছে, মাঠে গরু নিয়ে যাচ্ছে, বা কারখানায় করছে শ্রমিকের কাজ। তিনি মনে করেন এ-ধরনের কাজে বিকশিত হয় মেয়েরা। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে কাজই মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, কিন্তু তিনি কি চাইবেন জোড়াসাঁকোর মেয়েরাও ওই ধরনের কাজ ক'রে অর্জন করুক 'যথার্থ শ্রী'? তিনি তা চাইবেন না; তাই রবীন্দ্রনাথ বর্মীনারীদের যে-প্রশংসাপত্র দিয়েছেন, তার মূল্য বেশি নয়। পৃথিবী জুড়েই মেয়েরা চিরকাল ধ'রে এ-ধরনের নিম্নকাজ ক'রে আসছে, তা সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যে নয়; সামাজিক ব্যবস্থাই তাদের বাধ্য করেছে এসব কাজে। সাঁওতাল মেয়েদের কাজেরও তিনি প্রশংসা করেছেন, তাদের কাজের থেকে অবশ্য তাঁর চোখে বেশি পড়েছে ওই নারীদের দৈহিক নিটোলতা। কাজ তাদের দেহকে নিটোল করে নি, কাজ নারীদেহকে নিটোল করলে পৃথিবী জুড়েই

দরিদ্র নারীদের দেহ নিটোল হতো, রূপসীশ্রেষ্ঠরা দেখা দিতো সামাজিক শূদ্রদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বাইরের শারীরিক কাজ মেয়েরা ভালোই করতে পারে, এবং এটা যদি তারা করে, বেশ হয়, বা মেয়েদের খামোখা বাইরে বেরোনো ঠিক নয়, তাদের বাইরে বেরোনো উচিত শুধু কাজ করতে। তিনি মুগ্ধ হয়েছেন নারীদের ভূমিদাসী বা শ্রমিকের কাজ করতে দেখে।

তিনি মনে করেন মেয়েরা ভালো দাসীবৃত্তিতেই; জাপানি দাসীদের দেখে তাঁর মনে হয়েছে :

> এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে সব-চেয়ে চোখে পড়ে জাপানি দাসী।... যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা।... জানালার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগতে আরম্ভ করেছে-সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল ক'রে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, এটা দেখলেই বোঝা যায়, এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মেয়েদেরই হাতে; এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজেই এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় ব'লে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে-কারণেই হোক, মেয়েরা যেখানে এই কর্মতৎপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্যহানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে (*জাপানযাত্রী*, *রর* : ১৯, ৩৩৫)।

রবীন্দ্রনাথের জাপানি দাসীবন্দনার নিচে লুকিয়ে আছে নারীদের কর্মযোগ্যতা সম্বন্ধে এক ভীতিকর দর্শন : দাসীবৃত্তি নারীদের জন্যে স্বাভাবিক। নারীদের রূপান্তরিত করতে হবে দাসী নামের পদার্থে, একাকার ক'রে দিতে হবে মানুষ-মোম-মাংসকে; তারা হিল্লোল জাগিয়ে কাজ করবে, এতে তাদের স্বভাব বিকাশ লাভ ক'রে হয়ে উঠবে সুন্দর। 'স্বাভাবিক' হচ্ছে 'প্রাকৃতিক'-এর অন্যনাম; তাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীদের দাসীবৃত্তি প্রাকৃতিক। নারীদের বিলাস অবৈধ, কাজ না করলে বিকৃত হয় নারীরা, হানি ঘটে তাদের দেহমনসৌন্দর্যের। মনু বিধান দিয়েছিলেন যে নারীদের কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে সব সময়, নইলে নারীরা পরপুরুষের চিন্তায় নষ্ট হয়ে যাবে; বাইবেলে ঈশ্বরও গুণবতী ভার্যার প্রশংসা ক'রে বলেছে যে সে আলস্যের খাদ্য খায় না। জাপানি দাসীরা আলস্যের অন্ন তো খায়ই না, বরং তারা কাজকে পরিণত করে সৌন্দর্যের হিল্লোলে, বা কর্মনাট্যে, যা অনুমোদন করবেন মনু আর ঈশ্বর, যার বন্দনা করেন রবীন্দ্রনাথ। নারীরা শুধু দাসীত্বে সফল নয়, রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তারা ব্যবসাও করতে পারে :

> এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে-কথা বলছিলুম এই ব্যবসায়ে তারই প্রমাণ দেখতে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ: ...কর্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক।...যে-সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না সে-সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভালো করে করতে পারে, এই আমার বিশ্বাস।... যে-সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, যে-সব কাজে পটুতা পরিশ্রম ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব-চেয়ে দরকার, সে-সব কাজ মেয়েদের (*জাপানযাত্রী*, *রর* : ১৯, ৩২৩)।

রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন নারীদের কয়েকটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য : নারীরা মানুষের মন বুঝতে পারে; মানুষের সাথে সম্বন্ধ রক্ষা করতে পারে; এবং তারা কর্মকুশল। পিতৃতন্ত্র নারীদের এ-গুণগুলোর প্রশংসা ক'রে আসছে কয়েক সহস্রক ধ'রে, এবং নারীরা যাতে বিরত না হয় এগুলোর চর্চা থেকে তার ওপর রেখেছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এগুলো দাসদের গুণ; মন বুঝে চলতে হয় তাদের, নইলে তাদের পড়তে হয় বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে; সম্বন্ধও রক্ষা করতে হয় তাদের, এবং কর্মকুশলতায় তারা জয় করে প্রভুর মন। স্বাধীন পুরুষের কাছে এসব কাপুরুষতা; কিন্তু নারী যেহেতু দাসশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত, যেমন দাবি করেছেন আমূল নারীবাদীরা, তাই তারা চলার চেষ্টা করে অপরের মন বুঝে, মানিয়ে নিতে চায় অপরের সাথে। একে স্বাভাবিক বলার অর্থ হচ্ছে শূদ্রদের শূদ্রত্ব স্বাভাবিক। পিতৃতন্ত্র সমস্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপারকে জৈবিক ও শাশ্বত ব'লে গণ্য করেছে, রবীন্দ্রনাথও করেছেন। পুরুষতন্ত্র নারীদের বিকৃত ক'রে নিজের উপযোগী ক'রে নিয়েছে, এসব নারীদের স্বাভাবিক স্বভাব নয়। নারীরা ব্যবসা করতে পারে, এতে তিনি বিশ্বাস করেন, এবং তার প্রমাণও তিনি পেয়েছেন; তবে তিনি ব্যবসা বলতে বোঝেন মুদিদোকান চালানো, যার যোগ্য নারীরা। নারীরা যে শারীরিকভাবে দুর্বল, এটা সকলের জানা; রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীরা মানসিকভাবেও দুর্বল। 'যে-সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না', রবীন্দ্রনাথের মতে, সে-সব করতে পারে নারীরা। তাঁর এ-মত অভিনব নয়, পুরুষ নারীদের সম্পর্কে এ-ধারণা পোষণ ও প্রচার ক'রে আসছে পিতৃতন্ত্রের সূচনাকাল থেকেই। রুশো *এমিল*-এ এটা আলোচনা করেছেন বিশদভাবে; রবীন্দ্রনাথের মত রুশোর মতেরই প্রতিধ্বনি। নারী যেমন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী তেমনি প্রতিবন্ধী মানসিকভাবে; তারা করতে পারে সে-সব কাজ যাতে 'উদ্ভাবনার দরকার নেই', যাতে 'পটুতা পরিশ্রম ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব-চেয়ে দরকার'। রবীন্দ্রনাথ নারীদের প্রশংসাপত্র দিয়েছেন যে তারা ব্যবসা করতে পারে, তবে 'ব্যবসা' বলতে তিনি আসলে ব্যবসা বোঝান নি। ব্যবসার জন্যে দরকার সাহস, উদ্ভাবন শক্তি, তাই নারীরা ব্যবসার উপযুক্ত নয়; রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারী বড়োজোর হ'তে পারে মুদি; তিনি তা বিলেতে দেখেছেন, জাপানে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন নারীপুরুষের পৃথক এলাকায় বিশ্বাসী, তেমনি নারী যখন বাইরের কাজে আসে তখনও তিনি নারীপুরুষের পৃথক কাজে বিশ্বাসী। একশ্রেণীর তুচ্ছ কাজ আছে, যা করবে নির্বোধ দুর্বল নারী; আর অধিকাংশ সভ্যতার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে উদ্ভাবনশীল সাহসী পুরুষ। নারী হবে মুদি, সেবিকা, বিমানবালা, পুরুষ নির্বাহীর ব্যক্তিগত সহকারী; আর পুরুষ হবে সভ্যতার নিয়ন্ত্রক।

রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কালের অধিকাংশ মহাপুরুষের মতোই, বিরোধী ছিলেন নারীমুক্তির; যে-নারীরা পুরুষাধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্তির কথা বলে, তারা বিকারগ্রস্ত ব'লে বিশ্বাস করেন তিনি। প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নারী কল্যাণী হয়ে থাকবে গৃহে, প্রেম হবে তাদের জীবনের মূলধন; শুধু বিকৃত নারীরাই প্রতিষ্ঠা পেতে চায় বাইরে। *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে* (১৩৩৬) তিনি লিখেছেন :

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাধারণত কোনো মেয়ের দল বলে না, পুরুষকে সম্পূর্ণ বর্জন করাটাই তাদের জীবনের চরম ও মহোচ্চ লক্ষ্য। সম্প্রতি কোথাও কোথাও কখনো এমন কথার আভাস শোনা যায়, কিন্তু সেটা হল আস্ফালন। প্রাণের রাজ্যে মেয়েদের যে চিরকেলে স্থান আছে সেখানকার বন্দরের নোঙর ছিঁড়ে মনটাকে নিয়ে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, এমন কথা দুই-একজন মেয়ে বলতেও পারে; কারণ যাত্রারম্ভে ভাগ্যদেবতা যখন জীবনের সম্বল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেয় তখন প্যাক করবার সময় কিছু যে উলটোপালটা হয় না, তা নয় (*রর* : ১৯. ৩৮৩)।

নারীমুক্তির কথা, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, কোনো নারী 'প্রকৃতিস্থ' অবস্থায় বলতে পারে না; উন্মাদিনীরাই শুধু বলতে পারে এমন অস্বাভাবিক কথা। নারীমুক্তি হচ্ছে পাগলামো! তিনি পশ্চিমের নারীমুক্তিবাদীদের লক্ষ্য ক'রেই এসব বলেছেন, তাদের ক্রিয়াকলাপকে নিন্দা করেছেন 'আস্ফালন' ব'লে। তিনি চান নারী থাকবে 'প্রাণের রাজ্যে' চিরস্থায়ীভাবে; নারী সন্তান ধারণ ও প্রসব করবে, মনের রাজ্যে তার অধিকার নেই। যদি কোনো নারী মনের রাজ্যে ঢুকতে চায়, বুঝতে হবে তার ভেতরে রয়েছে কোনো গোলমাল। যে-নারী কবিতা লেখে, বিজ্ঞানচর্চা করে সে বিকৃত, প্রকৃতি ভুল ক'রে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা পুরুষকে। যারা বাইরে নারী আর ভেতরে পুরুষ, তারা অবশ্যই বিকৃত। রবীন্দ্রনাথের প্যাকিংতত্ত্ব অনুসারে কৃতী সব নারীই বিকৃত : স্বর্ণকুমারী দেবী, বা বেগম রোকেয়া, মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট্, জর্জ এলিয়ট, মাদাম ক্যুরি বিকৃত, তাঁদের ভেতরে প্রকৃতি ভুল ক'রে বোঝাই করেছে পুরুষের স্বভাব। রবীন্দ্রনাথের এ-মতের সাথে মিল আছে ফ্রয়েডের 'পুংগূঢ়ৈষা'র, যার সারকথা হচ্ছে ব্যর্থ বিকৃত নারীরাই প্রতিষ্ঠা চায় বাইরের জগতে। মেয়েরা মুক্তি চায় কেনো? তার কারণ নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

একদল মেয়ে বলতে শুরু করেছে যে, "মেয়ে হওয়াতে আমাদের অগৌরব, আমাদের ক্ষতি। অর্থাৎ, আমাদের আত্মপ্রকাশের ধাবায় পুরুষের সঙ্গে প্রভেদটাতে পীড়া পাচ্ছি।" এর থেকে বোধ হচ্ছে, *একদিন যে পুরুষ সাধক ছিল এখন সে হয়েছে বণিক* (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর* : ১৯, ৩৯১)।

পুরুষ সম্পর্কে অসাধারণ ভাববাদী ধারণা পোষণ রবীন্দ্রনাথের স্বভাব; যে-পুরুষ সফলভাবে নারীকে গৃহে আটকে রাখতো, সে তাঁর চোখে সাধক; যে-পুরুষ নারীকে আটকে রাখতে পারছে না, সে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চোখে সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ-বণিক। তিনি আরো বলেছেন, 'পুরুষ একদিন ছিল মিষ্টিক, ছিল অতল রসের ডুবারি। এখন হয়েছে মেয়েদের মতোই সংসারী' (ওই, ৩৯২)। পুরুষ বণিক হয়ে পড়েছে, সংসারী হয়ে পড়েছে, তাই নারী ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে, এটা বেশ আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষীয় ব্যাখ্যা। নারীরা কেনো মুক্তি চায়, রবীন্দ্রনাথের এ-রচনা লেখার সময় তা নারীরা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কি নারীবাদীদের কোনো লেখা পড়ার আগ্রহ বোধ করেন নি কখনো?

১৯৩৬-এর অক্টোবরে রবীন্দ্রনাথ নিখিলবঙ্গ-মহিলা কর্মীসম্মিলনে পড়েন 'নারী' (*কালান্তর, রর* : ২৪, ৩৭৭-৩৮৩) প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তিনি নারীদের আমন্ত্রণে. যে-নারীরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মুক্ত বা মুক্তিপিপাসু, বা

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অপ্রকৃতিস্থ', বা ভুলপ্যাককরা। প্রবন্ধটিতে পাই দুই রবীন্দ্রনাথকে : এক রবীন্দ্রনাথ পিতৃতান্ত্রিক, যিনি নারীকে মনে করেন প্রকৃতির অভিপ্রায় বাস্তবায়নের মাংসল যন্ত্র. যার কাজ সন্তানধারণ ও পালন, যে বইছে 'আদিপ্রাণের সহজ প্রবর্তনা' নিজের স্বভাবের মধ্যে; আরেক রবীন্দ্রনাথ, অনেকটা বাধ্য হয়ে, মেনে নেন যে নারীকে বেরিয়ে আসতে হবে বাইরে। যে-নারীরা আর কল্যাণী হয়ে থাকতে চান না, তাঁদের আমন্ত্রণে তাঁদের সম্মেলনে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বলবেন, এমন অরুচিকর স্বভাব ছিলো না তাঁর। তিনি খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন নতুন নারীদের সাথে। এ-প্রবন্ধে নারীবাদবিরোধী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ওপরে দিয়েছি, এখন দেখতে চাই রবীন্দ্রনাথ কতোটা মেনে নিয়েছেন নারীমুক্তিকে। কৃতজ্ঞ বোধ করছি নিখিলবঙ্গ-মহিলা কর্মীদের প্রতি, কেননা তাঁরা নিজেদের সভায় আমন্ত্রণ ক'রে উদ্ধার করেছিলেন পিতৃতান্ত্রিক রবীন্দ্রনাথকে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ না জানালে তাঁর তিরোধান ঘটতো নারীমুক্তিবিরোধী পুরুষতন্ত্রের এক বড়ো পুরোহিত রূপে; আমন্ত্রিত হয়ে রূপান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথ, কাটিয়ে ওঠেন নিজের আযৌবন প্রগতিবিরোধিতা, স্বীকার ক'রে নেন নারীমুক্তিকে, অনেকটা বাধ্য হয়ে। নারীরাই সৃষ্টি করেন এক নতুন রবীন্দ্রনাথকে, যখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর। যে-নারীমুক্তি একদিন তাঁর কাছে ছিলো অপ্রকৃতিস্থ ভুলপ্যাককরা একদল নারীর আস্ফালন, তা এখন তাঁর কাছে হয়ে ওঠে অনিবার্য :

> এ দিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এসিয়াতেও তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে।...বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ছে (ওই, ৩৭৯-৩৮০)।

অনেক কাল তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতিই নারীকে বন্দী করেছে ঘরে, এখন প্রকৃতির সে-অমোঘ নিয়ম হয়ে ওঠে 'আচার-বিচার' অর্থাৎ প্রথা। তাঁর সব বিশ্বাসই বাতিল হয়ে যায় এর ফলে। যে-গৃহ একদা ছিলো তাঁর চোখে নারীর অনিবার্য এলাকা, তা হয়ে ওঠে অতীতের ব্যাপার :

> কালের প্রভাবে মেয়েদেব জীবনের ক্ষেত্র এই-যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই-যে মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ করে বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল (ওই, ৩৮১)।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন মেয়েদের এলাকা 'স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে', 'মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়েছে'; তবে একটু ভুল বুঝেছেন তিনি, কেননা ঘটনাটি এতো স্বতই-ও আপনিই ঘটে নি। এর জন্যে নারীদের লড়াই করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাথেও। যে-রবীন্দ্রনাথ নারীদের বিশেষ বুদ্ধি ও বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি এখন তার আবশ্যক বোধ করেন নারীদের জন্যে; তিনি দেখেন তাঁর 'কল্যাণী'রা বদলে গেছে, বদলে দিচ্ছে পুরুষের সভ্যতাকে :

> ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই-যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে।... একটিমাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে-প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই।...এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে (*ওই*, ৩৮২-৩৮৩)।

তাঁর এতোদিন প্রিয় ছিলো ভুবনের মেয়েকে ভবনের মেয়েরূপে দেখা; বিশ্বাস ছিলো প্রকৃতির বিধান তাই। এক সময় মনে করতেন তিনি মেয়েরা বাইরে এলে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে; এখন তিনি তাদের প্রতিভাকে, যাতে তাঁর বিশ্বাস ছিলো না, কাজে লাগাতে চাইলেন সভ্যতার ভারসাম্য সৃষ্টিতে। নারী পুরুষকে অনুপ্রাণিত ক'রে, নিজের নারীত্বকে সভ্যতায় সংক্রমিত ক'রে পুরুষালি সভ্যতাকে কোমল করবে, বিধান করবে সভ্যতার সামঞ্জস্য, এমন কথা তিনি আগে (১৯১৭) বলেছেন; তবে এখন যে-ভারসাম্যের কথা বলেন তা প্রকৃতিতে ভিন্ন। তবে নারী যে সন্তান জন্ম দেয় আর লালন করে, তা ভোলেন নি তিনি, তাই নারীকে দেন 'সকল লোককে রক্ষার' দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথের মুক্ত নারী হয়ে ওঠে সব মানুষের মা। তাহলে পুরুষ কী করবে? রবীন্দ্রনাথ নারীপুরুষের নতুন সভ্যতার রূপরেখাও আঁকেন :

> সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়।.. সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ (*ওই*, ৩৮৩)।

রবীন্দ্রনাথ নতুন কল্প আশা করেন, যাতে পুরোপুরি অংশ নেবে নারীরা। তবে তিনি যেনো মনে করেন এ-নতুন কল্প সূচনা করেছে পুরুষ, তারা ডাকছে নারীকে, আর নারীদের দায়িত্ব হচ্ছে নিজেদের রক্ষণশীলতা ছেড়ে নতুন কল্প সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করা। অভিযুক্ত করছেন তিনি নারীদেরই, যেনো তারা হৃদয়কে মুক্ত আর, বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করে নি ব'লে, জ্ঞানের তপস্যায় নিষ্ঠা প্রয়োগ করে নি ব'লে বিলম্বিত হয়েছে নতুন কল্প। কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত, পুরুষেরাই-যাদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথও, সর্বশক্তিতে প্রতিরোধ ক'রে এসেছে নতুন কল্পকে। তবু সুখকর হচ্ছে যে পঁচাত্তর বছর বয়সে রূপান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথ, এবং আরো সুখকর হচ্ছে যে নারীরাই রূপান্তরিত করেছিলো তাঁকে।

ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার, ও মনোবিশ্লেষণাত্মক-সমাজবৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়াশীলতা

বিশশতকের এক বড়ো স্থপতির মহিমা পেয়েছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড; অবচেতনার আবিষ্কারকরূপে তাঁর জুটেছে খণ্ডকালীন অমরতা। এ-শতকের মানবিক সমস্ত কিছুর ওপর পড়েছে এ-মনোবিশ্লেষকের প্রভাব, নারীও তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে নি। তাঁর আবিষ্কার মূল্য পেয়েছে নতুন কোনো সৌরলোক আবিষ্কারের থেকেও বেশি, কেননা তিনি উদঘাটন করেছেন মহাজগতের দুর্জ্ঞেয়তম সৌরলোক– মানুষের মন-এর সূত্র! তবে এখন খুব বিরক্তিকর প্রশ্ন জাগছে তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে; বিশশতকের শ্রেষ্ঠ কিংবদন্তি যে-অবচেতনা, তাও আজ বিপন্ন। নারীসম্পর্কে ফ্রয়েডের সমস্ত সিদ্ধান্ত এখন গণ্য হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক ব'লে; শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয়, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলও : একরাশ পিতৃতান্ত্রিক, গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত কুসংস্কার তিনি পেশ করেছিলেন মনোবিশ্লেষণরূপে। ফ্রয়েড যখন উদঘাটন ও প্রকাশ ক'রে চলছিলেন মনের 'অদৃশ্য' সূত্র, শোনাচ্ছিলেন লিবিডো, অহম্, অবচেতনা, ইডিপাস-ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা, শিশ্নাসূয়ার পুরাণ; কামকে ক'রে তুলছিলেন বিশশতকের আল্লা; বিহ্বল হয়ে পড়ছিলো চারদিক। কেউ কেউ বিরোধিতা করেছেন তাঁর : অ্যাডলার, হোরনি, টমসন স'রে এসেছিলেন ফ্রয়েডীয় আঁধার থেকে; তবে ফ্রয়েডীয় আদিম অন্ধকারের পাতালে নেমে-যাওয়া বিশশতক তাঁদের আলোর ডাকে সাড়া দেয় নি। ফ্রয়েডের মানুষধারণাকেই ভুল মনে হয় আজ; পিতৃতন্ত্রের, গোত্রের ও নিজের দুঃস্বপ্ন মানুষ নামে তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়ে। ফ্রয়েডের মানুষ জৈবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, যার মুক্তি নেই প্রবৃত্তির কারাগার থেকে; ফ্রয়েডের মানুষ এমন জীব, যার জন্ম সংঘাত থেকে, যে চালিত প্রবৃত্তি দিয়ে, যাকে ঘিরে আছে স্তরেস্তরে নিরাশা; যে নিরন্তর সংঘাতরত নিজের আর বিশ্বের সাথে। ফ্রয়েডের লিবিডোতত্ত্ব সহজাত প্রবৃত্তির তত্ত্ব; লিবিডো হচ্ছে মানুষের মৌল কামশক্তি; মানুষের বিকাশ ঘটে ওই অন্ধ আদিম কামশক্তির সাথের ভয়াল সংঘাতের মধ্য দিয়ে; এ-সংঘাতের ভেতর দিয়ে বিকশিত হয় মানুষের চরিত্র, বিবেক ও সৃষ্টিশীলতা। ফ্রয়েডের জৈবিক প্রবৃত্তিনিয়ন্ত্রিত কামচালিত মানুষের সমস্ত বাস্তব কাজ তার অবদমিত কামের বহিঃপ্রকাশ। *গীতাঞ্জলি* অবদমিত কামের প্রকাশ, *আপেক্ষিকতত্ত্ব*ও তাই। তাঁর তত্ত্ব যে বিশশতককে সম্মোহিত করতে পেরেছিলো, তার কারণ বাইরে তা নিখুঁতভাবে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু ভেতরে আদিম কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওই তত্ত্বের আপাতজটিলতা, রহস্যময় কাব্যিকতা, প্রতীক ও চিত্রকল্পের ভীতিকরতা মুগ্ধ করেছিলো মানুষকে, যদিও তা সৃষ্টি করেছে মানুষ সম্পর্কে আদিম ও ভুল ধারণা।

হোরনি ছেড়ে দিয়েছিলেন ফ্রয়েডের লিবিডোতত্ত্ব; মানুষকে আদিম প্রবৃত্তির সংঘাতে জর্জরিত জীবরূপে দেখার বদলে তিনি দেখেছিলেন অশেষ সম্ভাবনাময়রূপে। অ্যাডলার বেরিয়ে এসেছিলেন ফ্রয়েডীয় বৃত্ত থেকে; দাবি করেছিলেন যে মানুষ জৈবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নক নয়; কাম প্রধান নিয়ন্ত্রক নয় মানুষের। মানুষ খেলার পুতুল নয় অবচেতন শক্তিরাশির। অবচেতনার থেকে চেতনার মূল্য ছিলো তাঁর কাছে বেশি; কিন্তু বিশশতকের মানুষ বিজ্ঞানের বিস্ময়ের মধ্যে বাস ক'রেও নিজেদের দেখতে পছন্দ করেছে আদিম প্রবৃত্তি ও কামের ক্রীড়নকরূপে। ফ্রয়েডের লিবিডো, অবচেতনা, প্রবৃত্তি সবই খুব সন্দেহজনক ব্যাপার। ফ্রয়েড আধুনিক কালে জন্ম দিয়েছিলেন পালেপালে আদিম মানুষ। ফ্রয়েড বিশ্বাসী ছিলেন অতীতে, অ্যাডলার ভবিষ্যতে; ফ্রয়েড মনে করতেন মানুষের প্রত্যাশা করার কিছু নেই, অ্যাডলার বিশ্বাস করতেন প্রত্যাশা আর সম্ভাবনাই মানুষ। ফ্রয়েড যে-অন্ধকারকে মানুষ নামে উপস্থিত করেছিলেন, তার হাতছানি ছিলো তীব্র; তাতে বিজ্ঞান, আদিমতা, কবিতা, কল্পনা, পুরাণ, কুসংস্কার ছিলো প্রচুর, তাই তাতে সাড়া দিয়েছে মানুষ। ফ্রয়েড বিশশতকের এক বড়ো স্থপতি, এবং পিতৃতন্ত্র, কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতারও এক বড়ো মহাপুরুষ।

ফ্রয়েডের কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মর্মস্পর্শী রূপ ধরা পড়ে তাঁর নারীধারণায় ও নারীবিশ্লেষণে; তাই নারীবাদীরাই প্রথম প্রবলভাবে আক্রমণ করেন তাঁকে। নারীবাদীদের বহুমুখি তীব্র যৌক্তিক আক্রমণে তাঁর জ্যোতিশ্চক্রটি এখন ম্লান। দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ৬৯-৮৩) ফ্রয়েডকে অনেকটা মেনে নিয়ে অনেকখানি প্রতিবাদ করেছিলেন চার দশক আগে, তাঁর অনেক কিছু বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন বিনয়ের সাথে; তবে নবনারীবাদীরা তাঁর মতো বিনয়ী নন : ফ্রাইডান (১৯৬৩, ৯১-১১১) ফ্রয়েডের প্রতিক্রিয়াশীল কুসংস্কারের রূপটি তুলে ধ'রে দেখান তাঁর ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা; আর মিলেট (১৯৬৯, ১৭৬-২২০) প্রচণ্ড আক্রমণ চালান ফ্রয়েড ও উত্তর-ফ্রয়েডীয়দের বিরুদ্ধে। তিনি কোনো কিছুই বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে রাজি নন; এবং বিজ্ঞানের নামে প্রচলিত সমস্ত কুসংস্কারকে ছিন্নভিন্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রধানত মিলেটের মূর্তিভাঙা আক্রমণের ফলেই ফ্রয়েড নারীবাদীদের, এবং অন্যদের কাছেও, হয়ে ওঠেন এক প্রতিক্রিয়াশীল অবৈজ্ঞানিক নাম। মিলেটের আক্রমণ তুলনাহীন ভাষায় ও যুক্তিতে। পরে নারীবাদীদেরই কেউকেউ, যেমন মিশেল (১৯৭৪), কিছুটা ভুল ধরার চেষ্টা করেন মিলেটের; অভিযোগ করেন যে মিলেট কোনোকোনো স্থলে বিশ্বস্তভাবে ফ্রয়েডকে উপস্থাপিত করেন নি। এসব সত্ত্বেও মিলেটের আক্রমণ যথার্থ: ফ্রয়েড যেখানে উদঘাটন করেছেন মানুষ ও নারীর জৈবিক-মানসিক সূত্র, মিলেট সেখানে উদঘাটন করেছেন ফ্রয়েডের সীমাবদ্ধতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সূত্র; এবং দেখিয়েছেন পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব ও ভিক্টোরীয় রক্ষণশীলতাই ফ্রয়েডকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে নারীত্ব সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় সূত্ররাশি। ১৯৩০-১৯৬০ সময়টিতে পশ্চিমে ঘটেছিলো রক্ষণশীলতার প্রত্যাবর্তন; নানা ধরনের রক্ষণশীলতার মধ্যে একটি ছিলো নারীকে আবার নারী ক'রে তোলা, নারীকে আবার চিরন্তনী ক'রে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া। এ-সময় পিতৃতান্ত্রিক

প্রতিক্রিয়াশীলতার বন্যা ধর্ম থেকে আসে নি, এসেছিলো পশ্চিমের ঝকঝকে শাস্ত্রগুলো থেকে : সাহিত্য থেকে, এবং বিজ্ঞান থেকে, বিশেষ ক'রে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব থেকে। বিজ্ঞানের মলাটের ভেতরে এ-সময়ের মহাপুরুষেরা পরিবেশন করেন পুরোনো পৃথক এলাকা ও ভূমিকাতত্ত্ব। মিলেটের (১৯৬৯, ১৭৮) মতে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী সিগমুন্ড ফ্রয়েড, যিনি ছিলেন ওই সময়ের 'লৈঙ্গিক রাজনীতির সবচেয়ে শক্তিমান একক প্রতিবিপ্লবী শক্তি'। নারীসম্পর্কে যতো কুসংস্কার তৈরি করা হয়েছিলো গত কয়েক সহস্রকে, নারীবাদীদের প্রতিবাদে যা হ'টে গিয়েছিলো অনেকখানি, তার সবই এ-সময়ে ফিরে এসেছিলো ফ্রয়েডীয় ছদ্মবেশে। ফ্রয়েডের জনপ্রিয় বাজারি ভাষ্যকারেরা তা ছড়িয়ে দিয়েছিলো দিকে দিকে। এতোদিন যে-নারী ছিলো ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বিকলাঙ্গ আর অধম, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানে সে হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিকভাবে বিকলাঙ্গ ও বিকৃত। ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের কুসংস্কার নারীকে যতোটা শোচনীয় জীবে পরিণত করে, তা করে নি কোনো ধর্মগ্রন্থও। ফ্রয়েড যদিও মেরি বোনাপার্তের কাছে স্বীকার করেছিলেন [দ্র ফ্রাইডান (১৯৬৩, ১০১), মিলেট (১৯৬৯, ১৭৮)] : 'যে-বিশাল প্রশ্নটির উত্তর কখনো দেয়া হয় নি এবং তিরিশ বছর ধ'রে নারী-আত্মা সম্পর্কে গবেষণা ক'রে যার উত্তর আমিও দিতে পারি নি, তা হচ্ছে 'নারী কী চায়?'', তবু নারীমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তৈরি করেছিলেন তিনি এক 'বৈজ্ঞানিক' তত্ত্ব, যার ভিত্তি তাঁর এক ধ্রুববিশ্বাস যে 'দেহই নিয়তি : অ্যানাটমি ইজ ডেসটিনি'। ফ্রয়েডের নারী নিজের বিকলাঙ্গ শরীরের শিকার।

ফ্রয়েড ছিলেন নিপুণ পর্যবেক্ষক; তবে রোগিনীদের সমস্যা বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন ইহুদি পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির বন্দী। তিনি জন্মেছিলেন মধ্য ইউরোপের প্রবল পিতৃতান্ত্রিক ইহুদি পরিবারে; বেড়েছিলেন ওই সমাজে যেখানে নারীপুরুষের এলাকা ও ভূমিকা ছিলো সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন। সেখানে পুরুষেরা প্রতিদিন প্রার্থনায় বিধাতাকে ধন্যবাদ জানাতো : 'তোমাকে ধন্যবাদ, প্রভু, তুমি আমাকে নারী ক'রে সৃষ্টি করো নি ব'লে'; আর নারীরা বিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতো : 'তোমাকে ধন্যবাদ, প্রভু, আমাকে তুমি তোমার অভিলাষ অনুসারে সৃষ্টি করেছো ব'লে।' তাঁদের পরিবারে বাবা ছিলো জিহোভার সমান প্রতাপশালী, মা পতঙ্গের মতো অসহায়। পুরুষাধিপত্য ও নারী-অধীনতা ছিলো ওই পরিবারে ও সমাজে প্রকৃতির শাশ্বত বিধান। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন পুরুষাধিপত্যবাদীরূপে, নারীমুক্তি ছিলো তাঁর কাছে উদ্ভট ব্যাপার। মিলের *নারী-অধীনতা* (১৮৬৯) প'ড়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি; নারী পুরুষের মতো বাইরে বেরিয়ে জীবিকা অর্জন করবে এটা ভাবতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছেন তিনি, এবং উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন যে এতে নষ্ট হয়ে যাবে নারীর নারীত্ব ও রমণীয়তা। তিনি নিজের পরিবারে ছেলেবেলা থেকে পুরুষকে দেখেছেন প্রবল, নারীকে অসহায়, পর্যুদস্ত, দুর্বল; এবং এটা তাঁর কাছে মনে হয়েছে স্বাভাবিক। নারীর যে-স্বভাব ও অবস্থা তিনি দেখেছেন, তা যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাপের ফল হ'তে পারে, এমন বোধ তাঁর মনে জাগে নি কখনো; বরং একে তিনি ভেবেছেন প্রাকৃতিক ও জৈবিক। বিয়ের আগে ফ্রয়েড তাঁর ভাবী স্ত্রী মার্থা বারনেইসকে লিখেছিলেন ন-শোর মতো চিঠি : ওই চিঠিগুলোতে

পাওয়া যায় এক পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষাধিপত্যবাদী ফ্রয়েডকে, যিনি ভাবী স্ত্রীকে করেন 'আমার মিষ্টি মেয়ে', 'প্রিয় ছোট্ট নারী', 'রাজকন্যা, আমার ছোট্ট রাজকন্যা'র মতো সম্বোধন। ওই তরুণীকে তিনি মনে করেছেন বালিকা; বিয়ের পর তাকে মনে করেছেন বালিকাবধু, যার কোনো বিকাশ ঘটা অসম্ভব। একটি চিঠিতে লিখেছেন [দ্র ফ্রাইডান (১৯৬৩, ৯৭-৯৮)] : 'আমি জানি তুমি কতো মিষ্টি, কীভাবে তুমি গৃহকে পরিণত করতে পারো স্বর্গে...যতোটা চাও আমি তোমাকে শাসন করতে দেবো আমাদের গৃহ, আর তুমি আমাকে পুরস্কৃত করবে তোমার মধুর প্রেমে'; আরেক চিঠিতে (৫ ১১ ১৮৮৩) স্টুয়ার্ট মিলের নারীমুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি লেখেন :

> তাঁর সম্পূর্ণ রচনায় এটা কখনো ধরা পড়ে নি যে নারীরা পুরুষের থেকে ভিন্ন–নিকৃষ্ট বলবো না, বলবো বিপরীত।...পুরুষের মতো নারীকেও জীবনসংগ্রামে পাঠাতে হবে, এটা সত্যিই একটা মৃতজাত ভাবনা। যদি আমি আমার মিষ্টি মেয়েকে কল্পনা করি এমন প্রতিযোগীরূপে, তাহলে তাকে আমি শুধু বলতে চাই, যেমন সতেরো মাস আগে বলেছি যে আমি তাকে ভালোবাসি এবং আমি চাই সে নিজেকে ওই সংগ্রাম থেকে গুটিয়ে নিয়ে আশ্রয় নেবে আমার গৃহের শান্ত প্রতিযোগিতাহীন কাজে।..প্রকৃতি নারীর নিয়তি নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে রূপ, মোহনীয়তা, ও মাধুর্যের মধ্য দিয়ে। আইন ও প্রথার নারীকে তার অনেক প্রাপ্য দেয়ার আছে, তবে নারীর নিশ্চিত মর্যাদা হচ্ছে : যৌবনে পূজিত প্রিয়তমা আর বার্ধক্যে প্রিয় পত্নী।

ফ্রয়েড ছিলেন রক্ষণশীল, আদর্শ ভিক্টোরীয়; তিনি সর্বত্র কাম দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু নিজে কামপরায়ণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অনেকটা আইবুড়ো আচারনিষ্ঠ নারীর মতো যে চারদিকে দেখতে পায় শুধু কাম। যে-মার্থাকে বিয়ের আগে ন-শো চিঠি লিখেছিলেন তিনি, বিয়ের পর তাকে আর চিঠি লিখেন নি; বিয়ের পর তাকে ফ্রয়েড দায়িত্ব দেন পত্নীর, যে তাঁর সংসার দেখে আর দেয় ছটি সন্তান। তাঁর সংসারকে মার্থা স্বর্গে পরিণত করতে পারে নি, অবধারিতভাবে সেটি হয়ে ওঠে একটি পিতৃতান্ত্রিক ইহুদি সংসার, যেখানে স্ত্রীর কাজ স্বামীসেবা, প্রসব ও লালনপালন।

ফ্রয়েডের নারীতত্ত্বে প্রতিটি নারীর জীবনী হচ্ছে শিশ্নাসূয়ার ইতিহাস। প্রতিটি নারী ধারাবাহিক শিশ্নাসূয়া [পেনিস এনভি]। লিঙ্গপুজোর ইতিহাসে ফ্রয়েড অতুলনীয়; তাঁর তত্ত্বে শিশ্ন বা (পুং)লিঙ্গই বিধাতা; লিঙ্গের এমন বৈজ্ঞানিক উত্থান কখনো ঘটে নি। লিঙ্গপুজোয় অদ্বিতীয় হিন্দুরা; ফ্রয়েড তাদেরও ওপরে। শিবলিঙ্গপুজোর একটি মন্ত্র আছে : 'পবিত্র শিব, স্বর্গীয় লিঙ্গধারী, স্বর্গীয় মূল, স্বর্গীয় শিশ্ন, প্রভু লিঙ্গ, তোমার জ্যোতির্ময় লিঙ্গ এতো বিশাল যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুও তা পরিমাপ করতে পারে না' [দ্র মাইলস (১৯৮৮, ৩৬)]। প্রাচীন কালে দেবীদের উৎখাত ক'রে দেবতাদের প্রতিষ্ঠার পর (পুং)লিঙ্গের যে-উত্থান ঘটে, তা চরম পরিণতি পায় ফ্রয়েডের তত্ত্বে। ফ্রয়েডের তত্ত্বে নারীর ব্যক্তিত্বের মূলে রয়েছে তার শাশ্বত শিশ্নাসূয়া; নারীর জীবন কাটে পুরুষের লিঙ্গটিকে অবিরাম ঈর্ষা ক'রে। নারী পুরুষের প্রচণ্ড লিঙ্গের ঈর্ষায় পোড়ায় নিজের সমগ্র অস্তিত্ব। নারী সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের পরিণত রূপ উপস্থাপিত হয়েছে 'নারীমনস্তত্ত্ব' বা 'নারীত্ব' (১৯৩৩) নামক বক্তৃতায়। ফ্রয়েড নারীকে স্বায়ত্তশাসিত মানুষ রূপে না দেখে দেখেছেন পুরুষের ঋণাত্মক প্রাণী রূপে; নারী এমন মানুষ, যে পুরুষ নয়; নারী এমন

মানুষ বা পুরুষ, যার কিছু একটা হারিয়ে গেছে। নারী হারিয়ে ফেলেছে তার শিশ্ন; নারী হচ্ছে শিশ্নহীনতা। ফ্রয়েডের মতে নারী যখন আবিষ্কার করে তার লিঙ্গ, দেখতে পায় তার শিশ্ন নেই, তখন সে মুখোমুখি হয় ভয়াবহ বিপর্যয়ের, যা নিয়ন্ত্রণ করে তার ব্যক্তিত্ব ও সারা জীবনকে। ফ্রয়েডের নারীমনস্তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে একটি বিপন্নকর অভিজ্ঞতার ওপর যে তার রয়েছে শিশ্নের বদলে একটি যোনি। নারী তার রন্ধ্রটিকে কী চোখে দেখে? ফ্রয়েড বলেন, বালিকা নিজের যোনিটি দেখেই মনে করে বা বুঝে ফেলে যে ওখানে একটি শিশ্ন থাকার কথা ছিলো; কিন্তু সেটি কেটে ফেলা হয়েছে, তাকে খোজা ক'রে ফেলা হয়েছে। নারী হচ্ছে খোজা পুরুষ, যে নিজের খোজাত্বের যন্ত্রণায় আমরণ ঈর্ষা ক'রে চলে পুরুষের অনন্য অসাধারণ অঙ্গটিকে।

ফ্রয়েড পুরুষনারীর কামবিকাশকে ভাগ করেছেন কয়েকটি স্তরে। শিশুর প্রথম বছরটি তার মনোকামিক বিকাশের *মৌখিক স্তর* , এ-সময় মুখই তার কাম-এলাকা। দ্বিতীয় বছরে শিশু উত্তীর্ণ হয় *পায়ুস্তর*-এ, পায়ুতে বোধ করে কামসুখ। তৃতীয়-চতুর্থ বছরে শিশু পৌঁছে *লিঙ্গস্তর*-এ, ছেলেরা শিশ্নে আর মেয়েরা ভগাঙ্কুরে বোধ করে কামসুখ। ছ-বছরের দিকে শিশুর কামবোধ কিছুটা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন চলে তার *সুপ্তিস্তর* । এরপর কৈশোর আসে তার *জননেন্দ্রিয় স্তর*, যখন আবার জাগে তার কাম। এ-সময়ে সে আকর্ষণ বোধ করে অন্য লিঙ্গের প্রতি; এবং সম্পন্ন হয় তার মনোকামিক বিকাশ। তবে ফ্রয়েডে ছেলে ও মেয়ের মনোকামিক বিকাশ অভিন্ন নয়: লিঙ্গস্তরে এসে তাদের মধ্যে ঘটে ভয়ঙ্কর ভিন্নতা। এ-স্তর থেকেই ফ্রয়েড ছেলেকে পুরুষ আর মেয়েকে বিকলাঙ্গ নারী ভাবতে শুরু করেন; এ-স্তরেই ঠিক হয়ে যায় যে ছেলে হবে পুরুষ আর মেয়ে হবে শিশ্নাসূয়াগ্রস্ত নারী। ফ্রয়েড জানিয়েছেন শিশুরা এ-স্তরেই আবিষ্কার করে তাদের লিঙ্গ, লিপ্ত হয় হস্তমৈথুনে; ছেলেরা শিশ্নের, মেয়েরা ভগাঙ্কুরের সাহায্যে। ফ্রয়েড ছেলের শিশ্ন ও মেয়ের ভগাঙ্কুরের মধ্যে দেখেছেন মহত্ত্ব ও নিকৃষ্টতা; তিনি শিশ্নকে বলেছেন 'ছেলের বহুগুণে উৎকৃষ্ট হাতিয়ার', ভগাঙ্কুরকে বলেছেন 'তার নিকৃষ্ট ভগাঙ্কুর', 'জননেন্দ্রিয়গত ত্রুটি', 'আদি যৌন নিকৃষ্টতা'। ফ্রয়েডের মতে লিঙ্গস্তরে প্রতিটি মেয়ের নিয়তি হচ্ছে একটি 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের' মুখোমুখি হওয়া; সে আবিষ্কার করে যে ছেলেদের রয়েছে একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য বৃহৎ শিশ্ন, এবং সাথেসাথে বুঝে ফেলে যে ওটা তার নিজের তুচ্ছ ভগাঙ্কুরের থেকে কতো উৎকৃষ্ট! এ-মহৎ আবিষ্কারের পর তার আর কোনো ক্ষমা নেই; ফ্রয়েড বলেন, 'সে-মুহূর্ত থেকেই চিরকালের জন্যে সে আক্রান্ত হয় শিশ্নাসূয়ায়'! বালিকা মনে করে তার শিশ্নটি কেটে ফেলে খোজা ক'রে ফেলা হয়েছে তাকে, সে বইছে একটি ঘা; আর ওই ঘাটি শুধু শারীরিক নয়, মানসিক। এর ফলে জন্মে তার চিরজীবী হীনমন্যতাবোধ– *হীনমন্যতা গূঢ়ৈষা* । ফ্রয়েডের বর্ণনা ও সিদ্ধান্ত খুবই মন্ময়, যা যুক্তিতে টেকে না। ছেলেমেয়েরা শিশুকালে পরস্পরের লিঙ্গ দেখে, তবে বালিকার পক্ষে বালকের শিশ্ন দেখা কেনো হবে এতো গুরুত্বপূর্ণ? কেনো বালিকা বালকের 'বৃহৎ' শিশ্নটিকে মনে করবে উৎকৃষ্ট? বড়ো হ'লেই হয় উৎকৃষ্ট? তার কাছে বালকের ঝুলন্ত মাংসটুকরোটিকে মনে হ'তে পারে হাস্যকর, নিজের প্রত্যঙ্গটিকে স্বাভাবিক। বালিকা কেনো নিজের প্রত্যঙ্গটি দেখেই মনে ক'রে ফেলবে ওটি বিকল,

বালকেরটিকে মনে করবে উৎকৃষ্ট, এবং সাথেসাথে আক্রান্ত হবে চিরশিশ্নাসূয়ায়? বালিকাদের অভিজ্ঞতা জানায় যে ফ্রয়েডীয় ওই সব অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তারা বালকদের শিশ্ন দেখে ঈর্ষায় কাতর হয়ে ওঠে না।

ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনেকখানি দাঁড়িয়ে আছে বালিকার 'অতি গুরুত্বপূর্ণ' আবিষ্কারের ওপর যে তার শিশ্ন নেই। ফ্রয়েড একে উপস্থাপিত করেছেন ভয়াবহভাবে, তাঁর বর্ণনা শিউরে দিতে পারে যে-কাউকে; মিলেট একে বলেছেন বাইবেলি স্বর্গচ্যুতির পুনরাভিনয়। তবে পৌরাণিক বিধাতা স্বর্গচ্যুত করেছিলেন দুজনকেই; কিন্তু বিশশতকের মনোবিজ্ঞানের বিধাতা স্বর্গচ্যুতি ঘটান শুধু ইভের। ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন, এবং আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন যে বালিকা তার ভগাঙ্কুরকে মনে করে শিশ্ন। কেনো বালিকা তার ওই শিউলিবোঁটাটিকে শিশ্ন মনে করে? ফ্রয়েড বলেন, বালিকা হস্তমৈথুন করে ওটি দিয়ে, তাই ওটিকে সে মনে করে শিশ্ন। যেনো ওই কাজটির জন্যে রয়েছে এক আদর্শ হাতিয়ার, যার নাম শিশ্ন; তাই যা দিয়েই করা হবে ওই কাজটি, তাকেই মনে করতে হবে শিশ্ন, বা নকল শিশ্ন, যা প্লাতোর দর্শন অনুসারে বাস্তবতা থেকে দ্বিগুণ দূরবর্তী, এবং ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানে নিকৃষ্ট! তিনি আরো বলেন, বালিকা ওটি দিয়ে হস্তমৈথুন করতে গিয়েই বুঝে ফেলে যে এ-কাজের জন্যে শ্রেষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে শিশ্ন। ফ্রয়েডের বালিকা তাঁর মতোই জ্ঞানী, সে নিজের ভগাঙ্কুর ছুঁয়েই সব বুঝে ফেলে; তুলনা ক'রে ফেলে শিশ্ন ও ভগাঙ্কুরের মধ্যে, এবং পৌঁছে যায় নিজের নিয়তিতে। এসব কি বালিকার ভাবনা, বালিকার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত? পুরুষতান্ত্রিক ফ্রয়েডই বালিকা হয়ে মনে করছেন এসব, নিজের ভাবনাকে তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন বালিকার ওপর। মেয়েশিশু যখন প্রথম দেখে কোনো ছেলেশিশুর শিশ্ন, তখনই সে কীভাবে বোঝে যে ওই সম্ভ্রান্ত প্রত্যঙ্গটি দিয়ে হস্তমৈথুন করে ছেলেশিশুটি? ধরা যাক কোনো মেয়েশিশু জীবনে প্রথম শিশ্ন দেখে এমন এক ফ্রয়েডীয় বালকের, যখন সে লিপ্ত ছিলো হস্তমৈথুনে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সে কী ক'রে বোঝে যে ওইটিই সর্বোত্তম এ-ক্রিয়ার জন্যে? ফ্রয়েড নিজেব সিদ্ধান্ত বালিকার ওপর চাপিয়ে দিয়ে তৈরি করেছেন এমন কিংবদন্তি, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হস্তমৈথুনের উৎকর্ষই যদি মানদণ্ড হয় শ্রেষ্ঠত্বের, তবে স্বীকার করতেই হবে যে শিশ্নের থেকে ভগাঙ্কুর অনেক উৎকৃষ্ট! এর স্পর্শকাতরতা, বৈদ্যুতিক পুলকের প্রতিভা নেই পুরুষের কোনো প্রত্যঙ্গের। ফ্রয়েডের বিশ্বাসে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, নারী নিকৃষ্ট; এবং পুরুষকে, শুধু পুরুষকে নয় পুরুষের সভ্যতাকে, তিনি সংহত করেছিলেন একটি প্রতীকে: প্রতীকটি হচ্ছে শিশ্ন। ফ্রয়েডীয় বিশ্বে শিশ্নই বিধাতা; তাই তাঁর চোখে শিশ্নের পাশে ভগাঙ্কুর শোচনীয়ভাবে নিকৃষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারী জৈবিকভাবেই নিকৃষ্ট পুরুষের থেকে। ক্লারা টম্পসন বলেছেন, 'ফ্রয়েড নারী সম্পর্কে ভিক্টোরীয় মানসিকতা থেকে কখনোই মুক্তি পান নি। তাঁর সমগ্র চিন্তার দুটি মূল ভাবনা, খোজা গূঢ়ৈষা ও শিশ্নাসূয়া, প্রস্তাব করা হয়েছে এ-ধারণা থেকে যে নারী জৈবিকভাবে পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট' [দ্র ফ্রাইডান (১৯৬৩, ১০২)]। নারী কি সত্যিই ঈর্ষা করে পুরুষের প্রত্যঙ্গটিকে, নাকি কি ঈর্ষা করে ওই প্রত্যঙ্গধারীদের? শিশ্নাসূয়ার পেছনে যে কোনো

জৈবিক কারণ নেই, রয়েছে সামাজিক কারণ, এটা ফ্রয়েড উপেক্ষা করেছেন পুরোপুরি। তাঁর পরিভাষাটি খুবই আপত্তিকর; এটি নারীকে চিহ্নিত করে পুরুষের একটি নির্বোধ প্রত্যঙ্গের অসূয়ায় জর্জরিত জীব ব'লে, গোপন ক'রে যায় নারীর দ্রোহকে।

শিশ্নাসূয়ার সাথে শিশুনারীকে, ফ্রয়েডের মতে, ধরে আরেকটি রোগে; তার নাম *খোজাগূঢ়ৈষা*। ছেলেকেও ধরে এ-ব্যাধিতে; ফ্রয়েড বলেন, সে যখন দেখতে পায় মেয়েদের নেই তার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ, তখন তাকে পায় খোজা হয়ে যাওয়ার ভয়ে। সে মনে করে কোনো কুকর্মের শাস্তি হিশেবে কেটে নেয়া হয়েছে মেয়েদের শিশ্ন; এবং তখন সে ভয় পেতে থাকে যে তার শিশ্নটিকেও কেটে ফেলে হয়তো খোজা ক'রে দেয়া হবে তাকে। তার ভয়ের কারণ সে বাবাকে হটিয়ে, ইডিপাসের মতো, কামনা করছে মাকে। সে কিছুকাল থাকে উদ্বেগ আর ভয়ের মধ্যে; কিন্তু একদিন সে অর্জন করে পৌরুষ, নিজেকে অভিন্ন মনে করে পিতার সাথে; কেটে যায় তার রোগ। মেয়ের বেলা তা ঘটে না, তা হয়ে থাকে দুরারোগ্য জন্মব্যাধি। মেয়ে যখন দেখে তার নেই শিশ্ন, সে বুঝে ফেলে তাকে খোজা ক'রে দেয়া হয়েছে; সে ভুগতে থাকে ঈর্ষায় ও হীনমন্যতায়। যখন সে দেখে তার মতো অন্য মেয়েদের, তার মায়েরও, নেই শিশ্ন, সে তখন ঘেন্না করতে শুরু করে নারীজাতিকেই। ফ্রয়েড (১৯৩৩, ১৬০-১৬১) বলেছেন :

> দু-লিঙ্গের শারীরিক পার্থক্য ছাপ ফেলে মানসিক জীবনের ওপর। বিশ্লেষণ থেকে এটা আবিষ্কার করা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলো যে মেয়ে নিজের শিশ্নের অভাবের জন্যে দায়ী করে তার মাকে; আর এ-অভাবের জন্যে তাকে কোনোদিন ক্ষমা করে না।...মেয়েদের বেলাও খোজা গূঢ়ৈষা দেখা দেয় অন্য লিঙ্গের জননেন্দ্রিয় দেখার পর। সে তৎক্ষণাৎ পার্থক্যটা লক্ষ্য করে, এবং বুঝতে পারে, স্বীকার করতেই হবে, এর তাৎপর্য। সে বোধ করে মারাত্মক অসুবিধা, এবং মাঝেমাঝেই ঘোষণা করে সেও 'চায় ওরকম একটা কিছু'; এবং হয়ে পড়ে *শিশ্নাসূয়াগ্রস্ত*, যা তার বিকাশ ও চরিত্রগঠনের ওপর অমোচনীয় ছাপ ফেলে যায়, যা অশেষ মানসিক শক্তি ছাড়া জয় করা যায় না। বালিকা বুঝতে পারে তার শিশ্ন নেই, এর অর্থ এ নয় যে এর অভাবকে সে মেনে নেয় হাল্কাভাবে। ঘটে এর বিপরীত, সে দীর্ঘকাল ধ'রে থাকে অমন একটা কিছু পাওয়ার বাসনায়; এবং এর সম্ভবপরতায় বিশ্বাস করে বহু বছর; এমনকি যখন তার বাস্তবতাবোধ তাকে বাধ্য করে ওই বাসনা ত্যাগ করতে, কেননা তা চরিতার্থ করা অসম্ভব, বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে তখনো তা বিরাজ করে তার অবচেতনায়, এবং ধারণ করে বেশপরিমাণ শক্তি। শিশ্ন লাভের যে-বাসনা এতো বেশি সে পোষণ করে, তাই হয়তো প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মনোবিশ্লেষণে আসার পেছনে থাকে; এবং মনোবিশ্লেষণ থেকে তারা যুক্তিসঙ্গতভাবেই যা প্রত্যাশা করে, যেমন কোনো মননশীল কর্মজীবন চালানো, তাকেও অনেক সময় মনে করা যায় এ-অবদমিত বাসনার উৎকর্ষিত রূপ ব'লে।

অর্থাৎ শিশ্নের ঈর্ষায় ও খোজা মনোভাবের জন্যে চিরকালের জন্যে বিকৃত হয়ে যায় নারী।

শিশ্নাসূয়া ও খোজাগূঢ়ৈষার কুফল ফলে আরো; জীবনের শুরুতে মেয়েশিশু মাকে নেয় নিজের প্রেমাস্পদরূপে, কিন্তু এ-স্তরে এসে সে ত্যাগ করে মাকে। ফ্রয়েড বলেন, সে ছেড়ে দেয় মাকে গর্ভবতী করার বাসনা! মাকে সে বর্জন করে, কেননা মা-ই 'দায়ী তার শিশ্নহীনতার জন্যে'; মা-ই 'তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে এমন অপ্রস্তুতভাবে'।

ফ্রয়েড বলেন, 'নিজের খোজাত্ব আবিষ্কার তার জীবনের এক মোড়-বিন্দু'; এ-সময় থেকে মা ও সব নারীর মূল্য ক'মে যায় তার চোখে, যে-শিশ্নহীনতার কারণে পুরুষের চোখেও নারীর মূল্য কম। এ-সময়ে তার লিবিডো ছোটে পিতার দিকে, কেননা তার আছে একটি শিশ্ন। পিতা হয়ে ওঠে তার প্রেমাস্পদ, মাকে সে দেখতে থাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। শিশুমেয়ে, ফ্রয়েড বলেন, মনে করে যে তার পিতা খুব উদার হয়ে তাকে উপহার দেবে একটি শিশ্ন। কিন্তু হতাশ হ'তে তার দেরি হয় না; তখন সে নিজের কামনা পূরণ করতে চায় গর্ভে সন্তান ধারণ করে। তবে ওই সন্তান শিশ্নের বিকল্প, শিশু নয় ওটি এক 'শিশ্নশিশু'। ফ্রয়েড বলেন, নারীর শিশ্নকামনা কখনো কাটে না, কেননা 'শিশ্নকামনাই হচ্ছে একান্ত নারীর কামনা'। নারী শিশু চায়, কিন্তু কেনো চায়? নারী শিশুর জন্যে শিশু চায় না; ফ্রয়েড বলেন, নারী শিশু চায়, কেননা ওই শিশু ছাড়া শিশ্নের কাছাকাছি আর কিছু পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব! নারী শিশ্নাতুর, শিশ্ন ছাড়া আর কিছু নারী চায় না; না পেয়ে সে চায় শিশু; তাই নারীর প্রেমাস্পদ হয়ে ওঠে শিশু। পুরুষ ঠিকমতো বেড়ে নারীকে ভালোবাসতে শেখে, তবে নারী পুরুষকে ভালোবাসতে শেখে না; শেখে শিশুকে ভালোবাসতে, কেননা শিশুর মধ্যেই পায় সে তার হারানো শিশ্নকে। নারীর শিশ্নকামনা একদিন চরম চরিতার্থতা লাভ করে ফ্রয়েডের (১৯৩৩, ১৬৫) মতে এভাবে :

> তার সুখ হয় সত্যিই অসামান্য যেদিন চরিতার্থ হয় তার শিশুলাভের বাসনা; এ-সুখ আরো বিশেষ হয়ে ওঠে যদি শিশুটি হয় ছেলে, যে তার জন্যে নিয়ে আসে বহুকামনার শিশ্নটি।

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে নারীর সন্তানকামনাও হয়ে ওঠে শিশ্নের জন্যে অনন্ত মৃগয়া। নারীর সন্তান কামনাকে ফ্রয়েড চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন শিশ্নকামনার সাথে; এবং নারীকে উৎখাত ক'রে দিয়েছেন তার কীর্তিত আসন থেকেও। নারীর সন্তান কামনাও জৈবিক নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক; পিতৃতন্ত্র নারীকে দেখতে চায় জননীরূপে, তাই নারী মা হয়ে পিতৃতন্ত্রের কাছে হ'তে চায় গ্রহণযোগ্য। পুত্রের শিশ্নটির প্রতি তার নেই কোনো আকর্ষণ; তার আকর্ষণ পুত্রের প্রতি, কেননা পিতৃতন্ত্রের মধ্যে টিকে থাকার জন্যে তার দরকার এমন একজন যে হবে পিতৃতন্ত্রের সদস্য।

বালক তার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গটি নিজে নিজে ব্যবহার ক'রে সুখ পায়, এটা ফ্রয়েড অনুমোদন করেন; কিন্তু বালিকা তার নিকৃষ্ট অঙ্কুরটি নেড়ে সুখ আহরণ করবে, ফ্রয়েড তা অনুমোদন করেন না। কেননা তাঁর কাছে হস্তমৈথুন একটি একান্ত পুরুষি কাজ। বালিকাকে নারী হয়ে উঠতে হবে; তাই তাকে বন্ধ করতে হবে পুরুষি কাজটি, নইলে নষ্ট হবে তার নারীত্ব। পরিপূর্ণ নারীত্ব অর্জনের জন্যে এটা দরকার। বালিকা যখন নিজের খোজাত্ব উপলব্ধি করে মর্মেমর্মে, তখন তার মানসিক অবস্থা কেমন হয়? ফ্রয়েড বলেন [দ্র মিলেট (১৯৬৯, ১৮৬)] :

> সে মেনে নেয় তার খোজাত্বের সত্য, এবং এর পরিণতিরূপে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজের নিকৃষ্টতা, তবে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এ-অপ্রিয় সত্যের বিরুদ্ধে।

তখন নারীর শরীরের ভেতর শুরু হয়ে যায় গৃহযুদ্ধ; এ-যুদ্ধে স্বাভাবিক নারীরা জীবনের পূর্ণতা লাভ করে মাতৃত্বে, কেননা জৈবিকভাবে এরই জন্যে তৈরি করা হয়েছে তাদের। বিকৃত নারীরা যায় ভুল পথে, তারা যায় সে-দিকে জৈবিকভাবে তারা যার অনপুযুক্ত। তারা বিকৃতির শিকার। ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন *পুংগূঢ়ৈষা*। যে-নারীরা মাতৃত্ব ছাড়া অন্য কোনো কাজে সাফল্য পেতে চায়, ফ্রয়েডের চোখে তারা ব্যাধিগ্রস্ত; তারা আক্রান্ত পুংগূঢ়ৈষায়। তারা সন্তানের মধ্য দিয়ে পেতে চায় না কাম্য শিশ্নটিকে, শিশ্ন পেতে চায় তারা অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, রাজনীতিক হয়ে বিভিন্ন পদের মধ্য দিয়ে। তারা ব্যাধিগ্রস্ত, তাই তাদের চিকিৎসা দরকার 'মনোবিকলনগ্রস্ত'রূপে! ফ্রয়েডের মতে এরা অবিকশিত, 'নাবালেগ' নারী। নারী যদি তার ভাগ্যকে, নিকৃষ্টতাকে, মেনে নেয়, তাহলে সে একধরনের তৃপ্তি পেতে পারে মাতৃত্বে; কিন্তু উদ্ধত-অবাধ্য নারীরা নিজেদের ব্যাধির জন্যেই ঢুকতে চায় পুরুষের এলাকায়। এমন নারী দেখলেই বুঝতে হবে সে পুংগূঢ়ৈষাগ্রস্ত বা *পুরুষালি প্রতিবাদের* শিকার। ফ্রয়েড ও ফ্রয়েডীয়দের মতে এদের চিকিৎসা দরকার। ফ্রয়েড বিজ্ঞানের নামে যা চালিয়েছেন, তার সবটাই কুসংস্কার : তিনি প্রথাকে ভেবেছেন সহজাত, পুরুষাধিপত্যকে মনে করেছেন প্রাকৃতিক। শিশ্নাসূয়াকে তিনি মনে করেছেন জৈবিক, যদিও তা আসলে সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া। ভিক্টোরীয় সমাজব্যবস্থায় পুরুষ ছিলো দেবতার মতো, তাই নারীর পক্ষে পুরুষকে ঈর্ষা করা ছিলো স্বাভাবিক। ওই নারীরা শিশ্নকে ঈর্ষা করতো না, বা এখনো করে না, কিন্তু তারা দেখে একটি শিশ্ন কতো সুযোগ এনে দিতে পারে। তাই তারা ঈর্ষা করে, তবে শিশ্নকে নয়, করে শিশ্নধারীদের। ফ্রয়েড নারীকে পুরুষের সাথে জড়িত দেখেছেন শুধু কামসম্পর্কে, মুছে ফেলেছেন আর সব সম্পর্ক। তাঁর সময় সমাজ নারীকে কোনো সুযোগই দিতো না, এখনো সমাজ নারীকে দেয় না তার প্রাপ্য সুযোগ; সমাজ রোধ করে তার সমস্ত সম্ভাবনা। তাই নারীর পক্ষে পুরুষকে ঈর্ষা করা খুবই স্বাভাবিক, এটা কোনো ব্যাধি নয়, বরং সুস্থতা; কিন্তু ফ্রয়েড নারীর এ-সুস্থ মানবিক ব্যাপারটিকেই নির্দেশ করেছেন রোগ হিশেবে। ফ্রয়েড তাঁর নারী রোগীদের সমস্যাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু সেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন শিশ্নাসূয়া নামে। তিনি দেখেছেন নারী অর্জন করতে চায় পুরুষের সাফল্য, বা মানবিক সাফল্য; একে যখন তিনি বাতিল ক'রে দিয়েছেন শিশ্নাসূয়া নামে, তখন তিনি বিজ্ঞানচর্চা করেন নি, প্রকাশ করেছেন নিজের কুসংস্কার। তাঁর কুসংস্কারটি হচ্ছে যে নারী কখনো পুরুষের সমান হবে না, যেমন নারী পাবে না একটি মহামান্য শিশ্ন। ফ্রয়েড সমাজপরিবর্তনে উৎসাহী ছিলেন না, তিনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজসংস্কৃতির চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেছেন : নারীপুরুষকে খাপখাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন তিনি ওই পীড়াদায়ক সমাজের সাথে। ফ্রয়েড মানুষের মনোলোকের বৈজ্ঞানিক সূত্র লেখেন নি, তিনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাহ্যিক সূত্রগলোকে মনোবিজ্ঞানের হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন মানুষের মনের সাথে।

ফ্রয়েডের চমৎকার উপাত্ত ও তার শোচনীয় ভাষ্য দেখে খুব দুঃখ হয়; এমন চমৎকার উপাত্তের এমন অপব্যবহার বেশি হয় নি বিজ্ঞানের ইতিহাসে। পিতৃতান্ত্রিক

পুরুষাধিপত্যবাদী সমাজ নারীর সমস্ত সম্ভাবনা রোধ ক'রে নারীকে কতোটা অসুস্থ ক'রে তুলতে পারে, তা উদঘাটন করা সম্ভব ওই উপাত্ত থেকে; কিন্তু তিনি সেদিকে না গিয়ে গেছেন ভুল পথে। তিনি নারীর অবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন অবধারিত জৈবিক সূত্ররূপে, যা সম্পূর্ণ ভুল। যে-অপরাধ সমাজের, তাকে তিনি কুৎসিত শিশ্নাসূয়া নামে চাপিয়ে দিয়েছেন নারীর ওপর। শিশ্নাসূয়া হচ্ছে পুরুষ-অসূয়া, যা অবধারিত বিশেষ সামাজিক পরিবেশে। পৃথিবী জুড়ে মেয়েশিশুরা ভাইয়ের শিশ্ন দেখার আগেই দেখে যে পৃথিবীটা পুরুষের। তারা দেখে সব দিকে পুরুষের আধিপত্য; পরিবার তাদের শেখায় পুরুষ প্রধান, ধর্ম শেখায় পুরুষ প্রধান, সমাজ শেখায় পুরুষ প্রধান, বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয়, প্রচার মাধ্যম শেখায় পুরুষ প্রধান। সমাজরাষ্ট্রের প্রতিটি সংস্থা পুরুষের প্রাধান্য প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের সংস্থা। ওই প্রধান্যকে একটি শিশ্নে সংহত করা মেয়েদের কাজ নয়, ফ্রয়েডের কাজ। নারীরা শিশ্নটিকে ঈর্ষা করে না, একটি শিশ্ন কী দিতে পারে তাকে ঈর্ষা করে। পুরুষকে তারা শিশ্ন ব'লেও ভাবে না, ভাবে পুরুষ ব'লে, যারা অধিকার ক'রে আছে পৃথিবী। মিলেট (১৯৬৯, ১৮৭) বলেছেন, 'ফ্রয়েড প্রধান ও নির্বোধ গোলমাল করেছেন শরীর ও সংস্কৃতি, অঙ্গসংস্থান ও মর্যাদার মধ্যে।' ফ্রয়েড বিরোধী ছিলেন নারীবাদের, নারীপ্রসঙ্গে তিনি বারবার নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে কটাক্ষ করেছেন; পৃথিবীকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন নারীমুক্তিরোগ থেকে। সাফল্য অর্জনের জন্যে, ফ্রয়েডের বিশ্বাস, থাকতে হবে একটি ঝুলন্ত প্রত্যঙ্গ; রন্ধ্র থাকলে চলবে না! তাঁর বিশ্বাস মেধা আর শিশ্নের মধ্যে রয়েছে জৈবিক সম্পর্ক; পুরুষের মেধাগত শ্রেষ্ঠতার জৈবিক প্রকাশ হচ্ছে শিশ্ন। ফ্রয়েড পুরুষতন্ত্রকে দেখেছেন শিশ্নরূপে, এমনকি মস্তিষ্কের থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন ওই প্রত্যঙ্গটিকে; এবং মনোবিজ্ঞানের মুখোশে প্রকাশ করেছেন কুসংস্কার।

ফ্রয়েড নারীর দুটি একান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন : সে-দুটি হচ্ছে লজ্জা ও ঈর্ষা। তিনি দাবি করেছেন এ-দুটির মূলেও রয়েছে শিশ্নাসূয়া। নারীর লজ্জাশীলতার প্রশংসায় পিতৃতন্ত্র পাগল, কিন্তু ফ্রয়েড জানিয়েছেন নারীদের লাজনম্রতার কারণ তাদের খোজাত্ববোধ, নিজেদের বিকলাঙ্গচেতনা। ফ্রয়েড (১৯৩৩, ১৭০) বলেন :

> লজ্জাশীলতা, যাকে মনে করা হয় নারীর একান্ত ভূষণ, তাও আসলে, আমাদের মতে, নারী শুরু করেছিলো নিজের যৌনাঙ্গের ত্রুটি ঢাকার জন্যে।

নারী লজ্জায় ম'রে যায় একথা ভেবে যে তার রয়েছে রন্ধ্র, তার শিশ্ন নেই। ফ্রয়েড মনে করেন জৈবিক কারণেই নারী কোনো কিছু দান করতে পারে নি সভ্যতায়, তার সে-শক্তি নেই; তবে নারীকে তিনি সভ্যতার দুটি আবিষ্কারের গৌরব দিয়েছেন। তাঁর মতে, নারীরাই আবিষ্কার করেছিলো কাপড় বোনা আর বেণীপাকানো। কেনো? তার ক্ষতের লজ্জা ঢাকতে! তাঁর মতে, নারী যৌনকেশ দিয়ে রন্ধ্রটিকে ঢাকতে গিয়েই আবিষ্কার করেছিলো বেণীপাকানো! নারী তার রূপের গর্বেও বিভোর থাকে; এর মূলেও আছে, ফ্রয়েডের মতে, তার যৌনাঙ্গের নিকৃষ্টতা; এ দিয়ে নারী পূরণ করে তার শিশ্ন না থাকার ঘাটতি! নারীর ঈর্ষা পুরুষতন্ত্রের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তি আর দুর্মরতম

কুসংস্কারগুলোর একটি। তাঁর মতে এর জন্ম শিশ্নাসূয়া থেকে। নারীর সহজাত নিকৃষ্টতা থেকে জন্ম নেয়া শিশ্নাসূয়ার ফলে, ফ্রয়েড বলেন, নারীর পরাসত্তা– *সুপার ইগো*– পুরুষের মতো সম্পূর্ণ বিকশিত হয় না, তাই নারীর বিবেক, ন্যায়-অন্যায় ও আদর্শবোধ, সমাজচেতনা খুবই কম। ফ্রয়েড বলেন : 'নারীর ন্যায়-অন্যায় বোধ খুবই কম; নিঃসন্দেহে এর সম্পর্ক রয়েছে নারীর মানসিক জীবনে ঈর্ষার প্রাধান্যের সাথে।' এ-কারণেই নারীর নেই সমাজচেতনা, এবং তাদের প্রবৃত্তি লাভ করে না উৎকর্ষ। ফ্রয়েডের এসব হচ্ছে বিজ্ঞানের নামে পুরুষের প্রাধান্য স্থায়ী করার সচেতন ও অবচেতন চক্রান্ত। নারীকে ঈর্ষাকাতর বলার অর্থ হচ্ছে শোষিতরা সবাই ঈর্ষাকাতর; ধনীদের সুখ দেখে গরিবদের চোখ জ্বলে ব'লেই তো গরিবেরা ঈর্ষাকাতর, এবং তাদের নেই বিবেক, ন্যায়-অন্যায় ও আদর্শবোধ আর সমাজের প্রতি দায়িত্ব! ফ্রয়েড বিজ্ঞানের নামে শুধু পুরুষতন্ত্রকেই রক্ষা করতে চেষ্টা করেন নি, টিকিয়ে রাখতে চেয়েছেন সব ধরনের শোষণতন্ত্রকেই।

ফ্রয়েডের ধ্রুববিশ্বাস নারীচরিত্রের, শিশ্নাসূয়া ও অন্যান্য রোগের, শেকড়ে রয়েছে তার বিকলাঙ্গ দেহ। তিনি ভুল বুঝেছিলেন প্রায় সবটাই। নারীমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ফ্রয়েডের ভ্রান্তির বড়ো কারণ হচ্ছে তিনি বোঝেন নি বা বুঝতে চান নি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপারের ভিন্নতা : তিনি বোঝেন নি যে নারীর শরীর আর অবস্থার মধ্যে কোনো জৈবিক সম্পর্ক নেই। তিনি, অনেকের মতোই, মনে করেছেন যে নারীর সামাজিক অবস্থা নারীর শরীরের মতো প্রকৃতিরই সৃষ্টি; নারী রয়েছে যে-অবস্থায়, তা-ই নারীর অবধারিত নিয়তি। নারীর অবস্থা যে সামাজের তৈরি, নারী যে শিকার সমাজের, তা তিনি বোঝে নি, কেননা সে-মানসিকতা তাঁর ছিলো না; তিনি বিশ্বাস করেছেন পুরুষ নারীকে যা করেছে, প্রকৃতি নারীকে করতে চেযেছে তাই। পুরুষ কাজ করেছে শাশ্বত প্রকৃতির বিশ্বস্ত প্রতিনিধিরূপে।

ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানে পুরুষ সক্রিয়তা, আর নারী অক্রিয়তা। পুরুষের সক্রিয়তা আর নারীর অক্রিয়তা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন এমন ব্যাপার ভিত্তি ক'রে, যার ভিত্তি খুবই দুর্বল। তিনি প্রমাণ হিশেবে নিয়েছেন তাঁর সমকালের নারীপুরুষের যৌন আচরণ, এবং শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর ক্রিয়াকলাপ। তিনি দেখেছেন পুরুষ নারীকে তাড়া ক'রে ফেরে, আর সঙ্গমে নারী থাকে মাটির মতো অক্রিয় আর পুরুষ থাকে বৃষের মতো সক্রিয়, এবং এরই মাঝে প্রমাণ পেয়েছেন নারীপুরুষের জৈবিক স্বভাবের। এটা যে জৈবিক নয়, সামাজিক তা বোঝেন নি তিনি; পিতৃতন্ত্র পুরুষকে শিখিয়েছে সক্রিয়, আর নারীকে অক্রিয় হ'তে; নারীপুরুষ অভিনয় ক'রে যাচ্ছে নির্দেশিত ভূমিকায়। এর কিছুই জৈবিক নয়; অনুমোদন পেলে নারীও হ'তে পারে চরম সক্রিয়। সামাজিক আচরণ পেরিয়ে ঢুকেছেন তিনি আরো ভেতরে, এবং বিশ্বাস করেছেন যে প্রবিষ্টকরণের কাজটি আর শুক্রাণুর চরিত্র সক্রিয়, আর যোনি ও ডিম্বাণুর আচরণ অক্রিয়। ফ্রয়েড (১৯৩৩, ১৪৭) বলেন :

> পুরুষের শুক্রাণু সক্রিয় ও চলমান; এটা খুঁজে বের ক'রে নারীর অণুকে, আর ডিম্বাণু অচল এবং অপেক্ষা ক'রে থাকে অক্রিয়ভাবে। কামের অণুজীবরাশির আচরণ সঙ্গমে নারীপুরুষের আচরণের

> কমবেশি আদর্শ। পুরুষ সঙ্গমের জন্যে নারীকে প্ররোচিত করে, আবদ্ধ করে এবং ঠেলে নারীর ভেতরে নিজের পথ ক'রে নেয়।

ফ্রয়েড বেশ বাড়িয়ে বলেছেন শুক্রাণুর সক্রিয়তার কথা, এবং তিনি পুরোপুরি অক্রিয় ক'রে দিয়েছেন ডিম্বাণুকে, যদিও তা ঠিক নয়। ডিম্বাণুও পালন করে বেশ সক্রিয় ভূমিকা। ডিম্বাণু ফেলোপীয় নালি দিয়ে বেরিয়ে আসে, শুক্রাণুকে আবদ্ধ করে সক্রিয়ভাবে। তবে এ-অণুজীবরাশির আচরণকে আদর্শ কাঠামো হিশেবে ধ'রে সমাজকাঠামো ব্যাখ্যা পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক কাজ। পুরুষের তথাকথিত সক্রিয়তা আর নারীর অক্রিয়তার কোনো জৈবিক ভিত্তি নেই, রয়েছে সামাজিক ভিত্তি; পিতৃতান্ত্রিক সমাজই অনুশাসনের মাধ্যমে তাদের চরিত্রকে দিয়েছে এমন রূপ। তবে ফ্রয়েড মনে করেন সক্রিয়তা-অক্রিয়তা জৈবিক, মনে করেন সমাজও দাঁড়িয়ে আছে জৈবভিত্তির ওপর। তাঁর মতে, নারীর কাজ হচ্ছে অক্রিয় থাকা যেমন পুরুষের কাজ সক্রিয় থাকা, কেননা তাঁর প্রকৃতি তাই চেয়েছে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে মানুষের প্রাণশক্তি বা কামের চালকশক্তির নাম *লিবিডো*। ১৯০৫-এ তিনি লিবিডোকে নির্দেশ করেছিলেন পুরুষধর্মী ব'লে, বলেছিলেন যে লিবিডো 'নিয়মিতভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরুষপ্রকৃতির, তা পুরুষ বা নারীর যারই হোক' [মিলেট (১৯৬৯, ১৯২)]। পরে, ১৯২৩-এ, তিনি কিছুটা মত বদলে বলেন যে লিবিডো লিঙ্গনিরপেক্ষ; তবুও ভেতরে ভেতরে তিনি বিশ্বাস করেন যে লিবিডো আসলে পুরুষপ্রকৃতিরই। ১৯৩৩-এ লিবিডো সম্পর্কে ফ্রয়েড (১৯৩৩, ১৬৮-১৬৯) বলেন :

> কামজীবনের চালকশক্তিকে আমরা বলেছি 'লিবিডো'। এ-কামজীবন নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষধর্মী ও নারীধর্মী দুই বৈপরীত্য দিয়ে; তাই অনেকে লিবিডোকে এ-দুই বৈপরীত্যের সাথে সম্পর্কিত করার প্ররোচনা বোধ করতে পারেন। এটা বিস্ময়কর মনে হতো না যদি দেখা যেতো যে কামের প্রত্যেক রূপের রয়েছে নিজ ধরনের লিবিডো, এর ফলে এক ধরনের লিবিডো কাজ করতো পুরুষধর্মী কামজীবনের লক্ষ্য থেকে, এবং অন্যটি নারীধর্মী লক্ষ্য থেকে। তবে এমন কিছু ঘটে না। লিবিডো রয়েছে এক ধরনেরই, যা পুরুষের কামের ভূমিকা যতোটা পালন করে ততোটাই পালন করে নারীর কামের ভূমিকা। এর আমরা কোনো লিঙ্গ নির্দেশ করতে পারি না; যদি আমরা প্রথাগত পুরুষধর্মিতা ও সক্রিয়তার সাদৃশ্য অনুসারে একে পুরুষধর্মী বলি, তবে আমাদের ভুললে চলবে না যে এর অক্রিয় লক্ষ্যের প্রবর্তনাও রয়েছে। তবে 'নারীধর্মী লিবিডো' পদটি গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের ধারণা হচ্ছে যখন লিবিডোকে লাগানো হয় নারীধর্মী কাজে, তখন তার ওপর পীড়ন করা হয় বেশি; এবং পরমকারণমূলকভাবে বলতে গেলে—প্রকৃতি পুরুষের ভূমিকার দাবির প্রতি যতোটা মনোযোগ দিয়েছে নারীর ভূমিকার দাবির প্রতি ততোটা মনোযোগ দেয় নি। এবং আবারও পরমকারণমূলকভাবে—এর কারণ সম্ভবত এই যে জৈবিক লক্ষ্য অর্জনের ভার দেয়া হয়েছে পুরুষের আক্রমণাত্মকতার ওপর, যা কিছু পরিমাণে নারীর সহযোগিতা বা সম্মতি নিরপেক্ষ।

নারীসম্পর্কে ফ্রয়েডের সবচেয়ে আপত্তিকর সিদ্ধান্তগুলোর কয়েকটি পাচ্ছি এখানে। তিনি যদিও বলেছেন লিবিডোর কোনো লিঙ্গ নেই, তবুও তিনি বিশ্বাস করেন লিবিডো আসলেই পুরুষধর্মী; তাই পুরুষেরই রয়েছে সভ্যতাসৃষ্টির শক্তি, এবং তার ওপর অর্পণ করেছে সমস্ত মানবিক দায়ভার। প্রকৃতি নারীকে দিয়েছে সামান্য লিবিডো, নারীর দাবির

দিকে মনোযোগ দেয় নি, এসবই বিজ্ঞানের বেশে ভিক্টোরীয় কুসংস্কার প্রচার। তিনি বিশ্বাস করেন নারীর যেহেতু লিবিডো কম, তাই নারীর পক্ষে পুরুষের মহত্ত্ব অর্জন অসম্ভব; নারীর প্রতিভা নেই সভ্যতাকে কিছু দেয়ার। তিনি নারীকে বাইরে রেখেছেন সভ্যতার; *সভ্যতা ও তার অতৃপ্তিতে* (১৯৩০) দেখিয়েছেন নারী আসলে সভ্যতার শত্রু। ফ্রয়েড শুধু সভ্যতাসংস্কৃতির ভারই পুরুষের হাতে দেন নি, তিনি মানবপ্রজাতিকে রক্ষার ভারই দিয়েছেন পুরুষের ওপর। নারী ধারণ করে মানব, কিন্তু ফ্রয়েড একে মূল্যবান মনে করেন না; নারী ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে আধারমাত্র। প্রকৃতি নারীকে মানবপ্রজাতি টিকিয়ে রাখার ভার দেয় নি, দিয়েছে পুরুষকে! তিনি বলেছেন, 'জৈবিক লক্ষ্য অর্জনের ভার দেয়া হয়েছে পুরুষের আক্রমণাত্মকতার ওপর, যা কিছু পরিমাণে নারীর সহযোগিতা বা সম্মতি নিরপেক্ষ'; অর্থাৎ নারী চাক বা না চাক, প্রকৃতি যেহেতু পুরুষকে দিয়েছে মানবপ্রজাতি টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব, তাই পুরুষ নারীকে ফাঁক ক'রে ঠেলে ভেতরে ঢুকে রক্ষা করবে মানবপ্রজাতি। ফ্রয়েডের মানবপ্রজাতি রক্ষার প্রকল্প তাই হয়ে দাঁড়ায় বলাৎকার, যা সহ্য করতে হবে নারীকে।

ফ্রয়েডের চোখে নারীর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য : অক্রিয়তা, মর্ষকাম, ও আত্মপ্রেম। বর্ণনা হিশেবে এগুলো ভুল নয়, তিনি তাঁর সময়ের নারীদের এ-বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন ঠিক মতোই, কিন্তু ব্যাখ্যা করেছেন ভুল। পিতৃতন্ত্র নারীকে দেখতে চায় অক্রিয়, তাই নারী তার স্বভাবের মধ্যে মেনে নিয়েছে অনেকখানি অক্রিয়তা, কেননা সক্রিয় হ'লেই পুরুষতন্ত্র ক্ষেপে ওঠে তার ওপর। পিতৃতন্ত্র সে-নারীকেই মহীয়সী মনে করে যে সহ্য করতে পারে চরম দুঃখযন্ত্রণা, পিতৃতন্ত্র বিরামহীন পীড়ন সহ্য করারকেই মনে করে নারীত্ব। পিতৃতন্ত্র সৃষ্টি করেছে অসংখ্য সতীচরিত্র, সীতা ও রহিমা, যারা মহত্ত্ব অর্জন করেছে শুধু অপার পীড়ন সহ্য করে। পুরুষ, শোপনহায়ারের মতো, মনে করে যে নারী জীবনের ঋণ কাজ দিয়ে শোধ করে না, করে দুঃখ দিয়ে। তাই নারীকে বাধ্য হয়েই হয়ে উঠতে হয়েছে মর্ষকামী। পিতৃতন্ত্র নারীকে সম্ভোগসামগ্রী রূপে দেখে, এজন্যে নারী আত্মপ্রেম আয়ত্ত করে অনেকখানি। অর্থাৎ পিতৃতন্ত্র নারীকে যে-ভূমিকা দিয়েছে, নারী তাতে অভিনয় করেছে নিজের অস্তিত্বের জন্যেই। তবে ফ্রয়েড নারীর অক্রিয়তা, মর্ষকাম, আত্মপ্রেমকে এ-চোখে দেখেন না; তিনি একে মনে করেন জৈবিক ও নারীত্ব। তিনি নারীর মধ্যে খোঁজেন এসবই। তিনি বিধান দেন যে নারীকে হ'তে হবে অক্রিয়, মর্ষকামী, আত্মপ্রেমিক; এসব যাদের আছে তারাই স্বাভাবিক নারী। নারীকে অক্রিয় হ'তে হবে; কী করতে হবে এর জন্যে? তিনি বলেন, নারীকে ভগাঙ্কুরের সুখ ছেড়ে যেতে হবে মাতৃত্বের দিকে, সুখ খুঁজতে হবে রন্ধ্রে। তাঁর মতে অক্রিয়তা আর মর্ষকাম একান্ত নারীর বৈশিষ্ট্য, এবং জড়ানো একে অন্যের সাথে; তাই এ-দুটি নারীর জন্যে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক পুরুষের জন্যে। মর্ষকাম নারীসুলভ, আর নারীত্ব মর্ষকামধর্মী। ফ্রয়েড বলেন (১৯৩৩, ১৪৮-১৪৯) :

> তাদের আক্রমণাত্মকতা অবদমনের ফলে, যা নারীদের ওপর চাপিয়ে দেয় তাদের গঠন ও সমাজ, তাদের মধ্যে বিকশিত হয় তীব্র মর্ষকামবাদী প্রবর্তনা, যার ফলে তাদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা কামগতভাবে রুদ্ধ হয়ে হয়ে ওঠে অন্তর্মুখি। তাই মর্ষকাম, যেমন বলা হয়ে থাকে, সত্যিকারভাবেই

> নারীধর্মী। তবে যখন আমরা মাঝেমঝেই পুরুষের মধ্যে মর্ষকাম দেখতে পাই, তখন একথা ছাড়া আর কী বলতে পারি যে ওই সব লোকের মধ্যে প্রকাশ ঘটেছে সুস্পষ্ট নারীধর্মী বৈশিষ্ট্য?

ফ্রয়েড মনে করেন নারী জৈবিকভাবেই তৈরি হয়েছে পীড়ন ভোগ করার জন্যে; পীড়ন নারীর জন্যে একধরনের সুখ। তাই পুরুষ যখন পীড়ন করে নারীকে, তখন পুরুষ কোনো অপরাধ করে না, বরং তাকে দেয় সুখ। ফ্রয়েডীয় মর্ষকামবাদকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে নিলে দাঁড়ায় যে পীড়নধর্ষণ নারীর জন্যে শুধু ভালোই নয়, বরং নারী ব্যাকুল হয়ে থাকে এরই জন্যে। নারীকে ছিঁড়েফেড়ে ফেললেও, ফ্রয়েডের তত্ত্বানুসারে, পুরুষের কোনো অপরাধ হওয়ার কথা নয়, কেননা তা পরিতৃপ্ত করে নারীর সহজাত মর্ষকামকে! নারী পীড়িত হয়ে সুখ পায়, এমন একটি বাজে কথা চালু রয়েছে কয়েক হাজার বছর ধ'রে; পুরুষতন্ত্রের মহাপুরুষেরা এ-ধারণাকে জনপ্রিয় করেছেন নানাভাবে, আর ফ্রয়েড দিয়েছেন তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। ফ্রয়েডীয় মর্ষকামতত্ত্ব নারীপীড়নের বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব, এবং অপবিজ্ঞান।

ফ্রয়েডের নির্দেশিত নারীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রেম বা *নার্সিসিজম*। নার্সিসিজম শব্দটি যদিও জন্মেছে আত্মপ্রেমমত্ত এক পৌরাণিক পুরুষের নাম থেকে, তবু পুরুষতন্ত্র পৃথিবী জুড়েই আত্মপ্রেমকে মনে করে একান্ত নারীর রোগ; ফ্রয়েডও তাই মনে করেন। নারীর আত্মপ্রেম, নারীর অক্রিয়তা বা মর্ষকামের মতোই, ফ্রয়েডের মৌলিক আবিষ্কার নয়; তাঁর আগে, কয়েক হাজার বছর ধ'রে, নারীর আত্মপ্রেমের বহু উপকথা লিখেছে পুরুষ, ফ্রয়েড দিয়েছেন তার অপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তাঁর মতে নারীর আত্মপ্রেম বিকার, তবে খুবই স্বাভাবিক নারীর জন্যে। পুরুষও হ'তে পারে আত্মপ্রেমিক, স্বীকার করেন ফ্রয়েড; তবে পুরুষের আত্মপ্রেম বিকার নয়, তা উন্নত প্রকৃতির; পুরুষের রয়েছে আত্মপ্রেমের উৎকর্ষায়ণের প্রতিভা। পুরুষ, ফ্রয়েড বলেন, নিজের প্রেমে পড়ে অন্যের বা নারীর প্রেমে পড়ার মতো ক'রে, তাই তা সুস্থ; কিন্তু স্বভাববিকৃত বিকলাঙ্গ ক্ষীণলিবিডো শিশ্নাসূয়াগ্রস্ত নারী তা পারে না; তার আত্মপ্রেম নিজের দেহকেন্দ্রিক। নারী নিজের প্রেমে পড়ে যেমন পুরুষ পড়ে নারীর প্রেমে, অর্থাৎ নারী নিজে পুরুষ হয়ে পড়ে নিজের শরীরের প্রেমে। এটা বিকার। নারী পারে না আত্মপ্রেমের উৎকর্ষ সাধন করতে, পুরুষ পারে। আত্মপ্রেম, ফ্রয়েডের মতে, একান্তভাবেই নারীধর্মী, এবং এর মূলে রয়েছে নারীর শাশ্বত শিশ্নাসূয়া। ফ্রয়েড (১৯৩৩, ১৭০) বলেন :

> আমরা লক্ষ্য করি যে নারীর মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ আত্মপ্রেম, তাই তারা অন্যের প্রেমে পড়ার আবেগের থেকে অনেক বেশি বোধ করে অন্যেরা তাদের প্রেমে পড়বে, সে-আবেগ। রূপের জন্যে গর্ববোধও আংশিকভাবে তাদের শিশ্নাসূয়ারই ফল, তারা তাদের মৌলিক কামনিকৃষ্টতার বিলম্বিত ক্ষতিপূরণ হিশেবেই নিজেদের শারীরিক সৌন্দর্যকে অতি বেশি মূল্য দিয়ে থাকে।

নারী যদি একটি শিশ্ন পেতো, তাহলে নিজের রূপে অন্ধ হতো না; শিশ্নের অভাব নারী মিটিয়ে নেয় আত্মপ্রেমে! নারীর আত্মপ্রেমের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফ্রয়েড; তাঁর মতো চমৎকার পর্যবেক্ষক ও শোচনীয় অপব্যাখ্যাকার বেশি মেলে না। সমাজ নারীকে যে-রোগে রুগ্ন দেখতে পছন্দ করে, তার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় যে-রোগের বীজ,

ফ্রয়েড তাকে ক'রে তুলেছেন জৈবিক। নারী নিজের রূপসচেতন, রূপের জন্যে অশেষ তার আকুলতা, নিজের রূপে সে বিভোরও হয়, এমনকি পুরুষের চোখেও সে দেখে নিজের মাংসের বিন্যাস; তার কারণ সে জানে সে কামসামগ্রী, তার মূল্য তার সম্ভোগযোগ্যতায়। নিজেকে নিজে সম্ভোগের জন্যে নারী আত্মপ্রেমমুগ্ধ নয়; পুরুষতন্ত্রের বিধান অনুসারে পুরুষের সম্ভোভযোগ্য হয়ে ওঠার জন্যেই নারী রূপসচেতন। সে জানে তার দেহ খাদ্য হবে পুরুষের, তাই নারী নিজেকে ক'রে তুলতে চায় সুস্বাদু খাদ্য। মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্ (১৭৯২) বলেছেন, 'শিশুবেলা থেকেই শেখানো হয় যে রূপই নারীর রাজদণ্ড, তার মন বেঁকে যায় তার দেহের আদলে, এবং এর কারুখচিত খাঁচার চারদিকে ঘুরেঘুরে সাজাতে শেখে শুধু কারাগারটিকে' [দ্র গ্রিয়ার (১৯৭১, ৫৫)]। ফ্রয়েড এসব মনে করেছেন জৈবিক; নারী জৈবিকভাবে অক্রিয়, মর্ষকামী, আর আত্মপ্রেমমুগ্ধ। ফ্রয়েড তাঁর সময়ের নারীস্বভাব বর্ণনা করেছিলেন নির্ভুলভাবে, তবে প্রতিক্রিয়াশীলতাবশত তা ব্যাখ্যা করেছেন ভুলভাবে; আর বিধান দিয়েছেন সম্পূর্ণ নারীবিরোধী। যদি দেখি একদল মানুষকে ক'রে ফেলা হয়েছে অক্রিয়, দুঃখযন্ত্রণাকে ক'রে তোলা হয়েছে তাদের জীবন, তাদের বাধ্য করা হয়েছে প্রভুদের মনোরঞ্জন ক'রে তুচ্ছ গর্বে মেতে উঠতে, তখন কি বলবো যে এসবই অবধারিত, এ-ই তাদের জৈবস্বভাব? নিশ্চয়ই বলবো না, কিন্তু বলেন মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড। বিশশতকে ফ্রয়েডীয়বাদ দেখা দিয়েছিলো নারীবাদের প্রধান প্রতিপক্ষরূপে।

কারেন হোরনি, ক্লারা টম্পসন, আলফ্রেড অ্যাডলার বেশ আগেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ফ্রয়েডীয় প্রতিক্রিয়াশীল নারীমনোবিজ্ঞান, কেননা ওই মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য নারীর পুরুষাধীনতাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। ধর্মের বিরুদ্ধে আজ কথা বলা যায়, প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে যে-কোনো নির্বোধ; কিন্তু বিশশতকে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বলা অসম্ভব। বিজ্ঞানের মুখোমুখি সবাই অসহায়, তার সূত্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার শক্তি নেই সাধারণের। তাই ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান নারীর বিরুদ্ধে কাজ করেছে প্রথাগত পুস্তকগুলোর থেকে অনেক বেশি প্রচণ্ডভাবে। মনোবিজ্ঞানীরাই প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন ফ্রয়েডীয় নারীমনোবিজ্ঞানের, যদিও তা বিশশতকের শ্রুতিতে প্রবেশ করে নি। কারেন হোরনি মনোবিশ্লেষকদের মধ্যে দেখেছিলেন পুরুষবাদী ঝোঁক; তাঁরা মানুষ বলতে বুঝেছেন পুরুষ, এবং নারীকে দেখেছেন পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি শিশ্নাসূয়া, পুংগূঢ়ৈষা, নারীদের হীনমন্যতাবোধ প্রভৃতি ধারণা ব্যাখ্যা ক'রে দেখান যে এগুলো জৈবিক নয়, সাংস্কৃতিক। মর্ষকামের কথা ধরা যাক। হোরনি দেখেছেন কোনোকোনো মনোব্যাধিগ্রস্ত নারী মর্ষকামী, কিন্তু তিনি একে জৈবিক ব'লে মনে করেন নি। তিনি এর দিয়েছেন ফ্রয়েডের থেকে অনেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাখ্যা। তিনি বলেছেন, 'কোনো জীবন্ত প্রাণী যখন পড়ে বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে, তখন সে তার সাথে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে' [দ্র উইলিয়ম্‌স্ (১৯৭৭, ৬৮)]। নারী পড়েছে প্রাণীজগতের সবচেয়ে বিপর্যয়কর অবস্থায়, তাই নারী খাপ খাইয়ে নিয়েছে বিপর্যয়ের সাথে। নারীর অবস্থা ও মন ব্যাখ্যার জন্যে বিবেচনা করতে হবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপারগুলো; তার শরীরের বাঁকে, রন্ধ্রে, অঙ্কুরে খোঁজাখুঁজি ক'রে ওগুলোর সূত্র মিলবে না। তিনি

মর্ষকামের একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। জারের শাসনকালে রাশিয়ার চাষীনারীরা চাইতো যে তাদের স্বামীরা তাদের প্রহার করুক, ওই প্রহার ছিলো প্রেমের প্রমাণ। এতে যদি মনে করা হয় যে নারীরা বা রুশ নারীরা মর্ষকামী, তবে বড়ো ভুল করা হবে। ওই সমাজব্যবস্থায় প্রহারকেই মনে করা হতো প্রেমের প্রকাশ; কিন্তু আজকের রাশিয়ার নারীরা প্রেমের প্রমাণরূপে প্রহারের কথা ভাবতেই পারে না। ওই সমাজের বদল ঘটেছে, তাই বদল ঘটেছে নারীর বাহ্যিক আচরণেরও, তবে নারীর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে নি। প্রতিটি জাতির ধর্মে, সাহিত্যে, কিংবদন্তিতে নারীকে দেখানো হয়েছে মর্ষকামীরূপে, গাওয়া হয়েছে নারীর মর্ষকামের গাথা। আদর্শ সতী মর্ষকামী, আদর্শ মা মর্ষকামী, আদর্শ প্রেমিকা মর্ষকামী, আদর্শ কন্যা মর্ষকামী; নারী পিতৃতন্ত্রের ধর্ষকামের ধারাবাহিক ভোগ্যসামগ্রী।

হোরনি বলেছেন, নারীপ্রকৃতি সম্পর্কে যে-ভাবাদর্শ গ'ড়ে তোলা হয়েছে, তা হচ্ছে নারী দুর্বল, আবেগপরায়ণ, অক্রিয়, পরনির্ভর: এ-ভাবাদর্শের জন্যেই নারীকে মনে হয় ওই সব অপবৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। পুরুষ নারীকে এমনই দেখতে চায়। এসবের জন্যেই নারী ভূমিকা পালন করে অক্রিয়তার, হয় মর্ষকামী বা আত্মপ্রেমমুগ্ধ; কিন্তু একে জৈবিক মনে করার কারণ নেই। 'প্রেমের অতিমূল্যায়ন' (১৯৩৪) নামের একটি লেখায় তিনি দেখান যে সামাজিক অবস্থা নারীকে শেখায় যে তাকে হ'তে হবে পিতৃতন্ত্রের আদর্শ নারী : তার জীবনের লক্ষ্য হবে বিশেষ কোনো পুরুষকে ভালোবাসা ও তার ভালোবাসা পাওয়া, তার সেবা করা। তার জীবন হবে বিশেষ পুরুষকেন্দ্রিক, সে ঘুরবে পুরুষসূর্যকে কেন্দ্র ক'রে। এমন অবস্থা পুরুষের মনে বাড়িয়ে দেয় আত্মমর্যাদাবোধ, আর কমিয়ে দেয় নারীর আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস। প্রতিটি ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে বারবার পাওয়া যায় এমন সব নির্দেশ, যা পুরুষকে দেবতা আর নারীকে ক'রে তোলে আত্মমর্যাদাহীন জন্তু। ইহুদিধর্মের বিধান হচ্ছে স্ত্রী স্বামীকে সম্বোধন করবে *বাআল* [প্রভু] বা *আদোন* [বিধাতা] ব'লে; সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে তার কাছে। একটি হাদিসে আছে [দ্র ফজলুর রহমান (১৯৭৭, ৩৩৫)] :

> স্বামী যদি কুষ্ঠরোগী হয় আর তাহার পুঁজ ইত্যাদি স্ত্রী নিজ জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া পরিষ্কার করে, উহাতেও স্ত্রী স্বামীর হক আদায় করিতে পারিবে না :

হিন্দুদের *কামকল্প*-এ আছে [দ্র মাইলস (১৯৮৮, ৭১)] :

> স্বামী ছাড়া পৃথিবীতে নারীর আর কোনো দেবতা *নেই*।...স্বামী হ'তে পারে বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, পাপিষ্ঠ, বদমেজাজি, লম্পট, অন্ধ, বধির বা বোবা ..তবু সারাজীবন নারী তাকে মান্য ক'রে চলবে।

এসব বিধানে যেমন পীড়ন করা হয়েছে নারীকে, তেমনি মুছে ফেলা হয়েছে তার আত্মমর্যাদার শেষ কণাটিকেও। নারীপীড়ন, ও তার মর্যাদা অস্বীকারের উৎকট বিধান দিয়েছে আঠারোশতকের এক জাপানি দাম্পত্যবিধিপ্রণেতা; 'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ'-এ সে বলেছে [দ্র মাইলস (১৯৮৮, ৭১)] :

> সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্বামীর প্রতি নারীর ভক্তি।.. স্ত্রী সব সময় কল্পনা করবে সে-সব, যা তার স্বামীর আনন্দ বাড়াবে, তাকে কোনো কিছু করতে দিতে অস্বীকার করবে না। যদি সে অল্পবয়স্ক বালক

পছন্দ করে, তবে স্ত্রী বালকের মতো হাঁটু গেড়ে বসবে যাতে স্বামী পেছন দিক থেকে তাকে নিতে পারে। তবে স্ত্রীকে ভুললে চলবে না যে পুরুষ নারীর পায়ুর কোমল প্রকৃতি বুঝতে পারে না, সে জোর ক'রে ঠেলে ভেতরে ঢুকতে পারে। তাই স্ত্রীব উচিত ধীরেধীবে নিজেকে প্রস্তুত করা এবং সিজিশুমি ক্রিম ব্যবহাব কবা...

এসবের পরেও নারী কী ক'রে রক্ষা করে তার আত্মমর্যাদাবোধ? যে-নারী মেনে নেয় এসব, তার জন্যে সমস্যা নেই, সে চ'লে যায় সব সমস্যার পরপারে; কিন্তু যে-নারী হ'তে চায় স্বাধীন, জড়িত হ'তে চায় কোনো পেশায়, তার জন্যে এসব তৈরি করে সংকট। এমন নারী হয়ে পড়ে অসুস্থ, সে ব্যর্থ হয় কর্মে ও প্রেমে। এর পেছনে নারীর শরীরের কোনো ভূমিকা নেই, আছে সমাজসংস্কৃতির ক্রিয়া। সমাজই ব্যর্থ ও অসুস্থ ক'রে দিচ্ছে নারীকে, কিন্তু ফ্রয়েড তার নিন্দা করেন পুংগুহ্যৈষাগ্রস্ত ব'লে। হোরনি দেখিয়েছেন, মূলসংকট হচ্ছে প্রেমের অতিমূল্যায়ন, প্রেমকেই নারীর জীবনের সব ব'লে ভাবা; যেনো পুরুষের সাথে নারীর কামসম্পর্কই জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিশ। যদি নারী প্রেমেই না পড়লো, প্রেমই না পেলো, স্ত্রীই না হ'তে পারলো, তাহলেই যেনো তার জীবনের সব নষ্ট হয়ে গেলো; তার জীবন হয়ে উঠলো অস্বাভাবিক। যে-নারী পিতৃতন্ত্রের বিধান মানে না, সে-ই ব্যাধিগ্রস্ত ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে; যদিও তা রোগ নয়, তা পিতৃতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতামনস্ক নারীর বিদ্রোহ।

ক্লারা টম্পসন আরো প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ফ্রয়েডকে। তিনি দেখান যে নারীমনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তগুলো জন্মেছে নারীর নিকৃষ্টতা সম্পর্কে ফ্রয়েডের বদ্ধমূল ধারণা থেকে; তাই ফ্রয়েড শিশ্নাসূয়া, ঈর্ষা, মর্ষকাম, হীনমন্যতাবোধ প্রভৃতিকে মনে করেছেন জৈবিক; তবে এসবের উৎপত্তি ঘটেছে সাংস্কৃতিক কারণে। মানুষ যে-অবস্থায় পড়ে সাধারণত তার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, নারীও নিয়েছে। শিশ্ন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুবিধা আর আধিপত্যের প্রতীক, নারী ঈর্ষা করে পুরুষের ওই সুবিধা আর আধিপত্যকে। নারী শিশ্নকে ঈর্ষা করে না, আর ঈর্ষাও সর্বজনীন নয়। ঈর্ষাবিদ্বেষ প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতির চরিত্র; নারীকে বাদ দেয়া হয় ওই প্রতিযোগিতা থেকে, তাকে দেয়া হয় না বিকশিত হ'তে। তাই তার মনে ঈর্ষা জন্মানো স্বাভাবিক, তবে এর পেছনে কোনো জৈব কারণ নেই। বর্তমান ব্যবস্থায় একটি নির্বোধ পুরুষ যে-সাফল্য লাভ করতে পারে, একটি বুদ্ধিমান নারী তা পারে না; তাই সে হ'তে পারে ঈর্ষাকাতর। সমাজই ঈর্ষার জনক। নারীর হীনমন্যতাবোধও সমাজে তার প্রকৃত অবস্থারই প্রতিফলন; তা শিশ্নহীনতার ফল নয়, মনোব্যাধিও নয়। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজের অবস্থা দেখে দেখে নারী ভোগে হীনমন্যতায়, এর পেছনে তার শরীর নেই; আছে সমাজ। নারীর পরাসত্তা দুর্বল, এটা নারীর জৈবিক স্বভাব নয়; এটা সমস্ত অধীন জাতিরই কৃত্রিম স্বভাব। তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে চায় শক্তিমানদের স্বীকৃতি। ভিক্টোরীয় তরুণী বা আজকের মধ্যপ্রাচ্যের বা বাঙলাদেশের তরুণী নির্ভরশীল তার পিতার ওপর, তার কোনো সুযোগ নেই স্বাধীন মন বিকাশের। যদি সে স্বাধীন হ'তে চায়, তবে তা হবে বিপজ্জনক। দুর্বলকে সব সময়ই আত্মরক্ষার জন্যে শক্তিমানের ভাবাদর্শ মেনে নিতে হয়। নারীও তা মেনে নিয়েছে, তাই মনে হয় নারীর পরাসত্তা

দুর্বল; তবে এটা প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে ঘটে নি, ঘটেছে সামাজিক কারণে।

ফ্রয়েডের মতে নারীদের আবেগমননগত বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় পুরুষের অনেক আগে। তিনি (১৯৩৩, ১৭৩) বলেন, 'তিরিশের কাছাকাছি কোনো পুরুষকে মনে হয় প্রাণবন্ত, এক অর্থে অপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তি, যার কাছে প্রত্যাশা করি যে সে তার বিকাশের সব সম্ভাবনা পূরণ করবে... তবে ওই বয়সের নারীরা মাঝেমাঝেই তাদের মনস্তাত্ত্বিক অনমনীয়তা ও অপরিবর্তনীয়তা দিয়ে আমাদের বিচলিত করে।' এ দেখেই তিনি ধ্রুব সূত্রে পৌছে গেছেন যে তিরিশ বছরের পর নারীদের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না! তিরিশ বছরেই নারী সমাপ্ত; এবং এর মূলে আছে তার শরীর। সম্পূর্ণ ভুল তাঁর সূত্র, যদিও পর্যবেক্ষণ নির্ভুল। ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণের আভ্যন্তর ব্যাখ্যা দিয়েছেন টম্পসন; তিনি দেখিয়েছেন ওই কালে এ-ই ছিলো স্বাভাবিক। এখনো পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়ে এটাই স্বাভাবিক যে নারী সমাপ্ত তিরিশে। এক সময় বাঙলায় জনপ্রিয় ছিলো একটি শ্লোক যে বাঙালির মেয়ে কুড়িতেই বুড়ী, অর্থাৎ তার জীবন নিঃশেষিত বিশ বছরেই। টম্পসন বলেছেন, নারীর জীবনের সাফল্য যতোদিন নির্ভর করবে বিয়ে ও মাতৃত্বের ওপর, ততোদিন তিরিশেই তার জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা অর্জিত হয়ে যাবে। যদি তার বিয়ে হয় ষোলো বা আঠারোতে, তাহলে তিরিশ বছরের মধ্যে উজাড় হয়ে যায় তার জরায়ু ও সৌন্দর্য, যা ছিলো তার জীবনের সম্ভাবনার ভিত্তি। যদি তার বিয়ে না হয়, তাহলে তার জীবন ব্যর্থ, বিয়ে হ'লেও ব্যর্থ; কেননা বিয়ে ও সন্তান কোনো সাফল্যই নয়। এখনো পৃথিবী জুড়ে তিরিশ বছর বয়স্ক অধিকাংশ নারীর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। টম্পসন ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর ব্যাখ্যার ত্রুটি; দেখিয়েছেন ফ্রয়েড নারীকে দেখেছেন পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, ফ্রয়েডের নারী হচ্ছে পুরুষের না-সূচক রূপ। ফ্রয়েড দেখেছেন তাঁর নিজের সংস্কৃতির নারীদের, আর ওই নারীদের স্বভাবকে মনে করেছেন বিশ্বজনীন ও শাশ্বত। ফ্রয়েড স্বাভাবিক নারীদের ব্যাখ্যা করেন নি, করেছেন পিতৃতন্ত্রের পর্যুদস্ত নারীদের। তিনি ফ্রয়েডের পুংগূঢ়ৈষারও দিয়েছেন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা; তিনি দেখিয়েছেন সংস্কৃতিই নারীকে ডাকে ওই দিকে। নারী যখন প্রথাগত আশ্রিত ভূমিকা ছেড়ে স্বাধীন জীবনের খোঁজে বেবিয়ে পড়ে, তখন সে সাফল্যের জন্যে অনুসরণ করে সফলদেরই : নারী দেখে সফল হচ্ছে পুরুষ, তাই নারী অনুকরণ করে পুরুষের আচরণ। পুরুষের জগতে পুরুষের অনুকরণ ক'রে সাফল্য অর্জন করে নারী, যা তার পুরুষাধীন অবস্থায় অসম্ভব। তাই পুংগূঢ়ৈষা কোনো রোগ নয়। ফ্রয়েড নারীর যে-সব বৈশিষ্ট্যকে মনে করেছেন একান্তভাবে নারীসুলভ ও জৈবিক, সেগুলোকে টম্পসন দেখিয়েছেন সামাজিক অবস্থার ফল ব'লে। তা শাশ্বত নয়, তার সাথে দেহের সম্পর্ক নেই; তা নারীর মৌল স্বভাব নয়। নারীর মৌল স্বভাব কী? টম্পসন বলেছেন, 'নারীর মৌল স্বভাব আজো অজানা' [দ্র উইলিয়মস্ (১৯৭৭, ৭৬)]।

অ্যাডলার ছিলেন ফ্রয়েডীয় বৃত্তে, কিন্তু বেরিয়ে এসেছিলেন যখন বুঝতে পারেন যে বদ্ধমূল ফ্রয়েডীয় ধারণা দিয়ে বিজ্ঞানচর্চা অসম্ভব। নারী সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ফ্রয়েডীয় ধারণা থেকে, এবং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। অ্যাডলার [দ্র উইলিয়মস্ (১৯৭৭, ৮০)] বলেছেন :

আমাদের সমস্ত সংস্থা, আমাদেব প্রথাগত প্রবণতা, আমাদেব বিধান, আমাদেব নৈতিকতা, আমাদেব প্রথা সাক্ষী দেয় যে পুরুষাধিপত্যের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্যে ওই সব প্রণয়ন ও রক্ষা করেছে সুবিধাভোগী পুরুষেরা।

শিশুকাল থেকেই শিশুরা পিতৃতন্ত্রের বিধানের শিকার হয়ে ওঠে। ছেলেশিশুকে ক'রে তোলা হয় আধিপত্যবাদী, মেয়েশিশুর মধ্যে জাগিয়ে তোলা হয় অধীন ও অপদার্থের বোধ। অ্যাডলারের মতে, বালিকা চারপাশে নারীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার দেখে দেখে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে নিজের আর নারীজাতির ওপর; এটা কোনো খোজা গূঢ়ৈষাব ফল নয়, সমাজব্যবস্থাই তাকে ক'রে তোলে আত্মঅবিশ্বাসী। নারীকে বের ক'রে দেয়া হয় শক্তির এলাকা থেকে, পুরুষের সমাজব্যবস্থা তাব সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে যে তার মনে দেখা দেয় সংকট। সমগ্র সভ্যতা নাবীর ওপর যে-চাপ সৃষ্টি করে, তা নারীকে বাধ্য করে পুরুষেব কাছে আত্মসমর্পণে। তাব পক্ষে সুস্থ থাকা কঠিন। তিনি দেখিয়েছেন সমাজ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজকেই মনে করে পুরুষের কাজ, গুরুত্বহীন কাজকে মনে করে নারীর কাজ; পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ, শক্তিমান, সুযোগ্য; নারী বাধ্য, দাসভাবাপন্ন, অধীনস্থ। তিনি দেখিয়েছেন পুরুষ নারীর প্রতি যে-সৌজন্য দেখিয়ে থাকে, তাতে মনে হয় যে নারীদের খুব মূল্য দেয়া হচ্ছে; তবে তাও করা হয় পুরুষের সুবিধারই জন্যে। নারীভূমিকা নিয়ে রয়েছে যে-বিশ্বজনীন অসন্তোষ, অ্যাডলারের মতে তা নিতে পারে তিন রকম রূপ। নারী হয়ে উঠতে পারে পুরুষের মতো সক্রিয়, বিদ্রোহ ক'রে সে ক্ষতিপূরণ করতে পারে নিজের অবস্থার। এ-ই হচ্ছে পুরুষালি প্রতিবাদ, যার অপব্যাখ্যা করেছেন ফ্রয়েড; তবে পুরুষালি প্রতিবাদের আশ্রয় নিতে পারে নারীপুরুষ উভয়ই, যখন তারা দেখে যে তাদের মানসম্মান বিপন্ন। তাঁর মতে নারীর জন্যে বেঁধে দেয়া হয়েছে বিশেষ সীমা, ওই সীমা থেকে নারী একটু স'রে গেলেই তার নিন্দা করা হয় পুরুষালি ব'লে। তিনি বলেন, এটা কোনো রহস্যময় ক্ষরণের ফলে ঘটে না, ঘটে বিশেষ স্থানে ও কালে, কেননা এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। নারী আরেক ধরনের প্রতিবাদ জানায় নিজেকে সম্পূর্ণ নারী ক'রে, পুরুষের পুরোপুরি অধীন হয়ে, নিজের ব্যর্থতায় নিজেকে অসুস্থ ক'রে। আছে আরেক ধরনের নারী, যারা ভাবতে পারে যে পুরুষই সব, তারা নিজেরা কোনো কাজের নয়, সম্পূর্ণ অযোগ্য তারা; তাদের অধীনতা ন্যায়সঙ্গত। তাদের এ-মনোভাবও একধরনের প্রতিবাদ, পরোক্ষ প্রতিবাদ : পুরুষের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে, নিজেরা সামান্যও দায়িত্বভার না নিয়ে তারা জানায় প্রতিবাদ। তাদের ভাব এমন : যেহেতু তোমরা পুরুষ, তাই তোমাদেরই সব কিছু করতে হবে, আমরা কিছু করতে পারবো না। ফ্রয়েডের পুংগূঢ়ৈষা তিনি মানেন নি, মানেন নি শিশ্নাসূয়া। তিনি মনে করেন ফ্রয়েড যে-সবকে মনে করেন জৈবিক ও বিশ্বজনীন, তা আসলে সামাজিক; তাই দরকার সমাজবদল।

ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানের নামে নারী সম্পর্কে প্রকাশ করেছিলেন একরাশ পুরুষতান্ত্রিক কুসংস্কার; পুরুষাধিপত্যকে তিনি ক'রে তুলেছিলেন জৈবিক, যদিও তা সাংস্কৃতিক। তাঁর প্রভাবেরও সীমা ছিলো না; তিনিই যেহেতু ছিলেন মনোবিজ্ঞানের শেষ কথা, তাই দেখা

দিয়েছিলেন তাঁর অসংখ্য অনুসারী, ও জনপ্রিয় ভাষ্যকার, যাঁরা প্রচার ক'রে চলছিলেন যে নারী বিকলাঙ্গ, আর পুরুষাধাপিত্য মেনে নেয়াই নারীজীবনের সার্থকতা। চল্লিশের দশকে দেখা দেন একদল মনোবিজ্ঞানী, যাঁদের বলা হয় উত্তর-ফ্রয়েডীয়, যাঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক নারীও; কিন্তু তাঁরা ফ্রয়েডের সমস্ত কুসংস্কারকে চূড়ান্ত বিজ্ঞান মনে ক'রে বিচিত্রভাবে প্রমাণ করেন যে নারী বিজ্ঞানসম্মতভাবেই বিকলাঙ্গ পুরুষ। ইয়ুং ফ্রয়েডকে বলেছিলেন, ফ্রয়েডের মৃত্যুর পরে তাঁর অনুসারীরা তাঁর ভুলগুলোকেও 'পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন' হিশেবে গণ্য করবে, তা প্রমাণিত হয় সত্য ব'লে। উত্তর-ফ্রয়েডীয়রা ফ্রয়েডের সমস্ত ভুলকে ধ্রুব জ্ঞান ক'রে সেগুলোকে চাপিয়ে দিতে থাকেন নারীর ওপর; জনপ্রিয় ভাষ্যকারেরা সেগুলোকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে নারীদের সন্ত্রস্ত ক'রে তোলেন। ফ্রয়েডের নারীতত্ত্বের দুজন আদি সম্প্রসারণকারী নারী : মারি বোনাপার্ত ও হেলেন ডয়েট্শ্; কিন্তু তাঁরা কোনো প্রশ্ন তোলেন নি ফ্রয়েডের নারীমনোবিজ্ঞান সম্পর্কে, বরং তাঁরা ফ্রয়েডকে ছাড়িয়ে গিয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ করেন নারী সম্পর্কে ছদ্মবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার। যেমন ফ্রয়েডীয় নারীর অক্রিয়তা ও মর্ষকামতত্ত্বকে বোনাপার্ত [দ্র মিলেট (১৯৬৯, ২০৪)] চরমরূপ দেন এভাবে :

> পশু বা উদ্ভিদ, প্রাণীজগতের সবটা জুড়েই অক্রিয়তা হচ্ছে নারীকোষের বৈশিষ্ট্য, ডিম্বের লক্ষ্যই হচ্ছে পুরুষকোষের জন্যে অপেক্ষা করা, অপেক্ষায় থাকা যে সক্রিয় সচল শুক্রাণু আসবে ও তাকে বিদ্ধ করবে। এমন বিদ্ধকরণের অর্থ হচ্ছে তার কোষলংঘন, তবে কোনো জীবিত প্রাণীর কোষলংঘন বোঝাতে পারে ধ্বংস : মৃত্যু অথবা জীবন। তাই নারীকোষের উর্বরতা সূচিত হয় এক ধরনের ক্ষত দিয়ে; স্বভাবে, নারীকোষ আদিরূপেই 'মর্ষকামী'।

তাঁর চোখে শুক্রাণু আক্রমণাত্মক, তাই পুরুষও আক্রমণাত্মক; একেই মনে করেন তিনি স্বাভাবিক। নারী তার খর্ব ভগাঙ্কুরের মতোই, তার পক্ষে আক্রমণাত্মক হওয়া অসম্ভব। বোনাপার্তের মতে, নারীর লিবিডো যেমন দুর্বল তেমনি দুর্বল তার আক্রমণাত্মকতা; তাই নারীকে থাকতে হবে পুরুষপর্যুদস্ত। তিনি প্রচার করেন যে পুরুষ যেহেতু জৈবিকভাবেই আক্রমণাত্মক, তাই তার আধিপত্য অনিবার্য। এ-সবই হচ্ছে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে ধ্রুব মনে ক'রে চরমে নিয়ে যাওয়া, ফ্রয়েডের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, ও নারীকে সমর্পণ করা পুরুষের কাছে। বোনাপার্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে ফ্রয়েডের কাছে, তাই নারী তাঁর কাছে চরম মর্ষকামী; তিনি মনে করেন নারী সঙ্গমে যে সুখ পায়, তা আসলে উৎপীড়িত হওয়ারই সুখ। তাঁর মতে সঙ্গমে নারী উপভোগ করে শিশ্নের প্রহার; সে শিশ্নের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়, সে ভালোবাসে শিশ্নের সন্ত্রাস! নারী যদি পছন্দ না করে শিশ্নের সন্ত্রাস, তাহলে? তাহলে, ফ্রয়েড যেমন বলেছেন, তা নারীরই অপরাধ বা বিকার; যে-নারী এটা পছন্দ করে না সে পুংগূঢ়ৈষাগ্রস্ত, পুরুষালি প্রতিবাদের শিকার! ফ্রয়েড বলেছেন, স্বাভাবিক নারী সঙ্গমে সুখ বোধ করে যোনির ভেতরে, স্বাভাবিক নারীর পুলক হচ্ছে যোনীয় পুলক; শুধু বিকৃতরা পুলক বোধ করে ভগাঙ্কুরে, তারা ভগাঙ্কুরীয়। ভগাঙ্কুরীয় হওয়া বিকার ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে; তাই এমনভাবে সঙ্গম করতে হবে যাতে শিশ্ন একটুও

স্পর্শ না করে ভগাঙ্কুরটিকে। বোনাপার্ত নারীকে শুধু মর্ষকামী হিশেবে বর্ণনা করেন নি, তিনি অনুশাসন দিয়েছেন যে নারীকে হ'তেই হবে মর্ষকামী। যে হবে না সে বিকৃত। তবে এতে কোনো বিজ্ঞান নেই, রয়েছে ভিক্টোরীয় কুসংস্কার; ফ্রয়েডের ভুল পদতলে নারীসমর্পণ।

ফ্রয়েডের ভ্রান্তি আর কুসংস্কারগুলোকে ধ্রুব সত্যরূপে মেনে নিয়েছিলেন আরেক নারী মনোবিজ্ঞানী। তিনি হেলেন ডয়েট্‌শ্‌, যাঁর দু-খণ্ডের *নারীমনোবিজ্ঞান-মনোবিশ্লেষণাত্মক ভাষ্য* (১৯৪৪) এক সময় হয়ে উঠেছিলো খুবই প্রভাবশালী, এমনকি দ্য বোভোয়ারও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর নানা অপব্যাখ্যা। তিনি নারীত্বকে অক্রিয়তার ও পুরুষত্বকে সক্রিয়তার সাথে অবিচ্ছেদ্য ক'রে তুলেছিলেন; শুধু কামে নয়, জীবনের সব এলাকায়। লৈঙ্গিক রাজনীতি তিনি শুরু করেছিলেন শয্যায়, এবং তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জীবনের সবখানে। যে-নারী সক্রিয়, তাঁর মতে সে-ই পুংগূঢ়ৈষাগ্রস্ত; ওই পুংগূঢ়ৈষার মূলে রয়েছে নারীর খোজাত্ব, তার শিশ্ন আর অণ্ডকোষের অভাব। তাঁর মতেও নারীর তিন মৌল বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রেম, অক্রিয়তা, ও মর্ষকাম। তাঁর চোখেও নারী বিকলাঙ্গ পুরুষ, যার শিশ্ন নেই, রয়েছে একটি অক্ষম খর্ব ভগাঙ্কুর; এবং দেহসংস্থানই নারীর নিয়তি। যে-নারী আত্মপ্রেমিক, অক্রিয়, মর্ষকামী, সে-ই স্বাভাবিক নারী তাঁর চোখে; আর অস্বাভাবিক তারা, যারা বর্জন করে আত্মপ্রেম, যারা পোষণ করে বাস্তব জীবনে সাফল্যের লক্ষ্য, যারা উপভোগ করে না মর্ষকাম। স্বাভাবিক হয়ে ওঠার জন্যে নারীকে ছেড়ে দিতে হবে সব লক্ষ্য, জীবনকে চরিতার্থ ক'রে তুলতে হবে স্বামী বা পুত্রের কাজ ও সাফল্যের মধ্যে। তাঁর মতে যে-নারীরা অর্জন করেছে নানা সাফল্য, তারা তা অর্জন করেছে স্বাভাবিক নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে; তাই তারা বিকৃত। স্বাভাবিক নারী, ডয়েট্‌শের মতে, হবে কামপরায়ণ; তার জীবনের লক্ষ্যই হবে প্রেম দেয়া ও পাওয়া; এ-স্বাভাবিক নারীরা বিশিষ্ট ক'রে তুলতে চায় না নিজেদের, তারা একাত্ম বোধ করে কোনো পুরুষের সাথে; এবং এর মধ্য দিয়েই বোধ করে জীবনের চরিতার্থতা। যে-নারী সাফল্য অর্জন করতে চায় সে বিকৃত, সে পুরুষালি প্রতিবাদের শিকার, যেমন তিনি দেখিয়েছেন যে জর্জ সাঁ শিকার ওই রোগের। এ-মনোবিজ্ঞানী, যিনি নিজে নারী ও সাফল্য অর্জন করেছিলেন পুরুষের ক্ষেত্রে, আসলে বিশ্বাসী ছিলেন নারী সম্পর্কে কুসংস্কারে, এবং প্রথাগত নারী ধারণায় [দ্র গ্রিয়ার (১৯৭০, ৯৪-৯৫)] :

> যদি তাদের থাকে প্রচুর পরিমাণে বোধি, যেটা নারীর বৈশিষ্ট্য, তারা হয় আদর্শ সহচরী, যারা নিয়ত অনুপ্রাণিত করে তাদের পুরুষদের, এবং তারা এ-ভূমিকায় পায় সবচেয়ে বেশি সুখ। তাদের সহজেই প্রভাবিত করা যায় এবং তারা তাদের সঙ্গীদের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং তাদের বুঝতে পারে। তারা সুন্দরতম ও সবচেয়ে কম আক্রমণাত্মক সঙ্গিনী এবং তারা থাকতে চায় ওই ভূমিকায়ই; তারা নিজেদের অধিকারের জন্যে চাপ দেয় না-বরং তার বিপরীত। শুধু প্রেম দিয়ে তাদের যে-কোনোভাবে সহজে চালানো যায়। কামে তারা সহজেই উদ্দীপিত হয় এবং খুব কম সময়ই তারা কামশীতল; তবে কামে তারা আরোপ করে মর্ষকামী শর্ত যা অবশ্যই পরমভাবে পরিতৃপ্ত করতে হবে। তারা প্রেম চায় এবং প্রত্যাখান করে সব ধরনের সক্রিয় প্রবণতা।

যদি তাদের কোনো প্রতিভা থাকে তবে তারা ওই শক্তিকে মৌলিক ও সৃষ্টিশীলভাবে কাজে লাগায়, তবে তারা প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে যোগ দেয় না। তারা সব সময়ই নিজেদের অর্জন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, এতে তারা একটুও মনে করে না যে তারা কিছু বিসর্জন দিচ্ছে, এবং তারা তাদেব সহকর্মীদেব সাফল্যে উল্লাস বোধ করে, যাদের তারা অনুপ্রাণিত করেছে। যখন তাবা নিয়োজিত হয় কোনো *বহির্মুখি কাজে* তখন তারা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করে সহায়তার, তবে তারা যখন তাদেব অন্তর্জীবনেব কোনো অনুভূতি বা চিন্তায় জড়িত হয়, অর্থাৎ নিয়োজিত হয় *অন্তর্মুখি কাজে* তখন তাবা চূড়ান্ত স্বাধীন। তাদেব [পুরুষেব সাথে] একাত্মতাবোধের শক্তি কোনো আন্তর দারিদ্র্যেব প্রকাশ নয়, ববং আন্তব সম্পদের প্রকাশ।

এটা নারীর বৈজ্ঞানিক বর্ণনা নয়, এটা অনুশাসন; তিনি চান এমন আদর্শ নারী, যা শুধু দুষ্প্রাপ্যই নয়, অসম্ভব। তাঁর নারী বর্জন করবে নিজের সত্তা। এমন নারী কোনো মানুষ নয়, সে নিজের জন্যে বাঁচে না; তবে নারী নিজের জন্যেও বেঁচে থাকে। এমন নারী জীবিত থাকে যখন তার পাশে থাকে কোনো পুরুষ, যার ওপর সে শুধু নির্ভরই করে না, যে তার প্রাণধারণের নিশ্বাস। ডয়েট্শ্ নারীকে পরামর্শ দিয়েছেন নিজেকে প্রত্যাখ্যান করার, পুরুষের সহচরী হয়ে ওঠার, পুরুষের সাথে খাপ খাওয়ানোর ও একাত্মতাবোধের; এর বদলে নারী পাবে সব কিছু। সে পাবে পুরুষের আদর, কাম, প্রেম, গৃহ; পুরুষ তাকে প্রভাবিত করবে, যেমন ইচ্ছে চালাবে, চাষ করবে, যেখানে ইচ্ছে রাখবে। এমন নারী আকর্ষণীয় মনে হ'তে পারে অনেকের কাছে, কিন্তু আসলে এমন ডয়েট্শীয় নারী আপাদমস্তক ক্লান্তিকর। সে আত্মবিসর্জনের মর্মস্পর্শী উদাহরণ। একে মনোবিশ্লেষণ হিশেবে চালিয়েছেন ডয়েট্শ্, তবে এ হচ্ছে নারী সম্পর্কে প্রথাগত কুসংস্কার। তাঁর বইয়ের দু-খণ্ডকে এক সময় মনে করা হতো নারী সম্পর্কে শেষকথা, কিন্তু তিনি নিজে নারী হয়েও প্রচার করেছিলেন পুরুষতান্ত্রিক কুসংস্কার। বোনাপার্ত ও ডয়েট্শ্ পুরুষতন্ত্রে দীক্ষার মর্মস্পর্শী উদাহরণ।

চল্লিশের দশকে শুরু হয় ফ্রয়েডীয় নারীতত্ত্বের জনপ্রিয়করণ, বিচিত্র ধরনের রচনা ও বইয়ে চারপাশ ছেয়ে যায়, প্রতিক্রিয়াশীলতা উপচে পড়তে থাকে ঝকঝকে ছাপা পৃষ্ঠার ভেতর থেকে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনোবিশ্লেষক ফার্ডিনান্ড লুন্ডবার্গ ও সমাজতাত্ত্বিক মারিনিয়া ফার্নহ্যামের *আধুনিক নারী, বিলুপ্ত লিঙ্গ* (১৯৪৭) নামের একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল বই। বইটি সাধারণ পাঠকদের ও পাঠ্যপুস্তক হিশেবে তরুণতরুণীদের অত্যন্ত প্রভাবিত করে। বইটি মধ্যযুগের একটি প্রচারপুস্তক; এটিতে আধুনিক সমস্ত কিছুকে নিন্দা করা হয়, মধ্যযুগকে চিত্রিত করা হয় স্বর্ণযুগ রূপে, আর সমস্ত আধুনিক প্রগতিশীল আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে প্রচার করা হয় ঘৃণা। তাঁদের বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য নারীমুক্তি আন্দোলন। লেখকদের মতে, যাঁদের একজন নারী, বর্তমান কালের অনেক নষ্টের মূলেই রয়েছে নারীবাদ, এবং এরই জন্যে নারী পরিণত হয়েছে 'বিলুপ্ত লিঙ্গ'-এ। তাদের মতে নারীবাদের মূলকথা বিদ্বেষ, নারীবাদ একধরনের নাটশিবাদ। এ-প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের মতে মার্ক্স আর মিল বিকৃত পুরুষ, আর বিশেষভাবে বিকৃত হচ্ছেন মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট্। ওই নারীই শুরু করেছিলেন নারীবিপ্লব নামক উন্মত্ততা। তাঁদের মতে নারীবাদ শুধু অশুভই নয়, একটি রোগ,

মনোবিকার, গৃহের শত্রু; নারীবাদ আবেগগত রুগ্নতার প্রকাশ। তাঁদের মতে নারীপুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না, সাম্য প্রতিষ্ঠার কোনো লক্ষ্য থাকলে তারা শারীরিকভাবে একই হতো। তাঁরা ঘোষণা করেন যে নারীবাদীরা পুরুষ হ'তে চায়, তারা ভোগে চরম শিশ্নাসূয়ায়। তাঁদের মতে, 'নারীবাদ হচ্ছে নারীর আত্মহত্যা, পুরুষের মতো বাঁচার প্রয়াস' [দ্র মিলেট (১৯৬৯, ২০৮)]। তাঁদের মতে মা হওয়া ছাড়া নারীর অন্য কোনো ইচ্ছে পোষণ করাই অসম্ভব অভিলাষ, পুরুষ হওয়ার অভিলাষ; এবং তাঁরা ওই অভিলাষকে তিরস্কার করেন প্রাণ ভ'রে। তাঁরা চান নারী থাকবে নারী হয়ে; তারা মা হবে, পুরুষের অধীনে থাকবে, পুরুষের ওপর নির্ভরশীল থাকবে। নারী সৃষ্টি হয়েছে শুধু এ-জন্যেই। তাঁদের মতে নারীবাদী আন্দোলন কমিয়ে দিয়েছে বিবাহ ও সংসারের মহিমা; আর নারীবাদীরা যে পুরুষের জন্যে এক নৈতিকতা আর নারীর জন্যে আরেক নৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তার কারণ তাদের ভেতরে রয়েছে অবৈধ কামের গভীর বাসনা। তাঁরা বিবাহপূর্ব কৌমার্য চান, তবে তা শুধু নারীর জন্যে; আর মনে করেন যে নারীপুরুষের ভিন্ন নৈতিকতা শুধু অনিবার্যই নয়, বিশেষভাবেই কাম্য। তাঁরা জয়গান করেন নারীত্বের, পরিবারের, নারী-অধীনতার, মাতৃত্বের। তাঁদের মতে পুরুষ থাকবে পুরুষের এলাকায়, নারী নারীর এলাকায়। যে-নারী খাপ খাওয়াতে পারে না পুরুষতন্ত্রের সাথে, তারা বিকৃত, ব্যাধিগ্রস্ত। এ-দুই লেখক মনোবিজ্ঞানের নামে প্রচার করেছেন প্রতিক্রিয়াশীলতা; তাঁদের বইয়ের ভেতর কোনো মনোবিজ্ঞান নেই, আছে অপবিজ্ঞান।

এক মনোবিশ্লেষক, এরিক এরিকসন, নারীকে ঘরে আটকে রাখার জন্যে বের করেন *ইনার স্পেস* বা *আন্তর* বা *আভ্যন্তর জগততত্ত্ব*। তিনি গবেষণা করেন কিশোরকিশোরীদের নিয়ে, তাদের হাতে দেন নানা মালমশলা এবং তৈরি করতে বলেন মনের মতো কাঠামো। তিনি দেখতে পান মেয়েরা বানাতে পছন্দ করে কোনো গৃহের অভ্যন্তর, যেখানে আছে সুখশান্তি; তারা তৈরি করে স্থির নানা অবস্থা, যেমন কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে। অন্যদিকে ছেলেরা তৈরি করে উঁচু অট্টালিকা, অট্টালিকার ভেঙে পড়া, এবং সড়ক, যেখান দিয়ে ছুটে চলছে যানবাহন। এ দেখেই এরিকসন ঠিক ক'রে ফেলেন যে এর সাথে সম্পর্ক আছে নারীপুরুষের লিঙ্গসংস্থানের : পুরুষ চায় উচ্চতা, সক্রিয়তা; নারী চায় অবরোধ, নিরাপত্তা। তিনি তত্ত্ব তৈরি ক'রে ফেলেন যে নারীর শরীরসংগঠনই, তার জরায়ু ও যোনির আভ্যন্তর জগতই স্থির ক'রে দেয় নারীর সত্তা, যা ভিন্ন পুরুষের থেকে। যেনো নারীর দেহসংগঠন পরিকল্পনার মধ্যেই রয়েছে শিশুপালনের শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক অঙ্গীকার! ফ্রয়েড বলেছিলেন যে নারী বোধ করে তার শিশ্ন নেই, আর এরিকসন আবিষ্কার করেন যে নারী বোধ করে যে তার অভ্যন্তরে একটি জগত রয়েছে, যেটির নাম জরায়ু। এরিকসন যে-উপাত্ত থেকে এতো বড়ো সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তা একটু ভালোভাবে দেখলেই তার *ইনার স্পেস* ও *আউটার স্পেসতত্ত্ব* ভেঙে পড়ে। মধ্যবিত্ত কিশোরকিশোরীরা বড়ো হয় যে-আবহাওয়ার মধ্যে, তাই তাদের শিখিয়ে দেয় যে মেয়েরা ভালোবাসবে ঘর, আর ছেলেরা বাইর; তাই তারা মেয়েলি ব্যাপারগুলোই বেছে নেয়, ছেলেরা বেছে নেয় পুরুষের ব্যাপারগুলো। এরিকসনের *ইনার স্পেস*,

আউটার স্পেসতত্ত্ব আমেরিকার মহাকাশ বিজয়ের সময়ের এক মার্কিন মনোবিশ্লেষকের অপবৈজ্ঞানিক পাগলামো। অন্যরা অন্তত পুরুষের জন্যে বাইর রেখে নারীর জন্যে রেখেছিলেন ঘর; মার্কিন মহাজগতমত্ততার কালে এ-বিজ্ঞানী পুরুষের জন্যে রাখেন মহাজগত, আর নারীর জন্যে রাখেন জরায়ু।

মনোবিশ্লেষণাত্মক কুসংস্কারের পর পশ্চিমে নারী সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়ে সমাজতাত্ত্বিক কুসংস্কার; সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে স্থির ক'রে দেয়ার জন্যে তৈরি করেন এক ঝকঝকে তত্ত্ব, তার নাম দেন *ফাংশনালিজম* বা *ভূমিকাবাদ*। তাঁরা কাজ করেন সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে, ঢুকে পড়েন পরিবারের ভেতরে, এবং তাঁদের বিদ্যাকে বিজ্ঞানসম্মত করার জন্যে নানা ধারণা ধার করতে থাকেন শরীরবিজ্ঞান থেকে, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাকে বর্ণনা করতে থাকেন *সংগঠন, ভূমিকা* ইত্যাদি ধারণার সাহায্যে, যেনো, যেমন ফ্রাইডান (১৯৬৩, ১১২) বলেছেন, ওই সব সংস্থার রয়েছে শক্ত অস্থি-পেশি প্রভৃতি। তাঁরা তাঁদের বিদ্যাকে ক'রে তোলেন ছদ্মবিজ্ঞান। তাঁরা বর্ণনার বদলে প্রচার করতে থাকেন অনুশাসন; কে কী ভূমিকা পালন করে, তার বদলে নির্দেশ দিতে থাকেন কার কর্তব্য কী ভূমিকা পালন। নারী হয়ে ওঠে ভূমিকাবাদের শিকার; নারীকে তারা বন্দী ক'রে ফেলেন নারী-ভূমিকায়। ভূমিকাবাদ বিবর্তনে বিশ্বাস করে না, মনে করে যে সব কিছু চিরস্থির হয়ে থাকবে, যে আছে যে-ভূমিকায় সে থাকবে তাতেই। লৈঙ্গিক বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে প্রথাগত লিঙ্গভেদ অস্বীকার করা, বিশেষ লিঙ্গের ব'লেই কাউকে পালন করতে হবে বিশেষ ভূমিকা বা হ'তে হবে বিশেষ মেজাজের, তা মেনে না নেয়া; আর ভূমিকাবাদের মূলকথা ওই সব মেনে নেয়া। ভূমিকাবাদীরা ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, গণিত প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরি করেছিলেন এমন এক অপবিজ্ঞান, যার সারবাণী হচ্ছে গৃহই নারীর স্থান। *আধুনিক বিবাহ* (১৯৪২) নামের এক বইয়ে এক সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন [দ্র ফ্রাইডান (১৯৬৩, ১১৪)] :

> নারীপুরুষ পরিপূরক।...পুরুষ ও নারী মিলে গ'ড়ে তোলে এক কার্যকর একক। একলা প্রত্যেকেই অসম্পূর্ণ। তারা পরিপূরক।... পুরুষ ও নারী যখন নিয়োজিত হয় একই পেশায় বা সম্পন্ন করে একই ভূমিকা, তখন এ-পরিপূরক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

একথা বলার জন্যে নতুন সমাজবিজ্ঞানীর দরকার ছিলো না; টেনিসন, রাসকিন ও অনেক ভিক্টোরীয় মহাপুরুষ একথা ব'লে গেছেন আরো আকর্ষণীয় মৌলিক ভঙ্গিতে; কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে যে একথা আবার বলা হয়েছে বিশশতকের চল্লিশের দশকে, বলেছেন 'বিজ্ঞানী'!

এ-বিজ্ঞানীরা তরুণীদের শিখিয়েছেন যে সারা জীবনের জন্যে কোনো পেশা গ্রহণ করা ঠিক নয়। যদি কোনো পেশা নিতে হয়, তবে নিতে হ'বে কিছু কালের জন্যে; ওই সময় চেষ্টা চালাতে হবে বিয়ের জন্যে, আর বিয়ে হয়ে গেলে পেশাকে বিদায় দিয়ে ঢুকতে হবে ঘরে, জরায়ুকে চরিতার্থ ক'রে তুলতে হবে মাতৃত্বে। তাঁরা শিখিয়েছেন বিয়ে আর পেশা একসাথে চালানো খুব খারাপ, পেশার থেকে বিয়ে অনেক ভালো; তাই ছেড়ে দিতে হবে বাইরের জীবন। কারণ মেয়েরা গৃহেই সুন্দর। তাঁরা শিখিয়েছেন যদি

মেয়েরা পেশাই বেছে নেয়, তবে তাদের থাকতে হ'তে পারে চিরঅবিবাহিত; যদি তারা মিলন ঘটাতে চায় বিয়ে ও পেশার, তবে তা ডেকে আনবে বিপর্যয়। ওই বিজ্ঞানীরা পরিসংখ্যানের পর পরিসংখ্যান ছেপে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে খুব বেশি মানুষের পক্ষে একই সাথে দুটি পেশা, সংসার ও চাকুরি, চালানো সম্ভব নয়, তা পারে শুধু অসাধারণেরা। কেননা এ-পেশা দুটির দাবি দু-রকম: সংসার চমৎকারভাবে চালানোর জন্যে দরকার নিজেকে পুরোপুরি অস্বীকার করা, দরকার পারস্পরিক সহযোগিতা; আর চাকুরির জন্যে দরকার আত্মবিকাশ, প্রবল প্রতিযোগিতা। তাঁরা তরুণীদের জানিয়েছেন যে আত্মবিকাশ খুব বিপজ্জনক ব্যাপার, খুবই সহজ ও মনোরম হচ্ছে আত্মঅস্বীকার। তাঁরা শিখিয়েছেন সংসারে সুখী হওয়া যায় তখনই যখন স্বামীস্ত্রী হয় পরস্পরের পরিপূরক, স্ত্রী থাকে ঘরে স্বামী বাইরে। দুর্ঘটনা ঘটে যখন দুজনই করে একই কাজ। এ হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত ভূমিকাবাদ। ভূমিকাবাদীদের প্রধান ছিলেন ট্যালকট পারসন্স্, যিনি মর্কিনদেশে নারীপুরুষের ভূমিকা বিশ্লেষণ ক'রে দেখান যে নারীর শ্রেষ্ঠ ভূমিকা হচ্ছে গৃহিণীর ভূমিকা! তাঁর মতে [দ্র ফ্রাইডান (১৯৬৩, ১১৬)]:

> নারীর মৌল মর্যাদা হচ্ছে স্বামীর স্ত্রী, আর সন্তানের মায়েব মর্যাদা।

এটা অসার মর্যাদা; নিজের নয়, অন্যের থেকে তার ওপর পতিত মর্যাদা; আর একথা বলার জন্যে কোনো নতুন সমাজবিজ্ঞানীর দরকার ছিলো না, পুরুষতন্ত্রের বিভিন্ন বই আর মনীষী এসব ব'লে আসছে কয়েক হাজার বছর ধ'রে। পুরুষ তো পিতা আর স্বামী হওয়ার মর্যাদায় গৌরব বোধ করে না। নারী ব্যস্ত থাকবে ঘর আর সন্তান নিয়ে? তবে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন নারীর ঘরকন্নার কাজ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, দিনভর করার মতো কাজ আর সংসারে নেই; তিনি স্ত্রীর জৌলুশপূর্ণতার কথা বলেছেন, তবে দেখেছেন ওটা থাকে শুধু যৌবনের কালে; তারপর সব কিছু ধ'সে পড়ে। পারসন্স্ চান সমাজ যেভাবে চলছে চলবে সেভাবেই, নারী পালন ক'রে যাবে তার প্রথাগত দাসীর ভূমিকা। তিনি, ও তাঁর সঙ্গীরা, জানেন সমাজ চলছে, কেননা বিপুল জনগোষ্ঠি মেনে নেয় তাদের অবস্থা, তারা খাপ খাইয়ে নেয় তাদের ভূমিকার সাথে। সমাজ তাদের বিন্যস্ত করে যেখানে সেখানে থেকেই তারা পালন করে তাদের ভূমিকা; ব্রাহ্মণ পালন করে ব্রাহ্মণের শূদ্র পালন করে শূদ্রের ভূমিকা; তাঁরা চান এ-ভূমিকা পালন চলবে চিরকাল। বালিকা, যেহেতু ভবিষ্যতে হবে স্ত্রী, প্রস্তুতি নেবে স্ত্রী হওয়ার; বালক নেবে স্বামী হওয়ার প্রস্তুতি। বালিকা প্রস্তুতি নেবে আনুগত্যের, নির্ভরতার; বালক নেবে স্বাধীনতা, আধিপত্য, আক্রমণাত্মকতা, ও প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি।

এক ভূমিকাবাদী সমাজবিজ্ঞানী একটি আদর্শ সমকালীন তরুণীর চিত্র এঁকেছেন এভাবে [দ্র ফ্রাইডান (১৯৬৩, ১১৮)]:

> আজকের ঐতিহাসিক মুহূর্তে, শ্রেষ্ঠ খাপ-খাওয়া মেয়ে সম্ভবত সে, যার পরীক্ষায় ভালো করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, তবে সব বিষয়ে 'এ' পাওয়ার মতো মেধা নেই...যে বেশ উপযুক্ত, তবে সে-সব বিষয়ে নয় যেগুলো নারীদের কাছে নতুন; যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং নিজেব জীবিকা অর্জন করতে পাবে, কিন্তু পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো ভালোভাবে পারে না; কোনো কাজ

ভালোভাবে করতে পারে (যদি সে বিয়ে না করে, বা অন্য কোনো কারণে তাকে কাজ করতে হয়) তবে সে তার পেশার সাথে একাত্ম বোধ করে না, নিজের সুখের জন্যে তা দরকারি মনে করে না।

যে-আদর্শ মেয়েটিকে তিনি কামনা করেছেন, সে চিরবালিকা; ভূমিকাবাদীরা চান তাই। এখানে পাই একটি শোচনীয় মেয়েকে, যার শরীরের ভাঁজ আর মস্তিষ্কের কোষ সবই পুরুষের জন্যে। পরীক্ষায় সে ভালো করবে, কিন্তু বেশি ভালো করবে না; সে চাকুরি করবে, কিন্তু বেশি ভালো চাকুরি করবে না। ওসব করবে ছেলে। সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে নারীর ভূমিকায়। এসব কথা অনেক আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে অনেক আগে বলেছেন রাসকিন ও অন্যান্য ভিক্টোরীয়। তবে ভিক্টোরীয়রা বিজ্ঞানের বেশে এগুলো প্রকাশ করেন নি, এঁরা প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানের বেশে। বিজ্ঞানীরা, ও বিজ্ঞান, হয়ে থাকেন ভবিষ্যৎমুখি, কিন্তু ভূমিকাবাদী এ-সমাজবিজ্ঞানীরা পুরোপুরি বর্তমানগ্রস্ত; না, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে অতীতগ্রস্ত। তাঁরা তাঁদের তত্ত্বে শক্তিশালী ক'রে তুলেছেন বাতিল অতীতের কুসংস্কার, এবং রোধ করতে চেয়েছেন পরিবর্তন। ভূমিকাবাদ বিজ্ঞান নয়, অনুশাসন; আগে যে-বিধান দেয়া হতো ধর্মের নামে, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান থেকে পারসন্সীয় ভূমিকাবাদ তাই করে ছদ্মবিজ্ঞানের নামে। ধর্মকে অস্বীকার করা সম্ভব, কিন্তু বিজ্ঞানকে অস্বীকার আজকাল অসম্ভব; তাই এসব নারীর ক্ষতি করেছে খুবই বেশি। ভূমিকাবাদ চায় যে মানুষ খাপ খাইয়ে চলবে তার অবস্থার সাথে, কেননা খাপ খাওয়ানোই স্বাভাবিকতা। ভূমিকাবাদীরা দেখেছেন প্রথাগত ব্যবস্থা বেশ কার্যকর, তাই তাঁরা বিধান দিয়েছেন যে তাই ঠিক, এবং তাই মেনে চলতে হবে। তাঁরা নারীদের আবার ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ঘরে, নারীদের ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন মার্গারেট মিডের ভাষায় আধুনিক 'গুহামানবী'। মিড নিজে যদিও মুক্তি আদায় ক'রে নিয়েছিলেন পুরুষতন্ত্রের শেকল থেকে, তবু তিনি নিজেও পরে অজ্ঞাতসারে কাজ করেছেন পুরুষতন্ত্রের পক্ষে; এবং শেষে বুঝতে পেরেছেন ভুল ক'রে ফেলেছেন অনেকখানি। বিশশতক আধুনিক সময় হিশেবে চিহ্নিত, কিন্তু এর বিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে ছড়িয়ে আছে কুসংস্কার, যার একটি বড়ো লক্ষ্য নারীকে পুরুষাধীন ক'রে তোলা।

নারী, তার লিঙ্গ ও শরীর

লিঙ্গ শুধু নারীপুরুষের কয়েকটি প্রত্যঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়, লিঙ্গ শরীরের প্রতিটি কোষে ছড়ানো। নারীর প্রতিটি কোষ সংবাদ বহন করে সে নারী, পুরুষের প্রতিটি কোষ সংবাদ বহন করে সে পুরুষ। তাই পার্থক্য রয়েছে পুরুষ ও নারীতে, তবে তা দু-মেরুর পার্থক্য নয়। প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক বিশ্বাসে নারীপুরুষ মেরুপ্রমাণ সুদূর আর বিপরীত; কিন্তু ওই সুদূরতা ও বৈপরীত্য জৈবিক লিঙ্গের জন্যে ততোটা নয়, যতোটা সাংস্কৃতিক লিঙ্গের জন্যে। প্রকৃতি নারীপুরুষকে বিপরীত ক'রে তৈরি করে না, সমাজই তাদের বিপরীত ক'রে তোলে। নারীপুরুষের উদ্ভব ও বিকাশও ঘটে একই রকমে, মাঝে ঘটে কিছুটা ভিন্নতা; কেউ হয় পুরুষ কেউ নারী, তবে ওই ভিন্নতাকেই পিতৃতন্ত্র ক'রে তোলে প্রধান। প্রকৃতি পুরুষতান্ত্রিক নয়, সমাজই পুরুষতান্ত্রিক পুরুষাধিপত্যবাদী। মানুষের উদ্ভববিকাশের প্রক্রিয়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা গেছে সম্প্রতি, কিন্তু আজো অধিকাংশের মধ্যে টিকে আছে পুরোনো বিশ্বাস যে নারী জন্মসূত্রেই সামাজিক লিঙ্গসম্পন্ন নারী। ধর্মগ্রন্থগুলো নারীর উদ্ভব সম্পর্কে প্রচার করেছে ভ্রান্ত পুরাণ; দার্শনিকেরা, এমনকি বিজ্ঞানীরাও, ওই ভ্রান্তিকেই প্রকাশ করেছেন আকর্ষণীয় রূপে; এবং নারী পুরুষের কাছে কামসামগ্রী হিশেবে কাম্য হ'লেও তার দেহের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গগুলোকে, সেগুলোর ক্রিয়াকলাপকে দেখেছে ঘৃণার চোখে। নারী স্ত্রীলিঙ্গ, তার অর্থ এ নয় যে তাকে সাংস্কৃতিক নারী হয়ে উঠতে হবে। স্ত্রীলিঙ্গ ও সাংস্কৃতিক নারীর দূরত্ব অনেক, দুটি বিষম : একটি জৈবিক আরেকটি পুরুষতন্ত্রের বিধানে প্রস্তুত। নারী আজো নিজেকে জানে না, জানে না তার উদ্ভবের প্রকৃতি ও শরীরকে; তবে পুরুষতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্যে এটা জানা অত্যন্ত দরকার।

মানুষ উদ্ভূত হয় উর্বরকৃত বা নিষিক্ত একটি কোষ থেকে [দ্র লিউইলিন-জোন্স (১৯৭১), উইলিয়ম্‌স্‌ (১৯৭৭), গ্যানোংগ্‌ (১৯৮৯)]। ওই কোষটি বা ডিম্বাণুটি উর্বর হওয়ার সাথে সাথে বিশ্লিষ্ট হয় দুটি অভিন্ন কোষে; ওই কোষ দুটি আবার বিশ্লিষ্ট হয়ে সৃষ্টি করে চারটি অভিন্ন কোষ। এভাবে সেগুলো বার বার বিশ্লিষ্ট হ'তে ও সৃষ্টি করতে থাকে অসংখ্য নতুন কোষ। পুরুষের বেলা তা ঘটে, ঘটে নারীর বেলা। ভাঙতে ভাঙতে আর গড়তে গড়তে কিছু কিছু কোষগুচ্ছ বিভিন্ন হয়ে ওঠে, এবং তৈরি করে বিশেষ বিশেষ তন্ত্রি বা প্রত্যঙ্গ। কোনো কোষগুচ্ছ তৈরি করে কংকাল, কোনো গুচ্ছ তৈরি করে পেশি, কোনো গুচ্ছ তৈরি করে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালি। কোনো গুচ্ছ তৈরি করে লাল রক্তকণিকা, কোনো গুচ্ছ তৈরি করে শাদা কণিকা। একগুচছ কোষ বহুগুণে বেড়ে তৈরি করে মস্তিষ্কের কোষ ও স্নায়ুতন্ত্রি। এসব কোষই উদ্ভূত হয় মাত্র একটি গর্ভবতী ডিম্বাণু থেকে; এবং এসব কোষের প্রত্যেকটি ধারণ করে অজস্র তথ্য। এসব তথ্যের অর্ধেক আসে জনকের কাছে থেকে, সে-শুক্রাণুটির মধ্য দিয়ে যেটি গর্ভবতী করেছে

ডিম্বাণুটিকে; বাকি অর্ধেক আসে জননীর কাছে থেকে ওই ডিম্বাণুর মধ্য দিয়েই। প্রত্যেকটি কোষ পালন করে একরাশ দায়িত্ব। কোষটিকে কী কাজ করতে হবে, সে-নির্দেশ খচিত থাকে প্রত্যেকটি কোষের কেন্দ্রস্থিত একধরনের পাকানো বস্তুতে। ওই পাকানো বস্তুর নাম *ক্রোমোসোম*। ওই ক্রোমোসোম গঠিত কয়েক কোটি গুটিকার দীর্ঘ মালায়। এগুলোর নাম *জিন*। জিন হচ্ছে তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক। জিন গঠিত হয় ডিএনএ-এর [ডিঅক্সিরিবোনিউক্লেইক এসিড] পাকানো তন্ত্রিতে। কোনো একটি কোষে কাজ করে মাত্র গুটিকয় জিন, বাকিগুলো থাকে নিষ্ক্রিয়।

মানবশরীরের প্রতিটি কোষে থাকে ৪৬টি ক্রোমোসোম; তবে এর ব্যতিক্রম দুটি কোষ : একটি নারীদেহের ডিম্বাণুকোষ, অন্যটি পুরুষদেহের শুক্রাণুকোষ। ৪৬টির মধ্যে ৪৪টি ক্রোমোসোম নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকলাপ। এ-৪৪টি ক্রোমোসমের নাম *অটোসোম*। বাকি ২টি স্থির করে লিঙ্গ, এ-দুটি লিঙ্গ ক্রোমোসোম। লিঙ্গ ক্রোমোসোম দুটির একটিকে বলা হয় X লিঙ্গ ক্রোমোসোম; অন্যটিকে বলা হয় Y লিঙ্গ ক্রোমোসোম। নারীশরীরের কোটি কোটি কোষের প্রত্যেকটিতে রয়েছে ৪৪টি অটোসোম এবং ২টি X ক্রোমোসোম; পুরুষশরীরের প্রত্যেকটি কোষে রয়েছে ৪৪টি অটোসোম, এবং ১টি X ও ১টি Y ক্রোমোসোম। নারী হচ্ছে ৪৪টি অটোসোম + XX; পুরুষ হচ্ছে ৪৪টি অটোসোম + XY। পুরুষ তার শরীরের কোটি কোটি কোষের প্রত্যেকটিতে পৃথক নারীর থেকে, কেননা তার প্রত্যেকটি কোষে রয়েছে ১টি Y ক্রোমোসোম, যা নেই নারীর শরীরে। নারীপুরুষের পার্থক্য একটি লিঙ্গ ক্রোমোসমে। নারীপুরুষের শরীরের প্রত্যেকটি কোষেই রয়েছে ৪৬টি ক্রোমোসোম, শুধু নারীর ডিম্বাণুকোষ আর পুরুষের শুক্রাণুকোষ এর ব্যতিক্রম; এ-দুটিতে ৪৬টি ক্রোমোসোম নেই, আছে মাত্র ২৩টি ক্রোমোসোম। তাই এ-দুটির আচরণও ভিন্ন। পুরুষ নারীর থেকে ভিন্ন শুধু ১টি Y ক্রোমোসমের জন্যে; এটিই ঠিক ক'রে দেয় সন্তানটি হবে পুরুষ, না নারী। Y ক্রোমোসমটি নিয়ে গর্ব করতে পারে পুরুষাধিপত্যবাদীরা, কিন্তু এর স্বভাবচরিত্র খুব প্রশংসনীয় নয়। এটির কাজ ধনাত্মক নয়, ঋণাত্মক; এটি কিছু সৃষ্টি করে না, এটি প্রকৃতি বদলে দেয় অন্যের। যখন কোনো Y ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণু উর্বর বা গর্ভবতী করে কোনো ডিম্বাণুকে, তখন এটি শুধু ওই ডিম্বাণুর স্ত্রীলিঙ্গতা কমিয়ে দেয়, তাই সন্তানটি পুরুষ হয়ে ওঠে। প্রথাগত ধারণা এমন যে নারীর সাথে কিছু যোগ করলে পুরুষ হয়; আসলে নারীর থেকে কিছু বাদ দিলে হয় পুরুষ। এটি কিছু ব্যাধিরও বিকাশ ঘটায়। পুরুষ যে নারীর থেকে কম বাঁচে, এর পেছনে আছে এটি। অপরাধবিজ্ঞানীরা এর একটি সাংঘাতিক স্বভাব লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা দেখেছেন বড়ো বড়ো অপরাধীদের অনেকের রয়েছে একটি অতিরিক্ত Y ক্রোমোসম; তারা XYY। অপরাধের সাথে সম্ভবত Y-র রয়েছে মৌল সম্পর্ক।

ডিম্বাণু উর্বর হওয়ার দিন বিশেক পর ভ্রূণের অন্ত্রের রন্ধ্রের দেয়ালে এক রকম কোষ দেখা দেয়। তারপর এ-কোষগুলো তন্ত্রির ভেতর দিয়ে চ'লে যায় অন্ত্রের রন্ধ্রের দু-দিকে

অবস্থিত নিচু পুরু এলাকায়। এ-তন্ত্রি থেকেই সৃষ্টি হয় ডিম্বাশয়। গর্ভাধানের তিরিশ দিন পরে এ-কোষগুলো ওই তন্ত্রিতে স্থির হয়ে বসে, ও বাড়তে থাকে। একে বলা হয় গোনাড। গর্ভাধানের ১৪০ দিন পরে গোনাডে প্রায় ৭০ লাখ কোষ পাওয়া যায়। এগুলোর অনেকগুলো ঢাকা থাকে আবরণে। আবরণের ভেতরে এগুলো বাড়তে থাকে, এবং অনেক কোষের মধ্যে দেখা দেয় তরল বস্তু। এগুলো ডিম্বাণু [ওসাইট]। যে-কোষগুলোতে তরল বস্তু দেখা দেয, সেগুলোকে বলে আধার বা *ফলিকল*। যে-কোষগুলোর আবরণ থাকে না, সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এবং জন্মের সময়ে মাত্র ২০ লাখ ডিম্বাণু অবশিষ্ট থাকে। এরপরও নষ্ট হয় বহু ডিম্বাণু, বয়ঃসন্ধির সময় অবশিষ্ট থাকে ২ লাখের মতো ডিম্বাণু। ঋতুস্রাবের সূচনা থেকে ঋতুবন্ধ পর্যন্ত প্রতি মাসে ১২ থেকে ২০টির মতো ডিম্বাণু বিকশিত হয়, এবং সবচেয়ে বেশি যেটি বিকশিত হয়, সেটিকে বের ক'রে দেয়া হয় ডিম্বাশয় থেকে। এটি পরিপক্ব ডিম্ব, এটি গর্ভবতী বা নিষিক্ত হ'তে পারে। মাঝেমাঝে একাধিক ডিম্বাণুও বেরিয়ে পড়ে, যার ফলে জন্মে একাধিক সন্তান। ডিম্বাশয়ে বাড়ার সময় প্রতিটি ডিম্বাণু ভেঙে সৃষ্টি হয় দুটি কন্যা-ডিম্বাণু; এ-দুটি আকারে সমান নয়, একটি বড়ো একটি ছোটো। প্রতিটি ডিম্বাণুতে থাকে ২৩টি ক্রোমোসোম : ২২টি অটোসোম, ও ১টি X ক্রোমোসোম। নিষিক্তির সময় বড়ো কোষটি শুক্রাণুর মাথাটিকে নিজের ভেতরে টেনে নিয়ে সৃষ্টি করে সন্তান। ছোটো কোষটি কোনো কাজ করে না।

নারীর ডিম্বাণু আদিম কোষ, তা ডিম্বাশয়ে জন্ম নেয় নারীর জন্মের অনেক আগে; পরে আর একটি ডিম্বাণুও জন্মে না। পুরুষের বেলা ঘটে অন্য রকম; যৌবনারম্ভ থেকে বুড়ো কাল পর্যন্ত পুরুষের অণ্ডাশয়ে ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন হ'তে থাকে শুক্রাণু। অণ্ডকোষে পাওয়া যায় এক রকম আদিম কোষ, যার থেকে তৈরি হয় শুক্রাণু। পরিপক্ব হওয়ার আগে সেগুলোর পরিবর্তন ঘটে বেশ কয়েকবার, এবং এ-সময় প্রতিটি শুক্রাণুতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায়। প্রতিটি পরিপক্ব শুক্রাণুতে থাকে ২৩টি ক্রোমোসোম, যার মধ্যে ২২টি অটোসোম এবং ১টি লিঙ্গ ক্রোমোসোম। শুক্রাণুর লিঙ্গ ক্রোমোসোমে থাকতে পারে ১টি X ক্রোমোসোম, বা ১টি Y ক্রোমোসোম। পুরুষের কোটি কোটি শুক্রাণুকে যদি দু-ভাগে ভাগ ক'রে ফেলি, তবে এক ভাগের শুক্রাণুতে থাকে ২২টি অটোসোম ও ১টি X ক্রোমোসোম, এবং আরেক ভাগের শুক্রাণুতে থাকে ২২টি অটোসোম ও ১টি Y ক্রোমোসোম। তাই যখন কোনো Y ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণু কোনো ডিম্বাণুকে উর্বর করে, তখন নতুন কোষটিতে থাকে ৪৪টি অটোসোম, এবং ১টি X ক্রোমোসোম ও ১টি Y ক্রোমোসোম। এর ফলে যে-শিশু জন্ম নেয়, সে হয় ছেলে। আর যদি ১টি X ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণু ডিম্বাণুকে উর্বর করে, তাহলে নতুন কোষটিতে থাকে ৪৪টি অটোসোম ও ২টি X ক্রোমোসোম। ফলে সন্তানটি হয় মেয়ে। তাই পিতাই নিয়ন্ত্রণ করে সন্তানের লিঙ্গ, যদিও তার কোন ধরনের শুক্রাণু গর্ভবতী করবে ডিম্বাণুকে তা নিয়ন্ত্রণের শক্তি নেই তার।

নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় তখন, যখন মাত্র একটি শুক্রাণু উর্বর করে একটি

ডিম্বাণুকে। সঙ্গমের ফলে যোনিতে স্খলিত হয় কোটি কোটি শুক্রাণু, তার মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার পৌঁছোতে পারে জরায়ুতে। তার মাত্র কয়েক শো ঢুকতে পারে ডিম্বনালিতে, এবং তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ওই নালি দিয়ে সাঁতরে এগোতে পারে ডিম্বাণুর দিকে। শুক্রাণুরা আদিম সাঁতারু। সব সাঁতারু সফল হয় না, মাত্র একটি ডিম্বাণুর শক্ত উজ্জ্বল আবরণ ভেদ ক'রে ঢুকতে পারে ডিম্বাণুর ভেতরে। যেই কোনো শুক্রাণু ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ ক'রে ভেতরে ঢুকে পড়ে, অমনি এমনভাবে বদলে যায় আবরণটি যে তাকে ভেদ ক'রে আর কোনা শুক্রাণু ভেতরে ঢুকতে পারে না। যখন ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর ক্রোমোসোম পরস্পরের সাথে মিলেমিশে যায়, তখনই সূচনা হয় নতুন জীবনের। জিনের নিয়ন্ত্রণে তখন নতুন কোষটি বার বার ভেঙে ভেঙে সৃষ্টি করে নতুন মানব। শুক্রাণুর শরীরটি এক চমৎকার সাঁতারুর; তার থাকে একটি মাথা, একটি মাঝভাগ, একটি লেজ। মাথায় থাকে ক্রোমোসোম, মাঝভাগটি যোগায় শক্তি, লেজটি কাটে সাঁতার। শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছে ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ ক'রে ক্রোমোসোমসহ নিজের মাথাটিকে ঢুকিয়ে দেয় ডিম্বাণুর ভেতরে। সে পৌঁছে তার গন্তব্যে। মাথাটি তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মাঝভাগ ও লেজ থেকে। মাঝভাগ আর লেজ আটকে থাকে আবরণে, এবং নষ্ট হয়ে যায়। ডিম্বাণুর ভেতর শুক্রাণুর মাথা ঢোকার পর তার কেন্দ্রস্থলটির আবরণ খ'সে ক্রোমোসোম বেরিয়ে পড়ে, এবং একই সাথে ডিম্বাণুর কেন্দ্রস্থলের আবরণও লুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে জননীর ২৩টি ও জনকের ২৩টি ক্রোমোসোম সম্মিলিত হয় পরস্পরের সাথে; কোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা হয় ৪৬। এভাবে মানবদেহের প্রতিটি কোষে ক্রোমোসোম থাকে ৪৬টি। নারী হচ্ছে নারী, কেননা তার শরীরের, শুধু ডিম্বকোষ ছাড়া, প্রতিটি কোষে থাকে ৪৪টি অলিঙ্গ অটোসোম আর ২টি X লিঙ্গ ক্রোমোসোম। তার শরীরে কোনো Y ক্রোমোসোম থাকে না। Y ক্রোমোসোম না থাকায় তার আভ্যন্তর ও বাহ্যিক যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো পায় বিশেষ রূপ।

পুরুষাধিপত্যবাদীদের মনে বহু শতাব্দী ধ'রে একটি কুসংস্কার জ'মে আছে যে শুক্রাণু শ্রেষ্ঠতর ডিম্বাণুর থেকে; এবং তারা এ থেকে দর্শন তৈরি করেছে যে পুরুষ নারীর থেকে উৎকৃষ্ট। এটা এক বড়ো ভুল ও পিতৃতান্ত্রিক অপপ্রচার। ডিম্বাণু-শুক্রাণুর মধ্যে কোনোটি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয় অন্যটির থেকে; ওগুলো সমান, এবং পালন করে নিজ নিজ দায়িত্ব। ডিম্বাণুর অক্রিয়তার কথা খুব বড়ো ক'রে রটানো হয়েছে, তার থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেছে যে নারী অক্রিয়। ডিম্বাণু অক্রিয় নয়। ডিম্বাণু সক্রিয়ভাবে মাসে মাসে বেরিয়ে আসে ডিম্বাশয় থেকে, নিজের মধ্যে টেনে নেয় শুক্রাণুকে; দু-ধরনের কোষের সম্মিলনে জ্ব'লে ওঠে জীবন। জীবন কোনো বিশেষ এক ধরনের কোষের সৃষ্টি নয়। নারী অক্রিয় নয়। তার যে-অক্রিয়তা দেখা যায়, তা সাংস্কৃতিক; পুরুষের বিধানেই নারী হয়ে উঠেছে অক্রিয়। এর সাথে ডিম্বাণুর আচরণের কোনো সম্পর্ক নেই। জীবন সৃষ্টিতে শুক্রাণু-ডিম্বাণুর ভূমিকা সমান; তবে মানুষের কৃতজ্ঞ থাকার কথা ডিম্বাণুর কাছে, কেননা জীবন লালনে ডিম্বাণুর ভূমিকা অনেক বেশি। ডিম্বাণুর ভেতর শুক্রাণু প্রবেশের পর ডিম্বাণু ভ্রূণটিকে লালন করে, পুষ্টি যোগায়, তাকে বিকশিত ক'রে তোলে।

এজন্যেই ডিম্বাণু আকারে অনেক বড়ো শুক্রাণুর থেকে। প্রাচীনেরা ডিম্বাণু সম্পর্কে গ'ড়ে তুলেছেন নানা উপকথা, তাকে ক'রে তুলেছেন সন্দেহজনক ও ভীতিকর। তাঁদের চোখে ডিম্বাণু স্থির, যার কাজ অপেক্ষা ক'রে থাকা; আর শুক্রাণু স্বাধীন, সচল, যেনো তা বহন করে জীবনচাঞ্চল্যের বাণী। এসবই জল্পনা। ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর স্বভাব দেখে শুধু লৈঙ্গিক রাজনীতিদক্ষরাই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে যে নারীর এলাকা ঘর, পুরুষের বাইর। ডিম্বাণু থেকে একটি নারী অনেক দূরের ব্যাপার; তাই ডিম্বাণু-শুক্রাণুর আচরণ থেকে নারীপুরুষের স্বভাব সম্পর্কে তত্ত্বসৃষ্টি নির্বুদ্ধিতা।

Y ক্রোমোসোম কী করে? এটি কাজ করে শুধু গোনাডের, অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয়ের, ওপর। এর অনুপস্থিতিতে ভ্রূণে বিকশিত হয় ডিম্বাশয়, উপস্থিতিতে বিকশিত হয় অণ্ডকোষ। অন্যান্য লৈঙ্গিক ভিন্নতা সৃষ্টি হয় হরমোনোর নিয়ন্ত্রণে। নারীর লিঙ্গ ক্রোমোসোম XX; এর একটি আসে জননী থেকে, অন্যটি জনক থেকে। তবে জনকের X ক্রোমোসোমটির উপস্থিতির ফলে সন্তানটি স্ত্রীলিঙ্গ হয় না, বরং স্ত্রীলিঙ্গ হয় Y-এর অনুপস্থিতির ফলে। ভ্রূণে ডিম্বাশয় বা অণ্ডকোষ বিকশিত হ'তে লাগে সাত সপ্তাহ। এ-সময়টিতে ভ্রূণটি নারী নয়, পুরুষও নয়; বা বলা যেতে পারে নারী, কেননা Y-এর উপস্থিতিতে ভ্রূণের গোনাড অণ্ডকোষে পরিণত হয়, আর যদি উপস্থিত না থাকে তবে তা যা ছিলো তাই থেকে যায়, অর্থাৎ সেখানে বিকাশ ঘটে ডিম্বাশয়ের। তাই নারী ও পুরুষ উভয়েরই সূচনা ঘটে নারীরূপে, সপ্তম সপ্তাহে এসেই শুধু কোনো কোনো ভ্রূণ পুরুষ হয়ে ওঠে। নারী হচ্ছে শুরু থেকে নারী, পুরুষ হচ্ছে শুরুতে নারী তারপর পুরুষ। এ দেখে মেরি জেন শারফি (১৯৭২) সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন [দ্র উইলিয়মস (১৯৭৪, ৯০)] :

> নারী ভ্রূণের রূপতত্ত্বের প্রাথম্য আমাদের বাধ্য করে লিঙ্গভিন্নতার প্রকৃতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধ'রে প্রচলিত ধারণা উল্টে দিতে। ভ্রূণতাত্ত্বিকভাবে বলা যায় যে শিশ্ন হচ্ছে অতিশায়িত ভগাঙ্কুর, অণ্ডকোষ উদ্ভূত হয় বৃহদোষ্ঠ থেকে, আদি লিবিডো নারীধর্মী ইত্যাদি।... সমস্ত স্তন্যপায়ীর জন্যে আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞান দাবি করে হাওয়া-থেকে-উদ্ভূত-আদম পুরাণ।

নারীপুরুষের যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো বিকশিত অবস্থায় খুবই ভিন্ন দেখায়, তবে ওগুলো অভিন্ন আদিম প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন বিকাশ। আদি গোনাডের একটিই রূপ, এর কোনো লিঙ্গভেদ নেই। এর দুটি অংশ : আভ্যন্তর ভাগ বা মেডুলা; এবং বহির্ভাগ বা কর্টেক্স। Y থাকলে সপ্তম-অষ্টম সপ্তাহে মেডুলা বেড়ে হয়ে ওঠে অণ্ডকোষ, কর্টেক্সটি প'ড়ে থাকে অদৃশ্য চিহ্নরূপে। যদি Y না থাকে, তাহলে কর্টেক্স বারো সপ্তাহে বেড়ে হয়ে ওঠে ডিম্বাশয়, মেডুলা নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ভ্রূণের সপ্তম সপ্তাহে তার থাকে পুরুষ [ওলফীয় নালি] ও স্ত্রী [ম্যুলারীয় নালি] উভয় ধরনেরই আদি জননেন্দ্রিয় নালি। পুরুষের বেলা ওলফীয় নালি বেড়ে সৃষ্টি হয় ভাস ডেফেরেন বা শুক্রনালি, শুক্রথলে, ও বীর্যনির্গম নালি। নারীর বেলা ম্যুলারীয় নালি বেড়ে সৃষ্টি হয় জরায়ু, ফ্যালোপীয় নালি বা ডিম্বনালি, ও যোনির ওপরের অংশ। যখন পুরুষের বিকাশ ঘটে তখন ম্যুলারীয় নালি অদৃশ্য চিহ্নের মতো প'ড়ে থাকে; যখন নারীর বিকাশ ঘটে তখন ওলফীয় নালি প'ড়ে

থাকে অদৃশ্য চিহ্নের মতো। প্রতিটি পুরুষ তার দেহে বয় নারীর পরিত্যক্ত আদি যৌনপ্রত্যঙ্গ, প্রতিটি নারী বয় পুরুষের পরিত্যক্ত আদিযৌনপ্রত্যঙ্গ। নারীপুরুষের বাহ্যিক যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোও বিকশিত হয় একই আদি প্রত্যঙ্গ থেকে; আদি একই রূপেরই ঘটে দু-রূপ বিকাশ। ভ্রূণের আট সপ্তাহ বয়স হওয়ার আগে এগুলোর কোনো ভিন্নতা থাকে না, এগুলোর সমান সম্ভাবনা থাকে নারীর বা পুরুষের যৌনাঙ্গরূপে বিকাশের। এ-সময়ে এটি হচ্ছে জননেন্দ্রিয় খাঁজের কিছু ওপরে অবস্থিত একটি যৌনকন্দ বা গুটিকা। খাঁজটির দু-পাশে থাকে মূত্রনালীয় ভাঁজ, তার পাশে থাকে ঔষ্ঠ্যঅণ্ডকোষীয় স্ফীতি। নারীর বেলা কন্দটি হয়ে ওঠে ভগাঙ্কুর, মূত্রনালীয় ভাঁজটি ক্ষুদ্রোষ্ঠ, ঔষ্ঠ্যঅণ্ডকোষীয় স্ফীতি হয় বৃহদোষ্ঠ। পুরুষের বেলা কন্দটি হয় শিশ্ন ও শিশ্নের শীর্ষ, মূত্রনালীয় ভাঁজ মূত্ররন্ধ্রের চারপাশে মিশে যায়, ঔষ্ঠ্যঅণ্ডকোষীয় স্ফীতি হয় অণ্ডকোষ। তাই নারীপুরুষের যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো বা নারীপুরুষ হচ্ছে এক অভিন্ন আদিরূপের দু-রকম উৎসারণ।

নারীপুরুষের মধ্যে ভিন্নতার থেকে অভিন্নতাই বেশি, তবে ভিন্নতা নেই এমন নয়। ওই ভিন্নতা এমন নয় যে শরীর বা লিঙ্গই হয়ে উঠবে তাদের নিয়তি, একজন করবে আধিপত্য আরেকজন থাকবে অধীন। বাস্তবে পুরুষতন্ত্র নারীপুরুষের জৈব লিঙ্গের থেকে সাংস্কৃতিক লিঙ্গকেই ক'রে তুলেছে প্রধান। ইংরেজিতে দুটি শব্দ আছে : *সেক্স* ও *জেন্ডার*, বাঙলায় শুধুই লিঙ্গ। সেক্স জৈব লিঙ্গ, জেন্ডার হচ্ছে বিশেষ লিঙ্গের জন্যে বিশেষ সাংস্কৃতিক বিধান। স্ত্রীলিঙ্গ মানুষকে নারী, আর পুংলিঙ্গ মানুষকে পুরুষ হিশেবে গ'ড়ে তোলা সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যাপার, লৈঙ্গিক রাজনীতি। সামাজিক লিঙ্গের সাথে যে জৈব লিঙ্গের সম্পর্ক নেই, তা প্রমাণিত হয় লিঙ্গদুর্ঘটনাগ্রস্তদের আচরণে। জন্ম নেয় অনেক শিশু, যারা জৈব বা মানবিক ভুলের জন্যে বিন্যস্ত হয় ভিন্ন লিঙ্গশ্রেণীতে, এবং লালিতপালিত হয় তার নতুন লিঙ্গপরিচয়ে। কোনো শিশু জৈবিকভাবে পুংলিঙ্গের, কিন্তু তার শিশ্নটি জৈব বিপর্যয়ের ফলে ঠিক মতো গ'ড়ে ওঠে নি, বা কোনো দুর্ঘটনায় সে হারিয়ে ফেলেছে শিশ্ন, তাকে পালন করা হয়েছে মেয়েরূপে; বা কোনো জৈবিক স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু বিশেষ সিনড্রোমগ্রস্ত মেয়েদের কাউকে লালন করা হয়েছে ছেলেরূপে, কাউকে মেয়েরূপে; তখন দেখা গেছে তারা আচরণ করে তাদের নতুন লিঙ্গ অনুসারে। এদের আচরণে বোঝা যায় জৈবিক লিঙ্গের সাথে সাংস্কৃতিক লিঙ্গের বিশেষ সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় বছর থেকে পাঁচ বা ছ-বছর পর্যন্ত শিশুকে যে-লিঙ্গ অনুসারে লালন করা হয়, সে আয়ত্ত করে সে-লিঙ্গেরই আচরণ, তার জৈবিক লিঙ্গ যাই হোক। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বালিকাদেরই বিশেষভাবে দীক্ষা দেয়া হয় সাংস্কৃতিক লিঙ্গে, তারা হয়ে ওঠে নারী, তাদের স্বভাব হয়ে ওঠে নারীধর্মী। এর সাথে জৈব লিঙ্গের সম্পর্ক নেই। দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ২৯৫) বলেছেন :

> কেউ নারীরূপে জন্ম নেয় না, বরং হয়ে ওঠে নারী ; সমাজে যে-নারী দেখা যায়, কোনো জৈব, মনস্তাত্ত্বিক, বা আর্থনীতিক ভাগ্য তার রূপ স্থির করে না; সমগ্র সভ্যতাই উৎপাদন করে পুরুষ ও খোজার মাঝামাঝি এ-প্রাণীটিকে, যাকে বলা হয় নারী।

নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো ঢাকা রহস্যে আর নিষেধে। নারীর শরীর যেনো আকর্ষণীয় রহস্যময় ভীতিকর দুর্গ, যার সংগঠন সে নিজে জানে না; জানাও নিষেধ। আজো মানুষের সবচেয়ে বড়ো ট্যাবো নারীর শরীর। তার একটি প্রত্যঙ্গ, স্তন, দৃষ্টিগ্রাহ্য; অধিকাংশ সংস্কৃতির পুরুষের চোখে ওটির আবেদন তীব্র, যদিও আদিম সমাজের পুরুষের চোখে ওর কোনো আবেদন নেই। তবে নারীর অধিকাংশ যৌনপ্রত্যঙ্গ দেহাভ্যন্তর ও অদৃশ্য, আর যেগুলো বাহ্যিক সেগুলোও অন্তরালবর্তী। একটি নগ্ন নারীর দিকে তাকিয়ে থেকেও তার কোনো যৌনপ্রত্যঙ্গ দেখা যায় না, শুধু আভাসের ঢেউ উঠতে থাকে। বালক শিশুর শিশ্নটি বাইর থেকে দেখা যায়, 'কী মিষ্টি' ব'লে ওটি নিয়ে তার পিতামাতারা খেলাও করে, ওটিকে দেয় নানা প্রিয় ডাকনাম;– সোনা, নুনু, ধন; কিন্তু বালিকার বাহ্যিক যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোকেও নিষিদ্ধ বস্তুর মতো ঢেকে রাখে সিন্দুকে। বালিকার যৌনপ্রত্যঙ্গের কোনটি কেমন, কোনটির কী নাম ও কী কাজ তা জানতে দেয়া হয় না বালিকাকে, জানতে চাইলে তাকে চুপ করিয়ে দেয়া হয়। যেনো ওগুলো অপার লজ্জার, ঘৃণার, অপরাধের, এমনকি পাপের। তাই নারী শৈশব থেকেই বিব্রত থাকে তার যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো নিয়ে। ওগুলো তার লজ্জা, লজ্জাস্থান; ওগুলো দেখতে নেই, দেখাতে নেই, ছুঁতে নেই, ছুঁতে দিতে নেই, ওগুলোর নাম নিতে নেই। অনেক ভাষায় বাহ্যিক যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোকে বলা হয় 'লজ্জাস্থান', এগুলোর চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পরিভাষা হচ্ছে 'পুডেনডাম' অর্থাৎ লজ্জার বিষয়। প্রথাগত লজ্জা, ঘৃণা, পাপ আর অপরাধবোধের সাথে আরেকটি দুর্নাম জড়িত ক'রে দিয়েছেন ফ্রয়েড; তিনি নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোতে দেখেছেন বিকলাঙ্গতা। নারীর শিশ্ন নেই, রয়েছে ভগাঙ্কুর; তাই নারী বোধ করে শিশ্নের অভাব, ভোগে খোজাগূঢ়ৈষায়, নিজেকে মনে করে বিকলাঙ্গ পুরুষ, এসব বাজে ধারণা তিনি যুক্ত ক'রে দিয়েছেন নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোর সাথে। এসবের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গ, ওগুলো একশো ভাগ স্বাভাবিক; আর ওগুলো লজ্জা, অপরাধ, ঘৃণা বা পাপের ব্যাপার নয়। তবু কোনো নারী নির্দ্বিধায় ছুঁতে পারে না তার প্রত্যঙ্গ, কেননা ওগুলো নিষিদ্ধ। প্রতিটি নারীর জানা উচিত তার আভ্যন্তর ও বাহ্যিক প্রত্যঙ্গগুলো, তবে শুধু অশিক্ষিত নারীরাই নয়, শিক্ষিত নারীরাও জানে না তাদের প্রত্যঙ্গগুলোকে ও সেগুলোর ক্রিয়াকলাপ। শৈশব থেকে তাদের বার বার দেখা দরকার নিজেদের প্রত্যঙ্গগুলো, বিশ্বাস করা দরকার যে ওগুলো কোনো নিষিদ্ধ বস্তু নয়। ওগুলো নিয়ে বিব্রত হয়ে থাকার জন্যে প্রকৃতি ওগুলো দেয় নি নারীকে।

নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোর কয়েকটি বাহ্যিক, কয়েকটি আভ্যন্তর। তবে এগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে নগ্ন হ'লেও, স্তন ছাড়া, নারী কখনো নগ্ন নয়। নারীর বাহ্যিক যৌনপ্রত্যঙ্গ এলাকার নাম যৌনাঞ্চল [ভালভা]। চমৎকার এলাকা এটি, আপলিনিয়ের এ-এলাকাকেই বলেছিলেন 'বিশুদ্ধ ত্রিভুজ'। এ-এলাকায় রয়েছে কয়েকটি প্রত্যঙ্গ, যেগুলো পালন করে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব। এগুলো নারীর বাইরের যৌনপ্রত্যঙ্গ, কিন্তু বাইর থেকে দেখা যায় না, দেখার জন্যে তাকাতে হয় কাছে থেকে, দেখতে হয় আঙুল দিয়ে ফুলের পাপড়ির মতো নেড়ে নেড়ে।

বৃহদোষ্ঠ : এটি হচ্ছে দু-ভাঁজ চামড়া; ঠোঁট যেমন মুখগহ্বরকে ঢেকে রাখে এ-দুটিও ঢেকে রাখে এ-দুটির মধ্যবর্তী ভগগহ্বরকে। দুটি বড়ো মোটা গোলাপপাপড়ি ব'লে মনে হ'তে পারে এ-দুটিকে। শিশু ও বুড়োকালে বৃহদোষ্ঠ দুটি থাকে ছোটো, ভেতরে মেদ থাকে না, তবে বয়ঃসন্ধি থেকে ঋতুবন্ধ হওয়া পর্যন্ত বৃহদোষ্ঠ থাকে পরিপুষ্ট। ওপরের দিকে বৃহদোষ্ঠ দুটি মিলিত হয় এক মেদপুষ্ট অঞ্চলে, যাকে বলা হয় ভেনাসের পাহাড় [মোন্স ভেনারিস] বা যোনিবিটপ। বৃহদোষ্ঠ, বিশেষ ক'রে মোন্স ভেনারিসের ওপর উদগত হয় যৌনকেশ।

ক্ষুদ্রোষ্ঠ : এ-দুটি মেদপুষ্ট স্পর্শকাতর চামড়ার ভাঁজ, গোলাপের ছোটো পাপড়ির মতো। ওপরের দিকে এ-দুটির একটি চ'লে যায় ভগাঙ্কুরের ওপরে, আরেকটি ভগাঙ্কুরের নিচে; নিচের দিকে এ-দুটি মিলিত হয় পরস্পরের সাথে। বয়ঃসন্ধি থেকে ঋতুবন্ধ পর্যন্ত এটি গুপ্ত থাকে বৃহদোষ্ঠের আড়ালে, দেখতে হয় আঙুল দিয়ে খুলে; তবে শিশু ও বুড়োকালে এ-দুটি বেশ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

ভগাঙ্কুর : পুরুষের যেমন শিশ্ন নারীর তেমন ভগাঙ্কুর; তবে শিশ্নের যৌন ছাড়া অন্য কাজ রয়েছে, কিন্তু ভগাঙ্কুরের একমাত্র কাজ যৌনসুখ অনুভব। তাই এটি অনন্য কামপ্রত্যঙ্গ, পুরুষের এমন কোনো অনন্য কামপ্রত্যঙ্গ নেই। এটি যেহেতু শুধু কামসুখের জন্যেই, আর কোনো কাজের জন্যে নয়, তাই দেশে দেশে পিতৃতন্ত্র এর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে এটি কেটে ফেলার বিধান দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক মুসলমান দেশে এখনো ভগাঙ্কুরছেদ বা নারীর খৎনা প্রচলিত রয়েছে। এটি কেটে ফেলার অর্থ হচ্ছে নারীর কামসুখের চিরাবসান। গত কয়েক দশকে নারীবাদীরা, ও মাস্টার্স্ ও জনসনের গবেষণা, প্রতিষ্ঠা করেছেন এর প্রাধান্য। তাঁদের মতে *অরগাজম* বা পুলকের জন্যে সঙ্গম অপ্রয়োজনীয়, এটি মৈথুন ক'রেই অনুভব করা সম্ভব চরম পুলক। ইলিয়েরসেন *আমি অভিযোগ করি* (১৯৬৯) নামের বইতে লিখেছেন [দ্র গ্রিয়ার (১৯৭১, ৪৩)] :

> (যৌনবিজ্ঞানীরা) পরামর্শ দেন যে সঙ্গমের অবতরণিকা হিশেবে নাড়তে হবে ভগাঙ্কুরটিকে, সঙ্গমকেই অধিকাংশ পুরুষ মনে করে 'আসল জিনিশ'। তাদের জন্যে যা 'আসল জিনিশ', নারীর জন্যে তা পুরোপুরি সুখানুভূতিহীন। এটিই হচ্ছে মূল জিনিশ! যাকে বিনীত, লজ্জাশীল ও অনুগত নারীরা শতো শতো বছর ধ'রে লুকিয়ে রেখেছে।

এটি অবস্থিত যৌনাঞ্চলের ওপরের দিকে মধ্যস্থলে। এটি মোটা শিউলিবোঁটার মতো, এর রয়েছে তিনটি অংশ : শীর্ষ, শরীবদণ্ড, ও পা। এর শীর্ষটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, দণ্ডটিও বেশ স্পর্শকাতর। শীর্ষ ও দণ্ড নেড়েই নারী পেতে পারে চরম পুলক। সঙ্গমে নারী পুলক বোধ করে প্রধানত শিশ্নের সাথে এটির ঘর্ষণে। অনেক নারী সঙ্গমে কোনো পুলক বোধ করে না, কিন্তু তারা ভগাঙ্কুর মৈথুন ক'রে চরম পুলক লাভ করে। ভগাঙ্কুরের একটু নিচেই থাকে মূত্ররন্ধ্র।

যোনিচ্ছদ : মূত্ররন্ধ্রের নিচে অবস্থিত নারীর যোনিমুখ, যেটি সাধারণত ঢাকা থাকে একটি পাতলা পর্দায়। পর্দাটির প্রথাগত নাম সতীচ্ছদ, তবে এটি থাকা-না-থাকা তথাকথিত সতীত্বের প্রমাণ-অপ্রমাণ নয়। সতীত্ব ব'লে কিছু নেই; এটি না থাকার অর্থ

এটি নেই। এটিকে যোনিচ্ছদ বলাই ভালো। এটি এক অপ্রয়োজনীয় জিনিশ। এটি একটি পাতলা পর্দা, যাতে থাকে এক বা একাধিক ছিদ্র, যার ভেতর দিয়ে নিঃসৃত হয় ঋতুস্রাব। এটির আকার ও স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন হয়ে থাকে নারী থেকে নারীতে; সঙ্গম না ক'রেও এটি ছিঁড়ে যেতে পারে, আবার বহুসঙ্গমেও থাকতে পারে অটুট। এটি ছেঁড়ার সময় সাধারণত কিছুটা রক্ত বেরোয়। অনেক সমাজে যোনিচ্ছদ ছেঁড়া ও রক্তক্ষরণকে মনে করা হয় নারীর সতীত্বের প্রমাণ। বাসর রাতের ভোরে তারা বিছানা খুঁজে দেখে রক্তের দাগ আছে কি-না। আরব ও আফ্রিকি সমাজে যোনিচ্ছদ ও বাসর রাতের রক্তক্ষরণ আজো চরম গুরুত্বের বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে সেখানে কনের পিতা চরম উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বাসরঘরের দরোজায়, তার হাতে দেয়া হয় কন্যার যোনিরক্তভেজা একটি শাদা রুমাল, আর সে সেটিকে পতাকার মতো উড়িয়ে ঘোষণা করে কন্যার সতীত্ব! রক্ষা করে বংশের মান। সেখানে এখন যোনিচ্ছদ জোড়ালাগানোর শল্যচিকিৎসা ধনীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়।

নারীর আভ্যন্তর যৌনপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে যোনি, জরায়ু, ডিম্বনালি বা ফ্যালোপীয় নালি, ও ডিম্বাশয়।

যোনি : এটি পুরুষের প্রধান স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন। পুরুষ এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, এমনকি ভয় পায় ও ঘৃণা করে এটিকে। যোনি একটি পেশল নালি, এটি পেছনের দিকে উঁচু হয়ে গিয়ে জরায়ুতে পৌঁছে। এটি পেশিতে গঠিত, এবং এতে আছে রক্তবাহী শিরাজাল, যা কামোত্তেজনার সময় ফুলে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে যোনির দেয়াল লেগে থাকে পরস্পরের সাথে; তবে এটি যেহেতু স্থিতিস্থাপক, তাই এর ভেতর দিয়ে লিঙ্গ বা ট্যাম্পুন প্রবেশের বা সন্তান প্রসবের সময় এটি বিস্ময়করভাবে প্রসারিত হয়। যোনি সাধারণত ৩.৭৫ ইঞ্চি দীর্ঘ। জরায়ুর গ্রীবা বা সারভিক্স ঢুকে পড়ে এর ভেতর। যোনি প্রত্যঙ্গ হিশেবে বিস্ময়কর। এটা শুধু স্থিতিস্থাপকই নয়, এটির আছে নিজেকে নিজে পরিচ্ছন্ন রাখার শক্তি। নারীর আভ্যন্তর প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে এটিই বেশি লিপ্ত হয় কামে; সাধারণ বোধে এটিই নারীর একমাত্র কামপ্রত্যঙ্গ। পুরুষ এটির ভেতরে শিশ্ন ঘর্ষণ ও ধাতুপাত ক'রেই চরম সুখ পায়। এটির সব অংশ সমান স্পর্শকাতর নয়, এর মধ্যভাগের কোনো স্পর্শকাতরতাই নেই, শুরু ও শেষভাগের রয়েছে কিছুটা স্পর্শকাতরতা। তাই শুধু এটির ভেতরে সঙ্গম করা হ'লে নারী পুলক বোধ করে না। ছোটো যোনি ব'লে কিছু নেই, যে-কোনো যোনিতে প্রবেশ করতে পারে যে-কোনো শিশ্ন। কামোত্তেজনার সময় যোনি সিক্ত হয়, সিক্ততা শিশ্নের প্রবেশের সহায়ক। যোনি কোনো অক্রিয় প্রত্যঙ্গ নয়, সঙ্গমের সময় এটি শিশ্নকে জিভের মতো চুষতে পারে।

জরায়ু : জরায়ু আরো বিস্ময়কর। গর্ভধারণের আগে এটি দেখতে অনেকটা নাশপাতির মতো, দৈর্ঘে প্রায় চার ইঞ্চি, পাশে আড়াই ইঞ্চির মতো, ওজন দু-আউন্স। গর্ভধারণের সময় এটির ওজন হয় আড়াই পাউন্ড, ধারণ করতে পারে সতেরো ইঞ্চি দীর্ঘ একটি শিশু। সন্তান জরায়ুতে উদ্ভূত হয় না, লালিত হয়। জরায়ু এক শূন্য পেশল আধার, এর সামনে মূত্রাশয় পেছনে মলাশয়। সামনের দিক থেকে দেখতে এটি

ত্রিকোণ, আর এটি বাঁধানো গ্রন্থিল তন্তুজালে। এ-তন্তুজালকে বলা হয় এন্ডোমিট্রিয়াম। প্রতি ঋতুস্রাবচক্রে ঘটে এ-এন্ডোমিট্রিয়ামের পরিবর্তন। এর ওপরের দিকের কোণকে বলা হয় 'করনু' বা শিং, যা ধারাবহিকভাবে ঢুকে গেছে ডিম্বনালির ভেতর।

ডিম্বনালি বা ফ্যালোপীয় নালি : ডিম্বনালি দুটি শূন্য ছোটো নালি, দুটি দু-দিকে। চার ইঞ্চির মতো লম্বা এ-নালি দুটি দু-দিকের ডিম্বাশয়ের সাথে সংযুক্ত রাখে জরায়ুকে। ডিম্বনালি খুব গুরুত্বপূর্ণ, এরই ভেতরেই ঘটে ডিম্বাণুর গর্ভ বা উর্বরায়ণ। এ-নালিতে গর্ভ ঘটার পর ভ্রূণ ক্রমশ স'রে গিয়ে বাস করে জরায়ুতে।

ডিম্বাশয় : ডিম্বনালির দু-প্রান্তে থাকে দুটি ডিম্বাশয়, দেখতে ডিমের মতো। দেড় ইঞ্চি লম্বা ও পাশে এক ইঞ্চির কম। শিশুবালিকার ডিম্বাশয় থাকে ছোটো. বয়ঃসন্ধির পর আকারে বাড়ে। ঋতুবন্ধের পর আবার ছোটো হয়ে যায়। এর আছে একটি কেন্দ্রস্থল, কেন্দ্রস্থলকে ঘিরে আছে কর্টেক্স। কর্টেক্সই প্রকৃত ডিম্বাশয়, যার ভেতর ঘুমিয়ে থাকে প্রায় দু-লাখের মতো ডিম্বাণু। পুরুষের যেমন অণ্ডকোষ নারীর তেমনি ডিম্বকোষ।

জৈব লিঙ্গ সত্য, তবে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবলতর সত্য হচ্ছে সাংস্কৃতিক লিঙ্গ। পিতৃতন্ত্র চায় পুরুষ হবে আক্রমণাত্মক, স্বাধীন, নিরাবেগ; আর নারী হবে অনাক্রমণাত্মক, দমন ক'রে রাখবে কাম; হবে অক্রিয়, সেবাশুশ্রূষাপরায়ণ, আকর্ষণীয়। সাংস্কৃতিক লিঙ্গের বিধান অনুসারে বেড়ে উঠতে হয় তাদের। বাল্যকালে তাদের লালনপালন করা হয় এ-বিধান অনুসারে, তারা দীক্ষিত হয় এতে, এবং মানবপ্রজাতি হয়ে ওঠে দুটি বিপরীত প্রাণীর সমষ্টি। এর পুরস্কার পায় পুরুষ, শাস্তি ভোগ করে নারী। জৈব লিঙ্গ মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্দেশ ক'রে দেয় না, ব'লে দেয় না যে নারী অধীনে থাকবে পুরুষের; কিন্তু সাংস্কৃতিক লিঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে এ-উদ্দেশ্য থেকে যে তা সব সময় নির্দেশ করবে নারীপুরুষের অবস্থান, ঘোষণা করবে যে পুরুষ আধিপত্যশীল নারীর ওপর। সাংস্কৃতিক লিঙ্গের ওপর গুরুত্ব আরোপ হচ্ছে *লিঙ্গবাদ*–অর্থাৎ পুরুষ হচ্ছে পুরুষ নারী হচ্ছে নারী, যা পুরুষাধিপত্যকে মনে করে চিরন্তন। নারীর শরীর দূষিত বা লজ্জার বস্তু নয়, একে নিয়ে বিধিনিষেধের বাড়াবাড়ি লিঙ্গবাদের প্রকাশ। নারী তার শরীর হারিয়ে ফেলেছে পুরুষ, সমাজ, রাষ্ট্রের কছে; কিন্তু নারীকে মনে রাখতে হবে তার শরীর তার নিজস্ব সম্পত্তি, এর ওপর সে ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, বা অলৌকিক কারো অধিকার নেই।

বালিকা

একটি নারী যেই গর্ভবতী হয়, শুভার্থীরা যখন পায় সে-সংবাদটি, সবাই স্বাগত জানাতে শুরু করে একটি সম্ভাব্য পুরুষকে, এবং নিষেধ জানাতে শুরু করে সম্ভাব্য একটি নারীকে। তারা জানে আসবে ছেলে, অথবা মেয়ে; কিন্তু যে আসবে তার ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই, যদি থাকতো তবে তা খাটাতো মাবাবা দুজনই, কেউ দ্বিধা বোধ করতো না। আজ এটা জানা যে জনকই নিয়ন্ত্রণ করে সন্তানের লিঙ্গ, তার Y ক্রোমোসোমই স্থির করে দেয় যে সন্তানটি হবে ছেলে। তবে সে মেপে মেপে নারীর ভেতরে নিজের Y ক্রোমোসোম নিক্ষেপ করতে পারে না। তাই তারা নির্ভর ক'রে থাকে দৈবের ওপর। পিতামাতা চায় ছেলে, অন্যরাও তাই চায়; মেয়ে বেশি মানুষ চায় না। যে-পুরুষের জন্মে একের পর এক মেয়ে, সে অপুরুষ হ'য়ে ওঠে সমাজের চোখে; যে-নারী একের পর এক মেয়ে প্রসব করে, তার জরায়ুর নিন্দার কোনো শেষ নেই। একটি ছেলে জন্ম দিতে পারলে মা কৃতিত্ব বোধ করে, তার দাম বেড়ে যায়, সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে; সভ্যতার দাবি মেটাতে পেরেছে ব'লে সে নিজেকে সফল মনে করে। সন্তানটি যদি প্রথম সন্তান হয়, তাহলে কথাই নেই; সবাই প্রতীক্ষা আর দোয়াকলমা পড়তে থাকে একটি ছেলের জন্যে। সবার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত ক'রে ছেলে হ'লে সাড়া প'ড়ে যায় স্বর্গমর্ত্যে, মুসলমানের আজান দিয়ে আল্লা আর মহাজগতকে তা জানিয়ে দেয়, হিন্দুরা শঙ্খকাঁসর বাজিয়ে উৎসব করে, অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও তাকে নিয়ে মেতে ওঠে নানা আড়ম্বরে। একটি মেয়ে জন্ম নিলে চারদিকে পড়ে শোকের ছায়া। যেনো বাড়িতে কেউ জন্ম নেয় নি, মৃত্যু হয়েছে কারো। একটি মেয়ের জন্ম পিতৃতন্ত্রের জন্যে অন্যতম প্রধান দুঃসংবাদ; একটি মেয়ের জন্ম পুরুষতন্ত্রের প্রচণ্ড প্রত্যাশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এক সময় আরবে, এমনকি ভারতেও, জন্মের সাথেসাথেই তাকে পুঁতে ফেলা হতো, এখন পুঁতে ফেলা হয় না; কিন্তু জন্মেই মেয়ে দেখে বিরূপ বিশ্ব, এবং সে নিয়ত একাকী। তার বিরুদ্ধে সবাই। ধাত্রী তাকে অবহেলায় তুলে ধরে, মা চোখ ফিরিয়ে নেয়, বাবার মুখ কালো হয়ে যায়। তবে সে মেয়ে, অবহেলা আর পীড়ন সহ্য করার অপার শক্তি তার, জন্মসূত্রেই সে নিয়ে আসে টিকে থাকার শক্তি। মেয়ে মায়ের গর্ভে থাকে ছেলের থেকে কিছুটা কম সময়, কিন্তু বাড়ে অনেক বেশি; তার অস্থিও হয় ছেলের অস্থির থেকে বেশি শক্ত। তার নার্ভতন্ত্রও হয় অনেক বেশি পরিণত। মেয়েরা জন্মে ছেলেদের থেকে অনেক কম ত্রুটি নিয়ে, বেঁচে থাকার শক্তিও নিয়ে আসে বেশি। গর্ভপাতে নষ্ট হয় অনেক বেশি ছেলে, মৃত ছেলেও জন্মে অনেক বেশি। জন্মের পর ছেলের মৃত্যুর হার অনেক বেশি মেয়ের মৃত্যুর হারের থেকে। পল্লীবাঙলায় মেয়ের প্রাণকে তুলনা করা হয় কইমাছের প্রাণের সাথে, কুটলেও যে মরে না। মেয়ে, পৃথিবীতে অনভিনন্দিত, বেঁচে থাকে শুধু অদম্য প্রাণশক্তিতে।

নারীপুরুষের ডিম্বাণু আর শুক্রাণুতে X ক্রোমোসোমের পরিমাণ অনেক বেশি, তাই মেয়েই বেশি জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা, জন্মও নেয় বেশি; কিন্তু মেয়ে পৃথিবীতে স্বাগত নয়। পৃথিবীর নানা অগ্রগতি সত্ত্বেও পৃথিবী এখনো আদিম, তার আদিমতার একটি হচ্ছে মেয়ে নিয়ে বিব্রত বোধ করা। গরিব প্রথাগত পরিবারেই শুধু নয়, আধুনিক পরিবারেও পুত্র ঐশ্বরিক ব্যাপার। আধুনিক পিতামাতা, যারা একটি সন্তানই যথেষ্ট শ্লোগানে দীক্ষিত, তারাও একটি ছেলের জন্যে একের পর এক মেয়ে জন্ম দিয়ে চলে, এবং একটি ছেলে জন্ম দিতে না পারার শোক সারাজীবনে ভুলতে পারে না। 'পুত্র' শব্দের মূল অর্থ 'পূত-নরক-ত্রাতা', যে পিতার মুখাগ্নি ক'রে পিতাকে উদ্ধার করে ওই ভয়ঙ্কর নরক থেকে; তাই পুত্রের জন্যে হিন্দুর ব্যাকুলতার শেষ নেই। পুত্র হচ্ছে 'নন্দন', যে আনন্দ দেয় চিত্তে। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ তাঁর সূত্ররচনার সাফল্যকে তুলনা করেন পুত্রলাভের সাথে; বলেন, সূত্র থেকে একটি মাত্রা কমাতে পারলে তিনি পান পুত্র লাভের আনন্দ। হিন্দুশাস্ত্রে পুত্রের জন্যে বাতিল ক'রে দেয়া হয়েছে নারীর সতীত্বের ধারণা : স্বামী যদি পুত্র জন্ম দিতে না পারে তবে পুত্র উৎপাদনের জন্যে বিধান রয়েছে পুত্রবীর্যবান পুরুষ নিয়োগের! মন্ত্র তো রয়েছে সম্ভবত অসংখ্য। মেয়ে তার বিপরীত; মেয়ে অস্বাগত অযাচিত। মার্কিন নারীমুক্তি আন্দোলনের বিখ্যাত নেত্রী লুসি স্টোনের জন্মের সময় তাঁর মা চিৎকার ক'রে উঠেছিলো, 'হায়! আমি দুঃখিত এটি মেয়ে। মেয়েমানুষের জীবন কী কষ্টকর।' ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী পরে আনন্দ দিয়েছিলেন অনেককে, কিন্তু তাঁর জন্মের সময় সকলের বুক থেকে যে-দীর্ঘশ্বাস বেরিয়েছিলো, তা তিনি মুছে ফেলতে পারেন নি জীবন ও মন থেকে। তিনি বলেছেন, 'আমি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে কাহারও আনন্দ বর্ধন করতে সমর্থ হই নি বরং সকলকারই আশাপ্রণোদিত চিত্তে হতাশা এবং নিরানন্দই এনে দিয়েছিলাম।' কারণ সবাই আকুল প্রতীক্ষায় ছিলো পুত্রের জন্যে, 'গড়ের বাদ্য'ও প্রস্তুত ছিলো; কিন্তু 'গড়ের বাদ্যি ছেড়ে একটি শাঁকও বাজল না, যদিও পুত্রসন্তানের শুভাগমন কল্পনায় সেটা আঁতুড় ঘরের দোরগোড়াতেই এনে রাখা হয়েছিল।' [দ্র চিত্রা (১৯৮৪, ৩০-৩১)]। ভার্জিনিয়া উল্ফ্ শেক্সপিয়রের বোনের কথা বলেছেন; এভাবেই পৃথিবীতে আসে শেক্সপিয়রের বোনেরা। বাঙলায় নারীদের মধ্যে যিনি প্রথম আত্মজীবনী লিখেছেন, সে-রাসসুন্দরী বলেছেন, মেয়েমানুষের জন্ম মিছা। সে স্ত্রীলিঙ্গ, তবে তার লিঙ্গে এমন কোনো নির্দেশ নেই যে সে হয়ে উঠবে 'নারী' : পুরুষের বিপরীত, পরাধীন পর্যুদস্ত পরনির্ভর। তার জন্মের পর পুরুষের সভ্যতা তাকে শাসন ক'রে তাকে বানিয়ে তোলে নারী, তাকে নানা তুচ্ছ পুরস্কার দিয়ে তাকে গ'ড়ে তোলে এমন বস্তুরূপে, যার নাম নারী। সে বেড়ে ওঠে বালিকারূপে; তার ভেতরে চলতে থাকে অবিরাম ভাঙাগড়া, তার বাইরে চলে পুরুষতন্ত্রের হাতুড়ির আঘাতে নিরন্তর ধ্বংস ও নির্মাণ। যে-নারী চারপাশে দেখতে পাই, তা এক বিকৃত জিনিশ; তা সামাজিক ভাঙাগড়ার অস্বাভাবিক পরিণতি। কোনো নারীকে স্বভাব অনুসারে বাড়তে দেয় না পিতৃতন্ত্র। জন্মসূত্রে সে স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু পিতৃতন্ত্রের হাতুড়ির ঘায়ে সে হয়ে ওঠে এমন এক লিঙ্গ, যাকে বোভোয়ার (১৯৪৯, ২৯৫) বলেছেন 'পুরুষ আর খোজার মাঝামাঝি লিঙ্গ'।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজসভ্যতা বিচিত্র ধরনের পুলিশবাহিনীর সমষ্টি; গায়ের জোরে টিকে থাকতে হ'লে পুলিশ ছাড়া উপায় নেই। পিতামাতা পরিবার পুলিশ, শোয়ার ঘর রান্নাঘর পুলিশ, রাস্তা পুলিশ, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ, মসজিদ মন্দির গির্জা সিনেগগ প্যাগোডা পুলিশ, সবাই পুরুষতন্ত্রের পুলিশ। এসব বাহিনীর প্রহরার মধ্যে বন্দী বালিকা বেড়ে ওঠে নারী হয়ে। এসব সংস্থা তাকে শুধু ভয় দেখায় না, তাকে পুরস্কারের লোভও দেখায়; তাকে ভয় দেখায় যাতে সে পুরুষের মতো বেড়ে উঠতে না চায়, তাকে পুরস্কারের লোভ দেখায় যাতে সে বেড়ে ওঠে পুরুষতন্ত্রের আদর্শ নারীকাঠামো অনুসারে। একে বলা হয় *বলীয়ানকরণ* বা *রিইনফোর্সমেন্ট*। এসব সংস্থা তার সামনে উপস্থিত রাখে অনুকরণীয় আদর্শকাঠামো, নিজেকে ঢেলে তৈরি হ'তে নির্দেশ দেয় ওই কাঠামোর আদলে। এর নাম *আদর্শকাঠামো অনুকরণ* বা *মডেলিং*। বালকের জন্যেও রাখে আদর্শকাঠামো অনুকরণের ব্যবস্থা, তবে তার আদর্শকাঠামো বিপরীত। বালিকার অনুকরণের আদর্শ মা ও চারপাশের দীক্ষিত নারীরা; তাই বালিকা হয়ে ওঠে নারী। বালকবালিকা জন্মের পরই বুঝে ওঠে না যে তারা পুরুষ বা নারী, লিঙ্গ তাদের কাছে গুরুত্বের ব্যাপার নয়। শুরুতে তারা নিজেদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই করে না। তাদের চোখে তারা এক, তাদের জগত এক; তারা, বালিকা আর বালক, উভয়েই বিশ্বকে উপলব্ধি করে হাত দিয়ে, পা দিয়ে, চোখ কান নাসিকা দিয়ে। পৃথিবীতে এসেই তারা শিশ্ন বা যোনি দিয়ে পৃথিবীকে পরখ করে না। তারা ছোটোবেলা বাড়ে একই রকমে, একই রকমে মায়ের স্তন চোষে, জড়িয়ে ধরে একই রকমে, তারা আদর উপভোগ আর ঈর্ষা বোধ করে একই রকমে। বারো বছব বয়স পর্যন্ত বালকবালিকার দেহে থাকে সমান শক্তি, মনোবলও থাকে একই পরিমাণে। তবে তিন বছর বয়স থেকে, বিশেষ ক'রে বয়ঃসন্ধি থেকে বালিকার আচরণে দেখা দিতে থাকে নারীত্ব। আগে এ-নারীত্বের অভিব্যক্তি ঘটতো অত্যন্ত সমারোহের সাথে, এখন তার প্রকাশ অনেক ক'মে গেছে। ওই নারীত্ব দেখে বিস্মিত আর মুগ্ধ হয়ে পড়তো পুরুষতন্ত্র, তারা মনে করতো বালিকার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে এক নারী, যে জেগে উঠতে শুরু করেছে। বিদ্যাসাগর [১৯৮৭, ৪১৮] *প্রভাবতীসম্ভাষণ*-এ প্রভাবতী নামের একটি বালিকার নারীআদর্শ অনুকরণের উল্লেখযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন :

১। কখনও কখনও, স্নেহ ও মমতার আতিশয্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক, ঐকান্তিক ভাবে, তনয়ের লালনপালনে বিলক্ষণ ব্যাপৃত হইতে।

২। কখনও কখনও, 'তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে' বলিয়া, দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, বিষণ্ন বদনে, ধরাসনে শয়ন কবিয়া থাকিতে।

৩। কখনও কখনও, 'শ্বশুরালয় হইতে অশুভ সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, ম্লান বদনে ও আকুল হৃদয়ে, কালযাপন করিতে।

৪। কখনও কখনও, 'স্বামী আসিয়াছেন' বলিয়া, ঘোমটা দিয়া, সঙ্কুচিতভাবে, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে; এবং, সেই সময়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জাশীলা কুলমহিলার ন্যায়, অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিতে।

৫। কখনও কখনও, 'পুত্রটি একলা পুকুরের ধারে গিয়াছিল, আর একটু হইলেই ডুবিয়া পড়িত', এই

বলিয়া, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয় আকুলতাপ্রদর্শন করিতে।
৬। কখনও কখনও, 'শ্বাশুড়ীর (sic) পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, অবিলম্বে শ্বশুরালয়ে যাইবার নিমিত্ত, সজ্জা করিতে।

তবে প্রভাবতী কোনো জন্মনারী নয়, সে নারীর নকল। বিদ্যাসাগর তার আচরণে মুগ্ধ হ'লেও তার আচরণকে কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ব'লে মনে করেন নি, মনে করেছেন সে যদি 'এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে' আরো বেঁচে থাকতো তাহলে তার 'যে সকল লীলা ও অনুষ্ঠান করিতে হইত' সে তা সম্পন্ন ক'রে গেছে শৈশবেই। সে কাঠামো অনুকরণের এক অসাধারণ উদাহরণ। বালিকার মধ্যে নারীত্বের প্রকাশ রহস্যময় জৈবিক নিয়ন্ত্রণের অবধারিত ফল নয়, জিনক্রোমোসোম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সংবাদ রাখে না। নারীত্ব হচ্ছে সমাজের অনিবার্য প্রভাব ও পীড়নের পরিণতি। সমাজে বেড়ে ওঠার অর্থ হচ্ছে সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল আয়ত্ত করা। সে টিকে থাকে, যে খাপ খায়; যে খাপ খায় না সমাজ তাকে ধ্বংস ক'রে দেয়, বা সে বদলে দেয় সমাজকে। অধিকাংশ মানুষই নিজেদের অস্তিত্বের জন্যে খাপ খায় সমাজের সাথে, শেখে সে-সব বিধিবিধান, যা তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে। ভঙ্গুর বালিকার পক্ষে সমাজ বদলে দেয়া অসম্ভব, তাই শেখে সামাজিক সূত্র। বালিকা তার জীবনের দ্বিতীয় বছর থেকে চারপাশ দেখে দেখে বোঝে যে নারী হয়ে ওঠাই তার সামাজিক নিয়তি। প্রতিটি বালকবালিকার কাছে সমাজ একটি বিশাল আয়না, যাতে তারা দেখতে পায় নিজেদের, ও তাদের, হয়ে উঠতে হবে যাদের মতো। তারা দেখে হয়ে উঠতে হবে পিতামাতার মতো; পিতা তাদের সামনে এক আদর্শকাঠামো, মা তাদের সামনে এক আদর্শকাঠামো। ওই কাঠামো অনুসারে ছেলে হয় পুরুষ, বালিকা হয় নারী। কোনো জৈবিক কারণে তারা সামাজিক নারীপুরুষ হয়ে ওঠে না।

ছোটোবেলা থেকেই বালিকার সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে প্রিয়জনেরা। বালিকা জন্মের সময় অভিনন্দিত হয় নি, জন্মের পরও সে পায় না ভাইয়ের সমান আদর। প্রথাগত পরিবারে, দরিদ্র পরিবারে, অনুন্নত সমাজে বালিকা অনেক কম আদর পায় ভাইয়ের থেকে। অবহেলার মধ্যে বড়ো হয় বালিকা। তার খাবার হয় কম, ও নিম্নমানের; ছেলের জন্যে তোলা থাকে মাছের মুড়োটি, দুধের সরটুকু রেখে দেয়া হয় ছেলের জন্যে, গাছের ফলটিও পাকে তারই জন্যে। বাঙালি সমাজে শৈশব থেকেই মেয়ের ভাগে জোটে এঁটোকাঁটা বাসি খাবার। সবার খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আসে তার খাওয়ার পালা, উচ্ছিষ্ট থেকেই মেয়েকে সংগ্রহ করতে হয় বেঁচে থাকার শক্তি। ওই উচ্ছিষ্ট খেয়ে কারো পক্ষে বীর হওয়া সম্ভব নয়, মেয়েও বীর হয় না; তার কাছে প্রত্যাশাও করা হয় না। জন্মসূত্রে সে নিয়ে এসেছিলো ছেলের থেকে অনেক শক্ত অস্থি, কিন্তু অপুষ্টির ফলে তার অস্থি হয়ে পড়ে দুর্বল। পরিপূর্ণ নারীর কংকালও থেকে যায় শিশুর কংকালের মতো অসুগঠিত, শরীরবিদ্যায় যাকে বলা হয় *পেডোমোর্ফিক* বা *বালরৌপিক*, তার কারণ বালিকার আশৈশব অপুষ্টি। শিশুছেলেকে যে-যত্নে শোয়ানো হয়, পরিষ্কার করা হয় তার মলমূত্র, বালিকা সে-যত্ন পায় না। পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ

বালিকা বড়ো হয় অনাদরে। ধীরেধীরে বালিকা জড়িয়ে পড়ে একজনের সাথে, যে বড়ো হয়েছে ও বেঁচে আছে তারই মতো অনাদরে, সে তার মা। মায়ের সাথে মেয়ের নাড়ি কখনো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। বাঙালি নারীদের আত্মজীবনীতে একটি শব্দ বারবার মেলে, শব্দটি 'অভাগিনী'। এক অভাগিনী বড়ো হ'তে থাকে আরেক অভাগিনীর আঁচলের নিচে। নিয়তি নিজের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে জড়িয়ে দেয় মা ও মেয়েকে। বালিকা জড়িয়ে পড়ে মায়ের সাথে, আর ছেলে একটু একটু দূরে স'রে যেতে থাকে; মনে হ'তে পারে যে বালিকা একটু বেশি আদর পাচ্ছে আর কম আদর পাচ্ছে ছেলেটি। তবে এও এক পিতৃতান্ত্রিক প্রতিভাস।

উন্নত, এমনকি আমাদের সমাজেও একটু বড়ো হবার পর ছেলে আর মাবাবার আলিঙ্গন আদর আগের মতো পায় না, কিন্তু মেয়েটি পায়। বালিকা হয়ে ওঠে তাদের পুতুল। মায়ের শরীর ঘেষে থাকতে পারে বালিকা, ছেলে পারে না; সে নির্বাসিত হয় মায়ের আঁচলের বাহুর আলিঙ্গনের আপাতমনোরম এলাকা থেকে। বাবাও মেয়েকে বুকে জড়িয়ে রাখে, আদর করে কাজেঅকাজে, একটু দূরে সরিয়ে দেয় ছেলেকে। মেয়েকে দেয়া হয় রঙিন জামাকাপড়, তার ঠোঁটের বাঁকা কারুকাজে মুগ্ধ হয় মাবাবা, তার চোখে অশ্রু মুক্তো মনে হয় তাদের। তার চুল আঁচড়ে দেয়া হয় যত্নে, তার মেয়েলিপনা দেখে মুগ্ধ হয় সবাই। সে থাকে মনোরম বাগানে; আর ছেলেকে যেনো নির্বাসিত করা হয় দণ্ডকারণ্যে। তার আদুরেপনা অসহ্য মনে হয়, তার ছলাকলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাকে বার বার বলা হয় 'পুরুষ এটা করে না', 'পুরুষ সেটা করে না', 'পুরুষ শাড়ি পরে না', 'পুরুষ লিপস্টিক দেয় না'। মেয়েকেও বলা হয় 'মেয়েরা এটা করে না', 'মেয়েরা ওটা করে না', 'মেয়েরা শার্ট পরে না', 'মেয়েরা এভাবে কথা বলে না'। স্থির ক'রে দেয়া হয় তাদের লিঙ্গপরিচয় ও লিঙ্গভূমিকা। ভিন্ন ক'রে দেয়া হয় তাদের ভূমিকা; তাদের বাধ্য করা হয় বিপরীত ভূমিকার পাত্রপাত্রী হয়ে উঠতে। ভিন্ন ক'রে দেয়া হয় ছেলে ও মেয়ের কাজ, আচরণ, এলাকা। ছেলেকে কাজ দেয়া হয় মুক্ত এলাকার, তাকে দেয়া হয় স্বাধীনতা; মেয়েকে দেয়া হয় অবরুদ্ধ এলাকার কাজ, তাকে দীক্ষিত করা হয় অধীনতা আর অবরোধে। মেয়ে ভয় পেলে খুশি হয় সবাই, আর ছেলে ভয় না পেলে খুশি হয় সবাই। মেয়েকে হ'তে হবে ভীত, সন্ত্রস্ত; টিকটিকি দেখেও সে কেঁপে উঠলে সবাই স্বস্তি বোধ করে যে একটি নারীর জন্ম হচ্ছে; সভ্যতা পাচ্ছে একটি বিশুদ্ধ নারী। তারা পৃথক, তারা পৃথক এলাকার; একজন অবরুদ্ধ ঘরের, আরেকজন মুক্ত বাইরের। তাদের জৈবনির্দেশের মধ্যে এসব নেই, আছে সামাজিক নির্দেশে; স্ত্রী ও পুংলিঙ্গ জৈব, নারী ও পুরুষ সামাজিক।

ছেলেকে যে থাকতে দেয়া হয় না মায়ের আঁচলের নিচে আর বাবার বুকের কাছে, তাতে মনে হ'তে পারে যে মেয়েটিকে আদর করছে সবাই, অনাদর করছে ছেলেটিকে; মেয়েটি সকলের চোখের মণি। কিন্তু আসলে চোখের মণি ছেলেটিই। তার সাথে যে আপাতরূঢ় আচরণ করা হয়, তার কারণ তার জন্যে সামনে প'ড়ে আছে অসামান্য সব ব্যাপার, যা ওই আদরের থেকে অনেক মহৎ, যার ভাগ মেয়ে কখনো পাবে না।

ছেলেবেলা থেকেই ছেলের কাছে প্রত্যাশা করা করা হয় বড়ো বড়ো কাজ, কেননা সে উৎকৃষ্ট মেয়ের থেকে। সে পিতৃতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, পিতৃতন্ত্র তারই হাতে অর্পণ করবে সভ্যতা। সে ছেলে, তাকে করতে হবে বিশ্বের কাজ; তাই সে হবে ভিন্ন, তাকে হ'তে হবে সাহসী, হ'তে হবে পুরুষ। সে সাগর পেরিয়ে যাবে, আকাশ ভেদ ক'রে ছুটবে; সে ভোগ করবে বসুন্ধরা। সে পুরুষ, তাকে হয়ে উঠতে হবে পুরুষ। তার পুরুষত্বের একটি প্রতীকও সমাজ খুঁজে পায় তার শরীরে, সেটি শিশ্ন। বালক তার শিশ্নকে সহজাত মহৎ মনে করে না, ওই প্রত্যঙ্গটির যে রয়েছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা তাও সে জানে না; কিন্তু চারপাশের আচরণ থেকে সে বুঝতে পারে ওটির গুরুত্ব। বড়োরা তার শিশ্নটিকে নানা ডাকনামে ডাকে, ওটিকে বলে সোনা নুনু ধন, ওটিকেই ক'রে তোলে একটি ব্যক্তি। শিক্ষিত সমাজে শিশ্নের মহিমা কমেছে, কিন্তু চাষীসমাজে এর মহিমা এখনো অপ্রতিহত। শিশ্নটি বড়ো হয়ে একাধিক দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু শৈশবে এর দায়িত্ব প্রস্রাবের। মেয়ের শিশ্ন নেই, রয়েছে দুটি রন্ধ্র, যা সে দেখতে পায় না। সে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে পারে না। এটা এক অসুবিধা। মুসলমানদের অবশ্য পুরুষনারী উভয়েরই জন্যে বিধান রয়েছে ব'সে প্রস্রাব করার; তবে দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের রয়েছে বিশেষ সুবিধা। বালিকা সে-সুবিধা নিতে পারে না। বালকের শিশ্ন তাকে ক'রে তোলে বিশিষ্ট।

বালিকার যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো মা, বা অন্য কারো চোখে মর্যাদা পায় না। সে তার প্রত্যঙ্গগুলো দেখতে পায় না, তাকে বলা হয় ওগুলো লুকিয়ে রাখতে; তার মনে এমন বোধ সৃষ্টি ক'রে দেয়া হয় যে ওগুলো লজ্জার বিষয়, ওগুলো নিষিদ্ধ, ওগুলোর কথা যতো ভুলে থাকা যায় ততোই ভালো, যেনো ওগুলো নেই। তার প্রত্যঙ্গগুলো যে আড়ালে থাকে, সে যে দেখতে পায় না ওগুলো, এতে বালিকা কোনো অভাব বোধ করে না। তবে সে বুঝতে পারে তার অবস্থান ছেলের অবস্থানের থেকে অনেক ভিন্ন, অনেক নিম্ন। পরিবার, সমাজ, সভ্যতা বালিকার বিরুদ্ধে ও বালকের পক্ষে এমনভাবে অবিরাম কাজ করতে থাকে যে সে অসহায় বোধ করে, এমনকি বোধ করে হীনমন্যতা। সবাই যাদের উপেক্ষার বিষয় মনে করে, তাদের পক্ষে হীনমন্যতাবোধ স্বাভাবিক; যুগ যুগ ধ'রে নিজেদের হীন অবস্থান দেখে দেখে তারা নিজেরাই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা আসলেই হীন। বালিকাও তা বোধ করতে পারে, বালিকাও তা বোধ করে। বালিকা বোধ করে সে নিকৃষ্ট তার ভাইয়ের থেকে। ভাইয়ের শিশ্ন আছে, তাকে ভালোটা খেতে দেয়া হয়, তার দাবি পূরণ করা হয় দ্রুত। বালিকা দেখে তার দাবি মেটে না, সে খাবার বেলা পায় মাছের বাজে টুকরোটি, মুড়ো খাওয়ার স্বপ্ন তার স্বপ্নই থেকে যায়। তাই তার জাগতে পারে, এবং জাগে হীনমন্যতাবোধ। ফ্রয়েড বালিকার হীনমন্যতা দেখেছেন; তিনি মনোবিজ্ঞানী হিশেবে উৎকৃষ্ট হ'তে পারেন, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী হিশেবে খুবই নিকৃষ্ট। তিনি বলেছেন খোজাগূঢ়ৈষার কথা, বালিকার শিশ্নাভাবের কথা, শিশ্নাসূয়াগ্রস্ততার কথা। তিনি বলেছেন বালিকা ঈর্ষা করে বালকের শিশ্নকে, কেননা তার শিশ্ন নেই; বালিকা শিশ্নের অভাবে ভোগে হীনমন্যতায়। ফ্রয়েডের তথ্য নির্ভুল, তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল।

বালিকা শিশ্নকে ঈর্ষা করে না, ঈর্ষা করে শিশ্নের অধিকারীকে। একটি শিশ্ন থাকলে অশেষ অধিকার, না থাকলে অধিকার নেই। শিশুবয়সে সামনের দিকে লেজের মতো ঝুলে থাকা শিশ্নটিকে বরং হাস্যকর আর খাপছাড়া ব'লেই মনে হয়। ওটি দেখে যে ঘেন্না জন্মে, তা নয়; আবার ওটি দেখার সাথে সাথে যে ওটির মহত্ত্বের কাছে অবনত হয়ে পড়তে হয়, এমনও নয়। ফ্রয়েড মনে করেছেন, আর তাঁর অনুসারীরা রটিয়েছেন, যে বালিকা বালকের শিশ্ন দেখার সাথেসাথেই লাভ করে দিব্যদৃষ্টি, তখনই বুঝে ফেলে যে তার নেই শিশ্ন, এবং সাথে সাথে আক্রান্ত হয় হীনমন্যতায়। তাঁরা ভুল বুঝেছেন বালিকার মনস্তত্ত্ব। একটি প্রত্যঙ্গ দেখেই হীনমন্যতার আবেগ জাগে না, এর জন্যে থাকা দরকার নিজের অবস্থা নিয়ে অসন্তোষ। বালিকা দেখে দেখে বড়ো হয় যে অনেক কিছুই তার প্রাপ্য নয়, আর ছেলের প্রাপ্য সব কিছু: তখন সে ঈর্ষা করে বালককে, পুরুষকে, তার শিশ্নটিকে নয়। বালিকা শিশ্নের ঈর্ষায় কাতর নয়, তবে একটি শিশ্নের অভাব তার জীবনে নিয়তির মতো কাজ করে। বোভোয়ারের মতে বালক তার শিশ্নে অনুভব করে নিজের ব্যক্তিত্ব, কিন্তু বালিকা তার কোনো প্রত্যঙ্গে ব্যক্তিত্বের আশ্বাস পায় না। ছেলে খেলতে পারে তার শিশ্ন নিয়ে, মেয়ে নিজের যৌনপ্রত্যঙ্গ নিয়ে খেলতে পারে না। খেলার জন্যে সে পায় পুতুল। পুতুল বস্তু, বালিকা ওই বস্তুর সাথে নিজেকে বোধ করে অভিন্ন। বালিকা পুতুল সাজায়, তাকে নিয়ে খেলে, তাকে আদর করে, যেমন আদর সে নিজে চায়। সে নিজেকে মনে করে পুতুল। বালক যখন ব্যক্তি হয়ে ওঠে, তখন বালিকা হয়ে ওঠে পুতুল। সে চারপাশে দেখে নারীদের, বালিকা শেখে রূপের মূল্য, নিজে হয়ে উঠতে চায় রূপসী। সাজগোজ হয় তার প্রিয়, আয়নায় সে দেখে নিজেকে, অন্যরা যখন তাকে সুন্দর বলে সে সুখ পায়। সে হয়ে উঠতে চায় পরী বা রাজকন্যা। সে তখন থেকে আর নিজের জন্যে বাঁচে না, বাঁচে অন্যের জন্যে। যে-রূপের জন্যে তার ব্যাকুলতার শেষ নেই, সে-রূপও তার নিজের জন্যে নয়, যেমন তার জীবনও নিজের জন্যে নয়। বালিকা নারী হয়ে উঠতে থাকে, আর হারাতে থাকে স্বায়ত্তশাসন।

বালিকার জীবনে দেখা দেয় *নার্সিসিজম* বা আত্মপ্রেম, তবে তা কোনো রহস্যময় জৈবিক কারণে নয়। বালিকা দেখে তার কোনো কাজের জন্যে সে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার গুরুত্ব শুধু তার রূপের জন্যে। চারপাশের নারীদের দেখে সে, দেখতে পায় রূপই তাদের সম্পদ। সে তখন মন দেয় নিজের শরীরের দিকে, তাকে সাজিয়ে ক'রে তুলতে চায় রক্তমাংসের পুতুল। সে বুঝে ফেলে তার রূপ দিয়ে সে সম্ভোগ করবে না, বরং সে হবে সম্ভোগের বস্তু। নারী অক্রিয়, তবে তার অক্রিয়তাও কোনো জৈবিক কারণে নয়; তাকে রহস্যময়ী বলা হ'লেও তার কোনো আচরণই রহস্য নয়। আত্মপ্রেম আর অক্রিয়তার পাঠ সে নেয় সমাজের কাছ থেকেই, সে হয়ে ওঠে সমস্ত সামাজিক নিয়মের মেধাবী ছাত্রী। কেননা তাতে উত্তীর্ণ হ'লে সে পুরস্কার পাবে, ব্যর্থ হ'লে জুটবে শাস্তি। বালিকা যখন ঘরে বন্দী হয়ে মেতে থাকে দিবাস্বপ্নে, লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে অক্রিয়তায়, তখন বালক বেরিয়ে পড়ে বাইরের জগতে। সে গাছে ওঠে, নৌকো চালায়, রাস্তায় যায়, মারামারি করে; সে নিজের দেহকে মনে করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। বালিকার শরীর যখন হয়ে ওঠে সুন্দর বোঝা, তখন বালকের শরীর হয়ে ওঠে

তার বড়ো সম্পদ। সে তার শরীর দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে পরিপার্শ্বকে। সে সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে অনুভব করে তার অস্তিত্ব। বালিকার বেলা ঘটে বিপরীত, সক্রিয়তা নিষিদ্ধ তার জীবনে। বালিকা তার সত্তা আর জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বোধ করে বিরোধিতা। বালিকাকে শেখানো হয় তার কাজ অন্যদের মনোরঞ্জন করা; সে নিজের সুখ চাইবে না, সুখ চাইবে অন্যের; অন্যের সুখই তার সুখ। তাকে শেখানো হয় যে সে নিজেকে পরিণত করবে নিষ্প্রাণ বস্তুতে, সে ছেড়ে দেবে নিজের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার।

সে হয়ে ওঠে জীবন্ত পুতুল, বাতিল হয়ে যায় তার স্বাধীনতা। সে কোনো কিছু নিজে বোঝার চেষ্টা করবে না, তার হয়ে বুঝবে অন্যরা; সে নিজে কিছু জানতে চাইবে না, তার হয়ে জানবে অন্যরা; সে নিজে কিছু করবে না, তার হয়ে করবে অন্যরা। বালিকা এভাবে হারিয়ে ফেলে তার মানসিক শক্তি, ক'মে যায় তার ভেতরের সম্পদ। সে হয়ে ওঠে শূন্য পাত্র। এভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর সে আর নিজেকে প্রধান ক'রে তোলার সাহস করে না। যদি তাকে উৎসাহিত করা হতো, তবে সেও পারতো বালকের মতো সাহসী, উদ্যমপরায়ণ, নির্ভীক, স্বাধীন হয়ে উঠতে। যখন কোনো মেয়েকে ছেলের মতো পালন করা হয়, তখন তার মধ্যে দেখা যায় সাহস, উদ্যম, স্বাধীনতা। বালিকারা যখন পুরুষের লালনে বড়ো হয়, তখন তারা কাটিয়ে ওঠে নারীত্বের ত্রুটিগুলো; কিন্তু সমাজ বালিকাকে বালকরূপে লালনের অনুমতি দেয় না। কোনো মেয়ে চুল ছোটো করলেই সমাজ হাহাকার ক'রে ওঠে। বাবার প্রভাবে বালিকা অনেকটা স্বাধীন হয়ে ওঠে, কিন্তু তার স্বাধীনতা হরণ করার মতো চারপাশে মা, খালা, ফুপুর অভাব নেই। কোনো বালিকাকে লালনের ভার নারীর হাতে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে বিকলাঙ্গ ক'রে তোলা। নারীরাই চিরকাল পালন ক'রে আসছে বালিকাদের, এবং তৈরি করছে বিকলাঙ্গ মানুষ। বালিকার সবচেয়ে বড়ো শুভার্থী তার মা; তবে মা-ই হয়ে ওঠে বালিকার বড়ো শত্রু। মা হচ্ছে পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত প্রাণী, যে নিজের জীবন দিয়ে সেবা করে পুরুষতন্ত্রের। মা মেয়েকে নিজের থেকেও নারী ক'রে তুলতে চায়, আর ছেলের মধ্যে চায় চূড়ান্ত পৌরুষ। মা পিতৃতন্ত্রের আদর্শ নারী গড়ার পারিবারিক কুম্ভকার। সে মেয়েকে ভালোবেসে নিজের মতো ক'রে তুলতে চেয়ে নিজের নিয়তি চাপিয়ে দেয় মেয়ের ওপর। মা নিয়তির মতো থাকে মেয়ের পাশে। মা ময়েকে ক'রে তুলতে চায় খাঁটি নারী, সতীসাধ্বী, কেননা সমাজ তার মেয়েকে এভাবে পেতেই পছন্দ করবে। মা তার জন্যে সংগ্রহ করে বান্ধবী, দেখে তার মেয়ের যাতে কোনো বন্ধু না জোটে; মা মেয়েকে শেখায় ধর্মকর্ম, শোনায় সতীসাধ্বীদের কাহিনী, শেখায় রান্নাবান্না, শেলাই। মা জানে রূপ খুব দরকার, তাই বালিকাকে শেখায় যে তাকে হয়ে উঠতে হবে সুন্দরী, অন্যের কাছে আকর্ষণীয়, নম্র, লজ্জাবতী। মা তার কন্যার জীবনকে সফল ক'রে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে নষ্ট করে কন্যার সত্তা। বালকবালিকার পোশাকেও আছে সক্রিয়তা ও অক্রিয়তার ব্যাপার। বালকের পোশাক সক্রিয়তার, বালিকার পোশাক সম্পূর্ণ অক্রিয়তার। বালক তার পোশাক তাড়াতাড়ি পরতে আর খুলতে পারে, যে-কোনো অবস্থায়ই তার পোশাক তার সক্রিয়তাকে বাধা দেয় না। কিন্তু বালিকা তার পোশাক

নিয়ে সারাক্ষণ থাকে বিব্রত। বালিকাকে পরতে হয় শাড়ির মতো বিব্রতকর পোশাক, যা তাকে ঘিরে রাখে, তাকে গ্রাস ক'রে রাখে। ওই শাড়ি প'রে দৌড়োনো যায় না, গাছে ওঠা যায় না, সাঁতার দেয়া যায় না। শাড়ি প'রে শুধু শুয়ে থাকা যায়। শাড়ির প্রতিবন্ধকতায় বালিকার পক্ষে সক্রিয় হওয়া অসম্ভব। তার পোশাকের অক্রিয়তার সাথে তাকে শেখানো হয় যে সোজা হয়ে হাঁটবে না, হাঁটবে মেরুদণ্ড বাঁকা ক'রে, সংকুচিত হয়ে। নিজেকে নিয়ে সব সময় থাকবে বিব্রত। এভাবে নষ্ট ক'রে দেয়া হয় তার স্বতস্ফূর্ততা। তাকে বানিয়ে তোলা হয় দাসী, পুতুল। আজকাল মধ্যবিত্তদের মধ্যে এটা কমছে, বালিকাকে দেয়া হচ্ছে সক্রিয়তার অনেক সুযোগ, তবে তা বালকের সুযোগের একাংশও নয়। লক্ষ্য হচ্ছে যেভাবেই হোক বালিকাকে নারী ক'রে তুলতে হবে।

বালিকার জগত ছোটো, মাকে দেখে দেখে তার মনে হয় মা পিতার থেকে শক্তিমান। তাই মা তার অনুকরণীয় আদর্শকাঠামো। সে মায়ের অনুকরণ করে, মায়ের মতো হয়ে উঠতে চায়, মা হয়ে উঠতে চায়। এক সময় পুতুল খেলার খুব চল ছিলো মেয়েদের মধ্যে, প্রতিটি মেয়েরই থাকতো একরাশ পুরোনো কাপড় দিয়ে তৈরি পুতুল। বালিকারা পুতুলকে মেয়েই মনে করতো নিজেদের, তাকে মেয়ের মতো সাজিয়ে বিয়েও দিতো। খুব মা মা ভাব দেখা যেতো ছোটো ছোটো বালিকাদের কথায়, কাজে, আচরণে। বাঙলা সাহিত্যে মায়ের আদলে গ'ড়ে ওঠা ছোটো ছোটো মায়েদের ছবি বেশ আবেগের সাথে আঁকা হয়েছে। এ-ছোটো মায়েরা সহজাত মা নয়, তারা আদর্শকাঠামো অনুকরণের দৃষ্টান্ত। কিন্তু আগে ছোটোদের আদর্শকাঠামো অনুকরণ দেখে মনে করা হতো বালিকাদের মধ্যে রয়েছে সহজাত মাতৃত্ব; একে মনে করা হতো কোনো রহস্যময় বিধানের ফল। বালিকাদের মাতৃত্ববোধ সমাজেরই শিক্ষার পরিণতি। এ নিয়ে গবেষণা হয়েছে প্রচুর, গবেষকেরা দেখিয়েছেন বালকবালিকারা অনুকরণ করে তাদের মাবাবাদের, তিন বছর বয়স থেকেই ছোটোদের আচরণ হয়ে পড়ে বিশেষ লিঙ্গ অনুকরণমূলক, 'সেক্স-টাইপড'। চাষী পরিবারে বালিকা উঠোনে ব'সে মাটির হাঁড়িপাতিলে রান্না করে মাটির কাল্পনিক ভাতমাছ, তারপর ধোয় হাঁড়িপাতিল, গুছিয়ে রাখে থালাবাসন; বালকটি একটু দূরে হয়তো অভিনয় করে তার পিতার মতো কাল্পনিক চাষবাসের। শহরে মধ্য- বা উচ্চ-বিত্ত পরিবারে ছোটো বালিকা তার মায়ের মতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লিপস্টিক ঘষে, উঁচু গোড়ালির জুতো প'রে হাতে ব্যাগ নিয়ে খটখট ক'রে হাঁটে, নিউমার্কেটে যাওয়ার অভিনয় করে; সে হয়ে ওঠে তার মায়ের মতো পরগাছার পরগাছা। আর বালকটি হয়তো বাবার মতো টেবিলে ব'সে অনবরত ফোন করার অভিনয় ক'রে চলে; সে হয়ে ওঠে পরগাছা। বালিকাদের সহজাত মাতৃত্বের বোধ এক পুরোনো উপকথা; তাদের দেহ নয়, সমাজই তাদের শিখিয়ে দেয় যে তারা মা হবে। তাই মায়ের পেশা তাদের শিখতে হয় শুরু থেকেই। বালিকা বুঝতে পারে শিশুপালনের ভার পড়ে মায়েরই ওপর। তাকে শিখিয়ে দেয়া হয় যে মা হওয়া এক দারুণ ব্যাপার, মা হওয়াই বালিকার জীবনের লক্ষ্য। নিজের মাকে বার বার বিয়োতে দেখে বালিকা বুঝে ফেলে একদিন সেও মা হবে, তার পেটেও জন্ম নেবে বাচ্চা, সেও বিয়োবে তার মায়ের মতো। বাচ্চা জন্ম দেয়ার প্রক্রিয়া যখন সে বুঝতে পারে, তখন

ঘেন্নায় ভয়ে শিউরে ওঠে বালিকা; কিন্তু কিছু করার নেই তার।

বালিকা দেখে নিজেকে আর তার বয়সের বালকদের, সব কিছু দেখে তার মনে জাগে ঈর্ষা। ঈর্ষা খারাপ আবেগ নয়, ঈর্ষা নিজের অবস্থান সম্পর্কে অসন্তোষের অনিবার্য আবেগগত পরিণতি। সে দেখতে পায় সে ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত প্রাণী। নিজের ভাগ্যকে সে মেনে নিতে বাধ্য হয়, কিন্তু এ-ভাগ্য নিয়ে থাকে অসুখী। সে যতোই বাড়তে থাকে, বুঝতে থাকে সমাজ আর জীবনের রীতিনীতি, ততোই সে ঈর্ষা করতে থাকে ছেলেদের; কিন্তু ওই ঈর্ষাকেও সে চেপে রাখতে বাধ্য হয়। বালিকা দেখে ছেলেরা স্বাধীন, তাদের জীবন অনেক সুবিধাজনক; তাতে বিধিনিষেধের বাড়াবাড়ি নেই, কিন্তু তার জীবন বিধিনিষেধ দিয়ে ঘেরা। বালিকার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি তার দেহ, কিন্তু সে-দেহ নিয়েও সে থাকে বিব্রত। তারপর বোধ করে বিপন্ন। বালিকার দেহ বেড়ে ওঠে আবদ্ধ ফলের মতো। তার শরীব কোনো কিছুর সংস্পর্শে আসতে পারে না, সেটি নিষিদ্ধ বস্তুর ঢাকা থাকে আবরণের পর আবরণে। তার দেহ সরাসরি সংস্পর্শে আসতে পারে না জলের, বাতাসের, রৌদ্রের। ঘাস অনেক দিন ঢাকা থাকলে যেমন বিবর্ণ হয়ে ওঠে, বালিকার দেহও হয়ে ওঠে তেমনই। সে পানিতে নামে একরাশ পোশাক নিয়ে, প্রচণ্ড গরমেও সে গা থেকে একটু কাপড় সরাতে পারে না; তার দেহ জানে না বৃষ্টির সরাসরি ছোঁয়ার স্বাদ, তার শরীর জানে না রোদের সরাসরি ছোঁয়া কেমন। বালক নগ্ন শরীরে সাঁতার কাটে, বাতাসে নগ্ন শরীর মেলে দেয়; খেলার সময় বালকের শরীর আসে অন্য শরীরের সংস্পর্শে। বালিকার শরীরকে বাড়াতে হয় অনাঘ্রাত পুজোর ফুলরূপে। তার ভেতরে জন্ম নেয় গুমোট, যা পুরুষের কাছে মনে হয় আকর্ষণীয়। প্রচণ্ড গরমের সময় এক কিশোরী আমাকে বলেছিলো, 'তোর মতো যদি খালি গায়ে ব'সে থাকতে পারতাম!' ওটা ছিলো তার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ সাধ! বালিকা তার দেহকে নগ্ন মেলে ধরতে চায় প্রকৃতির সামনে, পেতে চায় প্রকৃতির সমস্ত আদর; কিন্তু তার জীবনে তা নিষিদ্ধ।

বালিকা বয়সেই তার শরীরে ওপর অনেক সমাজ শুরু করে নৃশংস আক্রমণ। এমন এক আক্রমণ হচ্ছে *নারী-খৎনা*। মেয়েদের খৎনার বিভীষিকাজাগানো প্রথা আজো প্রচলিত আরব দেশগুলোতে, বিশেষ ক'রে মিশর, সুদান, ইয়েমেন, ও নানা উপসাগরীয় রাজ্যে; এবং সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, ঘানা, গিনি, ও নাইজেরিয়ায়। এসব দেশে কুমারীত্ব আর যোনিচ্ছদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যোনির এক টুকরো পাতলা পর্দার ওপর দাঁড়ানো সেখানে বংশের মানসম্মান। যাতে বংশের মানসম্মান বা বালিকার সতীত্ব ও সতীচ্ছদ অক্ষত থাকে, তার জন্যে খৎনা করানো হয় বালিকাদের। নারী সেখানে *ফিৎনা*, বিশৃঙ্খলা, যার কাজ বিপর্যয় ঘটানো; ওই বিপর্যয় থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্যে সেখানে কুরিয়ে ফেলে দেয়া হয় যোনির পাপপরায়ণ প্রত্যঙ্গগুলো। ওই বর্বর পিতৃতন্ত্র জানে যদি কেটে ফেলা হয় বালিকার ভগাঙ্কুর, বৃহদোষ্ঠ, ক্ষুদ্রোষ্ঠ, তাহলে থাকবে না তার কামক্ষুধা। রক্ষা পাবে সতীত্ব, আর সমাজ। বালিকাদের খৎনা করানো হয় সাত-আট বছর বয়সে, ঋতুস্রাব দেখা দেয়ার আগে [দ্র নওঅল (১৯৮০, ৩৩-৪৩), মাইল্‌স্ (১৯৮৮, ৮৮-৮৯)]। সেখানে রয়েছে মেয়েদেব খৎনা করানোর

জন্যে হাজামী। দুজন নারী মেয়েটিকে শক্ত ক'রে চেপে ধরে, যেমন ধরা হয় কোরবানির পশু; দু-উরু জোরে টেনে ধ'রে তারা ফাঁক করে বালিকার যোনিঅঞ্চল, আর হাজামী ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে বালিকার ভগাঙ্কুর ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গ। খৎনার সময় তারা আবৃত্তি করতে থাকে, 'আল্লা মহান, মুহম্মদ তার নবী : আল্লা আমাদের দূরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে।' যে-ছুরিটি দিয়ে খৎনা করা হয়, সেটি সব সময় ধারালোও হয় না। ছুরিটি হ'তে পারে ধারালো পাথর, ব্লেড, বা কাঁচের টুকরো। খৎনায় প্রথমে কেটে ফেলা হয় বালিকার সম্পূর্ণ ভগাঙ্কুর, তারপর কাটা হয় ক্ষুদ্রোষ্ট, তারপর বৃহদোষ্ঠের ভেতর ভাগের মাংস। খৎনার পর শেলাই ক'রে দেয়া হয় যোনিরন্ধ্র, একটু ফাঁক রাখা হয় ঋতুস্রাবের জন্যে, খোলা রাখা হয় মূত্ররন্ধ্র। খৎনার সময় বালিকার মা ও আত্মীয়ারা ক্ষতের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে খৎনা ঠিক মতো হয়েছে কিনা। খৎনার পর চল্লিশ দিনের জন্যে শক্ত ক'রে বেঁধে দেয়া হয় বালিকার দু-উরু, যাতে যোনি ভালোভাবে জোড়া লাগে। হাজামীরা অশিক্ষিত নারী, তারা খৎনা করতে গিয়ে বিপন্ন ক'রে তোলে বালিকার জীবন। খৎনা সফল করার জন্যে তারা গভীরভাবে কাটে বালিকার ভগাঙ্কুর, যাতে দেহে কামের একটি কণাও অবশিষ্ট না থাকে।

খৎনার অব্যবহিত ফল প্রবল রক্তক্ষরণ, জীবাণুসংক্রমণ, মূত্ররন্ধ্র ফেড়ে যাওয়া, মূত্রথলে ও পায়ুদ্বার বিক্ষত হওয়া। যোনিঅঞ্চল শেলাই ক'রে দেয়ার ফলে অনেক বালিকা পরে ঠিক মতো হাঁটতে পারে না। খৎনার পর যদি বালিকা বেঁচে থাকে, সে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে; সারাজীবনের জন্যে তার কামক্ষুধা মিটে যায়। সুদানে মেয়েদের খৎনা চলে মেয়েদের সারজীবন ধ'রে, মেয়েদের যোনি সেখানে নিরন্তর কাটাছেঁড়া ও শেলাইয়ের বস্তু। সুদানে বালিকার খৎনায় গভীর ক'রে কেটে ফেলা হয় ভগাঙ্কুর, বৃহদোষ্ঠ, ক্ষুদ্রোষ্ঠ, বলা যায় কামিয়ে ফেলা হয় ওই আপত্তিকর জিনিশগুলো; তারপর মেষের অন্ত্র দিয়ে শেলাই ক'রে দেয়া হয় যোনিরন্ধ্র, একটু ফাঁক রাখা হয় যাতে চুঁইয়ে বেরোতে পারে ঋতুস্রাব, আর প্রস্রাবের জন্যে খোলা রাখা হয় মূত্ররন্ধ্রটি। বিয়ের সময় যোনির শেলাই একটু কেটে ফাঁক করা হয় রন্ধ্রটি, যাতে শিশ্ন ঢুকতে পারে। সন্তান প্রসবের সময় শেলাই আরো কাটা হয় যোনি প্রসারিত করার জন্যে। প্রসবের পর আবার শেলাই ক'রে দেয়া হয় রন্ধ্র। নারী তালাক পেলে বা বিধবা হ'লে শেলাই ক'রে বন্ধ ক'রে দেয়া হয় যোনি, এবং আবার বিয়ে হ'লে আবার কেটে ফাঁক করা হয় রন্ধ্র। এভাবে চলতে থাকে নারীর রন্ধ্র কাটাকাটি জোড়াতালি। খৎনার ফলে সঙ্গম ও প্রসব হয়ে ওঠে বিপজ্জনক, আর মনে যে-ক্ষতটি জন্ম নেয় তা নারীর জীবনকে ঢেকে ফেলে দুঃস্বপ্নে। খৎনা হওয়া নারীর জন্যে বিবাহ ভয়ংকর। সোমালিয়ার একটি বাসর রাত এমন : স্বামী প্রথমে নতুন বউকে পিটোয় চাবুক দিয়ে, তারপর ছুরি দিয়ে যোনির শেলাই কেটে 'খোলে' তাকে। খোলার পর তিন দিন ধ'রে চালাতে থাকে অবিরাম সঙ্গম! কেনো স্বামীকে এতো পরিশ্রম করতে হয়? তার কারণ [দ্র মাইল্স্ (১৯৮৮, ৮৯)] :

> তাকে এ-'শ্রম' করতে হয় একটি 'প্রবেশ পথ' তৈরি করার জন্যে, যাতে ক্ষতটি আবার জোড়া লেগে না যায়।...বাসর রাতের ভোরে স্বামী তার ছুরিটি কাঁধে ঝুলিয়ে সারা এলাকা ঘুরে আসে, সবাই

প্রশংসার চোখে তাকায় তার দিকে। সে-সময় বউটি বিছানায় শুয়ে থাকে, নড়াচড়া করে না, লক্ষ্য রাখে যাতে তার ক্ষতটি খোলা থাকে।

নওঅল (১৯৮০, ৭-১১) বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজের খৎনার বিভীষিকা, যাতে শোনা যায় নৃশংস পিতৃতন্ত্রের আক্রমণে সমস্ত আরব বালিকার চিৎকার। ছ-বছরের নওঅল রাতে আধো ঘুমে আধো জাগরণে শুয়ে ছিলো নিজের বিছানায়। হঠাৎ সে অনুভব করে তার চাদরের নিচে ঢুকছে একটি শক্ত রোমশ হাত। হাতটি তাকে ধরে শক্ত ক'রে; আরেকটি হাত চেপে ধরে তার মুখ। সে চিৎকার ক'রে উঠতে চায়, কিন্তু পারে না। তারা তাকে গোশলখানায় নিয়ে যায়। সে দেখতে পায় নি তারা কজন ছিলো, বা তারা পুরুষ না নারী। তারা লোহার মতো শক্ত ক'রে ধরে তার হাত, বাহু, দু-উরু। সে একটুও নড়তে চড়তে পারে না। সে শুনতে পায় ছুরি শানানোর শব্দ, তার মনে প'ড়ে যায় ঈদের দিনে মেষ জবাইয়ের দৃশ্য। তার রক্ত হিম হয়ে আসে, হৃৎপিণ্ড থেমে যায়। সে বোধ করে তারা তার পেটের নিচে দু-উরুর মাঝে কী যেনো খুঁজছে। একটু পরে সে বুঝতে পারে তারা তার দু-উরু যতোটা সম্ভব ফাঁক ক'রে ধরেছে। তার মনে হয় এই একটি ধারালো ছুরি কেটে ফেলবে তার গলা, কিন্তু সে অনুভব করে যে ছুরিটি নেমে আসে তার দু-উরুর মাঝখানে, এবং সেখান থেকে কেটে ফেলে এক টুকরো মাংস। তার মনে হয় তার শরীরে আগুন ধ'রে গেছে, সে চিৎকার ক'রে ওঠে, কিন্তু কোনো শব্দ হয় না। সে দেখতে পায় রক্তে ডুবে গেছে তার নিতম্ব। কারা তার ভগাঙ্কুর কেটেছে সে জানে না, তবে সে যখন তার মাকে দেখতে পায় পাশেই, তখন তার দুঃখের সীমা থাকে না। সে দেখে তার মা হেসে কথা বলছে ওই লোকগুলোর সাথে, যারা কিছুক্ষণ আগে জবাই করেছে তাকে। তারা তাকে তার ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়, এবং চেপে ধরে তার ছোটো বোনকে। বোনটি তার চেয়ে দু-বছরের ছোটো। সে 'না, না' ক'রে চিৎকার ক'রে ওঠে; সে দেখে ভয়ে তার বোনের মুখ নীল হয়ে গেছে; তার চোখে পড়ে বোনের চোখ, যাতে জমাট হয়ে আছে আতঙ্ক। তাদের দৃষ্টি বিনিময় হয়, যে-দৃষ্টিতে তারা বলতে চায় : 'এখন আমরা জানি এটা কী। এখন আমরা জানি কোথায় আমাদের ট্র্যাজেডি। আমরা এক বিশেষ লিঙ্গের, স্ত্রীলিঙ্গের। পীড়ন ভোগ করাই আমাদের নিয়তি, আর আমাদের নিয়তি হচ্ছে যে ঠাণ্ডা নির্মম হাত ছিঁড়ে নেবে আমাদের দেহের একটি অংশ।' এ-নৃশংস অভিজ্ঞতার পর আর কোনো বালিকা কামের কথা ভাবতে পারে না; তার যোনিটি হয়ে ওঠে একটি স্পর্শকাতরতাহীন গর্ত, যাতে একদিন স্বামী খুঁজে পায় বহু স্বপ্নিত বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি পর্দা, কিন্তু সেটি কখনো কামসুখ বোধ করে না।

বালিকা যখন একটু বড়ো হয়, বড়ো হয় তার জগতটি; তখন সে চারপাশে দেখে পুরুষাধিপত্য। দেখে পৃথিবীটা পুরুষের। বালিকা এর বিরুদ্ধে যেতে পারে না, সে মেনে নেয় পুরুষাধিপত্য। বালকের শিশ্ন দেখতে পাওয়া নয়, পুরুষাধিপত্য দেখতে পাওয়াই তার জীবনের চরম সত্যকে দেখতে পাওয়া। এটা তার নিজের সম্বন্ধে ধারণাই পাল্টে দেয়। সে এখন বুঝতে পারে পিতাই বাড়ির প্রভু, সম্রাট, ঈশ্বর; মা তার মতোই তুচ্ছ।

পরিবারে পিতাই সূর্য, তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় সব কিছু। সে দেখতে পায় পিতার ইচ্ছেই সব, মায়ের ইচ্ছে কিছু নয়। যখন সে আরো ছোটো ছিলো, সে মনে করেছিলো সে হবে মায়ের মতো শক্তিমান, এখন দেখতে পায় মায়ের শক্তি নেই। সে চারপাশে দেখতে পায় পুরুষের মহিমা, শুনতে পায় পুরুষের বন্দনা। তার স্থান সেখানে নেই। সে সব কিছুতেই দেখে তার শোকাবহ নিয়তি। সে শুনতে পায় সব মহাপুরুষ পুরুষ, মহাপুরুষদের তালিকায় কোনো নারী নেই; যারা রাজ্য জয় করেছে, মানুষকে ধর্মের পথে এনেছে, যারা সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, তারা সবাই পুরুষ। কিছু কিছু নারীর কথাও শোনে বালিকা, তবে ওই নারীরা আকর্ষণীয় শুধু মর্মস্পর্শী মর্ষকামের জন্যে। ওই নারীরা শুধু ত্যাগ করেছে, দুঃখ ভোগ করেছে, পরিত্যক্ত হয়েছে: তারা স্মরণীয় হয়ে আছে পুরুষের পায়ে আত্মবিসর্জনের জন্যে। ধর্ম তাকে শোনায় ভয়ঙ্কর কথা, শোনায় পুরুষের পাঁজর থেকে জন্মেছে নারী। সে কি একথা বিশ্বাস করবে নাকি করবে না? তার মা তাকে বিশ্বাস করতে বলে, বাবা তাকে বিশ্বাস করতে বলে, সবাই বিশ্বাস করতে বলে; সে কী ক'রে করবে অবিশ্বাস? সে দেখে ধর্ম তারই জন্যে, তার ভাই ধর্মের কথা সব মেনে চলে না, সে-জন্যে তার ভাইকে চাপ দেয়া হয় না; কিন্তু দেখে তার ওপর খুব বেশি চেপে বসছে ধর্ম। সে শোনে পতির পায়ের তলে নারীর বেহেস্ত। সে শুনতে পায় নারীই সমস্ত নষ্টের মূলে। দিকে দিকে সে শুনতে পায় তার লিঙ্গের নিন্দা। সে নাটকে চলচ্চিত্রে পাঠ্যপুস্তকে উপন্যাসে দেখে পুরুষাধিপত্যের জয়। সে বোঝে সে বালিকা, সে নারী হয়ে উঠবে; সে কিছু উপভোগ করবে না, কিন্তু ভোগ করবে যন্ত্রণা। সে বোঝে পুরুষভোগ্যা পৃথিবী।

সেও পুরুষের ভোগ্যা। সবাই তাকে শেখায় তাকে প্রস্তুত হ'তে হবে পুরুষের উপভোগের জন্যে। তার শরীর তার উপভোগের জন্যে নয়, তার কাজ ওই শরীরকে আবেদনময়, পুরুষের উপভোগের জন্যে নিটোল ক'রে তোলা। তার কাজ কোনো পুরুষের মন জয় করা। সে কি পুরুষের মন জয় করবে তার বুদ্ধি দিয়ে, মেধা দিয়ে? না, পুরুষের মন জয় করতে হবে তাকে শরীর দিয়ে, তাকে হ'তে হবে রূপসী। সে হবে যৌনসামগ্রী। তাকে হ'তে হবে মর্ষকামী। সে হবে বিবি রহিমা, সে হবে সতী সীতা। সমাজ বালিকাকে শিক্ষা দেয় আত্মপ্রেমের, মর্ষকামিতার। বালিকা দেখতে শুরু করে দিবাস্বপ্ন, ওই স্বপ্নে ঘোড়া ছোটোয় রাজপুত্ররা। সে হয় আত্মপ্রেমবিভোর, ভ'রে ওঠে মেয়েলিপনায়; সে শেখে কটাক্ষ, শেখে শরীর বাঁকিয়ে দাঁড়াতে। অশ্রু হয়ে ওঠে তার সম্পদ। বালকেরা মুগ্ধ হয় তার চোখের জলের গভীরতায়, তাই সে শেখে চোখ ছলছল করতে। বালিকাকে শেখানো হয় সে কিছু করতে পারবে না, করবে ছেলেরা; তাকে শেখানো হয় অক্রিয়তা অনেক বেশি সুখকর। তাই সে হয় অক্রিয়। অক্রিয় ভূমিকাকে সে প্রতিবাদ না ক'রে মেনে নেয়, কেননা সে মনে করে এই তার নিয়তি। বালকের জন্যে আছে ভবিষ্যৎ, তার জন্যে নেই। বালক বড়ো হয়ে কর্মকর্তা হবে, বিমান চালাবে, সমুদ্রে যাবে, মাঠে যাবে, শহরে যাবে, পৃথিবী দেখবে, ধনী হবে; আর বালিকা হবে স্ত্রী, মা, পিতামহী, মাতামহী। সে তার মায়ের মতো সংসার দেখবে, সে সন্তান প্রসব আর পালন করবে তার মায়ের মতো। খুব বড়ো হয়ে ওঠে একটি কথা যে সে হবে মা।

বালিকা জেনে ফেলে সে হবে মা, তাই জন্মের রহস্য তার জন্যে হয়ে ওঠে এক বড়ো ব্যাপার। বালক যে-বয়সে জন্মের রহস্য সম্পর্কে ভাবেই না, সে-বয়সে বালিকার বড়ো ভাবনার বিষয় হয়ে ওঠে জন্মরহস্য আর কাম। বালকও ভাবে শরীরের কথা, তবে সে রহস্য উদঘাটনের জন্যে ভাবে না, ভাবে উপভোগের জন্যে। বালিকা উপভোগের জন্যে ভাবে না, ভাবে উদঘাটনের জন্যে, নিজের নিয়তিকে জানার জন্যে। বালক নারীদেহ সম্পর্কে খুবই উৎসাহী হয়, লুকিয়ে দেখার চেষ্টা করে নারীদেহ; নিয়মিত হস্তমৈথুনও করে, তবে সে এ-বয়সে স্বামী, পিতা হিশেবে কল্পনা করে না নিজেকে। কিন্তু বালিকা ভাবতে থাকে বিয়ের কথা, দেখতে থাকে নিজেকে স্ত্রী, মা-রূপে। বালিকা বুঝে ফেলে যে মায়ের পেটে সন্তান জন্ম নেয়, মা জন্ম দেয় সন্তান। সে বোঝে, গ্রামে হ'লে সে দেখতেও পায়, কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্তান জন্ম দেয়া; কেঁপে ওঠে তার অস্তিত্ব। কীভাবে মায়ের পেটে ঢোকে শিশু, এটা বালকবালিকা উভয়ের চিন্তায়ই স্থান পায়। বালক জানে এ-দায়িত্ব তাকে বইতে হবে না, তাই সে মাথা ঘামায় না এ নিয়ে; কিন্তু বালিকার চিন্তায় তা স্থির হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে একটু একটু আভাস পেতে থাকে কী ক'রে মায়ের পেটে আসে সন্তান। এক সময় সে মনে করতো বিয়ে হ'লেই সন্তান হয়; এখন সে বোঝে কিছু একটা করতে হয় বাবামাকে। কী করতে হয়? স্পষ্ট ক'রে কারো থেকে সংবাদ পায় না, তবু এক সময় সঙ্গমের সংবাদ সে পায়। প্রথমে বোঝে না, বোঝার পর বালিকা শিউরে ওঠে। বালকবালিকা যখন বুঝতে পারে সঙ্গম কী, তখন তারা প্রত্যেকে ঘেন্নায় চিৎকার ক'রে ওঠে : না, না, তাদের বাবামা অতো খারাপ নয়, তারা এ-কাজ করতে পারে না। কিন্তু বালিকা চিৎকার ক'রে সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না; তবে তার ভয় জাগে বিয়ে সম্পর্কে। বালিকা হয়তো দেখে ফেলে কোনো পুরুষের শিশ্ন, ভয়ে সে আরো কুঁকড়ে যায়। তার জগতে নেমে আসে বিভীষিকা। বালিকা এক সময় অনুভব করে বদল ঘটছে তার ভেতরে, তার শরীর হয়ে উঠছে নারীর শরীর। বারো তেরো বছরের সময় শুরু হয় তার কৈশোরসংকট: দেখা দিতে থাকে তার স্তন, আর সে বিপন্ন বোধ করতে থাকে নিজেকে নিয়ে। তার শরীর তার কাছে হয়ে ওঠে লজ্জার বস্তু, যা নিয়ে সে থাকে বিব্রত। এক সময় হঠাৎ ময়লা রক্তে ভেসে যায় তার উরু আর বিছানা; আর ভীত রক্তাক্ত অপরাধবোধগ্রস্ত বালিকা এগিয়ে চলে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে।

কিশোরীতরুণী

বালিকার পরিণতি কিশোরী, কিশোরীর পরিণতি তরুণী; তাদের বিপন্ন পরিণতি নারী। পিতৃতন্ত্রের নানা প্রান্তে তাদের বিকাশের মধ্যে, যদি একে বিকাশ বলতে পারি, রয়েছে মিল : তাদের জৈব বিকাশে মিল রয়েছে পৃথিবী জুড়ে; কিন্তু বিভিন্ন দেশ, সমাজ, শ্রেণী কিশোরীতরুণীদের একইভাবে বাড়তে দেয় না। বাড়া নয়, বলা যায়, রুদ্ধ ক'রে রাখা হয় তাদের বিকাশ। বাঙালি আর মার্কিন কিশোরীর মধ্যে জৈব মিল স্পষ্ট, কিন্তু সমাজ তাদের এমন পৃথক ক'রে রাখে যেনো তারা ভিন্ন গ্রহ বা প্রজাতির। আরবি কিশোরী জৈবিকভাবে বাঙালি আর মার্কিন কিশোরীর মতোই বাড়ে, তবে তার ওপর সামাজিক বোঝা এতো ভারী এতো নির্মম যে তার মনই শুধু নয়, বিকৃত হয়ে যায় তার দেহও। তাদের সবার পরিণতি নারী; সব দেশেই নারী বিপন্নতার মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষ, এবং বহু দেশে তারা পুরোপুরি পর্যুদস্ত। একই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর কিশোরীতরুণীর মধ্যেও রয়েছে মিল-অমিল; চাষী আর আমলার মেয়ের জৈবিক বিকাশ অভিন্ন, কিন্তু তারা এতো ভিন্ন শ্রেণীর যে তারা পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু তারা একই পংক্তির। ধনী পরিবারের কিশোরীটির সাথে ওই পরিবারের কিশোরটির যতোটা মিল, তার চেয়ে অনেক মিল তার দরিদ্র চাষী পরিবারের কিশোরীটির সাথে : তারা শিকার একই সামাজিক নিয়তির। সব নারী, সব কিশোরীতরুণীর ভাগ্য একই পীড়নের সুতোয় গাঁথা। সমাজ কিশোরীর দিকে ওৎ পেতে থাকা বাঘ একটু বিচ্যুতি ঘটলে বাঘ লাফিয়ে পড়ে তার ওপর। সমাজ তার দেহকে যেভাবে বাড়াতে চায়, তাকে সেভাবে বাড়াতে হয় দেহ; সমাজ যেভাবে স্বপ্ন দেখাতে চায় তরুণীকে, সেভাবে স্বপ্ন দেখতে হয় তাকে। তারা সমাজনিয়ন্ত্রিত প্রাণী, খাঁচার মধ্যে তারা বাড়তে থাকে আদর্শ নারী হওয়ার জন্যে। বাঙালি নারীরা তাঁদের আত্মজীবনীতে বারবার 'খাঁচা' আর 'পিঞ্জর'-এর কথা বলেছেন, পাখির রূপকে দেখেছেন নিজেদের; কিন্তু তাঁরা পোষাপাখি ছিলেন না, ছিলেন পোষাজন্তু। সমাজ পোষাজন্তুটিকে বলে নারী। তার দেহ আছে; যে-দেহটি সে নিজের ব'লে পেয়েছে, সেটি তাকে বিব্রত করে, তাকে মাঝে মাঝেই অসুস্থ করে; তবে কিশোরী ওই দেহ, তরুণী ওই দেহ। তার দেহও সমাজেরই বিবেচনার বস্তু; তার দেহ পরখের কর পরখ করতে থাকে অনেক সমাজ। অনেক সমাজে কিশোরী বুঝতেই পারে না কীভাবে সে বেড়ে উঠেছে, তরুণী হয়েছে; তার আগেই তার দেহ কোনো বর্বর অত্যাচারে বিকৃত হয়ে যায়। প্রতিটি সমাজ কিশোরীতরুণীর জন্যে বের করেছে সামাজীকিকরণের বিশদ বিধিমালা, যার লক্ষ্য তাকে পিতৃতন্ত্রের আদর্শকাঠামোর আদলে শিশুস্বভাবের নারী ক'রে তোলা।

সামাজিকীকরণের ফলে বদলে যেতে থাকে বালিকা, ভিন্ন হয়ে যেতে থাকে বালকের

থেকে; সে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে তার লিঙ্গভূমিকার সাথে, তবু সে তার স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন হারিয়ে ফেলে না। যেই সে পৌঁছে কৈশোরে, তার ভবিষ্যৎ বাসা বাঁধে তার শরীরে; দ্য বোভোয়ারের (১৯৪৯, ৩৫১) ভাষায়, 'বয়ঃসন্ধির সাথে ভবিষ্যৎ শুধু ঘনিয়ে আসে না; তার শরীরে বাসা বাঁধে; পরিগ্রহ করে চরম মূর্ত বাস্তব রূপ।' ভিন্ন হয়ে যায় কিশোরকিশোরী। কিশোর সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যায় প্রাপ্তবয়স্কতার দিকে; তার ভবিষ্যৎ তার জন্যে চমৎকারভাবে সৃষ্টি ক'রে রেখেছে সমাজ, সেখানে সে প্রবেশ করে স্বায়ত্তশাসিত মানুষরূপে; কিন্তু কিশোরী অপেক্ষা করতে থাকে, তার জীবন হয়ে ওঠে অনন্ত অপেক্ষা। কৈশোর বালিকার জন্যে ক্রান্তিকাল; এ-সময়ে তার কোনো বিশেষ লক্ষ্য নেই, সে জানে না তার জীবনের উদ্দেশ্য। কিশোরী তরুণী হয়ে ওঠে, তার শরীরের বিপজ্জনক সুন্দর পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু সে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে না তার জীবনে। তরুণীর সময় কাটে অবসাদগ্রস্ত প্রতীক্ষায়। সে প্রতীক্ষা করে পুরুষের। তার জীবন সে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না, সমাজ সে-ব্যবস্থা রাখে নি; সমাজ উদ্ভাবন করেছে তাকে রুদ্ধ করার সমস্ত বিধি। তার জন্যে রেখেছে একটি প্রতীক্ষার মহাসামগ্রী : পুরুষ। তার জীবনের সারকথা সংহত একটি শব্দে : পুরুষ। কিশোরীকে, তরুণীকে সমাজ একটিই স্বপ্ন দিয়েছে : পুরুষ। কিশোরও স্বপ্ন দেখে নারীর, কিশোরও কামনা করে নারী; তবে তা তার জীবনের খণ্ডাংশ। নারী তার জীবনের নিয়তি নয়, নারীর মধ্যে সে দেখে না জীবনের পূর্ণতা। যুবক নিজের জীবনের পূর্ণতার স্বপ্ন দেখে বাস্তব সাফল্যে, নারী ওই সাফল্যের একটি অংশ; কিন্তু তরুণীর জীবনের সারকথা পুরুষ, যে পূর্ণ ক'রে তুলবে তার জীবন। এটা কোনো জৈব বিধান নয়; প্রকৃতি তাকে প্রতীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করে নি, কিন্তু সমাজ তার জন্যে পুরুষের প্রতীক্ষাকে ক'রে তুলেছে অবধারিত।

তরুণী থাকে অবসাদগ্রস্ত অস্তিত্বের মধ্যে বন্দী। তার কোনো লক্ষ্য নেই উদ্দেশ্য নেই; সে নিরর্থক প্রাণী। তাকে ওই নিরর্থকতার বন্দীত্ব থেকে যে উদ্ধার করবে, সে পুরুষ। সমাজব্যবস্থা পুরুষকে দিয়েছে ত্রাতার ভূমিকা। সব পুরুষ সমান শক্তিশালী, সমান ঐশ্বর্যশালী নয়; কিন্তু পুরুষ হওয়াই ঐশ্বর্য। পুরুষ শক্তিশালী, ধনী; তার হাতে আছে সুখের চাবি, সে স্বপ্নের রাজপুত্র। বালিকা বয়স থেকেই বালিকা দেখে পুরুষ উৎকৃষ্ট : পুরুষ আয় করে টাকা। যে টাকা আয় করে সে-ই প্রভু। সমাজ নারীর পায়ের নিচ থেকে সরিয়ে রেখেছে আর্থনীতিক ভিত্তিটি, যার ওই ভিত্তি নেই সে কখনো দাঁড়াতে পারে না। কিশোরতরুণী জানে সে কখনো টাকা আয় করবে না, যে-সব কাজ সে শিখছে মায়ের পুণ্য আদর্শ অনুসরণ করে সে-সবের কোনো আর্থ মূল্য নেই। তার কাজের আর্থ মূল্য নেই, তাই তারও মূল্য নেই। সে ব্যক্তি হয়ে উঠবে না, প্রভু হয়ে উঠবে না। সমাজের সব কিছু তাকে বুঝিয়ে দেয় তার জন্যে সবচেয়ে ভালো কোনো পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি হওয়া। তার চাহিদা সামগ্রী হিশেবে। যে-মেয়ের জন্যে ঘন ঘন পাত্র আসে, তাকে নিয়ে গর্ব বোধ করে বাবামা; যাকে বউ করার জন্যে প্রতিযোগিতা পড়ে যোগ্যদের মধ্যে, অন্য মেয়েরা ঈর্ষা করে তাকে; কারণ পুরুষ পাওয়াই তার জীবনের সাফল্য। বিয়ে নারীর শ্রেষ্ঠ পেশা। তরুণীর জন্যে অন্যান্য পেশার থেকে এটা

বেশি সম্মানজনক, এবং কম শ্রমসাধ্য; একটি দেহই তাকে এর যোগ্য ক'রে তোলে। বিয়ে তাকে দেয় সামাজিক মর্যাদা, এর মাধ্যমে তৃপ্ত হয় তার কাম ও মাতৃত্বস্পৃহা। স্বামী পাওয়াই তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণতম কাজ। এ-কাজ সে নিজে বেছে নেয় নি, এ-কাজকে সে নিজের জন্যে স্থির করে নি; সমাজই নির্ধারণ ক'রে দিয়েছে।

বিয়ে তার শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পেশা; কিন্তু এর জন্যে তাকে মূল্যও দিতে হয় প্রচুর। পুরুষ কোনো পেশার জন্যে এমন মূল্য দেয় না। সে একটি পেশার জন্যে উৎপাটিত করে নিজের অস্তিত্ব, তার যা কিছু পরিচিত আপন ছিলো তাদের থেকে সে সরিয়ে নেয় নিজেকে। সে মেনে নেয় নির্বাসন। সে নিজেকে সরিয়ে নেয় বাপের বাড়ি থেকে, পিতামাতার অধিকার থেকে, তার পরিচিত প্রিয় দৃশ্যগুলো থেকে। সে সক্রিয় বিজয়ীর বেশে ঢোকে না তার ভবিষ্যতে। সে শুধু নিজেকে সমর্পণ করে এক নতুন প্রভুর অধিকারে। সে যে নিজেকে সমর্পণ করে একটি পুরুষের কাছে, এর তাৎপর্য বের করার চেষ্টা করেছে পুরুষতন্ত্র : এর তাৎপর্য নারী নিকৃষ্ট পুরুষের থেকে, তার পুরুষের সমান হওয়ার শক্তি নেই। তাই সে অসম প্রতিযোগিতায় না নেমে নিজেকে সমর্পণ করে পুরুষের পায়ে, যার রয়েছে জয়ী হওয়ার শক্তি। বিয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব আর নারীর নিকৃষ্টতার প্রমাণ। নারী নিজেকে সমর্পণ করে, তবে তার সমর্পণের মূলে কোনো জৈব কারণ নেই; প্রকৃতি তাকে পুরুষের অধীনে থাকার জন্যে সৃষ্টি করে নি। সমাজই তাকে তৈরি করেছে এমনভাবে। সমাজ তার জন্যে নির্ধারিত ক'রে রেখেছে এমন ভবিষ্যৎ, যার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বিয়ে তাকে কিছুটা স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু তার বিবাহিত জীবন এক নিরন্তর সংকট; পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার।

বয়ঃসন্ধি বদলে দেয় বালিকার দেহ। এর আগে বালকবালিকার শরীরে থাকে সমান শক্তি, প্রাণবন্ততাও থাকে সমান; কিন্তু বয়ঃসন্ধি বালিকাকে জন্ম দেয় নতুন ক'রে। তার দেহ হয়ে ওঠে আগের থেকে ভঙ্গুর, এক ঠুনকো অবয়বের অধিকারী হয় সে; তার কামপ্রত্যঙ্গগুলো সহজে বোধ করে আহত, আর বুকের দু-পাশে দুটি বিব্রতকর ফলের মতো দেখা দেয় অদ্ভুত, বিপত্তিকর স্তন। পুরুষের চোখে স্তন সুন্দর, তার শরীরের ওই স্ফীত পিণ্ড দুটি পুরুষের চোখে জাগায় তীব্র আবেদন; কিন্তু কিশোরী তা নিয়ে থাকে বিব্রত। অস্বস্তি তাকে ঘিরে ধরে, আগের জামা তাকে পীড়া দিতে থাকে; সে দৌড়েতে গেলে ওগুলো দোলে, ব্যায়াম করতে গেলে দোলে। তার বুকে যন্ত্রণা হয়ে যা ফুলে ওঠে তা স্তন, যা তার নিজের কোনো কাজে লাগে না; একদিন পুরুষ ও-দুটি মথিত করে, শিশু শোষণ করে। কিশোরী হয়ে ওঠে দুর্বল, কমতে থাকে তার পেশির শক্তি, সে হারিয়ে ফেলে তৎপরতা। একই বয়সে কিশোর অর্জন করে পেশি, অর্জন করে তৎপরতা। এমন একটি প্রক্রিয়া দেখা দেয় তার শরীরে, যা কখনো বোধ করে না পুরুষ; তা তার ঋতুস্রাব। পশ্চিমে একে এক সময় বলা হতো 'অভিশাপ', যা কিশোরীর কাছে আসলেই অভিশাপ মনে হয়। অধিকাংশ সমাজেই এর জন্যে তাকে প্রস্তুত ক'রে তোলা হয় না, তাই হঠাৎ অনভিপ্রেত রক্তের প্রবাহ তাকে ভীত ক'রে তোলে। কিশোরী বোধ করে মাথাব্যথা, ক্লান্তি, তলপেটে ব্যথা। ব্যাহত হয়ে পড়ে তার

স্বাভাবিক জীবনধারা, তার শরীর হয়ে ওঠে তার জন্যে সমস্যা। সব ধর্মই শেখায় যে এটা অশুচি অপবিত্র, যদিও এতে নেই কোনো অশুচিতা অপবিত্রতা, তবুও কিশোরী নিজের অশুচিতা ও যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ৩৫৩) বলেছেন, 'সমগ্র মহাজগতকে তার মনে হয় এক দুর্বহ ভার। দুর্বহ ভারগ্রস্ত, নিমজ্জিত, সে নিজের কাছেই নিজে হয়ে ওঠে অপরিচিত, কেননা বাকি সমগ্র জগতের কাছেই সে অপরিচিত।' মাসে মাসে একই অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাকে পাগল ক'রে তুলতে পারে; তবে কিশোরী জানে তাকে বেঁচে থাকতে হবে এ নিয়ে।

কৈশোরে, বছর তেরোর দিকে, বিকাশ ঘটে বালকের ইচ্ছাশক্তি। এ-সময় প্রকাশ ঘটতে থাকে তাদের আক্রমণাত্মক প্রবণতা, শরীর দিয়ে তারা পরখ ক'রে দেখতে চায় চারপাশ, জয়ের বাসনা দেখা দিতে থাকে শরীরের প্রতিটি কাজে; বালকেরা প্রতিযোগিতায় নামে। শারীরিক শক্তি হয়ে ওঠে বালকের জীবনের প্রধান সত্য। কিন্তু ওই বয়সেই, এবং তারো আগে, বালিকা নিজেকে গুটিয়ে নেয় শক্তির এলাকা থেকে। সমাজ তার মনে শক্তি চায় না, শরীরে শক্তি চায় না, সমাজের চোখে অপ্রয়োজনীয় তার অস্থি আর পেশি। তার কাছে সমাজ চায় কোমল মেদ। অধিকাংশ সমাজে ছোটো বালিকাদের জন্যেও নেই কোনো খেলাধুলো; এবং কৈশোরে পৌঁছে যা অবশিষ্ট থাকে, তাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বাঙালি বালিকা কোনো খেলার সুযোগ পায় না, তবু তারা মাঝে মাঝে দৌড়োনোর সুযোগ পায়, কিশোরীর জন্যে তাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের সহপাঠিনীরা মারাত্মক খেলোয়াড় ছিলো, দৌড়ে ওদের সাথে পেরে ওঠা ছিলো কঠিন; কিন্তু একদিন ওরা বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। আমরা মাঠে খেলে চলেছি, ওরা উঁকি দিয়ে চলেছে আমাদের দিকে। এর পর ওরা আমাদের দেখে লজ্জা পেয়েও পিছলে পড়তো, মনে হতো ওরা হাঁটতেও ভুলে গেছে। কিশোরী শক্তি, পেশি, গতির এলাকা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঢোকে ঘরে, ঘর তার দেহকে শিথিল অবসন্ন ক'রে তোলে। তারা হয়ে ওঠে অন্তঃপুরিকা, পুরনারী, পুরলক্ষ্মী, পুরাঙ্গনা, পুরবালা, অসূর্যম্পশ্যা।

কিশোরীতরুণীর শরীর বিকশিত হয় না সক্রিয়ভাবে, তাদের দেহ অক্রিয়ভাবে ভোগ করে বিভিন্ন ব্যাপার। 'শরীর' শব্দটিতে রয়েছে এক ধরনের সক্রিয়তা; তাই এক সময় নারীর শরীর বোঝাতে এ-শব্দটি ব্যবহৃতই হতো না : ব্যবহৃত হতো দেহ, দেহলতা, দেহবল্লরী, তনু, তনুলতার মতো অপেশল শব্দ। তাদের ক'রে দেয়া হয় সীমাবদ্ধ, তারা যেতে পারে না সীমার বাইরে। তরুণের জীবনের প্রাণ প্রতিযোগিতামূলক প্রবণতা, কিন্তু তরুণীর জীবনের কোনো সক্রিয় প্রতিযোগিতা থাকে না। প্রতিযোগিতার এলাকা থেকে নির্বাসিত তারা তুলনা করে, শুধু তুলনা করে। তারা তুলনা করে ছেলেদের সাথে ছেলেদের, তুলনা করে নিজেদের সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ের। তুলনা কোনো সক্রিয় কাজ নয়; তুলনা করা সক্রিয় প্রতিযোগিতার বিপরীত। সক্রিয়র কাজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া, জয় লাভ করা, আর অক্রিয় দর্শকের কাজ প্রতিযোগীদের মধ্যে তুলনা করা। কিশোরীতরুণী হয়ে ওঠে জয়পরাজয়কম্পিত মুখরিত পৃথিবীর দর্শক। প্রতিযোগিতার

মধ্যে থাকে জয়পরাজয়, থাকে অন্যদের পরাভূত ক'রে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ; কিন্তু কিশোরীতরুণী কখনো প্রতিযোগিতায় নামে না। এটাও কোনো রহস্যজনক জৈব ব্যাপার নয়, এটা সম্পূর্ণরূপে সামাজিক। সমাজ চায় না তারা প্রতিযোগিতায় নামুক, তারা মেতে উঠুক জয়পরাজয়ে; সমাজ চায় তারা তাদের আরাধ্য পুরুষদের মধ্যে তুলনা করুক। তরুণীর শারীরিক শক্তির অভাবের ফলে তার মধ্যে জন্ম দেয় ভীরুতা। সে যে শুধু টিকটিকি তেলেপোকাকে ভয় পায়, তা নয়; সে ভয় পায় সক্রিয় সব কিছুকেই। পিতৃতন্ত্র খুব পছন্দ করে এটা, নারীর ভয় তার মনে হয় সুন্দর; চরম ভয়ের মধ্যে বাস করারই নারীত্ব। কিশোরীতরুণী যেহেতু নিজেদেব শরীরে শক্তি অনুভব করে না, তাই নিজেদের ওপর তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে; তারা কখনো রুখে দাঁড়ায় না, মেনে নেয় তাদের ওপর সব আক্রমণ। তারা যখন আক্রান্ত হয়, তখন তাদের হাতে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও আত্মরক্ষা করতে পারে না; কেননা নিজেদের শক্তিতে তারা অবিশ্বাসী। তারা ছেড়ে দেয় উদ্যমশীলতা, বিদ্রোহের সাহস তাদের থাকে না। তারা দণ্ডিত ভীরুতা ও আত্মসমর্পণে, তারা অবস্থান নেয় তাদের সমাজনির্ধারিত স্থানে। তারা হয় বশমানা, তাদের মনে হয় যা যে-অবস্থায় আছে থাকবে সে-অবস্থায়ই। নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনের কথা ভাবনায় আসে না তাদের। শরীর তাদের নিয়তি নয়, তবু শরীরই হয়ে ওঠে তাদের সামাজিক নিয়তি।

কিশোরীতরুণীর শরীর নিয়েও উদ্বিগ্ন অনেক সমাজ; ওই সমস্ত সমাজ চায় পুরুষের জন্যে তারা প্রস্তুত রাখবে একটি অক্ষত দেহ, এমন কাঁচের পাত্রের মতো যত্নে রাখবে শরীর যাতে তাদের রন্ধ্রের ঝিল্লিটির একটি তন্তুও না ছেঁড়ে। তরুণীকে রক্ষা করতে হবে তার সতীত্ব। পিতৃতন্ত্র তরুণের সততা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়, তরুণের সতত্ব ভিন্ন ব্যাপার; তরুণীব সতীত্ব হচ্ছে তার অক্ষত সতীচ্ছদ। পিতৃতন্ত্রকে সে শ্রেষ্ঠ যে-উপহারটি দিতে পারে, তা একটি অটুট সতীচ্ছদ। মধ্যপ্রাচ্য ও তার সন্নিকট অঞ্চলের মুসলমান পিতৃতন্ত্র এখনো তরুণীর সতীত্ব ও সতীচ্ছদের ওপর দেয় বিভীষিকাজাগানো গুরুত্ব, যার ফলে প্রতিটি তরুণী বাস করে দোজখের ভীতির থেকে ভয়ানক ভীতির মধ্যে। ভূমধ্যসাগবীয় পুরুষদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের একটি হচ্ছে অটুট যোনিচ্ছদসম্পন্ন কুমারী, যাকে এর আগে আর কোনো পুরুষ ছোঁয় নি। ফাতিমা মেরনিসসি (১৯৮২, ১৮৩) বলেছেন, সেখানে পুরুষের মর্যাদা অবস্থিত নারীর দু-উরুর মাঝখানে। প্রকৃতিকে বশ বা পর্বত জয় ক'রে তারা অর্জন করে না মর্যাদা, তারা নারীদের নিয়ন্ত্রণ করে আয়ত্ত করে মানসম্মান। সেখানে পুরুষ চায় নারীর সতীত্ব, চায় তার অক্ষত সতীচ্ছদ; এবং এ-কামনাকে তারা এতো দূর নিয়ে যায় যে তা হয়ে ওঠে মহাজাগতিক উন্মত্ততা। ওই পুরুষেরা চায় তাদের নারীরা সতী হবে, কিন্তু তারা নিজেরা লিপ্ত হবে অবৈধ যৌনসম্পর্কে, যাবে কাম থেকে কামে। সতীত্ব ও সতীচ্ছদ নিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পুরুষের পরাবাস্তব পাগলামোর বিবরণ দিয়েছেন নওঅল এল সাদাওয়ি তাঁর *হাওয়ার লুকোনো মুখ* (১৯৮০, ২৪-৩২) বইয়ের 'সতীত্ব/সম্মান নামক খুব পাতলা ঝিল্লি' নামের বমিজাগানো পরিচ্ছেদে।

প্রত্যেক আরব বালিকার থাকতে হয় একটি পাতলা পর্দা, যার নাম সতীচ্ছদ। এটা তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সম্পদ। তবে শুধু সতীচ্ছদ থাকলেই চলবে না, সতীচ্ছদটিকে হ'তে হবে বিশুদ্ধ; বাসর রাতে ওটিকে প্রচুর রক্তপাত ক'রে প্রমাণ করতে হবে যে তার অধিকারিণী ছিলো পরম সতী। বিছানার শাদা চাদরে পড়তে হবে রক্তের দৃষ্টিগ্রাহ্য দাগ। মেয়েটি যদি অভাগিনী হয়, তার থাকতে পাারে একটি শক্ত স্থিতিস্থাপক চ্ছদ। ওই চ্ছদটিকে আঙুল বা শিশ্ন দিয়ে ঘাঁটলেও কোনো রক্ত বেরোবে না। সে প্রমাণ করতে পারবে না সে সতী। পরদিনই হয়তো তার লাশ পাওয়া যাবে কোনো বালুকাস্তূপে। কোনো কোনো মেয়ের চ্ছদ এতো পাতলা হয় যে তা হাঁটতে ফিরতে দৌড়োতে গিয়েই ছিঁড়ে যেতে পারে, সেও প্রমাণ করতে পারবে না সে ছিলো সতী। বংশের সম্মানের জন্যে সেও হয়তো লাশ হবে। কোনো কোনো মেয়ের ওই চ্ছদটি নাও থাকতে পারে, সে প্রাকৃতিকভাবেই অসতী! নওঅল চিকিৎসক, তাঁর কাছে একবার একটি ষোলো বছরের 'গর্ভবতী' মেয়ে আসে। তিনি দেখেন মেয়েটি গর্ভবতী নয়; তার যোনিচ্ছদে কোনো রন্ধ্র নেই ব'লে বছরের পর বছর ধ'রে তার পেটে জমেছে ঋতুস্রাবের রক্ত। তার ভাগ্য ভালো, সে বিবাহিত; অবিবাহিত হ'লে হয়তো পরিবারের নামে তাকে কোরবানি করতো ভাই বা বাবা। এমন ঘটনা মিশরে অনেক ঘটেছে। সুষ্ঠু যোনিচ্ছদ নিয়ে জন্মে মাত্র ৪১.৩২% মেয়ে; ১১.২% মেয়ের কোনো চ্ছদই থাকে না, ১৬.১৬% মেয়ের চ্ছদ এতো পাতলা হয় যে ছিঁড়ে যায় সহজে, আর ৩১.৩২% মেয়ে জন্মে মোটা স্থিতিস্থাপক চ্ছদ নিয়ে [নওঅল (১৯৮০, ২৬)]। তাই বাসর রাতে রক্ত ঝরতে পারে ৪১.৩২% মেয়ের, কিন্তু সতীচ্ছদপাগল আরব চায় সব বাসরশয্যা হবে যুদ্ধক্ষেত্রের মতো রক্তাক্ত। সেখানে স্বামী বিছানায় রক্তের দাগ না পেয়ে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে আসে চিকিৎসকের কাছে স্ছদ আছে কিনা পরীক্ষা করানোর জন্যে, পিতামাতা চায় তাদের মেয়ের জন্যে একটি সতীচ্ছদের সার্টিফিকেট! আরব সমাজে তরুণীর দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'প্রত্যঙ্গ' তার যোনিচ্ছদ; তা তার চোখ, হাত বা পায়ের থেকে অনেক মূল্যবান। মেয়ে একটি হাত বা চোখ হারালে ততোটা দুঃখ পায় না আবব পিতামাতা, যতোটা পায় তার চ্ছদটি নষ্ট হ'লে। বাসর রাতে যে-মেয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে প্রমাণ করতে পারে না যে সে সতী, সে তালাক পায়, মৃত্যুও তার প্রায় অবধারিত। এ নিয়ে তৈরি হয় বড়ো কেলেঙ্কারি, নষ্ট হয় বংশের মর্যাদা। পরিবারটি ডুবে যায় অপমানে, যা শুধু 'মোছা সম্ভব রক্তে'। তারা বিশ্বাস করে আল্লা মেয়েদের যোনিচ্ছদ দেয় সতীত্ব রক্ষার জন্যে, মেয়েদের দায়িত্ব ওই চ্ছদ পুরুষকে উপহার দেয়া।

বাসররাতে সেখানে প্রতিটি বধুকে দিতে হয় রক্তাক্ত সতীত্বের পরীক্ষা। স্বামীটি নিজে শিশ্ন বা আঙুল দিয়ে যোনি খুঁড়ে দেখতে পারে, কিন্তু অনভ্যস্ত যুবকেরা সব সময় ঠিক মতো কাজটি পারে না। তাই মিশরে আছে 'দায়া' বা 'নারী হাজাম', যাদের কাজ মেয়েদের খৎনা করানো, এবং বাসর রাতে সতীচ্ছদ ছেঁড়া। তারা দেখতে কুৎসিত, হাতে রাখে বড়ো বড়ো নখ, যা তাদের পেশার জন্যে দরকার। দায়াকে পারিশ্রমিক ছাড়াও বেশ ঘুষ দিয়ে থাকে মেয়ের বাবামা, যাতে সে নখ দিয়ে গভীর ক'রে খুঁড়ে

প্রত্যঙ্গটির দেয়াল-চ্ছদ-ওষ্ঠ ছিন্নভিন্ন ক'রে প্রমাণ ক'রে দেয় মেয়ের সতীত্ব। বাসরঘরে ঢোকে দায়া, বাইরে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে মেয়ের বাবামা আত্মীয়স্বজন। মেয়ের সতীত্বে অসতীত্বে দায়ার কিছু যায় আসে না, সে জানে সতী প্রমাণ হ'লে তার মিলবে প্রচুর টাকা। সে তার নোংরা আঙুল আর বড়ো নখ ঢুকিয়ে দেয় মেয়ের যোনিতে, মেয়েটির ভাগ্য ভালো হ'লে রক্ত বেরিয়ে আসে সহজে, সে ওই রক্তে ভেজায় শাদা রুমাল। যদি সহজে না বোরোয়, সে তার দীর্ঘ নখ ঢুকিয়ে দেয় মেয়ের যোনির দেয়ালে, খুঁড়ে ফেলে দেয়াল, ফিনকি দিয়ে বেরোয় রক্ত; আর ওই রক্তভেজা রুমাল তুলে দেয় মেয়ের পিতার হাতে। পিতা মেয়ের যোনিরক্তভেজা রুমাল পতাকার মতো উড়িয়ে ঘোষণা করে মেয়ের সতীত্ব, হর্ষধ্বনি দিয়ে ওঠে আত্মীয়স্বজন। মেয়েটি বিছানায় কাতরাতে থাকে, রক্তে তার মহাজগত ভিজে যায়; কিন্তু মরুভূমিকে সে একটি চ্ছদ দিতে পেরে ধন্য বোধ করে। এমনই বর্বর ওই মরুভূমি। সতীচ্ছদ আরব পুরুষদের জাতীয় পতাকা

চোখের বদলা যেমন চোখ, মিথ্যার বদলা তেমনই মিথ্যা: আর প্রতারণার বদলা প্রতারণা। আরব পুরুষ নিজে যৌনসৎ নয়, কিন্তু চায় সতী; তাই প্রতারণা তার প্রাপ্য। আরব পুরুষ রক্ত চায়, তাকে পেতে হয় রক্তের প্রতারণা। আগে বাসর রাতে মেয়ের যোনিতে ঢুকিয়ে দেয়া হতো মুরগির রক্তের দলা, এখনো গরিব পরিবারে তা করা হয়; আর ওই রক্তের দাগ দেখে শান্ত হয় আরবের হৃদয়। এখন সেখানে দেখা দিয়েছে সতীচ্ছদের শল্যসংযোজনা! শল্যচিকিৎসক এখন সতীত্ব হারানো তরুণীর রন্ধ্রে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি সতীচ্ছদ জুড়ে দিয়ে তাকে আবার ক'রে তোলে সতী। আরব অঞ্চলে এখন দেখা দিয়েছে কৃত্রিম সতী। এ-সুযোগ নিচ্ছে ধনী পরিবারের মেয়েরা। ১৯৬৮তে সতীচ্ছদ সংযোজনের ব্যয় ছিলো ২০০০ দিরহাম, এখন নেমেছে ৫০০-১০০০ দিরহামে। সেখানে একটি সাধারণ কৃষক পরিবারের বার্ষিক ব্যয় ৬৫ দিরহাম, একটি মেয়ের রন্ধ্র শেলাইয়ের ব্যয় ২০০০ দিরহাম! সতীচ্ছদ সংযোজনে ব্যবহৃত হয় অতি আধুনিক পদ্ধতি, কিন্তু এটি সেবা করছে সবচেয়ে আদিম পিতৃতন্ত্রের। ফাতিমার (১৯৮২, ১৮৫) মতে, কৃত্রিম সতীত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে, কেননা আরব পুরুষ চায় অসম্ভবকে। তারা নিজেরা বিয়ের আগে নারীদের সতীত্ব হরণ করে, কিন্তু বিয়ের সময় হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে একটি সতী-একটি সতীচ্ছদ! কৃত্রিম সতীচ্ছদ আরব পুরুষের জন্যে যোগ্য পুরস্কার, শঠকে পুরস্কৃত করতে হয় শঠতা দিয়েই। নওঅল (১৯৮০, ৩০-৩১) আরবদের পারস্পরিক প্রতারণার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলেছেন। এক দিন একটি মেয়ে তার চিকিৎসালয়ে আসে। সে পাঁচ মাসের গর্ভবতী, কিন্তু তার সতীচ্ছদ রয়েছে অটুট! মেয়েটি তাঁকে জানায় যে বার বার অগভীর সঙ্গমের ফলে তার গর্ভ ঘটেছে। মেয়েটি তাঁকে অনুরোধ করে পেট কেটে বাচ্চাটি ফেলে দিতে, যাতে অক্ষত থাকে তার মূল্যবান চ্ছদটি। তিনি রাজি না হওয়ায় মেয়েটি চ'লে যায়। বহু বছর পর মেয়েটির সাথে তাঁর দেখা হয়, মেয়েটি তাকে জানায় সে অন্য এক ডাক্তার দিয়ে পেট কেটে গর্ভপাত করিয়েছিলো। এখন সে এক সফল প্রকৌশলীর স্ত্রী, তাদের দুটি সন্তান হয়েছে। নওঅল (১৯৮০, ৩১) বলেছেন :

> কল্পনায় আমি মাঝে মাঝে আমার অদেখা সে-প্রকৌশলীটিকে দেখি, দেখতে পাই বাসর রাতে সে পবিত্র অনুষ্ঠানরূপে তার স্ত্রীর চ্ছদ ছিন্ন করছে, বুঝে নিচ্ছে যে তাব স্ত্রী ছিলো কুমারী; এবং পবম সুখে সে দেখতে পায় তার স্ত্রীর চ্ছদটি অটুট বয়েছে। তাব কাছে ওই মেয়েটির পেটের লম্বালম্বি কাটাদাগটি তুচ্ছ, যেমন ওই মেয়েটিব হৃৎপিণ্ড বা যকৃৎ বা মস্তিষ্কে একটি কাটা দাগেব কোনো তা ৎপর্য নেই তাব কাছে, তবে এক মিলিমিটাব দীর্ঘ ওই চ্ছদে যদি থাকতো একটি ছোটো ছেঁড়া, তাহলে তা উল্টেপাল্টে দিতো তার সমগ্র জগত।

কিশোরীবালিকা এখনো এমন আদিমতার শিকার পিতৃতন্ত্রের নানা প্রান্তে। তার দেহ যেমন অক্ষত পেতে চায় অনেক সমাজ, আবার অনেক দর্শনবিজ্ঞান মনে করে সহজাতভাবেই তার দেহ বিকলাঙ্গ। প্লাতো ও তাঁর অনুসারীরা মনে করতেন নারীর শরীর নিকৃষ্ট পুরুষের শরীর থেকে; এবং উনিশশতকে অটো ভিনিঙ্গার নামের এক জর্মন বালক*লিঙ্গ ও চরিত্র* নামে একটি বই লিখে দেখায় কতো নিকৃষ্ট নারীর দেহ ও চরিত্র। ফ্রয়েড গভীর প্রভাবিত ছিলেন তার দ্বারা, এবং তারই নারীধারণাকে তিনি দিয়েছিলেন ছদ্মবৈজ্ঞানিক রূপ। ভিনিঙ্গার বইটি লিখে অল্প বয়সেই আত্মহত্যা করে, তবে তার লেখায় রূপ পায় তরুণীর দেহ ও চরিত্র সম্পর্কে পুরুষের আদিম ঘৃণা। তার চোখে নারী অভিন্ন তার দেহ ও তার অবচেতন কামের সাথে; তাই নারী পাশব। তার মতে, 'যে-পুরুষ নারী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে তার পক্ষে নারী সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা অসম্ভব; পুরুষ নারীকে ঘৃণা করে, বা তারা কখনো নারী সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবে না'। তার সিদ্ধান্ত [দ্র গ্রিয়ার (১৯৭০, ১০৫)] :

> একটি সম্পূর্ণ নগ্ন নারীদেহ এমন অনুভূতি সৃষ্টি করে যেনো তার অভাব রয়েছে কোনো কিছুর, তার রয়েছে এমন অসম্পূর্ণতা যা সৌন্দর্যের সাথে অসমঞ্জস।...নারীকে আকৃষ্ট করে কামের বিকশিত চিহ্নগুলো; সে বিকর্ষণ বোধ করে মনের উন্নত গুণাবলির প্রতি। নারী মৌলিকভাবে লিঙ্গপূজারী।

তরুণের যৌনপ্রবর্তনা তার শারীর শক্তিরই প্রকাশ, সম্ভোগ ক'রে সে উপলব্ধি করতে চায় পৌরুষ। তরুণী তার কামনার ভেতরে পোষণ করে লজ্জা। কেননা সে জানে সে সম্ভোগ করবে না, তাকে সম্ভোগ করবে পুরুষ; সে হবে পুরুষের খাদ্য। যুবক তার কামের সাফল্যে গৌরব বোধ করে, একের পর নারী সম্ভোগ করার জন্যে বোধ করে ব্যগ্রতা; এতে তার কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু তরুণী লজ্জায় কুঁকড়ে থাকে, সম্ভোগ তার জন্যে নয়। তার কামের সাফল্যের অর্থ হচ্ছে নিজের শরীরকে পুরুষের সম্ভোগের বস্তু ক'রে তোলা। তার সারা দেহ তার কাছে বিব্রতকর। প্রতি মাসের রক্তক্ষরণের ফলে নিজের দেহকে তার নিজের কাছে মনে হয় বিরক্তিকর। ঋতুস্রাব তার এক প্রতিবন্ধকতা। প্রতি মাসে তার জীবনে একটা ব্যাঘাতের মতো দেখা দেয় ওই রক্ত। এটা তার জীবনে সৃষ্টি করে বিভীষিকা, যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে তার চেতনা জুড়ে। সে সন্দেহ করে নিজের দেহকেই, ভয়ে ভয়ে থাকে নিজের দেহ নিয়ে; নিজের দেহকে মনে করে অসুস্থ। যদিও ঋতুস্রাব এতো বিকল করার মতো ব্যাপার নয়, তবু তার মনোজগতে এটা এমন বিকলন ঘটিযে দেয় যে তার সম্পূর্ণ মহাজগতই হয়ে ওঠে বিকল। নারী হওয়ার অস্বস্তি ধ্বংস ক'রে দেয় নারীর শরীর। তবে নারীর শরীর তার জন্যে প্রতিবন্ধকতা, কেননা চারপাশ চায় তার শরীর তার জন্যে হোক প্রতিবন্ধকতা।

এমন শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্যে কোনো পেশা থেকে দূরে থাকার দরকার পড়ে না। এ-সময় দু-এক দিন সে অসুস্থ থাকতে পারে, কিন্তু এটা কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। এ-সময়ে অধিকাংশ নারীই তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ ক'রে থাকে। কিন্তু ধর্ম বলে সে অশুচি, সমাজ বলে সে রুগ্ন।

সমাজ নারীর জন্যে নিষিদ্ধ ক'রে রাখে বাইরের সমস্ত কাজ। এখন দেশে দেশে নারী বাইরের অনেক কাজ করছে, তবু অনেক দেশ রয়েছে যেখানে নারীর জন্যে বাইর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যে-সব দেশে নারী বাইরে কাজ করতে পারছে, সেখানেও নারীর জন্যে রাখা হয় বিশেষ ধরনের কাজ। এমন কোনো কাজ নেই, যা অসম্ভব নারীর পক্ষে; কিন্তু সমাজ তাকে কাজ না দিয়ে, তার জন্যে কাজ নিষিদ্ধ ক'রে, প্রমাণ করে সে অনুপযুক্ত বা নিকৃষ্ট। সমাজ সব দিকে তার বিকাশের পথ বন্ধ ক'রে দিয়ে প্রমাণ করে যে তার পক্ষে বিকাশ অসম্ভব। সুপরিকল্পিতভাবে সমাজ তাকে ঠেলে দেয় হীনমন্যতাগূঢ়ৈষার দিকে। মেধা, মননশীলতা, সৃষ্টিশীলতার কথা ধরা যাক। প্রচলিত লোকবিশ্বাস হচ্ছে যে কৈশোর থেকে মেয়েদের হ্রাস পেতে থাকে মেধা, মননশীলতা, সৃষ্টিশীলতা। এ-লোকবিশ্বাস কি সত্য বা সত্য হ'লে কী কারণ রয়েছে এর পেছনে? স্বীকার ক'রে নেয়া যাক যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এটা সত্য; কিন্তু এর কারণ কি? এর কারণ নারীর জৈবসংগঠনে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে সমাজসংস্থায়। এর কারণ মেয়েদের উৎসাহ দেয়া হয় না এসব ব্যাপারে; আগে নিষেধ করা হতো, এখন নিষেধ করা না হ'লেও তাদের অনুপ্রাণিত করা হয় না। ভাইটির জন্যে সব সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়, তার পড়াশুনোয় যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে তা দেখে পিতামাতা, এমনকি বোনটিও। বোনটির কাছে আশা করা হয় না মেধা, মননশীলতা, সৃষ্টিশীলতা; সে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি হবে এ তো আশা করাই হয় না, এমনকি সে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আমলা হবে তাও আশা করা হয় না। তার কাছে আশা করা হয় নারীত্ব, তার কাছে দাবি করা হয় সে হবে নারী। যে-মেয়েটি লেখাপড়া করছে, তার কাছে ভালোভাবে লেখাপড়া চাওয়া হয় না, চাওয়া হয় লেখাপড়ার সাথে সে ভালোভাবে আয়ত্ত করবে নারীর কাজগুলো। লেখাপড়া তার কোনো কাজে আসবে না, কাজে আসবে নারীর কাজগুলো। এমন প্রত্যাশা করা হয় যার কাছে, সে কী ক'রে হবে মেধাবী, মননশীল, সৃষ্টিশীল? বাসার কিশোর বা তরুণ পুত্রটির পড়াশুনো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই; তার জীবনে আছে প্রমোদের ব্যবস্থাও। তাকে কেউ কুটোটিও নাড়তে বলে না; কিন্তু বাসার কিশোরী বা তরুণী কন্যাটিকে করতে হয় গৃহপরিচারিকার ক্লান্তিকর কাজগুলো।

ঘরকন্নার কাজগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ক্লান্তিকর কাজ। একই কাজের পুনরাবৃত্তি চলে তাতে সারা জীবন ভ'রে, আর যে জড়িয়ে পড়ে ওই কাজে তার জীবন হয় ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির পুনরাবৃত্তি। যে-তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, তাকে জানতে হবে চমৎকার মাছ ভাজা; যে-কিশোরী বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, তাকে শিখতে হবে চমৎকার শেলাই। বাসার কিশোর আর তরুণটির কাছে তা আশা করা হয় না, কিন্তু কিশোরীতরুণীর কাছে দাবি

করা হয়। ছেলেটি তার বিছানা গুছিয়ে না রাখলে মা খুশি হয়, দেখতে পায় একটি পুরুষের জন্ম হচ্ছে; কিন্তু মেয়েটি বিছানা না গোছালে একটি নারীর মৃত্যু দেখে মা আতংকিত হয়ে পড়ে। এমন দাবি করা হয় যার কাছে তার পক্ষে মেধাবী, মননশীল, সৃষ্টিশীল হওয়া অসম্ভব। মা মেয়ের বড়ো শুভার্থী, কিন্তু মা-ই মেয়ের ওপর চাপিয়ে দেয় পারিবারিক কাজের বোঝা। এতে তার কোনো অশুভ উদ্দেশ্য নেই, খুবই শুভ তার উদ্দেশ্য; মা জানে তার মেয়ের জীবন সৃষ্টিশীলতার নয়, সমাজ তাকে ওই অধিকার দেয় নি, ওই অধিকার দিয়েছে পুত্রকে। সমাজের বিশ্বস্ত পুলিশের মতো কাজ ক'রে চলে মা; এবং মেয়েটিকে বন্দী ক'রে ফেলে। কিন্তু এ-মা-ই ছেলেটিকে দেয় স্বাধীনতা। মেধাবী মেয়েটির থেকে অনেক বেশি যত্ন নেয়া হয় নির্বোধ ছেলেটির, এবং একদিন দেখা যায় নির্বোধ ছেলেটি ছাড়িয়ে গেছে মেধাবী মেয়েটিকে। যে-কিশোরী প্রথম হয় মাধ্যমিক পরীক্ষায়, পনেরো বছর পর সেও দেখতে পায় তার থেকে অনেক সাফল্য লাভ করেছে তার সাথের সাধারণ মেধার ছেলেরা; কেননা সে ক্রমশ ছেড়ে দিয়েছে উচ্চাভিলাষ, কিন্তু ছেলেরা সমাজের প্রেরণায় ও চাপে হয়েছে উচ্চাভিলাষী। উচ্চাভিলাষের জন্যে স্বাধীনতা দরকার, কিন্তু তরুণীর জীবনে তা নেই।

সামাজিক সমস্ত প্রথা তরুণীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। অনেক দেশ আছে, যেখানে মেয়েদের জন্যে পথ নিষিদ্ধ, তারা পথে বেরোতে পারে না; বেরোলে নিজেদের ঢেকে রাখতে বাধ্য হয় বোরখার মধ্যযুগীয় অন্ধকারে; এবং অবরোধের অন্ধকারের মধ্যে কাটে তাদের জীবন। আরবদেশগুলো এখনো মেয়েদের ঢেকে রাখছে এ-অন্ধকারে। বাঙলাদেশে বিশশতকের কয়েক দশক জুড়ে তারা থেকেছে অবরুদ্ধ। পিতৃতন্ত্রের মধ্যে মুসলমান পিতৃতন্ত্র এখনো হিংস্রভাবে রক্ষণশীল; ইরান-মধ্যপ্রাচ্যের তরুণীরা জানে না স্বাধীনতার একটি বিন্দুর স্বাদ কেমন [দ্র ফাতিমা (১৯৭৫, ১৯৮৪), নওঅল (১৯৮০)]। ফাতিমা মেরনিস্সির *বোরখা পেরিয়ে* (১৯৭৫) ও *মুসলমানের অবচেতনায় নারী* (১৯৮৪), এবং নওঅল এল সাদাওয়ির *হাওয়ার লুকোনো মুখ*-এ (১৯৮০) ভয়াবহ বিবরণ মেলে মুসলমান তরুণীদের জীবনবিভীষিকার। তাদের তুলনায় বাঙালি কিশোরীতরুণীরা অনেক স্বাধীন; তবে ওই স্বাধীনতা ছেলেদের স্বাধীনতার তুলনায় তুচ্ছ। বাঙলাদেশে মেয়েরা রাস্তায় বেরোতে পারে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার মধ্যে; তাদের বেরোনোয় কোনো নিষেধ নেই, কিন্তু পথে পথে তারা দেখে নিষেধ। পাড়ার মাস্তান তাকে দেখে শিস দেয়, মুদি মন্তব্য করে, ধার্মিকেরাও তার বুকের দিকে নির্লজ্জের মতো তাকায়। সে একা নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ছাড়া যেতে পারে না, তাকে স্বাধীনতা শিক্ষা দেয়ার জন্যে পথেঘাটে ধানখেতের আলে ওৎ পেতে আছে শিশ্নধারীরা। কিশোরীতরুণী বাঙলাদেশে স্বাধীনতা ভোগ করে ধর্ষণকারীর উদ্যত শিশ্নের ছায়ার নিচে, তারা স্বাধীনতা ভোগ করে কামুকের অ্যাসিডের ধারাপাতের বিভীষিকার নিচে। তারা রাস্তায় বেরোয় যেনো পথের দু-দিকে দেখার মতো কিছু নেই, যেনো গন্তব্য ছাড়া তারা আর কিছু জানে না। সমাজ তাদের জানিয়ে দেয় তাদের পথে বেরোনোর অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু পথের স্বাধীনতা দেয়া হয় নি। ছেলের জন্যে পথই গন্তব্য, কিন্তু কিশোরীতরুণীর জন্যে

পথ গন্তব্য নয়। তাই তাদের সব সময় চলতে হয় নিয়ন্ত্রিত ভঙ্গিতে, দণ্ডিত নাগরিক হিশেবে; ঘরে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বাইরে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে ক'রে শুকিয়ে যায় তাদের স্বতস্ফূর্ততা। তাদের ভেতরে বেড়ে ওঠে মানসিক চাপ, সারা শরীর জুড়ে দেখা দেয় ক্লান্তি অবসাদ। তরুণী হয়ে ওঠে ক্লান্তি অবসাদের রক্তমাংসস্তূপ।

অবসাদে পরিবৃত থাকে তরুণীর শরীর ও জীবন। তাই তরুণীরা একে অন্যকে ক্লান্ত অবসন্ন ক'রে তোলে সহজে, দুটি ক্লান্ত শরীরপ্রাণ বেশিক্ষণ পরস্পরকে সজীব রাখতে পারে না। তারা পছন্দ করে, দরকার বোধ করে তরুণের সাহচর্য। সমাজ তাদের বুঝিয়ে দেয় তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাদের বাধা দেয় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে। কিন্তু তারা পারে না স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে, কোনো কিছুই একলা করতে পারে না, পারলেও তাদের দ্বিধা থেকে যায়। অস্বয়ংসম্পূর্ণতার অশক্তি তাদের ভেতরে বাড়িয়ে তোলে ভীরুতা, দ্বিধাগ্রস্ততা, যা দেখা দেয় তাদের কাজে ও জীবনে। কামিনী রায়ের 'করিতে পারি না কাজ/ সদা ভয় সদা লাজ,/ সংশয়ে সংকল্প সদা টলে' মহিলা কবি ও কিশোরী ও তরুণীর কথা, কিশোর বা তরুণের কথা নয়। সমাজ তাদের বুঝিয়ে দেয়, তারাও মনে করে অসামান্য কোনো সাফল্য অর্জন তাদের জন্যে নয়; ওসব ছেলেদের জন্যে। তাই তারা উচ্চাভিলাষ পোষণ করতেও ভয় পায়, পরিহার ক'রে চলে সব উচ্চাভিলাষ। তারা বিশ্বাস করতে থাকে যে ছেলেরা উৎকৃষ্ট, তারা যা পারে না তা অবশ্যই পারে ছেলেরা, পারতেই হবে ছেলেদের। সমাজ ছেলেদের ওপর বিশ্বাস করে, তরুণীরাও বিশ্বাস করে ছেলেদের; সমাজ তাদের ওপর আস্থাহীন, তারাও আস্থাহীন নিজেদের ওপর। এমন আত্মবিশ্বাসহীনতা যাদের, তাদের বিকাশ অসম্ভব; তারা অবিকশিত থাকতে বাধ্য। এর পরিণতি আলস্য আর নিম্নমাঝারিত্ব, কোনো কিছু ভালোভাবে করতে না পারা। তরুণী বিশ্বাস করে সে যা পারে না, তা অবশ্যই পারে তরুণ; পারতেই হবে তরুণকে। নিজে না পারার জন্যে সে অস্বস্তি বোধ করে না, কিন্তু তা যদি না পারে ছেলে তবে সে বোধ করে অস্বস্তি। ছেলেরা যে ছেলে। কিশোরীতরুণীকে সমাজ দীক্ষা দিয়েছে এমন পরাজয়ী মনোভাবে। তার পরাজয়ী মানসিকতার কারণ তরুণী জানে তার ভবিষ্যৎ তার হাতে নয়; তার মনোভাব এমন যে কী হবে এতো সাধ্যসাধনা ক'রে যেখানে তার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে অন্যের ওপর। এটা এক দিকে যেমন নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ, তেমনই প্রতিবাদও। সমাজে যেহেতু পুরুষই সব, তাই সে চায় পুরুষই তার হয়ে রক্ত বাষ্প ক'রে অর্জন করুক সাফল্য।

তরুণীর পরাজয়ী মানসিকতার মূলে নিজের নিকৃষ্টতার বোধ কাজ করে না, সে মনে করে না যে সে সহজাতভাবেই নিকৃষ্ট, বরং তার প্রতিবাদী মনোভাবই জন্ম দেয় তার এ-বোধ : তাকে যে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হবে, সমাজ যে চায় সে নির্ভর করবে কোনো পুরুষের ওপর, এটা তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে; এবং সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় সাফল্যলাভের সব ইচ্ছে। তার কোনো যোগ্যতা সমাজের চোখে গুরুত্বপূর্ণ নয়, পুরুষ তাকে তার যোগ্যতার জন্যে মূল্যবান ভাবে না; তার মূল্য ততোটাই যতোটা সে হয়ে ওঠে পুরুষের স্বপ্নের আদলে। মেয়েরা শিখে ফেলে যে পুরুষের কাছে

গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে তাকে ছেড়ে দিতে হবে তার অধিকার, পুরুষ তখনই খুশি হয় যখন সে ছেড়ে দেয় নিজের সব যোগ্যতালাভের বাসনা। পুরুষ মেধাবী নারী পছন্দ করে না; তারা ভয় পায় নারীর সাহস, মেধা, যোগ্যতাকে। পুরুষের আকর্ষণ নির্বোধ রূপসীর প্রতি, তাই তরুণীকে হয়ে উঠতে হয় নির্বোধ, কিন্তু রূপসী। রূপই তার একমাত্র যোগ্যতা। রমণীয় হওয়ার অর্থ দুর্বল, নিরর্থক, অনুগত হওয়া। তরুণীকে চেপে রাখতে হয় তার সমস্ত স্বতস্ফূর্ততা, তার বদলে আয়ত্ত করতে হয় রূপ। যদি সে কোনো সক্রিয়তা দেখায়, তবে তা নষ্ট ক'রে দেয় তার নারীত্ব, তার আবেদন; অক্রিয়তাই তার সৌন্দর্য। তরুণীর ব্যক্তিসত্তা ও নারীসত্তার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে সমাজ। কৈশোর যে তার জন্যে বিশেষ সংকটের কাল, তার কারণ এতো দিন সে ছিলো স্বায়ত্তশাসিত, কিন্তু কৈশোরে পৌঁছে তাকে ত্যাগ করতে হয় তার স্বায়ত্তশাসন। মানুষ হিশেবে সে হয়ে উঠতে চায় সক্রিয়, স্বাধীন, প্রধান; কিন্তু সমাজ চায় সে হবে অক্রিয় সামগ্রী। সক্রিয় সত্তা ও অক্রিয় সামগ্রী হয়ে ওঠার বিরোধে কিশোরী দুলতে থাকে আশা ও ভয়, কামনা ও ঘৃণার মধ্যে। নারী হওয়ার জন্যে তাকে মেনে নিতে হবে অধীনতা, করতে হবে আত্মসমর্পণ। এ-সমস্যা বিভিন্ন কিশোরীর মধ্যে সৃষ্টি করে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। যে-বালিকা দীক্ষিত হয়ে গেছে নারীভূমিকায়, সে সহজে মেনে নেয় অধীনতা; কিন্তু যে-বালিকা দীক্ষিত হয় নি, তার পক্ষে অধীনতা মেনে নেয়া কঠিন হয়। তবে সে এড়াতে পারে না তার সামাজিক নিয়তিকে। সে কিছুটা প্রতিবাদের সাথে স্বীকার ক'রে নেয় তার নারীত্ব। তখন সে হয়ে ওঠে অক্রিয়, হয়ে উঠতে চায় রূপসী, জাগিয়ে তোলে মেয়েলিপনা; মন দেয় রূপচর্চায়। সে তখন নিজের বিব্রতকর স্তন দুটিকে আর লুকিয়ে রাখে না, সে-দুটি নিয়ে আর অস্বস্তি বোধ করে না; সে-দুটিকে মনে করে নিজের সম্পদ, ক'রে তোলে আকর্ষণীয়। সে নিজেকে দেখতে শুরু করে আয়নায়, মুগ্ধ হ'তে থাকে নিজের রূপে, সে জানে তার যা মূল্য তা ওই রূপের জন্যে; নিজের শরীরে সে খোঁজে এক নারীকে।

কাম মানুষের সমান বয়সী। কাম উপভোগের শক্তি তরুণীর অনেক বেশি তরুণের থেকে, কিন্তু তার উপভোগ নিষিদ্ধ; তরুণীকে তার কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে হয়ে উঠতে হয় শিকার। পুরুষতন্ত্র তাকে মনে করে কামসামগ্রী, অনেক উপভোগ্য বস্তুর মতো সেও বস্তু। তাই তরুণী বস্তু বা সামগ্রী হয়ে ওঠে, নিজেকে সে মনে করে বস্তু, এবং নিজের নতুন সত্তাকে দেখে বিস্ময়ের চোখে। নিজের শরীরে সে দেখতে পায় এক অচেনা শরীর; যেনো অচেনা এক নতুন দেহ দখল করেছে তার চেনা শরীরকে। নিজের শরীর তাকে বিহ্বল ক'রে তোলে, বিস্মিত হয়ে শরীরের দিকে দিকে দেখে অভাবিত বন্যা। যৌবন কোনো তরুণীকে ক্ষমা করে না, ভিখিরি বালিকার দেহকেও প্লাবিত করে নির্দয়ভাবে; যা সে চায় নি, যার মূল্য সে দিতে পারবে না তা তাকে নিতেই হয়। চিত্রাঙ্গদার মতো হতভাগ্য খুবই কম তরুণী, তাদের দেবতার কাছে বর চাইতে হয় না; কিন্তু তারা সবাই শিউরে ওঠে চিত্রাঙ্গদার মতোই অভাবিতকে নিজের শরীরে দেখে। চিত্রাঙ্গদা নতুন শরীর পায় বর হিশেবে, সেটিকে সে নিজের মনে করে নি; নিজের

শরীরে নিজের শত্রুকে দেখে সে চিৎকার ক'রে উঠেছে, 'কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া /অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন।' কিন্তু তরুণী নিজের নতুন শরীরে কোনো রাক্ষসীকে নয়, দেখে এক দেবীকে। সে তার নতুন শরীরকে আদর করে, মুগ্ধ হয় নিজের আঙুল বাহু উরুর দিকে তাকিয়ে, নিজে মোহিত হয় নিজের দু-স্তনের সৌন্দর্যে। শুরু হয় তরুণীর একলা নির্জন অন্তরঙ্গ সংগোপন দিবাস্বপ্নের কাল। দিবাস্বপ্ন কিশোরকিশোরী, তরুণতরুণী, এবং যে-কোনো সৃষ্টিশীল মানুষের প্রাত্যহিক বাস্তবতা। দিবাস্বপ্নে মানুষ সৃষ্টি করে এমন এক বাস্তবতা যা সে কোনো দিন পাবে না, পেলে হয়তো ক্ষুণ্ন বোধ করবে। তরুণী নিজের সাথে নিজে কথা বলে, অজস্র স্বপ্নের মধ্যে বাস করে। সে তখন তার নিজের স্বপ্নে বিভোর, তার ওই স্বপ্ন এতো মূল্যবান যে তা প্রকাশ করা যাবে না কারো কাছে, প্রকাশ করলে বাস্তবের নোংরা ছোঁয়ায় স্বপ্নের সোনা হয়ে উঠবে আবর্জনা। তাই তার মধ্যে জন্মে গোপন করার প্রবণতা, সব কিছু সে গোপন করতে চায়, তার সমগ্র স্বপ্ন ও বাস্তবতাকে সে পুরে রাখতে চায় এক গোপন চন্দনকাঠের সিন্দুকে।

কিশোরীতরুণীর দিবাস্বপ্ন পেরিয়ে যায় বাস্তবতার সমস্ত সীমা, ডুবে যায় সে রুগ্ন দিবাস্বপ্নে। তরুণীর দিবাস্বপ্ন হচ্ছে সে যা পায় নি, কখনো পাবে না, এমনকি কখনো পেতে চাইবে না, তার ক্ষতিপূরণ। কিন্তু দিবাস্বপ্ন কখনো বাস্তবতার বিকল্প হয়ে উঠতে পারে না; দিবাস্বপ্ন যদি সীমা পেরিয়ে যায়, তা মানুষকে অসুস্থ ক্লান্ত ক'রে তোলে। প্রতিটি তরুণী দিবাস্বপ্নক্লান্ত। একলা নির্জন দিবাস্বপ্ন তাকে ভ'রে তুলতে পারে না, স্বপ্ন স্থগিত হয়ে যাওয়ার পরই সে দেখে সে প'ড়ে আছে বাস্তবের আবর্জনার ওপর– নিঃসঙ্গ। সে তখন খোঁজে বান্ধবী, নিজের একান্ত দ্বিতীয় সত্তাকে। অনেক মেয়ে পরস্পরকে দেখায় নিজেদের নগ্ন দেহ, তুলনা করে নিজেদের স্তনের, শরীরের বিভিন্ন ভাঁজের, আবিষ্কার করে পরস্পরের দেহবিশ্ব। প্রতিটি মেয়ের, এবং ছেলের, মধ্যেই রয়েছে সমকামীপ্রবণতা; তরুণীর ওই প্রবণতার মূলে রয়েছে তার আত্মপ্রেম। তরুণীরা পরস্পরের শরীরে খুঁজে পায় নারীত্ব। কিন্তু তরুণী জানে সমকামী সম্পর্ক অস্থায়ী; এবং অনেক তরুণী এ-সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার সুযোগও পায় না, অনেকে পেয়েও গ্রহণ করে না। প্রচণ্ড বিধিনিষেধের খড়্গ ঝোলে তার ওপর; সমগ্র পিতৃতন্ত্র তাকে নিষেধ করে ওই সম্পর্কে যেতে। কেননা পুরুষই তার নিয়তি। তখন তার চোখে মোহনীয় হয়ে ওঠে পুরুষ। তবে পুরুষ তাকে মুগ্ধ করে, আবার সন্ত্রস্তও করে। যে-পুরুষ তাকে সন্ত্রস্ত করে, সে তাকে বাদ দিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে রাজপুত্রের। এখন চারদিকে রাজপুত্রের ভিড়; একালে রাজপুত্রেরা জন্মেছে সিনেমার অভিনেতা, গায়ক, খেলোয়াড় ইত্যাদি হয়ে। তরুণী তাদের স্বপ্ন দেখে; স্বপ্ন দেখে অন্য এলাকার কোনো বিখ্যাত পুরুষেরও। তার এ-স্বপ্ন বিশুদ্ধ স্বপ্ন, সে স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন দেখার জন্যেই; বাস্তবে ওই পুরুষকে পাওয়ার জন্যে নয়। সে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে বাস করে কল্পনায়, সে একাকার করে দেয় বাস্তবতা আর কল্পনাকে। তরুণী কামনা করতে থাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যার কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে পারে।

আত্মপ্রেম থেকে আত্মসমর্পণ হচ্ছে সমকামী প্রবণতা থেকে মর্ষকামিতার জগতে প্রবেশ। নারী সহজাত মর্ষকামী ব'লে নারীকে নিন্দিত ক'রে দিয়েছেন ফ্রয়েড; তবে নারী সহজাত মর্ষকামী নয়। পুরুষেরও রয়েছে মর্ষকামিতা। পুরুষতন্ত্র নারীকে দীক্ষা দিয়েছে মর্ষকামে, যন্ত্রণাসম্ভোগে; বাধ্য করেছে মর্ষকামে। পুরুষতন্ত্র যে-সমস্ত নারীকে প্রশংসাপত্র দিয়েছে, তারা সবাই তা কিনেছে মর্মান্তিক মর্ষকামিতার মূল্যে : তারা পুরুষের জন্যে সব ত্যাগ করেছে, জীবন উৎসর্গ করেছে, অজস্র পীড়ন সহ্য করেছে, এবং পুরুষতন্ত্র তাদের স্বীকার ক'রে নিয়েছে আদর্শ নারীকাঠামোরূপে। পুরুষতন্ত্র তরুণীকে শিখিয়েছে পুরুষের জন্যে দুঃখ স্বীকারই প্রেম, অবিরাম আত্মোৎসর্গই নারীত্ব। প্রেমে যে পড়ে সে-ই মর্ষকামী, তার কাজ যন্ত্রণায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠা। তরুণী অসংখ্য উপাখ্যানে শোনে আদর্শ প্রেমিকাদের দুঃখ স্বীকারের কাহিনী, সেও মনে মনে হয়ে ওঠে এক আদর্শ প্রেমিকা, যে প্রিয়তমের জন্যে সইবে অনন্ত দুঃখ। সে কল্পনা করে পিতামাতা সমাজসংসারকে অস্বীকার ক'রে সে বেরিয়ে পড়েছে প্রেমিকের হাত ধ'রে, তাদের জন্যে আর কিছু নেই, আছে শুধু প্রেম আর অবিরাম দুঃখ। সে দুঃখের পর দুঃখকে জয় করতে থাকে, প্রেমিককে রক্ষা করে সমস্ত বিপদ থেকে, এবং সুখ পায় প্রেমিকের বুকে মুখ রেখে। সে হয়ে ওঠে আরেক আদর্শ প্রেমিকা, নারী, যার নাম চিরকাল মনে রাখবে ইতিহাস। কিশোরতরুণও এমন অপরাজিত প্রেমের স্বপ্ন দেখে, তবে তার স্বপ্নটি বিপরীত; সে দেখে প্রেমিকাটি তার জন্যে সব ত্যাগ ক'রে এসেছে, তার বুকে স্থান পেয়ে ধন্য হয়েছে। কিশোর প্রেমিকেরা কিশোরী প্রেমিকার চোখে বার বার জল দেখতে চায়, জল দেখে খুব সুখ পায়; কিশোরীরাও চোখকে সমুদ্রের মতো ভ'রে তুলতে জানে। তরুণীকে সমাজই তৈরি করেছে মর্ষকামী ক'রে, কারণ সে নারী হবে; এবং তার জীবন হবে ধারাবাহিক মর্ষকামিতা। তার জৈব সংকেতের মধ্যে নেই এ-ব্যাধি, রয়েছে সামাজিক সংকেতে।

কাল্পনিক প্রেম থেকে বাস্তব প্রেমে যেতে ভয় পায় অনেক তরুণী; যখন স্বপ্নের পুরুষ সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন সন্ত্রস্ত হয় অনেকে। তরুণী পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, চায় পুরুষের অনুরাগ, কিন্তু ধরা পড়তে চায় না। বয়ঃসন্ধির সাথে সে লজ্জা বোধ করতে শেখে, পুরুষতন্ত্র তাকে লজ্জা বোধ করতে বলে; সে লজ্জা আর ছেনালিপনাকে একাকার ক'রে দেয়। তার লজ্জা সবখানি লজ্জা নয়, তার লজ্জা হচ্ছে উল্টোনো লজ্জাহীনতা। সে চায় তার দিকে তাকাক পুরুষ, কিন্তু তার দিকে কোনো পুরুষ তাকালে সে একই সাথে সুখ পায় ও আহত হয়। সে চায় তার সৌন্দর্যে পুরুষ মুগ্ধ হোক, কিন্তু যখন তারা তাকায় তার পায়ের দিকে, তার নিতম্বের দিকে, তার স্তনের দিকে, তখন সে লজ্জা পায়। তরুণী পুরুষের কামনা জাগিয়ে দিতে চায়, কিন্তু যখন দেখে সে কামনা জাগিয়ে দিয়েছে পুরুষের, তখন গুটিয়ে নেয় নিজেকে। সে স্পর্শ পেতে চায়, কিন্তু স্পর্শ পেলে প্রকাশ করে বিরক্তি। পৃথিবী জুড়ে তরুণীর জীবনের মূল লক্ষ্য একটি স্বামী পাওয়া; এবং অধিকাংশ সমাজে এখনো তার জন্যে স্বামীটি সংগ্রহ করে অভিভাবকেরা। সে নিজেকে নিজের পছন্দ মতো সমর্পণও করতে পারে না, সমর্পণ করে

অন্যরা। তাই তরুণী স্বাধীন সত্তা হিশেবে বিকশিত করতে পারে না নিজেকে। কোনো কোনো সমাজে তরুণী নিজের ভবিষ্যতকে নিতে পারে নিজের হাতে; তারা নিরন্তর পুরুষভাবনা থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু অধিকাংশ সমাজে আজো তা অসম্ভব। দিন দিন তা আরো অসম্ভব ক'রে তোলা হচ্ছে। বাঙলাদেশে তার কানে যে-অশ্লীল গানটি নিয়মিত বাজানো হয়, তা হচ্ছে বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে। বিয়েতে মুক্তি নেই তরুণীর, তার মুক্তি নিজের স্বাধীন সত্তায়। কিন্তু পরিবার ও সমাজ তার সত্তা বিকাশের জন্যে উৎসাহী নয়, উৎসাহী তাকে অবিকশিত ক'রে দিতে। আমাদের সমাজের প্রায় সবাই এখন কাজ করছে কিশোরীতরুণীর বিকাশের বিরুদ্ধে; সমাজনীতি আর রাজনীতি কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে। তারা এখন আর বিকশিত ও স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে না, দেখছে বন্দী হওয়ার বন্দী থাকার স্বপ্ন।

নষ্টনীড়

দ্য বোভোয়ার নারীর মাসিক রক্তক্ষরণের প্রক্রিয়াটিকে দৃষ্টি ও আবেগগ্রাহ্য ক'রে তুলেছেন একটি চিত্রকল্পে; বলেছেন (১৯৪৯, ৬১) নারীর ভেতরে প্রতি মাসে গ'ড়ে ওঠে একটি দোলনা, অপেক্ষা করে শিশুর জন্যে, কিন্তু শিশু আসে না ব'লে ভেঙে যায় দোলনাটি; ওই নষ্ট দোলনা নারীর ভেতর থেকে ক্ষরিত হয় বিষণ্ন রক্তিম ধারারূপে। নারী এ-সময় তার শরীরকে অনুভব করে সবচেয়ে যন্ত্রণার মধ্যে, মনে করে ওই শরীর তার নিজের নয়; এক অচেনা রাক্ষসীকে বেঁধে দেয়া হয়েছে তার সাথে। নারী, পুরুষেরই মতোই, দেহ; তবে এ-সময় তার দেহ সে নয়, অন্য কিছু। নারী প্রজাতির শিকার; নারী তার জীবনের অনেকগুলো বছর বিশেষ বিশেষ সময়ে বন্দী থাকে তার আভ্যন্তরে ঋতুচক্রে। প্রতিটি নারী মোটামুটি দশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে, বয়ঃসন্ধি থেকে ঋতুবন্ধ পর্যন্ত, চার শো পঞ্চাশ বারের মতো গড়ে আর ভাঙে নিজের আভ্যন্তর দোলনা; একে বলা হয় ঋতু, ঋতুস্রাব, মাসিক, রজঃ, পুষ্প, মেনস্ট্রুয়েশন, মেনসিজ। বলা হয়ে থাকে যে ঋতুস্রাব জরায়ুর কান্না-সন্তান আসে নি ব'লে মাসে মাসে রক্তধারায় কাঁদে জরায়ু। নারী একে মেনে নিতে বাধ্য হয়, তবে এটা তার জন্যে প্রীতিকর নয়। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা একে বলে 'অভিশাপ'; প্রতিটি নারীই একে মনে করে তার জীবনের পুনরাবৃত্ত অভিশাপ। নারী যদি এর হাত থেকে রেহাই পেতো, তবে বাঁচতো। ঋতুক্ষরণ তার জীবনের এক বড়ো বিরক্তি, বড়ো বোঝা; সন্তান ধারণ আর প্রসবও এমন বিরক্তিকর নয় নারীর কাছে। তবে নারীর জীবনের এ-সত্যটির জন্যে পিতৃতন্ত্র নারীকে পুরস্কার দেয় নি, তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে নি, তাকে দিয়েছে শাস্তি। নারী খুব বিব্রত বোধ করে তার মাসিক নিয়ে, তার কারণ পিতৃতন্ত্রের চোখে এটা দূষণ; এ-সময়ে নারী নিজে দূষিত, দূষিত করে পুরুষদের, এমন বাজে ধারণা সৃষ্টি করেছে সমস্ত পিতৃতন্ত্র। এ-ধারণা দিয়ে আধুনিক সময়ও আচ্ছন্ন। এ-সময়েও নারীও বলে যে তার শরীর 'খারাপ'। কোনো কোনো সমাজে মেয়ে প্রথম ঋতু দেখার সময় উৎসব করা হতো; আঠারোশতকের কবি নসরুল্লাহ্ খোন্দকার জানিয়েছেন চট্টগ্রামে ঋতুসূচনাকে বলা হতো 'পুষ্পদেখা' ; এবং সেখানে 'কন্যা বা বধূ প্রথম রজস্বলা হলে বাজনা বাজিয়ে এবং সহেলা ও নৃত্যাদির অনুষ্ঠান করে উৎসব করা হত'; তবে 'রজস্বলা নারীকে মুসলিম ঘরেও অপবিত্র মনে করা হত' [আহমদ শরীফ (১৯৭৭, ১৫০)]। পিতৃতন্ত্রের তিরস্কারের ফলেই ঋতুস্রাব পরিণত হয়েছে গোপন নিষিদ্ধ ঘটনায়, তবে এটা গোপন নিষিদ্ধ ব্যাপার হওয়ার মতো কিছু নয়। একে প্রকাশ্য ঘটনার মর্যাদা দেয়ার জন্যে সিলভিয়া প্লাথ কবিতা লিখেছেন ঋতুস্রাব নিয়ে; এবং জারমেইন গ্রিয়ার প্রস্তাব করেছেন আধুনিক ঋতুস্রাব উৎসবের। তাতে যে-বালিকা প্রথম রক্ত দেখে শিউরে

উঠেছে, নিজেকে ভাবতে শুরু করেছে ঘৃণ্য, সে পাবে আত্মবিশ্বাস, নিজেকে মনে করবে জীবনের জন্যে প্রস্তুত।

আদিম মানুষেরা নারীর পুনরাবৃত্ত ক্ষরণকে দেখেছে ভয় বিস্ময় ঘৃণার চোখে। ঋতুমতী নারীকে নির্দেশ করেছে অশুচি, তাকে ক'রে তুলেছে নিষিদ্ধ অস্পৃশ্য প্রাণী। পৃথিবীর চারটি প্রধান ধর্ম–হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্ট, ইসলাম ধর্মের চোখে নারীর মাসিক চক্র অত্যন্ত অপবিত্র। প্রতিটি ধর্মের চোখেই নারীর শরীর ঘৃণার বস্তু; নারীর রন্ধ্রটির জন্যে পুরুষ পাগল থাকলেও ওটির নিন্দা করতে কেউ কুণ্ঠা বোধ করে নি, তাই ওই রন্ধ্র থেকে রক্তক্ষরণকে প্রতিটি ধর্মই ঘৃণ্য ব'লে গণ্য করেছে। প্রতিটি ধর্মে ঋতুমতী নারী পশুর থেকেও নিকৃষ্ট। মানুষের চোখে রক্ত বিস্ময়কর বস্তু, তা একই সাথে শক্তি ও ভয়ের ব্যাপার; আদিম মানুষেরা মাসিক রক্তকে মনে করেছে ভীতিকর। তারা ঋতুকে মনে করেছে শয়তানের কাজ, তাই ঋতুমতী নারীর জন্যে নিষিদ্ধ করেছে সব কিছু, এবং তাকে নিষিদ্ধ করেছে সব কিছুতে। জুরথুস্ত্রীয় বিধান হচ্ছে ঋতুমতী নারী পবিত্র শিখার দিকে তাকাতে পারবে না, জলে নামতে পারবে না, সূর্যের দিকে তাকাতে পারবে না, পুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে না। পাপুয়া নিউগিনির কাফিরা ঋতুমতী নারীকে একলা এক সপ্তাহ ধ'রে আটকে রাখে অন্ধকার কুঁড়েঘরে, তাকে কিছু খেতে দেয়া হয় না। এভাবে তাকে শিখিয়ে দেয়া হয় যে সে নিজের ও অন্যদের জন্যে ভয়ঙ্কর। তার শরীর ও রক্তের ছোঁয়ায় পুরুষের বমি পায়, পুরুষের রক্ত কালো হয়ে যায়, পুরুষের মাংস দূষিত ও বুদ্ধি নষ্ট হয়, মৃত্যু হয়। পিতৃতন্ত্রগুলো এমন আদিম বিশ্বাস থেকেই বিধান তৈরি করেছেঋতুমতী নারীর জন্যে। বাইবেলের *লেবীয় পুস্তক*-এ *[লেভিটিকাস]* ঋতুমতী নারীকে বারো দিনের জন্যে 'নিদ্দাহ্' বা অশুচি হিশেবে নির্দেশ করা হয়েছে; এবং ১৫৬৫ সালে লেখা একটি বিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে সে স্বামীর সাথে একই শয্যায় শোবে না, পরিবারের কারো সাথে খাবে না, অন্যদের সাথে এক ঘরে থাকবে না, স্যাবাথের প্রদীপ জ্বালবে না, সিনেগগে ঢুকবে না, স্বামীকে স্পর্শ করবে না, তাকে কিছু দিতেও পারবে না। তাকে পরতে হবে এমন পোশাক যাতে তাকে দেখায় ইহুদিদের মধ্যে ইহুদি [দ্র মাইল্‌স্ (১৯৮৮, ৮২-৮৩)]! অর্থাৎ সে পচা নোংরা প্রাণী। খ্রিস্ট ও মুসলমানধর্ম ইহুদিধর্ম থেকে প্রচুর ধার করেছে প্যালেস্টাইনের গোত্রীয় কুসংস্কার; আর সেগুলোকে বিধিবদ্ধ করেছে ধর্মের বিধানরূপে। ঋতুমতী নারী সম্পর্কে হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমানের বিধানও নিষ্ঠুর; হিন্দু নিষ্ঠুরতায় ইহুদির সমান [দ্র 'দেবী ও দানবী']। সব ধর্মেই ঋতুকালে নিষিদ্ধ করেছে সঙ্গম, তবে অধিকাংশ নারী এ-সময়েই বোধ করে তীব্র কাম, ও পুলক বোধ করে সবচেয়ে বেশি।

পিতৃতন্ত্রের নিন্দিত নারীর শরীর ও সত্তা জুড়ে এ-সময় ঘটে এমন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, যা তাকে ক'রে রাখে অভিভূত। অনেক নারীর জন্যে এটা কোনো বিশেষ বিপন্নতা নয়, কিন্তু ঋতুক্ষরণকালে, এবং শুরুর কয়েক দিন আগে থেকেই, অধিকাংশ নারী বোধ করে বিপন্ন। শুরুর আগে অনেক নারীর দেখা দেয় একরাশ উপসর্গ, যাকে বলা হয় প্রাকস্রাব সিন্ড্রোম। চিকিৎসকেরা মনে করে এসবের পেছনে কোনো বাস্তব কারণ নেই, তবে

ওগুলো অনেকের জন্যেই বাস্তব; সেগুলো হয়তো নেই, কিন্তু তারা বোধ করে; তাদের জীবন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অনেক নারী বোধ করে তাদের শরীর ভারী হয়ে উঠছে, জুতোতে পা আংটিতে আঙুল ঢুকছে না; দেখা দিচ্ছে মাথা ব্যথা, পাচ্ছে বিবমিষায়। শুরুর আগে বাড়ে তাদের রক্তচাপ, আবার শেষের দিকে হ্রাস পায় রক্তচাপ; অনেক সময় শরীরে দেখা দেয় উত্তাপ, বোধ হয় জ্বর, তলপেটে দেখা দেয় যন্ত্রণা। অনেকের দৃষ্টি আর শ্রুতিতে ঘটে ব্যাঘাত, অনেকের শরীরে দেখা দেয় দুর্গন্ধ। নারী হয়ে পড়ে অস্থির। তার মনোজগতে দেখা দেয় বিচলন। অনেকের মেজাজ ঠিক থাকে না, বোধ করে চরম বিষণ্নতা, স্মৃতিভ্রংশতা ঘটে অনেকের, অনেককে পায় স্বপ্নগ্রস্ততায়। টি এস এলিঅটের প্রথম স্ত্রী এর শিকার হয়ে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। এ-সময়েই নারী শরীরকে বোধ করে সবচেয়ে যন্ত্রণার মধ্যে, বাস করে রাক্ষসীর সাথে।

বালিকার জীবনের দশ থেকে বারো বছর বয়সের সময়টি তার বয়ঃসন্ধির কাল: এ-সময়ে সে হয়ে ওঠে কিশোরী। দশ থেকে ষোলো বছর বয়সের সময়টিকে ধরতে পারি কৈশোর হিশেবে। তার কৈশোরজীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ঋতুস্রাবসূচনা। দশ থেকে ষোলো, এমনকি উনিশ, বছর বয়সের মধ্যে যে-কোনো সময় এটা ঘটতে পারে। ঋতুর প্রথম আবির্ভাবকে বলা হয় ঋতুসূচনা [মেনার্কি]। ঋতুসূচনাকে মনে করা হয় বালিকার নারী হয়ে ওঠা; অর্থাৎ পিতৃতন্ত্রের মতে নারীর প্রধান যে-কাজ, সন্তানধারণ, বালিকা তার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ঋতুসূচনা কখন ঘটবে নির্ভর করে বালিকার শরীরের পুষ্টির ওপর; গরিব পরিবারের মেয়েদের ঋতুসূচনা ঘটে দেরিতে, ধনী পরিবারের মেয়েদের ঘটে কিছুটা কম বয়সে। এর সাথে জলবায়ুর সম্পর্ক নেই; উষ্ণ অঞ্চলে তাড়াতাড়ি আর শীতল অঞ্চলে বিলম্বে ঘটে, এমন নয়; এর সম্পর্ক শরীরের পুষ্টির সাথে। আর্থসামাজিক অবস্থার প্রভাব সুদূরপ্রসারী, তা স্বর্গকে প্রভাবিত করে, করে বালিকার মস্তিষ্ককেও। ঋতুসূচনা বালিকার শরীরের ভেতরে ঘটা একরাশ ঘটনার পরিণতি। তার শরীরের এ-পরিবর্তন ঘটে কয়েকটি গ্ল্যান্ড বা লালাগ্রন্থির পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের ফলে। এ-সব ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক গ্রন্থিটির নাম হাইপোথালামাস; এটি অবস্থিত মস্তিষ্কের এক বিশেষ স্থানে। এটি পিটুইটারি গ্রন্থির সাথে সমন্বয় ক'রে কাজ করে, এবং নিয়ন্ত্রণ করে পরবর্তী ঘটনাগুলো। অজানা কেনো কারণে ঋতুসূচনার বছর চারেক আগে থেকে হাইপোথালামাস এক ধরনের বস্তু নিঃসারণ করতে থাকে, তার নাম নিঃসারক হরমোন। নিঃসারক হরমোনের কাজ অন্য হরমোনের নিঃসরণ ঘটানো। হাইপোথালামাস ও পিটুইটারির সংযোজক রক্তনালিগুলোর ভেতর দিয়ে নিঃসারক হরমোন বইতে থাকে, এর ফলে পিটুইটারি থেকে নিঃসৃত হয় কয়েকটি হরমোন। এগুলোর একটি শরীরবৃদ্ধিকারক হরমোন, যার ক্রিয়ায় ঋতুসূচনার আগে শরীর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঋতুসূচনার চার বছর আগে থেকে বালিকা বাড়তে শুরু করে; প্রথম দু-বছর বেশি বাড়ে, ঋতুসূচনা যতোই কাছিয়ে আসে ততোই তার বাড়া কমতে থাকে। বারো বছর বয়সের দিকে পিটুইটারি গ্রন্থি দেড় ঘন্টা পর পর ঝলকে ঝলকে নিঃসারণ করে আরেকটি নিঃসারক হরমোন। এর নাম গোনাডোট্রোফিন

নিঃসারক হরমোন। এ-হরমোন সক্রিয় ক'রে তোলে পিটুইটারির বিশেষ কিছু কোষকে। ওই কোষগুলো উৎপাদন করে এমন দুটি হরমোন, যা নিয়ন্ত্রণ করে বালিকার ডিম্বাশয়কে। এর একটির নাম ফলিকল-উদ্দীপক হরমোন; অন্যটির নাম হলুদ-উৎপাদক হরমোন।

বয়ঃসন্ধির কালে বালিকার ডিম্বাশয়ে থাকে দু-লক্ষের মতো ডিম্বাণু; তার মধ্যে এক ধরনের ডিম্বাণু থাকে, যেগুলোর ভেতরে দেখা দেয় তরল পদার্থ; ওগুলোর নাম *ফলিকল*। ফলিকল শব্দের অর্থ *আধার*। ফলিকল-উদ্দীপক হরমোনের কাজ ফলিকলকে উদ্দীপ্ত করা, এর ক্রিয়ার ফলে ডিম্বাশয়ের কোনো কোনো ফলিকল বিকশিত হয়। প্রথম দিকে খুব কম ফলিকলই বিকশিত হয়; তবে সেগুলো বৃদ্ধি পাওয়ার সময় উৎপন্ন হয় ইস্ট্রোজেন নামের একটি হরমোন। ইস্ট্রোজেন শব্দের অর্থ 'ডিম্ব-উৎপাদক', নাম থেকেই এর কাজ বোঝা যায়। ইস্ট্রোজেন বালিকাকে করে নারী। উদ্দীপ্ত ফলিকলগুলো মাসখানেক ধ'রে ইস্ট্রোজেন উৎপাদন ক'রে মারা যায়। এ-সময়ে আরো অনেক ফলিকলও উদ্দীপ্ত হয়, এগুলোও ইস্ট্রোজেন উৎপাদন করে। প্রতি মাসে আরো বেশি ক'রে (১২ থেকে ২০টি) ফলিকল উদ্দীপ্ত হ'তে থাকে, তাই ধীরেধীরে ইস্ট্রোজেন উৎপাদনও বাড়ে। ইস্ট্রোজেনের অনেক কাজ : এটি স্তননালি ও স্তনবৃন্তের চারপাশের এলাকার বৃদ্ধি ঘটায়; এটি ডিম্বনালি, জরায়ু ও যোনিকে বাড়ার জন্যে উদ্দীপ্ত করে। এটি নিতম্বে মেদ সঞ্চার করে, তবে শরীরের বৃদ্ধি শ্লথ ক'রে দেয়। ক্রমশ শরীরে বেশ বৃদ্ধি পায় ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ, ঋতুসূচনা সন্নিকট হয়ে আসে। ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ার ফলে জরায়ুর ভেতরের দেয়ালের আস্তরণ বাড়ে। ওই আস্তরণকে বলে এন্ডোমেট্রিয়াম। এ-সময়ে হ্রাস পায়ে ফলিকল-উদ্দীপক হরমোন। যেই ফলিকল-উদ্দীপক হরমোনের পরিমাণ কমতে থাকে, অমনি ডিম্বাশয়ে ফলিকল বাড়া থেমে যায়, এবং ইস্ট্রোজেন নিঃসরণও হ্রাস পায়। তখন জরায়ুর ভেতরের দেয়ালের আস্তরণ গঠিত যে-সব রক্তনালিতে, সেগুলো ভেঙে যায়; জরায়ুতে রক্তক্ষরণ ঘটে। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এন্ডোমেট্রিয়াম। রক্ত, তন্তুর তরল পদার্থ এবং এন্ডোমেট্রিয়ামের কোষ জমা হয় জরায়ুতে, তারপর বাইরে বেরিয়ে আসে যোনিপথ দিয়ে। শুরু হয় রক্তস্রাব, দেখা দেয় ঋতুসূচনা।

ঋতুসূচনার পর থেকে প্রথমে অনিয়মিত, পরে নিয়মিতভাবে কিছু দিন পর পর দেখা দেয় মেয়েদের ঋতুস্রাব। সূচনার চার থেকে ছ-বছর, সতেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে প্রতিটি মেয়ের ঋতুস্রাবের একটি বিশেষ ধরন দাঁড়িয়ে যায়। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ধরন, তবে অধিকাংশ নারীরই, যদি সে গর্ভবতী না হয়, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মাসে একবার ঋতুস্রাব ঘটে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের দিকে আবার অনিয়মিত হয়ে ওঠে; এবং চিরকালের জন্যে ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। একে বলে *ঋতুসমাপ্তি* [মেনোপজ]। এক ঋতুস্রাবের সূচনা থেকে আরেক স্রাবের সূচনা পর্যন্ত সময়কে বলা হয় ঋতুস্রাব চক্র। প্রতিটি চক্র শুরু হয়ে ক্ষরণ শুরুর দিন। তাই ঋতুচক্রের মধ্যে পড়ে ক্ষরণেব দিনগুলো, এবং আরেক স্রাব শুরু হওয়া পর্যন্ত দিনগুলো। অধিকাংশ নারী

নিজের ঋতুচক্র সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কিছুই জানে না; এমনকি চক্রের দিনগুলো গোণার নিয়মও জানে না। উচ্চশিক্ষিত অধিকাংশ নারীও মনে করে একেকটি চক্র শুরু হয় ক্ষরণ সমাপ্ত হওয়ার পর দিন থেকে, যদিও চক্র শুরু হয় ক্ষরণ শুরুর দিন থেকে। সবার চক্র সমান দীর্ঘ নয়; ঋতুচক্র ২২ থেকে ৩৫ দিনের হ'তে পারে, এবং গড়ে হয় ২৯ দিনের। পরবর্তী স্রাব ঠিক কোন দিন শুরু হবে, তা একশো ভাগ নিশ্চিতির সাথে বলা অসম্ভব, সাধারণত দু-চারদিন এদিক-সেদিক হয়। কিশোরীদের ঋতুস্রাব বেশ অনিয়মিত, সাধারণত স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি দিন পর পর হয়, তবে কোনো কোনো মেয়ের হয় ঘন ঘন। ঋতুসূচনার পর প্রথম দু-এক বছর বছরে মাত্র দু-তিনবার দেখা দেয়, যখন দেখা দেয় তখন প্রবলভাবে দেখা দেয়। তবে পরে একটা নিয়মিত চক্র দাঁড়িয়ে যায়। ঋতুস্রাবে নারীর আভ্যন্তর ঘটনারাশির নিয়ন্ত্রক হাইপোথালামাস। মস্তিষ্কের এ-অংশটিও আবেগকাতর হয়, বিপর্যস্ত হয়; এবং প্রবল আবেগকাতরতার ফলে ঋতুস্রাব সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যেতে পারে। কোনো মেয়ে বাড়ি থেকে অন্য কোথাও গেলে, বা পেশা বদলালেও সাময়িকভাবে স্থগিত হ'তে পারে তার চক্র। আবেগগত কারণে দু-তিন মাস, এমনকি বছর খানেকের জন্যেও স্থগিত হয়ে যেতে পারে ঋতুচক্র। এর নাম আমেনোরয়েয়া বা ঋতুবিরতি। এটা রোগের ফলে ঘটতে পারে, এবং এর পেছনে কোনো রোগ নাও থাকতে পারে। রোগের কারণে না হ'লে ঋতুবিরতি কোনো গুরুত্বের ব্যাপার নয়। অনেকের ধারণা ঋতুস্রাবে শরীর পরিচ্ছন্ন হয়, তবে ঋতুস্রাবে শরীর পরিচ্ছন্ন হয় না; আর ঋতুস্রাব না হ'লেও তার ভেতরে কোনো আবর্জনা জমে না। ঋতুক্ষরণকে পুরুষেরা ঘেন্না করে, কামুকও এ-সময় নারীকে ছুঁতে চায় না; নারীরাও নিজেদের মনে করে অশুচি। এতে অশুচিত্বের কিছু নেই, সঙ্গম না করারও কিছু নেই; বরং এ-সময়টা সম্পূর্ণ নিরাপদ, এবং অধিকাংশ নারী এ-সময়েই বোধ করে বেশি কামাবেগ। ঋতুক্ষরণের রক্ত দূষিত নয়, ঘৃণার বস্তু নয়। গ্রিয়ার (১৯৭০, ৫১) বলেছেন, 'যদি তুমি নিজেকে মুক্ত মনে করো, তবে তুমি তোমার ঋতুরক্ত একটু চেখে দেখার কথা ভেবে দেখতে পারো-যদি তোমার এতে ঘেন্না লাগে, তবে আরো অনেক পথ বাকি আছে, মেয়ে।'

নারীর অভ্যন্তরে তার জীবনের প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে মাসে মাসে পুনরাবৃত্ত হ'তে থাকে একই ধরনের সংকেত, সংকেতের ফলে ঘটতে থাকে একই ধরনের ঘটনা। ঘটনাগুলোর নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্কের একটি অংশ, তার নাম হাইপোথালামাস। প্রথমে হাইপোথালামাস কাজ শুরু করে, সেটি গোনাডোট্রোফিন-নিঃসারক হরমোন পাঠায় পিটুইটারি গ্রন্থিতে, উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে পিটুইটারির কোষ। পিটুইটারি ক্ষরণ করে দুটি হরমোন : একটি ফলিকল-উদ্দীপক হরমোন, আরেকটি হলুদ-উৎপাদক হরমোন। ফলিকল-উদ্দীপক হরমোনের কাজ ডিম্বাশয়ের ডিম্বাণু ফলিকলগুলোকে উদ্দীপ্ত করা। রক্তে ফলিকল উদ্দীপক হরমোন বাড়ার ফলে ডিম্বাশয়ে ১২ থেকে ২০টির মতো ডিম্বাণু উদ্দীপ্ত হয়। এ-ফলিকলগুলো বৃদ্ধি পায়, এবং উৎপাদন করে ইস্ট্রোজেন। ইস্ট্রোজেন-এর অর্থ *ডিম্ব-উৎপাদক*, এর কাজ ডিম্বাণু ফোটানো। ইস্ট্রোজেন একটি নারী হরমোন,

এটি নারীদেহে নানা কাজ করে; তবে এর বিশেষ কাজ হচ্ছে জরায়ুর ভেতরের দেয়ালের আস্তরণ সৃষ্টি করা। ইস্ট্রোজেন জরায়ুর আস্তরণকে উদ্দীপ্ত করে, তার ফলে আস্তরণ বিকশিত হয়। এ-আস্তরণের নাম এন্ডোমেট্রিয়াম। এর বৃদ্ধি ঘটে চক্রের ৫ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত। এটি সরু সরু নালিতে গঠিত, এতে থাকে কোষের কয়েকটি স্তর। ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে কোষের স্তর বৃদ্ধি পায়। জরায়ুতে যে পরিবর্তন ঘটে, তা বৃদ্ধিমূলক; তাই ঋতুচক্রের এ-পর্বকে বলা হয় চক্রের বৃদ্ধিপর্ব। এ-পর্বে নারীর ভেতরে তৈরি হয় নীড়, যেখানে বাসা বাঁধতে পারে ভ্রূণ।

ফলিকল বাড়তে থাকে, সাথে সাথে রক্তে বাড়তে থাকে ইস্ট্রোজেন। চক্রের ১৩ দিনের দিন রক্তে এর পরিমাণ শুরুর দিনের ছ-গুণ হয়ে দাঁড়ায়। এ-সংবাদ পৌঁছে যায় হাইপোথালামাসে, সেটি বুঝতে পারে যে আর ফলিকল উদ্দীপ্ত করার দরকার নেই; তাই কমিয়ে দেয় ফুলকল-উদ্দীপক হরমোন উৎপাদন। তখন হাইপোথালামাস নিঃসরণ করে একটি হরমোন, যার নাম হলুদ-উৎপাদক-হরমোন-নিঃসারক হরমোন। বাঙলায় নামটি বেশ বিদঘুটে শোনাচ্ছে, এর কাজ হচ্ছে হলুদ-উৎপাদক হরমোন নিঃসরণে পিটুইটারিকে উদ্দীপ্ত করা। এর প্রভাবে পিটুইটারি উৎপাদন করে হলুদ-উৎপাদক হরমোন বা লিউটিনাইজিং হরমোন। এ-হরমোন ডিম্বাণু ফলিকলগুলোর কোনো একটিকে ফুটিয়ে তার ভেতরের ডিম্বাণুটিকে বের হ'তে সাহায্য করে; এবং ফলিকলের কোষগুলোকে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণে রঞ্জিত ক'রে তোলে। এ-জন্যেই এর নাম লিউটিনাইজিং বা হলুদ-উৎপাদক হরমোন। চক্রের ১৪ দিনের দিন হঠাৎ রক্তনালি দিয়ে হলুদ-উৎপাদক হরমোনের প্রবল প্রবাহ বয়ে যায়। এ-হরমোন পৌঁছে ডিম্বাশয়ে, সেখানে এটি সবচেয়ে বিকশিত ফলিকলটিকে ফুটিয়ে ডিম্বাণুটিকে বের ক'রে দেয়। একে বলা হয় ওভিউলেশন বা ডিম্বস্ফোটন। ডিম্বাণুটি ধরা পড়ে ডিম্বনালির আঙুলাকৃতির প্রান্তে, এবং সেটি ডিম্বাণুটিকে ছেড়ে দেয় ডিম্বনালিতে। ফোটা বা উর্বর ডিম্বাণু এগোতে থাকে সামনের দিকে।

ডিম্বনালিতেই ঘটে উর্বরায়ণ বা গর্ভসূচনা। ডিম্বাণু বেরিয়ে যাওয়ার পর তার শূন্য ফলিকল বা আধারটি চুপসে যায়, হলুদ-উৎপাদক হরমোন সেটিকে হলদে ক'রে তোলে। চোপসানো ফলিকলটিকে বলা হয় *হলুদ বস্তু*। এ-হলুদ বস্তুটি, এবং অন্যান্য ১১ থেকে ১৯টি ফলিকল যেগুলো তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে নি, সবাই মিলে একটি নতুন হরমোন উৎপাদন করতে থাকে। এর নাম প্রোজেসটেরোন। এর অর্থ *গর্ভ-উৎপাদক*। প্রোজেসটেরোন দ্বিতীয় প্রধান নারী হরমোন। এর নানা কাজের মধ্যে প্রধান কাজটি হচ্ছে জরায়ুকে ভ্রূণধারণ ও লালনপালনের জন্যে প্রস্তুত করা। প্রোজেসটেরোন জরায়ুর দেয়ালআস্তরণকে পুরু ক'রে তোলে, গ্রন্থি থেকে পুষ্টিকর তরল পদার্থের নিঃসরণ ঘটিয়ে জরায়ুকে ভ্রূণলালনের উপযুক্ত করে। ডিম্বাণু ফোটার পর চক্রের পর্বকে বলা হয় হলুদপর্ব বা গর্ভ-উৎপাদক পর্ব। যদি ডিম্বাণু উর্বর অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার না হয়, এবং ভ্রূণ এন্ডোমেট্রিয়ামে স্থান না নেয়, তাহলে ডিম্বাশয়ে হলুদ বস্তুটি ও উদ্দীপ্ত ফলিকলগুলো মারা যায়। তখন রক্তে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেসটেরোন হ্রাস পায়। এর ফলে

হাইপোথালামাস আবার গোনাডোট্রোফিন নিঃসারক হরমোন ছাড়তে থাকে, এবং পিটুইটারি আবার ফলিকল-উদ্দীপক হরমোন উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। রক্তে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেসটেরোন ক'মে যাওয়ার ফলে পরবর্তী ঋতুস্রাবের দিন চারেক আগে থেকে জরায়ুর মোটা রসপূর্ণ আস্তরণ কুঁচকে যেতে থাকে; এর ফলে এর রক্তনালিগুলো গুটিয়ে যায়। ভাঙতে শুরু করে গোটানো রক্তনালিগুলো, আস্তরণের গভীরতর স্তরে ঘটতে থাকে রক্তপাত। এর ফলে রক্তের ওপর ভাগের আস্তরণ পৃথক হয়ে পড়ে; এটি ভেঙেচুরে পড়ে জরায়ুতে, এর সাথে পড়ে এন্ডোমেট্রিযাম থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত ও তরল পদার্থ। ঋতুস্রাবে রক্ত বেশি থাকে না, নিঃসৃত বস্তুর এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক হয় রক্ত। এ-রক্ত সাধারণত চাপ বাঁধে না। কয়েক ঘন্টার মধ্যে এতোটা বর্জ্য জমে যে জরায়ু সংকুচিত হয়ে যোনির ভেতর দিয়ে তা বের ক'রে দেয়। শুরু হয় ঋতুস্রাব।

ঋতুক্ষরণ তিন থেকে পাঁচ দিন ধ'রে চলে; তবে এক দিনের ক্ষরণ যেমন ঘটে, তেমনই আট দিন ধ'রেও ক্ষরণ ঘটতে পারে। ক্ষরণে সাধারণত গড়ে ৩০ মিলিলিটার রক্ত ঝরে। চক্রের প্রথম পর্ব, অর্থাৎ ঋতুক্ষরণ শুরু থেকে ডিম্বাণু ফোটা পর্যন্ত সময়টা নির্দিষ্ট নয়। এ-পর্বটি ৯ থেকে ২৫ দিনের, বা তারও বেশি দিনের হ'তে পারে। ডিম্বাণুটি কবে ফুটবে, তা জানাই কঠিন; জানলে সহজে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যেতো। কেননা ডিম্বাণু ফলিকল থেকে বোরোনোর পর বাঁচে প্রায় ৭২ ঘন্টা, তবে তা উর্বর হ'তে পারে ৩৬ ঘন্টা পর্যন্ত। শুক্রাণু বাঁচতে পারে ৪৮ ঘন্টা। তাই ২৮ দিনের একটি চক্রে উর্বরতার কাল ১২০ ঘন্টার বেশি নয়; কমও হ'তে পারে। সমস্যা হচ্ছে নারীর ডিম্বস্ফোটনের দিনটি জানা দুরূহ। তবে চক্রের ৯ম দিনের আগে ও ২০তম দিনের পর গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা কম। চক্রের দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ ডিম্বাণু ফোটার দিন থেকে নতুন চক্রের ক্ষরণ শুরুর দিন সব সময়ই হয় ১৪ দিন; তাই ডিম্বাণু ফোটার দিনটি জানা গেলে পরবর্তী চক্র শুরুর দিন কবে হবে, তা ব'লে দেয়া যায়। কিন্তু ডিম্বাণু ফোটার দিনটি নির্দিষ্টভাবে জানা খুবই কঠিন। নারীর ভেতরে যা ঘটে, তার জন্যে তার প্রাপ্য ছিলো স্তব; কিন্তু পিতৃতন্ত্র তাকে করেছে তিরস্কার; ঘোষণা করেছে দূষিত ব'লে। কারণ নারীর কোনো-না-কোনো দোষ খুঁজে বের করতে পারলেই পিতৃতন্ত্র তার বিধানকে ক'রে তুলতে পারে আরো নির্মম।

প্রেম ও কাম

প্রেম ও কাম পরস্পরসম্পর্কিত, দুটিই নারীপুরুষের জীবনের বিশেষ পর্বে প্রবলভাবে দেখা দেয়, যদিও জীবনে দুটির গুরুত্ব সমান নয়। প্রেম স্বল্পায়ু, মানুষ প্রেমে বাঁচে না, জীবনে প্রেম অপরিহার্য নয়; প্রেম বিশেষ বিশেষ সময়ে কোনো কোনো নরনারীর জীবনে জোয়ারের মতো দেখা দেয়, তাতে সব কিছু– অধিকাংশ সময় তারা নিজেরাই– ভেসে তলিয়ে যায়; তবে আজীবন মানুষ বাস করে নিপ্প্রেম ভাঁটার মধ্যে। প্রেম তীব্র আবেগ, তা ঝড় জোয়ার বন্যা স্রোত ঘূর্ণির মতোই; ওগুলোর মতোই প্রেমও দীর্ঘস্থায়ী নয়, এবং বার বার দেখা দিতে পারে। তবে প্রেমকে অতিশায়িত ক'রে দেখা রোম্যান্টিক আন্দোলন-উত্তর কালের, পুরুষের, স্বভাব। প্রেমের থেকে কামের, আশ্লেষের, আয়ু অনেক বেশি: কাম দোলনা থেকে কবর, চিতা পর্যন্ত বেঁচে থাকে। অপ্রেম জীবন দশকপরম্পরায় যাপন করে মানুষ, অধিকাংশের জীবনেই কখনোই প্রেমের ছোঁয়া লাগে না; কিন্তু কামহীন জীবন অসম্ভব। যাদের কাম অচরিতার্থ, যারা সঙ্গী পায় না কামের, তারাও একান্ত কামযাপন করে। প্রেম বলতে গত আড়াই শো বছর ধ'রে পশ্চিমের পৃথিবী যা বোঝে, এবং পশ্চিম থেকে ঋণ ক'রে আমরা যা বুঝি এক শতাব্দী ধ'রে, তা রোম্যানটিকদের আবিষ্কার। পুরোনো পৃথিবীতে প্রেম ছিলো না; আজ আছে একটি বড়ো কিংবদন্তি হয়ে। যে-আবেগ প্রেম নামে নরনারীর মনে জেগে ওঠে বিপরীত লিঙ্গের কারো জন্যে, কিশোরতরুণের কাছে যা রক্তমাংসের অনেক ওপরের কোনো স্বপ্ন ব'লে মনে হয়, তা আসলে মাংসের জন্যে মাংসের সোনালি ক্ষুধা।

কিশোর বয়সে অভাব থাকে মাংসের অভিজ্ঞতার, তাই প্রেমকে মনে হয় একান্ত হৃদয়ের; কিন্তু অভিজ্ঞতার পর তা হৃদয়াবেগ রূপে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, দুপুরের হৃদয় সন্ধ্যায়ই মাংসের উল্লাস হয়ে দেখা দেয়। প্রেম ও কাম একই জিনিশের সূচনা ও সমাপ্তি; সূচনার সঙ্গে জড়িত কাতরতা, যন্ত্রণা, আত্মোৎসর্গপরায়ণতা, মর্ষকামিতা, ব্যর্থতাবোধ; পরিণতির সঙ্গে জড়িত সম্ভোগ, সুখ, বিজয়, ধর্ষকামিতা। প্রেম উত্তেজনাপর্ব, যখন নারীপুরুষের মনে জাগতে থাকে আবেগ; কাম হচ্ছে পুলকপর্ব, যখন শরীরের সাথে শরীরের ঘর্ষণে ওই আবেগ ছোঁয় চূড়ো; আর পরবর্তী জীবন হচ্ছে নিবৃত্তিপর্ব। প্রেম একটি মানসিক অবস্থা, এবং খুব স্বাভাবিক অবস্থা নয়; তা স্বাভাবিকতা থেকে পতন। বাঙলায় যে বলা হয় 'প্রেমে পড়া', তা নির্দেশ করে স্বাভাবিকতা থেকে ওই বিচ্যুতিকেই। প্রেমের উপসর্গগলোর মধ্যে রয়েছে অনিদ্রা, অন্যমনস্কতা, ক্ষুধাহীনতা, কাতরতা। প্রেমিকপ্রেমিকার চোখ ভ'রে থাকে তাদের প্রেমাস্পদ, তারা বাস করে অস্বাভাবিকতার মধ্যে। তবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাদের কিছু কালের জন্যে সুখে ভ'রে দেয়। যাকে চাই তাকে না পাওয়া প্রেম, তাকে পাওয়া কাম।

মানুষ পেতে চায়, তাই কাম বা যৌনতা জীবনের খাদ্য ও পানীয়। কামচরিতার্থতা অনেকটা জীবনচরিতার্থতা। যার কামজীবন পরিতৃপ্ত নয়, সে সুস্থ নয়, খুব ভেতরে তার নিরন্তর দংশন চলতেই থাকে। একটি পুলকপ্লাবিত সঙ্গম নারীপুরুষকে যা দিতে পারে, তা আর কিছু দিতে পারে না; জন্মজন্মান্তরের অচরিতার্থ প্রেমের থেকে একবার পুলকিত সঙ্গম উত্তম। সঙ্গম বাইরের দিক থেকে রুচিকর নয়; সভ্য সংস্কৃত মানুষ কীভাবে মেতে উঠতে পারে অমন বন্যতায়, তা ভেবে অনেক মনীষী বিস্মিত হয়েছেন, এবং প্রায় সমস্ত কিশোরকিশোরী বোধ করে ঘৃণা। আমার মাবাবাও এমন করে, এমন করে আমার শিক্ষক অধ্যাপকও?-এসব প্রশ্ন জাগে তাদের মনে; এবং ঘেন্নায় তারা শিউরে নিঃশব্দে চিৎকার করে-না, না, তারা এমন করে না; তারা এতো খারাপ নয়। কিন্তু কামের কাছে কেউ বাবামা শিক্ষক অধ্যাপক মহাপুরুষ দেবদূত নয়; কামে সবাই মানুষ। পুংসকতার সাথে আদিমতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে ব'লেও অনেকের বিশ্বাস; লরেন্স বিশ্বাস করতেন যে বুর্জোয়ারা এতো সংস্কৃত যে তারা নপুংসক ক্লীব বন্ধ্যা; তাই তাদের উর্বর করার জন্যে দরকার অসংস্কৃত বর্বরের বীর্য। কাম মানবিক, কাম মানুষের সমান বয়সী।

পুরুষতন্ত্র প্রেমের জয়গান গায়, তবে প্রেমে বিশ্বাস করে না; আর কামের নিন্দা করে, তবে বিশ্বাস করে কামে। পুরুষতন্ত্রের প্রধান বিশ্বাসগুলোর প্রধানটি সম্ভবত কাম; তার বিধানগুলোতে কামকে যেটুকু নিন্দা করা হয়েছে, তা পুরুষের অংশগ্রহণের জন্যে নয়, নারীর অংশ গ্রহণের জন্যে। পুরুষ নিজের সম্ভোগের সমস্ত পথ খোলা রেখে নারীকে দীক্ষিত করেছে সতীত্বে; ঘরে রেখেছে সতী আর বাইরে রেখেছে পতিতা। পুরুষ নারীর কামকে নিরুদ্ধ করার জন্যে নারীকে অবরোধে, পর্দায়, জেনানায় বন্দী করেছে, তাকে সূর্যের আলো দেখতে না দিয়ে তার নাম রেখেছে অসূর্যম্পশ্যা, তার ভগাঙ্কুর ছিন্ন করেছে, তাকে সতীত্ববন্ধ পরিয়েছে; কিন্তু নিজের কামের তৃপ্তি খুঁজেছে নারী থেকে নারীতে। চীনের তাওবাদ– 'প্রকৃতির দিকে পরম পথ'– দার্শনিক সত্যে পৌচেছে যে 'একটি পুরুষ যতো বেশি নারীর সাথে সঙ্গম করবে ততো বেশি কল্যাণ হবে তার; যদি পুরুষ একরাতে দশটির বেশি নারীর সাথে সঙ্গম করতে পারে, তাহলে তাই সর্বোত্তম' [দ্র ট্যানাহিল (১৯৮০, ১৫৬)]। ইসলাম পুরুষের জন্যে বহুবিবাহের, এবং ক্রীতদাসীসম্ভোগের বিধান রেখে স্বীকৃতি দিয়েছে পুরুষের কামকে, আর নারীকে সতী রাখার সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। পুরুষতন্ত্র নারীর জন্যে রেখেছে প্রেম, পুরুষের জন্যে রেখেছে কাম; নারীকে দিয়েছে প্রেমের মর্ষকামিতা উপভোগ, পুরুষের জন্যে রেখেছে কামের উদ্দীপনা। যার জীবনে কিছু নেই প্রেমই তার আশ্রয়, যার জীবনে রয়েছে সাফল্য প্রেম তার জীবনের মনে-না-পড়ার মতো খণ্ডাংশ। নারী হয়ে উঠেছে প্রেমের শিকার; নিষিদ্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে তার কাম, যদিও পুরুষতন্ত্র বিশ্বাস করে আগুন আর রক্তের ক্ষুধা কখনো মেটে না। সত্য হচ্ছে সভ্যতার কয়েক হাজার বছর ধ'রে নারী পুরুষের প্রেমে নিজের জীবন ব্যর্থতায় ভ'রে তুলেছে, কিন্তু তার কাম চরিতার্থতা লাভ করে নি। লৈঙ্গিক রাজনীতির সূচনাই হয় শয্যায়; শয্যায় নারীকে পরাভূত ক'রে তাকে পরাজিত করা হয়েছে জীবনের সমস্ত এলাকায়। সমস্ত কামসূত্র লেখা হয়েছে

পুরুষের জন্যে; তার কামবাসনাকে চূড়ান্তরূপে পরিতৃপ্ত করার জন্যে।

নারীর জীবনে অতিশায়িত করা হয়েছে প্রেমকে। তবে তাও বৈধ প্রেম, যে-পুরুষের সে আশ্রিত নারীর প্রেম শুধু তারই জন্যে। যে-নারীরা বৈধ প্রেমের পথে না গিয়ে গেছে অবৈধ প্রেমের পথে, তারা নিন্দিত হয়েছে, শাস্তি পেয়েছে, তাদের জীবন বিপদ ও যন্ত্রণায় ভ'রে উঠেছে; তবে বৈধ-অবৈধ সব প্রেমই মূলত নারীর জন্যে ব্যর্থতা। পুরুষ নারীর প্রেমে দেখতে চেয়েছে মর্ষকামের প্রকাশ; পীড়িত হয়েই তারা স্মরণীয় হয়েছে। বায়রনের একটি উক্তি হচ্ছে 'প্রেম পুরুষের জীবনের একটি অংশ, আর নারীর সমগ্র অস্তিত্ব।' নারীর জীবনে কোনো সাফল্য নেই, তাই নারীর সমগ্র অস্তিত্ব সংকুচিত হয়ে পড়ে একটি আবেগে, বা পুরুষতন্ত্র চায় নারীর সমগ্র অস্তিত্ব সংকুচিত হোক পুরুষের জন্যে আবেগে, আর সে-ই ততো মহীয়সী যে সহ্য করে যতো বেশি পীড়ন। তবে মহাপ্রেম কিংবদন্তি; প্রেম প্রধান ব্যাধি হয়ে থাকে শুধু তাদেরই জীবনে, যাদের কামনা মেটে নি। পুরুষের মতো প্রেম নারীর জীবনেরও অংশমাত্র; প্রেম তার জীবনে প্রধান নয়, তবে তার জীবন সংকীর্ণ, ব্যর্থ ব'লে তাকে থাকতে হয়েছে প্রেমের অসুস্থতার মধ্যেই। এখনো কি থাকে? ভাবালুতার যুগের উপন্যাসে যে-নায়িকাদের পাওয়া যায়, তাদের জীবনে প্রেম ও পুরুষ ছাড়া আর কিছু ছিলো না, তাই তারা কেঁদে বালিশ ভেজাতো, তাদের চোখ থেকে অবিরল বেরিয়ে আসতো অশ্রু, আজ তেমন ঘটে না। বিরহিণীও আজকাল দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু এককালে নারীমাত্রই ছিলো বিরহিণী, আর তার নানা দশারও শেষ ছিলো না। বিরহের একেক দশায় সে ভোগ করতো একেক ধরনের পীড়ন। প্রেম ও নারীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে যতো উপকথা প্রচলিত রয়েছে, তা জৈবিক নয়; তা সামাজিক পরিস্থিতিরই পরিণতি। নিটশে বলেছেন [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ৬৫২)] :

> পুরুষ ও নারীর কাছে একই শব্দ প্রেম বোঝায় দু-জিনিশ। নারী প্রেম বলতে যা বোঝে, তা খুবই স্পষ্ট : তা শুধু ভক্তি নয়, তা প্রত্যাশাহীন নিঃশর্ত সম্পূর্ণ দেহমন সমর্পণ। তার প্রেমের শর্তহীনতার বৈশিষ্ট্য তার প্রেম'কে পরিণত করে এক ধরনের ধর্মবিশ্বাসে; এবং এই তার একমাত্র বিশ্বাস। পুরুষ যখন ভালোবাসে কোনো নারীকে, তখন সে নারীর কাছে চায় প্রেম;...যদি কোনো পুরুষ বোধ করে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বাসনা, তাহলে, আমার কথা হচ্ছে, সে পুরুষ নয়।

পুরুষ ধ'রেই নেয় যে নারী যখন প্রেমে পড়ে, তখন সে ভুলে যায় তার অস্তিত্ব, তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব; কেননা প্রেমে পুরুষ ঈশ্বর আর নারী ভক্ত। ভক্ত যেমন নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে প্রভুর পদতলে, নারীও করে তাই ; কেননা প্রভু ছাড়া নারী নিরস্তিত্ব। পুরুষতন্ত্র নারীর আত্মোৎসর্গ আত্মসমর্পণপরায়ণতাকে মনে করে প্রাকৃতিক; মনে করে প্রকৃতিই নারীকে সৃষ্টি করেছে এভাবে। কিন্তু এর সাথে প্রাকৃতিক বা জৈববিধির কোনো সম্পর্ক নেই; এখানেও কাজ করে সামাজিক সূত্র। পুরুষ নারীকে শিখিয়েছে আত্মোৎসর্গ করতে, তাকে বাধ্য করেছে আত্মসমর্পণ করতে। নারী ও পুরুষের পরিস্থিতি ভিন্ন ব'লে তারা সব কিছুই দেখে ভিন্নভাবে, ভিন্নভাবে দেখে প্রেমকেও। নারী অস্বায়ত্তশাসিত, সমাজ তাকে কোনো কিছুর কর্তা হয়ে উঠতে দেয় না, তাই নারী প্রেমেও আত্মতান্ত্রিক

হয়ে উঠতে পারে না। নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া তার উপায় নেই; প্রেমে তাই সে নিজেকে সমর্পণ করে সমাজপতি পুরুষের কাছে। নারী সমর্পণ করে নিজের দেহ ও আত্মা পরম সত্তার কাছে, ওই পরম সত্তা কখনো পুরুষ কখনো বিধাতা। নারী জানে পরনির্ভরতাই তার নিয়তি, তাই তার জন্যে ভালো হচ্ছে কোনো দানবের বদলে কোনো দেবতাকে পুজো করা। তাই প্রেমকে নারী ক'রে তোলে ধর্ম, আত্মসমর্পণ ক'রে সে করতে চায় আত্মরক্ষা। নারী তার প্রেমে পড়ে, যে তাকে উন্নীত করতে পারে নিজের অবস্থান থেকে; সে পুজো করে পৌরুষের. সম্পদের, সামজিক অবস্থানের। যে-নারী নিজের থেকে নিম্ন অবস্থানের কারো জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে, সে বেছে নেয় চরম মর্ষকামিতা।

নারীর জীবনে প্রেমের অবকাশ খুবই কম। তার রয়েছে স্বামী, সংসার, সন্তান, গৃহস্থালি, কাম, এবং অনেকের রয়েছে পেশা। কাম জৈবিক, প্রেম সাংস্কৃতিক; নারী প্রেম শেখে প্রেমের অতি প্রচারের ফলেই। প্রেম এখন সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপিত পণ্য, অন্যান্য পণ্যের মতো এরও প্রধান ক্রেতা নারী। তবে অধিকাংশ সংস্কৃতিই নারীর জন্যে প্রেম নিষিদ্ধ ক'রে রেখেছে, তাদের জন্যে রেখেছে বিবাহিত প্রেম, যা বিশেষ দরকারে পড়ে না। অনেক কিশোরীতরুণী বিশেষ বয়সে প্রেমের স্বপ্ন দেখে : তাদের ওই স্বপ্নের পেছনে রয়েছে তাদের শরীরের প্ররোচনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ। মনোবিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেন নারী প্রেমিকের মধ্যে খোঁজে পিতাকে। আসলে তারা পিতা নয়, খোঁজে পুরুষকেই; যে তাকে দিতে পারে মহিমা। পুরুষ নারীর চোখে মহিমান্বিত, বাল্যকাল থেকেই তারা দেখে পুরুষের মহিমা; প্রেমিক বা স্বামীর মধ্যে তারা দেখতে চায় তা। পুরুষাধিপত্যবাদী সমাজে নারী পুরুষের কাছে নিজেকে মনে করে শিশু, প্রেমিক যখন তাকে ডাকে 'মিষ্টি মেয়ে', 'ময়না', 'আমার পাখি', তখন তা তার হৃদয় স্পর্শ করে। পুরুষের বাহুতে আবার বালিকা হয়ে ওঠার আনন্দ তাদের অসীম। নারীর আত্মসমর্পণ তার টিকে থাকার অভিলাষের প্রকাশ। ধর্মে ভক্ত বিধাতার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে নিজের জন্যে একটি অসামান্য স্থান ক'রে নেয়, নারীও তেমনি প্রেমে স্থান ক'রে নেয় নিজের জন্যে। দেবতার পদতলে সে হয়ে ওঠে নৈবেদ্য। প্রেমে নারীর আচরণ সামাজিক ব্যবস্থারই ফল, বাঙালি-সৌদি-মার্কিন নারীর প্রেম-আচরণ এক রকম নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ নারী কখনো প্রেমের আবেগ বোধ করে নি।

প্রেম অপরিহার্য নয়; তবে কাম অপরিহার্য। অধিকাংশ সমাজেই প্রেম নিষিদ্ধ, তবে কাম নিষিদ্ধ নয়। নারীর জীবনে সাধারণত কাম আসে বিয়ের মধ্য দিয়ে. বিয়েই তাদের জন্যে কামের কানাগলি। তবে নারীর বিয়ে নিজের কামের জন্যে নয়, পুরুষের কামের জন্যে; নারীর বিয়ে নারীর আত্মরক্ষার জন্যে। কোনো সংস্কৃতিই নারীর কামতৃপ্তিকে মূল্য দেয় নি. বরং বহু যত্নে লিখেছে তার কাম দমন করার বিধান। পুরুষ নারীকে চিরকাল ভয় করেছে তার কামশক্তির জন্যে, পুরুষ বুঝতে পেরেছে কামবাসনা তার যতোই প্রবল হোক স্খলনের পর তার আর কোনো উদ্যম থাকে না; কিন্তু নারী যেনো অনন্তকাল লিপ্ত হয়ে থাকতে পারে। আরবরা নারীকে *ফিৎনা* বা বিশৃঙ্খলা ব'লে ভয় করে; তাকে

অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে; হিন্দুরা তার কামশক্তি দেখে হয়েছে আতংকিত। পুরুষ নিজের কামকে বিরামহীনভাবে চরিতার্থ করেছে, কিন্তু নারীর কামতৃপ্তির কথা ভাবে নি। পুরুষের কাছে সতী সে, যে সঙ্গমের সময়ও নড়াচড়া করে না; ভিক্টোরীয় এক পুরোহিত বলেছিলেন, 'নোড়ো না, নারী।' নারীর কাম সম্পর্কে পুরুষতন্ত্র দুটি বিরোধী ধারণা পোষণ ও প্রচার করে : একটি হচ্ছে নারীর কামক্ষুধার শেষ নেই, কিছুতেই ওই আগুন নেভে না; অন্যটি হচ্ছে নারী কাম পছন্দ করে না, নারী প্রাকৃতিকভাবেই একপুরুষে পরিতৃপ্ত। দুটিই অপপ্রচার; কেননা নারী তৃপ্ত হয়, এবং নারী কাম পছন্দ করে, নারী জৈবিকভাবে একপুরুষের সতী নয়। একাধিক পুরুষের সাথে কামসংসর্গে তার আপত্তি নেই, তবে পুরুষতন্ত্রের ভয়ে অধিকাংশ নারীই তা স্বীকার করে না। একপতিপত্নী প্রথার উদ্ভব সম্পর্কে বাখোফেন বলেছেন যে নারীরাই উদ্যোগ নিয়েছিলো একটি পুরুষের সাথে সঙ্গমের অধিকার পাওয়ার, কেননা বহু পুরুষের সাথে সঙ্গম তাদের ভালো লাগে নি। তাঁর এ-মত সমর্থন করেছেন বিপ্লবী এঙ্গেলসও (১৮৮৪, ২১০); তিনি বলেছেন বহু পুরুষের সাথে সঙ্গমের পীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে 'আগ্রহের সঙ্গে পরিত্রাণ হিসাবে তারা অবশ্য পাতিব্রত্যের অধিকার, একটি পুরুষের সঙ্গে অস্থায়ী বা স্থায়ী বিবাহ চেয়ে থাকবে।' তাঁর এ-সিদ্ধান্তের মূলে আছে ভিক্টোরীয়বাদ, যার সিদ্ধান্ত হচ্ছে নারীরা কাম পছন্দ করে না। নারীরা কাম পছন্দ করে না ব'লে একটি পুরুষের শয্যায় নিষ্ঠার সাথে পালন করতে চেয়েছে পাতিব্রত্য, এবং নারীদের আগ্রহেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একপতিপত্নী বিয়ে, এ-মত ঠিক নয়। পুরুষ চেয়েছে ব'লই এটা ঘটেছে; পুরুষ তার বহুসম্ভোগের পথ খোলা রেখে নারীকে নিজের একান্ত সম্ভোগের বস্তু ক'রে তোলার জন্যেই সৃষ্টি করেছে একপতি(বহু)পত্নী বিয়ে। নারী কাম পছন্দ করে, খুবই উপভোগ করে। একনিষ্ঠতা জৈবিক নয়, সামাজিক; আর তা মেনে চলতে বাধ্য হয় শুধু নারী। পুরুষ কখনোই একনিষ্ঠতাকে মনপ্রাণে স্বীকার করে নি; রাজ্যের সাধুতম পুরুষটিও অভ্যন্তরে অত্যন্ত লোলুপ।

বাঙালির কামজীবন এক নিষিদ্ধ গোপন এলাকা, যদিও বাঙালি পুরুষ কামে চিংড়ির মতোই উৎসাহী। বাঙালির সামাজিক জীবনে কাম বেশ প্রবল ভূমিকা পালন ক'রে থাকে, বাঙালি পুরুষেরা একত্র হ'লেই কামালাপে মেতে ওঠে, এবং তাদের সমস্ত আচরণেই কামলোলুপতা প্রকাশ পায়। বাঙালি সমাজকে অবদমিত কাম-দিয়ে-ঘেরা সমাজও বলা যায়; এবং ওই অবদমন নিয়মিতভাবে প্রকাশ পায় ধর্ষণরূপে। তবে শয্যায় তাদের আচরণ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। বাঙালি নারীপুরুষের কামজীবন সম্পর্কে কিন্সে ও অন্যান্যের *পুরুষের যৌন আচরণ* (১৯৪৮), *নারীর যৌন আচরণ* (১৯৫৩), বা মাস্টার্স ও জনসনের *মানুষের যৌন সাড়ার* (১৯৬৬) মতো বই লেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে এ-বিষয়ে যে কিছুই লেখা হয় নি, তাতে বোঝা যায় বাঙালির কামজীবন সুস্থ নয়। যা গোপন ক'রে রাখা হয়, তা সাধারণত অসুস্থ হয়ে থাকে। এটা নিষিদ্ধ বিষয়; আর এর পীড়ন ভোগ করে নারী। বাঙালি নারীর যৌনজীবন বলাৎকার ও চরম বিবক্তিকর অবসাদের সমষ্টি। উচ্চশিক্ষিত কিছু নারী আমাকে জানিয়েছেন তাঁরা পুলক সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাঁদের স্বামীরা লাফ দিয়ে উপসংহারে পৌঁছেন, এই

তাঁদের চাঞ্চল্যকর কামজীবন। দরিদ্র অশিক্ষিত নারীরা সাধারণত ভোগ করে স্বামীর বলাৎকার। বাঙলাদেশে প্রতিটি শয্যাকক্ষ, যদি থাকে, নারীর জন্যে বলাৎকার বা বিরক্তিকর অবসাদকক্ষ।

নারীর জীবনে কাম এক প্রধান ব্যাপার, তবে নারী যেমন তার জীবনকেই সমর্পণ করে কোনো পুরুষের কাছে, তেমনই সমর্পণ করে তার কামকেও। তার শরীর তার অধিকারে নয়, তার কামও তার অধিকারে নয়; মার্গারেট স্যাংগার বলেছেন, 'কোনো নারী নিজেকে স্বাধীন বলতে পারে না, যে তার নিজের শরীরের মালিক ও নিয়ন্ত্রক নয়।' নারী মালিক আর নিয়ন্ত্রক নয় তার কামেরও। ক্যাথেরিন ম্যাককিনন (১৯৮২, ১) বলেছেন, 'মার্ক্সবাদে যেমন শ্রম নারীবাদে তেমন কাম : যা মানুষের একান্ত আপন, কিন্তু যা হরণ করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি।' নারীর কামকে অপরিতৃপ্ত রাখাই পুরুষতন্ত্রের রীতি। নারী কামে সক্রিয় সম্ভোগী হ'তে পারে না, কোনো সংস্কৃতিই চায় না কামে নারী উদ্যোগী ভূমিকা নিক; সব সংস্কৃতিই চায় নিজের কাম দিয়ে নারী সেবা করবে পুরুষের। নারীর জন্যে বিয়ে হচ্ছে কাম দিয়ে পুরুষের সেবা। নারী পুরুষের ভোগ্যসামগ্রী। কামে নারী ও পুরুষের ভিন্নতা অসীম জৈবিক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিকভাবে : সব সংস্কৃতি চায় যে কামে পুরুষ থাকবে কর্তা, পুরুষই নিয়ন্ত্রণ করবে শয্যা; পুরুষই স্থির করবে কখন ও কতোটা কামের প্রয়োজন, কীভাবে তা পরিতৃপ্ত করা হবে। কামে পুরুষ ভূমিকা পালন করে সক্রিয় কর্তার, পুরুষের কাম তার দেহ থেকে ধাবিত হয় নারীর শরীরের দিকে, নারীর শরীর পুরুষের কামের শিকার। দ্য বোভোয়ার বলেছেন (১৯৪৯, ৩৯৪), 'নারীকে বিদ্ধ ও উর্বর করা হয় তার যোনি দিয়ে, যা শুধু পুরুষের মধ্যবর্তীতার ফলেই পরিণত হয় কামকেন্দ্রে, এবং এটা সব সময়ই এক ধরনের বলাৎকার।' পুরুষতন্ত্র নারীর ওই রন্ধ্রটিকেই মনে করে নারীর কামের আকর, যেনো ওই রন্ধ্রটিতে কয়েক মুহূর্ত কাজ করলেই নারীর কাম পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। আধুনিক যৌনবিজ্ঞান ও নারীবাদীরা দেখিয়েছেন কামসুখের জন্যে ওটি উত্তম নয়; কেননা যোনির দেয়ালের স্পর্শকাতরতা কম। নারীর রয়েছে একটি অনন্য কামপ্রত্যঙ্গ, ভগাঙ্কুর, যেটি নারীকে পৌঁছে দিতে পারে চরম পুলকে। তবে পুরুষতন্ত্র এটিকে শুধু উপেক্ষাই করে না, অনেক অঞ্চলে এটিকে উচ্ছেদও করে, যাতে নারী কখনো কাম বোধ না করে। তাই নারীর জন্যে অবধারিত বলাৎকার; বলাৎকারের ফলেই বালিকা নারী হয়ে ওঠে। পৃথিবী জুড়ে এখনো নারীর জন্যে বিবাহিত বা অবিবাহিত প্রথম সঙ্গম বলাৎকার। বাঙলাদেশের যে-কিশোরীকে আত্মীয়রা খাটের সাথে বেঁধে বাধ্য করে বাসর রাত কাটাতে, যে-কিশোরী জানে না তার শরীরকে, যে প্রস্তুত হয় নি নিজের ভেতরে কোনো শিশ্নগ্রহণের জন্যে, এটা তার জন্যে যেমন বলাৎকার, তেমনই বলাৎকার শিক্ষিত তরুণীর জন্যেও, কেননা তার ভেতরেও একইভাবে ঠেলে ধাক্কিয়ে ভেঙেচুড়ে ছিঁড়েফেড়ে ঢোকে একটি অচেনা উদ্যত অবিবেচক শিশ্ন। অধিকাংশ সমাজে লৈঙ্গিক রাজনীতির হিংস্র রূপটি— বলাৎকার বা ধর্ষণ— দেখা দেয় বাসর শয্যায়। প্রথম রাতেই ছিন্নভিন্ন ওই নারীরা আর খাপ খাওয়াতে পারে না কামের সাথে, কাম হয়ে ওটে তাদের জীবনের ভীতি, অবর্ণনীয় অবসাদ।

কামে নারীকে নির্ভর করতে হয় পুরুষের ওপর; পুরুষই নেয় আক্রমণাত্মক ভূমিকা, নারী নিজেকে সমর্পণ করে তার আগ্রাসনের কাছে। পুরুষ, যদি সে নিজে প্রস্তুত থাকে, নারীর ভেতরে ঢুকতে পারে যে-কোনো সময়, তাই শুধু পুরুষই করতে পারে ধর্ষণ: নারী প্রস্তুত কিনা তা পুরুষের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বা পুরুষ মনে করে নারী সব সময়ই প্রস্তুত। চিরকালই অধিকাংশ নারী পুরুষকে তার ভেতরে গ্রহণ করেছে অপ্রস্তুত অবস্থায়; তীব্র পীড়নে ঘুম ভেঙে তারা দেখে ভেতরে ঢুকে পড়েছে পুরুষ, অসুস্থ অবস্থায়ও তারা বাধ্য হয় পুরুষকে প্রবেশাধিকার দিতে। নারী পুরুষকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ব্যবহার করতে পারে না; কিন্তু পুরুষ পারে অপ্রস্তুত নারীর ভেতরে ঠেলে ঢুকতে। পুরুষ চাইলে লাশের সাথেও সঙ্গম করতে পারে। সঙ্গমে অধিকাংশ সমাজে নারীর অনুমতি বা আগ্রহের প্রয়োজন হয় না; পুরুষের কাছে নারী নিজের শস্যক্ষেত্র, ওই খেতে পুরুষ যে-কোনো সময় যে-কোনো দিক দিয়ে ঢুকতে পারে। পুরুষ নিজের কামের প্রহরীরূপে স্বর্গীয় সত্তাদেরও নিয়োগ করতে দ্বিধা করে না; হাদিসে আছে স্বামী যদি সঙ্গম চায় আর স্ত্রী না চায়, তাতে কামার্ত স্বামীটি যদি জেগে রাত কাটায়, তবে ফেরেশতাদের অভিশাপ সারা রাত বর্ষিত হয় পাপী নারীটির মাথার ওপর [দ্র 'পিতৃতন্ত্রের খড়্গ']। এতো গুরুত্বপূর্ণ পুরুষের কাম, নারী আছে ওই কামের খাদ্য হওয়ার জন্যে। এ-জন্যেই সঙ্গমকে অনেকে মনে করেন নারীর পরাজয়, সঙ্গমের আসনেও প্রকাশিত দেখেন পুরুষাধিপত্য। দ্য বোভোয়ারও (১৯৪৯, ৪০৫-৪০৬) বলেছেন :

> তরুণীর নিজের বলতে আছে শুধু দেহখানি : এটি তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ; যে-পুরুষটি তার ভেতরে প্রবেশ করে, সে এটি গ্রহণ করে তার থেকে;...যে-অপমান সে আশংকা করেছে তা পরিণত হয় সত্যে : তাকে পরাভূত করা হয়, সম্মত হ'তে বাধ্য করা হয়, জয় করা হয়। অধিকাংশ প্রজাতির মাদিটির মতো, সঙ্গমের সময় সে থাকে পুরুষটির নিচে। অ্যাডলার এ থেকে উৎপন্ন হীনমন্যতার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বাল্যকাল থেকেই উচ্চমন্যতা ও হীনমন্যতার ধারণা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; উঁচু গাছে ওঠা কৃতিত্ব; স্বর্গ পৃথিবীর ওপরে, নরক নিচে; প'ড়ে যাওয়া, নিচে নামা ব্যর্থতা; ওপরে ওঠা সাফল্য; কুস্তিতে জিততে হ'লে প্রতিপক্ষের কাঁধ মাটির সাথে লাগিয়ে দিতে হয়। এতে, নারীটি প'ড়ে থাকে পরাজয়ের ভঙ্গিতে: তার চেয়েও খারাপ হচ্ছে পুরুষটি তার ওপর চ'ড়ে থাকে যেভাবে সে চাবুক হাতে বল্গা ধ'রে চড়ে কোনো পশুর ওপর। সে নিজেকে সব সময় বোধ করে অক্রিয়; তাকে শৃঙ্গার করা হয়, বিদ্ধ করা হয়; সে ভোগ করে সঙ্গম, আর পুরুষটি নিজেকে প্রয়োগ করে সক্রিয়ভাবে।

সঙ্গমের আসনও আধিপত্য-অধীনতার প্রকাশ? অসুস্থ সভ্যতায় সব কিছুই যেখানে রাজনীতি, সব কিছুই যেখানে নির্দেশ করে আধিপত্য-অধীনতার সম্পর্ক, সেখানে অন্তরঙ্গতম ব্যাপারটিও হয়ে ওঠে আধিপত্য-অধীনতার প্রতীক। বাইবেলের ভাষ্যকারেরা বুঝেছিলেন এর রাজনীতিটুকু, পুরুষ ওপরে নারী নিচেই তাঁদের মনে হয়েছে প্রাকৃতিক বিধিবদ্ধ আসন। নুহের প্লাবনের কারণ হিশেবে তাঁরা দেখিয়েছেন নারীপুরুষের বিপরীত বিহারকে, যাতে 'নারীরা প্রভুত্ব করে পুরুষের ওপর' [দ্র ফিজেস (১৯৭০, ৫১)]।

পুরুষতন্ত্রে প্রধান পুরুষের কাম; তবে নারীর রয়েছে কামসুখভোগের অধিকতর শক্তি। কাম অনেকাংশে পুরুষের একটি প্রত্যঙ্গের কাজ; কয়েক মুহূর্তে স্খলিত হ'তে

পারলেই পুরুষ মুক্তি পায়। কিন্তু নারীর কাম তার পরিস্থিতির মতোই জটিল বহুস্তরিক। কোনো স্খলনে যেহেতু তার কামনার সমাপ্তি ঘটে না, তার কাম যেহেতু তার সমগ্র শরীর ও চেতনায় ছড়িয়ে পড়ে, সে যেহেতু হঠাৎ জ্ব'লে উঠে হঠাৎ নিভে যায় না, তার সূচনা থেকে সমাপ্তি যেহেতু ধীরমন্থর জলস্রোতের মতো, তাই সুখ যেমন তাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে, তেমনই সুখের অভাবও তাকে জ্বালাতে পারে দীর্ঘ সময় ধ'রে। সঙ্গমে চূড়ান্ত আত্মবিলোপ ঘটে নারীর; সে ডুবে যায় অক্রিয় অবসন্নতায়, তার চোখ বুজে আসে, যেনো ভেসে যায় ঝড় প্লাবনে অনন্ত অন্ধকারের ভেতর দিয়ে, প্রবেশ করে মাংস, জরায়ু, কবরের অন্ধকারে। নারীর মতো চূড়ান্ত আত্মবিলুপ্তির মধ্যে কাম পুরুষ কখনো উপভোগ করতে পারে না; পুরুষকে থাকে সচেতন, তার সচেতনতা তার বড়ো বাধা। নারীর জন্যে সঙ্গম ধ্যান, ধ্যানে আত্মসচেতনতা বিঘ্নকর; পুরুষের জন্যে সঙ্গম কাজ, কাজে আত্মসচেতনতা অপরিহার্য। তাই ওই ধ্যানের সময় নারীকে ডাকলে, কেমন লাগছে জানতে চাইলেও সে বিরক্ত বোধ করে; কেননা অনির্বচনীয়কে সে উপলব্ধি করতে চায় অনির্বচনীয়রূপেই। ষাটের দশকে নারীর কাম সম্পর্কে মাস্টার্স ও জনসনের (১৯৬৬) গবেষণা পশ্চিমে নারীকে অনেকখানি মুক্তি দেয় পুরুষের কামাধিপত্য থেকে; এবং নারীবাদীরা ঘোষণা করেন তাঁদের কামসার্বভৌমত্বের কথা। কয়েক দশক আগে ভোটাধিকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তাঁদের কাছে, ষাটের দশকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কামাধিকার। এর ফলে পশ্চিম মুক্তি পায় ভিক্টোরীয়বাদ নামের রোগ থেকে, নারী অনেক বেশি উপভোগ করে তার শরীর। ষাটের দশকে নারী ফিবে পায় তার শরীর।

মাস্টার্স ও জনসন নারীর যৌন সাড়াকে ভাগ করেছেন চারটি পর্বে : উত্তেজনাপর্ব, অধিত্যকাপর্ব, পুলকপর্ব, ও শমপর্ব। পুরুষও যায় এ-চারটি পর্বের ভেতর দিয়ে; তবে তাদের প্রত্যঙ্গের ভিন্নতা অনুসারে উপভোগ করে ভিন্ন অভিজ্ঞতা।

উত্তেজনাপর্ব : এর সূচনা ঘটে কোনো পুরুষের শরীরসংস্পর্শে, তবে কোনো পুরুষকে দেখেও এব সূচনা ঘটতে পারে। বিভিন্ন নারী বছরের বিভিন্ন সময় বোধ করে বিশেষ উত্তেজনা; কেউ ঋতুকালে, কেউ চক্রের মধ্যভাগে, কেউ ঋতুসূচনার আগে বোধ করে তীব্র কাম-উত্তেজনা। সব ধর্মেই ঋতুকালে সঙ্গম নিষিদ্ধ, যদিও এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অনেক নারী এ-সময়েই বেশি কাম বোধ করে। এ-সময়টা নিরাপদও, গর্ভসূচনার কোনো সম্ভাবনা নেই। নারীর উত্তেজনাপর্ব পুরুষের উত্তেজনাপর্বের থেকে দীর্ঘ, পুরুষ যতো সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে নারী তেমন হয় না। এ-পর্বে স্তনবৃন্ত খাড়া হয়ে ওঠে, ভগাঙ্কুর আয়তনে বাড়ে, 'ওষ্ঠগুলো' কোমল পুরু হয়ে স্ফীত হয়, যোনি সিক্ত হয়; এবং রক্তপ্রবাহের ফলে ত্বকে দেখা দিতে পারে ঝিলিক, যাকে বলা হয় 'কাম ঝিলিক'।

অধিত্যকাপর্ব : উত্তেজনাপর্বেরই সম্প্রসারণ অধিত্যকাপর্ব; উত্তেজনাপর্বে যা কিছুর সূচনা ঘটে, এ-পর্বে সে-সব পৌঁছে তুঙ্গে। নারী এ-পর্বে ভেতরে চায় শিশ্ন। এ-পর্বে জরায়ুর গ্রীবা বৃদ্ধি পায়, যোনিরন্ধ্রও বাড়ে। এর ফলে যোনির গভীরদেশে তৈরি হয় একটি থলের মতো এলাকা, যেখানে ঘটবে বীর্যপাত। এ-সময় যোনির বাইরের দিকটা

বেড়ে এ-এলাকাটির ব্যাস হ্রাস পায়। মাস্টার্স ও জনসন একে বলেছেন 'পুলকমঞ্চ'। অধিত্যকাপর্ব যতো দীর্ঘ হয় ততোই সুখকর নারীর জন্যে।

পুলকপর্ব : পুলক শরীরমিলনের লক্ষ্য। পুলক এক অনির্বচনীয় অনুভূতি; নারী এ-পর্বে বোধ করে তীব্রতম সুখ, যা প্রতি নারীর জন্যে অনন্য। পুলকই কাম্য, কেননা তা নরনারীকে পৌঁছে দেয় সুখের শিখরে: একে ভয়ও পায় অনেকে। ফরাশিরা একে বলে 'ছোটো মৃত্যু'। নারীর পুলকের সূচনা হয় শ্রোণীদেশে, পরে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। এর সূচনা ঘটে স্তব্ধতায়, তারপর ঘটে অদম্য পেশিসঞ্চালন, শিহরণ, ভাসমানতার অনুভূতি, উষ্ণতা, মানসিক উত্তেজনামুক্তি, ও উল্লাস। পুলক ঘটে প্রতিবর্তীতার ফলে। ভগাঙ্কুরের সাথে শিশ্ন, ওষ্ঠ বা আঙুলের ঘর্ষণের ফলে উত্তেজনার সংবাদ পৌঁছে সুষুম্নাকাণ্ডে; সেখান থেকে তা পেঁছে দেয়া হয় নারীর শ্রোণীনিয়ন্ত্রক স্নায়ুরাশিতে। এর ফলে ঘটে পুলক। তবে সব নারীর সব সময় পুলক নাও ঘটতে পারে। ঘটবে কী ঘটবে না, তা নির্ভর করে ওই প্রতিবর্তীতায় তার মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণের মাত্রার ওপর। যে-নারী কোনো যৌননিষেধগ্রস্ত নয়, সে হয়তো সহজেই পৌঁছোয় পুলকে; কিন্তু যে নারী যৌননিষেধগ্রস্ত, সে হয়তো কখনোই পৌঁছোয় না। কেউ কেউ পুলকের সময় আলোড়িত ক'রে তোলে তার শরীর ও পরিবেশকে, শীৎকারে ভ'রে দেয় চারপাশ, কেউ কেউ থাকে স্তব্ধ। পুরুষের সাথে নারীর পুলকের পার্থক্য হচ্ছে নারীর কোনো বীর্যপাত ঘটে না।

আগে মনে করা হতো পুলক রয়েছে দু-ধরনের; একটি ভগাঙ্কুরীয়, আরেকটি যোনীয়। এ-ধারণার মূলে রয়েছে ফ্রয়েডের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সূত্র। তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে ভগাঙ্কুরীয় পুলক নারীর বিকাশহীনতার পরিচায়ক, কেননা তা হস্তমৈথুনেই লাভ করা যায়, বালিকাও তা লাভ করতে পারে; আর যোনীয় পুলক নারীর কাম ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের পরিচায়ক, কেননা এতে বাল্যের কাম ভগাঙ্কুর থেকে স্থানান্তরিত হয় যোনিতে। ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্ত প্রথাগত কুসংস্কারের প্রকাশ : পুলক হচ্ছে পুলক, কীভাবে তার উৎপত্তি ঘটেছে তা বিবেচনার বিষয় নয়। কেউ যদি কবিতা প'ড়ে, সূর্যাস্ত দেখে, জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময় নিজের নামে শ্লোগান শুনে পুলক বোধ করে, তাও চমৎকার! এটা নিশ্চিত যে পুলকের উৎস ভগাঙ্কুর, উত্তেজিত ভগাঙ্কুরই শুরু করে ঘটনাটি, তবে যোনিও এতে কিছুটা অংশ নেয়। ষাটের দশক থেকে নারীর কামে যোনির মর্যাদা ক'মে গেছে, প্রধান হয়ে উঠেছে ভগাঙ্কুর। কারো কারো ভগাঙ্কুর এতো প্রতিভাশালী যে একের পর এক, মেশিনগানের মতো, পুলক বোধ করতে পারে; কেউ কেউ পঞ্চাশটি পুলকের সংবাদও দিয়েছে! তবে সম্প্রতি নারীর পুলককেও পুরুষ ব্যবহার করছে নারীকে নতুন ধরনের দাসী ক'রে তুলতে; পুরুষ দাবি করছে সে যখন শিশ্ন চালাবে, তখন নারীকে বাধ্যতামূলকভাবে পেতে হবে পুলকের পর পুলকের পর পুলক। নারীর একটি দায়িত্ব হয়ে উঠেছে পুলক অর্জন করা, যে-নারী পুলক অর্জন করে না পুরুষ তাকে মনে করে প্রতারক; তাই পশ্চিমে নারী এখন পুরুষকে কামসেবা করতে গিয়ে বাধ্য হচ্ছে পুলকলাভের অভিনয় করতে। পুরুষ এখন মনে

করছে নারী হচ্ছে পুলকলাভের যন্ত্র, তার কাজ শয্যাকে পুলকে পুলকে প্লাবিত করা [দ্র ক্লাইন ও স্পেভার (১৯৮৭, ১১০-১২৪)]। নারীর পুলকও পুরুষেরই জন্যে!

শমপর্ব : শমপর্ব পুলকোত্তর বা পুলকহীন সঙ্গমোত্তর পর্ব, যখন নারীপুরুষ ফিরে যায় তাদের প্রাক-উত্তেজনা অবস্থায়। এ-পর্বে ঘটে সব কামনার নিবৃত্তি বা দেখা দেয় ব্যর্থতার ফলে যন্ত্রণা। পুলকের পর পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে যোনি নীরস হয়ে ওঠে, তবে উত্তেজিত করা হ'লে নারী আবার পুলকের পর পুলক পেতে পারে। নারী যদি অধিত্যকাপর্বের পর কোনো পুলক অনুভব না করে, বা ব্যর্থ সঙ্গমের পর হস্তমৈথুন ক'রে পুলক বোধ না করে, তবে তার শান্ত অবস্থায় ফিরতে অর্ধেক দিনরাত কেটে যেতে পারে। বার বার উত্তেজনা ও পুলকলাভে ব্যর্থতা নারীর জীবনে নিয়ে আসতে পারে হতাশা ক্লান্তি অবসাদ, দেখা দিতে পারে নানা জটিলতা। পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ নারী পুলকের অভাবে অবসাদগ্রস্ত।

ষাটের দশকে পশ্চিমে নারীবাদ নানা মুক্তির সাথে ঘটায় নারীর কামেরও মুক্তি; প্রধান হয়ে ওঠে পুলক, ভগাঙ্কুর; কামে প্রথাগত রীতির বদলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আরেক রীতি– মুখসঙ্গম। *পুলক* একটি শ্লোগানে, মহান ভাবাদর্শে, পরিণত হয়। ফ্রয়েড সৃষ্টি ক'রে গিয়েছিলেন ভগাঙ্কুর ও যোনির বিরোধ; তাঁর কাছে ভগাঙ্কুর ছিলো অবিকাশের আর যোনি বিকাশের পরিচায়ক। তাঁর মতে প্রকৃত নারীকে সুখ বোধ করতে হবে যোনিতে, ভগাঙ্কুরে নয়। যদি করে, তবে সে রয়ে গেছে বালিকা; তার বিকাশ ঘটে নি, তার চিকিৎসা দরকার। এটা ইহুদি-খ্রিস্টান ধারণার ছদ্মবৈজ্ঞানিক রূপ; তিনি উচ্ছেদ না ক'রে সম্পন্ন করেন নারী খৎনা। ষাটের দশকে নারীবাদীরা ফ্রয়েডকে বাতিল করেন, বাতিল করেন অনেকটা যোনিকেও। তাঁদের মতে ভগাঙ্কুরই সুখবোধের অনন্য প্রত্যঙ্গ, এটির সাহায্যেই পুলক বোধ করে নারী; যোনি গৌণপ্রত্যঙ্গ। মাস্টার্স ও জনসন (১৯৬৬, ৪৫) বলেছেন, 'সম্পূর্ণ মানব অঙ্গসংস্থানে ভগাঙ্কুর অনন্য। এর কাজ ইন্দ্রিয় উদ্দীপনা গ্রহণ ও বৃদ্ধি করা। তাই নারীর রয়েছে এমন একটি প্রত্যঙ্গ, যার শারীরিক ভূমিকা শুধু যৌন উত্তেজনার সূচনা ও বৃদ্ধি করার মধ্যেই সীমিত। পুরুষের দেহসংস্থানে এমন কোনো প্রত্যঙ্গ নেই।' কিন্তু যোনি কি বাতিল, এটা কি সম্পূর্ণরূপেই একটি নির্বোধ চামড়ার থলে? গ্রিয়ার (১৯৭০, ৪৩) প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন, 'এটা বাজে কথা যে পুরুষ যখন যোনিতে শিশ্ন চালায় তখন নারী কোনো কিছু অনুভব করে না : শূন্য যোনির বদলে যখন যোনির ভেতর একটি শিশ্ন ভরা থাকে তখন পুলক গুণগতভাবেই ভিন্ন।' যোনি একেবারে অনুভূতিহীন নয়, এটিও সক্রিয় হ'তে পারে; অনেক যোনি শিশ্নকে ওষ্ঠ ও জিভের মতো চুষতে পারে। নারীবাদীরা ষাটের দশকেই মেটান যোনি ও ভগাঙ্কুরের ফ্রয়েডীয় বিরোধ; তবে প্রধান ক'রে তোলেন ভগাঙ্কুরকেই। এর ফলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মৌখিক সঙ্গম। পশ্চিমে নারীরা অনেকটা ফিরে পেয়েছে তাদের শরীর, কিন্তু গ্রহ জুড়ে নারীর শরীর এখনো পুরুষের জমিদারি।

বিয়ে ও সংসার

পিতৃতন্ত্র নারীর জন্যে যে-পেশাটি রেখেছে, তা বিয়ে ও সংসার; এ-ই পিতৃতন্ত্রের নির্ধারিত নারীর নিয়তি। এরই মাধ্যমে নারীকে বিস্তৃত জীবন থেকে সংকুচিত ক'রে, তার মনুষ্যত্ব ছেঁটে ফেলে, তাকে পরিণত করা হয় সম্ভাবনাশূন্য অবিকশিত প্রাণীতে। নারীকে দেয়া হয়েছে বিয়ে নামের অনিবার্য স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, যার মধ্য দিয়ে সে ঢোকে একটি পুরুষের সংসার বা পরিবারে; পালন করে পুরুষটির গৃহিণীর ভূমিকা, কিন্তু বন্দী থাকে দাসীত্বে। প্রথাগত স্ত্রীর ভূমিকা একটি প্রশংসিত পরিচারিকার ভূমিকা, যে তার প্রভুর সংসার দেখাশোনার সাথে কাম ও উত্তরাধিকার দিয়ে চরিতার্থ করে প্রভুর জীবন। বিয়ে ও সংসার নারীর সম্ভাবনার সমাপ্তি; অবশ্য পুরুষতন্ত্র বিশ্বাস করে না নারীর কোনো সম্ভাবনায়ই, মনে করে দাসীত্বেই নারী লাভ করে পরিপূর্ণতা। এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২১৪) পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাকে বলেছেন 'স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়'; এর ফলে 'পুরুষ গৃহস্থালির কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হল পদানত, শৃংখলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তানসৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।' বিয়ে, তাঁর মতে, 'মোটেই স্ত্রী ও পুরুষের সদ্ভাব সূত্রে' দেখা দেয় নি, দেখা দেয় 'নারী পুরুষের একজন কর্তৃক অপরের উপর আধিপত্য হিসাবে'; আর পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে 'স্ত্রী-ই হল প্রথম ঘরোয়া ঝি'। এঙ্গেলস (১৮৮৪, ২২৯) দেখিয়েছেন 'আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য অথবা গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে... বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে বিত্তবান শ্রেণীগুলির মধ্যে পুরুষই হচ্ছে উপার্জনকারী, পরিবারের ভরণপোষণের কর্তা এবং এইজন্যই তার আধিপত্য দেখা দেয়, যার জন্য কোন বিশেষ আইনগত সুবিধা দরকার পড়ে না। পরিবারের মধ্যে সে হচ্ছে বুর্জোয়া; স্ত্রী হচ্ছে প্রলেতারিয়েত।' প্রতিটি পরিবার গ'ড়ে ওঠে একজন ব্রাহ্মণ ও একটি শূদ্রীর সমবায়ে, যাতে পুরুষটি ব্রাহ্মণ নারীটি শূদ্রী। পুরুষই বিয়ে ও সংসারের কর্তা, সে-ই সংসারে সার্বভৌম, তার বিধানই সংসারে ধ্রুব ধর্মগ্রন্থ; নারীটি ওই সংসারের পরিচারিকা। বাড়ির দাসীর সাথে বুর্জোয়া স্ত্রীটির পার্থক্য হচ্ছে দাসীটিকে (যৎসামান্য) বেতন দেয়া হয়, আর নারীটি (কখনো কখনো মর্যাদা ও বিলাসে) রক্ষিত হয়। রোজা লুক্সেমবার্গ তাঁর সময়ের বুর্জোয়া নারীদের বলেছিলেন 'পরগাছার পরগাছা', ম্যাককিনন (১৯৮২, ৮) প্রলেতারিয়েত নারীদের বলেছেন 'ক্রীতদাসের ক্রীতদাসী'; এবং মিল রয়েছে দু-শ্রেণীর নারীর মধ্যেই যে তারা একই রকমে শোষিত। রক্ষণশীল বঙ্কিমও 'প্রাচীনা ও নবীনা'য় (১৮৮৭, ২৫১) বলেছেন, 'পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না।' তবে তারা শুধু শোষক ও শোষিতই নয়, তাদের ভিন্নতা আরো

বেশি; শোষকশোষিতরা হয় একই প্রজাতির, কিন্তু স্বামীস্ত্রী ভাবগতভাবে বিধাতা ও ভক্তের পর্যায়ের : হিন্দুমতে পতি পরম গুরু; সে 'স্বামী', 'পতি', বা 'ঈশ্বর': মুসলমান মতে স্বামীর পায়ের নিচে বেহেস্ত, স্বামী প্রায় সেজদার উপযুক্ত; খ্রিস্টান মতে স্বামীই নারীর ঈশ্বর। মিল্টনের ইভ আদমের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে বলে [উদ্ধৃত, ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ (১৭৯২, ১০১)] :

> আমার প্রণেতা ও ব্যবস্থাপক, তুমি যা আদেশ করো
> প্রশ্নহীন আমি মান্য করি; এ-ই বিধাতার বিধি:
> বিধাতা তোমার *বিধি, তুমিই আমার* : এর বেশি কিছু
> না জানাই নারীর সবচেয়ে সুখকর জ্ঞান ও গুণ।

নারী আজো রয়ে গেছে বিবি হাওয়ার পর্যায়েই।

সমাজ বিয়ে ও সংসারের নামে নারীর জন্যে বিধিবদ্ধ করেছে এ-ভবিতব্যই। বিয়ের জন্যে দরকার পুরুষ ও নারী দুজনকে; তবে বিয়েতে তাদের ভূমিকা সমান নয়; পুরুষ বিয়ে করে, নারী বিয়ে বসে, নারীকে বিয়ে দেয়া হয়, নারীর বিয়ে হয়। পুরুষ সক্রিয়, নারী অক্রিয়; তার বিয়ে হয় অন্যদের দৌত্যে, বা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের মতো। প্রতিটি পিতৃতন্ত্র বিয়ের যে-বিধান তৈরি করেছে, তা সম্পূর্ণ পুরুষের স্বার্থে প্রস্তুত, নারীর স্বার্থ তাতে দেখা হয় নি; নারীকে ব্যক্তি হিশেবেই গণ্য করা হয় নি। হিন্দু বিধানে বিয়ে নারীবলি, মুসলমান বিধানে বিয়ে চুক্তিবদ্ধ দেহদান, খ্রিস্টান বিধানে বিয়ে নারীর অস্তিত্ব বাতিল। এ-সম্পর্কে আগেই, 'পিতৃতন্ত্রের খড়্গ' পরিচ্ছেদে, বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বিয়ে পুরুষ ও নারীর কাছে ভিন্ন ব্যাপার; বিয়ে দুটি অসম মানুষের স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পর্ক, ও চুক্তি, যাতে বাতিল হয়ে যায় নারীটির স্বায়ত্তশাসন। তবে বিধানের থেকে অনেক মানুষ উৎকৃষ্ট ব'লে সব সময় বিধানের পীড়ন সহ্য করতে হয় না নারীকে, কিন্তু গোপনে সে মেনে নেয় নিজের ভাগ্য। পুরুষ স্বাধীন সম্পূর্ণ ব্যক্তি, সে উপার্জন করে, উপার্জনই তাকে প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তি হিশেবে; নারী করে গৃহস্থালি ও গর্ভধারণের কাজ, যা কখনো তাকে পুরুষের সমকক্ষ ক'রে তোলে না। মনু [৯:৩] যে বলেছেন, 'নারীকে কুমারীকালে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করবে, নারী কখনোই স্বাধীন থাকার যোগ্য নয়', এটা সব পিতৃতন্ত্রেরই বিশ্বাস; নারীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিলে বিপন্ন হয়ে পড়ে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারসংস্থা। নারী কখনোই স্বায়ত্তশাসিত নয়; সে বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে আশ্রিত থাকে, বিয়ের ফলে ঘটে তার প্রভুবদল; পিতার বদলে স্বামীটি হয় তার নতুন প্রভু। এক প্রভু ধর্মীয় বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে তাকে হস্তান্তরিত করে আরেক প্রভুর কাছে; এ-হস্তান্তরণ চুক্তি সাধারণত সম্পন্ন হয় দু-প্রভু, শ্বশুর ও জামাতার, মধ্যে। বিয়েতে নারী পাত্র নির্বাচন করে না, কিন্তু বিধান ও সামাজিক পরিস্থিতি অনুসারে তার পক্ষে অবিবাহিত থাকাও অসম্ভব; তাই বিয়ে তার জন্যে জীবিকার একমাত্র উপায়। বিয়ের মধ্য দিয়েই নারীর ব্যবস্থা হয় জীবনধারণের; তার অস্তিত্বের যে কিছুটা মূল্য আছে নারী তা প্রমাণ করে বিয়ের মধ্য দিয়েই; বিয়ে ছাড়া তার অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই, বিয়ে ছাড়া তার

অস্তিত্ব পিতৃতন্ত্রের কাছে আপত্তিকর। তবে সমাজ যে চায় অবশ্যই বিবাহিত হ'তে হবে নারীকে, তা নারীর জন্যে নয়; তা সমাজ ও পুরুষের জন্যে।

সমাজ দু-কারণে চায় নারী বিয়ে বসবে, না ব'সে থাকতে পারবে না; হিন্দু পিতৃতন্ত্র এমন ব্যবস্থা করেছে যে নারীকে শেষ নিশ্বাসের পূর্ব-মুহূর্তে বা কোনো বস্তুর সাথে হ'লেও অবশ্যই বিয়ে বসতে হবে। নারীর বিয়ে না করা সমাজের সাথে অমার্জনীয় বেয়াদবি, মারাত্মক সমাজদ্রোহিতা। বিয়ে নারীর জন্যে অবধারিত, এর প্রথম কারণ সমাজের জন্যে তাকে সন্তান, সম্ভব হ'লে পুরুষ, উৎপাদন করতে হবে, তাকে মা হ'তে হবে; মানুষ প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে তাকে। তবে পুরুষতন্ত্র মনে করে মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার ভার পুরুষকেই দিয়েছে প্রকৃতি, নারীর কাজ শুধু অক্রিয় আধারের ভূমিকা পালন করা; নারী যদি আধারের ভূমিকা পালনে সম্মত না হয়, তাহলে পুরুষ, যেমন ফ্রয়েড বলেছেন, নারীর সম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই তার জরায়ুতে উৎপাদন করবে মানুষ। দ্বিতীয় কারণ তাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে পুরুষের কাম, পরিচর্যা করতে হবে পুরুষের সংসার। নারীর জন্যে বিয়ে পুরুষসেবা, যার বিনিময়ে পুরুষ তার ভরণপোষণ করে। যে-দুটি কারণে নারীকে বাধ্য করা হয় বিয়েতে, তাতে নারীকে মানবিক সমস্ত এলাকা থেকে তাড়িয়ে ঢোকানো হয় জৈবিক এলাকায়, সেখানে তার একমাত্র কাজ প্রাণপোষণ ও লালন। নারী উৎপাদন করে পুরুষের উত্তরাধিকারী; তার ভূমিকাই যদিও প্রধান এতে, কিন্তু তা মুছে দেয়া হয়, সন্তান পরিচয় ধারণ করে শুধু পুরুষের। কামের পরিতৃপ্তি বিয়ের আশুউদ্দেশ্য; বিয়ের দিন কেউ মানবজাতির ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, ভাবে যৌনসংসর্গের কথা; এবং ভাবে পুরুষটির দিক থেকে। নারীটি অনাঘ্রাত কিনা, পুরুষটি কীভাবে নারীটিকে ভোগ করবে, ক'রে তৃপ্তি পাবে কিনা, নারীটি কতোখানি উপযুক্ত সম্ভোগের, এসবই সংগোপন বিবেচনার বিষয় হয় সবার। এজন্যেই বিয়ের আগে মেয়ের দেহটিকে নানাভাবে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা হয়; আর পুরুষটিকে সুখাদ্য খাইয়ে ক'রে তোলা হয় কামশক্তিমান। বিয়েতে পুরুষের কামই প্রধান, নারীর কামের পরিতৃপ্তি বিয়ের উদ্দেশ্য নয়; পুরুষের কাম মেটাতে গিয়ে যদি নারীর কামও মেটে, তাহলে আপত্তি নেই, যদি না মেটে তাহলে তা আপত্তিকর। বিয়ের বাইরে নারীর কামের পরিতৃপ্তি নিষিদ্ধ। বহুবিবাহের সুবিধা ভোগ করে পুরুষ চিরকালই; হিন্দুধর্ম ও ইসলামে তা স্বীকৃতও; তাছাড়াও পুরুষ মিলিত হয় দাসীর সাথে, পুরুষ উপপত্নী রাখে, বেশ্যাসম্ভোগ করে; কিন্তু নারী একটি পুরুষ ছাড়া আর কোথাও কাম পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কামনিষ্ঠতা পুরুষের কাছে প্রত্যাশা করা হয় না, কিন্তু নারীর জন্যে তা বিধিবদ্ধ; নারী ওই বিধান থেকে বিচ্যুত হ'লে পায় চরম শাস্তি।

বিয়ে স্বামীস্ত্রী উভয়েরই জন্যে একই সাথে ভার ও উপকারী, তবে দুজনের পরিস্থিতি ভিন্ন। পুরুষ বিয়ে না করলেও সমাজে গৃহীত হয়, সমাজে গৃহীত হওয়ার একমাত্র শর্তই পুরুষ হওয়া; কিন্তু নারী শুধু বিয়ের মধ্য দিয়েই গৃহীত হ'তে পারে সমাজে। বিয়ে তাকে একটি সংসার দেয়, যদিও সংসারটি তার নয়; সে পরিচিত হয় পুরুষটির

পরিচয়ে, অর্থাৎ পুরুষের সংস্পর্শে সে স্থান পায় সমাজে। বিয়ে না হ'লে তার জীবনই নষ্ট। তাই তাকে বিয়ে দেয়ার জন্যে ব্যগ্র থাকে পিতামাতা, তাতে তার মত আছে কিনা তাতে কেউ আগ্রহ বোধ করে না; সমাজ ধ'রেই নেয় বিয়ের জন্যে প্রস্তুত থাকাই নারীত্ব। প্রথাগত সমাজে তার জন্যে ঠিক করা হয় একটি স্বামী; অপ্রথাগত সমাজে তাকে সাধনা করতে হয় স্বামী ধরার। প্রথা-অপ্রথার মিশ্র সমাজে তার অবস্থা হয়ে ওঠে আরো জটিল, তাকে প্রস্তুত থাকতে হয় যে-কোনো পুরুষের জন্যে, আবার তাকে ফাঁদ পাততে হয় বিশেষ পুরুষের জন্যে, যেমন বাঙলাদেশে। তবে বিয়েতে সে অক্রিয়; সে বিয়ে করে না, বিয়ে বসে বা তাকে বিয়ে দেয়া হয়। পুরুষ বিয়ে করে অস্তিত্বসম্প্রসারণের জন্যে; বাল্যকাল থেকেই সে তার অস্তিত্বকে সম্প্রসারিত করতে থাকে, বিয়ে তার অস্তিত্বসম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার একটি অংশ, তার অস্তিত্বের চূড়ান্ত সার্থকতা নয়। তার জীবন যেমন সক্রিয়তার, বিয়েতেও সে তেমনই সক্রিয়; বিয়ে তার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিকে দৃঢ়তা দেয়। বিয়ে নারীকে কিছু অধিকার দেয়; বিয়ের মাধ্যমে সে পায় নিরাপত্তা, তবে সব নারী নিরাপত্তা পায় না, কিন্তু সে পরিণত হয় একটি পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিতে।

বিয়ের ফলে উদ্ভূত সংসার সংস্থাটির প্রধান হয় পুরুষটি; সে-ই হয় সমাজে পরিবার বা সংসারের প্রতিনিধি। একটি পরিবার সৃষ্টি একটি নতুন সামন্ত রাজ্য সৃষ্টির মতো; সেখানে অধিরাজ পুরুষটি, আর নারীটি ওই রাজ্যে লুপ্ত ক'রে দেয় নিজের সত্তা। পশ্চিমে নারীটিকে গ্রহণ করতে হয় পুরুষটির নাম, সে অর্ন্তভুক্ত হয় পুরুষটির ধর্মে ও শ্রেণীতে; তার সমস্ত জীবন বদল করতে হয় একটি নতুন জীবনের সাথে। মূলত নারীর কোনো ধর্ম ও শ্রেণী নেই, সে যে-প্রভুর অধীনে যায় অর্ন্তভুক্ত হয় সে-প্রভুরই ধর্ম ও শ্রেণীতে। নাম বদল নারীকে নতুন শূদ্রে পরিণত করে; হিন্দুধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ দুবার জন্ম নেয়, কিন্তু নারীও জন্ম নেয় দুবার, দ্বিতীয় জন্ম ঘটে তার বিয়েতে;-শূদ্ররূপে। আমাদের দেশে নারীর নামই ছিলো এক সময় বাহুল্য, তাই স্বামীর নাম গ্রহণ করতে হতো না তাকে; তবে পশ্চিমের প্রভাবে এ-দেশেও বিত্তশালীদের মধ্যে প্রচলিত হয় পুরুষাধিপত্যের এ-রীতিটি। পুরুষতন্ত্র নারীকে কিছুতেই স্বাধীন, নিজের নামেও স্বাধীন থাকতে দেয় না; এর করুণ রূপ দেখা যায় বেগম রোকেয়ার নামে। বাঙলায় পুরুষতন্ত্রের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন যিনি, তাঁর নামের সাথেও পুরুষতন্ত্র স্বামীর নামটি যোগ ক'রে তাঁকে ক'রে তুলেছে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। নারীর পক্ষে পুরুষাধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়া এতোই কঠিন। বিয়ের ফলে নারীটি যোগ দেয় পুরুষটির সংসারে, হয় পুরুষটির অর্ধাঙ্গিনী; সৃষ্টি হয় একটি পরিবার। এক সময় পুরুষটি স্ত্রীটিকেই বলতো নিজের 'পরিবার', তবে সে-ই পরিবারে সর্বময়। পুরুষটি যেখানে থাকে বা থাকতে বলে, সেখানে থাকে এবং যেভাবে চলতে বলে, সেভাবে চলে নারীটি। নারীটি ছিঁড়ে ফেলে তার প্রাক্তন জীবনের সাথে সম্পর্ক। নারীটি পুরুষটিকে দেয় দেহ, তার কুমারীত্ব, তাকে থাকতে হয় পুরুষটির একান্ত অনুগত। পুরুষটির কাছে সে হয়ে ওঠে বিকশিত দেহের এক অবিকশিত বালিকা।

পুরুষটির রয়েছে আর্থনীতিক ভিত্তি, নারীটির নেই; পিতৃতন্ত্র সূচনার কালেই নারীকে আর্থ ভিত্তি থেকে উৎখাত ক'রে পুরুষনির্ভরতাকে ক'রে তুলেছে তার ভবিতব্য। আর্থনীতিক ভিত্তি যার নেই, সে পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারে না, তার কোনো মেরুদণ্ড নেই। নারী আর্থ মেরুদণ্ডহীন; তার এখনো দরকার 'ভাতার'। স্বামীটি উপার্জন করে, সে গৃহে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না; সে অংশ গ্রহণ করে সভ্যতায়। নারীটি দণ্ডিত হয় সন্তানপ্রসবের জৈবিক ও সংসারের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্ত কাজে। নারী শুধু দেহ সৃষ্টি ও দেহ লালনের কাজে নিযুক্ত থাকে ব'লে দেহোত্তীর্ণ হ'তে পারে না; কিন্তু পুরুষটি দেহোত্তীর্ণ, সে শুধু সম্ভোগের সময়ই জড়িত হয় দেহের সাথে। পুরুষের জন্যে রয়েছে দু-ই : প্রকৃতি ও সংস্কৃতি; পুরুষ বিয়ের মধ্য দিয়ে তার দেহকে যেমন পরিতৃপ্ত করে, তেমনই গৃহের বাইরে গিয়ে অংশ নেয় দেহোত্তীর্ণ সভ্যতায়। সঙ্গম ও সন্তান সৃষ্টি কোনো মহৎ মানবিক কাজ কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে; তবে পিতৃতন্ত্র একে জরুরি মনে করলেও মহৎ মনে করে না। তাই নারীর কাজে কোনো মহত্ত্ব নেই, সে সভ্যতায় অংশ গ্রহণ করে না। যে-নারীরা সভ্যতায় অংশ নিয়েছে ও নেয়, পুরুষতন্ত্র তাদের মনে করে বিকৃত। অনেকেই মনে করেন জৈবিকতাই যেহেতু নারীকে বন্দী ক'রে রেখেছে আদিম স্তরে, সন্তান ধারণই যেহেতু তার প্রধান সীমাবদ্ধতা, তাই নারীকে মুক্তির জন্যে সন্তান ধারণই অস্বীকার করতে হবে। পুরুষ তার পেশা ও সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে বিকশিত সম্প্রসারিত করে নিজেকে; যখন সে এসবে ক্লান্তি বোধ করে, তখন বিশ্রাম নেয় গৃহের মনোরমতায়। গৃহ পুরুষের জন্যে বিশ্রামকক্ষ, সে গৃহের নয়। বাঙালি কবি, কালিদাস রায়, বলেছেন, 'গৃহই মোদের সব, প্রাণপণে করি তার আঁধার হরণ, /নিভে যদি কার ক্ষতি? গৃহের ক্ষতির আর হয় কি পূরণ।' কিন্তু পুরুষ গৃহের অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করে গৃহের বাইরে থেকে, গৃহের ওই অন্ধকারে যে থাকে সে নারী। সে গৃহিণী, কুলবতী, কুলবালা, কুলস্ত্রী, কুলনারী, পুরনারী, পুরস্ত্রী; সে সভ্যতার কেউ নয়, সে গৃহের অন্ধকারের।

প্রসব, পালন, ও সংসারের কাজে নিয়োজিত থেকে নারী প্রজাতির সংরক্ষণ করে, এবং নিজে থেকে যায় অপরিবর্তিত। এ-জন্যেই পুরুষতন্ত্র তৈরি করেছে চিরন্তন নারীপ্রকৃতি, চিরন্তনী, শাশ্বতী প্রভৃতি ছক। সে কোনো কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে না, সে ঘরের সীমার বাইরে গেলেও ঘর ও বাইরের মধ্যে তার সেতু হয়ে থাকে স্বামীটি। দেশের বিখ্যাত নারীটিরও পরিচয় স্বামীর স্ত্রী হিশেবে; পিতৃতন্ত্র যে-সব নারীকে স্বীকৃতি দেয়, তারাও স্বামীর পরিচয় দিয়েই বোধ করে গৌরব। বিয়ে আজো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথাগত ব্যাপারগুলোর একটি, চলছে প্রথাগত রীতিতেই। বিয়ে চাপিয়ে দেয়া হয় নারীর ওপর, পুরুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় না; কেননা নারীর সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। বিয়ে না হ'লে সে হয় পিতা, ভাই বা অন্য কারো গলগ্রহ দাসী; তার জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় কেটে যাওয়ার পর পিতার বাড়িই তার জন্যে সবচেয়ে অসুখকর, অবিবাহিত অবস্থায় পিতার বাড়িতে থাকা কলঙ্ক। সে অরক্ষণীয়া। বিয়ে তাকে একটি সংসার দেয়। তাই সে একটি স্বামী চায়, এমন একটি স্বামী

খোঁজে, যার অবস্থান তার অনেক ওপরে। নারী যেহেতু যে-শ্রেণীতে থাকে অর্ন্তভুক্ত হয় সে-শ্রেণীরই, তাই নিজের শ্রেণীউন্নতির জন্যে চায় তার চেয়ে ওপরের শ্রেণীর স্বামী, সমাজও তাই চায়। পেশাজীবী নারীরাও বিয়ে বসে তাদের থেকে অনেক উঁচুপেশার পুরুষের সাথে; দরিদ্র পরিবারে স্বামীস্ত্রীটির মধ্যে আর্থভিত্তির যে-পার্থক্য থাকে, তার চেয়ে বেশি পার্থক্য থাকে সাধারণত পেশাজীবী স্বামীস্ত্রীর মধ্যে; তাই স্বামী থাকে প্রথাগত স্বামী, স্ত্রী প্রথাগত স্ত্রী।

বিয়েতে নারীর কাম কিছুটা মেটে, তবে তার কাম নিজের জন্যে নয়; সে নিজের কাম দিয়ে সেবা করে পুরুষটির। সে দেহদান করে, পুরুষটি তাকে সম্ভোগ করে, বিনিময়ে তার ভরণপোষণ করে। নারীর দেহ সে একটি পণ্যরূপে কিনে নেয়, পণ্যটিকে নিজের সুবিধা মতো ব্যবহার করে; কিন্তু এটি পণ্য হিশেবে উৎকৃষ্ট। এটি যেমন অক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তেমনই সক্রিয় হ'তে পারে গৃহস্থালির কাজে : তার কাজ দেহদান, সন্তান ধারণ, প্রসব ও পালন, আর ঘরকন্না। এর জন্যে তাকে কোনো বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয় না, কোনো বিশেষ ঝুঁকিও নিতে হয় না। তাই পেশা হিশেবে নারীর কাছে একে মনে হয় চমৎকার। তার সামনে অন্য কোনো পেশার দরোজা খোলা নেই, কোনো পেশাই তার জন্যে এতো সহজ সুবিধাজনক নয়। তাই পেশা হিশেবে নারীর জন্যে আজো বিয়েই শ্রেষ্ঠ পেশা। অপদার্থ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারীরা এর সুবিধা ভোগ করে চরমভাবে; তারা দেহদান ও প্রসবের জৈবিক ভূমিকা পালন ছাড়া আর কোনো ভূমিকাই পালন করে না। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারীদের জন্যে বিয়ে আকর্ষণীয় বৈধ পবিত্র পতিতাবৃত্তি; তাই তাদের নিজেদের বা অভিভাবকদের প্রধান উদ্বেগ একটি উৎকৃষ্ট খদ্দের বা স্বামী সংগ্রহ করা। তারা দরকার হ'লে স্বামী কিনে নেয়। এরা সুবিধাজনক পেশার আলস্যে অপদার্থ হয়ে উঠে এক সময় দেহদানের যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে; তখন তাদের আমলা, লুণ্ঠতরাজদক্ষ পতিরা খোঁজে নতুন নারী। এরা বাস করে কারুকার্যখচিত আরামদায়ক কারাগারে, এবং কাজ করে নারীমুক্তির প্রতিপক্ষরূপে।

অবিবাহিত নারীর কামপরিতৃপ্তি পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়ে নিষিদ্ধ; পশ্চিমের মুক্ত সমাজে তার পক্ষে কাম পরিতৃপ্ত করা আর অসম্ভব নয়, কিন্তু অত্যন্ত নিষিদ্ধ পূর্বাঞ্চলে। বিবাহিত নারীর বিবাহবহির্ভূত কামসম্পর্ক আইনগত অপরাধ, কিন্তু অবিবাহিত নারীর কামসম্পর্ক আরো মারাত্মক অপরাধ। কাম চাইলে নারীকে বিয়ে করতেই হবে। মাতৃত্বের জয়গান গাওয়া প্রতিটি পিতৃতন্ত্রের অভ্যাস, কিন্তু পিতৃতন্ত্র বিশুদ্ধ মাতৃত্বে বিশ্বাস করে না; বিশ্বাস করে বিবাহিত মাতৃত্বে। মাতৃত্ব বিবাহিত নারীর গৌরব, অবিবাহিত নারীর কলঙ্ক। তাই তরুণীর জীবনের লক্ষ্যই বিয়ে, কিন্তু বিয়ে কোনো তরুণের জীবনের লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য আর্থনীতিক সাফল্য, বিয়ে তার জীবনের একটি কাজ। আজকের তরুণের চোখে বিয়ে আগের মতো মোহ সৃষ্টি করে না, এটা তার কাছে বোঝাই মনে হয়, কেননা বিয়ের উপকারিতা আগের থেকে অনেক ক'মে গেছে। পশ্চিমে থাকা, খাওয়া, কামযাপন করা সম্ভব সংসার পাতার থেকে অনেক সহজে; পুবে

বিয়ের বাইরে কামযাপন প্রায় অসম্ভব ব'লে আজো বিয়ের প্রতি তরুণদের আগ্রহ রয়েছে। বদ্ধ সমাজ বিয়েতে প্ররোচিত করে, মুক্ত সমাজ বিয়েতে অনীহ করে; বিয়ে মুক্তির নয়, বন্ধনের ব্যাপার। বাঙলায় একে 'বিবাহবন্ধন'ই বলা হ'য়ে থাকে। বিয়ে জীবনকে কিছুটা চরিতার্থ করে; বিয়ে নরনারীকে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দেয়, কামের পরিতৃপ্তি ঘটায়, সন্তান ও সংসার দেয়: নিরর্থক জীবনকে প্রথাগতভাবে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে। তবে পুরুষ যে বিয়ে খুব চায়, তা নয়; নারীই পুরুষের মধ্যে এ-চাওয়া সৃষ্টি করে। অধিকাংশ সমাজেই এখনো বিয়ে ঠিক করা হয়, তাতে উদ্যোগ নেয় পাত্রীপক্ষই বেশি, কেননা বিয়ে ছাড়া নারীর জীবনে কোনো সাফল্য নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সব দেশেই কনে দেখার রীতি প্রচলিত ছিলো; বাঙলাদেশে আজো আছে। গ্রামে মেয়েরা চরম লাঞ্ছনার মধ্যে আজো নিজেদের দেখায়, রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা দেয়; শহরেও কোনো নিউ মার্কেট, বিপনিবিতানে পিতামাতারা প্রদর্শন করে কন্যাদের। তাদের মাংস পছন্দ হ'লেই পুরুষেরা এগিয়ে আসে।

তরুণীরা বিয়ের প্রতীক্ষা করে, তবে ভয়ও পায়; কেননা বিয়েতে তাদের ঠেলে ফেলা হয় জীবনের পরিণতিতে, যার ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বিয়ে নারীটির জন্যে বেশি উপকারী পুরুষটির থেকে, বিয়ে ছাড়া তার আর কোনো পরিণতি নেই; তবে বিয়েতে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নারীকেই, পুরুষকে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না। নারীটিকে ছিঁড়ে ফেলতে হয় তার অতীতের সাথে সম্পর্ক, যে-জীবনের মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে সেখান থেকে বিয়ে তাকে উপড়ে নিয়ে স্থাপন করে অন্য জীবনে, দিন দিন অচেনা হয়ে যায় তার পরিচিত মুখ আর দৃশ্যগুলো। তাই বিয়ে যতোই ঘনিয়ে আসে ততোই উদ্বিগ্ন বোধ করে তরুণীরা, ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা যেমন তাদের বিপন্ন করে তেমনই দুর্বহ হয়ে ওঠে একটি পুরুষের কাছে আত্মদানের ভাবনা। তারা বোঝে এ-ই তাদের জন্যে ভালো, এ-ই তাদের জীবনের লক্ষ্য, এ-ই তাদের জীবনসমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান, তবু মনের তলে থাকে ভয়। বিয়ে তাদের জন্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা; যদি ওই যাত্রার শেষে থাকে কোনো সব পেয়েছির দেশ, তাহলে চমৎকার, নইলে তা বিভীষিকা। পৃথিবীর অধিকাংশ মেয়ের জন্যে বিয়ে আনন্দ নয়, পরিত্রাণ; কিন্তু বিপর্যয়ের সম্ভাবনার কথাও তাদের বুকে জেগে থাকে। মুসলমান সমাজে বিয়ের কথা মনে এলেই তালাকের কথাও মনে আসে; এ-তালাক পশ্চিমের বিবাহবিচ্ছেদ নয়। পশ্চিমের নারী আজ অসহায় নয়, বিবাহবিচ্ছেদ তার জন্যে বিপর্যয় নয়, কিন্তু দরিদ্র সমাজে তা খড়্গের মতো নারীটির মাথার ওপর ঝুলতে থাকে।

প্রেম এখন কিংবদন্তির মতো চারপাশে ছড়ানো, এটা এক আধুনিক পুরাণ; তবে প্রেম বিয়ের ভিত্তি নয়, এমনকি বিয়ের সিমেন্টও নয়। বিয়েতে চাওয়া হয় না যে নারীপুরুষ পরস্পরকে ভালোবাসবে প্রেমিকপ্রেমিকার মতো, এমনকি নারীটিকেও প্রেমের দায়িত্ব দেয়া হয় না; তার কাছে চাওয়া হয় সে পালন করবে স্ত্রীর দায়িত্ব। প্রেম নয়, তার কাছে কাম চাওয়া হয়; স্ত্রী হ'তে হ'লে তাকে এ-শর্তটি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তবে তাকে মানতে হবে যে বিয়ের বাইরে সে কোনো কামসম্পর্ক পাতবে না; পুরুষের

ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এটি, তবে তা মানা হয় না, কঠোরভাবে মানতে হয় শুধু নারীকেই। পুরুষ আজো একপতিপত্নী বিয়ে মেনে নেয় নি, বিয়ের বাইরে পুরুষের কামপরিতৃপ্তির অজস্র রাস্তা খোলা রয়েছে। বিয়ে নারীর কামতৃপ্তির জন্যে নয়, তার কামদমনের জন্যে। নারীর কামতৃপ্তি বিবেচনার বিষয় ব'লে মনে করে না সংসারসংস্থাটি, মনে করে নারী ক্ষণিক সুখের বদলে বহন করবে দীর্ঘ গর্ভ ও প্রসবের বেদনা। বাইবেলে স্পষ্টভাবেই উচ্চারণ করা হয়েছে অভিশাপটি : 'আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে' [*আদিপুস্তক*, ৩:১৬]। পিতৃতান্ত্রিকেরা বিশ্বাস করে যে নারী মর্ষকামী, তার পীড়ন দরকার; পীড়নের মধ্য দিয়েই তার ভেতর জেগে ওঠে মাতৃত্ব। প্রসব নারীর কাছে সুখকর নয়, প্রসবে কোনো অসামান্য অপার্থিব অনুভূতি নেই; বিকল্প থাকলে নারী প্রসবের দায়িত্ব থেকে মুক্ত ক'রে নিতো নিজেকে। নারী ভোগ করে প্রসবের যন্ত্রণা, পুরুষের এসব নেই; পুরুষ চায় শয্যায় তার স্ত্রীটি হবে সমস্ত যৌনাবেদনময়ী অভিনেত্রীর সমষ্টি; তারা নারীকে চায় সব সময় সতী, কিন্তু শয্যায় বারাঙ্গনা। এ-বিরোধ কী ক'রে সে মেটাবে? যাকে বাল্যকাল থেকে শেখানো হয়েছে কাম খারাপ, সে কী ক'রে মেতে উঠবে শারীরিক প্রমোদে? মঁতেন বলেছেন, 'আমরা একাধারে চাই স্বাস্থ্যবতী, তীব্র, গোলগাল, এবং সতী– অর্থাৎ গরম ও ঠাণ্ডা দু-ই' [দ্র দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ৪৫৬)]। এখন এ-অপপ্রত্যাশার শিকার পূর্বাঞ্চলের নারীরা, যেখানে পুরুষ পাশবিক।

মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিয়ের সময় কনেটিকে কুমারী থাকতো হতো না, বরং বিয়ের আগেই তার সতীত্বমোচন করতে হতো, না হ'লেই তা গণ্য হতো ত্রুটি ব'লে; কিন্তু পিতৃতন্ত্র তার রন্ধ্রে আবিষ্কার করে একটি দামি চ্ছদ। বিয়েতে নারীটির দায়িত্ব চমৎকারভাবে প্যাককরা অটুট চ্ছদসমৃদ্ধ একটি যোনি স্বামীটিকে উপহার দেয়া [দ্র 'নারী, তার লিঙ্গ ও শরীর']। এটা যে-কোনো তরুণীর মনে জাগায় ভয়, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মুসলমান দেশগুলোতে আজো তা নববিবাহিত নারীর বিভীষিকা। পৃথিবীর নানা দেশে আজো বাসর রাতের ভোরে শয্যায় খোঁজা হয় রক্ত। বাঙলাদেশে রক্তখোঁজা বিভীষিকা হয়ে ওঠে নি কখনো, তবে আজো তা খোঁজা হয়, পুরুষটি ও তার আত্মীয়রা বিছানায় রক্ত পেলে সুখ বোধ করে। নারীর জন্যে বাসর রাত বলাৎকারের রাত; বাঙলাদেশ ধর্ষণের দেশ, তবু বিয়েতে যতো বলাৎকার সম্পন্ন হয় এখানে তার একাংশও সড়কে বা খেতের আলে হয় না। অধিকাংশ নারী পুলক বোধ না ক'রেই মা, দাদীনানী হয়; অনেকে কামবোধ না ক'রেই মেটায় স্বামীর কাম। যদিও নারীদের কাম অশেষ কিন্তু বিয়ের ফলে অনেকেই কামবোধ হারিয়ে ফেলে, কাম হয়ে ওঠে তাদের জন্যে পীড়ন।

বিয়ে ও সংসার নারীকে দেয় দুটি ভূমিকা : গৃহিণী ও জননী। প্রথাগতভাবে নারী এ-দুটি ভূমিকা সম্পন্ন করতে পারলেই নারীর জীবন সার্থক ব'লে গণ্য করা হয়। নারীর এ-দুটি ভূমিকাকে খুবই আদর্শায়িত করেছে পিতৃতন্ত্র; সমস্ত ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি নারীর এ-দুটি ভূমিকার স্তবগানে মুখর। তবে নারীর এ-ভূমিকা দুটিই নারীর মুক্তির প্রতিবন্ধক,

সাম্যের বিরোধী। এ-ভূমিকা দুটিকে পেরিয়ে যেতে না পারলে নারী বন্দী হয়ে থাকবেই, তাকে থাকতেই হবে ঘরে ও আঁতুড় ঘরে। দুটি ভূমিকাই নারীকে পালন করতে হয় গৃহবন্দীত্বের মধ্যে মানবিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে; এ-ভূমিকা দুটিই নারীকে বহিষ্কৃত করে সভ্যতা থেকে। প্রথাগতভাবে মনে করা হয় নারী বিয়ের পর স্ত্রী, ও মায়ের দায়িত্ব হাসিমুখে চমৎকারভাবে পালন করবে, কেননা এগুলোই তার জন্যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক, যেনো নারীর জৈবনির্দেশের মধ্যে খচিত হয়ে আছে কীভাবে সন্তানকে দুধ খাওয়াতে হবে, কীভাবে ঢালতে হবে স্বামীর পা ধোয়ার পানি, কীভাবে ইস্ত্রি করতে হবে স্বামীর শার্ট, কীভাবে ব'সে থাকতে হবে শিশুবিদ্যালয়ের পাশের রাস্তায়– এসব নির্দেশ! প্রথাগতদের ঋষি বঙ্কিম (১৮৮৭, ২৫২-২৫৩) 'নবীনা'র কয়েকটি ত্রুটি ধরেছিলেন :

> তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু;... গৃহকর্ম্মের ভার. প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;-প্রথম শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে।.. .স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়ই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল।. . নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু।...তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক।...গৃহিণী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অর্থে উপকার হয় না;...
>
> স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য।...নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দাভয়ে, তত ধর্ম্মভয়ে নহে।...ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পাবেন যে, প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক।

এ হচ্ছে প্রথাগতদের বিশ্বাস; এর সবই সহজে বাতিল ক'রে দেয়া সম্ভব, কিন্তু আজো বাতিল হয় নি। নবীনাদের মূল দোষ শিক্ষা; অসম্পূর্ণ শিক্ষা; আর অল্পবিদ্যা সত্যই ভয়ঙ্করী, কেননা তা আরো শেখার আগ্রহ সৃষ্টি করে, এবং প্রথার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে শেখায়। নারীর স্থান গৃহ, সে গৃহ সাজিয়েগুছিয়ে রাখবে, সংসার ঠিক মতো চলার জন্যে সব কিছু করবে, এ হচ্ছে প্রথাগত বিধান। যে-নারী এটা করে না সে অস্বাভাবিক, অনৈতিক, নারী নামের অযোগ্য। কিন্তু গৃহস্থালির কাজ শুধু নারীকেই কেনো করতে হবে, পুরুষও তা করতে পারে। পুরুষকে রেহাই দেয়া হয় এ-ক্লান্তিকর কাজ থেকে, যাতে পুরুষ অংশ নিতে পারে সভ্যতার কাজে;–রাজনীতি, বিজ্ঞান, ব্যবসা, সাহিত্যে, এমনকি প্রমোদে। বঙ্কিমের যে-প্রবীণারা জল তুলতো, বাটনা বাটতো, তাদের স্বাস্থ্যের যে এতে উন্নতি ঘটতো এমন নয়; পুরুষও তাহলে নিতো স্বাস্থ্যোন্নতির ওই এ-পদ্ধতি। এটা নারীপীড়ন, এবং পীড়ন আদর্শায়িতকরণ। বাইবেলের হিতোপদেশ 'গুণবতী ভার্য্যার বর্ণনা'য় বলেছে যে 'তিনি রাত্রি থাকিতে উঠেন, আর নিজ পরিজনদিগকে খাদ্য দেন', 'তিনি বলে কটি বন্ধন করেন, আপন বাহুযুগল বলশালী করেন', 'রাত্রিতে তাঁহার দীপ নির্ব্বাণ হয় না' এবং 'তিনি আলস্যের খাদ্য খান না':

অর্থাৎ গুণবতী গৃহিণী এক সার্বক্ষণিক দাসী। সবাই বাইবেলে বিশ্বাস করে না, কিন্তু বিশ্বাস করে এ-বাণীতে। সংসারের কাজগুলো চাপিয়ে দেয়া হয় নারীর ওপর, ক্লান্তিকর বিরক্তিকর কাজগুলো সম্পন্ন করাই তার জন্যে ধর্ম; এসব কাজ যার জীবনে পুনরাবৃত্ত হয়, তার কোনো সম্ভাবনার বিকাশ ঘটতে পারে না।

সামন্ত ও বুর্জোয়া দু-সমাজই গৃহিণীপনাকে এক মহৎ ভাবাদর্শে পরিণত করেছে, গৃহ ও গৃহিণীর স্তুতি করেছে ও করছে, যদিও উত্তম গৃহিণী উত্তম পরিচারিকা মাত্র। অম্বুজাসুন্দরী নামের এক নারী কবি লিখেছিলেন [দ্র যোগেন্দ্রনাথ (১৩৬০, ৩৩৭)]:

বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুল-নারী,
ধীবতা নম্রতা মাখা, ঘোমটায় মুখ ঢাকা
রয়েছে উনন-ধাবে চিরকাল ধবি,
বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুল-নাবী।
নয়নে কজ্জল-দাগ, অধরে তাম্বুল-বাগ
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু লক্ষ্মীর আসন,...
বুক-ভরা স্নেহ-ধারা, পতি-প্রেমে মাতোয়ারা
স্থিব সবসীর ন্যায় গম্ভীর সুস্থিব।

এর কাব্যটুকুর মূল্য নেই: সেটুকু বাদ দিলে সত্য যা থাকে, তা হচ্ছে 'রয়েছে উনন-ধারে চিরকাল ধরি।' গৃহ তার স্থান, তবে গৃহসুখ তার জন্যে নয়; তার কাজ গৃহকে পুরুষদের জন্যে সুখকর ক'রে তোলা। গৃহে তার সমস্ত কাজ পুরুষদের লক্ষ্য ক'রে, গৃহ তার দ্বিতীয় দেহ; পুরুষের জন্যে যেমন তাকে আকর্ষণীয় করতে হয় দেহখানি তেমনই আকর্ষণীয় করতে হয় গৃহখানিকে। সামন্ত সমাজে নারীর স্থানই গৃহ, তাই নারীকে দেয়া হয়েছে গৃহের সমস্ত ক্লান্তিকর কাজ। ওই কাজগুলো সে যেখানে করতো সে-এলাকাটি হতো গৃহের নিকৃষ্টতম অংশ; গৃহের নিকৃষ্ট অংশে জীবনের নিকৃষ্ট কাজগুলো গৃহিণীকে সম্পন্ন করতে হতো পুরুষের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে। দরিদ্র নারীদের গৃহ নেই, তবে কাজের অভাব নেই। আধুনিক বুর্জোয়ারা ব্যবসার স্বার্থে সৃষ্টি করেছে পালে পালে গৃহিণী, গৃহিণী সৃষ্টিতে তাদের গবেষণা ও প্রচারের শেষ নেই; তারা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চলছে পুরোনো গৃহিণীকে আধুনিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত করতে। একটি আদর্শ গৃহিণী সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে একরাশ পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি; এবং প্রগতিশীলতা প্রতিরোধ।

গৃহিণী এমন নারী, যে নিজের সমস্ত সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান ক'রে ঢোকে আরামদায়ক বন্দীশিবিরে; সে পণ্য উৎপাদনকারীদের মানসসুন্দরী, যাকে লক্ষ্য ক'রে পৃথিবীর দিকে দিকে ঘুরছে পুঁজিবাদী কারখানাগুলোর চাকা। আদর্শ গৃহিণীর কাজ হচ্ছে পুঁজিবাদী পণ্যে নিজের গৃহ ভ'রে তোলা। ধনী বিশ্বে আদর্শ গৃহিণীদের গন্তব্য বিপনিকেন্দ্র; গরিব বিশ্বে ধনী গৃহিণীদের গন্তব্য বিপনিকেন্দ্র। তাদের স্বামীদের পবিত্র গৃহ ব্যাংক, আর স্থূল মস্তিষ্কহীন আদর্শ গৃহিণীদের পবিত্র এলাকা বিপনিকেন্দ্র। ধনী বিশ্বে গৃহিণীদের গৃহের কাজ করতে হয়; কিন্তু গরিব বিশ্বে দাসদাসী এতোই সুলভ যে ধনী গৃহিণীদের সাংসারিক কাজও করতে হয় না, তবে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নারীরা ব্যগ্র থাকে নিপুণভাবে

গৃহিণীর দায়িত্ব পালন করতে। গরিব বিশ্বে শোষণ সহজ, তাই ধনী গৃহগুলোতে উৎপন্ন হয় একপাল অপদার্থ নারী, যারা দেহসম্ভোগ ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন দেখে না। তারা জীবনকে বাতিল ক'রে দিয়ে মনে করে জীবন উপভোগ করছে। গৃহিণীর কাজ এমন কাজ, যা পেশা, আবার পেশা নয়। গৃহিণী হওয়ার জন্যে প্রশিক্ষণ নিতে হয় না, মনে করা হয় যে প্রতিটি নারীর মধ্যেই রয়েছে একেকটি অনন্যসাধারণ গৃহিণী, যে জেগে ওঠে সংসারে ঢুকেই। গৃহিণীর কাজ হচ্ছে পুনরাবৃত্তির পর পুনরাবৃত্তি; আদর্শ গৃহিণী একই কাজ ফিরে ফিরে করে, প্রতিদিন করে, কাজ করতে করতেও তার কাজের শেষ হয় না, তার কোনো অবসর নেই। তার জীবন হচ্ছে রান্না, ধোয়ামোছা, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, রান্না, ধোয়ামোছা, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, রান্না। গৃহিণীর কাজকে 'পেশা' বলা পশ্চিমি সুভাষণ; এটি তৈরি করা হয়েছে গৃহিণীর নিরর্থক কাজকে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলার জন্যে। যে-কোনো পেশায় রয়েছে বিশেষ অধিকার ও দায়িত্ব, গৃহিণীর কাজে তা নেই; তার বেতন নেই, কাজের নির্দিষ্ট সময় নেই, অনেককে ব্যস্ত থাকতে হয় সারাক্ষণ অনেককে করতে হয় না কিছুই। কোনো পেশায় না থাকাই হচ্ছে গৃহিণীর পেশায় থাকা; বিবাহিত যে-নারী আর কিছু নয়, যে কোনো আর্থযোগ্যতা অর্জন করে নি, সে-ই গৃহিণী। তার কাজকে মর্যাদা দিলে আছে, না দিলে নেই; এমন মহৎ কাজে জড়িত গৃহিণী।

চল্লিশের দশক থেকে পশ্চিমে পুঁজিবাদ আবার বিয়ে, সংসার, গৃহিণীকে গৌরবান্বিত করার সর্বগ্রাসী অভিযানে নামে; তার লক্ষ্য পণ্য বিক্রয়, সে জানে গৃহিণী হচ্ছে আদর্শ ক্রেতা; তাই নারীকে আবার আদর্শ নারী, খাঁটি গৃহিণী, বিশুদ্ধ মাতা ক'রে তোলার ধর্মযুদ্ধ শুরু করে পুঁজিবাদ। যে-নারী কোনো পেশায় জড়িত, যে নিজে চিন্তা করে, যে ব্যক্তিগত সাফল্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, বিয়ে সংসার পণ্য তার কাছে গৌণ; কিন্তু যে-নারী কোনো বাইরের জগত নেই, তার থাকে বিয়ে, গৃহ, পণ্য, কাম। পুঁজিবাদী মাধ্যমগুলো নিরন্তর প্রচার চালাতে থাকে যে পেশা নারীকে অসুখী করে, পেশা নারীর নারীত্ব নষ্ট করে; নারীর জীবন চরিতার্থ হয় বিয়ে, সংসার, কাম, আর পণ্যে। তারা তরুণীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয় জ্ঞান আর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে, তাদের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে বিশ্বে কী হচ্ছে তা নিয়ে ঘর্মাক্ত থাকা পুরুষের কাজ; নারীদের কাজ পড়াশুনো চুকিয়ে দিয়ে সতেরোআঠারো বছর বয়সে বিয়ে ও ঘরসংসার এবং মাতৃত্ব ও পণ্যস্তূপে জীবন চরিতার্থ করা। পুঁজিবাদী কারখানাগুলো উৎপাদন করতে থাকে পণ্য, আর প্রচার মাধ্যমগুলো উৎপাদন করতে থাকে খাঁটি গৃহিণী, যারা তরুণী, অগভীর, রূপসী, অক্রিয়; শয্যাকক্ষ, রান্নাঘর, কাম, শিশু, গৃহ যাদের জগত। এদের বার বার শোনানো হয় খাদ্য, পোশাক, রূপচর্চা, আসবাবপত্র ও কামের কথা; তাদের জীবনে নিষিদ্ধ হয়ে যায় জ্ঞান, রাজনীতি, চেতনা, যা কিছু মানবিক। তাদের দীক্ষিত করা হয় এ-ধর্মে যে নারীর বাইরে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা বিকৃতি, তাদের জন্যে পুণ্য হচ্ছে অক্রিয় কাম, পুরুষাধিপত্য ও বিয়োনোর মধ্যে জীবনকে পূর্ণ করা। তাদের শেখানো হয় যে নারীকে হ'তে হবে 'গৃহিণী'; এবং তাদের অহমিকাকে তৃপ্ত করার জন্যে বলা হয় তাদের 'পেশা : গৃহিণী'। তাদের কাজ রান্না, ঘর ঝাঁটা, রান্না, কাপড় ধোয়া,

ইস্ত্রি করা, রান্না। চিন্তাজগতের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তাদের; তারা বই পড়ে না, পড়ে বিনোদনমূলক পত্রিকা, যেগুলোতে থাকে রান্না, রূপচর্চা, গৃহসজ্জার কথা; যেগুলোতে থাকে না কোনো পেশাজীবী নারীর কথা, একমাত্র 'পেশাজীবী' যে-নারী এগুলোতে ফিরে ফিরে স্থান পায়, সে অভিনেত্রী;– পুরুষের প্রধান সম্ভোগপণ্য ও নারীমুক্তির এক বড়ো প্রতিপক্ষ। গৃহিণীর কাজ পশ্চিমে খুব ক'মে গেছে, গৃহে এতো কাজ নেই যে সে কাজে ব্যস্ত রাখবে নিজেকে। হাতে কাজ নেই, অথচ সময়ের অভাব নেই, এমন গৃহিণী কী করতে পারে? সে পারে নিরর্থক কাজকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে। পার্কিন্সনের একটি সূত্র বদলে ফ্রাইডান (১৯৬৩, ২০৫-২২৫) নতুন সূত্র তৈরি করেছেন যে 'গিন্নিপনা ফেঁপে সবটুকু সময়কে ভ'রে রাখে'; অর্থাৎ খাঁটি গৃহিণীর হাতে কাজ না থাকলে সে চালডাল মিশিয়ে বাছতে বসে! পেশাজীবী নারী যে-কাজ করবে আধ ঘন্টায়, আদর্শ গৃহিণী করবে চার ঘন্টায়, তার কাজ নেই কিন্তু সময় অনেক। আদর্শ গৃহিণী এক শোচনীয় অপচয়।

গৃহিণীর মহত্তম কাজ প্রসব করা, মা হওয়া। পুরোনো কাল থেকেই সবচেয়ে আদর্শায়িত ভূমিকাগুলোর একটি মা; পিতৃতন্ত্র মায়ের জয়গানে অনেক শ্লোক রচনা করেছে। এর মূল কারণ নারীর মর্ষকামিতার চূড়ান্ত রূপ মা : মা এমন নারী, যার জীবন অপার দুঃখের। মা ভাবমূর্তির মধ্যে গৌরবায়িত করা হয়েছে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তিকে, মা দুঃখের নারীমূর্তি। মা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ শহীদ। কিন্তু নারীকে কি চিরকাল বেছে নিতে হবে অপার দুঃখকেই, নারী কি যন্ত্রণা ভোগ ক'রেই পাবে মহিমা, শহীদ হওয়াই হবে নারীর নিয়তি? আদি নারীবাদীরা নারীর মা ভূমিকাটিকে প্রত্যাখ্যান করেন নি, তবে আক্রমণ করেছিলেন; শার্লোট পার্কিন্স গিলম্যান (১৮৯৮) পরিহাস ক'রে বলেছিলেন যে অন্য কোনো গ্রহের কোনো সমাজবিজ্ঞানী এসে যদি শোনেন মানবপ্রজাতির কল্যাণের জন্যে 'মায়ের ত্যাগস্বীকারের' কথা, তবে তিনি অত্যন্ত অভিভূত ও মুগ্ধ হবেন। 'কী চমৎকার' বলবেন তিনি। 'কী পরম করুণ ও কোমল! মানবজাতির অর্ধেক সমস্ত মানবিক উৎসাহ ও কাজ ফেলে তাদের সমস্ত সময়, শক্তি ও নিষ্ঠা নিয়োগ করছে মাতৃত্বে! সে-মহান জাতিকে লালন ও পালন করার জন্যে যাতে সে ভালোভাবে অন্তর্ভুক্তও নয়! কী মহান অসামান্য শহীদত্ববরণ [দ্র উইলিয়ম্‌স্‌ (১৯৭৭, ২৯৬)]! প্রথাগতভাবে নারীদের সারা বছর ধ'রে গর্ভবতী ক'রে রাখাই ছিলো পুরুষের কৃতিত্ব, আর নারীদের গৌরব ছিলো জরায়ুর উর্বরতায়; কিন্তু আধুনিক কালেও যখন পরিবার পরিকল্পনা হয়ে উঠেছে মহাজাগতিক শ্লোগান, তখনও পুঁজিবাদ নারীদের শেখাচ্ছে মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণতা; কেননা তা প্রকাশ করে নারীদের মৌল আদিমতা। ফ্রাইডান (১৯৬৩, ২৯৫) পেশ করেছেন এক গৃহিণী মায়ের স্বপ্নভঙ্গের তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকারোক্তি :

> আমি স্ত্রী ও মায়ের সুন্দর ভাবমূর্তিটি রক্ষা করার জন্যে খুব পরিশ্রম করতাম। আমি আমার সব সন্তান প্রসব করেছি স্বাভাবিকভাবে। আমি তাদের বুকের দুধ দিয়েছি। একবার এক পার্টিতে এক বৃদ্ধার কথায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, যখন আমি তাঁকে বলি যে সন্তান প্রসবই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, 'আদিম পাশবিক কাজ, এবং তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি কি পশুর

চেয়ে বেশি কিছু হ'তে চাও না?'

স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব, তাকে বুকের দুধ খাওয়ানো, ঘন ঘন তার কাঁথা বদলানো, তার বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তায় ব'সে থাকাতে নারীর মুক্তি নেই। মার্কিন গৃহিণীরা এক দিন দেখতে পায় গৃহ, কাম, সন্তান, স্বামী, আসবাবপত্র তাদের আটকে ফেলেছে; বাতিল হয়ে গেছে তাদের সত্তা। তাকে ধরেছে এক নতুন রোগে, যার নাম 'গৃহিণীর ক্লান্তি', যে-ধারাবাহিক পুলকের জন্যে সে পাগল ছিলো, সে পুলকও দুর্লভ হয়ে উঠেছে, স্বামীও চ'লে গেছে অন্য তরুণীর শয্যায়; তাকে গ্রাস করেছে এমন এক সমস্যা যার কোনো নাম নেই। বিয়ে, কাম, সংসার, মাতৃত্বে মুক্তি নেই নারীর। মানুষ মুক্তি পেতে পারে শুধু মানুষ হয়ে।

বাঙলাদেশে বিয়ে ও সংসার নারীর অনিবার্য তীর্থ; গরিব নারীদের জন্যে তা অবধারিত উৎপীড়নের লীলাক্ষেত্র, মধ্য ও উচ্চবিত্ত নারীদের জন্যে সুখকর বন্দীশিবির। বিয়ে ও সংসার এখন বিশেষ পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে শিক্ষিত তরুণীদের জন্যে; তাদের শিক্ষা সমস্ত লক্ষ্য ও তাৎপর্য হারিয়ে নিরর্থক হয়ে উঠছে। বিয়ে ও সংসার তাদেরও জীবনের প্রধান, একমাত্র, লক্ষ্য; বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া নিরর্থক অপব্যয়। বিয়ে এখানে তরুণীদের অত্যন্ত দরকার, সমাজ তাদের দেয় না অবিবাহিত কামের অধিকার, এবং জীবিকার কোনো নিশ্চয়তা। কিন্তু বিয়ে ও সংসারই জীবনের লক্ষ্য হয়ে বাতিল ক'রে দিচ্ছে জীবনকে। প্রথম উচ্চশিক্ষিত বাঙালি তরুণীদের অনেকেই বিয়ে করেন নি; চিকিৎসক বিধুমুখী, যামিনী, আর রাধারানী, সুরবালা, হেমপ্রভা, লজ্জাবতী বিয়ে করেন নি; বা অনেকে বিয়ে করেছিলেন বেশি বয়সে– চন্দ্রমুখী বসু, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, কামিনী রায়, সরলা, কুমুদিনী বিয়ে করেন তিরিশ পেরোনোর পর; এবং যাঁরা বিয়ে করেছিলেন, তাঁদের কারো কারো জীবনে শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো। প্রথম দিকের স্নাতক কামিনী রায় বিয়ের আগে কবিতা লিখেছিলেন, বিয়ের পর বিয়ের সুখে এতো পাগল হয়ে যান যে আর কবিতা লেখেন নি; আবার লেখেন যখন স্বামীর মৃত্যুতে মুক্তি পান সংসারের সুখ থেকে। আজো যে তাঁকে স্মরণ করি, তা ওই সুখের বিয়ের জন্যে নয়; কয়েকটি পদ্যের জন্যে। ষাটের দশকেও বাঙলাদেশের শিক্ষিত তরুণীরা বিয়ে ও সংসারের বাইরের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করতো, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতা এখন এতো প্রবল যে তরুণীদের অন্যান্য স্বপ্ন সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে বিয়েকেই ক'রে তোলা হয়েছে একমাত্র দুঃস্বপ্ন। প্রগতিশীলেরাও আজ কন্যাদের সতেরো বছর বয়সে স্বামীর সংসারে পাঠিয়ে জীবন সার্থক করেন। দুর্বার পশ্চাৎমুখিতার ফলে তরুণীদের জন্যে উচ্চশিক্ষা তাদের সমস্যার সমাধান না হয়ে রূপ নিচ্ছে সংকটের; যদি তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে না ঢুকতো, তাহলে ষোলোসতেরো বছর বয়সে কারো সংসারে ঢুকে জরায়ুর সাফল্য অর্জন করতে পারতো, কিন্তু এখন উচ্চশিক্ষা তাদের জন্যে কোনো পেশার ব্যবস্থাও করে না, এবং বিয়ের সম্ভাবনাও নষ্ট করে। আজকের প্রতিক্রিয়াশীল তরুণেরা তাদের পিতামহদের মতো আবার উন্মাদ হয়ে উঠেছে কিশোরীসম্ভোগের জন্যে; তারা চিকিৎসক প্রকৌশলী আমলা হয়ে ব্যগ্রতা বোধ করছে দশম শ্রেণীর বালিকার দেহ ভোগের জন্যে। তারা

শিক্ষাকে ভয় পায়, শিক্ষিত নারীকে ভয় পায়, তারা তৃপ্তি বোধ করে নির্বোধ বালিকায়।

বিয়ে, একপতিপত্নী বিয়ে, সংসার ও মাতৃত্ব সম্প্রতি নারীবাদীদের তীব্র আক্রমণেব বিষয় হয়েছে; কারণ প্রধানত এরই মাধ্যমে পীড়ন করা হয় নারীদের, বাতিল ক'রে দেয়া হয় তাদের সত্তা। নষ্ট ক'রে দেয়া হয় তাদের সম্ভাবনা, তাদের মেধা ও প্রতিভা। আমি কতিপয় নারীকে জানি, যাঁরা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় থেকে, কিন্তু এখন তাঁদের কোনো পার্থক্য নেই মাধ্যমিক পাশ গৃহিণীর সাথে; সংসার তাঁদের মেধা গ্রাস করেছে। একজন জানিয়েছেন তাঁর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে তিনি বই প'ড়ে বুঝতে পারেন না, ভালো সাময়িকীও পড়তে পারেন না, পড়তে পারেন শুধু রম্যপত্রিকার কেলেঙ্কারি, যদিও ছাত্রজীবনে তিনি লিখতেন চমৎকার প্রবন্ধ। বিয়েসংসার নারীদের কী ক'রে তোলে বোঝা যায় তাঁদের দিকে তাকালে। বিয়েসংসাব কি আজো জীবনের প্রার্থিত লক্ষ্য হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ? পশ্চিমে বিয়েসংসার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, বাঙলাদেশেও আর বিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচিত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিয়ে কি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্যের সাথে? বিয়ে এখনো নারীটিকে অধীন ক'রে তোলে পুরুষটির, পুরুষটি নারীটির থেকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হ'লেও। বিয়েতে স্বামীস্ত্রীর যে-প্রথাগত ভূমিকা রয়েছে, তারও বদল ঘটা দরকার; স্ত্রীকেই যে দেখতে হবে সংসার, একে আর অবধারিত মনে করার কারণ নেই। দরিদ্র দেশগুলোতে নারীদের অবস্থা শোচনীয়, শুধু প্রগতিশীলতা তাদের উদ্ধার করতে পারে ওই শোচনীয়তা থেকে। নারীর জন্যে প্রগতিশীলতা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, প্রতিক্রিয়াশীলতা নারীর চিরশত্রু। পশ্চিমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের, যাতে স্বামী কুলপতি স্ত্রী দাসী ও আর্থনীতিকভাবে নির্ভরশীল, তার মৃত্যুর সম্ভাবনা। নারীর শিক্ষা, কাম, ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা, যাকে বলা হয় 'ইএসই ফ্যাক্টর', বদলে দিচ্ছে বিয়ে ও সংসারের চরিত্র। প্রথাগত বদ্ধ বিয়ের বদলে দেখা দিচ্ছে উন্মুক্ত বিয়ে, বহুজনীয় বিয়ে, একত্রবাস: এবং বদলে যাচ্ছে পবিবারসংস্থা। প্রথাগত বিয়ে একদিন এখানেও হয়ে উঠবে অতীতের ব্যাপার।

ধর্ষণ

নারীর ওপর পুরুষের বলপ্রয়োগের চরম রূপ ধর্ষণ, যাতে পুরুষ নারীর সম্মতি ছাড়া তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। পুরুষ সুবিধার জন্যে বা আক্রোশবশত নারীকে খুন করতে পারে– মাঝেমাঝেই করে; কিন্তু খুনের থেকেও মর্মান্তিক ধর্ষণ, কেননা খুন নারীটিকে কলঙ্কিত করে না। ধর্ষণ একান্ত পুরুষের কর্ম; নারীর পক্ষে পুরুষকে খুন করা সম্ভব, কিন্তু ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। পুরুষের দেহসংগঠন এমন যে পুরুষ সম্মত আর শক্ত না হ'লে নারী তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে পারে না; কিন্তু উত্তেজিত পুরুষ যে-কোনো সময় নারীকে তার শিকারে পরিণত করতে পারে। অসম্মত নারীর সাথে জোর ক'রে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াকে কয়েক দশক আগে সাধারণত বলা হতো *বলাৎকার*, এখন অকপটে বলা হয় *ধর্ষণ*। ধর্ষণ কোনো আধুনিক ব্যাপার নয়, এবং বিশেষ কোনো সমাজে সীমাবদ্ধ নয়। তবে কোনো কোনো সমাজ বিশেষভাবে ধর্ষণপ্রবণ, আর কোনো কোনো সমাজ অনেকটা ধর্ষণমুক্ত; যদিও সম্পূর্ণ ধর্ষণমুক্ত সমাজ ও সময় কখনোই ছিলো না, এখনো নেই। মানবসমাজ ধর্ষণের ইতিহাস লিখে রাখার দরকার বোধ করে নি; কিন্তু প্রাচীন পুরাণ ও উপাখ্যানে ধর্ষণের যে-বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় প্রাচীনেরা ধর্ষণকে অনেকটা ধর্মে ও দর্শনে পরিণত করেছিলো।

ভারতীয় পুরাণে পরাশর কর্তৃক সত্যবতীকে ধর্ষণের উপাখ্যান বিখ্যাত; আর দেবরাজ ইন্দ্র মাঝেমাঝেই স্বর্গমর্ত্য জুড়ে ধর্ষণ ক'রে বেড়াতো। গ্রিক পুরাণ ভ'রেই পাওয়া যায় ধর্ষণ, যাতে প্রধান ধর্ষণকারী দেবরাজ জিউস। গ্রিক পুরাণ জানিয়ে দেয় নারীদেহ পুরুষের কামাক্রমণের চিরকালীন লক্ষ্যবস্তু; এবং এতে এমন একটি বাণীও পাওয়া যায় যে আক্রমণ ও অধিকার করা যেতে পারে নারীকে, লুণ্ঠন করা যেতে পারে তার দেহ, যদি না সে বের করতে পারে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার কোনো চরম উপায়। আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার এক উপায় হচ্ছে মৃত্যুবরণ, মৃত্যুই নারীর ধ্রুব সখা; তবে গ্রিক পুরাণে ধর্ষণকারীকে প্রতিহত করার নাটকীয় উপায় রূপান্তরগ্রহণ। ধর্ষণকারীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে করতে, পেরে না উঠে, শেষ মুহূর্তে নারী নিজের শরীরকে রূপান্তরিত করে কোনো প্রাকৃতিক বস্তুতে; যেমন দাফনে অ্যাপোলোর কামক্ষুধা থেকে বাঁচার জন্যে রূপান্তরিত হয় লরেলতরুতে। তবে যারা পলাতে পারে না, বিশেষ ক'রে ধর্ষণকারী যখন কোনো দেবতা, তখন তাদের শরীরের ঘটে আরেক রূপান্তর; তারা গর্ভবতী হয়, প্রসব করে বীরসন্তান, যারা নগরপত্তন করে, সৃষ্টি করে সভ্যতা। পুরাণের নানা ব্যাখ্যা সম্ভব। গ্রিক পুরাণের ধর্ষণ সরাসরি কাম ও নারীপুরুষের ভূমিকা নির্দেশ করতে পারে; আবার নির্দেশ করতে পারে বিয়ে ও বিয়ের বাইরে নারনারীর আচরণের বিধিবিধান। পৌরাণিক ধর্ষণ অস্তিত্ব, ধর্ম ও রাজনীতিক ব্যাপারের প্রতীকও হ'তে পারে। গ্রিক পুরাণ পুরুষাধিপত্যবাদী সমাজের সৃষ্টি; তাই ধর্ষণ নির্দেশ

করতে পারে পুরুষাধিপত্য ও শিশ্নের শক্তি, যার রূপ দেখা যায় দেবরাজ, 'দেবতা ও মানুষের পিতা', জিউসের ক্রিয়াকলাপে। অলিম্পাসে অধিষ্ঠিত দেবরাজের শক্তির শেষ নেই, যা ঝলকে ওঠে তার রাজদণ্ড ও বজ্রে; এবং তার কামশক্তি আর কামনাও অনন্ত। সে তার কামশক্তি অবাধে প্রয়োগ করে দেবী আর মানবীদের ওপর। পৌরাণিক ধর্ষণের তাৎপর্য যাই হোক, তা প্রমাণ করে ধর্ষণ মানুষের সমান বয়সী। ব্রাউনমিলার বলেছেন, 'শুরুতে পুরুষ ছিলো প্রাকৃতিক লুণ্ঠনকারী আর নারী ছিলো প্রাকৃতিক শিকার' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২৩০)]; এবং আজো তাই রয়ে গেছে।

পৃথিবীতে পৌরাণিক কাল আর নেই, দেবতারা আর ধর্ষণ করে না; তবে দেবতাদের স্থান নিয়েছে আজ পুরুষেরা; প্রায়-অবাধ ধর্ষণ চলছে পৃথিবী জুড়ে। ধর্ষণ এখন দেখা দিয়েছে মারাত্মক মড়করূপে;– আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত সমাজে যেমন চলছে ধর্ষণ, তেমনি চলছে বাঙলাদেশের মতো অনুন্নত সমাজে। বাঙলাদেশ এখন সবচেয়ে ধর্ষণপ্রবণ সমাজের একটি; মনে হচ্ছে পৌরাণিক দেবতারা আর ঋষিরা দলবেঁধে জন্মলাভ করেছে বাঙলাদেশে। ধর্ষণের সব সংবাদ অবশ্য জানা যায় না; সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ধর্ষিতরাই তা চেপে রাখে; কিন্তু যতোটুকু প্রকাশ পায় তাতেই শিউরে উঠতে হয়। বাঙলাদেশে ধর্ষণ সবচেয়ে বিকশিত সামাজিক কর্মকাণ্ড, পৃথিবীতে যার কোনো তুলনা মেলে না। বাঙলাদেশে এককভাবে ধর্ষণ করা হয়, এবং দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়; এবং ধর্ষণের পর ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়। এখানে পিতা ধর্ষণ করে কন্যাকে (কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে এক পিতা ধর্ষণ করে তার তিন কন্যাকে), জামাতা ধর্ষণ করে শাশুড়ীকে, সহপাঠী ধর্ষণ করে সহপাঠিনীকে, আমলা ধর্ষণ করে কার্যালয়ের মেথরানিকে, গৃহশিক্ষক ধর্ষণ করে ছাত্রীকে, ইমাম ধর্ষণ করে আমপারা পড়তে আসা কিশোরীকে, দুলাভাই ধর্ষণ করে শ্যালিকাকে, শ্বশুর ধর্ষণ করে পুত্রবধুকে, দেবর ধর্ষণ করে ভাবীকে; এবং দেশ জুড়ে চলছে অসংখ্য অসম্পর্কিত ধর্ষণ। চলছে দলবদ্ধ ধর্ষণ;–রাতে গ্রাম ঘেরাও ক'রে পুলিশ দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে গৃহবধুদের (কয়েক বছর আগে ঠাকুরগাঁয়ে ঘটে এ-ঘটনা); নিজেদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে পুলিশ দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ ক'রে হত্যা করে একটি বালিকাকে; ১৯৯৫র আগস্ট মাসে, দিনাজপুরে, যার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সারা শহর, এবং প্রাণ দেয় সাতজন; মহাবিদ্যালয়ে প্রেমিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছাত্ররা দলগতভাবে ধর্ষণ করে ছাত্রীকে (ব্রজমোহন কলেজ, ১৯৯৫); মাস্তানরা বাসায় ঢুকে পিতামাতার চোখের সামনে দলগতভাবে ধর্ষণ করে কন্যাদের (বিভিন্ন শহর ও গ্রামে)। বাঙলাদেশ আজ ধর্ষণকারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ। বাঙলাদেশে নারী বাস করছে নিরন্তর ধর্ষণভীতির মধ্যে। চাষীর মেয়ে মাঠে যাবে–সে আর কোনো ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের; মেয়েটি ইস্কুলে বা মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে–সে আর কোনো ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের; মেয়েটি বাইরে যাবে–সে আর কোনো ভয় পাচ্ছে না, কিন্তু ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের। সুজান গ্রিফিন বলেছেন, 'আমি কখনোই ধর্ষণের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারি নি' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২২১)]। বাঙলাদেশে প্রতিটি নারী এখন সুজ্যান গ্রিফিন।

ধর্ষিত হওয়া নারীর জন্যে মৃত্যুর থেকেও মারাত্মক; ধর্ষিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ধসিয়ে দেয় ধর্ষিত নারীর জীবনের ভিত্তিকেই। ধর্ষিত হওয়ার মুহূর্তে নারী গভীরতম অন্ধকারে পতিত হয়; তার যদি সঙ্গমের পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে যন্ত্রণা আর বিভীষিকা তাকে পাগল ক'রে তুলতে পারে। ধর্ষণ অনেকের ওপর ফেলে দীর্ঘপ্রসারী প্রভাব-নষ্ট হয়ে যায় তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার শক্তি, তারা আর কোনো পুরুষের সাথেই জড়িত হ'তে পারে না, পুরুষের প্রতিটি আচরণ তাদের কাছে ধর্ষণ ব'লে মনে হয়; বদলে যায় তাদের আচরণ, মূল্যবোধ, এবং সব সময়ই তারা থাকে শঙ্কিত। ধর্ষিত নারী আণবিক বোমাগ্রস্ত নগরী, যার কিছুই আর আগের মতো থাকে না। কিন্তু ধর্ষিত হওয়ার পর সমাজ তার সাথে সুব্যবহার করে না, তার জন্যে বেদনার্ত হয় না, করুণা করে না। ধর্ষিত অধিকাংশ নারীই ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে না, কেননা সমাজ অনেকটা ধর্ষণকারীর পক্ষেই। তাই অধিকাংশ ধর্ষিত নারীই ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে ঘটনাটিকে ভাগ্য ব'লে মেনে নেয়। ধর্ষিত নারী কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারতো বিচার বিভাগের কাছ থেকে; কিন্তু বিচার বিভাগ, যা পুরুষেরই সৃষ্টি, তাকে নিয়ে অনেকটা খেলায় মেতে ওঠে। বিচার বিভাগের সাহায্য চাওয়ার পর ধর্ষিত নারী ধর্ষিত হওয়ার বিভীষিকার পর পড়ে বিচারব্যবস্থার বিভীষিকার মধ্যে। পৃথিবী জুড়েই বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ ধর্ষিতদের পীড়িত করে প্রচণ্ডভাবে; বিচার বিভাগের আচরণে ধর্ষিতদের মনে হয় তারা ধর্ষিত হচ্ছে আবার। ধর্ষণের অভিযোগের পর কাজ শুরু করে পুলিশ; তারা তথাকথিত সত্য ঘটনা বের করার নামে নির্মম অশ্লীলভাবে জেরা করতে থাকে ধর্ষিতদের, যেনো ধর্ষিতরাই অপরাধী; যেনো তারা দেবতুল্য পুরুষকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যেই ধর্ষণের অভিযোগ আনে। পুলিশ মনে করে কোনো নারী যদি সত্যিই ধর্ষিতা হয়, তার শরীরে নানা রকম চিহ্ন থাকবেই। নারী বাধা দেবে, ধর্ষণকারী তাকে আঘাত করবে; তার দাগ ফুটে থাকবে ধর্ষিতের শরীরে। দাগগুলো সাক্ষী দেবে যে নারীটি ধর্ষিত। যদি কোনো নারী এমন দাগ ছাড়া পুলিশের কাছে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করে, পুলিশ তাকে একটা মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছু মনে করে না। *পলিটিক্যাল রিভিউ*তে প্রকাশিত রচনায় এক গোয়েন্দা সার্জেন্ট তার সহকর্মীদের দিয়েছে এ-উপদেশ [দ্র টেমকিন (১৯৮৬, ১৭)] :

> মনে রাখতে হবে যে শিশুদের বেলা ছাড়া বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে সন্ত্রাস ব্যতীত ধর্ষণ অসম্ভব, তাই তাদের শরীরে সন্ত্রাসের চিহ্ন থাকবেই। যদি কোনো নারী শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছাড়া থানায় এসে ধর্ষণের অভিযোগ তোলে, তাহলে তাকে খুব কঠোরভাবে জেরা করতে হবে। যদি তার অভিযোগ সম্বন্ধে সামান্যও সন্দেহ জাগে, তবে তাকে সরাসরি মিথ্যাবাদী বলতে হবে। যে-মেয়েরা গর্ভবতী বা বেশি রাতে বাসায় ফেরে, তাদের ওপর কড়া দৃষ্টি দিতে হবে, কেননা এমন ধরনের মেয়েরা খুব বদমাশ; তারা সহজেই ধর্ষণ বা অশোভন আক্রমণের অভিযোগ তোলে। তাদের কোনো সহানুভূতি দেখাবে না।

এ-উপদেশ থেকেই বোঝা যায় ধর্ষিত নারী কতোটা সহযোগিতা পায় পুলিশের। যেমন শুধু ভিখিরি হ'লেই চলবে না, হ'তে হবে অন্ধ খোড়া কুষ্ঠরোগী; তেমনি নারী শুধু ধর্ষিত হ'লেই চলবে না, তার শরীরে মারাত্মক আঘাতের দাগ থাকতেই হবে; তা যতো

গভীর আর প্রশস্ত হয় ততোই ভালো। বিচার বিভাগ জানতে চায়, সে কি একটুও সুখ পেয়েছে? তাহলে চলবে না। বিলেতের এক বিচারক, সত্তরের দশকে, ধর্ষিতদের উপদেশ দিয়েছিলো : 'আপনারা দু-পা চেপে রাখবেন।' এক লেখিকা উত্তর দিয়েছিলেন, 'ধর্ষিত হওয়ার সময় দু-পা চেপে রাখার কথা মনে থাকে না।' বিচার বিভাগ আসলে ধর্ষিত নারীর কাছে কী চায়? চায় তার মৃত্যু। বিচার বিভাগ বলে, তোমার উচিত ছিলো ধর্ষণকারীকে বাধা দেয়া, যদিও তার হাতে একটা ছুরিকা ছিলো, যদিও তার হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো, যদিও সে তোমার থেকে শক্তিমান; এবং তোমার উচিত ছিলো মৃত্যুবরণ। বিচার বিভাগ বা পুরুষতন্ত্র ধর্ষিত নারীর থেকে মৃত নারী পছন্দ করে। ধর্ষিত নারী অভিযোগ তোলে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে; মৃত নারী মেনে নেয় পুরুষতন্ত্রকে।

ধর্ষিত নারী পুলিশ পার হয়ে বিচারালয়ে যাওযার পর শুরু হয় নতুন বিভীষিকা; পুলিশের নিষ্ঠুর আচরণের পর বিচারালয় মেতে ওঠে আরো নিষ্ঠুর আচরণে। পুরুষ ধর্ষিত নারীর অভিযোগ বিচারের যে-প্রক্রিয়া বের করেছে, তা দেখে মনে হয় ধর্ষণকারীর বিচার তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য ধর্ষিত নারীর বিচার। যেনো ধর্ষিত হয়ে সে অপরাধ করেছে; বিচারালয় সে-অপরাধটুকুই খুঁজে বের করতে চায়। বিচার চলার সময় পুরুষটির বদলে বিচারালয়ের সব মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে নারীটির ওপর। বিচারালয়ে প্রথমেই নারীটির চরিত্রের ওপর লেপন করা হয় একরাশ কলঙ্ককালিমা; খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করা হয় তার যৌনজীবনের ইতিহাস। অবিবাহিত নারী ধর্ষিত হ'লেই তার জীবন কলঙ্কিত হয়ে যায়; কিন্তু বিচার বিভাগের কাছে তা-ই যথেষ্ট নয়; বারবার তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তার সঙ্গমের অভিজ্ঞতা আছে কি না, থাকলে তা কেমন, কার কার সাথে সে সঙ্গম করেছে, সঙ্গমে সে সুখ পায় কি না প্রভৃতি। আসামীর উকিল নিজের মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে নিয়ে থাকে কয়েকটি কৌশল : সে বারবার প্রশ্ন করে ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে;–কখন ধর্ষণ করা হয়েছে, কীভাবে করা হয়েছে, কতোক্ষণ করেছে, এসব সম্পর্কে সে বিরতিহীন প্রশ্ন করতে থাকে। নারীটিকে বারবার বর্ণনা করতে হয় নিজের ধর্ষিত হওয়ার উপাখ্যান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই নারীর বিবৃতির মধ্যে অসঙ্গতি বের করা, আর দেখানো যে ঘটনাটিতে নারীটির সম্মতি ছিলো। যে-সব ক্ষেত্রে ধর্ষিত আর ধর্ষণকারী পূর্বপরিচিত সেখানে ব্যবহার করা হয় আরেক কৌশল। এ-ক্ষেত্রে চলতে থাকে কুৎসিত প্রশ্নের ঝড়, যার লক্ষ্য প্রমাণ করা যে তাদের মধ্যে আগে থেকেই যৌনসম্পর্ক ছিলো; এটা নতুন কিছু নয়, এবং ধর্ষণ নয়। তারপর রয়েছে চিরকালীন কৌশলটি, যার কাজ প্রমাণ করা যে নারীটি অসতী, আর দেখিয়ে দেয়া যে এমন অসতীর পক্ষে এমন স্থানকালে সঙ্গমে সম্মতি দেয়াই স্বাভাবিক। মনে করা যাক নারীটি সন্ধ্যার পর (বাঙলাদেশে) বা মধ্যরাতে (পশ্চিমে) বাসায় ফিরছিলো। তখন দাবি করা হবে যে-নারী সন্ধ্যার পর বা মধ্যরাতে বাড়ি ফেরে, তার চরিত্র ভালো নয়, তাই তার পক্ষে সম্মতি দেয়াই স্বাভাবিক।

এ তো উকিলের কাজ, আর উকিলের কাজ উকিল করবেই। ধর্ষিত নারীটি তাকে

পয়সা দেয় নি, দিয়েছে ধর্ষণকারী; তাই সে সীমা পেরিয়ে গিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করবে মক্কেলকে। কিন্তু বিচারক কী করে? যখন উকিল অশ্লীল জেরা করতে থাকে নারীটিকে তখন মাননীয় বিচারকেরা কী করে? অপরাধমূলক বিচারে আইন শুধু প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করারই অনুমতি দেয়; কিন্তু ধর্ষণের মামলায় বিচারকেরা উকিলকে দেয় লাগামহীন স্বাধীনতা, যা পরিবেশকে ক'রে তোলে সবার জন্যে উপভোগ্য; আর নারীটির জন্যে পুনরায় ধর্ষিত হওয়ার সমান। বিচারকেরা উকিলদের শুধু অবাধ স্বাধীনতাই দেয় না, মাঝেমাঝে নিজেরাও আপত্তিকর মন্তব্যের পর মন্তব্য ক'রে উকিলদের উৎসাহিত আর ধর্ষিতকে পীড়িত ক'রে থাকে। ১৯৮২ সালে বিলেতে এক বিচারক মন্তব্য করে [দ্র টেমকিন (১৯৮৬, ১৯-২০)] : :

> যে-নারীরা না বলে তারা সব সময় না বোঝায় না। বিষয়টা শুধু না বলার নয়, বিষয়টা হচ্ছে সে কীভাবে না বলছে, কীভাবে সে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করছে। সে যদি এটা না চায় তাহলে তার উচিত তার দু-পা চেপে বন্ধ ক'রে রাখা। বলপ্রয়োগ ছাড়া তার ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়, তাই তার শরীরে বলপ্রয়োগের চিহ্ন থাকবেই।

ধর্ষিত হওয়া যেনো নারীরই অপরাধ– কেনো সে দু-পা চেপে সব কিছু বন্ধ ক'রে রাখে নি? ধর্ষণের বিচার ধর্ষিতাদের জন্যে চরম বিভীষিকার ব্যাপার। নিউজিল্যান্ডে ধর্ষণ সম্পর্কে গবেষকেরা জানিয়েছেন ধর্ষিতরা বিচারের পীড়নকে খারাপ মনে করে ধর্ষণের থেকেও; যা অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সমতুল্য। ধর্ষিত নারী বিচার চাইতে গেলে ধর্ষিত হয় কমপক্ষে তিনবার– দুবার রূপকার্থে।

নারীর ওপর বলপ্রয়োগের চরম রূপ ধর্ষণ; কিন্তু এ-সম্পর্কে ইতিহাসরচয়িতারা সাধারণত চুপ থাকতেই পছন্দ করেছেন। বাশার বলেছেন, 'আজকের পুরুষ ঐতিহাসিকদের পক্ষে স্বস্তির সাথে আলোচনার জন্যে ধর্ষণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, খুবই রাজনীতিক বিষয়' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২১৬)]। পুরুষের লেখা অপরাধের ইতিহাসে ধর্ষণ গুরুত্ব পায় নি; তাকে গণ্য করা হয়েছে তুচ্ছ ব্যাপার ব'লে। ধর্ষণের বিভীষিকা প্রথম তুলে ধরেন আধুনিক নারীবাদীরা; এবং প্রস্তাব করেন ধর্ষণের তত্ত্ব। তাঁরা দাবি করেন ধর্ষণকে শুধু কিছু ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের বিকৃত কাজ ব'লে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না; ব্যাপারটিকে বুঝতে হবে লৈঙ্গিক সম্পর্ক ও লৈঙ্গিক রাজনীতি, কলঙ্কিত ও নিন্দিতকরণ, সন্ত্রাস ও অপরাধের ভাষায়। কেইট মিলেটই (১৯৬৯, ৪৩-৪৬) প্রথম 'বলপ্রয়োগ' নামে ধর্ষণ বিষয়টি আলোচনা করেন; দেখান যে পিতৃতন্ত্রে নারীর ওপর পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৌশলগুলোর একটি ধর্ষণ। ১৯৭৫-এ বেরোয় ধর্ষণ সম্পর্কে সুজান ব্রাউনমিলারের সাড়াজাগানো বই *আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে : পুরুষ, নারী ও ধর্ষণ*। তাঁর বইয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য হচ্ছে ধর্ষণ সব সময়ই কাজ করেছে এক প্রধান সামাজিক শক্তিরূপে, পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে। এরপর বেরিয়েছে বহু বই : ক্যারোলিন হার্সের *ধর্ষণ নিয়ে সমস্যা* (১৯৭৭), সুজ্যান গ্রিফিনের *ধর্ষণ : চেতনার শক্তি* (১৯৭৮), রুথ ই হলের *যে-কোনো নারীকে জিজ্ঞেস করুন* (১৯৮৫) প্রভৃতি, ও আরো বহু বই ও নিবন্ধ।

পুরুষ কেনো ধর্ষণ করে? এ-সম্পর্কে পাওয়া যায় তিনটি তত্ত্ব : একটি নারীবাদীদের, একটি সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের, ও একটি জীববিজ্ঞানীদের। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বে ধর্ষণ একটা সামাজিক ব্যাধি, যার উদ্ভব ঘটেছে আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজের জটিলতা থেকে। এ-তত্ত্বটি বাতিল হয়ে যায় সহজেই; কেননা ধর্ষণ শুধু আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ষণ আগেও ছিলো, এখনও আছে; শিল্পোন্নত সমাজে যেমন রয়েছে ধর্ষণ, তেমনি রয়েছে এ-কালের আদিম ও অর্ধআদিম সমাজগুলোতে। ধর্ষণ আন্তঃসাংস্কৃতিক। ধর্ষণ সম্পর্কে নারীবাদী ও জীববিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সমন্বয় করলে পাওয়া যায় ধর্ষণ সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ ধারণা। ধর্ষণ সম্পর্কে নারীবাদীদের তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক পুরুষাধিপত্যের একটি কৌশল হিশেবেই পিতৃতন্ত্র লালন ক'রে আসছে ধর্ষণ; আর জীববিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সারকথা হচ্ছে বিবর্তনের ফলেই পুরুষের কামতৃপ্তির একটি প্রক্রিয়ারূপে উদ্ভূত হয়েছে ধর্ষণ। নারীবাদীরা ধর্ষণ সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্তে পৌচেছেন : প্রথমটি হচ্ছে ধর্ষণ শুধু ধর্ষণকারীর আলোকে বোঝা সম্ভব নয়, বুঝতে হবে পুরুষের সমগ্র মূল্যবোধের আলোকে; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধর্ষণ যতোটা অবদমিত কামের প্রকাশ তারচেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ নারীবিদ্বেষের।

কেইট মিলেট *লৈঙ্গিক রাজনীতি* (১৯৬৯) গ্রন্থে ধর্ষণের যে-তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন, তাই সম্প্রসারিত ক'রে ব্রাউনমিলার *আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে* (১৯৭৫) গ্রন্থে প্রস্তাব করেন ধর্ষণের বিস্তৃত তত্ত্ব। তাঁর তত্ত্বই এখন ধর্ষণের নারীবাদী তত্ত্ব হিশেবে গৃহীত। নারীবাদীরা নারীর অস্তিত্বকে দেখেন পিতৃতান্ত্রিক পীড়ন ও আধিপত্যের কাঠামোতে; তাঁরা মনে করেন পিতৃতন্ত্রের উদ্ভবই নারীর দুরবস্থার মূলে। কেউ কেউ পিতৃতন্ত্র ও পীড়নকে একার্থক ব'লেই মনে করেন। যেমন, মেরি ড্যালি পিতৃতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'পিতৃতন্ত্র, ধর্ষণবাদের ধর্ম' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২৩১)]। ব্রাউনমিলার ধর্ষণের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে দাবি করেন যে প্রকৃত ধর্ষণকারী কোনো ব্যক্তি নয়, প্রকৃত ধর্ষক হচ্ছে পিতৃতন্ত্র। তাঁর মতে ধর্ষণ পিতৃতন্ত্রের জন্যে দরকার; কেননা ধর্ষণ পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নয়, ধর্ষণ পিতৃতন্ত্রকে বিপন্ন করে না; বরং কাজ করে পিতৃতন্ত্রের সেনাবাহিনীর মতো। পিতৃতন্ত্র 'পৌরুষ'কে দেখে যে-মুগ্ধ চোখে, আর পোষণ করে যে-নারীবিদ্বেষ, তাতে গ'ড়ে ওঠে এমন গণমনস্তত্ত্ব, যা উৎসাহিত করে ধর্ষণকে। পুরুষের মধ্যে কেউ কেউ ধর্ষণের কাজ করে, সবাই করে না; তবে সব পুরুষই সম্ভাব্য ধর্ষণকারী। সুযোগ পেলে, যেমন যুদ্ধের সময় অবরোধকারী সেনাবাহিনী উল্লাসের সাথে করে (স্মরণীয় . দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোরিয়ায় জাপানি বাহিনী; ১৯৭১-এ বাঙলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) সব পুরুষই ধর্ষণের কাজটি করতে পারে; আর বহু স্বামী বাসর ঘরে ও অন্যান্য সময় যে-যৌন আচরণ করে, তা ধর্ষণের পর্যায়ে পড়ে। বহু স্বামী নিয়মিতভাবে ধর্ষণ করে স্ত্রীদের। ইতিহাস ভ'রেই ধর্ষণ চ'লে আসছে, যদিও তা স্বীকার করা হয় নি। ব্রাউনমিলারের মতে ধর্ষণ বৈধতা দেয় পিতৃতন্ত্রকে। কর্ম হিশেবে ধর্ষণ বর্বরভাবে নারীকে করে পুরুষের ইচ্ছার অধীন; আর

ভীতি হিশেবে ধর্ষণ সব সময় খবরদারি করে নারীর আচরণের ওপর। ধর্ষণ সীমিত করে নারীর স্বাধীনতা; আর প্রচার করে পিতৃতন্ত্রের ভাবাদর্শ যে পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ নারীর সব সময়ই দরকার। নারী যেখানেই যায় কোনো-না-কোনো মহৎ পুরুষ তার অভিভাবকত্ব করে; তাকে আগলে রাখতে চায়। এটা দেখেই মে ওয়েস্ট পরিহাস ক'রে বলেছিলেন, 'কী মজার, যে-পুরুষেরই সাথে দেখা হয় সে-ই আমাকে রক্ষা করতে চায়; আমি বুঝতে পারি না কী থেকে' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২১৮)]।

ব্রাউনমিলার বের করতে চেয়েছেন ধর্ষণের প্রতি পিতৃতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি। আদি বাইবেলের ইহুদি বিধান থেকে সামন্ততন্ত্রের বিধান পর্যন্ত সমাজ ধর্ষণকে দেখেছে কী চোখে? বাইবেলি আর সামন্ত সমাজের চোখে ধর্ষণ কোনো নারীর কাছে কোনো পুরুষের অপরাধ নয়; ধর্ষণ ছিলো এক পুরুষের কাছে আরেক পুরুষের অপরাধ। ধর্ষণ বিবেচিত হতো চৌর্যবৃত্তি ব'লে, যাতে একটি পুরুষ চুরি করতো আরেক পুরুষের ধন; – ওই বিধানে চোর কোনো নারীর কাছে অপরাধ করতো না, করতো আরেক পুরুষের কাছে। অপরাধটি ছিলো যে চোর কোনো নারীকে চুরি করেছে তার বৈধ মালিকের–পিতা বা স্বামীর–কাছে থেকে; এবং হরণ করেছে তার সতীত্ব, যার মালিক তার পিতা বা স্বামী। নারীটি যদি অবিবাহিত হতো, ধর্ষণের ফলে নষ্ট হয়ে যেতো বিয়ের বাজারে তার পণ্যমূল্য; সতীত্ব নষ্ট হওয়ায় তার পরিবারের ওপর পড়তো কলঙ্ক। তখনকার বিচারব্যবস্থা পরিবারের প্রধানকে, পিতা বা স্বামীকে, ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করতো। ধর্ষিত মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেয়া হতো যাজিকাশ্রমে, বা বিয়ে দেয়া হতো হরণকারী বা ধর্ষণকারীর সাথে। ধর্ষণের ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত যে-নারী, তা স্থির করতে কয়েক হাজার বছর লেগেছিলো পিতৃতন্ত্রের।

ব্রাউনমিলার ও নারীবাদীদের মতে ধর্ষণ কিছু বিকৃত মনোব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কাজ নয়, সমাজেরই কাজ; ধর্ষণ বিকারগ্রস্তের রোগ নয়, পিতৃতন্ত্রেরই রোগ। ব্রাউনমিলার বলেছেন, 'প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত, আমার বিশ্বাস, ধর্ষণ এক চরম ভূমিকা পালন ক'রে এসেছে; এটা এক সচেতন ভীতিপ্রদর্শনপ্রক্রিয়া, যার সাহায্যে সব পুরুষ সব নারীকে রাখে সন্ত্রস্ত অবস্থায়' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২১৮)]। নারী বাস করে ধর্ষণকারীর দীর্ঘ ছায়ার নিচে। ধর্ষণ নারীর ওপর পুরুষের বলপ্রয়োগের মূল অস্ত্র; ধর্ষণ এক রাজনীতিক অপরাধ, নারীকে অধীনে রাখার পুরুষের চরম উপায়। ধর্ষণ যে এক রাজনীতিক অস্ত্র, এ-মতের বিকাশ ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে; কেননা সেখানেই লৈঙ্গিক রাজনীতিতে ধর্ষণ একটি বড়ো হাতিয়ার ব'লে গণ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের পরিমাণ ভীতিকরভাবে বেশি; ১৯৭৯ সালে জানা যায় ৭৫, ৯৮৯টি ধর্ষণের ঘটনা; এরপর আরো বাড়ে ধর্ষণের পরিমাণ। যুক্তরাষ্ট্রেই ধর্ষণকে রাজনীতিক রূপ দিয়েছে পুরুষেরাই; ব্ল্যাক প্যান্থার নেতা এলড্রিজ ক্লিভার কালোদের সংগ্রামের কৌশল হিশেবে অনুসারীদের নির্দেশ দেয় শ্বেত নারীদের ধর্ষণের [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২১৮)]। ধর্ষণ যে অনেকটা রাজনীতিক ব্যাপার এটা বোঝা যায় দখলকারী সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলের নারীদের ধর্ষণের ঘটনায়। ব্রাউনমিলার মনে করেন ধর্ষণের উদ্ভব ঘটেছে আদিকাল থেকে পুরুষের দেহ ও মনস্তত্ত্বের বিবর্তনের ফলে; তবু এটা একটি রাজনীতিক অপরাধ।

পুরুষই শুধু ধর্ষণ করতে পারে, নারী পারে না। পুরুষের শরীরসংগঠন ধর্ষণের যোগ্যতাসম্পন্ন। ব্রাউনমিলার বলেছেন, 'ধর্ষণ করার জন্যে পুরুষের শারীরিক যোগ্যতাই সৃষ্টি করেছে পুরুষের ভাবাদর্শ, যার নাম ধর্ষণ।'

ধর্ষণের পরিমাণ সব দেশে সমান নয়, সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে পার্থক্য রয়েছে ধর্ষণহারের। সব সমাজ ধর্ষণকারীদের সমানভাবে অনুপ্রাণিত করে না। কিছু সমাজ অনেকটা ধর্ষণমুক্ত, কিছু সমাজ প্রচণ্ড ধর্ষণপ্রবণ। পশ্চিম সুমাত্রা প্রায়ধর্ষণমুক্ত; সেখানে ধর্ষণকারী নিজেকে ছোটো করে, ছোটো করে তার আত্মীয়পরিজনকে। সেখানে সবাই পরিহাস করে তার পৌরুষকে; তার ভাগ্যে জোটে পীড়ন, কখনো মৃত্যু; অনেক সময় সে নির্বাসিত হয় গ্রাম থেকে, যেখানে সে আর ফিরে আসতে পারে না। [দ্র স্যানডে (১৯৮৬, ৮৪)]। কিছু সমাজ ধর্ষণপ্রবণ, যেমন বাঙলাদেশ। কোন সমাজ উৎসাহিত করে ধর্ষণ? যে-সমাজ বিশৃঙ্খল, যে-সমাজে মৌলবাদের বিকাশ ঘটছে কিন্তু মৌলবাদী কঠোরতা নেই, যে-সমাজ পুরুষাধিপত্যবাদী, যে-সমাজে কারোই নিরাপত্তা নেই, আর নারী যেহেতু সমাজে সবচেয়ে অসহায়, তাই সেখানে ধর্ষণ প্রকটরূপে দেখা দেয়। বাঙলাদেশে মাস্তান ছাড়া সবাই অসহায়; তাই বাঙলাদেশ হয়ে উঠেছে ধর্ষণের লীলাভূমি। ম্যালিনোস্কি বলেছেন, 'কাম, বিস্তৃততম অর্থে, শুধু দুটি মানুষের শারীর সম্পর্ক নয়, এটা এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি।' নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন নারীপুরুষের লৈঙ্গিক পার্থক্যের পেছনে প্রাকৃতিক যে-ভিত্তিই থাকুক-না-কেনো, নারী আর পুরুষ, কাম আর সন্তান উৎপাদন সাংস্কৃতিক ব্যাপার [দ্র স্যানডে (১৯৮৬, ৮৪)]। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ধর্ষণের ব্যাপার দেখে এ-মতটিকেই মেনে নিতে হয়। পুরুষ জন্মসূত্রেই পাশবিক বা ধর্ষণপ্রবণ এটা কোনো কাজের কথা নয়; মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে ধর্ষণের ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায় না। কামের জৈবিক ভিত্তি অবশ্যই রয়েছে, তবে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ধর্ষণের ঘটনার যে ভিন্নতা দেখা যায়, তাতে এটা স্পষ্ট যে সংস্কৃতি মানুষের কামপ্রবৃত্তিকে প্রবলভাবেই চালিত করে। ধর্ষণ পুরুষাধিপত্যের সামাজিক ভাবাদর্শেরই প্রকাশ। ধর্ষণপ্রবণ সমাজে নারীর ক্ষমতা আর আধিপত্য নেই, নারী সেখানে কোনো সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে না—যদিও কোনো নারী হঠাৎ সরকারপ্রধান হয়ে যেতে পারে; সেখানকার পুরুষেরা ঘৃণা করে নারীর সিদ্ধান্ত। ধর্ষণপ্রবণ সমাজে পৌরুষ বলতে বোঝানো হয় হিংস্রতা আর কঠোরতা। বাঙলাদেশ এমনই এক সমাজ।

জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তনবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করেন ধর্ষণ ব্যাপারটিকে [দ্র থর্নহিল ও অন্যান্য (১৯৮৬)]। তাঁদের মতে ধর্ষণ পুরুষের এমন আচরণ, যা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিবর্তনতত্ত্বের বিরোধী। তবে তাঁরা মনে করেন ধর্ষণ হয়তো বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ শর্তনির্ভর এক আচরণ। এ-মত অনুসারে ধর্ষণে লিপ্ত হয় সে-পুরুষেরাই, যারা কাঙ্ক্ষিত সঙ্গিনীকে পাওয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ, যারা প্রয়োজনীয় সম্পদ আর মর্যাদার অধিকারী নয়। এ-মতের ভিত্তি হচ্ছে বলপ্রয়োগে সঙ্গমের তুলনামূলক জীববিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানীরা প্যানোর্পা প্রজাতির বৃশ্চিকমক্ষিকার আচরণ পর্যবেক্ষণ ক'রে কীভাবে

বলপ্রয়োগে সঙ্গমের উদ্ভব ঘটেছে, সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌচেছেন। ব্যাপারটি এমন। পুরুষ প্যানোর্পা ক'রে থাকে তিন রকম যৌন আচরণ। প্রথম আচরণ দুটি বেশ মধুর, বেশ সফল পুরুষের আচরণ : এ-ক্ষেত্রে পুরুষ প্যানোর্পা বিনামূল্যে কাম চরিতার্থ করতে চায় না; সে সঙ্গম চায় খাদ্যের বিনিময়ে–সে সঙ্গমের আগে নারী প্যানোর্পার সামনে খাবার রাখে; নারী প্যানোর্পাটি যখন খাবার খেতে থাকে, তখন পুরুষটি সঙ্গমের কাজ সম্পন্ন করে। তৃতীয় আচরণটি হচ্ছে সবল সঙ্গম বা বলাৎকার বা ধর্ষণ। এ-ক্ষেত্রে পুরুষ প্যানোর্পা নারী প্যানোর্পাকে কোনো সঙ্গমপূর্ব খাবার দিতে পারে না, তাই নারী প্যানোর্পাকে সে আকৃষ্ট করতে পারে না। নারী প্যানোর্পা তার আবেদনে সম্মত হয় না ব'লে সে বলপ্রয়োগ করে : পাশ দিয়ে কোনো নারী প্যানোর্পা যাচ্ছে দেখলেই পুরুষ প্যানোর্পা তার দিকে ছুটে যায়, নিজের নমনীয় তলপেট বাড়িয়ে দেয়। যদি সে নারীটির একটি পা বা পাখা আটকে ধরতে পারে, তবে সে নারী প্যানোর্পাটিকে স্থাপন করে নিজের জন্যে সুবিধাজনকভাবে, বলপ্রয়োগে কাবু ক'রে ফেলে নারী প্যানোর্পাটিকে, এবং শক্ত ক'রে ধ'রে সঙ্গমের কাজ সম্পন্ন করে। পুরো কাজের সময় সে নারী প্যানোর্পাটিকে শক্তভাবে ধ'রে রাখে। পুরুষ প্যানোর্পার এ-বলাৎকারকে কিছুতেই অস্বাভাবিক বা বিকৃত আচরণ বলা যায় না;– প্যানোর্পাদের সমাজ রাষ্ট্র সভ্যতা বিজ্ঞান দর্শন মনোবিজ্ঞান নেই। কিছু কিছু পুরুষ প্যানোর্পার মধ্যে এ-ধরনের আচরণের বিকাশ ঘটেছে বিবর্তনের ফলেই।

নারী প্যানোর্পার আচরণও লক্ষ্য করার মতো;– যে-পুরুষ প্যানোর্পা তাকে সঙ্গমপূর্ব দেনমোহর বা খাবার দিতে পারে, তার সাথে নারী প্যানোর্পা বেশ মধুর আচরণ করে; আর যে-পুরুষ প্যানোর্পা সঙ্গমপূর্ব খাবার দিতে পারে না, তাকে সে নিজের কাছে ঘেষতে দেয় না, তার কাছ থেকে সে দ্রুত পালিয়ে বাঁচে ; এমন গরিব পুরুষ প্যানোর্পা তাকে ধ'রে ফেললে সে তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে লড়াই করে; কিন্তু সম্পদশালী পুরুষ প্যানোর্পা সঙ্গম করতে চাইলে সে বাধা দেয় না। নারী প্যানোর্পার সাথে সঙ্গমের জন্যে পুরুষ প্যানোর্পা কৌশল তিনটির কোনটি প্রয়োগ করবে, তা নির্ভর করে খাবারের সুলভতা-দুর্লভতার ওপর। এগুলোর খাদ্য হচ্ছে মরা সন্ধিপদী পতঙ্গ। সঙ্গমের অধিকার লাভের জন্যে পুরুষ প্যানোর্পা প্রথম যে-কৌশলটি প্রয়োগ করে, সেটিই শ্রেষ্ঠ কৌশল;–সে নারী প্যানোর্পার সামনে মরা পতঙ্গ নিবেদন করে। মরা পতঙ্গের অভাবে সে বেছে নেয় দ্বিতীয় কৌশলটি;–সে নারীটিকে নিবেদন করে নিজের ভেতর থেকে নিঃসৃত লালা। কিন্তু লালাও যদি সে দেনমোহর হিশেবে দিতে না পারে, তখন বেছে নেয় চরম কৌশলটি–সে নারী প্যানোর্পাটিকে জোর ক'রে ধ'রে সঙ্গম করে। পুরুষ প্যানোর্পার দেহের আকৃতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বড়ো আকারের পুরুষ প্যানোর্পা সাধারণত খাবার বা লালা নিবেদন করতে পারে, তাই তার বলাৎকার করার দরকার পড়ে না; বলাৎকার সাধারণত ক'রে থাকে ছোটো আকারের পুরুষ প্যানোর্পা।

পুরুষ প্যানোর্পা সঙ্গমের কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবে, তা নির্ভর করে তার যোগ্যতার ওপর; আর তার যোগ্যতার বিচারক হচ্ছে নারী প্যানোর্পা। নারী প্যানোর্পার কাছে সে-পুরুষ প্যানোর্পাই সবচেয়ে যোগ্য, যে খাবার হিশেবে মরা পতঙ্গ সরবরাহ করতে

পারে। যে-পুরুষ প্যানোর্পা লালা নিবেদন করে, আর যে-পুরুষ প্যানোর্পা মরা পতঙ্গ নিবেদন করে, তাদের মধ্যে পতঙ্গশালী প্যানোর্পার সাথেই সে সঙ্গমে সম্মত হয়। যে খাবার বা লালা কিছুই যোগাতে পারে না, শুধু জোর ক'রে সঙ্গম করতে চায়, এমন পুরুষের সাথে সে মিলতেই রাজি হয় না; তার উদ্যোগকে সে সব শক্তি দিয়ে বাধা দেয়। পুরুষ প্যানোর্পার বলপ্রয়োগে সঙ্গম নারী প্যানোর্পার পছন্দ নয়; শুধু জোর ক'রেই পুরুষ প্যানোর্পা নারী প্যানোর্পার ওপর এমন কাজ সম্পন্ন করে।

সঙ্গমের অধিকার লাভের জন্যে পুরুষ প্যানোর্পারা যে-প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে যায়, তার প্রকৃতি দেখে সিদ্ধান্তে পৌছোনো সম্ভব যে যেখানে সঙ্গমের সঙ্গিনী লাভ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে একটি বিকল্প আচরণরূপে বিকশিত হ'তে পারে বলপ্রয়োগে সঙ্গম। যখন নারী তার সঙ্গী বেছে নেয় পুরুষের সম্পদ ও মর্যাদা অনুসারে, আর পুরুষদের মধ্যে একদল থাকে সম্পদশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন, এবং আরেকদল থাকে সম্পদ ও মর্যাদাহীন, তখন সম্পদ আর মর্যাদাহীনেরা ধর্ষণকেই বেছে নিতে পারে কার্যকর বিকল্পরূপে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্যানোর্পার আচরণ থেকে আহরিত এ-সিদ্ধান্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রোযোজ্য কি না? আমরা কি বলবো যেহেতু কিছু কিছু অমনুষ্য প্রাণীর পুরুষেরা বিশেষ কারণে বলপ্রয়োগে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাই মনুষ্য পুরুষেরাও লিপ্ত হবে বলাৎকারে? আমরা কি বলবো যে বিবর্তনের ফলে যেমন প্যানোর্পার মধ্যে একটি বিকল্প আচরণ হিশেবে দেখা দিয়েছে বলপ্রয়োগে সঙ্গম, একইভাবে বিবর্তনের ফলেই মানুষ পুরুষের মধ্যে বিকশিত হয়েছে বলাৎকার বা ধর্ষণ? প্যানোর্পার আচরণ দিয়ে আমরা মানুষের আচরণকে গ্রহণযোগ্য করতে পারি না।

তবে বহুপত্নীক বিবাহসংশ্রয়ে যেখানে পুরুষদের মধ্যে রয়েছে যৌন প্রতিযোগিতা, সেখানে বিবর্তনমূলক নির্বাচন কীভাবে কাজ করতে পারে, তা খুঁজে দেখতে পারি। বিয়ে করা তো আসলে কামপ্রতিযোগিতা। বহুপত্নীক বিবাহ এমন সংশ্রয়, যাতে কম সংখ্যক পুরুষ যৌন সম্পর্কে মিলিত হ'তে পারে বহুসংখ্যক নারীর সাথে। এ-পদ্ধতিতে পুরুষদের মধ্যে চলে সাফল্যের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা, কেননা সফল পুরুষেরাই শুধু লাভ করতে পারে কাম্য–সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী আবেদনময়ী–নারী। সফল পুরুষেরা আকর্ষণীয় নারীর কাছে। মানুষ প্রজাতির মধ্যে পুরুষের বহুপত্নীত্বের ব্যাপারটি অনেকটা বিবর্তনের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন [দ্র থর্নহিল ও অন্যান্য (১৯৮৬, ১১০-১১১)]। অনেক সমাজে হারেমে বহুপত্নী রাখা অনুমোদিত। এমন সমাজে কিছু পুরুষ বহু নারীর সাথে মিলিত হয়, অধিকাংশ পুরুষ এক সময়ে এক নারীর সাথে মিলিত হয়, আর বহু পুরুষ কোনো নারীর সাথেই মিলনের সুযোগ পায় না। সব সমাজেই কমবেশি বহুপত্নীকতা রয়েছে। মানব সমাজের এ-বহুপত্নীকতা প্রত্যক্ষভাবে নারী লাভের জন্যে সৃষ্টি করে পুরুষের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, আর পরোক্ষভাবে সৃষ্টি করে ধন ও মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতা। ধন ও মর্যাদা পিতৃতন্ত্রের নারীর কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

ধর্ষণ হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক বলপ্রয়োগে নারীসঙ্গম। বলপ্রয়োগে সঙ্গম হচ্ছে সে-সঙ্গম, যাতে নারীর স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন সম্মতি নেই। এতে সব সময় বলপ্রয়োগের দরকার পড়ে না। ধর্ষণ পুরুষের এমন আচরণ, যা নারীকে তার সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার দেয় না।

বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ষণ তখনই সংঘটিত হয়, যখন পুরুষ নারীর পছন্দকে বিপর্যস্ত ক'রে বলপ্রয়োগে তার সাথে সঙ্গম করে। এটা নারীর দুটি বিবর্তনমূলক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে : নারীর যৌনসঙ্গী বাছাইয়ের অধিকার নষ্ট করে, আর ধন ও মর্যাদার বিনিময়ে নিজের শরীর দানের অধিকারকে অস্বীকার করে। থর্নহিল ও অন্যান্য (১৯৮৬) সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে বিবর্তনের একটি পরিণতিরূপেই বিকাশ ঘটেছে ধর্ষণের। তাঁরা নারীবাদীদের ধর্ষণতত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁদের মতে পুরুষাধিপত্যই যদি থাকতো ধর্ষণের মূলে, তাহলে পুরুষ ক্ষমতাশালী বয়স্ক নারীদের ধর্ষণ করতো; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ধর্ষণকারীদের লক্ষ্য সাধারণত যুবতী ও দরিদ্র নারী। তাঁদের মতে নারীবাদীদের তত্ত্ব জ্ঞাপন করে যে সব শ্রেণী ও বয়সের পুরুষেরাই ধর্ষণকারী; তাও সত্য নয়; ধর্ষণকারীরা সাধারণত তরুণ ও দরিদ্র।

জীববিজ্ঞানীদের ধর্ষণতত্ত্বে বেশ সত্য রয়েছে, যাকে বলতে পারি জীবতাত্ত্বিক সত্য; নারীবাদীদের তত্ত্বে রয়েছে সামাজিকসাংস্কৃতিক সত্য, যা. বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে, জীববৈজ্ঞানিক সত্যের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জীববিজ্ঞানের সূত্রে দাবি করতে পারি যে হত্যা, স্বৈচারাচার, পীড়ন, লুণ্ঠন, শোষণ প্রভৃতি প্রবণতা উদ্ভূত হয়েছে বিবর্তনের ফলেই; তবে বিবর্তনের সূত্রের সাহায্যে সামাজিকরাজনীতিক অন্যায়কে বিধানসম্মত করা যায় না। মানুষ প্যানোপা নয়, মানুষ সামাজিকসাংস্কৃতিক প্রাণী; এবং মানুষের বর্তমান পর্যায়ে কেউ অন্য কারো ওপর আধিপত্য করার অধিকার রাখে না। পুরুষের ধর্ষণের প্রবণতা রয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই; না থাকলে পুরুষ ধর্ষণ করতো না; কিন্তু ধর্ষণে তাকে উৎসাহ দেয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। ধর্ষণরোধের উপায় হচ্ছে সমাজরাষ্ট্রের সব এলাকায় নারীর প্রতিষ্ঠা, পুরুষের সমান প্রতিষ্ঠা; তবে তাতেও হয়তো ধর্ষণ লুপ্ত হবে না। ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্যে নারীকে হয়ে উঠতে হবে পুরুষের সমকক্ষ–ঘরে ও বাইরে, এবং শারীরিক শক্তিতে।

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ : অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দু

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ (১৭৫৯-১৭৯৭) চোখে জাগিয়ে তোলেন দুটি আপাতবিষম সুন্দর ভয়াবহ চিত্রকল্প : অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দুর। মনে হয় কোথাও গভীর মিল রয়েছে অগ্নি ও অশ্রুর, অন্তত মেরি মিলিয়ে দিয়েছিলেন দুটিকে; আগুন তাঁর মধ্যে অশ্রু হয়ে টলমল ক'রে উঠতে পারতো, আবার অশ্রু হয়ে উঠতে পারতো লেলিহান অগ্নিশিখা। মেরি, ফরাশি বিপ্লবের থেকেও বিপ্লবাত্মক, ১৭৯১-এ বত্রিশ বছরের তরুণী; মাত্র ছ-সপ্তাহে লেখেন তাঁর তেরো পরিচ্ছেদের ভয়ঙ্কর বইটি : *ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্‌স্‌ অফ ওম্যান : উইথ স্ট্রিকচার্‌স্‌ অন পলিটিকেল অ্যান্ড মোরাল সাবজেক্টস্‌।* বেরোয় ১৭৯২-এ; দু-শো বছর আগে; ভাবতে ভালো লাগছে, শিহরণ বোধ করছি এজন্যে যে বাঙলা ভাষায়, পৃথিবীর এক অন্ধকার এলাকায়, একা পালন করছি বইটির দ্বিশতবার্ষিকী! বইটি নারীবাদের প্রথম মহাঘোষণা; মানুষের লেখা সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক, বিখ্যাত ও আপত্তিকর বইগুলোর একটি তাঁর *ভিন্ডিকেশন।* বইটি প্রকাশের পর পিতৃতন্ত্রের ইতিহাসে প্রথম বিপ্লবী নারী, তেত্রিশ বছরের মেরি পান প্রগতিশীলদের অভিনন্দন ও প্রশংসা, কিন্তু নিন্দাই জোটে বেশি। নিন্দাই ছিলো তাঁর স্বাভাবিক প্রাপ্য, তখন পৃথিবী জুড়েই ছিলো তাঁর শত্রুরা, আজো তারা আছে; তাই ওই বই লিখে সকলের চোখের মণি হয়ে উঠবেন তিনি, তা আশা করতে পারি না, মেরিও করেন নি। তিনি পান তাঁর পুরস্কার : রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্র ক্ষেপে ওঠে, তাঁর নাম অভিন্ন হয়ে ওঠে অনাচারের সাথে; রক্ষণশীলদের কাছে মেরি হয়ে ওঠেন নিষিদ্ধ ঘৃণ্য নাম। তবে তিনি ঘৃণাই শুধু পান নি, পেয়েছেন অনুরাগও। টমাস কুপার উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, 'এবার পুরুষতন্ত্রের সমর্থকদের বলো (যদি পারে) *নারী-অধিকার*-এর উত্তর দিতে।' মেতে ওঠে রক্ষণশীলেরা, অশ্লীল গালাগালিতে ভ'রে ফেলে চারপাশ: হোরেস ওয়ালপোল মেরিকে বলেন 'পেটিকোটপরা হায়েনা'; আরেকজন বলে 'দার্শনিকতাকারিণী সর্পিণী' ইত্যাদি। মেরি তাদের চোখে হয়ে ওঠেন অশুভর নারীমূর্তি। তাঁর নিন্দুকেরা শুধু তখনই ছিলো না, ছিলো উনিশশতকে, বিশশতকের অর্ধেক ভ'রে তারা ছিলো, আছে আজো। ফ্রয়েডীয়দের চোখে মেরি এক খোজাগৃঢ়ৈষারুগ্ন শিশ্নাসূয়াগ্রস্ত নারী, যে নারীবাদ নামের নষ্টের মূলে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত নারীবাদীরাও সংকোচ করতো তাঁর নাম নিতে, ভয়ে কুঁকড়ে যেতো একথা ভেবে যে মেরির নাম নিলে পুরুষতন্ত্র ক্ষেপে উঠবে, তাঁদের কোনো দাবি পূরণ হবে না। মেরি সমস্ত 'সদগুণে'র বিনাশকারিণী, তাঁর নাম নিলে হানি ঘটবে সতীত্বের। কিন্তু জয় হয়েছে মেরিরই, যিনি বত্রিশ বছরে লিখেছিলেন একটি বিপজ্জনক বই, এবং অশ্রুর মতো মিলিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে। মেরি আবার ফিরে এসেছেন, তাঁর নাম

এখন পাচ্ছে নারীবাদী সন্তের মহিমা; মার্ক্স যেমন সমাজতন্ত্রের মেরি তেমনই নারীবাদের। তাঁর সমাধিতে মৃত্যুর একশো একষট্টি বছর পর দ্বিশতজন্মবার্ষিকীতে অর্পিত হয়েছে পুষ্পার্ঘ্য।

নারীবাদের প্রথম মহান নারী মেরি ছিলেন অগ্নি ও অশ্রুর সমবায়; তাঁর জীবন ছিলো যেমন লেলিহান, তেমনই কোমলকাতর; তাঁর সমাপ্তি ঘটেছিলো বিষণ্ন আর্ত চিৎকারে। তিনি বেঁচে ছিলেন অন্যদের সময়ে, বেশি দিন বাঁচেন নি; কিন্তু তাঁর বই পড়লে, মধুর মুখচ্ছবিটির দিকে তাকালে মনে হয় মেরি বেঁচে আছেন; এবং রক্ষণশীলদের সাথে ক'রে চলছেন নিরন্তর বোঝাপড়া। ১৭৫৯-এ লন্ডনের বাইরে এপিং বনের কাছাকাছি এক গরিব চাষীপরিবারে জন্ম হয় মেরির। মেরি ছিলেন প্রথম সন্তান। তাঁর বাবা অ্যাডওয়ার্ড ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট তখন অপচয় ক'রে ক'রে নিঃস্ব, সংসারও চালাতে পারছিলো না। মেরির পরে ওই পরিবারে জন্মে আরো তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। তাঁর বাবা জীবিকার সন্ধানে সপরিবার ঘোরে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের নানা স্থানে, কিন্তু কখনো সচ্ছলতা পায় নি। তাঁর বাবা ছিলো রাগী, অত্যাচারী; মা ছিলো ভীরু। মেরি বাল্যকাল থেকেই বেড়ে ওঠেন দায়িত্বশীল মেয়েরূপে, এবং মেনে নিতে পারেন নি বাবার স্বৈরাচার। বাবা তাঁর মাকে মারতো মাঝেমাঝেই, আর মেরি মাকে বাঁচানোর জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বাবামা দুজনের মাঝখানে। মেরি বলেছেন, তাঁর বাবা ছিলো স্বৈরাচারী, মা স্বৈরাচারের স্বেচ্ছাশিকার। তাঁর মায়ের চরিত্রে প্রতিবাদের এক কণাও ছিলো না; এবং তাঁর মা মেয়েদের তুচ্ছ গণ্য ক'রে মনে করতো একদিন বড়ো ছেলেটিই উদ্ধার করবে তাকে। পরে দেখা যায় ছেলে মায়ের দিকে তাকায়ও নি, মেরিই সাহায্য করেছেন মাকে।

গরিব চাষীপরিবারের মেয়ে মেরি বেড়ে ওঠেন খামারে খামারে; মধ্যবিত্ত মেয়েদের সুবিধা যেমন পান নি তিনি, তেমনই পান নি তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো। মেরি খেলাধুলো করতেন ভাইদের সাথে, যা তাকে ভিন্নভাবে বিকশিত করেছিলো; মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের নিরর্থক 'অর্জন'গুলো তাঁকে আয়ত্ত করতে হয় নি। বাসায় লেখাপড়ার সুযোগ ছিলো না, তবু তিনি লেখাপড়া শেখেন নিজের চেষ্টায়। বাল্য থেকেই তাঁর সাধনা ছিলো স্বাধীন স্বাবলম্বী হওয়ার, মেয়েমানুষের পুরুষনির্ধারিত ভূমিকায় তিনি বন্দী থাকতে চান নি। উনিশ বছর বয়সে, ১৭৭৮-এ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন মেরি স্বাধীন জীবিকার খোঁজে, যা সে-সময় ছিলো দুঃসাধ্য। নানা পেশা গ্রহণ করেন তিনি, যার কোনোটিই খুব ভালো ছিলো না। প্রথম তিনি নেন এক ধনী বিধবার সহচরীর কাজ, বইতে শুরু করেন পরিবারের দায়িত্ব। তিনি ভার নেন ভাইবোনদের শিক্ষার, পালন করেন অভিভাবকের দায়িত্ব। ১৭৮৩তে তিনি আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের জন্যে নেন একটি বিশেষ উদ্যোগ; বান্ধবী ফ্যানি ব্লাড ও বোনদের নিয়ে লন্ডনের নিউইংটন গ্রিনে স্থাপন করেন বিদ্যালয়। তখন নিউইংটন ছিলো ডিসেন্টার, উদারনীতিক বুদ্ধিজীবী ও যাজকদের আবাসিক এলাকা; তাই সেটি ছিলো মেরির মতো স্বাধীনচেতা নারীর উপযুক্ত বাসস্থল। ওই এলাকায় বাস করতেন সংসদসংস্কারপন্থী জেমস বার্গ, বিপ্লববাদী

যাজক রিচার্ড প্রাইস। মেরি আর্থিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করছিলেন ব'লে তাঁরা সবাই উৎসাহ দিতেন মেরিকে।

মেরি বাল্যকাল থেকে বিরোধী ছিলেন পিতার স্বেচ্ছাচারিতার, নিউইংটনে উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে তিনি বিরোধী হয়ে ওঠেন সব ধরনের স্বেচ্ছাচারী শক্তির। তাঁর বিদ্যালয় সফল হয় নি; এবং নানা সংকটে জীবন ভ'রে ওঠে মেরির। নিউইংটনেই একজন তাঁকে পরামর্শ দেয় লিখে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করার, যা সে-সময়ে কোনো নারীর জন্যে ছিলো অসাধ্য পেশা। কিন্তু মেরির কাছে অসাধ্য ব'লে কিছু ছিলো না। কী নিয়ে লিখবেন তিনি? তিনি বিদ্যালয় খুলেছিলেন বালিকাদের জন্যে, তাই শিক্ষা সম্পর্কে লেখাই ছিলো তাঁর জন্যে সবচেয়ে সহজ। ১৭৮৭তে মেরি লেখেন প্রথম বই *কন্যাদের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা।* এ-বইতে তিনি প্রথার বিরুদ্ধে যান নি, খ্রিস্টানরা নারীদের জন্যে যে-ভূমিকা ও অবস্থান ঠিক ক'রে রেখেছিলো, তাই মেনে নেন তিনি; কিন্তু *ভিন্ডিকেশন*-এ আর মানেন নি। এ-বই থেকে আয় হয় দশ গিনি। তখন তাঁর নিজের অর্থাভাবের শেষ ছিলো না, তবু ওই টাকাটা তিনি দিয়ে দেন মৃত বান্ধবীর পরিবারকে, কেননা তাদের খুব দরকার। কিছুতেই আর্থস্বনির্ভরতা অর্জন করতে না পেরে ১৭৮৬তে মেরি নেন একটি হীন চাকুরি। তিনি নেন আয়ারল্যান্ডের লেডি কিংসবরোর গভর্নেসের কাজ। এখানেই পরিচিত হন তিনি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বিলাসবহুল অবসরভরপুর অকর্মণ্য জীবনের সাথে, যে-জীবনকে মেরি ঘেন্না করেছেন অন্তর থেকে। তিনি দেখেন উচ্চবিত্ত নারীদের জীবন কাটে কী অসার বিলাসের মধ্যে, কীভাবে নষ্ট হয়ে যায় তাদের চরিত্রের বিকাশ। পরে মেরি এদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় কথা বলেছেন, উদ্ধারঅযোগ্য ব'লে ঘোষণা ক'রে বিলোপ কামনা করেছেন এদের। সুখের বিষয় গভর্নেসের কাজে মেরির বেশি দিন থাকতে হয় নি।

মেরি যোগাযোগ করেন তাঁর উদারনীতিক প্রকাশক জোসেফ জনসনের সাথে, জানান নিজের পরিকল্পনা। জনসন মেরিকে ফিরে আসতে বলেন লন্ডনে; তাঁর বই প্রকাশ করবেন ব'লেও প্রতিশ্রুতি দেন। মেরি ১৭৮৭তে ফেরেন লন্ডনে; লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস : *মেরি* (১৭৮৮)। *মেরি* বেশ ভাবাবেগপূর্ণ উপন্যাস, যাতে স্থান পায় তাঁরই দুঃখকষ্টপূর্ণ জীবন। এটি এমন এক তরুণীর কাহিনী, যে প্রতিবেশের চাপ অগ্রাহ্য ক'রে করছে নানা ভালো কাজ। লন্ডনে ফিরে মেরি মুক্তি পান আয়ারল্যান্ডের অভিজাত পরিবারের অন্তঃসারশূন্যতা থেকে, এবং পান নিজেকে বিকশিত করার মতো চমৎকার মননশীল পরিবেশ। প্রকাশক জনসনের দোকানের ওপরের তলায় তখন মিলিত হতেন চিত্রকর হেনরি ফুসেলি, জোসেফ প্রিস্টলি, উইলিয়ম গডউইন, উইলিয়ম ব্লেক, টমাস পেইন প্রমুখ উদারনীতিক বুদ্ধিজীবী। মেরি পান তাঁদের সঙ্গ। তিনি নেন লেখকের জীবিকা, নিজেকে বলেন 'এক নতুন প্রজাতির প্রথম'; কেননা তখনো লেখা কোনো নারীর জীবিকা হয়ে ওঠে নি। মেরিই প্রথম নারী, যিনি লেখাকে করেন জীবিকা।

এ-অভিনব পেশা গ্রহণের পর মেরির জীবন হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ কর্মের ও লক্ষ্যের; তবে মেরি ছিলেন এমন তরুণী, যাঁর মস্তিষ্কটি ছিলো মেধাবী, হৃদয়টি রোম্যান্টিক।

তিনি মন দেন লেখায় এবং লেখায়, খুব দ্রুত লেখায়। তিনি কতোটা দ্রুত লিখতে পারতেন, তার পরিচয় বহন করছে *ভিন্ডিকেশন,* যা লিখতে আজ যে-কেউ বছরখানের সময় নেবে, তিনি নিয়েছিলেন মাত্র ছ-সপ্তাহে। রূপসী ছিলেন মেরি, কিন্তু সাজগোজ পছন্দ করতেন না; তাঁর বাসায় বিশেষ আসবাবপত্রও ছিলো না। ফরাশি নেতা ট্যালিরাঁদ তাঁর বাসায় এলে তিনি তাঁকে ভাঙা পেয়ালায় চা খেতে দিয়েছিলেন। টাকা তাঁর সহজ আয়ের জিনিশ ছিলো না, তাই অপচয়ের জিনিশও ছিলো না। মেরি লিখতে আর অনুবাদ করতে থাকেন জনসনের *অ্যানালিটিকেল রিভিউর* জন্যে, ক্রমশ বিশ্বাস অর্জন করতে থাকেন নিজের সামাজিক রাজনীতিক নান্দনিক বোধ সম্পর্কে। তিনি পুস্তক সমালোচনা লিখে লিখে তৈরি করতে থাকেন নিজের দৃঢ় ভিত্তি। তখনকার লন্ডনের রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রধান বার্ক দু-হাতে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিলেন সব বিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্তন। ফরাশি বিপ্লবের বিরুদ্ধে তিনি লেখেন *রিফ্লেকশনস অন দি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন।* মেরি এর উত্তরে লেখেন *এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্স্ অফ মেন* (১৭৯০); নারী-অধিকার প্রতিপাদনের আগে মেরি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন মানুষের অধিকার। এ-বইতে মেরি আক্রমণ করেন রক্ষণশীলতাকে, ব্যক্ত করেন মানুষ, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল বক্তব্য; দাবি করেন যে নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা মানুষের জন্মাধিকার, শুধু স্বৈরাচারই মানুষকে বঞ্চিত করে এসব অধিকার থেকে। বার্ক যাদের সেবক, সে-অভিজাতদের তিনি বলেন 'উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত নপুংসকতা দ্বারা খাসি করা পদাধিকারী উড়নচণ্ডী লম্পট'। মেরি চরম প্রতিপক্ষ ছিলেন উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত শক্তিমান ও ধনবানদের।

মানুষের অধিকার দাবির এক বছর পর, ১৭৯১-এ, মেরি দাবি করেন নারীর অধিকার; লেখেন *ভিন্ডিকেশন।* জোসেফ জনসন বইটি প্রকাশ করেন ১৭৯২-এ। প্রথম সংস্করণে মুদ্রণত্রুটি ছিলো অনেক, তাই মেরি ওই বছরই বের করেন দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ, এবং এটিই গৃহীত বইটির শুদ্ধ সংস্করণরূপে। মেরির বইটিই অকাট্য নীতিপ্রণালিভিত্তিক নারীমুক্তির প্রথম সুপরিকল্পিত প্রস্তাব, ইশতেহার, ঘোষণা; নারীবাদের আদিগ্রন্থ। বিপ্লবকে কাছে থেকে দেখার জন্যে ১৭৯২-এ মেরি যান ফ্রান্সে। এর মাঝে বেরিয়েছে বইটির ফরাশি সংস্করণ, তাই মেরি সেখানে হয়ে উঠেছেন খ্যাতিমান। তিনি সেখানে গৃহীত হন সাহিত্যিক ও রাজনীতিক লেখকদের এক আন্তর্জাতিক সংঘে, যাতে ছিলেন হেলেন মারিয়া উইলিয়ম্স্, জোয়েল বারলো, ফরাশি বিপ্লবী ব্রিসো, এবং মানুষের মুক্তির মহাপ্রবক্তা টমাস পেইন। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ফরাশি নেতা ট্যালিরাঁদের নামে, আশা করেছিলেন নারীশিক্ষা সম্পর্কে আইনপ্রণয়নে ট্যালিরাঁদ প্রভাবিত করবেন সংসদকে। তাঁর আশা পর্যবসিত হয় হতাশায়। বিপ্লবীরাও বিশ্বাস করে নারী-অধীনতায়। ব্যর্থ হয়ে যায় ফরাশি বিপ্লব, খুশি হয় বার্কেরা; তবু মেরি লেখেন *অ্যান হিস্ট্রিকেল অ্যান্ড মোরাল ভিউ অফ দি অরিজিন অ্যান্ড প্রোগ্রেস অফ দি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন* (১৭৯৪)। তিনি হতাশ হন, তবু জনগণের ওপর বিশ্বাস হারান না।

প্যারিসে মেরির পরিচয় হয় গিলবার্ট এমলের সাথে। সে মার্কিন, একটি ভাবালু উপন্যাসের লেখক, তবে ব্যবসায়ী। তার সাথে পরিচয়ই মেরির জীবনের প্রধান দুর্ঘটনা। মেরি তার প্রেমে পড়েন, কিন্তু এমলে আকর্ষণ বোধ করে মেরির দেহের প্রতি। তাঁরা তিন বছর একত্র বাস করেন, বিয়েতে বিশ্বাসহীন মেরি বিয়ে করতে চাইলেও বিয়ে তাঁদের হয় নি। তাঁদের একটি মেয়ে (মে ১৭৯৪) হয়, নাম ফ্যানি এমলে। এর পর এমলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মেরির কাছে থেকে; আর মেরি মেয়ে নিয়ে ছোটেন এমলের পেছনে পেছনে, প্যারিস থেকে লা হাভারে, লন্ডনে, আবার প্যারিসে। এমলে ছুটতে থাকে টাকা আর অন্য নারীর পেছনে। ১৭৯৫-এ মেরি মেয়ে আর একটি পরিচারিকা নিয়ে যান স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়। সেখানে পালন করেন এক অদ্ভুত দায়িত্ব, করেন এমলের ব্যবসাপ্রতিনিধির কাজ। সেখানে থাকার সময় মেরি এক কল্পিত অনুপস্থিত প্রেমিকের উদ্দেশে পত্রাকারে লেখেন জর্নাল; কয়েক মাস পরে তা বেরোয় *লেটার্স রিটেন ডিউরিং এ শর্ট রেসিডেন্স ইন সুইডেন, নরওয়ে অ্যান্ড ডেনমার্ক* (১৭৯৬) নামে। তাঁর জীবনের চরম সংকটকালে লেখা এ-চিঠিগুলো বিস্ময়করভাবে প্রশান্ত, কাব্যিক, এবং সমাজসমালোচনামুখর। লন্ডনে ফিরে মেরি দেখেন এমলে বাস করতে শুরু করেছে একটি অভিনেত্রীর সাথে। ক্লান্ত কাতর মেরির কাছে জীবন হয়ে ওঠে দুর্বহ; একরাতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন টেমস নদীতে। কিন্তু ব্যর্থ হন আত্মহত্যায়। যে-প্রেমের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন মেরি *ভিন্ডিকেশন*-এ, তার প্ররোচনায়ই নারীবাদের মহাদেবী বেছে নেন আত্মহত্যা।

কিন্তু জীবন তখনো অপেক্ষা ক'রে ছিলো তাঁর জন্যে; মৃত্যু থেকে উঠে এসে মেরি ঢোকেন জীবনে : *এনকোয়ারি কনসারনিং পলিটিকেল জাস্টিস*-এর (১৭৯৩) আলোড়নজাগানো লেখক দার্শনিক উইলিয়ম গডউইনের সাথে গ'ড়ে ওঠে তাঁর হৃদয়সম্পর্ক। গডউইনের সাথে সম্পর্কের সময়টা মেরির জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়; ওই দার্শনিক ভালোবেসেছিলেন মেরিকে, ও মেরির লেখাকে। মেরির মৃত্যুর পর তিনিই লিখেছিলেন মেরির অকপট জীবনী, ও সম্পাদনা করেছিলেন মেরির রচনাবলি। মেরি ও গডউইন কেউই বিশ্বাস করতেন না বিয়েতে; তাঁদের কাছে বিয়ে ছিলো কৃত্রিম চুক্তি, যা সৎমানুষের জন্যে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু তাঁরা, মেরি গর্ভবতী হয়ে পড়লে, বিয়ে করেন। সন্তান প্রসবের জন্যে যখন অপেক্ষা করছিলেন মেরি, তখন তিনি লিখে চলছিলেন *রংস অফ উইমেন* (১৭৯৮) নামে একটি উপন্যাস। মেরি যখন সুখী, তখনই পরিহাসের মতো এগিয়ে আসে মৃত্যু। নারীবাদের মহানারী, বিয়েতে অবিশ্বাসী কিন্তু বিবাহিত, মেরি মৃত্যু বরণ করেন নারীদেরই এক পুরোনো শাস্তিতে : সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মৃত্যু হয় মেরির ১৭৯৭-এর আগস্টে, আটত্রিশ বছর বয়সে। তিনি উপহার দিয়ে যান একটি মেয়ে, যার নাম মেরি গডউইন শেলি : পৃথিবীর বিখ্যাততম গথিক উপন্যাস *ফ্র্যাংকেনস্টাইন*-এর লেখিকা, কবি শেলির দ্বিতীয় স্ত্রী।

মেরি *ভিন্ডিকেশন* লিখেছিলেন এমন এক সময়ে, যখন পশ্চিমে চলছিলো প্রচণ্ড সামাজিক রাজনীতিক ভাঙাগড়া, যখন বিপ্লব ছিলো অধিকাংশের স্বপ্ন। ফ্রান্সে তখন

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছিলো সাধারণ মানুষের অধিকার, বিলেতে আমূলবাদীদের ভয়ে শংকিত হয়ে পড়ছিলো অভিজাততন্ত্র। ওই আমূলবাদেরই এক উৎসারণ মেরির *ভিন্ডিকেশন।* তাঁরা তখন প্রশ্ন তুলছিলেন সমস্ত প্রচলিত সামাজিক রাজনীতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে: অনুপ্রাণিত ছিলেন লক ও রুশোর মত দিয়ে যে রাজা বা অভিজাততন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী নয়, সাধারণ মানুষই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বিলেতে তখন অধিকাংশ মানুষেরই ছিলো না সাধারণ নাগরিক অধিকার, সব অধিকার ছিলো অভিজাতমণ্ডলির। সেটা টম পেইনের *রাইট্‌স্ অফ ম্যান*-এর কাল। যে-বোধ থেকে পেইন লিখেছিলেন *রাইট্‌স্ অফ ম্যান,* সে-বোধেই মেরি লিখেছিলেন *রাইট্‌স্ অফ ওম্যান।* মেরির আগেও কেউ কেউ বলেছেন নারীর ভূমিকা ও অধিকারের কথা, তবে মেরি তাঁদের মতো ক'রে বলেন নি; মেরি বলেছেন নিজের বিপ্লবী রীতিতে। তিনি কোনো পুরোনো ধারার উত্তরাধিকারী নন, তিনিই স্রষ্টা এক নতুন ধারার, যাকে এক সময় বলা হতো নারীমুক্তি আন্দোলন, এখন বলা হয় নারীবাদ। মেরি নারীর অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তুলে ধরেন সমগ্র রাজনীতিক ও সামাজিক সংশ্রয়কে, যা নারীপুরুষের জীবনের সাফল্য সম্পর্কে তৈরি করেছে দ্বৈত মানদণ্ড, নারীকে ঠেলে দিয়েছে নিকৃষ্ট অবস্থানে, করেছে পুরুষাধীন। বিলেতে তখন নারী ছিলো পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই শোচনীয় অবস্থায় : ধর্ম, সমাজ, আইন সব কিছুই নারীকে ক'রে রেখেছিলো মনুষ্যেতর। গরিব নারীদের শেষ ছিলো না দুর্দশার, আর অভিজাত নারীরা জীবন যাপন করছিলো বিলাসী পশুর জীবন। মেরির আগে যাঁরা নারীর অবস্থাবদলের কথা বলেছেন, তাঁরা কেউ নারীর মুক্তির কথা বলেন নি; তাঁরা বলেছেন পুরুষাধীন থেকে নারীর আরেকটুকু ভালো থাকার কথা। তাঁরা সবাই প্রচার করেছেন যে পুরুষের কাছে মোহনীয়, রমণীয় হওয়াই নারীর সার্থকতা। সে-সময়ে যে-নারীরা কিছুটা 'মুক্তি' পেয়েছিলেন, যাঁরা 'নীলমুজো' নামে বদনাম অর্জন করেছিলেন, তাঁরাও প্রথাগত ধারণা থেকে দূরে যান নি, তাঁরাও বিশ্বাস করতেন নারীর সহজাত নিকৃষ্টতায়।

এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্‌স্ অফ ওম্যান সুশীল ভদ্রবই বা কোনো সুশীলা ভদ্রবালার লেখা বই নয়, এটি বিপ্লবীর লেখা বিপ্লবী বই। মেরি চিত্তবিনোদন করতে বা ঘুম পাড়াতে চান নি, চেয়েছেন জাগিয়ে তুলতে। তিনি লিখতে চেয়েছেন উপকারী বই, বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য উপকারে আসা।' বইটির প্রতি অনুচ্ছেদে ছড়িয়ে আছে মেরির তীব্র ব্যক্তিত্ব, তাঁর কৌতুক ও ক্রোধ জ্ব'লে উঠেছে বার বার। মেরি নারীর অধিকারের কথা বলেছেন, তবে বলেছেন প্রধানত মধ্যবিত্ত নারীর কথা। উচ্চবিত্ত নারীদের তিনি ঘেন্না ও করুণা করতেন, বিশ্বাস করতেন যে উচ্চবিত্ত শ্রেণীটি লুপ্ত হয়ে যাবে। দারিদ্র্য তাঁর চোখে মহান ছিলো না, দারিদ্র্যের নির্মমতার সাথে খুব ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন মেরি; তাই নিম্নবিত্তদের জন্যে তাঁর দরদের অভাব না থাকলেও কীভাবে তাদের সমস্যার সমাধান হবে, তা তিনি বলেন নি। তিনি বলেছেন মধ্যবিত্ত নারীদের কথা, কেননা তারাই রয়েছে 'স্বাভাবিক অবস্থায়'। মেরি তাঁর বইয়ের শুরুতে, প্রথম তিন পরিচ্ছেদে, প্রতিষ্ঠা করেছেন মৌল নীতিগুলো, যার ওপর ভিত্তি ক'রে তিনি দাবি করেছেন নারীর অধিকার। তারপর তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রতিবেশের প্রভাবে বিকৃত

হয়েছে নারীরা; দেখিয়েছেন আঠারোশতকের নারীবিরোধী ধারার কয়েকজনের, বিশেষ ক'রে রুশোর লেখার প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ভ্রান্তি। শেষে আলোচনা করেছেন নারীর অবস্থান, শিশুশিক্ষা, পরিবার প্রভৃতি সম্পর্কে।

মেরির লক্ষ্য ছিলো সুস্পষ্ট, বইটির প্রতি পাতায় তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে নারীপুরুষের অসাম্য মানুষের তৈরি ব্যাপার। বইয়ের শুরুতে, *ভূমিকার* প্রথম বাক্যেই মেরি বলেছেন :

> ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে, এবং চারপাশের জগতের দিকে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে আমার চেতনা পীড়িত হয়েছে বেদনার্ত ক্ষোভের সবচেয়ে বিষণ্ণ আবেগে, এবং আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি একথা স্বীকার ক'রে যে হয়তো প্রকৃতিই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে বড়ো বিভেদ, নয়তো পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যে-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, তা খুবই পক্ষপাতপূর্ণ।

নারীপুরুষের প্রাকৃতিক বিভেদের কথাটা তাঁর নয়, প্রথাগতদের; তিনি বিশ্বাস করেন যে সভ্যতা একদেশদর্শী, বিভেদ মানুষেরই সৃষ্টি। তিনি বেছে নিয়েছেন মধ্যবিত্ত নারীদের, বলেছেন, 'আমি বিশেষ মনোযোগ দেবো মধ্যবিত্তদের প্রতি, কেননা তারাই সবচেয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আছে ব'লে মনে হয়।' তিনি তাঁর সময়ের নারীদের জানতেন ভালোভাবে, যারা পুরুষতন্ত্রের সমস্ত বাজে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো মন দিয়ে; তিনি চান তাদের বিপরীত দৃষ্টিকোণ দেখতে, ও ভিন্ন মানুষে পরিণত করতে। মেরি বলেছেন [ভূমিকা] :

> আমার লিঙ্গশ্রেণীয়রা, আশা করি, আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি আমি তাদের রমণীয় রূপের তোষামোদ করার বদলে তাদের গণ্য করি বুদ্ধিমান প্রাণীরূপে, এবং যদি আমি মনে না করি যে তাঁরা রয়ে গেছেন চিরশৈশবে, যাঁরা নিজেরা দাঁড়াতে পারেন না।

তাঁর লিঙ্গশ্রেণীয়রা দুর্বল সব দিকে, তিনি তাদের উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন, 'যাতে তাঁরা শরীর ও মন উভয়েরই শক্তি অর্জনের চেষ্টা করেন।' নারীর যে-অবস্থা তিনি দেখেছেন :

> একমাত্র উপায়ে নারীরা পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারে-বিয়ে ব'সে। এ-কামনা তাদের পশুতে পরিণত করে, যখন তাদের বিয়ে হয় তখন তারা এমন আচরণ করে যা শুধু শিশুদের কাছেই আশা করা যায়-তারা সাজগোজ করে, তারা রঙ মাখে।

মেরি তাঁর বইটি উৎসর্গ করেছিলেন ফরাশি রাজনীতিক নেতা ট্যালির্যাঁদের নামে। পাঁচ পাতার উৎসর্গবক্তব্যে তিনি কতকগুলো দাবি জানান, বলেন, 'আমি আমার লিঙ্গের পক্ষে দাবি করছি, নিজের জন্যে নয়।' ফরাশি বিপ্লবের বাণী ছিলো তাঁর সমস্ত চেতনা জুড়ে, তা তিনি প্রকাশ করেছেন স্পষ্ট ভাষায় [উৎসর্গ] :

> স্বাধীনতাকে আমি দীর্ঘ কাল ধ'রে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন, সব গুণের ভিত্তি ব'লে গণ্য ক'রে আসছি; আমার সব চাওয়া সংকুচিত ক'রে হ'লেও আমি নিশ্চিত করবো আমার স্বাধীনতাকে, যদি আমাকে ঊষর প্রান্তরে বাস করতে হয় তবুও।

একটি মৌলিক প্রশ্ন করেছেন মেরি : 'চরম বিচারক ক'রে কে তৈরি করেছে

পুরুষদের?' তিনি দাবি করেছেন নারীপুরুষের সাম্য, যার মূলে রয়েছে তাঁর নৈতিকবোধ ও বিশ্বাস যে পীড়ন অশুভ পীড়নকারী ও পীড়িত দুয়ের জন্যেই। তিনি বলেছেন, 'তারা সুবিধাজনক দাসী হ'তে পারে, তবে দাসত্বের বিক্রিয়া ঘটে সব সময়, তা পতিত করে প্রভুকে এবং তার শোচনীয় আশ্রিতকে।'

ভিন্ডিকেশন-এর প্রথম দু-পরিচ্ছেদের নাম 'মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব বিবেচনা' ও 'লৈঙ্গিক চরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত মতামত বিবেচনা'। মেরি এ-দু-পরিচ্ছেদে নারী ও তার ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত মত আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন সেগুলোর ভ্রান্তি, এবং বর্জন করেছেন সেগুলো। শতাব্দীপরম্পরায় সবাই বলেছে ও লিখেছে বিধাতাই নারীকে তৈরি করেছে পুরুষের থেকে হীন ক'রে, নারী সহজাতভাবেই নিকৃষ্ট; একে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন 'বাজে কথা' ব'লে। তাঁর কাছে মানুষের বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি বা যুক্তিশীলতা; তিনি স্বীকার করতে রাজি নন যে বিধাতা নারীকে মানুষ হিশেবে তৈরি ক'রে তারপর কেড়ে নিয়েছে তার বুদ্ধিবিবেচনা। মেরির মতে মানুষ ও সভ্যতার অগ্রগতির বড়ো বাধা স্বেচ্ছাচারী অবৈধ ক্ষমতা, এবং ক্ষমতাসংঘগুলো ব্যক্তি ও সমাজকে পীড়ন ক'রে দূষিত ক'রে ফেলেছে। মেরি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার চরম প্রতিপক্ষ, তিনি ঘৃণা করেন উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষমতাকে; *ভিন্ডিকেশন*-এ বার বার মেরি প্রকাশ করেছেন তাঁর ঘেন্না। তিনি বলেছেন, যে-সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্যদের ওপর আধিপত্য করে উত্তরাধিকারলব্ধ ধন ও ক্ষমতার মতো কৃত্রিম অধিকার দিয়ে, তারা হয়ে ওঠে তোষামোদপরায়ণ, অলস, অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন মেরি অভিজাততন্ত্র, সেনাবাহিনী, ও গির্জাকে, কেননা এগুলো স্বেচ্ছাচারী শক্তিসংঘ। মেরি (১৭৯২, ৯৩) বলেছেন, 'উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত মর্যাদা, ধন, রাজত্ব থেকে উৎসারিত হয়েছে' অশেষ দুর্দশা; এবং 'সব ধরনের ক্ষমতাই দুর্বল মানুষদের মাতাল ক'রে তোলে; এবং এর অপব্যবহার প্রমাণ করে যে মানুষের মাঝে যতো বেশি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজে ততো বেশি বিরাজ করবে নৈতিক উৎকর্ষ ও সুখ' (১৭৯২, ৯৬)।

মেরি রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সেনাবাহিনী, পুরোহিততন্ত্রের করেছেন প্রবল সমালোচনা, কেননা এগুলো টিকে আছে উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাচারী শক্তির ওপর ভর ক'রে। তিনি বলেছেন এসব সংস্থা যতোদিন আছে, ততোদিন অসম্ভব পরিবর্তন, তাই দরকার এসব সংস্থার বিলোপসাধন। মেরি নারীর অবস্থার একটু-আধটু উন্নতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না; নারীর অবস্থা একটু ভালো করা হ'লে, বা একদল অভিজাত নারীকে একটু ওপরে উঠোনো হ'লে সমস্যার সমাধান হবে না, তাই তিনি চেয়েছেন সার্বিক বদল। তিনি বলেছেন, সামাজিক ও আর্থ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বদল ছাড়া সমাজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটবে না। উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত ধন, ক্ষমতা সবই যুক্তি ও পরিবর্তনের প্রতিবন্ধক। সমাজের সম্পূর্ণ বদলের কথা না ব'লে শুধু নারীর অবস্থাবদলের কথা তাঁর কাছে ছিলো নিরর্থক, কেননা যে-স্বেচ্ছাচারী শক্তি পীড়ন করছে নারীকে, সে-শক্তিই আধিপত্য করছে সমাজের অধিকাংশ পুরুষের ওপর। মেরি বার বার চমৎকার আক্রমণ করেছেন উত্তরাধিকাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাকে, দেখিয়েছেন ওগুলো কীভাবে

রোধ করছে মানুষের মুক্তি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মেরি দেখিয়েছেন পুরুষতন্ত্র নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্যে কীভাবে ভিন্ন ক'রে দিয়েছে নারীদের ভূমিকা, নারীকে দিয়েছে সাফল্যের ভিন্ন আদর্শ, 'নিষ্পাপতা'র নামে রেখে দিয়েছে 'অজ্ঞানতা'র মধ্যে। নারীকে কী শিক্ষা দেয়া হয়? মেরি (১৭৯২, ১০০) বলেছেন :

> বাল্যকাল থেকেই নারীদের বলা হয়, এবং তাদের মাদের উদাহরণ দেখিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, যে পুরুষের দুর্বলতা সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান, যাকে ঠিকভাবে বলতে হয় চতুরতা, নম্র মেজাজ, দেখানো আনুগত্য, বালসুলভ শোভনতার প্রতি সতর্ক মনোযোগের সাহায্যেই তারা পাবে পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ; আর যদি রূপসী হয়, তাহলে তাদের জীবনের কমপক্ষে বিশ বছরের জন্যে আর কিছুর দরকার নেই।

এভাবেই নষ্ট ক'রে দেয়া হয়েছে নারীকে। পুরুষ নারীর মধ্যে চেয়েছে 'নম্রতা ও মধুর আবেদনময়ী সৌন্দর্য', নারীকে ক'রে রাখতে চেয়েছে 'চিরশিশু', দেয় নি তাকে বিকশিত হ'তে। নারীকে যে-শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা শুধু নিরর্থকই নয়, ক্ষতিকরও। মেরি (১৭৯২, ১০৩) বলেছেন :

> আমাকে দুর্বিনীত বলতে পারেন; তবু আমি যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তা আমাকে বলতে হবে যে রুশো থেকে ডঃ গ্রেগরি পর্যন্ত যাঁরা নারীশিক্ষা ও ভদ্রতা সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁরা সবাই নারীকে সাহায্য করেছেন আরো কৃত্রিম, দুর্বল চরিত্রের হয়ে উঠতে, এবং পরিণামে তাদের ক'রে তুলেছেন সমাজের আরো বেশি অপদার্থ সদস্য।

তিনি দেখিয়েছেন নারীদের দেয়া হয়েছে যে-শিক্ষা, তা তাদের পরিণত করেছে পুরুষের ভোগ্যবস্তুতে। নারীকে তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে দেয়া হয় নি, তাকে উ ৎসাহিত করা হয়েছে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটাতে। মস্তিষ্কহীন নারী ও সেপাইয়ের তুলনা ক'রে মেরি (১৭৯২, ১০৬) বলেছেন, 'তাদের শেখানো হয়েছে অন্যদের সন্তোষ বিধান করতে, এবং তারা বেঁচে আছে শুধু সন্তোষবিধানের জন্যে।' রুশো ছিলেন মেরির প্রিয়, কিন্তু মেরি রুশোর নারীতত্ত্ব বাতিল ক'রে দিয়েছেন যুক্তিসম্মতভাবে। রুশো শিক্ষা দিয়েছেন নারী মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে স্বাধীন ভাববে না, পুরুষের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্যে নারী হবে আবেদনময়ী ছেনাল, নারী হবে পুরুষের অবসর বিনোদনের মধুর সহচরী। মেরি (১৭৯২, ১০৮) একে বলেছেন, 'হোয়াট ননসেন্স!' নারীকে যে প্রেমের কথা বেশি ক'রে শোনানো হয়, তারও বিরুদ্ধতা করেছেন মেরি, কেননা তা নারীকে দুর্বল ক'রে তোলে। নারীকে সমাজ একরাশ বাজে শিক্ষা দিয়ে যে অদ্ভুত প্রাণীতে পরিণত করেছে, মেরি তা আলোচনা ক'রে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। পুরুষ সম্পর্কে মেরি (১৭৯২, ১২১) বলেছেন :

> পুরুষকে আমি ভালোবাসি আমার সমকক্ষ সঙ্গী হিশেবে; তবে তার রাজদণ্ড, সত্য বা আরোপিত, যেনো আমার দিকে প্রসারিত না হয়, যদি না কোনো ব্যক্তির যুক্তিবুদ্ধি দাবি করে আমার শ্রদ্ধানুগত্য, এমনকি তখনো আমার আনুগত্য হবে তার বুদ্ধির কাছে, পুরুষটির কাছে নয়।

নারী এতোদিন ধ'রে পুরুষের অধীন রয়েছে ব'লেই যে নারী পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট এটা মেরির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা সমান, তাই তারা পালন করবে একই

মানবিক দায়িত্ব। মেরি (১৭৯২, ১৩৯) বলেছেন, 'আমি মেনে নিচ্ছি যে নারীর রয়েছে ভিন্ন দায়িত্ব পালনের ভার; তবে সেগুলো হবে *মানবিক* দায়িত্ব, এবং আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে সে-সব পালনের নীতিও হবে অভিন্ন।'

ভিন্ডিকেশন-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'বিভিন্ন কারণে নারী যে-অধঃপতিত অবস্থায় পৌঁচেছে, সে-সম্পর্কে মন্তব্য'। মেরি বলেছেন, নারী প্রাকৃতিকভাবেই দুর্বল, না পরিস্থিতির প্রভাবে দুর্বল এটা স্পষ্ট; এবং তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে নারী পরিস্থিতির শিকার। মেরির মতে নারী বর্তমানকে উপভোগ করতে গিয়ে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে নষ্ট করেছে নিজেকে। মেরি মনে করেন 'নারীকে শুধু পুরুষের বিনোদেব জন্যে সৃষ্টি করা হয় নি, এবং তার লৈঙ্গিকতা নষ্ট ক'রে দেবে তার মানবিকতা, তা হ'তে পারে না।' পুরুষ নারীকে ক'রে রাখতে চেয়েছে লৈঙ্গিক প্রাণী, নারীকেও শিখিয়েছে যে লৈঙ্গিক প্রাণী হওয়াই তার জন্যে ভালো। নারীকে করতে দেয়া হয় নি বুদ্ধির চর্চা, তার প্রবৃত্তিকে ক'রে তোলা হয়েছে প্রধান। মেরি বলেছেন, বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ সূত্র তৈরি করার শক্তিই জ্ঞান, কিন্তু নারীকে দেয়া হয় নি তার সুযোগ। পুরুষ নারীকে এ-শক্তিলাভের সুযোগ তো দেয়ই নি, বরং প্রচার করেছে যে নারীর লৈঙ্গিক স্বভাবের সাথে জ্ঞান সামঞ্জস্যহীন। মেরির মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার সুযোগ না পেয়েই পতন ঘটেছে নারীর; তারা মেতে উঠেছে বা তাদের মাতিয়ে তোলা হয়েছে স্থূল ইন্দ্রিয়চর্চায়। নারীর পেশা হয়েছে বিনোদন করা, নারী 'রূপের সার্বভৌমত্ব'কে মেনে নিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে তার স্বাধীনতাকে, এবং বোধ করেছে 'হীনতার গৌরব'। নারীকে শেখানো হয়েছে তুচ্ছ সব ব্যাপারে গৌরব বোধ করতে। মেরি দেখিয়েছেন উপন্যাস, সঙ্গীত, কবিতা নারীকে ক'রে তুলেছে ইন্দ্রিয়াতুর প্রাণী; তারা সব কিছু অর্জন করতে চায় রূপ ও দুর্বলতা দিয়ে। তারা ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে, তাই সব কিছুতে নির্ভর করে পুরুষের ওপর।

ভিন্ডিকেশন-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদ 'কয়েকজন লেখক, যাঁরা নারীকে পরিণত করেছেন করুণার পাত্রে, যা প্রায় মানহানির কাছাকাছি, তাঁদের সমালোচনা'। অসামান্য, এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী, পরিচ্ছেদ এটি; এটি নারীবাদীদের অনুপ্রাণিত ক'রে চলছে দু-শো বছর ধ'রে। এটির প্রেরণায় আধুনিক নারীবাদীরা বাতিল ক'রে দিয়েছেন সাম্প্রতিক অনেক মহাপুরুষকে, যেমন মেরি বাতিল করেছিলেন রুশো ও অন্যদের। মেরি অনুরাগী ছিলেন রুশোর, বিশ্বাসী ছিলেন তাঁর রাজনীতিক আদর্শে; কিন্তু রুশোর নারীদর্শন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অত্যন্ত আপত্তিকর, কেননা তা নারীকে পুরুষাধীন রাখার দর্শন। উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে মেরি বাতিল করেছেন রুশোকে, দেখিয়েছেন রুশোর প্রতিক্রিয়াশীলতা। মেরির আলোচনার পর রুশো আর রুশো থাকেন না, হয়ে ওঠেন এক বিভ্রান্ত দার্শনিক, যাঁর নারীতত্ত্ব গ্রহণ করলে মানুষের মুক্তির কথা হয়ে ওঠে হাস্যকর প্রলাপ। মেরি দেখিয়েছেন রুশো তাঁর নিজের দর্শনের করুণ শিকার; তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন উদারনীতিক আদর্শের সাথে। মেরি বলেছেন, রুশোর যেখানে দেখা উচিত ছিলো যুক্তি দিয়ে, সেখানে তিনি দেখেছেন আবেগ দিয়ে; এবং নারীকে নষ্ট

করেছেন। নারী সম্পর্কে রুশোর তত্ত্বকে মেরি বলেছেন 'পুংস্বৈরাচার'। রুশোর আদর্শ নায়িকা সোফি মেরির কাম্য নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশো চান পুরুষনির্ভর রূপসী ছেনাল; মেরি চান স্বাধীন, চরিত্রসম্পন্ন নারী, যে আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর। রুশোর কাছে যা রমণীয়, মেরির কাছে তা অনৈতিক ও বিপজ্জনক। রুশোর আদর্শ নারী একই সাথে নির্বোধ ছেনাল ও শোচনীয় সতী। রুশো নারীকে শিখিয়েছেন স্বামী স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে অসতীও বললে নারী তার প্রতিবাদ করবে না; সে অভিযোগ মেনে নিয়ে থাকবে স্বামীর অনুগত। মেরির মতে এটা নারীকে সম্পূর্ণ নষ্ট করার কুশিক্ষা। মেরি রুশোকে যেমন বাতিল করেছেন তেমনই বাতিল করেছেন জেমস ফোরডাইস ও ডঃ গ্রেগরিকে। তখন খুব প্রভাবশালী ছিলো ফোরডাইসের *সারমনস্ টু ইয়াং উইমেন* (১৭৬৫), *দি ক্যারেক্টার অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ দি ফিমেল সেক্স* (১৭৭৬), ও গ্রেগরির *লেগ্যাসি টু হিজ ডটার*। মেরি দেখান এঁদের ভ্রান্তি। এ ছাড়া মাদাম গেনলিসের *লেটার্স অন এডুকেশন*, লর্ড চেস্টারফিল্ডের *লেটার্স*ও আলোচনা ক'রে দেখান এগুলোর অপশিক্ষা। এ-পরিচ্ছেদে মেরি পরিষ্কার করেন বিপুল আবর্জনা, যা এতোদিন চলছিলো দর্শন ও প্রাজ্ঞতার নামে।

মেরির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'চরিত্রের ওপর আবাল্যজড়িত ভাবাদর্শের প্রভাব'। মেরি প্রয়োগ করেন জন লকের মনোবিজ্ঞান, শূন্য শ্লেটতত্ত্ব, এবং দেখান নারীর চরিত্রের ওপর প্রতিবেশের প্রভাব অশেষ। রক্ষণশীলদের মতে নারী বিধির বিধানেই অধম, মেরি দেখান প্রতিবেশই নারীকে করেছে এমন। নারীর নিকৃষ্টতার মূলে নক্ষত্র নেই, তার শরীরও নেই, আছে সর্বনাশা প্রতিবেশ। বাল্যকাল থেকেই, মেরি দেখান, মাবাবা ও অভিভাবকেরা বালিকাকে শেখায় যে তাকে হ'তে হবে আদর্শ নারী; তাকে ঢালাই করা হয় শোচনীয় আদর্শ নারীর ছাঁচে। মেয়েরা দেখে তাদের সুখ নির্ভর করে তারা কতোটা পুরুষের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে, তার ওপর। সামাজিকীকরণের ফলে তারা হয়ে ওঠে শারীরিক মানসিকভাবে দুর্বল, নির্বোধ, অন্তঃসারশূন্য, মূর্খ, চতুর, রূপসচেতন, ভাবালুতাপূর্ণ, অর্থাৎ অপদার্থ। প্রথম তারা এসব শেখে মায়ের কাছে থেকে, তারপর সারা সমাজ থেকে। তিনি মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক দু-রকম শক্তি অর্জনের কথাই বলেছেন। মেরি বলেন, ঘরকন্নাও নষ্ট করে নারীদের; ঘরকন্না তাদের এমন বিপর্যস্ত করে যে তাদের পক্ষে চিন্তা করার শক্তি ও সুযোগ থাকে না। মেয়েরা কী পড়ে? মেরি বলেছেন, সুযোগ পেলে তারা ইতিহাস, দর্শন পড়ে না, পড়ে সাধারণত উপন্যাস। না পড়ার থেকে যা-কিছু পড়াই মেরির কাছে ভালো, তবে উপন্যাস পড়া তাঁর কাছে কোনো শিক্ষাই নয়। তিনি ভাবালুতাপূর্ণ উপন্যাসের কথাই বলেছেন; ওই উপন্যাস মেয়েদের উদ্ভট কল্পরাজ্যে নিয়ে যায়, বাস্তবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় না। *ভিন্ডিকেশন*-এ মেরি নারীর ভূমিকা, শিক্ষা, শিশুপালন, অর্থনীতি, কাজ, ভূমিকা-সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বিস্তৃতভাবে। অর্থনীতিটা ছিলো তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; তাঁর মতে জীবিকা অর্জনের সামর্থ্যই মানুষকে দেয় স্বাধীনতা, তাই যতোদিন নারী আর্থ স্বাধীনতা অর্জন করবে না, ততোদিন কোনো স্বাধীনতাই অর্জন করবে না। তিনি বার বার বলেছেন নারীর আর্থস্বাধীনতার কথা।

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের *ভিন্ডিকেশন* নারীমুক্তির সার্বিক প্রস্তাব; এটি থেকেই জন্ম নিয়েছে পরবর্তী বিভিন্ন ধারার নারীবাদ। তাঁর প্রস্তাব সম্পূর্ণ বিপ্লবাত্মক, এবং তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত ও রাজনীতিকভাবে তাঁর অধিকাংশ উত্তরাধিকারীর থেকে অনেক বেশি আধুনিক, ও প্রগতিশীল। তবে মৃত্যুর পর তাঁর প্রস্তাবের থেকে তাঁর প্রথাবিরোধী জীবনই সাধারণত বিষয় হয় আলোচনা ও বিতর্কের। তিনি প্রথাগত নৈতিকতা অস্বীকার ক'রে অবিবাহিত বাস করেছেন এক পুরুষের সাথে, জন্ম দিয়েছেন তথাকথিত অবৈধ সন্তান, এটাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিলো কপট রক্ষণশীলদের কাছে। মেরি সম্পূর্ণ সৎ ছিলেন, অনেক বেশি সৎ ছিলেন প্রথাগত সৎদের থেকে; এবং এখন পশ্চিম মেনে নিয়েছে মেরির জীবনরীতিকেই। উনিশশতকের নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের সাথে সন্ধি ক'রেই পেতে চেয়েছিলেন অধিকার, এবং তাঁরা মেরির মতো সার্বিক পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন নি। তাঁরা পেতে চেয়েছিলেন একটু-আধটু সুবিধা, আর ভোটাধিকার। পুরুষতন্ত্রের সাথে সন্ধিপাতানো নারীবাদীরা আচরণ করেছেন অবলা সতীসাধ্বীর মতো; যাতে পুরুষেরা রেগে উঠতে পারে, তা থেকেই সুশীলা কুলবালার মতো সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেদের। তাঁরা জোসেফিন বাটলারকে অস্বীকার করেন, যখন তিনি পতিতাদের পক্ষে কথা বলেন (১৮৬৪): তাঁরা এলিজাবেথ স্ট্যান্টনকে অস্বীকার করেন, যখন তিনি *নারীর বাইবেল* (১৮৯৫, ১৮৯৮) লেখেন; তাঁরা অ্যানি বেসান্টকে অস্বীকার করেন, যখন তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। তবে সুশীলা নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আদায় করতে পারে নি, ভোটাধিকারও নয়; তখনই পুরুষতন্ত্র নারীবাদীদের দাবি মেনেছে যখন দেখা দিয়েছেন কোনো অশীল নারীবাদী। মেরিকেও তাঁরা অস্বীকার ক'রে চলতে চেয়েছেন, তবে মেরি তাঁদের চেতনায় থেকেছেন সব সময়ই, এবং তাঁর বইটির বেরিয়েছে নানা সংস্করণ। মেরি পুরুষবিদ্বেষী ছিলেন না, পুরুষ তাঁর ছিলো খুবই পছন্দ: তিনি চেয়েছিলেন সমানাধিকার। তিনি অবাধ কামেও বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি যে-দুটি পুরুষের সাথে শারীরিকভাবে মিলেছেন, তাঁদের তিনি ভালোবেসেছিলেন। মেরি, নারীবাদের জননী, ছিলেন আদর্শ জননী; অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দুর সমবায়, যিনি আজো তীব্র, জীবন্ত, এবং প্রেরণার অশেষ উৎস।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর : প্রাণদাতা ও জীবনদাতা

মানুষের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী চক্রান্তে হিন্দু পিতৃতন্ত্র অনন্য; আর কোনো পিতৃতন্ত্রে অভিজাতশ্রেণী সমাজের অধিকাংশ মানুষকে এমন নিপুণভাবে পীড়ন ও পর্যুদস্ত করতে পারে নি। হিন্দু পিতৃতন্ত্র সমাজকে শুধু চার বর্ণে বিভক্ত করে নি, অভিজাতমণ্ডলি অনভিজাতদের ওপর শুধু নির্মম পীড়ন চালায় নি; হিন্দু পিতৃতন্ত্র পীড়িত হওয়াকে পরিণত করেছিলো নিম্নবর্ণের ধর্মে। হিন্দু পিতৃতন্ত্রে অধিকাংশ মানুষ মর্ষকামিতার শিকার, মর্ষকাম তাদের পুণ্য ধর্ম। উৎপীড়িত হওয়া মানুষের শোচনীয়তার লক্ষণ নয়, ওই উৎপীড়ন মেনে নেয়াই মানুষের শোচনীয়তার লক্ষণ; এবং মানুষকে হিন্দু পিতৃতন্ত্র এমন শোচনীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলো যে সমাজের অধিকাংশ মানুষ উৎপীড়িত হওয়াকেই ভক্তি করেছে ধর্ম ব'লে। হিন্দু পিতৃতন্ত্রে অধিকাংশ পুরুষই যেখানে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বলি, সেখানে নারীর অবস্থা যে হবে চূড়ান্ত শোচনীয়, তার অস্তিত্বই যে অস্বীকার করা হবে, তাকে যে শারীরিকভাবে পীড়ন করা হবে, তা ধ'রে নেয়া যায়; এবং হিন্দু পিতৃতন্ত্র নিষ্ঠুরতায় ছাড়িয়ে গেছে সমস্ত সীমা। অন্যান্য পিতৃতন্ত্র নারীকে মনে করেছে দাসী ও ভোগ্যসামগ্রী, আর হিন্দু পিতৃতন্ত্র নারীকে গণ্য করেছে বলির পশু; নারীকে ধারাবাহিকভাবে বলি দিয়েছে পুরুষেব যূপকাঠে। হিন্দু পিতৃতন্ত্র নারীকে সম্পত্তির অধিকার দেয় নি, পুরুষকে করেছে নারীর ঈশ্বর, পুরুষকে দিয়েছে অবাধ নারীঅপব্যবহারের অধিকার, বিধবাকে দেয় নি বিয়ের অধিকার, এবং নারীপোড়ানোকে ক'রে তুলেছে ধর্ম। হিন্দু পিতৃতন্ত্রে নারীর প্রাণের মূল্য নেই, জীবনেরও অধিকার নেই; নারী শূদ্রের থেকে শূদ্র, যদিও এ-পিতৃতন্ত্রই নারীকে কপট স্তব করেছে দেবীরূপে। বিদ্যাসাগর (১৮৫৫খ, ৮৩৯) গভীর ক্ষোভে বলেছিলেন, 'যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই....আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে'; তিনি আর্তনাদ করেছিলেন, 'হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!' নারীর জন্যে নিষ্ঠুরতম ভূভাগের নাম ভারতবর্ষ, নিষ্ঠুরতম ব্যবস্থার নাম হিন্দু পিতৃতন্ত্র।

যেখানে ধর্মহীনতা বেশি সেখানেই জন্ম নেয় ধর্মপ্রবর্তকেরা, আর যেখানে পীড়ন বেশি সেখানেই ঘটে ত্রাতাদের আবির্ভাব। নারী সবচেয়ে পীড়িত ছিলো ভারতে, তাই এখানেই প্রথম দেখা দেন নারীত্রাতারা : রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন নারীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে *সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ– প্রথম প্রস্তাব* প্রকাশ করেন ১৮১৮তে, *দ্বিতীয় প্রস্তাব* ১৮১৯-এ; এ-বিষয়ে তাঁর শেষলেখা *সহমরণ* বেরোয় ১৮২৯-এ। বিদ্যাসাগর *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা*

এতদ্বিষয়ক– প্রথম প্রস্তাব প্রকাশ করেন ১৮৫৫তে, এবং একই বছর প্রকাশ করেন *দ্বিতীয় প্রস্তাব*। পৃথিবীর আর কোথাও তাঁদের, অন্তত রামমোহনের, আগে নারীর পক্ষে কোনো পুরুষ কিছু লেখে নি, লড়াইয়ে নামে নি। বিলেতে নারীর পক্ষে প্রথম যে-পুরুষ বই লেখেন, তিনি দার্শনিক উইলিয়ম টমসন; তাঁর বই *মানবজাতির অর্ধেক, নারীদের আবেদন মানবজাতির অপর অর্ধেক, পুরুষদের দুরহঙ্কারের বিরুদ্ধে* বেরোয় ১৮২৫-এ; কিন্তু তিনি হন উপহাসের পাত্র। পশ্চিমে নারীর পক্ষে পুরুষের লেখা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বই জন স্টুয়ার্ট মিলের *নারী-অধীনতা* বেরোয় ১৮৬৯-এ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর পৃথিবীর দুই আদি নারীবাদী পুরুষ, মহাপুরুষ। তাঁরা কর্মবীর হিশেবেও অসামান্য; তাঁরা বই লিখেই থেমে যান নি, যাওয়ার উপায় ছিলো না; তাঁরা আইন প্রণয়ন করিয়ে বাস্তবায়িত করেছিলেন নিজেদের স্বপ্ন। পৃথিবীর নারীবাদের ইতিহাসে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নাম স্বর্ণলিপিতে লেখা থাকার কথা।

তবে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর নারীমুক্তি বা নারী-স্বাধীনতার কথা বলেন নি, মুক্তি বা স্বাধীনতার কথা বলা যায় সভ্য সমাজে;– যেমন বলেছেন মিল; তাঁরা নারীর জন্যে দাবি করেছেন দুটি সামান্য জিনিশ;– বেঁচে থাকা ও জীবনযাপনের অধিকার, যা তখন হিন্দু নারীদের জন্যে ছিলো মুক্তির থেকেও অনেক বড়ো। হিন্দু পিতৃতন্ত্রের নৃশংসতা সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সচেতন; বিদ্যাসাগর হিন্দু পিতৃতন্ত্রকে তীব্র ভাষায় আক্রমণও করেছেন, একে নিকৃষ্টতম বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি, এবং হাহাকার করেছেন বার বার। নারীপুরুষের সম্পর্ক যে লৈঙ্গিক রাজনীতি, তা বুঝেছেন তাঁরা দুজনেই, যদিও এর ওপর জোর দেন নি। হিন্দু পিতৃতন্ত্র নারীর ওপর বলপ্রয়োগে নির্মম, নারীর নিন্দায় মুক্তকণ্ঠ; রামমোহনের প্রবর্তকের কণ্ঠে কথা বলেছে হিন্দু পিতৃতন্ত্র। প্রবর্তক বা পিতৃতন্ত্রের অভিযোগের উত্তরে নিবর্তক বা রামমোহন (১৮১৮, ২০২) বলেছেন :

> স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে।... স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে ২ উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগের পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে।

লৈঙ্গিক রাজনীতিটি এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন রামমোহন। একগোত্র বলপ্রয়োগে আরেক গোত্রকে পরাভূত ক'রে কেড়ে নিয়েছে তার সমস্ত অধিকার, নারীর যা পাওয়ার কথা ছিলো তা তাকে না দিয়ে রটিয়ে দিয়েছে যে নারী ওসবের অযোগ্য, এ-রাজনীতি ধরা পড়েছে রামমোহনের চোখে, যদিও তাঁর পক্ষে তখন এ-রাজনীতিক লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিলো না। তাঁর রাজনীতি ছিলো বাঁচিয়ে রাখার রাজনীতি, নারীর বেঁচে থাকাই ছিলো রাজনীতি। বিদ্যাসাগরও (১৮৭১, ৮৪৩) বলেছেন :

> স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিকনিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা।

বিদ্যাসাগরের বর্ণনায়ও নারী রাজনীতিকভাবে, শারীরিক দুর্বলতাবশত, পরাভূত জাতি; যেনো পুরুষের থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, অনার্যের মতো ভিন্ন ও পরাভূত জাতি; তাই তারা 'পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ' করছে, যেমন করেছে ইংরেজের অধীনে ভারতীয়রা। পুরুষজাতি বিদ্যাসাগরের চোখে নৃশংস স্বৈরাচারী, যাদের অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ নারী মেনে নিয়েছে নিরুপায় হয়ে। দুজনেই পুরুষনারীর সম্পর্কের ভেতরে দেখেছেন রাজনীতি, লৈঙ্গিক রাজনীতি, যদিও আর এগোন নি। কেননা তাঁরা নারীমুক্তির যুদ্ধে নামেন নি, তাঁরা দাবি করেছেন নারীর জন্যে সামান্য অধিকার, যা নিশ্বাসের মতো সামান্য, জীবনযাপনের মতো সামান্য।

রামমোহন হিন্দু নারীকে দিয়েছেন প্রাণ, বিদ্যাসাগর দিয়েছেন জীবন; রামমোহনের যেখানে শেষ, বিদ্যাসাগরের সেখানে শুরু। রামমোহন চেয়েছেন শুধু বিধবার প্রাণটুকু, আর বেশি কিছু নয়; কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে ওই প্রাণটুকু যথেষ্ট নয়, নারীর জন্যে তাঁর দরকার জীবন, যা শুধু নিশ্বাসপ্রশ্বাস নয়, উপভোগের। বিধবা বেঁচে আছে, চিতার আগুনে ছাই হয়ে যায় নি, সে পেয়েছে ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার, এ-ই যথেষ্ট রামমোহনের জন্যে; তাঁর পক্ষে আর কিছু চাওয়া সম্ভব ছিলো না, হিন্দু পিতৃতন্ত্রের কাছে তা মনে হতো বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে বিধবার ব্রহ্মচর্য এক ধরনের চিতাগ্নিতে দগ্ধ হওয়াই, তা জীবন নয়, তা বাঁচা নয়। মানুষ শুধু নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে না। রামমোহন (১৮১৮, ১৭০) বারবার বলেন ও প্রমাণ করেন, 'পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না। আর আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক থাকিবেন।' তিনি চেয়েছেন শুধু বিধবার ব্রহ্মচর্যের অধিকার। ওই ব্রহ্মচর্যও অত্যন্ত নৃশংস : নারী শুধু মৃত পতির ধ্যান ক'রে ফলমূল খেয়ে ও না খেয়ে বেঁচে থাকবে; তার রক্ত থাকবে না মাংস থাকবে না, জীবন থাকবে না। তবে হিন্দু পিতৃতন্ত্রের কাছে এও ছিলো এক অনুমোদনঅযোগ্য আবদার। বিদ্যাসাগরের কাছে নিশ্বাসপ্রশ্বাস যথেষ্ট নয়, ব্রহ্মচর্যে তিনি বিশ্বাসই করতেন না; তাঁর দাবি জীবন। রামমোহনের নারী শুধু নিশ্বাসপ্রশ্বাস; বিদ্যাসাগরের নারী রক্তমাংসের সজীব মানুষ, যার একটি শরীর আছে, আর ওই শরীরের রয়েছে আগুনের থেকেও লেলিহান ক্ষুধা। বিদ্যাসাগর যখন বিধবার বিয়ের কথা বলেন, তখন বিধবার শরীরটিকে বাস্তব ও সত্য ক'রে তোলেন; নারীকে ফিরিয়ে দেন তার হারানো অস্বীকৃত শরীর। বিদ্যাসাগর (১৮৫৫খ, ৮৩৯) যখন বলেন :

তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না;... দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।

তখন বড়ো হয়ে ওঠে নারীর শরীর, শরীরই হয়ে ওঠে নারী। যার নিজের শরীরের

ওপর অধিকার নেই, তার আর কোনো অধিকার নেই। বিদ্যাসাগর একথা বুঝেছিলেন, তাই তিনি পড়েন আমূল নারীবাদীদের শ্রেণীতে, যাঁরা শুধু নারীর আর্থস্বাধীনতাকেই নয়, শরীরকেও মনে করেন গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক বই দুটিতে তিনটি শব্দ– 'বৈধব্যযন্ত্রণা', 'ব্যভিচারদোষ' ও 'ভ্রূণহত্যাপাপ'– ধ্রুবপদের মতো পুনরাবৃত্ত হয়ে মনে করিয়ে দিয়েছে নারীর শরীরকে। তাঁর বর্ণনা পড়ার সময় উনিশশতকের সমস্ত হিন্দু বালবিধবার অচরিতার্থ কাম দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এতেই প্রকাশ পেয়েছে বিদ্যাসাগরের অকপট আধুনিকতা। এ-সম্পর্কে তাঁর রচনায় পাই :

[ক] কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্যনির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকবণ হইতে পাবে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক [বিদ্যাসাগর (১৮৫৫ক. ৭০৬)]।

[খ] দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহেব প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত যে উত্তরোত্তব প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ' আপনারা অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করা, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত; অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত কবিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচাবদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত [বিদ্যাসাগর (১৮৫৫খ, ৮৩৪)]।

[গ] তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে [বিদ্যাসাগর (১৮৫৫খ, ৮৩৮)]।

[ঘ] হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা, দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদেব ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য' শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে... সম্মত নহ [বিদ্যাসাগর (১৮৫৫খ. ৮৩৮-৮৩৯)]।

বিদ্যাসাগরের রূপকগুলো লক্ষ্য করার মতো : শরীর জ্ব'লে উঠেছে লেলিহান আগুনের মতো, পাপ বয়ে চলেছে নদীস্রোতের মতো;– 'যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানল', 'ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত' প্রভৃতি রূপক চোখের সামনে নারীর অতৃপ্ত শরীরটিকে যেমন উপস্থিত করে, তেমনি হাজির করে ভারতীয় কামার্ত লম্পট পুরুষ জাতিটিকে। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন জীবন হচ্ছে

কাম, ব্রহ্মচর্য জীবন নয়। বিদ্যাসাগর 'ব্যভিচারদোষ' ও 'ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত'-এর কথা বলেছেন, এজন্যে তিনি বিধবাকে দায়ী করেন নি; বিধবাকে তিনি তাঁর সময়ের ধর্মপ্রাণ সামাজিকদের মতো একেকটি সম্ভাব্য বারাঙ্গনা মনে করেন নি, তিনি দায়ী করেছেন সমাজকেই। বিদ্যাসাগর এ-রূপকগুলো ব্যবহার ক'রে স্বীকৃতি জানিয়েছেন নারীর শরীরকে, শরীরকে ক'রে তুলেছেন জীবন; এবং এগুলো দিয়ে আক্রমণ করেছেন তাঁর সময়ের ভণ্ড সমাজকে। বিধবা একা ব্যভিচার করতে পারে না, একা জন্ম দিতে পারে না ভ্রূণ, তার জন্যে দরকার কোনো ধার্মিক পুরুষ, তিনি তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রামমোহন উদার নারীবাদী; আর বিদ্যাসাগর আমূল নারীবাদী, যিনি শরীরকে ক'রে তুলেছেন জীবন।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সহমরণ নিবারণে, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে, বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণে বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয়ের চেষ্টা করেন : শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্রকে বাতিল ক'রে প্রবর্তন করেন নববিধান। তাঁরা কি বিশ্বাস করতেন শাস্ত্রে? রামমোহন হয়তো কিছুটা করতেন. কিন্তু বিদ্যাসাগরের ওই শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিলো না বিন্দুমাত্র; কিন্তু তাঁরা জানতেন মধ্যযুগীয় এ-অঞ্চলে এটাই উপায়। যুক্তি এখানে মূল্যহীন, মূল্যবান এখানে পুরোনো শ্লোক। বিদ্যাসাগর (১৮৫৫ক, ৬৯৫-৬৯৬) বলেছেন, 'যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া. ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।' তাই তাঁরা দুজনেই ঘেঁটেছেন শাস্ত্র, শাস্ত্র থেকে নিয়েছেন সে-সব অংশ, যা তাঁদের পক্ষে। তাঁরা শাস্ত্রকে প্রমাণ হিশেবে নিয়েছেন এজন্যে নয় যে তাঁরা ওই শাস্ত্রের সাথে একমত, তাঁরা ওই শাস্ত্র নিয়েছেন কেননা ওই শাস্ত্র তাঁদের সাথে একমত। তাঁদের দুজনের জন্যে এটা ছিলো বিশেষ সুবিধাজনক; পাণ্ডিত্যে ও মেধায় তাঁরা তাঁদের প্রতিপক্ষের থেকে এতো শ্রেষ্ঠ ছিলেন যে তাঁদের পরাজিত করা ছিলো অসম্ভব। তাঁরা শাস্ত্রে বিশ্বাস করতেন না, বিশ্বাস করতেন আইনে; তাই শাস্ত্র দিয়ে তাঁরা প্রথাগ্রস্ত দেশবাসীদের কাবু ক'রে প্রবর্তন করেন আইন। তাঁরা জানতেন আইন ছাড়া অসম্ভব হবে সহমরণ নিবারণ, বা বিধবাবিবাহ প্রবর্তন; এবং এও জানতেন যদি তাঁদের দেশবাসী তাঁদের যুক্তি মেনে নেয়, কিন্তু আইন প্রণীত না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আবার দেখা দিতে পারে সহমরণপ্রথা, নিষিদ্ধ হ'তে পারে বিধবাবিবাহ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যদি উনিশশতকে ওই আইন পাশ না করাতেন, তাহলে বিশশতকে গান্ধির ভারতবর্ষে ওই আইন কখনো প্রবর্তিত হতো না; কেননা বিধবা হতো দুষ্ট রাজনীতিকদের জন্যে চমৎকার রাজনীতি। বিদ্যাসাগর (১৮৭১, ৮৮৪-৮৮৫) কেনো আইন চেয়েছেন, তা শোনার মতো :

> কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন.... বহুবিবাহ সামাজিক দোষ; সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকেব কার্য; সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া কোনও ক্রমে বিধেয় নহে।

এই আপত্তি শুনিয়া আমি, আমি কিয়ৎ হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য, এ কথা শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্ণসুখকর।...

যাঁহারা এই আপত্তি করেন, তাঁহারা নব্য সম্প্রদায়েব লোক। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ও বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা অর্বাচীনের ন্যায়, সহসা এরূপ অসার কথা মুখ হইতে বিনির্গত করেন না। হইা যথার্থ বটে, তাঁহারাও এক কালে অনেক বিষয়ে অনেক আস্ফালন কবিতেন,... কিন্তু এ সকল পঠদ্দশার ভাব। তাঁহাবা পঠদ্দশা সমাপন করিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, পঠদ্দশার ভাবের তিরোভাব হইতে লাগিল। অবশেষে, সামাজিক দোষের সংশোধন দূরে থাকুক, স্বযং সেই সমস্ত দোষে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া, সচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিতেছেন।

বাঙলা ও বাঙালি এখনো এমনই আছে; ছাত্রজীবনেই তারা প্রগতিশীল পরে প্রতিক্রিয়াশীল। বিদ্যাসাগর ও রামমোহন এদের বিশ্বাস করেন নি, বিশ্বাস করেছেন আইনে। আইনই নতুন কালের শাস্ত্র।

রামমোহন লিখেছেন *সম্বাদ,* তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেছেন পুরোনো দার্শনিক সংলাপের কাঠামোতে; বিদ্যাসাগর লিখেছেন *প্রস্তাব,* তিনি সরাসরি লড়াইয়ে নেমেছেন হিন্দু পিতৃতন্ত্রের সাথে। রামমোহনের সময় বাঙলা গদ্যের, এবং রামমোহন নিজের বাঙলা গদ্যের, যে-অবস্থা ছিলো, তাতে বিদ্যাসাগরের মতো সরাসরি তীব্র গবেষণাধর্মী প্রস্তাব লেখা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে; তাই তিনি প্রবর্তক-নিবর্তকের বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রতিপাদন করেছেন যে শাস্ত্রে রয়েছে বিধবার বেঁচে থাকার বিধান। শুধুই বেঁচে থাকা, এর বেশি নয়; বিধবা বেঁচে থেকে পালন করবে ব্রহ্মচর্য, আর কিছু নয়। রামমোহনের প্রবর্তক হচ্ছে হিন্দু পিতৃতন্ত্রের উনিশশতকী দেশাচারগ্রস্ত রূপটি, যেটি দুর্বল হয়ে পড়েছিলো সব দিকে, এবং রামমোহন তাকে করেছেন দুর্বল থেকে দুর্বলতর। রামমোহন প্রবর্তকের মুখে দিয়েছেন শাস্ত্রের পুরোনো সমস্ত কথা; নিবর্তকের মুখে দিয়েছেন শাস্ত্রের সাথে মানবতাবাদী যুক্তি, যার আক্রমণে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে প্রবর্তক। *সম্বাদ*-এর শুরুতেই রামমোহন (১৮১৮, ১৬৯) প্রবর্তকের সংলাপে পেশ করেছেন পুরোনো সংস্কার :

স্বামী মবিলে পর যে স্ত্রী ঐ পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে বাস করে।। আর যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলের দ্বারা গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয় তাহার ন্যায় বলের দ্বারা ঐ স্ত্রী স্বামীকে লইয়া তাহার সহিত সুখ ভোগ করে। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন কবে সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামিকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে। আর অন্য স্ত্রী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ইচ্ছাবতী আর স্বামীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত যে ঐ স্ত্রী সে পতির সহিত তাবৎ পর্য্যন্ত স্বর্গ ভোগ করে যাবৎ চতুর্দশ ইন্দ্রপাত না হয়। আর পতি যদি ব্রহ্মহত্যা করেন কিম্বা কৃতঘ্ন হয়েন কিম্বা মিত্রহত্যা করেন তথাপি ঐ পতিকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করে ইহা অঙ্গিরামুনি কহিয়াছেন। স্বামী মরিলে সাধ্বী স্ত্রী সকলের অগ্নি প্রবেশ ব্যতিরেকে আর অন্য ধর্ম্ম নাই।।

প্রবর্তক গ্রহণ করেছে হারীত, অঙ্গিরার মত; রামমোহন গ্রহণ করেছেন মনুর মত। রামমোহন বারবার যে-শাস্ত্রবাক্যটির হাতুড়ি পিটিয়েছেন, সেটি মনুর : 'স্ত্রীলোক

পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মোক্ষ সাধন করিবেন।' রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ভাগ্য ভালো যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পরস্পরবিরোধী বিধানের সমষ্টি; ওই পরস্পরবিরোধী বিশাল ভাণ্ডার থেকে বচন উদ্ধার ক'রে যে-কোনো কিছুকে শাস্ত্রসম্মত ব'লে প্রমাণ করা সম্ভব, অপ্রমাণও সম্ভব। রামমোহনের আশ্রয় মনু, যে-মনু নারীকে বহু তিরস্কার ক'রে একটিমাত্র কৃপা করেছিলেন : ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছিলেন [দ্র 'দেবী ও দানবী', 'পিতৃতন্ত্রের খড়ুগ']। রামমোহন স্বীকার করেছেন শাস্ত্রে সহমরণের বিধান রয়েছে, কিন্তু তিনি নির্ভর করেছেন বিকল্পবিধানের ওপর। তিনি (১৮১৯, ১৯০) শাস্ত্রবাক্যকে ব্যাকরণবিদ-যুক্তিশাস্ত্রীর মতো ভেঙে ভেঙে বের করেছেন বিকল্প বিধানটি :

> পতি ১ মরিলে ২ ব্রহ্মচর্য্য ৩ অথবা ৪ সহগমন ৫। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য বিধবার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয়।

বিধবার সহমরণও রামমোহন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন, যদি তা স্বেচ্ছাসহমরণ হয়। নিবর্তক (১৮১৮, ১৭৩) প্রশ্ন করেছে : 'তোমাদের রচিত সংকল্পবাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে।।' তিনি স্বেচ্ছাসহমরণ মেনেছেন, কেননা তিনি জানতেন অধিকাংশ নারী স্বেচ্ছাসহমরণে যায় না বা যাবে না; তাদের বাধ্য করা হয় সহমরণে। প্রবর্তক সহমরণ চায় কলঙ্ক থেকে মুক্ত থাকার জন্যে, তার কাছে নারী হচ্ছে সম্ভাব্য কলঙ্ক। প্রবর্তকের (১৮১৮, ১৭৪) মতে, 'স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহারো মনে স্ত্রীঘটিত কলঙ্কের কোনো চিন্তা হয় না।।' সম্ভাব্য কলঙ্ক থেকে বাঁচার উপায় বিধবাকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা; যেনো তারা কোনো মানুষকে পোড়ায় না, পোড়ায় কলঙ্ককে!

রামমোহন প্রথম *সম্বাদ* শেষ করেছেন সহমরণ সম্পর্কে হিন্দু পিতৃতন্ত্রের মনকে কিছুটা কোমল ক'রে; কিন্তু তার মন অতো সহজে গলার বস্তু নয়। তাই রামমোহনকে লিখতে হয় দ্বিতীয়, দীর্ঘতর, প্রস্তাব; এতে তাঁর একটিই প্রতিপাদ্য : 'ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পর, স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য করিবেন।' রামমোহন বিধবাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মেনে নিয়েছেন নিষ্কাম ধর্ম, কামনাকে গণ্য করেছেন পাপ; এমনকি স্বর্গকামনাও তাঁর কাছে পাপ। পিতৃতন্ত্র নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে নারীকে যে-কোনো স্তব করতে পারে, দেখাতে পারে যে-কোনো প্রলোভন। তিনি (১৮১৯, ১৯২) প্রশ্ন করেছেন, 'স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া এরূপ অবলা স্ত্রীবধেতে প্রবর্ত্ত হওয়াতে কি স্বার্থ দেখিয়াছেন?' আবার (১৮১৯, ১৯৪) প্রশ্ন করেছেন, 'তবে বিধবাকে স্বর্গ কামনাতে প্রলোভ কেন দেখান? মুক্তিসাধন নিষ্কাম কর্ম্মে কেন প্রবর্ত্ত না করান?' স্বর্গের প্রলোভন দেখানো যে

প্রতারণা রামমোহনের কাছে তা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। স্বর্গের প্রলোভনে নারী যদি সহমরণে না যায়, তখন হিন্দু পিতৃতন্ত্র কী করে? তখন বিধবাকে 'বন্ধনপূর্ব্বক দাহ' করে, এটা 'দেশাচারপ্রযুক্ত সৎকর্ম্ম'। রামমোহন বলেছেন, এটা দস্যুবৃত্তি। যেভাবেই হোক হিন্দু পিতৃতন্ত্রকে মুক্তি পেতে হবে বিধবার ভার থেকে, তাই তার শেষ যুক্তি হচ্ছে নারীনিন্দা [রামমোহন (১৮১৮, ২০১)] :

> স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা, এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়। স্বামীর পরলোক হইলে পর, শাস্ত্রানুসারে পুনরায় বিধবার বিবাহ হইতে পারে না, এককালে সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিরাশ হয়, অতএব এ প্রকার দুর্ভাগা যে বিধবা তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ।

রামমোহন একটি একটি ক'রে উত্তর দিয়েছেন এসবের। তাঁর উত্তরের মধ্যে ধরা পড়েছে বলতন্ত্রের পীড়নের রাজনীতিক [রামমোহন (১৮১৮, ২০২)] রূপটি :

> প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?

আধিপত্যকারী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অধীন শ্রেণীকে কোনো অধিকার, দায়িত্ব দেয় না; না দিয়ে দিয়ে তাদের ক'রে তোলে সম্পূর্ণ অযোগ্য, এবং শেষে ঘোষণা করে যে অধীনেরা সহজাতভাবেই অযোগ্য। তাদের দণ্ডিত করা হয় সে-অযোগ্যতায়, যে-যোগ্যতা তাদের অর্জন করতে দেয়া হয় নি। রামমোহন দেখিয়েছেন নারীর বুদ্ধিচর্চা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়ে তাদের নিন্দিত করা হয়েছে নির্বোধ অল্পবুদ্ধি ব'লে, তবে এটা তাদের সহজাত স্বভাব নয়; পুরুষতন্ত্রের পীড়নেরই ফল। নারী কি 'অস্থিরান্তঃকরণ'? 'বিশ্বাসের অপাত্র'? 'সানুরাগা' অর্থাৎ পরপুরুষাসক্ত? 'ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা'? তিনি দেখিয়েছেন নারীর বিরুদ্ধে এগুলো মিথ্যে অভিযোগ; আর এসব দিকে নারী পুরুষের থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। সে-উৎকৃষ্ট নারী পুরুষের দাসী (১৮১৮, ২০২-২০৩) : 'স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাতিতে করে...।' নারী এমন দাসী, যাকে উঠতে হয় প্রভুর চিতায়! তিনি স্বেচ্ছাসহমরণও মেনে নিয়েছেন, চেয়েছেন 'এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী'দের যেনো 'বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা' থেকে রক্ষা করা হয়।

রামমোহন তাঁর *সম্বাদ* লিখেছেন নৈর্ব্যক্তিক রীতিতে; কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে তাঁর সকাতর আবেগ। তাঁর প্রস্তাবগুলো অভিসন্দর্ভ হিশেবে অসামান্য, কিন্তু তিনি নারীর কথা বলতে গিয়ে কেঁপেছেন আবেগে। তিনি মুখোমুখি লড়াই করেছেন হিন্দু পিতৃতন্ত্রের সাথে, ওই পিতৃতন্ত্র তার সাথে যে-নিষ্ঠুরতা করেছে, তা তিনি ভোলেন নি। তিনি নারীকে শুধু নিশ্বাসের অধিকার নয়, দিতে চেয়েছেন জীবনের অধিকার, তাই তাঁর লড়াই ছিলো আরো রক্তাক্ত। সহমরণ

নৃশংস ব'লে তার নিবারণও সহজ, সহজেই মানুষ ও জনগণকে বোঝানো সম্ভব যে নারীকে পোড়ানো নৃশংসতা। কিন্তু যাদের সংবেদনশীলতা আদিম, তাদের বোঝানো অত্যন্ত কঠিন যে ব্রক্ষ্মচর্য পালন ক'রে বেঁচে থাকা চিতায় ছাই হওয়ার থেকেও মর্মান্তিক। নারীর আর্থ ও অন্যান্য স্বাধীনতা চাওয়ার মতো অবস্থা তখন ছিলো না, তিনি তা চান নি; চেয়েছেন জীবনযাপনের অধিকার। তিনি নারীর দেহকে মূল্য দিয়ে, নারীর দেহকে স্বীকার ক'রে হয়ে উঠেছেন একজন আমূল নারীবাদী; এবং উনিশশতকের সবচেয়ে আধুনিক মানুষ। একটি আদিম পিতৃতন্ত্রের মুখোমুখি একজন আধুনিক মানুষ দাঁড়ালে তাঁকে যে-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, তার সবখানিই ভোগ করেছেন বিদ্যাসাগর; তাঁর বুকে ক্ষোভও জেগেছে অশেষ। হিন্দু পিতৃতন্ত্র তাঁকে সহ্য করে নি; অমূল্যচরণ বসু জানিয়েছেন, 'বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার এমনকি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্বৃত্তেরা প্রভুর আজ্ঞা পালনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ মহোদয় মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রহরীরক্ষিত অট্টালিকায় বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ-প্রহারের কাল্পনিক সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর একবারে সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন' [বিনয় (১৯৭৩, ২৬৮)। এ হচ্ছে বিপন্ন পিতৃতন্ত্রের ইতর আচরণ। প্রিয় বালিকা প্রভাবতীকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেছিলেন (*প্রভাবতীসম্ভাষণ*, ৪১৯) :

> তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে অতি সুবোধের কার্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয় ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও স্বচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

বেঁচে থাকার চেয়ে ভারতে নারীর ম'রে যাওয়াও তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'সুবোধের কার্য'; বিধবাবিবাহের দ্বিতীয় প্রস্তাব-এ (১৮৫৫খ, ৮৩৯) বলেছেন, ভারতবর্ষে যেনো 'হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে', আর্তনাদ করেছেন, 'হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর।' এ-ক্ষুব্ধ বিলাপ থেকেই বোঝা যায় এ-মহৎ আমূল নারীবাদীকে কতোটা যন্ত্রণা দিয়েছিলো নির্বোধ হিন্দু পিতৃতন্ত্র।

নারীকে জীবন দেয়ার জন্যে বিদ্যাসাগর লিখেছেন 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামের একটি প্রবন্ধ, *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*– প্রথম পুস্তক (১৮৫৫), *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*– দ্বিতীয় পুস্তক (১৮৫৫), *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার*– প্রথম পুস্তক (১৮৭১), *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার*– দ্বিতীয় পুস্তক (১৮৭৩) নামের চারটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, এবং *ব্রজবিলাস* (১৮৮৪) নামের একটি বিদ্রূপাত্মক

প্রতিআক্রমণাত্মক বই। বিদ্যাসাগরের রচনাবলির এক বড়ো অংশ নারীকল্যাণমূলক রচনা, এবং ওগুলো মানবিকতা, পাণ্ডিত্য, ও যুক্তিতে অসাধারণ। শাস্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু শাস্ত্র দিয়েই তাঁকে প্রমাণ করতে হয়েছিলো যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী। আধুনিক কালের এক বড়োট্র্যাজেডি হচ্ছে একে চলতে হয় পুরোনো কালের বিধান দিয়ে, কেননা তা 'স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ', এবং বিদ্যাসাগরকে তা ঘেঁটে দেখাতে হয় বর্তমানকালসম্মত বিধান, যদিও তাতে তাঁর বিশ্বাস নেই, ও তিনি নিজেই লিখতে পারতেন ওই সব পুরোনো বস্তুর থেকে অনেক উৎকৃষ্ট শাস্ত্র। নারীকে জীবন দেয়ার জন্যে তিনি শুরু করেছেন শেকড় থেকে– বাল্যবিবাহ থেকে; কেননা বাল্যবিবাহই বালবিধবা উৎপাদনের প্রধান ব্যবস্থা। তাঁর মতে, 'অল্প বয়সে যে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম' ('বাল্যবিবাহের দোষ', ৬৮৫); 'বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার' (ওই, ৬৮৪)। বিধবাকে তিনি জনশূন্য বনবাস থেকে মুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন মানবিক সংসারে।

বিদ্যাসাগর শাস্ত্র মেনেছেন, কেননা লোকে শাস্ত্র মানে, এবং তিনি শাস্ত্রে পেয়েছেন তাঁর প্রস্তাবের সমর্থন। যদি তিনি সমর্থন না পেতেন শাস্ত্রে, তাহলে কী করতেন বিদ্যাসাগর? তিনি কি শাস্ত্রকেই শেষ কথা ব'লে মানতেন? না, তিনি বাতিল ক'রে দিতেন শাস্ত্রকে; হয়তো দেখাতেন ওই সব শাস্ত্রের কাল শেষ কয়ে গেছে, ওই সব শাস্ত্র কলিকালের জন্যে নয়। শাস্ত্র কী? বিদ্যাসাগর প্রথমে দেখান শাস্ত্র হচ্ছে ধর্মশাস্ত্র; আর মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রমুখ ধর্মশাস্ত্রকর্তা। এর মাঝে উনিশটিকে বাতিল ক'রে বিদ্যাসাগর রেখেছেন একটিকে, কেননা সেটি তাঁকে সমর্থন করে; যদি সমর্থন না করতো তাহলে সেটিকেও বাতিল করতেন তিনি। তিনি স্বীকার করেছেন *পরাশরসংহিতা*কে। মনু বলেছেন, 'কলিযুগের ধর্ম অন্য', আর *পরাশরসংহিতার* প্রথম অধ্যায়ে আছে : 'পরাশরনিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম।' পরাশর বলেছেন ব'লেই বিদ্যাসাগর তাঁকে মেনেছেন, তা নয়; তিনি পরাশরকে স্বীকার করেছেন, কেননা তাতে রয়েছে বিধবার বিয়ের বিধান। তাই তিনি অন্য সব শাস্ত্র বাতিল ক'রে বলেছেন, 'কলিযুগের লোক পূর্ব পূর্ব যগের ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে অক্ষম' (১৮৫৫ক, ৬৯৭); স্থির করেছেন : 'পরাশরসংহিতা কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র' (১৮৫৫ক, ৬৯৯)। বাতিল অন্য সব শাস্ত্র। পরাশর বলেছেন [বিদ্যাসাগর (১৮৫৫ক, ৭০০)] :

> স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে সার্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসম কাল স্বর্গে বাস করে।

স্বর্গলাভের কোনো মোহ তাঁর ছিলো না, নারী বিয়ে করতে পারলে স্বর্গের কোনো

দরকার বোধ করবে ব'লেও তাঁর মনে হয় নি। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে 'রাজকীয় আদেশক্রমে, সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে।' পরাশরের বিধানের বিদ্যাসাগর (১৮৫৫ক, ৭০০) দিয়েছেন এ-ভাষ্যে :

> পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, সহগমন। তন্মধ্যে, রাজকীয় আদেশক্রমে, সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। বিধবাদিগের দুই মাত্র পথ আছে বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য; ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য করিবেক। কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন।

পরাশর প্রথমেই দিয়েছেন বিয়ের বিধি। প্রশ্ন জাগে রামমোহন কেনো খুঁজে পান নি পরাশরের এ-বিধিটি, তাঁকে কেনো সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিলো মনুর বিধি নিয়েই যে বিধবা ব্রহ্মচর্য পালন করবে বা সহমরণে যাবে? রামমোহন কি পেয়েও এড়িয়ে গিয়েছিলেন বিধিটিকে? তিনি কি. ১৮১৮তে, মনে করেছিলেন যে প্রাণই যথেষ্ট নারীর জন্যে, ব্রহ্মচর্যই নারীর জীবন? রামমোহন কি মনে করেছিলেন বিধবার জন্যে প্রাণের বেশি কিছু চাইতে গেলে পণ্ড হবে সব কিছু, বা তিনি নিজেও বিশ্বাস করতেন যে বিধবার বিয়ে হওয়া ঠিক নয়? কিন্তু আটত্রিশ বছরেই দেখা যায় প্রাণই যথেষ্ট নয়-'কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।' যে-বিধবা ছিলো সামান্য নিশ্বাস, মাত্র আটত্রিশ বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগর দাবি করেন যে তার রয়েছে একটি শরীর, তার রয়েছে কামনাবাসনা, আর ওই শরীরে রিপুরা অন্যান্য শরীরের মতোই সক্রিয়। বিধবাদের বৈধব্যযন্ত্রণা ছাড়াও ছিলো আর্থনিরাপত্তাহীনতার সমস্যা; তাদের অধিকাংশের জীবনই ছিলো অবহেলিত দাসীর জীবন। বিদ্যাসাগর সে-সব প্রসঙ্গ তোলেন নি, মনে করেছেন বিয়ে হ'লে ওগুলো মিটবে। বিধবাকে বিয়ে দিয়ে তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সম্পূর্ণরূপে; তাই তাদের ও সন্তানদের কী মর্যাদা হবে, তাও দেখিয়েছেন শাস্ত্র ঘেঁটে। তাঁর চোখে কুমারী ও বিধবার কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু হিন্দু পিতৃতন্ত্র কেনো মেনে নেবে এ-মানবিকতা? তার পাণ্ডারা কি কোলাহল করবে না? মেতে উঠবে না শাস্ত্রের শুদ্ধ-অশুদ্ধ ব্যাখ্যায়? তারা মেতে ওঠে; এবং তাঁকে লিখতে হয় দীর্ঘ দ্বিতীয় পুস্তক, যাতে প্রতিপাদ্য একই, কিন্তু শ্লোক আর যুক্তি অনেক বেশি। কিন্তু তিনি জানতেন শুধু শ্লোকে কাজ হবে না, আইন পাশ করাতে হবে। তা তিনি করিয়েছিলেন, বিধবাবিবাহের আইন পাশ হয় ১৬ জুলাই ১৮৫৬তে।

নারীকে সংসারে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুপরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যাসাগর কাজ শুরু করেছিলেন; তাই বিধবাবিবাহ প্রচলনের পর তাঁর কাজ হয় বহুবিবাহ রহিত করা। এ-লড়াইয়ে নামতে হয়েছে বিদ্যাসাগরকে, কেননা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হ'লে তাঁর নারী পুরুষতন্ত্রের পীড়ন থেকে বাঁচে না। বহুবিবাহ বিষয়ক তাঁর বই দুটি আকারে অনেক বড়ো, গবেষণা হিশেবে অসামান্য; এবং এ-দুটিতে তিনি হিন্দু কুলবিন্যাস ও পুরুষের কুৎসিত রূপ তুলে ধরেছেন বিস্তৃতভাবে। তিনি বিয়ে দিয়েছেন বিধবাকে, কিন্তু ওই বিয়ে

জিনিশটি কী? বিয়ে হচ্ছে নারীর জন্যে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হওয়া; তিনি বলেছেন, 'এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও সমাজে বহুবিধ অনিষ্ট হইতেছে' (১৮৭১, বিজ্ঞাপন]। বহুবিবাহ নিষেধেও তিনি শাস্ত্রকেই নিয়েছেন প্রমাণ হিশেবে, কিন্তু তিনি শাস্ত্রের শেষে চেয়েছেন আইন। বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকে তিনি প্রমাণ করেছেন : 'স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, নির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় সবর্ণাবিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে' (১৮৭১, ৮৪৭)। তিনি দেখান যে 'বল্লাল গুণ দেখিয়া কুলমর্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; দেবীবর দোষ দেখিয়া কুলমর্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছেন' (১৮৭১, ৮৫৮)। দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষের তালিকা ক'রে যে-কুলবিন্যাস করেন, তাকে বলা হয় 'মেলবন্ধন', এবং এরই ফলে দেখা দেয় বহুবিবাহ। আগে অনেক বেশি ঘরে নারীদের বিয়ে দেয়া যেতো, কিন্তু মেলবন্ধনের ফলে বিয়ে দেয়ার মতো ঘরের সংখ্যা ক'মে যায়। কিন্তু নারীদের বিয়ে দিতেই হবে; তাই দেখা দেয় বহুবিবাহ। কুল কোনো ঐশ্বরিক ব্যাপার নয়; তিনি দেখিয়েছেন, 'কুলীনমহাশয়েরা যে কুলের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন, তাহা বিধাতার সৃষ্টি নহে' (১৮৭১, ৮৬২), নিতান্তই দেবীবর ঘটকের সৃষ্টি। বিদ্যাসাগর বলেছেন, 'যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লাল সেন ও দেবীবর ঘটকবিশারদ নিঃসন্দেহে নরকগামী হইয়াছেন' (১৮৭১, ৮৬৮)। বিদ্যাসাগর দিয়েছেন কুলীনদের অমানুষিক বর্বরতার পরিচয়; বলেছেন, 'এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই' (১৮৭১, ৮৬৯)। তাঁর এ-পুস্তক হিন্দু পিতৃতন্ত্রের পুরোহিতদের উত্তেজিত করে, তাঁরা শাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিদ্যাসাগরের ওপর। তখন তিনি লেখেন দ্বিতীয় প্রস্তক; একে একে তর্কবাচস্পতিপ্রকরণ, ন্যায়রত্নপ্রকরণ, স্মৃতিরত্নপ্রকরণ, সামশ্রমিপ্রকরণ, কবিরত্নপ্রকরণ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে খণ্ডন করেন পিতৃতন্ত্ররত্নদের শ্লোক ও যুক্তি। কিন্তু তিনি বহুবিবাহ রহিত করতে পারেন নি।

রামমোহন হিন্দু বিধবার প্রাণদাতা, বিদ্যাসাগর জীবনদাতা; তবে প্রাণ দেয়ার চেয়ে জীবন দেয়া অনেক কঠিন। বিধবাকে এখন আর চিতায় উঠতে হয় না, যদিও ভারতে আবার সহমরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে; কিন্তু হিন্দু বিধবা আজো জীবনে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা পায় নি। এখনো বিধবার বিয়ের কথায় হিন্দু পিতৃতন্ত্র বিচলিত হয়ে ওঠে; এমনকি বিধবারাও কেঁপে ওঠে নরকের ভয়ে। প্রথাবাদের ভারতীয় অঞ্চলে জীবনের থেকেও শক্তিশালী প্রথা।

পুরুষতন্ত্র ও রোকেয়ার নারীবাদ

রোকেয়া এখন বাঙালি মুসলমান পিতৃতন্ত্রের কাছে এক মহীয়সী, তিনি আজ অলঙ্কৃত করছেন পুণ্যময়ীদের পংক্তি;– কোনো প্রথাগত নারীর জন্যে এটা পরম প্রাপ্তি, কিন্তু রোকেয়ার জন্যে এটা খুবই শোচনীয় স্বীকৃতি। ভারতীয় ভূভাগের এক বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে বিদ্রোহীদের মূলেই উপড়ে ফেলা হয় বা চেষ্ট করা হয় উপড়ে ফেলার, তবে তা সম্ভব না হ'লে তাঁদের নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়া হয় প্রথার ভেতর বিন্যস্ত ক'রে। বিদ্রোহীরা হয়ে ওঠেন প্রথাগত। রোকেয়াকেও তাই করা হয়েছে; রোকেয়া হয়ে উঠেছেন এক মহীয়সী পুণ্যময়ী সতী নারী, বা একজন মুসলমান ভদ্রমহিলা। এভাবে চূড়ান্তরূপে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়া হয়েছে রোকেয়াকে। তাঁর নামটিই এর ভালো পরিচয় দেয়। পুরুষেরা ও তাঁর ভক্ত প্রথাগ্রস্ত নারীরা তাঁকে বিখ্যাত ক'রে তুলেছেন 'বেগম রোকেয়া' নামে, যদিও তাঁর নামে কখনো 'বেগম' ছিলো না। তাঁর নাম ছিলো রোকেয়া বা রুকাইয়া খাতুন; তবে তিনি নিজেও মেনে নিয়েছিলেন পশ্চিমি পুরুষতান্ত্রিক নাম 'আর এস হোসেন' বা 'রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন'। তাঁর জন্মের সালতারিখকেও অনেকটা কিংবদন্তি মনে হয়;-অনেকে শুধু ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিলো ব'লে জানান, জন্মের তারিখ উল্লেখ করেন না; আবার কেউ কেউ বলেন তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৮৮০ সালের ডিসেম্বরের ৯ তারিখে, এবং পুণ্যবানদের মতো তাঁর মৃত্যুও হয়েছিলো ডিসেম্বরের ৯ তারিখেই (১৯৩২)। হয়তো তাঁর জন্মের আসল তারিখটি লুপ্তই হয়ে গেছে। তাঁর জীবনকাহিনীও জানা যায় সামান্য; তবে তার ভেতরেও চোখে পড়ে রোকেয়া নামের অগ্নিশিখাটি।

পিতৃতান্ত্রিক, দুশ্চরিত্র, অপব্যয়ী, জমিদার পিতার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিলো। বেড়েছেন তিনি অন্ধকার অবরোধের মধ্যে, যেখানে মেয়েদের পড়াশুনো ছিলো নিষিদ্ধ। তবে বড়ো ভাইয়ের কাছে গোপনে শিখেছেন বাঙলা ও ইংরেজি, এবং শিখেছেন অত্যন্ত ভালোভাবে নিজেরই সহজাত প্রতিভায়। কেউ কেউ মনে করেন রোকেয়া বিয়ের পরে স্বামীর কাছে ভালোভাবে শিখেছিলেন ইংরেজি; এটাও এক পুরুষতান্ত্রিক বিশ্বাস। তাঁদের কাছে নারীর ইংরেজি শেখা বিস্ময়কর ব্যাপার, বাঙলা নিজে নিজেই শেখা সম্ভব; ইংরেজি শিখতে হ'লে দরকার একটি উদার শিক্ষিত স্বামী! যদি ধরি যে রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিলো আঠারো বা ষোলো বছর বয়সে, তাহলে স্বামীর কাছে ইংরেজি শেখার তত্ত্বটি বাতিল ক'রে দিতে হয়; কেননা ওই বয়সের পর একটি বিদেশি ভাষা শেখা এবং তাতে *Sultana's Dream* লেখা ভাষাঅর্জন সম্পর্কে ভুল ধারণামাত্র। তাঁর বিয়ে হয় কারো মতে ষোলো, কারো মতে আঠারো বছর বয়সে। বেশ বড়ো পরিহাস ব'লে মনে হয় রোকেয়ার বিয়েটিকে : বাঙালি নারীমুক্তির সন্তের বিয়ে

হয় এক দোজবর, অবাঙালি, বিহারির সাথে। তাঁর স্বামীটি যে-বছর, ১৮৮০তে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন, সে-বছর জন্ম হয় তাঁর; তিনি স্ত্রী হন পিতার বয়স্ক এক পুরুষের। সাখাওয়াতের বয়স তখন ছিলো ৩৮ বা ৪২, রোকেয়ার ছিলো ১৬ বা ১৮। ওটি ছিলো বিয়ের জন্যে বিয়ে; বিয়ের সময়ই সবাই জানতো যে দীর্ঘ বৈধব্য পালনই হবে রোকেয়ার বিবাহিত জীবন। মুসলমান পিতৃতন্ত্র রোকেয়ার জীবনকে মর্মস্পর্শী ক'রে তুলতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নি; তাঁকে ধ্বংস ক'রে দিতে পারলেই সেটি সার্থকতা বোধ করতো, কিন্তু পারে নি।

রোকেয়ার পিতা অমানুষ ছিলেন, কিন্তু বড়ো ভাই ও তাঁর স্বামীটি ভিন্ন ছিলেন ওই সময়ের মুসলমান পুরুষদের থেকে। রোকেয়ার সমগ্র রচনবলি ভ'রে রয়েছে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ও ঘৃণা; 'পুরুষ' ধারণাটিই ছিলো তাঁর কাছে আপত্তিকর। পুরুষদের তিনি যে সামান্য করুণা করেছেন, তা সম্ভবত ভাই ও স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে। রোকেয়ার রচনাবলির প্রধান বৈশিষ্ট্য পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; পশ্চিমের প্রথম নারীবাদী মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্টের মধ্যেও এতোখানি পুরুষবিদ্বেষ ও দ্রোহিতা দেখা যায় না। মেরি পুরুষকে সমকক্ষ বন্ধু হিশেবে মেনে নিয়েছিলেন রোকেয়া তাও মানতে রাজি হন নি। মেরিব সাথে রোকেয়ার জীবনের মিল ও অমিল দু-ই চোখে পড়ে। মেরি ছিলেন গরিব পরিবারের মেয়ে, লেখাপড়া শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়, বালিকা বিদ্যালয় খুলেছিলেন, বই লিখেছিলেন বালিকাদের শিক্ষা সম্পর্কে। তিনি বিয়ে না ক'রে বাস করেছেন প্রেমিকের সাথে, জন্ম দিয়েছেন অপ্রথাগত কন্যা; প্রতারিত হয়েছেন, তারপর আবার প্রেমে প'ড়ে গর্ভবতী হয়েছেন, এবং কন্যা জন্ম দিতে গিয়ে লোকান্তরিত হয়েছেন মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে। মেলামশার সুযোগ পেয়েছেন মেরি ওই সময়ের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সাথে। রোকেয়া জন্মেছেন ধনী পরিবারে, বাল্য কেটেছে অবরোধে, বিয়ে হয়েছে পিতার বয়সী পুরুষের সাথে, জন্ম দিয়েছেন দুটি অকালমৃত কন্যা। তাঁর বিবাহিত জীবন এগারো বা তেরো বছরের। মেরি শারীরিক সম্পর্কে এসেছেন দুটি পুরুষের সাথে, এবং সংস্পর্শে এসেছেন বহু পুরুষের; রোকেয়া শারীরিকভাবে জেনেছেন একটি পুরুষকে, সে-জানাও ছিলো সম্ভবত অতৃপ্তিকর; আর সংস্পর্শে আসেন নি কোনো পুরুষের। রোকেয়ার সমাজের পুরুষ তাঁর কাছে ছিলো পশুর সমান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পুরুষপ্রসঙ্গ তোলেনই নি : পিতাকে তিনি প্রায় পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন, স্বামী ও ভাইদের স্বীকার করেছেন অনেকটা করুণা ক'রে।

নিজের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে নীরবতাই ছিলো তাঁর স্বভাব, কিন্তু ইঙ্গিতেই তিনি জানাতে পারতেন প্রচুর। ৩০ ৪ ৩১-এর এক চিঠিতে লিখেছিলেন : 'শৈশবে বাপের আদর পাই নি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ Urine পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলুম-তাদেরও প্রাণভরে কোলে নিতে পারি নি। একজন ৫ মাস বয়সে, অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুড়ছি' [দ্র মোশফেকা (১৯৬৫, ১৫)]। এ হচ্ছে রোকেয়ার সমগ্র আত্মজীবনী, কয়েক পংক্তিতে লেখা কয়েক খণ্ড। এতে জীবনের

প্রথাগত ব্যর্থতার ছবিটি যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনই এর একটি পংক্তি সাংঘাতিক : 'আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুড়ছি।' বৈধব্যের কথা এলেই কেনো আসে আগুনের রূপক, দাউ দাউ ক'রে ওঠে কেনো দেহবহ্নুৎসব? বিদ্যাসাগর বালিকা বিধবার 'অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে'র কথা বার বার বলেছেন, রোকেয়া বলেছেন নিজেরই কথা। শরীরকে তিনি সম্পূর্ণ চেপে গেছেন কাজে ও লেখায়, পালন ক'রে গেছেন মুসলমান ব্রহ্মচর্য। মুসলমান পুরুষেরা যে তাঁকে ধন্যধন্য ক'রে, তার অনেকটা তাঁর ওই মর্ষকামী ব্রহ্মচর্যের জন্যে। তিনি বলেছেন, 'আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন' ('রানী ভিখারিণী', *রোর,* ২৯১); *পদ্মরাগ*-এ (*রোর,* ৪৬২) বলেছেন, 'সিদ্দিকা নিজেকে 'চিরকুমারী' জ্ঞান করিবেন না, কারণ চিরকুমারী নিঃস্ব;...তিনি নিজেকে বিধবা মনে করিবেন, যেহেতু বিধবার স্বামী-স্মৃতিরূপ বহুমূল্য সম্পদ থাকে। পতিধ্যান তাহার জীবনের নিত্যসহচর। তাহা না হইলে বিধবা বাঁচিবে কি লইয়া?' এ হচ্ছে পুরুষতন্ত্রকে মেনে নিয়ে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

তবে রোকেয়া নিজে পতিধ্যান করেন নি। ২৫ ৪ ৩২-এর এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : 'আপনি ঘুণাক্ষরেও ভাববেন না যে, আমার শ্রদ্ধেয় স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্যই আমি এ স্কুল আঁকড়ে পড়ে আছি।... আমি আমার স্বামীর নামের কাঙ্গাল নই' [মোশফেকা (১৯৬৫,২৪-২৫)]। তিনি বিদ্যালয়ের নামবদলের জন্যেও প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাঁর পুরুষ অভিভাবকেরা তাতে রাজি ছিলেন না; কেননা তাঁরা 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল' নামটিতে দেখতেন পুরুষতন্ত্রের জয়;— একটি নারী বালিকাদের শিক্ষা দেয়ার ছলে পুজো ক'রে চলছেন একটি মৃত পুরুষকে! নারীকে মুক্তি চাইতে হবে পুরুষাধিপত্য মেনে নিয়ে; পুরুষের লাশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ জীবিত নারীর থেকে। রোকেয়া দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি, বিয়ে তাঁর কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো না; তবে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো পুরুষতন্ত্রের কাছে। রোকেয়া যদি আবার বিয়ে করতেন, তাহলে পুরুষতন্ত্র তাঁকে বাতিল ক'রে দিতো; নারীমুক্তির কথা ভুলে তাঁকে থাকতে বাধ্য করতো স্বামীর পদতলে। রোকেয়া ছিলেন আমূল নারীবাদী, কিন্তু তিনি জানতেন তিনি পৃথিবীর এক বর্বর পিতৃতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত; তাঁকে বিদ্রোহ করতে হবে ওই বর্বরতাকে স্বীকার ক'রেই। ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের জীবন এ-সমাজে অকল্পনীয়। রোকেয়া নিজের মধ্যে সংহত করেছিলেন প্রবল দ্রোহিতা ও মর্ষকামিতাকে, পুরুষতন্ত্রকে আক্রমণ ও পরাভূত করার জন্যে তাঁকে সুখের সাথে সহ্য করতে হয়েছে পুরুষতন্ত্রের পীড়ন। কিন্তু তিনি পুরুষতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে নিরন্তর লড়াই ক'রে গেছেন; তাঁর রচনাবলি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ধারাবাহিক মহাযুদ্ধ।

রোকেয়া লিখেছেন প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস; এবং প্রতিটি আঙ্গিক তিনি ব্যবহার করেছেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্ররূপে। তাঁর প্রবন্ধ বিশুদ্ধ মননশীল প্রবন্ধ নয়, তাতে রয়েছে কথাশিল্পিতার ছাপ; আবার তাঁর উপন্যাসও পুরোপুরি উপন্যাস নয়, তাতে রয়েছে প্রাবন্ধিকতার ছাপ। বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য ছিলো না; তাঁর লক্ষ্য ছিলো পৌনপুনিক আক্রমণে পুরুষতন্ত্রকে দুর্বল ক'রে নারীকে সমাজে জীবনে প্রতিষ্ঠিত

করা। চেতনায় তিনি এগিয়ে ছিলেন তাঁর সময়ের মুসলমান ও হিন্দু সমস্ত পুরুষ, নারী ও মহাপুরুষদের থেকে; তাঁর ছিলো সরাসরি মতপ্রকাশের চমৎকার স্বভাব, এবং ছিলো প্রখর পরিহাসের শক্তি। স্বামীর মৃত্যুর আগের রোকেয়ার লেখায় দেখা যায় আক্রমণাত্মক প্রবণতা, একাকী জীবনে তাঁর লেখায় বড়ো হয়ে ওঠে পরিহাস, তীক্ষ্ণ উইট, যা তাঁর অন্তর্গত বিষণ্নতার প্রকাশ। তিনটি ভাষা–বাঙলা, উর্দু, ইংরেজি–ছিলো তাঁর আয়ত্তে, তাঁর হাতের লেখা ছিলো পুষ্পপাপড়ির মতো মনোহর; অনুরাগী ছিলেন তিনি প্রথাগত কবিতার, তিনি নিজেই ছিলেন ভালো কবি; এবং মননশীলতায় ছিলেন সে-সময়ের শ্রেষ্ঠদের একজন। উপন্যাস রচনায় ছিলেন তিনি বঙ্কিমানুসারী, তাঁর *পদ্মরাগ*-এর প্লট বঙ্কিমী রীতিতে তৈরি। তিনি কি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের নাম শুনেছিলেন, তাঁর বইটি দেখেছিলেন? এর কোনো প্রমাণ তিনি রেখে যান নি, তবে মনে হয় মেরির বই তিনি দেখেন নি; দেখলে রোকেয়া 'স্ত্রীজাতির অবনতি' নামে প্রবন্ধ না লিখে লিখতেন সুপরিকল্পিত পূর্ণাঙ্গ বই। তিনি ইংরেজিতে একটি চমৎকার ইউটোপিয়া লিখেছিলেন, এবং বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন; আজো সেটিই বাঙলায় লেখা একমাত্র ইউটোপিয়া। ইউটোপিয়া ও অ্যান্টি-ইউটোপিয়া বা ডিস্টোপিয়া তাঁর চেতনায় বড়ো স্থান ক'রে নিয়েছিলো; কেননা তিনি যে-সমাজে বাস করতেন সেটিই ছিলো এক মূর্ত অ্যান্টি-ইউটোপিয়া, এবং তিনি পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ওই সমাজকে। শুধু 'সুলতানার স্বপ্ন' নয়, তাঁর *পদ্মরাগ*ও একধরনের ইউটোপিয়া, আর তাঁর কয়েকটি রূপকথা– 'জ্ঞানফল', 'সৃষ্টিতত্ত্ব', 'নারীসৃষ্টি', 'মুক্তিফল' ইউটোপিয়া ও অ্যান্টি-ইউটোপিয়ার মিশ্রণ।

রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে চালিয়েছিলেন সার্বিক আক্রমণ। তিনি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছেন পুরুষতন্ত্রের তৈরি নারী ও পুরুষের ভাবমূর্তি, বর্জন করেছেন নারীপুরুষের প্রথাগত ভূমিকা; তুলনাহীনভাবে আক্রমণ করেছেন পুরুষতন্ত্রের বলপ্রয়োগসংস্থা ধর্মকে। রোকেয়া পরে ধর্মের সাথে কিছুটা সন্ধি করেছেন আত্মরক্ষার জন্যে; নইলে তাঁকে ও তাঁর আদর্শকে অত্যন্ত বিপন্ন ক'রে তুলতো মুসলমান পিতৃতন্ত্র। তিনি এমন এক পিতৃতন্ত্রের সদস্য ছিলেন, যেখানে পুত্র মাকে শেখায় সতীত্ব। তাঁর ভাগনে আবদুল করিম গজনভি, বাল্যকালেই বিলেতে গিয়েছিলেন, মন্ত্রী আর স্যার হয়েছিলেন, কিন্তু মধ্যযুগ থেকে বেরোতে পারেন নি; তিনি খালা রোকেয়াকে পর্দা শেখাতে দ্বিধা করেন নি। খালাকে শর্ত দিয়েছিলেন যদি খালা পর্দা মানেন (এর অর্থ রোকেয়ার আচরণ পর্দাসম্মত ছিলো না বিলেতফেরত স্যার-ভাগনের মতে), তবে তিনি রোকেয়ার স্কুলটি সরকারি ক'রে দেবেন। পুত্র যেখানে মাকে সতীত্ব শেখায়, সে-উৎকট ভূখণ্ডে রোকেয়া ধর্মের নামে মাঝেমধ্যে দু-একটি বই উৎসর্গ ক'রে নিস্তেজ ক'রে দিতে চেয়েছেন ধর্মকে। ১৯০৪-এ বেরোয় রোকেয়ার মূর্তিভাঙা প্রবন্ধ 'আমাদের অবনতি' (*নবনূর* : ১৩১১, ভাদ্র)। *মতিচূর*-এ (প্রথম খণ্ড : ১৯০৫) মুদ্রিত হয় এর খণ্ডিত, মুসলমান পিতৃতন্ত্রের অনুমোদিত রূপ : 'স্ত্রীজাতির অবনতি'। এটি রোকেয়ার *Vindication of the Rights of Woman*। ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের মতো রোকেয়া নারীমুক্তির সার্বিক প্রস্তাব পেশ করেন নি এ-প্রবন্ধে, তবে নারীমুক্তির মূলকথার সবই এতে রয়েছে সংক্ষেপে। এর

'আপত্তিকর' অংশের সাথে বিস্ময়কর মিল পাওয়া যায় এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন ও অন্যান্যের *নারীর বাইবেল*-এর (১৮৯৫, ১৮৯৮)।

নারীবাদনেত্রী স্ট্যান্টন দেখেছিলেন, নারীমুক্তির বিরুদ্ধে পুরুষতন্ত্র সব সময়ই উঁচিয়ে ধরে বাইবেল, তাই তিনি বাতিল ক'রে দেন বাইবেলকেই। তিনি আক্রমণ করেন বাইবেলি নারীর ভূমিকা ও ভাবমূর্তিকে; বলেন : 'বাইবেলকে আমরা দীর্ঘকাল ধ'রে অন্ধভক্তির বস্তু ক'রে তুলেছি। এখন এটি অন্যান্য বইয়ের মতো পড়ার সময় এসে গেছে, নিতে হবে এর ভালো শিক্ষা বাদ দিতে হবে খারাপটা' [দ্র হোল ও লেভিন (১৯৭৩, ৪৪৫)]। তিনি 'পাঁজরের হাড়ের গল্পটি'কে 'তুচ্ছ অস্ত্রোপচার' ব'লে বাতিল ক'রে দেন; দেখান যে সম্পূর্ণ বাইবেল দাঁড়িয়ে আছে হাওয়া বা নারীর পাপের ধারণা ভিত্তি ক'রে। তিনি বলেন, 'সাপটি, ফলগাছটি এবং নারীটিকে সরিয়ে নাও; তারপর আর থাকে না কোনো পতন, কোনো ক্রুদ্ধ বিচারক, কোনো নরক, কোনো চিরশাস্তি;- সুতরাং দরকার পড়ে না কোনো ত্রাতার। এভাবে খ'সে পড়ে সমগ্র খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের তলদেশ। এ-কারণেই সমস্ত বাইবেলি গবেষণা ও উচ্চতর সমালোচনায় পণ্ডিতেরা কখনো নারীর অবস্থানটি ছুঁয়ে দেখেন না' [দ্র হোল ও লেভিন (১৯৭৩, ৪৪৫)]। এর ফলে হৈচৈ পড়ে পশ্চিমে; ভদ্র নারীমুক্তিবাদীরা অস্বীকার করেন স্ট্যান্টনকে। এর মাত্র ন-বছর পরে পৃথিবীর এক অন্ধকার কোণে উগ্র পিতৃতন্ত্রের মধ্যে রোকেয়া, মাত্র চব্বিশ বছরের তরুণী, ঘোষণা করেন : 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।' পিতৃতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম কোনো নারী সরাসরি বাতিল ক'রে দেন কোনো বিশেষ একটি ধর্মগ্রন্থকে নয়, সমস্ত ধর্মগ্রন্থকে; ধর্মগ্রন্থের পেছনের সত্যকে প্রকাশ করেন অকপটে। পিতৃতন্ত্রের বলপ্রয়োগসংস্থাটি এর আগে, ও পরে, এমন আঘাত আর কখনো বোধ করে নি [*রোর*, সম্পাদকের নিবেদন, (১১)-(১৩)] :

> আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই;... যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।..আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি; এখন ত অবস্থা এই যে, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই শুনিতে পাই : 'প্যাট্! তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম!' সুতরাং আমাদের আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া যায়।...
>
> আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে : 'ঘুমাও, ঘুমাও, ঐ দেখ নরক।' মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।... আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।...
>
> এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত কি না, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন

> না।...এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নাবীর প্রতি অত্যাচার অধিক।...
>
> 'ধর্ম' শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর কবিয়াছে, ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।...

রোকেয়া কোনো বিশেষ ধর্মকে বাতিল করেন নি, বাতিল করেছেন সব ধর্মকেই। ১৯০৪-এ এটা সম্ভব ছিলো, কিন্তু রোকেয়া যদি আজ একথা বলতেন, তবে তাঁকে প্রকাশ্য রাস্তায় ছিঁড়ে ফেলা হতো। মুসলমান পিতৃতন্ত্র তাঁর ধর্মসমালোচনা অনুমোদন করে নি, তাই রোকেয়াকে বাদ দিতে হয়েছিলো তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠাংশ; এবং পরে তাঁকে কিছুটা সন্ধি করতে হয়েছিলো মুসলমান পিতৃতন্ত্রের সাথে। 'স্ত্রীজাতির অবনতি'তে রোকেয়া শুধু পিতৃতন্ত্রের হিংস্র বলপ্রয়োগসংস্থাটিকে আক্রমণ করেন নি, তিনি আক্রমণ করেছেন পুরুষতন্ত্রের সমগ্র জীবনপরিকল্পনাকেই। তিনি ব্যাখ্যা ও বাতিল করেছেন পুরুষতন্ত্রের তৈরি প্রতিটি ভাবমূর্তি। নারীর সমস্ত প্রথাগত ভাবমূর্তি বর্জন ক'রে তিনি নারীর অবস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন নারী দাসীমাত্র। তিনি বলেছেন, 'এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী' (*রোর,* ১৭)! একবার নয়, বলেছেন বার বার। তিনি বলেছেন, '"দাসী" শব্দে অনেক শ্রীমতি আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "স্বামী" শব্দের অর্থ কি? দানকর্তাকে "দাতা" বলিলে যেমন গ্রহণকর্তাকে "গ্রহীতা" বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে "স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর" বলিলে অপরকে "দাসী" না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন' (*রোর,* পাদটীকা, ১৮-১৯)? তাঁর কাছে নারীপুরুষের প্রথাগত সম্পর্ক কোনো পবিত্র মহৎ ব্যাপার নয়; তা শক্তিব সম্পর্ক, যাতে একজন জয়ী ও আরেকজন পরাজিত। রোকেয়া জানতেন নারীপুরুষের লৈঙ্গিক রাজনীতিতে বলপ্রয়োগের ফলে নারী পরাজিত; তাদের সম্পর্ক লৈঙ্গিক রাজনৈতিক।

নারী কেনো দাসী হয়েছে, তাও ব্যাখ্যা করেছেন রোকেযা; তাঁর ব্যাখ্যা অনেকটা এঙ্গেলসের (১৮৮৪) ব্যাখ্যার কাছাকাছি। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন ব্যক্তিমালিকানা ও পরিবারের উৎপত্তিই নারীর পুরুষাধীনতার মূলে; এবং রোকেয়া (*রোর,* ১৭) বলেছেন :

> পুবাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ মানবজাতিব এক অংশ (নর) যেমন নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পাবিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

তিনি বিশ্বাস করেন যখন সমাজবন্ধন ছিলো না, তখন মুক্ত স্বায়ত্তশাসিত ছিলো নারী। সমাজবন্ধনের মূলেই রয়েছে পরিবার, তাই পরিবারই যে নারীর দাসীত্বের মূল কারণ, তা অস্পষ্ট থাকে নি তাঁর কাছে। পরিবারে পুরুষ হয়েছে প্রভু, নারী দাসী। তিনি অবশ্য প্রশ্ন করেছেন, 'আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবত সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পইয়া সংসারের

সকল প্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে' (*রোর,* ১৭)। সুযোগটা যে নারীকে দেয় নি পুরুষ, তাও তিনি জানিয়েছেন। যুগ যুগ ধ'রে দাসত্বের কুপ্রভাব পড়ে দাসদের স্বভাবের ওপর, নারীর ওপরেও পড়েছে; রোকেয়া তাও দেখিয়েছেন চমৎকার ও বিস্তৃতভাবে। ওলস্টোনক্র্যাফটের *ভিন্ডিকেশন*-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম 'Observations on the State of Degradation to which Woman is Reduced by Various Causes': 'নানা কারণে নারীর যে-অবনতি ঘটেছে, সে-সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ'। রোকেয়ার প্রবন্ধটির নাম 'আমাদের/স্ত্রীজাতির অবনতি' বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ দেখিয়েছেন নারীকে বন্দী করার পর তার মানসিক শক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছে, নারীকে শেখানো হয়েছে তুচ্ছ রূপ, বিনোদন, ভাবাবেগ প্রভৃতিতে মেতে থাকতে, আর তারাও বোধ করেছে 'নিকৃষ্টতায় মহিমান্বিত'! রোকেয়াও বলেছেন একই কথা : 'আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে' (*রোর,* ১৭)। ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ রূপচর্চা, অলঙ্কার, বিনোদন, উপন্যাস পড়া, শারীরিক ও মানসিক বলহীনতাকে আক্রমণ করেছেন প্রবলভাবে, রোকেয়াও তাই করেছেন। রোকেয়া বলেছেন, 'সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক্ দুর্বলতা নহে' (*রোর,* ২১)? তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি' (*রোর,* ২৪)? ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের মতোই বলেছেন, 'শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়' (*রোর,* ২৫); বলেছেন, 'আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না' (*রোর,* ২৬); 'বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে' (*রোর,* ২৮)।

রোকেয়া *ভিন্ডিকেশন* পড়েন নি ব'লেই মনে হয়, পড়লে নারীর অধিকার সম্পর্কে হয়তো সম্পূর্ণ বইই লিখতেন; কিন্তু কেনো মিল ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের সাথে তাঁর? এর এক চমৎকার উত্তর অন্য প্রসঙ্গে তিনি নিজেই দিয়েছেন : 'বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, ডেকান (হায়দরাবাদ), বোম্বাই, ইংলন্ড– সর্ব্বত্র হইতে একই ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় কেন? ...ইহার কারণ সম্ভবতঃ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অবলাবৃন্দের আধ্যাত্মিক একতা' (*মতিচূর,* নিবেদন)! এ যে প্রচণ্ড পরিহাস– 'ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অবলাবৃন্দের আধ্যাত্মিক একতা'– এটাও *পুরুষতন্ত্রকেই* পরিহাস। তিনি জানেন এটা আধ্যাত্মিক নয় সম্পূর্ণ বাস্তবের একতা, নারীর দাসীত্ব বিশ্বজনীন ব্যাপার। অলঙ্কারের যে-ব্যাখ্যা রোকেয়া (*রোর,* ১৯-২০) দিয়েছেন, তা নারীকে দাসী থেকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে :

> আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি–এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্যবর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ-নির্মিত, আমাদেব হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত চুড়ি! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (চমথ-ডমফফটব) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে!...গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ী" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের "নোলক" পরাইয়াছেন!! ঐ

নোলক হইতেছে "স্বামী"ব অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন!

নারী শুধু দাসীই নয়, তারও নিম্নস্তরের; তিনি বলেছেন, 'আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি' (*রোর,* ২৭৭)। তিনি দেখিয়েছেন নারী আসলে নিরাশ্রয়, কেননা তার নিজের ব'লে কিছু নেই; এমনকি নিজের ওপরও নেই নারীর নিজের অধিকার। নারীর সবখানেই থাকে পরাশ্রিত : 'যখন আমরা রাজকন্যা, রাজবধূরূপে প্রাসাদে থাকি, তখনও প্রভু-গৃহে থাকি। যখন... গোশালায় গিয়া আশ্রয় লই,-তখনও অভিভাবকের বাটিতে থাকি।...গৃহ বলিতে আমাদের একটিও পর্ণকুটীর নাই। প্রাণী-জগতের কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয় নহে। সকলেরই গৃহ আছে– নাই কেবল আমাদের' ('গৃহ',*রোর,* ৭৪)। মনে পড়ে উল্‌ফের *এ রুম অফ ওআন্স ৌন*-এর কথা। পুরুষতন্ত্রকে আক্রমণের জন্যে তিনি নারীর অবস্থানটিকে শনাক্ত ক'রে নিয়েছেন, এবং নারীর বিকৃত স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

'পুরুষ' ধারণাটি রোকেয়ার ধারাবাহিক আক্রমণস্থল : তিনি উপহাস করেছেন পুরুষকে, তাকে গণ্য করেছেন পশুর থেকেও নিকৃষ্ট, আদমের কাল থেকেই পুরুষকে দেখিয়েছেন নির্বোধরূপে। পুরুষ তাঁর চোখে প্রতারক আর পীড়নকারী। প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বজুড়ে চ'লে এসেছে নারীবিদ্বেষের যে-ধারাটি, রোকেয়া একা যেনো তাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন প্রচণ্ড পুরুষবিদ্বেষের সাহায্যে। পুরুষ তাঁর নিরন্তর আক্রমণলক্ষ্য, কেননা পুরুষ নারীকে পরিণত করেছে দাসীতে, পুরুষ কেড়ে নিয়েছে নারীর স্বাধিকার ও স্বাধীনতা; কিন্তু তিনি নারীর সাম্য চেয়েছেন তাঁর ধিক্কৃত পুরুষের সাথেই। তাঁর পুরুষবিদ্বেষ ও পুরুষের সাথে সাম্য লাভের দাবি এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে ফ্রয়েড বা ফ্রয়েডীয়রা তাঁকে পেলে খুব সুখ বোধ করতেন; তাঁরা তাঁকে শনাক্ত করতেন এক পুংগূঢ়ৈষা-শিশ্নাসূয়াগ্রস্ত নারীরূপে; কিন্তু তিনি তাঁদের যে-উত্তর দিতেন, তাতে অনেক আগেই ভেঙে পড়তো ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের কুসংস্কারসৌধ। তিনি পুরুষকে বলেছেন, 'নরাকারে পিশাচ' ('গৃহ', *রোর,* ৭৩); বলেছেন, 'ডাকাতী, জুয়াচুরি, পরস্বাপহরণ, পঞ্চ 'মকার' আদি কোন্ পাপের লাইসেন্স্ তাঁহাদের নাই' (*পদ্মরাগ : রোর,* ৩৩৪)? বাঙালি পুরুষকে পরিহাস ক'রে বলেছেন, 'ভারতের পুরুষসমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা' ('নিরীহ বাঙ্গালী', *রোর,* ৩২)! *পদ্মরাগ*-এর সকিনা লতিফকে বিদ্রুপ ক'রে বলেছে, 'খোদাতালার সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব পুরুষ হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি বাঞ্ছনীয়' (*রোর,* ৩৫২)? এক বাক্যে তিনি কাঁপিয়ে দিয়েছেন পুরুষ ও তার স্রষ্টাকে। পুরুষকে বলেছেন প্রতারক : 'বহুকাল হইতে পুরুষ নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে, আর নারী কেবল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে' (*রোর,* ২৭৮)। বলেছেন, 'কুকুরজাতি পুরুষাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য ('ডেলিশিয়া-হত্যা', *রোর,* ১৬২)!; 'যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ততা ও কপটাচারকে সদ্‌গুণ বলা যায়, তবে অবশ্য পুরুষজাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ' (*রোর,* ১৭০)! পুরুষ তাঁর চোখে অলস, বলেছেন : 'অলসেরা অতিশয় বাকপটু হয়' ('সুলতানার স্বপ্ন', *রোর,* ১৩৫)।

রোকেয়া তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে পুরুষদের রেখেছেন, তাদের সম্পূর্ণ বহিষ্কার করেন নি; হয়তো তিনি ভেবেছেন পুরুষদের অন্তত একটি উপযোগিতা রয়েছে; কিন্তু সাম্প্রতিক প্রজননবিজ্ঞানের কথা যদি তিনি কল্পনা করতে পারতেন, ভাবতে পারতেন যদি কোনো 'সাহসী নতুন বিশ্ব'-এর কথা, তাহলে হয়তো তিনি পুরুষ প্রজাতিটিকেই বাতিল ক'রে দিতেন। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রে পুরুষ রেখেছেন, কিন্তু তাদের বন্দী করেছেন অবরোধে। নারীস্থানে রাস্তায় কেনো পুরুষ নেই, জানতে চায় সুলতানা। সারা তাকে জানায়, 'এ দেশে পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে' ('সুলতানার স্বপ্ন', *রোর,* ১৩৬); এতে পরম তৃপ্তি পেয়েছে সুলতানা : 'আমি প্রাণে বড় আরাম পাইলাম;-পৃথিবীতে অন্ততঃ এমন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে' (*রোর,* ১৩৬)! তাদের জন্যে তিনি তৈরি করেছেন 'জেনানা'র প্রতিরূপ 'মর্দানা'। সেখানকার ভাষা বিপরীত ধরনের লিঙ্গবাদী, বাঙলায় 'নারীভাবাপন্ন' বলতে যা বোঝায়, নারীস্থানে তা বোঝায় 'পুরুষভাবাপন্ন' শব্দে, যার অর্থ 'পুরুষের মত ভীরু ও লজ্জানম্র' (*রোর,* ১৩৪)। তাঁর কাছে পুরুষ বন্য জন্তু, বদ্ধ পাগল; তাই নারী 'নিরাপদ নহে,-যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে' (*রোর,* ১৩৬)! সারা বলেছে, 'তাহারা (পুরুষেরা) কোন ভাল কাজের উপযুক্ত নহে' (*রোর,* ১৩৮)। তিনি পুরুষদের নিয়োগ করেছেন নিম্নপদ ও পেশায় : 'তাঁহারা (পুরুষেরা) কেরানী মুটে মজুরের কাজ করিয়া থাকেন' (*রোর,* ১৪৯)। নারীস্থান যে কল্যাণময়, তার কারণ পুরুষ-শয়তানেরা সেখানে অবরুদ্ধ; সুলতানা বলেছে, 'আপনারা স্বয়ং শয়তানকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, আর দেশে শয়তানী থাকিবে কিরূপে' (*রোর,* ১৪৭)। রোকেয়া চান না যে তাঁর একটি তীরও ব্যর্থ হোক; তাই তিনি পাদটীকায় 'শয়তানকে' কথাটি ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছেন 'পুরুষ জাতিকে' ব'লে।

কিন্তু রোকেয়া নারীর জন্যে চেয়েছেন অপদার্থ নির্বোধ দুশ্চরিত্র পাপিষ্ঠ শয়তান পাশবিক পুরুষেরই সমকক্ষতা। এটা কোনো শিশ্নাসূয়াগ্রস্ততা বা পুংগৃঢ়েষা নয়, এটা একটি হারানো শিশ্ন ফিরে পাওয়ার ফ্রয়েডীয় রোগ নয়; এটা নারীর পূর্ণ অধিকার লাভ। তিনি পুরুষকে ঈর্ষা করেন নি, ঈর্ষা করেছেন পুরুষের স্বাধীনতা ও অধিকারকে; বলেছেন, 'একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও...। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।...পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব' ('স্ত্রীজাতির অবনতি', *রোর,* ২৯)। পুরুষের সাথে সমকক্ষতার ব্যাপারটি তিনি ব্যাখ্যা ক'রে দিয়ে কোনো ফ্রয়েডীয় অপবিজ্ঞানের অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। বলেছেন, 'আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ' (*রোর,* পাদটীকা, ২৯)। রোকেয়া চেয়েছেন পুরুষের সাথে সম্পূর্ণ সাম্য; তাঁর কাছে নারীপুরুষ লিঙ্গগতভাবে ভিন্ন, কিন্তু উভয়ই মানুষ, এবং উভয়ের জীবনেরই লক্ষ্য ও সার্থকতা এক : 'পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে– একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও

তাহাই' (*রোর,* ৩১)। তিনি নারীর অধীনতার মূল কারণ হিশেবে, প্রাচীন থেকে আধুনিক কালের অন্যান্যের মতোই, ধরেছেন শারীরিক দুর্বলতাকে : 'শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না' ('অর্ধাঙ্গী', *রোর,* ৪৩)। 'অপর জাতি' কথাটি লক্ষ্য করার মতো; পুরুষ যেনো একটি ভিন্ন ও বিরোধী জাতি নারীর থেকে। তিনি শারীরিক শক্তির উপকারিতা বুঝেছেন, তিন্তু তাকে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড ব'লে স্বী'কার করেন নি; তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড মানসিক শক্তি। তিনি নারীর জন্যে চেয়েছেন মানসিক শক্তি, যা অর্জনের উপায় হচ্ছে শিক্ষা : 'আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি' (*রোর,* ৪৩-৪৪)।

পুরুষতন্ত্রের তৈরি এক ঐশী ভাবাদর্শ *স্বামী,* যা পুরুষকে উত্তীর্ণ করেছে নারীর বিধাতার স্তরে। হিন্দু নারীরা স্বামীকে পুজো করে, হিন্দু নারীর জন্যে স্বামী ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই; মুসলমান নারীর বেহেস্তও স্বামীর পদতলে, এবং হাদিসে আছে– আল্লা ছাড়া আর কাউকে সেজদা করার বিধান যদি থাকতো, তাহলে নারীকে নির্দেশ দেয়া হতো স্বামীকে সেজদা করার। বাঙলায় 'স্বামী' শব্দ ও ধারণাটি এখন অশ্লীল হয়ে উঠেছে, এটা এখন পরিহার্য শব্দগুলোর একটি; রোকেয়া অনেক আগেই বাতিল করেছিলেন 'স্বামী' ধারণাটি। এটিকে বাতিল করার অর্থ হচ্ছে পুরুষতন্ত্রের একটি বড়ো মন্দির ধ্বংস করা। রোকেয়া বলেছেন, 'তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের স্বামী হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশঃ তাঁহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান্ সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি' (*রোর,* ১৮-১৯)! তিনি দাবি করেছেন নারী দাসীত্ব করে, তবে পুরুষও প্রেমবশত একধরনের দাসত্ব করে, কিন্তু পুরুষকে 'দাস' বলা হয় না। তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'সমাজ তবু বিবাহিত পুরুষকে "প্রেম-দাস" না বলিয়া স্বামী বলে কেন' (*রোর,* পাদটীকা, ১৯)? 'স্বামী' তাঁর কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর শব্দ; প্রশ্ন করেছেন, 'শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে "স্বামী" ভাববেন কেন' (*রোর,* ৪৩)? তিনি এ-শব্দটি বাতিল ক'রে প্রস্তাব করেছেন একটি নতুন শব্দ : 'আশা করি এখন "স্বামী" স্থলে "অর্ধাঙ্গ" শব্দ প্রচলিত হইবে' (*রোর,* ৪৪)।

রোকেয়া প্রথাগত ছকবাঁধা নারীভাবমূর্তি বা 'স্টেরিঅটাইপ' স্বীকার করেন নি; তিনি ওই ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে তা বর্জন করেছেন। নারী হবে সীতা বা রহিমা, হবে মর্ষকামিতার উদাহরণ, পুরুষতন্ত্র তৈরি করেছে এমন ধারণা; তিনি তা বাতিল করেছেন। রোকেয়া বলেছেন, 'এ দেশের গ্রন্থকারেরা নারী চরিত্রকে নানা গুণ ভূষায় সজ্জিত করেন বটে; বেশীর ভাগে অবলা হৃদয়ের সহিষ্ণুতা বর্ণনা করা হয় (কারণ রমণী পাষাণ প্রায় সহিষ্ণু না হইলে তাহার প্রতি অত্যাচারের সুবিধা হইত না যে!)' ('ডেলিশিয়া-হত্যা', *রোর,* ১৫৫)। পুরুষতন্ত্র নারীকে ক'রে তুলেছে মর্ষকামিতার

উদাহরণ, সে-নারীই পুরুষতন্ত্রের প্রশংসিত যে সহ্য করে অসহ্য পীড়ন; কিন্তু রোকেয়া তা মানেন নি। তিনি (*রোর,* ৩৬-৩৭) বলেছেন :

> নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন।...পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে-সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ।...রামচন্দ্র "স্বামিত্বের" ষোল আনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা?-কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ কবিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে।

তিনি সীতার এক প্রতিরূপ তৈরি করেছেন *পদ্মরাগ*-এ, যার নাম সিদ্দিকা। *রামায়ণ*-এ রাম ত্যাগ করেছিলো সীতাকে, *পদ্মরাগ*–এ নেয়া হয় তার প্রতিশোধ : সিদ্দিকা ত্যাগ করে স্বামীকে। সমগ্র নারীসমাজের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কয়েক হাজার বছরের প্রস্তুতি নেয় একটি নারী, তাকে সৃষ্টি করেন রোকেয়া, তার নাম সিদ্দিকা। রোকেয়ার *পদ্মরাগ* অসাধারণ উপন্যাস নয়, কিন্তু এতেই ঘটে এক অসাধারণ ঘটনা : এই প্রথম পূর্বদেশের এক নারী পরিত্যাগ করে পুরুষকে, তার স্বামীকে। সিদ্দিকা বলেছে (*রোর,* ৪৫৩) :

> আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকু'মাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, "আর রাখ তোমাব পণ ও তেজ– ঐ দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনাব পরে জয়নব আবার স্বামী-সেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।" আর পুরুষ-সমাজ সগর্বে বলিবেন, "নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী, গবীয়সী হউক না কেন,– ঘুরিয়া ফিরিয়া আবাব আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে!" আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী-জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে। পক্ষান্তরে আমার এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আশা করি ।

সিদ্দিকা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তার অতীতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের সমস্ত নারীর পক্ষে। সে দেখিয়েছে 'একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী-জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।' পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এমন স্পষ্ট উচ্চারণ ও পদক্ষেপ সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ; সিদ্দিকা শুধু মনে করিয়ে দেয় ইবসেনের নোরাকে। লতিফ জানতে চেয়েছে, 'সিদ্দিকা, স্পষ্ট বল, তুমি আমার গৃহিণী হইবে কি না?' সিদ্দিকা বলেছে, 'না। তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি' (*রোর,* ৪৫৯)। সিদ্দিকা নিষ্ঠুর নয়, সে যেমন বিবাহবিচ্ছেদ চায় নি, তেমনই চায় নি স্বামীর পায়ের নিচে বেহেস্তও। সিদ্দিকা হয়ে উঠেছে বিশ্বপুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীতন্ত্রের কণ্ঠস্বর, এবং সে শুধু কথা বলে নি, বাস্তবায়িত করেছে নিজের লক্ষ্য। সমগ্র নারীজাতির দায়ভার সে তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। রোকেয়া কোনো মধুর মোহ জাগিয়ে রাখতে চান নি, পাঠকের মনে এমন কোনো রোম্যানটিক ভাববিলাস লালনের সুযোগ রাখেন নি যে পরে কোনো দিন মিলন ঘটবে সিদ্দিকা আর লতিফের। উপন্যাসের শেষবাক্য দুটি যেমন মানবিকতায় কোমল, তেমনই বিদ্রোহে নির্মম : 'লতীফ সিদ্দিকার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন। এই তাঁহাদের শেষ দেখা' (*রোর,* ৪৬৮)। সিদ্দিকা নোরার থেকেও কঠোর।

নারীর পুরুষাধীনতার দুটি প্রধান কারণ : শরীর ও অর্থনীতি। রোকেয়া বিশ্বাস করেছেন পুরুষ নারীকে প্রথমে শারীরিক শক্তিতে পরাভূত ক'রেই বন্দী করেছে, শেষে নারীকে আর্থনীতিক এলাকা থেকে বের ক'রে দিয়ে ক'রে তুলেছে অসহায়। শারীরিক শক্তিতে নারী কখনো পুরুষের সমান হবে না ব'লে তিনি বিশ্বাস করেছেন, তার দরকার আছে ব'লেও মনে করেন নি। কিন্তু যদি প্রতিষ্ঠিত হয় আর্থনীতিক সাম্য, তাহলে ঘুচবে নারীর পুরুষাধীনতা। তাই তিনি দাবি করেছেন নারীর আর্থ স্বাধিকার। তিনি বলেছেন, 'পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়' (*রোর*, ২৮)। নারীর মুক্তির উপায় আর্থ স্বনির্ভরতা লাভ : 'যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব' (*রোর*, ২৯-৩০)। তিনি জানেন যে নারী কম পরিশ্রম করে না, তবে তার পরিশ্রমের কোনো আর্থ মূল্য নেই। স্বামীর সংসারে নারী বেতনহীন দাসী। তিনি বলেছেন, 'উপার্জন করিব না কেন?...যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না' (*রোর*, ৩০)? কোনো পেশাই তার কাছে উপেক্ষণীয় নয়; বলেছেন, 'আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন' (*রোর*, ৩০)? তিনি উচ্চারণ করেছেন নারীমুক্তির এক চরম বাণী (*রোর*, ৩০) :

> কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।

কিন্তু আজো কন্যাগুলোকে সুশিক্ষিত করা হয় নি; আর যাদের করা হয়েছে তারা কর্মক্ষেত্রের স্বাধীনতার থেকে পছন্দ করে শুভবিবাহের শেকল।

পুরুষতন্ত্রকে বহুমুখি আক্রমণে বিপর্যস্ত ক'রে রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর নারীতন্ত্র। নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন নারীস্থান, এবং পুরুষকে অবরুদ্ধ করেছেন গৃহের ভেতরে (পুরুষের প্রয়োজন কেনো তা তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন নি), বদলে দিয়েছেন পুংলিঙ্গবাদী ভাষার স্বভাব, বার বার লিখেছেন ইউটোপিয়া ও অ্যান্টি-ইউটোপিয়া (বা ডিস্টোপিয়া)। নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সার্বিক উদ্যোগ নিয়েছেন রোকেয়া *Sultana's Dream* (১৯০৫) বা 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ। ইউটোপীয় ভাবনাকল্পনার মূলে থাকে বিশেষ ধরনের সমাজ, ওই বিকৃত সমাজের চরম সংশোধন সম্পন্ন করা হয় ইউটোপিয়ায়। অরওয়েল বলেছেন, 'ন্যায়সঙ্গত সমাজের স্বপ্ন মানুষের কল্পনাকে যুগে যুগে দুর্মরভাবে আলোড়িত করেছে, তাকে আমরা স্বর্গরাজ্য বলতে পারি বা বলতে পারি শ্রেণীহীন সমাজ, বা তাকে মনে করতে পারি অতীতের কোনো স্বর্ণযুগ, যা থেকে অধঃপতিত হয়েছি আমরা ' [দ্র কৃষাণ কুমার (১৯৮৭, ২))। ইউটোপিয়ার উদ্ভববিকাশ ঘটেছে পশ্চিমে, পূর্বাঞ্চলে কেউ ইউটোপিয়া লেখেন নি; এর একমাত্র ব্যতিক্রম রোকেয়া। অনেকে মনে করেন পশ্চিমে যতো ইউটোপিয়া লেখা হয়েছে, তার সবই কোনো-না-কোনোরূপে প্লাতোর *রিপাবলিক* থেকে উৎসারিত, ওগুলো *রিপাবলিক*-এর

পাদটীকা। তবে প্লাতোর অনেক আগেই ইউটোপীয় ভাবনার বিকাশ ঘটেছে ইউরোপে, যার পরিচয় মেলে খ্রিপূ সপ্তম শতকের হেসিঅদের *ওঅর্কস অ্যান্ড ডেইজ*-এ। তিনিই প্রথম কল্পনা করেছিলেন এক স্বর্ণযুগের, যখন মানুষেরা বাস করতো দেবতার মতো, যাদের মন মুক্ত ছিলো সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে, যখন কোনো কাজ ছিলো না, যখন গাছে গাছে ধ'রে থাকতো সুমিষ্ট ফল। অসংখ্য ইউটোপিয়া লেখা হয়েছে, তবে সাহিত্যের এ-আঙ্গিকটি নাম পেয়েছে টমাস মুরের *ইউটোপিয়া* (১৫১৬) থেকে। মুরের বই থেকে ইউটোপিয়ার চরিত্র বদলে যায়; তিনি একটি শুদ্ধ সমাজের বিধান না দিয়ে তা বাস্তবায়িত করেন তাঁর বইতে। ইউটোপিয়ায় চিত্রিত হয় উৎকৃষ্টতম সমাজব্যবস্থা, তাকে বিমূর্ত না রেখে ক'রে তোলা হয় মূর্ত। ইউটোপিয়া বর্তমানে প্রচলিত কোনো সমাজের বিদ্রূপাত্মক রূপ নয়, তাতে চিত্রিত হয় একটি সম্পূর্ণ সমাজ। অ্যান্টি-ইউটোপিয়া বা ডিস্টোপিয়ায় চিত্রিত হয় নিকৃষ্টতম সমাজ।

রোকেয়া তাঁর নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে লিখেছেন ইউটোপিয়া ও ডিস্টোপিয়া দু-ই। রোকেয়ার 'সৌরজগৎ' সংলাপটিতে আভাস পাওয়া যায় ইউটোপিয়ার : ওই পরিবারে একটি মাত্র পুরুষ, আর সবাই নারী। ওই পরিবারে রয়েছে গৃহিণী ও নটি কন্যা, কোনো ছেলে নেই। সেখানে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে জাফর আলী। বিজ্ঞানের প্রতি রোকেয়ার আকর্ষণ ছিলো, ওই পরিবারের মেয়েরাও বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট; তাদের তিনজন ভর্তি হ'তে চায় 'টেকনিকাল স্কুলে'। রোকেয়াই বোধ হয় এ-অঞ্চলে প্রথম ভাষায় লিঙ্গবাদ ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছিলেন। গওহর জাফরকে তিরস্কার করে, '*ইহা তোমার* womanishness (*স্ত্রীভাব*)।' নূরজাহাঁ এতে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলে : "womanish" শব্দে আমি আপত্তি করি! 'ভীরুতা', 'কাপুরুষতা' বল না কেন' (*রোর*, ১১৬)? পশ্চিমের নারীবাদীদের ভাষিক লিঙ্গবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অনেক আগে রোকেয়া এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন; ভাষা থেকে মুছে দিয়েছিলেন লিঙ্গবাদ। নূরজাহাঁ প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রশংসা ক'রে বলে, 'উক্ত শিক্ষয়িত্রীটি অতিশয় ভদ্রলোক' (*রোর*, ১১৭)। ভাষা থেকে লিঙ্গবাদ কমছে, কিন্তু শিক্ষয়িত্রীকে 'ভদ্রলোক' বলার অবস্থা আজো আসে নি, তবে রোকেয়া ১৯০৫ সালেই 'ভদ্রমহিলা' বাদ দিয়ে ব্যবহার করেছিলেন 'ভদ্রলোক'। শুধু লিঙ্গবাদ মুছে দিয়েই তিনি তৃপ্তি পান নি, তিনি শুরু করেছিলেন বিপরীত ধরনের লিঙ্গবাদ। 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ সারা সুলতানাকে বলে, 'আপনি অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন।' রোকেয়া 'পুরুষভাবাপন্ন' শব্দের দেন নতুন অর্থ : 'পুরুষের মত ভীরু ও লজ্জানম্র' (*রোর*, ১৩৪)। বিয়ের ভাষায় প্রকাশ পায় পুরুষের সক্রিয়তা আর নারীর নিষ্ক্রিয়তা; রোকেয়া ওই ভাষারীতিকেও উল্টে দিয়েছেন। ডেলিশিয়ার বিয়েকে তিনি বর্ণনা করেছেন, 'সচরাচর বলা হয়, 'বর কন্যাকে বিবাহ করিল', কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলিতে হইবে, 'কন্যা বরকে বিবাহ করিলেন। কেননা ডেলিশিয়াই মিঃ কারলীঅনের অন্নবস্ত্র ইত্যাদি যোগাইবার ভার লইলেন' (*রোর*, ১৫৬)!

রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন পুরুষতন্ত্রের বদলে নারীতন্ত্র, পুরুষাধিপত্যের স্থলে নারী-আধিপত্য। তাঁর ডিস্টোপিয়াধর্মী রূপকথাগুলোতে সমাজের দুরবস্থার জন্যে

সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেছেন তিনি পুরুষদের, যারা তাঁর চোখে সমস্ত দোষের সমষ্টি। তারা অপদার্থ, দায়িত্বহীন, অবিবেচক, মিথ্যাবাদী, এবং সমাজরাষ্ট্র পরিচালনার অযোগ্য। তাঁর 'জ্ঞানফল'-এ দেশটির নাম কনকদ্বীপ হ'লেও সেটি বসবাসের অযোগ্য; পুরুষেরা সেটি নষ্ট করেছে। রোকেয়া বাইবেলি স্বর্গচ্যুতির উপাখ্যানটি ব্যাখ্যা করেছেন নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং ওই পতনই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য, নির্বোধের স্বর্গ গ্রহণযোগ্য নয়। নারী যে আগে নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলো একে তিনি নিয়েছেন নারীর গৌরব হিশেবে, কেননা নারীরই রয়েছে জ্ঞানের প্রতি সহজাত আকর্ষণ : 'ফল ভক্ষণ করিবামাত্র হাভার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইল।... এই সময় তথায় আদম গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাভা তাঁহাকে স্বীয় হস্তস্থিত ফল খাইতে অনুরোধ করিলেন। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণে আদমেরও জ্ঞানোদয় হইল' (*রোর,* ১৮০)। রোকেয়ার বর্ণনায় আদম নির্বোধ পুরুষ, জ্ঞানের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ *নেই*। 'পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণে' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ; রোকেয়া বোঝাতে চান পুরুষ জ্ঞানী নারীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে। আদম শুধু নির্বোধ, উচ্ছিষ্টভোজীই নয়, সে অমানিবকও। রোকেয়ার হাওয়া তার কন্যাদের বর দিয়ে দীর্ঘায়ু করেছে, কিন্তু আদম– 'তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাদৃশ প্রবল না থাকায়'– পুত্রদের কোনো বর দেয় নি। ওই দ্বীপের পতন ঘটেছিলো পুরুষেরা 'নারীর আহৃত জ্ঞানে নারীকেই বঞ্চিত করিয়াছিল' (*রোর,* ১৮৮) ব'লে। 'মুক্তিফল'ও আরেক অ্যান্টি-ইউটোপিয়া, ভোলাপুরেরও পতন ঘটে নারীকে অধিকারহীন ক'রে রাখার ফলে। সেখানে নারীর অধিকারের মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে ভাই প্রবীণের উক্তিতে : 'না বোন, তোমাকে কৈলাস পর্যন্ত যাইতে দিতে পারি না। তুমি আমার সহিত গল্প কর, উপন্যাস পাঠ কর, আমার সঙ্গে পারমার্থিক গান গাও–এই পর্যন্তই যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা বা সমকক্ষতা দিতে পারি না' (*রোর,* ২০২)। নারীকে দেয়া হয়েছে গল্প করার, উপন্যাস পড়ার, আর 'পারমার্থিক গান গাওয়ার' স্বাধীনতা; ভোলাপুর যে ভারতবর্ষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

পুরুষের সৃষ্ট অ্যান্টি-ইউটোপিয়ার বর্ণনা রোকেয়াকে তৃপ্তি দিতে পারে নি, কেননা সেখানকার নষ্ট সমাজে নারীও অসুস্থ। তাই রোকেয়া পুরুষের সমাজকেই অস্বীকার ক'রে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নারীস্থান। রোকেয়ার পক্ষে অসম্ভব ছিলো *Sultana's Dream* বা 'সুলতানার স্বপ্ন' না লেখা; কেননা নারীতন্ত্র বা নারী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত দেখা ছিলো তাঁর জন্যে অনিবার্য। এজন্যে তাঁকেই লিখতে হয় বাঙলা ভাষায় প্রথম ও শেষ ইউটোপিয়া; সম্ভবত কোনো এশীয় ভাষায়ও এটিই একমাত্র ইউটোপিয়া। পঁচিশ বছরের এক আমূল নারীবাদী তরুণীর নারী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ, যা কোমলমধুর কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহায় ক্ষমাহীন নির্মম। রোকেয়া ব্যাপকভাবে নারীস্থানের সমাজজীবন উপস্থাপিত করেন নি, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করেছেন পুরুষদের। পুরুষের ওই দেশে কী প্রয়োজন, তা তিনি বলেন নি; তবে প্রতিশোধগ্রহণের জন্যে পুরুষদের অত্যন্ত দরকার ছিলো সেখানে। রোকেয়া পুরুষজাতিটিকেই বাদ দিতে পারতেন ওই সমাজ থেকে, কিন্তু তিনি দেন নি; তিনি হয়তো মনে করেছেন সামাজিকভাবে পুরুষ দরকার, তবে তার চেয়ে বেশি দরকার

পুরুষপীড়নের জন্যে। রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' বৈজ্ঞানিক ইউটোপিয়া; তিনি কোনো আদিম স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেন নি, সৃষ্টি করেছেন ভবিষ্যতের বিজ্ঞাননির্ভর সমাজ, কেননা বিজ্ঞানই শুধু মুক্তি দিতে পারে নারীকে। রোকেয়া নারীর শারীরিক দুর্বলতা সম্পর্কে ছিলেন সচেতন, তাই কোনো আদিম আর্কেডিয়া তাঁর কাজে আসতো না; তার দরকার ছিলো এমন শক্তি, যা শারীরিক শক্তিকে সহজেই পরাভূত করে। বিজ্ঞান সে-শক্তি, তাই রোকেয়ার নারীস্থান বিজ্ঞাননির্ভর। রোকেয়ার নারীস্থান তাঁর স্বদেশের বিপরীত : 'ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,– তাহারা সমুদয় সুখ-সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে রাখিয়াছে' (*রোর*, ১৩৭)! তিনি তাঁর নারীস্থান থেকে মুছে ফেলেছেন ভারতবর্ষের সমস্ত সামাজিক ব্যাধি। 'সুলতানার স্বপ্ন' রোকেয়ার নারীতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের ও পুরুষতন্ত্রের চূড়ান্ত পরাজয়ের কাহিনী।

যে-পুরুষতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধারাবহিক লড়াই করেছেন রোকেয়া, তার সাথে কি তিনি কিছুটা সন্ধি করেছিলেন কখনো কখনো? পিতৃতন্ত্রের সাথে সন্ধির কিছুটা পরিচয় রয়েছে তাঁর রচনাবলিতে। পিতৃতন্ত্রের বলপ্রয়োগসংস্থাটির সাথে, সম্ভবত বাধ্য হয়ে, তিনি সন্ধি করেছেন মাঝেমাঝে; কিন্তু খুব বেশি ছাড় দেন নি সেটিকে। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলেন ধর্মকে, ওই আক্রমণের পরেও যে তিনি টিকে ছিলেন তার কারণ তখন পরিবেশ ছিলো ভিন্ন; আজ হ'লে রাস্তায় তাঁর লাশ পাওয়া যেতো, বা তিনি নিন্দিত জীবন কাটাতে বাধ্য হতেন নির্বাসনে। তাঁর ওপর নিশ্চয়ই পড়েছিলো মুসলমান পিতৃতন্ত্রের প্রবল চাপ। তিনি বুঝেছিলেন টিকে থাকতে হ'লে কিছুটা সন্ধি পাতিয়ে নিষ্ক্রিয় ক'রে দিতে হবে পিতৃতন্ত্রের বলপ্রয়োগসংস্থাটিকে। তিনি মাঝেমাঝে ধর্মকর্মের কথা বলেছেন, কিন্তু প্রথাগত ধর্মে তাঁর অন্ধ আস্থা ছিলো না। তাঁর নারীস্থানেও ধর্ম আছে : সেখানে 'ধর্মবিধান' হচ্ছে 'প্রেম ও সত্য', যা খুবই প্রথাবিরোধী। তিরিশোত্তর রোকেয়া ধর্মের কথা কিছু বলেছেন, এবং অবরোধবাসিনীদের ভয়াবহ জীবন আঁকার পাশাপাশি অবরোধের পক্ষেও বলেছেন কিছু কথা। শুনে স্তম্ভিত বোধ করি যখন *অবরোধবাসিনী*র রোকেয়া বলেন, 'আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই' ('অর্ধাঙ্গী', *রোর*, ৩৫)। নিশ্চয়ই বড়ো একটা চাপের মধ্যে পড়েছিলেন তিনি তখন।

পিতৃতন্ত্রের সাথে বেশ কিছুটা মিটমাটের উদাহরণ 'বোরকা' প্রবন্ধটি। তিনি এতে যে শিকার হয়েছেন স্ববিরোধিতার, তা নিজেও বুঝেছেন; তাই আত্মসমর্থনের যে-চমৎকার প্রতিভা ছিলো তাঁর, তা তিনি প্রয়োগ করেছেন পুরোপুরি। তিনি বলেছেন, 'তাঁহারা প্রায়ই আমাকে "বোরকা" ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝিবে যে জেলেনী, চামারনী, কি ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে' ('বোরকা', *রোর*, ৫৬)? বোরকা জিনিশটি কুৎসিত, মধ্যযুগীয় পিতৃতন্ত্র এটি চাপিয়ে দিয়েছে নারীর ওপর, এটা তাঁর বোঝার কথা; তবু তিনি এর পক্ষে কথা বলেছেন।

তিনি কি মনে করেছিলেন যে নারী উন্নতি করবে বোরকার ভেতরে থেকেই? তা কি হবে না নারীর জন্যে চরম গ্লানিকর? অবরোধপ্রথার উদ্ভব ঘটে নারী সম্পর্কে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর ইসলামি ধারণা থেকে যে নারী হচ্ছে 'ফিৎনা'। ইসলামি বিশ্বাস হচ্ছে যে নারীর কাম প্রবল, তা নষ্ট ক'রে দিতে পারে সমাজশৃঙ্খলা; তাই নারীকে রুদ্ধ ক'রে রাখতে হবে অবরোধে। ইসলামি ধারণায় নারী মানসিক শক্তিতে দুর্বল, সে নিজের কামকে বশে রাখতে পারে না; তাই নারীর কামের গ্রাস থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্যে নারীকে আটকে রাখতে হবে অবরোধে, তাকে ঢেকে দিতে হবে বোরকায়। রোকেয়া বোরকা মেনে নিয়েছেন, খুব অবজ্ঞা করেছেন 'জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী'কে, কেননা তিনি চেয়েছেন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নারীর কল্যাণ; এবং একটি কথা বুঝতে চান নি যে তাঁর অবজ্ঞার 'জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী'রা আসলেই অনেক উন্নতি করেছে অবরুদ্ধ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারীদের থেকে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নারীরা যেখানে অপদার্থ, 'জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী'রা সেখানে অনেক মুক্ত। তিনি বলেছেন, 'আমাদের ত বিশ্বাস যে, অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নাই' (*রোর,* ৫৭)। 'বেশী বিরোধ নাই' ব'লে তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে অবরোধ ও উন্নতির মধ্যে বিরোধ রয়েছে, এবং তিনি বোরকার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে ক্রমশ চ'লে গেছেন নিজেরই বিপক্ষে।

তিনি বলেছেন, 'অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে– নৈতিক।...মানুষের "অস্বাভাবিক" সভ্যতার ফলেই অন্তঃপুরের সৃষ্টি' (*রোর,* ৫৭)। 'স্বাভাবিক' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন অসভ্যতাকে, আর 'অস্বাভাবিক' বলতে সভ্যতাকে; তিনি সভ্যতা ও অস্বাভাবিকতার পক্ষে, তাই অবরোধেরও পক্ষে। যদি তিনি মেনে নেন সভ্যতার সৃষ্টি অন্তঃপুরকে, তাহলে তাঁকে মেনে নিতে হয় অন্যান্য বিধানও। তিনি নৈতিকতার কথা বলেছেন, এ-নৈতিকতা পুরুষতন্ত্রের নৈতিকতা; যে-পুরুষতন্ত্র মনে করে নারী *ফিৎনা* বা বিশৃঙ্খলা। রোকেয়া কি নিজেকে ফিৎনা ব'লে স্বীকার করবেন? রোকেয়ার পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো পুরুষকে বোরকা পরানোর প্রস্তাব করা, যেমন করেছেন তিনি 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ, পুরুষকে ঢুকিয়েছেন অবরোধে। তিনি বোরকার পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (*রোর,* ৫৮) :

> রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোন ক্ষতি নাই।...রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি (public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিম্বা বোরকার দরকার হয়।

যদি রেলস্টেশনে কোনো মহিলা দর্শক আকৃষ্ট করেন, তবে দোষটা কার? মহিলার, না লোলুপ দর্শকের? যে-অপরাধ পুরুষের, তার জন্যে শাস্তি পাবেন মহিলা? তিনি 'কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক' ক'রে রক্ষা করবেন পর্দা? রোকেয়া *অবরোধবাসিনী*তে রেলস্টেশনে নারীর দুরবস্থার বেশ কয়েকটি শোচনীয় কাহিনী বলেছেন, আর তিনিই চাচ্ছেন নারী বোরকা প'রে সেখানে পুরুষের মনে ঘৃণা জাগিয়ে

আত্মরক্ষা করবে। তিনি অবরোধের পক্ষে দিয়েছেন সভ্যতার দোহাই : 'সকল সভ্য জাতিদেরই কোন-না-কোন রূপ অবরোধ-প্রথা আছে' (*রোর*, ৫৯)। তিনি জানেন যে তথাকথিত সভ্যতা হরণ করেছে নারীর অধিকার, আর তিনি লড়াই করছেন ওই পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধেই। তিনি অবরোধের পক্ষে একটি ভুল যুক্তি দিয়েছেন : 'আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই– শিক্ষার অভাবে হইয়াছে' (*রোর*, ৬১)। অবরোধ ও শিক্ষা একসাথে চলতে পারে না; কাউকে মহাপণ্ডিত ক'রে যদি রেখে দেয়া হয় অবরোধে, তাহলে সে তেজপূর্ণ, মহৎ, সাহসী হবে না; ব্যর্থ হয়ে যাবে তার শিক্ষা; শিক্ষিত হওয়ার পরও সে থাকবে পুরুষের দাসী ও কামসামগ্রী। তবে রোকেয়া জানেন অবরোধ ক্ষতিকর; তিনি বলেছেন (*রোর*, ৫৯-৬০) :

> আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে।... ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে।.. আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।...বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse) হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন করিতে হইবে।

তিনি অবরোধকে সুদর্শন করার প্রস্তাব করেছেন, চেয়েছেন মসৃণ অবরোধ; কিন্তু অবরোধ হচ্ছে অবরোধ, তা কোনো মসৃণতা জানে না। 'বোরকা' রচনাটিতে বিস্ময়করভাবে রোকেয়ার ওপর চেপে আছে আরব পিতৃতন্ত্র, এবং তিনি বিচ্যুত হয়েছেন নিজের স্বভাব থেকে। ধর্মকর্মের কথাও রোকেয়া বলেছেন পুরুষতন্ত্রের চাপে, কিন্তু ভালোভাবে চোখ দিলে দেখি যে ধর্মকে রোকেয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ ব'লে ভাবতেন না। 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি : সভানেত্রীর অভিভাষণ'-এ (*রোর*, ২৮২) রোকেয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন :

> মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।.. আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহু দূরে : প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়।

তিনি বালিকাদের কোরান শেখাতে চেয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষার সাথে, কারণটিও ব'লে দিয়েছেন : 'প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়।' তিনি ইসলামি পিতৃতন্ত্রের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন নি যে সব শিক্ষাই পাওয়া যায় ওই গ্রন্থে; তিনি বলেছেন প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ওই গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য।

পুরুষতন্ত্র নারীকে কয়েকটি ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করেছে; তার একটি গৃহিণীর ভূমিকা। রোকেয়া নারীর প্রথাগত ভূমিকায় বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু গৃহিণীর ভূমিকাটি তিনি মেনে নিয়েছিলেন। এটা তাঁর একান্ত নিজের বিশ্বাস থেকে নয়, অন্যদের বিশ্বাসকে তিনি দিয়েছিলেন স্বীকৃতি। তিনি প্রশ্ন করেছেন : 'আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় আপনারা সমস্বরে বলিবেন, "সুগৃহিণী হওয়া"' ('সুগৃহিণী', *রোর*, ৪৫)। রোকেয়া সুগৃহিণী হওয়াকে যে বড়ো কাজ ব'লে স্বীকার করেছেন, তা নয়; তবে তিনি

মেনে নিয়েছেন পুরুষতন্ত্রের এ-বিধানটি। বলেছেন, 'পুরুষ বিদ্যালাভ করেন অন্ন উপার্জনের আশায়', আর 'আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা Mental Culture) করিব কিসের জন্যে? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental Culture) আবশ্যক' (*রোর*, ৪৫-৪৬)। সুশিক্ষার উদ্দেশ্য সুগৃহিণী হওয়া? তাহলে কি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ে না শিক্ষা? যে-কাজ অশিক্ষিত পরিচারিকা করতে পারে একটু যত্ন নিলে, বা চিরকাল ধ'রে ক'রে আসছে নিরক্ষর সুগৃহিণীরা, তার জন্যে সুশিক্ষা এক প্রচণ্ড অপচয়। রোকেয়া ঘরকন্নার ক্লান্তিকর কাজের যে-দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন : 'গৃহ এবং গৃহসামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা, পরিমিত ব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহস্থালী সম্পন্ন করা, রন্ধন ও পরিবেশন, সূচিকর্ম, পরিজনদিগকে যত্ন করা, সন্তানপালন করা' (*রোর*, ৪৬), এবং সেগুলো সম্পন্ন করার যে-রীতি নির্দেশ করেছেন, তাতে সুগৃহিণী হয়ে ওঠে একটি শিক্ষিত দাসী, শিক্ষার শোচনীয় অপব্যয়। রোকেয়া নিশ্চয়ই উন্নত জাতের দাসী উৎপাদনের জন্যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন নি। রোকেয়া 'সূর্যোত্তাপে রান্না'র স্বপ্ন দেখেছিলেন গৃহিণীকে ক্লান্তিকর ঘরকন্না থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে, কিন্তু 'সুগৃহিণী'তে তিনি গৃহিণীর ওপর যে-ভার চাপিয়ে দেন তাতে খুব খুশি হবে পুরুষতন্ত্র। তারা তাদের স্ত্রীদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে খুব ব্যগ্র হয়ে উঠবে, কিন্তু শুধু নষ্ট হয়ে যাবে রোকেয়ার নারীরা।

পুরুষতন্ত্রের সাথে, বাধ্য হয়ে, সামান্য সন্ধির কথা বাদ দিলে রোকেয়া হয়ে ওঠেন পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ আমূল নারীবাদী, পিতৃ-ও পুরুষ-তন্ত্রকে যিনি ধারাবাহিক আক্রমণে বিপর্যস্ত ক'রে গেছেন। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান পুরুষতন্ত্র তাঁকেও নিষ্ক্রিয় ক'রে দিয়েছে, এবং তিনি যে-উত্তরাধিকারীদের সৃষ্টি ক'রে গেছেন, তাঁরা বহু দূরে স'রে গেছেন তাঁর চেতনা থেকে। তাঁর উত্তরাধিকারী নারীরা হয়েছেন 'ভদ্রমহিলা', স্বামীর শিক্ষিত দাসী ও প্রমোদসঙ্গিনী, সামাজিক সুবিধাভোগী, এবং তাঁরা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন রোকেয়াকে।

বঙ্গীয় ভদ্রমহিলা : উন্নত জাতের নারী উৎপাদন

উনিশশতকের বাঙলা দেখতে পায় এক অভিনব জাতের নারীর উদ্ভব, যার সাথে মিল নেই তার আগের নারীদের। বাঙলার নারী আগের হাজার বছর ধ'রে ছিলো গাঢ় অন্ধকারে; তার নিজের কোনো সত্তা ছিলো না, স্বাধীনতার কথা সে কখনো শোনে নি, তার কোনো স্বপ্ন ছিলো কিনা তা কেউ জানে না। পুরুষ তাকে পশুর থেকেও নিকৃষ্টরূপে বাঁচিয়ে রেখেছে, আগুনে পুড়েছে, ইচ্ছেমতো গ্রহণ করেছে ও ছেড়েছে, তাকে অবরোধের কারাগারে আটকে রেখেছে। উনিশশতকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি ছিলো নারীর জনপ্রিয়তম রূপক, তবে আবহমান বাঙালি নারী পিঞ্জর বা 'সোনার খাঁচা'য় পোষা ময়না ছিলো না; সে ছিলো পশুর থেকেও নিকৃষ্ট, পশুকেও মূল্যবান গণ্য করেছে বাঙালি পুরুষ কিন্তু নারীকে কখনো মূল্যবান মনে করে নি। তার জন্ম ছিলো বাঙালি পুরুষতন্ত্রের জন্যে বিভীষিকা, তার মৃত্যু ছিলো তৃপ্তিকর। তার সাথে পুরুষ কখনো আন্তরিক সম্পর্কে আসে নি, তার শরীরকেও কখনো পরিতৃপ্ত করে নি ব'লেই মনে হয়, যদিও তার 'মদন আট গুণ' ব'লে তাকে ধিক্কার দিয়েছে। শতাব্দীপরম্পরায় বাঙালির জন্ম হয়েছে পুরুষের ক্ষণিক উত্তেজনায়, অক্রিয় নারীদেহ ক্ষণিক পীড়নের ফলে। উনিশশতকের আগের বাঙালি নারী সম্পূর্ণ মুখাবয়বহীন, পুরুষতন্ত্রের যূপকাঠে রক্তাক্ত উৎসর্গিত একটি প্রাণী নারী। এ-অঞ্চলের দুটি সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলমান, প্রবল পিতৃতান্ত্রিক; উনিশশতক পর্যন্ত তারা বাস করেছে গভীর মধ্যযুগীয়তার মধ্যে, এখনো তারা সম্পূর্ণ উঠে আসে নি ওই মধ্যযুগ থেকে; বরং সেখানে ফেরার জন্যে তারা আজ খুবই ব্যগ্র। ঐতিহাসিকভাবে এ-অঞ্চলে অধিকাংশ পুরুষেরই কোনো স্বতন্ত্র সত্তা ছিলো না, তারাই ছিলো মুষ্টিমেয় সমাজপতির প্রচণ্ড পীড়নের শিকার; তাই নারীর দুরবস্থা ছিলো এখানে শোচনীয়তম। তারা ক্রীতদাসের ক্রীতদাসী ছিলো না, তারা ছিলো পশুর অধীনে পশুতর নারী।

উনিশশতকে উৎপন্ন হয় এক নতুন জাতের নারী, যার সাথে মিল নেই তার পূর্বপ্রজাতির। যে-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় তারা, তার নাম শিক্ষা। শিক্ষার ফলে উৎপন্ন অভিনব নারীদের বোঝানোর জন্যে দরকার পড়ে অভিনব শব্দ, তাদের জন্যে ইংরেজির অনুকরণে তৈরি করা হয় এক অভিনব শব্দ : *ভদ্রমহিলা*। উনিশশতকে তারা ছিলো সমগ্র বাঙালি নারীসমুদ্রে ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো, আঙুলে গোণা যেতো তাদের, সমকালের অধিকাংশের সাথে তাদের লিঙ্গগত মিল ছাড়া আর বেশি মিল ছিলো না। আজো যেমন ভদ্রমহিলারা সমগ্র বাঙালি নারীসমাজের একটি ছোটো সুবিধাভোগী অংশ, তারাও ছিলো তেমনই। সমাজে তারা দেখা দিয়েছিলো এক নতুন প্রপঞ্চরূপে, সমাজ তাদের চেয়েছে এবং চায় নি, আজো যেমন সমাজ তাদের চায় ও চায় না। এ-ভদ্রমহিলারা হয়ে আছে

বাঙালি নারীসমাজের এক বিচ্ছিন্ন অংশ, পুরুষতন্ত্রের স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন। ওই নারীরা ছিলো শিক্ষা নামের অভিনব প্রক্রিয়ার অভিনব উৎপাদন। শিক্ষার সাথে বাঙালি নারীর কোনো সম্পর্ক ছিলো না উনিশশতকের আগে, যদিও ইতিহাসে মেলে হটী বিদ্যালঙ্কার বা চন্দ্রাবতীর মতো দু-একটি নাম। হিন্দু সংহিতা লিখে তার শিক্ষা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলো, মুসলমানও তাই করেছিলো; মুসলমানের অবস্থা ছিলো আরো নিকৃষ্ট। উনিশশতকে কিছু নারী হঠাৎ আলো দেখতে পায়। তারা সবাই ব্রাহ্ম, দেশি খ্রিস্টান, ও হিন্দুসম্প্রদায়ের, সমাজের উঁচু ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর। ওই আলো, শিক্ষা, তাদের বদলে দিয়েছিলো; এমন নারী দেখা দিয়েছিলো বাঙলায়, যা আগে কখনো দেখা যায় নি। কিন্তু তারা ছিলো পুরুষতন্ত্রেরই পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুত। তারা নিজেরা স্থির করে নি তারা কী হবে, নিজেদের জীবন কীভাবে গ'ড়ে তুলবে, তারা নিজেরা চায় নি নিজেদের স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন; তারা উৎপাদিত হয় পুরুষতন্ত্রের শিক্ষাকলে পুরুষতন্ত্রের জীবনপরিকল্পনা অনুসারে। তবু তারা অভিনব, কিন্তু অসম্পূর্ণ।

উনিশশতকে, যেমন আজো, পুরুষ নারীকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে ও দিচ্ছে নিজেরই স্বার্থে, নিজেরই সুবিধার জন্যে; নারীর স্বার্থে নয়। তারা চেয়েছে সমাজের সব কিছু থাকবে অক্ষুণ্ন, অটুট থাকবে শোষণের সমস্ত ব্যবস্থা, পুরুষ থাকবে প্রভু নারী থাকবে তার অধীন, কিন্তু নারী কিছুটা শিক্ষা পাবে। শিখবে লেখাপড়া, পাশও করবে, কিন্তু থাকবে প্রথাগত পদানত নারী। পুরুষ চেয়েছে নারী তার ভূমিকা পালন ক'রে যাবে মনুসংহিতানুসারে; এবং হবে সহচরী, উন্নত জাতের শয্যাসঙ্গিনী, প্রসবকারিণী, ধাত্রী; হবে শিক্ষিত পরিচারিকা। তারা চেয়েছে ভিক্টোরীয় নারীরূপে দেখা দেবে সীতাসাবিত্রী; তারা চেয়েছে শিক্ষিত সতী ও পতিব্রতা। উনিশশতকি পুরুষতন্ত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গবাদ পুরোপুরি বজায় রেখে সূচনা করেছিলো স্ত্রীশিক্ষার; নারীর স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন তাদের লক্ষ্য ছিলো না, বরং সাবধান থেকেছে যাতে স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসনের মতো আপত্তিকর ব্যাপারগুলোতে উৎসাহী না হয়ে ওঠে নারীরা। হাজার বছর ধ'রে পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত নারীরাও দিয়েছে পুরুষতন্ত্রের কাম্য অনুকূল সাড়া, তারাও সাধারণত জয়গান গেয়েছে প্রথার; বিদ্রোহ সাধারণত তাদের স্বভাবে ছিলো না। পুরুষতন্ত্র তাদের জন্যে যত্নের সাথে শিক্ষক বেছেছে, তাদের জন্যে এমন পাঠ্যবই লিখতে চেয়েছে যাতে নারী হয়ে ওঠে নারী, যদিও ঠিক মতো লিখতে পারে নি; পুরুষতন্ত্র লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেছে যাতে শিক্ষা ভূমিকা বদলে দিয়ে নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে না তোলে। তারা চেয়েছে শিক্ষিত নারীসম্বলিত প্রথাগত বা প্রাচীন ভারতবর্ষ। তারা উৎপাদন করতে চেয়েছে বাহ্যিকভাবে উন্নত জাতের নারী, যারা পুরুষের সেবা করবে উন্নতভাবে, প্রমোদ যোগাবে উন্নতভাবে, গর্ভবতী হবে ও সন্তান লালন করবে উন্নতভাবে, কিন্তু থেকে যাবে পুরোনো নারী, রমণী, অবলা, বামা, সতী, ও পুরুষাশ্রিত। বাঙলায় নারীশিক্ষা প্রথম থেকেই নারীকে নষ্ট ক'রে দেয়, তার বিকাশের পথ দেয় বন্ধ ক'রে; তাই দেড় শো বছরের নারীশিক্ষা শুধু উন্নত জাতের নারী উৎপাদন ক'রে নিঃশেষ হয়, ব্যর্থ হয় নারীকে মুক্ত বা স্বাধীন করতে।

উন্নত জাতের বাঙালি নারী, যার নাম দেয়া হয়েছে *ভদ্রমহিলা*, উৎপাদনের স্বপ্ন বাঙালি পুরুষ প্রথম দেখে নি, দেখে বিদেশিরা। রামমোহন উনিশশতকের তৃতীয় দশকে নারীকে বাঁচান শ্মশানের গ্রাস থেকে, বিদ্যাসাগর দু-দশক পর বিধবাকে দেন আইনসম্মত সংসার, কিন্তু নারীকে শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগ তাঁরা নেন নি। বাঙলায় উন্নত জাতের, ভিক্টোরীয়, নারীর স্বপ্ন দেখে প্রথম ইংরেজ ধর্মপ্রচারকেরা, প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করে তারাই। বাঙালির প্রথম প্রয়াস ছিলো ওই উদ্যোগ ব্যর্থ ক'রে দেয়া, স্বপ্ন বার বার ভেঙে দেয়া। ওই ইংরেজ ধর্ম ও শিক্ষাপ্রচারকেরাও প্রগতিশীল গোত্রের ছিলো না, তারা বিশ্বাস করতো না নারীমুক্তিতে; তারা বিশ্বাস করতো কিঞ্চিৎ শিক্ষায়। নারীশিক্ষার সঙ্গে এদেশে বিদেশি ও দেশি যারা প্রথম জড়িত ছিলো, তারা ছিলো ভিক্টোরীয়; ভিক্টোরীয় যুগের সমস্ত কুসংস্কারে তারা ছিলো আচ্ছন্ন, যদিও ভিক্টোরীয় কুসংস্কারকেই তারা মনে করতো সভ্যতা। উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলায় যখন নারীশিক্ষা একটু ব্যাপকভাবে শুরু হয়, তখন নারীপুরষ সম্পর্কে ভিক্টোরীয় জনপ্রিয় ধারণা ছিলো যে নারী ও পুরুষ পৃথক ও পরিপূরক; নারীর স্থান গৃহ, পুরুষের স্থান বাইর। টেনিসনের *প্রিন্সেস* (১৮৪৭), রাসকিনের *সিসেম অ্যান্ড লিলিজ*-এ (১৮৬৫) প্রস্তাবিত হয় যে-*পৃথক এলাকাতত্ত্ব* বা *পরিপূরকতত্ত্ব*, তাই গ্রহণ করেছিলো তারা, মিলের *দি সাবজেকশন অফ উইমেন*-এ (১৮৬৯) নারীর যে-অধিকার দাবি করা হয়, তা ছিলো তাদের কাছে ভীতিকর। টেনিসন, রাসকিন ও ভিক্টোরীয়রা চেয়েছিলেন নারী কিছুটা শিক্ষা পাবে, যা হবে মূলত নিরর্থক, হবে পুরুষের আকর্ষণীয় সহচরী। নারী কিছুটা অগভীর ব্যবহারিক জ্ঞান আয়ত্ত করবে, কিন্তু তার জ্ঞান কাজে খাটাতে পারবে না, সে হবে স্বামীর সুখকর সেবিকা ও বিনোদসঙ্গিনী। নারী হবে পুরুষের বাইবেলি 'হেল্পমিট' বা দাসী। উনিশশতকের নারীদের জন্যে ও নারীদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম বেশ তাৎপর্যপূর্ণ : *বামাবোধিনী পত্রিকা* (১৮৬৩), *অবলাবান্ধব* (১৮৬৯), *বঙ্গমহিলা* (১৮৭৫), *ভারতী* (১৮৭৭), *পরিচারিকা* (১৮৭৮), *পাক-প্রণালী* (১৮৮৩), *গার্হস্থ্য* (১৮৮৪), *মহিলা-বান্ধব* (১৮৮৭), *দাসী* (১৮৯৭), *মহিলা* (১৮৯৭), *অন্তঃপুর* (১৮৯৮)। *পরিচারিকা*, আর *দাসী*ধর্মী নামেই জানিয়ে দিয়েছে নারী আসলে কী?

যে-ব্রাহ্মরা এদেশে প্রবল উৎসাহের সাথে এগিয়ে গিয়েছিলো নারীশিক্ষার দিকে, তারা ছিলো বাইবেলি সহচরীতত্ত্বের অনুরাগী, আর দেশি খ্রিস্টানরা তো ধর্মীয় কারণেই ছিলো তার অনুরাগী। বাঙালি পুরুষ সহস্রক ধ'রে নিরক্ষর নারীর আত্মোৎসর্গপরায়ণতা, ত্যাগ, সতীত্ব, পাতিব্রত্য উপভোগ করেছে, উনিশশতকে তারা উপভোগ করতে চায় শিক্ষিত সতীত্ব, মাতৃত্ব, পাতিব্রত্য, আত্মোৎসর্গপরায়ণতা। রাসকিন-টেনিসনি *পৃথক এলাকাতত্ত্ব* ছিলো নারীর জন্যে কারুকাজকরা নতুন শেকল, নারীর জীবন ব্যর্থ ক'রে দেয়ার ভিক্টোরীয় চক্রান্ত [দ্র 'নারীর শত্রুমিত্র']। তাই উনিশশতকের বাঙলায় নারীশিক্ষার যে-ধারা প্রবর্তিত হয়, তা উৎপাদন করেছে এক ধরনের উন্নত জাতের নারী, যার পবিত্র কাজ পুরুষতন্ত্রের সেবা করা। তখন বাঙলায় নারী বোঝানোর জন্যে পিতৃতান্ত্রিক শব্দ ছিলো 'স্ত্রীলোক', 'মাগী'ও ছিলো বহুলপ্রচলিত; কিন্তু এ-নতুন জাতের নারীর

জন্যে ভিক্টোরীয় আদলে তৈরি করা হয় একটি নতুন শব্দ : *ভদ্রমহিলা।* 'মহিলা' শব্দও তাদের জন্যে যথেষ্ট মনে হয় নি, কেননা শব্দটি সম্ভবত তৈরি করেছিলো ভিক্টোরীয় ভাবাদর্শদীক্ষিত পিউরিটান ব্রাহ্মরা, যদিও 'মহিলা'র অর্থই 'ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত নারী'। রাসকিন বিলেতি নারীদের কপটভাবে তোষণের জন্যে প্রস্তাব করেছিলেন 'লেডি' শব্দটি, যার অর্থ তিনি করেছিলেন 'ব্রেড-গিভার', যার কাজ দানদক্ষিণা করা বা ভিক্ষা দেয়া। ওই 'লেডি'র বাঙলাই হয় 'ভদ্রমহিলা' : ব্যাকরণিক ও প্রজাতিগতভাবে এক অভিনব নারী, কিন্তু মর্মমূলে প্রথাগত।

বাঙলায় সুযোগসুবিধা চিরকালই প্রাপ্য একমুঠো মানুষের, শিক্ষার সুযোগও পেয়েছিলো একমুঠো নারী। মুসলমানেরা তখন শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলো; আর এ-দেশের অধিকাংশ যারা, সে-দরিদ্রদের শিক্ষা কেনো জীবনেরই অধিকার নেই, তাই তারা শিক্ষা থেকে সব সময়ই বহু দূরে। মুসলমানদের মধ্যে যারা উচ্চবিত্ত ছিলো, তারা অধিকাংশই বাঙালি ছিলো না; আর বাঙালি মুসলমান মাত্রই ছিলো দরিদ্র, এবং সমগ্র মুসলমান সমাজ ছিলো মধ্যযুগাচ্ছন্ন। শিক্ষালাভের সুযোগ ছিলো উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের, ব্রাহ্মদের, ও দেশি খ্রিস্টানদের। অধিকাংশ সামন্ত হিন্দু ওই সুযোগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ক'রে থেকেছে অন্ধকারে, ব্রাহ্ম ও দেশি খ্রিস্টানরা সুযোগ নিতে চেয়েছে প্রাণপণে। তখনও দেশ জুড়ে জমাট মধ্যযুগ, কুসংস্কারের অপ্রতিহত আধিপত্য; নারী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চুপ। বাঙলার পুরুষতন্ত্র নারীকে মুখ খুলতে দেয় নি আবহমান কাল ধ'রে, নারী তার কথা বলে নি কখনো, সে হয়ে উঠেছিলো অবলা ও নির্বাক। নারী জানতো লেখাপড়া শেখার অর্থ বিধবা হওয়া, নারী জানতো কালিকলমের সংস্পর্শ তার জীবনকে শোচনীয় ক'রে তুলবে; তাই নারীর বুকে শিক্ষার জন্যে আকুলতা জাগার কথা নয়; তবুও আকুলতা জেগেছে, কিন্তু নারী তা প্রকাশ করতে পারে নি। উনিশশতকের নারীদের আত্মজীবনীতে মাঝেমাঝে প্রকাশ পেয়েছে লেখাপড়ার জন্যে লোকোত্তর আকুলতা, রাসসুন্দরী দিয়েছেন যার অবিস্মরণীয় বর্ণনা, সে-আকুলতা নিশ্চয়ই জন্ম নিয়েছে অজস্র নারীর বুকে; কিন্তু তা কখনো প্রকাশ পায় নি।

উনিশশতকে নারীশিক্ষার কথা প্রথম বলে বিদেশি পুরুষেরা, পরে দেশি পুরুষেরা; নারীরা নয়। বলার কোনো উপায় ছিলো না, বলার মতো কোনো মানুষ ছিলো না। বাঙলার দরিদ্র নারীরা চিরকাল বাইরে বেরিয়েছে, বাইরের কাজ করেছে, তারা স্বাধীনতার আগুনের মধ্যে জ্বলেছে; কিন্তু উচ্চবর্ণের সামন্ত পরিবারের নারীরা বন্দী থেকেছে অবরোধে। ভারতবর্ষে অবরোধ নিয়ে এসেছিলো মুসলমানেরা, এবং হিন্দুরা ওই অবরোধে মুসলমানদের মতোই অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অবরোধের শিকার ছিলো উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণের নারীরা। ওই অবরুদ্ধ নারীদের বোঝানোর জন্যে বেশ কিছু শব্দ মেলে বাঙলায় : অন্তঃপুরিকা, পুরনারী, পুরলক্ষ্মী, পুরাঙ্গনা, পৌরস্ত্রী, পুরস্ত্রী, পুরমহিলা, পুরবালা, পুরবাসিনী, অন্তঃপুরবাসিনী, পৌরাঙ্গনা, অসূর্যসম্পশ্যা। পাথরখণ্ডের মতো এ-শব্দগুলোই বুঝিয়ে দেয় কেমন শক্ত দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিলো বাঙলার উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণের নারীদের। একটি সামন্ত জমিদার বা ধনী গৃহস্থের বাড়ির বর্ণনা দেয়া

যাক। ওই বাড়িটি বিশাল; ওই গৃহের সম্মুখভাগের বড়ো অংশ জুড়ে সদরমহল, এবং পেছনের দিকে অল্পজায়গা জুড়ে অন্তঃপুর বা অন্দরমহল বা জেনানা, যেখানে বন্দী থাকতো নারীরা। অন্দরমহলটি হতো অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর, যাতে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচতো উচ্চবর্ণের নারীরা। তাদের জীবনে কোনো আলো ছিলো না, জীবন ছিলো না। বাড়ির কর্তাও দিনের বেলা অন্দরমহলে ঢুকতে পারতো না; রাতে হয়তো কখনো এসে আকস্মিকভাবে মিলিত হতো স্ত্রীর দেহের সাথে। সামন্ত প্রভুদের অবশ্য স্ত্রীসহবাসের বিশেষ শারীরিক প্রয়োজন পড়তো না, বাগানবাড়িতে ও পতিতাপল্লীতে তাদের প্রয়োজন মিটতো, তবু তারা উত্তরাধিকার সৃষ্টির গভীর আগ্রহেই মিলিত হতো স্ত্রীদের শরীরের সাথে। উনিশশতকের আগে বাঙলায় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কোনো মানবিক সম্পর্ক ছিলো না, উচ্চবিত্তের পুরুষ পতিতার সাথে যতোটা সময় কাটাতো স্ত্রীর সাথে তার একাংশও কাটাতো না; মানসিক সম্পর্কের কথা ছিলো অজানা, শারীরিক সম্পর্ক ছিলো খণ্ড উত্তেজনার। তাই নারীর কথা কেউ শুনতে পায় নি, নারী কারো কাছে নিজের কথা বলে নি। দরিদ্র নারীরা ভাত নিয়ে চিরকাল চিৎকার করেছে, জীবনের কথা বলার অধিকার তাদের ছিলো না। পুরুষই চিরকাল বলেছে নারীর কথা, উনিশশতকে নারীর কথা বলে, আর নারীর জন্যে জীবনপরিকল্পনা করে পুরুষই।

১৮১৭তে যেদিন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিনই অনিবার্য হয়ে ওঠে নারীশিক্ষা। ওই কলেজ যে-অভিনব পুরুষ সৃষ্টির ভার নেয়, তার জন্যে যে অপরিহার্য হয়ে উঠবে অভিনব ধরনের নারী, তা হয়তো সেদিন কেউ ভাবে নি, কিন্তু সেদিনই হয় নারীশিক্ষার বীজ বোনা। নারীশিক্ষা এদেশে নারীর জন্যে হয় নি, হয়েছে পুরুষের জন্যে; নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো নারী শিক্ষিত হবে, তার ফল ভোগ করবে পুরুষ। ১৮১৮তে চুঁচুড়ায় এক ইংরেজ ধর্মপ্রচারক প্রতিষ্ঠা করেন এদেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় সম্ভবত ক্রাইস্টের করুণা নারীজাতির কাছে পৌছে দেয়ার জন্যে, কিন্তু তাঁর করুণা পাওয়ার জন্যে বিশেষ কারো আগ্রহ জাগে নি। মেরি অ্যান কুক ১৮২৩ থেকে কয়েক বছরের মধ্যে স্থাপন করেন বেশ কিছু বালিকা বিদ্যালয়, কিন্তু সেগুলো সফল হয় নি; কেননা হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তখনো নিজেদের চাহিদা জানায় নি। তখনো সৃষ্টি হয় নি লেখাপড়াজানা মেয়ের জন্যে যুবকদের বুকে আবেগ, বা শিক্ষিত বউবাজার। কিন্তু ১৮৩০-এর দশকেই দেখা দেয় এক অভিনব ব্যাপার, স্বামীরা বাড়িতে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করে স্ত্রীদের। স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি সত্য যে হিন্দু কলেজে অভিনব পুরুষ তৈরি হয়েছে, তার জন্যে দরকার অভিনব নারী। ১৮৩৮-এই *সমাচার দর্পণ*-এ চিঠি বেরোয় : 'দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহয্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন?' তিরিশের দশক থেকে ফল ফলতে শুরু করে হিন্দু কলেজের; তখন যারা ওই কলেজে পড়তো, বা পড়া শেষ করেছে তাদের পক্ষে পিতামহীকে নিয়ে জীবন কাটানো সম্ভব ছিলো না। তাই তরুণ স্বামীরা নিজেদের চাহিদা অনুসারে ঢালাই করতে শুরু করে স্ত্রীদের, নিজেরাই প্রস্তুত করতে শুরু করে স্বপ্নের স্ত্রী। শুরু হয় বঙ্গীয় হাওয়া উপাখ্যান; ব্রাহ্ম-হিন্দু আদমেরা পাঁজরের অস্থির বদলে পুস্তক দিয়ে সৃষ্টি করতে থাকে ব্রাহ্ম-হিন্দু হাওয়া। নিজের স্বার্থে নিজের উপভোগের জন্যে।

তরুণ স্বামীরা দেখা দেয় শিক্ষকরূপে, এবং তিরিশের দশক থেকে কয়েক দশক ধ'রে বাড়িতে স্বামীর কাছে লেখাপড়া শেখে অনেকেই; শেখে বেশ ভালো লেখাপড়া। কৈলাসবাসিনী দেবী, দ্রবময়ী, বামাসুন্দরী, কুমুদিনী, নিস্তারিণী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী ও আরো কজন গৃহশিক্ষিত নারী এখন বিখ্যাত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম ভারতবর্ষীয় আইসিএস, যেভাবে স্ত্রীকে শিক্ষিত ক'রে তোলেন, তা নিজের জন্যে উপযুক্ত স্ত্রী সৃষ্টির অনন্য উদাহরণ হয়ে আছে। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যম, উদ্দীপনা ও প্রগতিশীলতাকে স্বীকার না ক'রে পারা যায় না, কিন্তু ওই রীতিতে শিক্ষিত নারী সৃষ্টিই বাঙলায় নারীশিক্ষার এক মৌল দুর্বলতা। স্বামী শিক্ষিত মানুষ সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে শিক্ষিত স্ত্রী; গ'ড়ে নেয় নিজের মতো ক'রে, স্ত্রী হয় স্বামীর ব্যবহারের সুখকর সামগ্রী। জ্ঞানদানন্দিনী যদি অন্য কারো হাতে পড়তেন, তাহলে হয়তো অশিক্ষিতই থাকতেন; বা কোনো উকিলের স্ত্রী হ'লে তিনি হতেন উকিলের স্ত্রী। এতে নারীর মুক্তি ঘটে না, ব্যক্তিগতভাবেও নয়, শ্রেণীগতভাবে তো নয়ই। মুক্তি না ঘটলেও কিছুটা মুক্তি ঘটেছে অবশ্যই, তাতে ব্যক্তিগতভাবে উপকার হয়েছে অনেকের; কিন্তু বাঙালি নারীর তাতে বিশেষ উপকার হয় নি।

১৮৪৯ সালে জে ই ডি বেথুন বা বিটন কলকাতায় স্থাপন করেন ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল, পরে তার নাম হয় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়। এ-বিদ্যালয় থেকেই শুরু হয় বাঙালি নারীদের ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, ইংরেজের উদ্যোগে, ও বিদ্যাসাগরের মতো দেশি উৎসাহীদের সহযোগিতায়। দেশি বুড়োদের নারীশিক্ষায় উৎসাহ থাকার কথা ছিলো না, কেননা ওই শিক্ষার ফল তারা ভোগ করতো না; তাই তারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় নি। রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার লিখেছিলেন *স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক* (১৮২২); রাধাকান্ত নারীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু দের নিজের কন্যাদের শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন না; যেমন অনেক পরে রবীন্দ্রনাথও নিজের কন্যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেন নি। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উৎসাহ ছিলো বিদেশিদের, তারা জীবনে মহৎ কিছু করতে চেয়েছিলো, আর ছিলো তরুণ শিক্ষিতদের, কেননা তারা স্ত্রী হিশেবে পেতে চেয়েছে শিক্ষিত নারী। তরুণদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গতি ছিলো না, তাই বিদেশিরাই ছিলো বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা। বিদেশিরা চেয়েছিলো ভিক্টোরীয় নারী তৈরি করতে, তরুণরা চেয়েছিলো শিক্ষিত বা আধুনিকা স্ত্রী। ১৮৭০-এর দশকে লেখাপড়াজানা বউর প্রবল চাহিদা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাই দিকে দিকে ব্যাঙের ছাতার মতো বালিকা বিদ্যালয় দেখা দিতে থাকে, যেগুলোর লক্ষ্য মেয়েদের বিয়ের বাজারে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা। ওই সব বিদ্যালয় টেকে নি। *জ্ঞানাঙ্কুর* ১৮৭৫ সালেই জানায় যে 'এক্ষণকার যুবকেরা শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন, কেনই বা না চাহিবেন? যুবকদের লেখাপড়া শিখাইলে স্ত্রীদিগকে অবশ্যই লেখাপড়া শিখাইতে হইবে...আরো কিছু দিন পরে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিবে' [উদ্ধৃত গোলাম মুরশিদ (১৯৮৫, ৩২)]। তখন পর্যন্ত একটি বাঙালি মেয়েও প্রবেশিকা পাশ করে নি, কিন্তু শিক্ষিত স্ত্রীর বাজার তৈরি হয়ে গেছে, বউ হওয়ার জন্যেই দরকার পড়ে ক খ গ ঘ এ বি সি ডি লেখাপড়া। শিক্ষিত বউর বিরোধীরও

অভাব ছিলো না। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় *জ্ঞানাঙ্কুর*-এ ১৮৭৩-এ লিখেছিলেন, 'বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের সংসর্গ অপেক্ষা নরকবাস বরং ভাল।' প্রথম যে-বাঙালি মেয়েটি প্রবেশিকা বা এন্ট্রান্স আর্টস পাশ করেন, তিনি দেশি খ্রিস্টান চন্দ্রমুখী বসু। দেরাদুন বিদ্যালয় থেকে ১৮৭৬-এ তিনি পাশ করেন। তাঁর দু-বছর পর ১৮৭৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন কাদম্বিনী বসু [ব্রাহ্ম], যিনি এক নম্বরের জন্যে প্রথম বিভাগ পান নি। ১৮৮০তে চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দেন, দুজনেই বিএ পাশ করেন ১৮৮৩তে। চন্দ্রমুখী ১৮৮৪তে এমএ পাশ করেন, কাদম্বিনী চিকিৎসাবিদ্যায় ভর্তি হন। বিদ্যাসাগর চন্দ্রমুখীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেক্সপিয়রের রচনাবলি উপহার দেন। ১৯০০ সালের মধ্যে ২৭জন নারী বিএ পাশ করেন। শিক্ষা খুব এগোয় নি, কিন্তু তখন আলোড়ন তৈরি হয়েছে বিপুল।

বাঙলায় নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো আকর্ষণীয় সহচরী, সুগৃহিণী, সুমাতা উৎপাদন করা। এর কোনোটিই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য নয়। আগের নারীরা অশিক্ষিত ছিলো, কিন্তু তারা যে সুগৃহিণী ও সুমাতা ছিলো না, তা নয়; তারা খুবই উৎকৃষ্ট ছিলো মা ও গৃহিণী হিশেবে। এ-বস্তু উৎপাদনের জন্যে *মেঘনাদবধকাব্য*, জ্যামিতি, বা শেক্সপিয়রের কবিতা লাগে না; কাউকে লেখাপড়া শিখিয়ে এমনভাবে গর্ভবতী করা সম্ভব নয় যে সে প্রসব করবে কোনো রবীন্দ্রনাথ বা নিউটন। আদর্শ মাতার ধারণাও খুবই ভুল ছিলো, যেমন আছে আজো; তখন অনেকেই কামনা করেছে শিক্ষা এমন মা উৎপাদন করবে, যারা দলে দলে প্রসব করবে নেপোলিয়ন বা জর্জ ওয়াশিংটন বা গারিবাল্ডি। যে-মা নেপোলিয়ন বা হিটলার প্রসব করতে পারে, তার সম্পর্কে তো আগে থেকেই সাবধান হওয়া দরকার। আসলে নারীশিক্ষার লক্ষ্য ছিলো আকর্ষণীয় সহচরী ও শয্যাসঙ্গিনী উৎপাদন। নারীর বিকাশ ঘটানো, তাকে স্বায়ত্তশাসিত মানুষরূপে বেড়ে উঠতে দেয়া এর লক্ষ্য ছিলো না; তাকে আর্থনীতিকভাবে স্বাধীন করা এর উদ্দেশ্য তো ছিলোই না, বরং এটাই অনেকের ভয় ছিলো যে নারী একদিন স্বাধীন হয়ে পড়তে পারে। তাই নারী যাতে স্বাধীন স্বনির্ভর না হ'তে পারে, নারীর জন্যে প্রস্তাবিত হয় ভিন্ন ধরনের শিক্ষা; তা শিক্ষা নয়, নারীশিক্ষা, যাতে বিকশিত হবে নারীর নারীত্ব ও রমণীয়তা। নারীর পাঠক্রম নিয়ে শুরু হয় বড়ো বিতর্ক।

১৮৬০-এর দশকে প্রস্তাব করা হয় যে নারীদের বিশেষভাবে দিতে হবে ঘরকন্না, রান্নাবান্না, শেলাই, শিশুপালন ইত্যাদি নারীসুলভ শিক্ষা। ভারতীয় মহাপুরুষেরা কপটতায়ও মহান হয়ে থাকেন। যেমন কেশবচন্দ্র সেন বিলেতে নারীদের সম্পর্কে এতো মহৎ সব কথা বলেন যে অ্যানেট অ্যাক্রয়েড তাতে মুগ্ধ হয়ে নারীশিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন; এসে দেখেন কেশব সেন নারীদের প্রথাগত নারী ক'রে রাখতেই চান। তাঁর প্রকাশ্য কলহ বাধে কেশব সেনের সাথে, কেননা কেশব সেন চান 'ভদ্রমহিলা', অ্যাক্রয়েড চান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী [দ্র বোর্থউইক (১৯৮৪, ৫৮-৫৯)]। কেশব সেন চেয়েছিলেন নারী শিখবে রমণীয় শিক্ষা;- তারা জ্যামিতি, দর্শন, অঙ্ক প্রভৃতি পুরুষালি বিষয় পড়বে না, শিখবে শেলাই, রান্না, শিশুপালন;

শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর অনুরাগীরা অবশ্য দাবি করেছেন যে নারীরা পড়বে সব কিছুই। রাজনারায়ণ বসু (১৮৭৪, ৪৭) বলেছেন, 'হয় স্ত্রীদিগের রীতিমত শিক্ষা দেও, নতুবা শিক্ষা দেওয়ায় কাজ নাই।' দেড় দশক পরে *ইন্ডিয়ান ক্রিস্টান হেরাল্ড* (১৮৮২) উগ্রতার সঙ্গেই নারীদের নারী বানিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে চায় : 'ভারত চায় যে তার পুত্ররা হবে পুত্র এবং কন্যারা হবে কন্যা, পুত্র নয়' [উদ্ধৃত বোর্থউইক (১৯৮৪, ৯৮)। ভারতকন্যা বানানোর জন্যে তাদের কী পড়াতে হবে? পড়াতে হবে গার্হস্থ্য অর্থনীতি, অঙ্কন, সঙ্গীত, রান্না, শেলাই ও স্বাস্থ্যবিধি, যা আসলে কোনো শিক্ষাই নয়।

পুরুষ চেয়েছে শিক্ষিত স্ত্রী, আর নারী শিক্ষিত হ'তে চেয়েছে ভালো বর পাওয়ার জন্যে : বাঙলায় নারীশিক্ষার এ-মহান উদ্দেশ্য আজো পুরোপুরি বজায় রয়েছে। পিতৃতন্ত্র নারীর সমস্ত পথ বন্ধ ক'রে খোলা রেখেছে একটি পথ, সেটি বিয়ে; তাকে দিয়েছে একটি পেশা, সেটি বিয়ে। উৎকৃষ্ট পেশায় নিয়োজিত হওয়ার যোগ্যতার থেকেও এ-অঞ্চলে কঠিন একটি ভালো বিয়ে; এবং বিয়েই যেহেতু নারীর নিয়তি, তাই শিক্ষা হয়ে ওঠে নারীর নিয়তিউন্নয়নের হাতিয়ার। তবে একমাত্র শিক্ষাই ভালো বিয়ের সোনার চাবি নয় নারীর জন্যে, শিক্ষা নারীর জন্যে শুরু থেকেই হয়ে ওঠে প্রসাধন : তাকে ভালো বংশের হ'তে হবে, তার বাপের সমৃদ্ধ অর্থকোষ থাকতে হবে, তার রূপ থাকতে হবে, তারপর থাকতে হবে শিক্ষা। শিক্ষা হচ্ছে অতিরিক্ত যোগ্যতা, এবং কখনো কখনো অযোগ্যতা। নারীশিক্ষার শুরু থেকেই বাঙলায় শিক্ষা নারীর জন্যে বিয়ের অতিরিক্ত যোগ্যতা হয়ে আছে; এবং এজন্যেই নারীশিক্ষা অনেকটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ওই সময়, যেমন এখনো, যারা শিক্ষাকে নিয়েছিলো বিয়ের সিঁড়িরূপে, যারা আসলে জ্ঞানের দিকে এগোয়ই নি, তারা প্রায় সবাই সুযোগ পেলেই বিয়ে ব'সে শিক্ষার আশুউদ্দেশ্যকে সফল করেছে। কিন্তু যাঁরা শিক্ষাকে নিয়েছিলেন গুরুত্বের সাথে, বিয়ে হয়ে ওঠে তাঁদের জন্যে সংকট। তাঁরা অনেকে বিয়েই করেন নি, বা করেছেন বেশ দেরিতে, এবং কেউ কেউ বিয়ে ক'রে নষ্ট করেছেন জীবন।

প্রথম এমএ চন্দ্রমুখী বসু একচল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন বিপত্নীক কেশবানন্দকে; তাঁর বোন বিধুমুখী, প্রথম দুই মহিলা এমবির একজন, অবিবাহিত থাকেন আজীবন। ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, প্রথম দুজন মহিলা এমবির একজন, যিনি অধিকার করেছিলেন প্রথম স্থান, উনচল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন এক চিকিৎসককে। ভার্জিনিয়া নিজে ছিলেন সুচিকিৎসক, কিন্তু বিয়ের পর চিকিৎসা ছেড়ে হয়ে ওঠেন স্বামীর রোগীদের সেবিকা। কামিনী সেন (রায়) বিয়ে করেন তিরিশ বছর বয়সে। এর আগেই কবি হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি, বিয়ের পর কল্যাণী স্ত্রী হওয়ার তাঁর সাধ জাগে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে বলেন যে সংসারই তাঁর কবিতা। তবে কবিতাও প্রতিশোধ নিতে দেরি করে নি; অনতিবিলম্বেই বিধবা হয়ে কামিনী রায় ফিরে আসেন কবিতায়। বিয়ে তাকে অপমৃত্যু দিয়েছিলো, কবিতা আজো তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাঁর বোন যামিনী সেন চিকিৎসক হয়েছিলেন, বিলেত থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছিলেন, বুঝেছিলেন সংসার কাকে বলে; তাই বিয়েই করেন নি।

জগদীশচন্দ্র বসুর অনুজা হেমপ্রভা বসু এমএ, রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লজ্জাবতী বসু বিএ, রাধারাণী লাহিড়ী বিএ, সুরবালা ঘোষ বিএ বিয়ে করেন নি। তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন পুরুষতন্ত্রকে, এবং পুরুষতন্ত্র আজো তাদের দেখে সন্দেহের চোখে। বিয়ের পায়ে অনেকেই, নারীশিক্ষার সূচনায়ই, উৎসর্গ ক'রে দেন শিক্ষাকে। সরলা দাস প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন প্রবেশিকার জন্যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর পরীক্ষার অনুমতিও মিলেছিলো, কিন্তু এক ডাক্তারের সাথে বিয়ে হবে ব'লে তিনি পরীক্ষা দেন নি। হেমন্তকুমারীও একই কারণে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন নি। সবলা সেনের ইচ্ছে ছিলো বিএ পাশ ক'রে কোনো পেশায় ঢুকবেন, কিন্তু এক ব্যারিস্টারের বউ হওয়ার পর সংসারের পেশায় এতো সুখ পান যে আর কোনো পেশার কথা ভাবতে পারেন নি। শিশিরকুমারী বাগচী ১৮৯৮-এ বিএ পাশ ক'রে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন, কিন্তু বিয়ের পর করেন সুখের সংসার। শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়ে হেমলতা ১৮৯৩-এ বিয়ের পর ছেড়ে দেন একটি ভালো চাকুরি। তাই লেখাপড়া হয়ে থাকে বিয়ের সিঁড়ি, প্রধান পেশা থাকে বিয়ে ও সংসার। বাঙালি নারী আজো বহন করছে এ-সুখকর অভিশাপ।

কেউ বিএ পাশ ক'রে যদি বাসায় ব'সে থাকে, বা হয় সুগৃহিণী বা সুমাতা, তবে তা হচ্ছে শিক্ষার অপচয়, এবং ক্ষতিকর। শিক্ষিত সুগৃহিণী, যে কোনো পেশায় জড়িত নয়, তার পক্ষে পরগাছা হয়ে ওঠা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না। নারীশিক্ষা, পুরুষতন্ত্রের পরিকল্পনা অনুসারে, বাঙলায় সৃষ্টি করেছে পরগাছার জঙ্গল। প্রথম দুজন নারী স্নাতক বেরোতে না বেরোতেই *নিউ ডিস্পেন্সেশন* (৮ জুলাই ১৮৮৩) লেখে [উদ্ধৃত বোর্থউইক (১৯৮৪, ৩১০)] :

> স্নাতক পরীক্ষার জন্যে ছাত্রীদের ভর্তি করার বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতির বিরুদ্ধে যাই বলা হোক না কেনো, সত্য আমাদের মেনে নিতেই হবে, এবং তা হচ্ছে যে এর মাঝেই আমরা কয়েকজন নারী-বিএ পেয়েছি। আমরা তাঁদের নিয়ে কী করবো? যদি তাঁদের শুধু তাঁদের ডিগ্রি নিয়ে থাকতে দিই, তবে তাঁরা শিক্ষক হিশেবে পচবেন এবং অহমিকায় নষ্ট হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো পথ থাকবে না। নারী স্নাতকদের শুধু ডিগ্রি দিয়ে বিদায় ক'রে দিলে তা সমাজের নৈতিকতা উন্নয়নে কতোটা কাজে আসবে, তা আমরা জানি না। জনস্বার্থে সর্বোৎকৃষ্ট নীতি হবে তাঁদের সদ্ব্যবহার করা।

কিন্তু শুরু থেকেই এর সদ্ব্যবহার হয় নি। প্রথম পর্যায়ে যাঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন, তাঁরা ধনী পরিবারেরই ছিলেন; তাই তাঁদের জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে নামতে হয় নি বেশি। আর বিয়ে হয়ে গেলে তো চমৎকার। ছিলো প্রচণ্ড রক্ষণশীলতা, দু-এক দশক আগে পর্যন্ত নারীর কোনো পেশায় নিযুক্ত থাকাকে সমাজ ভালো চোখে দেখে নি। নারীরাও নষ্ট করেছে নিজেদের। একটা ভালো বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তারা হারিয়ে ফেলে শিক্ষার সবটুকু, হয়ে ওঠে সচ্ছল স্বামীর অপদার্থ শয্যাসঙ্গিনী। তারা অশিক্ষিত নারীর থেকেও অনেক অধম। উনিশশতকে, যেমন আজো, নারী যখন পেশা গ্রহণ করতে চেয়েছে, তখন সমাজ তার জন্যে রেখেছে দুটি নারীসুলভ পেশা : শিক্ষকতা, ও চিকিৎসা বা ধাত্রীবিদ্যা। আজো প্রধানত এ-দুটি পেশায় আটকে আছে নারী। ১৯০১-এ কলকাতায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন ৭২৫জন নারী [দ্র বোর্থউইক (১৯৮৪, ৩১০)]. তার মধ্যে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষকের পেশায় ৫৮৭জন, প্রশাসন ও পরিদর্শনে

৬জন, চিকিৎসায় ১২৪জন, চিত্রগ্রহণে ৪জন, লেখক, সম্পাদক, সাংবাদিক ৪জন। পেশা হিশেবে শিক্ষকতাকে প্রথম নিয়েছিলেন পাবনার বামাসুন্দরী দেবী। ১৮৬৩তে ২০ বা ২১ বছরের এ-তরুণী প্রতিষ্ঠা করেন একটি বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৬০-এর দশকে ব্রাহ্ম মনোরমা মজুমদার বরিশালে নানা বৈরিতার মধ্যে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি ঢাকা সরকারি বয়স্ক বালিকা বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক হিশেবে যোগ দেন মাসে ৬০ টাকা বেতনে। যাঁরা প্রথম চাকুরি নিয়েছিলেন তাঁরা সাধারণত ছিলেন দেশি খ্রিস্টান ও হিন্দু বিধবা। খিস্টানদের কোনো সামাজিক বাধা ছিলো না, আর হিন্দু বিধবার ছিলো জীবিকার সমস্যা; তাই তাঁরা পেশায় জড়িয়েছেন নিজেদের। ১৮৬৬ সালে রাধামণি দেবী মাসে ৩০ টাকা বেতনে শেরপুর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। তিনি চশমা পরতেন, এটা ছিলো তাঁর সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য। রাধারানী লাহিড়ী বিএ ১৮৮০তে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে বেথুন বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন; ১৮৮৬তে তিনি হন মাসে ১০০ টাকা বেতনের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। তাঁরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন বাঙালি নারী আগের হাজার বছরে তা ভোগ করে নি, কেননা তাঁরা ছিলেন আর্থনীতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত।

চন্দ্রমুখী বসু, প্রথম নারী এমএ, ১৮৮৪তে মাসিক ৭৫ টাকা বেতনে বেথুন বিদ্যালয়ের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হন; ১৮৮৬ সালে হন মাসিক ১৫০ টাকা বেতনের তত্ত্বাবধায়ক। চমৎকার বেতন! কেউ কেউ চাকুরির জন্যে নিজের এলাকা থেকে চ'লে যান সুদূরে : ১৮৯০-এ অবিবাহিত শরৎ চক্রবর্তী বিএ অমৃতসরে আলেকজান্দ্রা খ্রিস্টান বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে চ'লে যান; কামিনী বসু প্রধান শিক্ষিকা হয়ে চ'লে যান দেরাদুন বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৮৯১-এ অঘোরকামিনী রায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে যান লক্ষ্ণৌ, ফিরে নিজেই স্থাপন করেন বিদ্যালয়। কুমুদিনী খাস্তগীর ১৮৯৩-এ মহিশুরের মহারানী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা নেন। সরলা দেবী ছিলেন চাঞ্চল্যকরভাবে ব্যতিক্রম; তিনি ১৮৯৫-১৮৯৬ সালে চাকুরি নেন হায়দ্রাবাদের মহারানীর সহকারীর মাসে অসাধারণ ৪৫০ টাকা বেতনে। তাঁর চাকুরির প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু তিনি 'নরনারীর স্বায়ত্ত জীবিকা অর্জনে সমান দাবি প্রতিপন্ন' করার জন্যেই চাকুরি নেন, ছেড়ে দেন অল্প পরেই [দ্র গোলাম মুরশিদ (১৯৮৩, ১০৪), বোর্থউইক (১৯৮৪, ৩১৭-৩২২)]। দেশি খ্রিস্টানরা লেখাপড়া শিখেছিলেন আগে, এবং লেখাপড়াকে কাজে লাগিয়েছিলেন নানা পেশায় নিযুক্ত হয়ে। ১৮৭৬-এ রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, ইংরেজের বিধবা, মনোমোহিনী হুইলার ২০০ টাকা বেতন ও ৩০ টাকা যাতায়াত ভাতায় নিযুক্ত হন বিদ্যালয় পরিদর্শক। এঁরাই রেখেছিলেন শিক্ষার মর্যাদা, শিক্ষিত সুগৃহিণীরা নয়।

চিকিৎসা, শিক্ষকতার মতোই, হয়ে দাঁড়িয়েছিলো অনেকটা নারীর পেশা। আর্থিক কারণে এটি শিক্ষকতার থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। অবরোধপ্রথা ছিলো নারী চিকিৎসকদের জন্যে আশীর্বাদ। নারীর চিকিৎসার জন্যে পুরুষ চিকিৎসক গ্রহণযোগ্য ছিলো না, তাই বেশ কজন নারী চিকিৎসক হয়েছিলেন, পেশায় ভালোও করেছিলেন।

তাঁদের পেশাগত বাধাবিপত্তির অভাব ছিলো না। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ১৮৮৬তে এলএমএস পাশ ক'রে হন বাঙলার প্রথম নারী চিকিৎসক। ১৮৮৮তে তিনি লেডি ডাফরিন নারী হাসপাতালে ৩০০ টাকা বেতনে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। প্রাইভেট চিকিৎসা, এবং নেপালে মহারাজার চাকুরি ক'রে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন; এবং ১৮৯৩-এ উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যান। ফিরে আসেন এডিনবরা, ডাবলিন, গ্লাসগো থেকে নানা ডিগ্রি নিয়ে। যামিনী সেন ১৮৯৭-এ এলএমএস পাশ করেন, ১৮৯৯-এ নেপালে চাকুরি নেন। তিনিও বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। নারী চিকিৎসকদের পেশা ছিলো বিপদসঙ্কুল, বিশেষ ক'রে মফস্বলে তাঁদের মাঝেমাঝেই বিপদে পড়তে হতো। তাঁদের বিরুদ্ধে শহরেও কুৎসার শেষ ছিলো না। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি যখন কলকাতায় চিকিৎসা শুরু করেন *বঙ্গনিবাসী* পত্রিকা সম্পাদকীয়তে তাঁকে অশ্লীলভাবে আক্রমণে করে। তিনিও মানহানির মামলা করেন, এবং ১৮৯১-এ সম্পাদক মহেন্দ্র পালের এক বছর কারাদণ্ড হয়। অভদ্র মধ্যযুগীয় পুরুষতন্ত্রকে একটি ভালো শিক্ষা দিয়েছিলেন কাদম্বিনী। ১৯০২ সালে মালদায় ঘটে নারীচিকিৎসক হরণ ও শ্লীলতাহরণ। প্রমীলাবালা ছিলেন মালদায় নারীচিকিৎসক; সেখানকার লম্পট জমিদার মদনগোপাল তার স্ত্রীর চিকিৎসার নামে রাতের বেলা তাঁকে ডেকে পাঠায়। জমিদারের নৌকোয় নিয়ে তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। ওই সমাজ নারী ডাক্তার বেশি দিন সহ্য করে নি, কেননা তা পুরুষের অহমিকাকে ঘা দেয়; তাই দেখা যায় পুরুষেরা অল্পকালের মধ্যেই নারী ডাক্তারের বদলে চায় ধাত্রী। ডাক্তারকে ধাত্রী বানাতে না পারলে পুরুষতন্ত্রের মনে শান্তি থাকে না। কেশব সেন দাবি করেন যে তাঁদের নারী ডাক্তার দরকার নেই, দরকার ধাত্রী। ধাত্রী খুবই দরকার ছিলো সন্দেহ নেই; চিকিৎসার অভাবে নারী মরলে ক্ষতি ছিলো না, কিন্তু পুরুষের উত্তরাধিকারীকে প্রসব করানো ছিলো খুবই জরুরি।

বাঙালি নারীর জন্যে নারীকে লেখাপড়া শেখায় নি, শেখাতে বাধ্য হয় পুরুষেরই জন্যে; কিন্তু নারীশিক্ষাবিরোধী প্রবণতা তার কখনোই কমে নি। তার মনের মধ্যে সব সময়ই কাজ ক'রে চলেছে এ-বোধ যে এটা খর্ব করে পুরুষের প্রভুত্ব, শিক্ষায় নারী হয়ে ওঠে অসতী, শিক্ষিত নারী নষ্ট করে পরিবার। সতীত্বের চিন্তায় বড়ো উদ্বিগ্ন পুরুষতন্ত্র, যদিও নারীর সতীত্ব নষ্ট করে পুরুষই। নারীশিক্ষার শুরুতেই ধর্মসভার মুখপত্র *সমাচারচন্দ্রিকা* ভয় দেখায় যে 'বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংগঠনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসৎপুরুষেরা তাহাদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্পবয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য খাদক সম্পর্ক।...ধনবানদিগের কন্যারা পথিমধ্যে ভৃত্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া গমন করিলে তথাপি কৌমার হরণের ভয় আছে, কেননা রক্ষকেরাই স্বয়ং ভক্ষক হইবে' [দ্র শ্রীপান্থ (১৯৮৮, ২৩)]। এ-বর্ণনা যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে বাঙালি পুরুষ আপাদমস্তক লম্পট। নারীশিক্ষা আজো বাঙালির বড়ো উদ্বেগ, যদি তা হয় প্রকৃত নারীশিক্ষা; ছদ্মনারীশিক্ষায় তার আপত্তি নেই। শিক্ষা যদি নারীকে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত, মুক্ত করে, তবে তা আপত্তিকর হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্মর কাছে, কিন্তু তা যদি নারীকে উন্নত দাসী করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য। নারীর প্রকৃত শিক্ষা এখানকার পুরুষ চায় নি,

নারীও সাধারণত তা বুঝে উঠতে পারে নি। নারীশিক্ষা একই সাথে পুরুষের কাছে ছিলো বিষ ও অমৃত– আনন্দ ও উদ্বেগের ব্যাপার, যদি তা নারীকে পরিণত করে আবেদনময়ী পরিচারিকায়, তবে তা আনন্দদায়ক, যদি তা নারীকে মুক্ত করে, তবে তা উদ্বেগের কারণ।

উনিশশতকে নারী যখন লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছে, সমাজ তাকে দেখেছে গভীর সন্দেহের চোখে। তরুণেরা শিক্ষার পক্ষে থাকলেও মহাপুরুষদের অনেকেই 'নবীনা'র সমালোচনায় থেকেছেন মুখর, যেমন বঙ্কিম। তখন 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' বা আলেকজান্ডার পোপের 'লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং' নারীশিক্ষার অপকারিতা প্রমাণের জন্যে ফিরেছে মুখেমুখে। অল্পবিদ্যা আসলেই ভয়ঙ্কর, কেননা তা আরো শেখার আগ্রহ জাগায়। বঙ্কিম 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধে প্রাচীনার গুণগানে মুখর থেকে দোষ ধরেছেন নবীনার; নবীনার বহু দোষের একটি হচ্ছে তারা একটু লেখাপড়া শিখেই ধর্মকে অবহেলা করতে শিখেছে। নিরপেক্ষ বিচারে বোঝা যায় তারা অল্প লেখাপড়া শিখে যতোটা বুঝেছিলো, বঙ্কিম অনেক লেখাপড়া শিখে মহাপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও ততোটা বোঝেন নি; বোঝেন নি যে ধর্ম আসলেই গুরুত্বহীন। নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটতে দেরি হয় নি; ১৮৭০-এর দশকে প্রথম প্রবেশিকা পাশ মেয়েটি বেরোনোর আগেই প্রতিক্রিয়ার কলরোল শোনা যায়; এবং অচিরেই প্রহসনে প্রহসনে নারীশিক্ষার বদনাম রটতে থাকে মঞ্চে মঞ্চে। লৈঙ্গিক রাজনীতিতে পুরুষতন্ত্রের শেষ অশ্লীল অস্ত্র হচ্ছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। *পাশকরা মাগ, কেয়াবাৎ মেয়ে, পরিণয়ে প্রগতি, মডেল ভগিনী, স্বাধীন জেনানা* ধরনের অশ্লীল প্রহসনে উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধ দূষিত হয়ে ওঠে। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* ১৮৭৮-এই লেখে, 'স্ত্রীশিক্ষার যে বিষময় ফল দাঁড়াইতেছে তাহা কেবল এই প্রণালীর দোষ।... যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রীজাতি উৎকৃষ্ট গৃহিণী ও মাতা হইতে পারে তাহাই তাহাদের বিশেষ পাঠ্য' [উদ্ধৃত গোলাম মুরশিদ (১৯৮৫, ৩৮)]। একটি মেয়েও তখনো প্রবেশিকা পাশ করে নি, কিন্তু শুরু হয়ে গেছে 'বিষময় ফল' ফলা! পুরুষতন্ত্রের অভিযোগ তারা উৎকৃষ্ট মাতা ও গৃহিণী নয়; তারা আশা করেছিলো নারী শিক্ষিত হয়ে ঘরে ঘরে নেপোলিয়ন, জর্জ ওয়াশিংটন প্রসব করবে; পুত্রদের ক'রে তুলবে মহাপুরুষ, স্বামীদের করবে শিক্ষিত সেবা। কিন্তু দেখতে পায় স্বর্গে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে, হাওয়া গন্ধম খেতে শুরু করেছে আদমের অনুমতি ছাড়াই।

১৮৮৫তে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস; ১৮৮৯ সালের দিকে কতিপয় নারী যোগ দেন কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির উদ্যোগে ১৮৮৯ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন ছ-জন নারী, তাঁদের দুজন বাঙালি : একজন দ্বারকানাথের স্ত্রী কাদম্বিনী, আরেকজন জানকীনাথ ঘোষালের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন স্ত্রী হিশেবে, ব্যক্তি হিশেবে নয়। নারীদের যোগ দেয়ার উদ্যোগ নেয়ায় কংগ্রেসিরা দ্বারকানাথকে উপহাসও করে। কংগ্রেসের ষষ্ঠ সম্মেলনে, কলকাতায়, যোগ দিয়েছিলেন মাত্র একটি নারী– স্বর্ণকুমারী দেবী। কিন্তু তিনি উপস্থিত

থেকেও ছিলেন অস্তিত্বহীন। সম্মেলনে ধন্যবাদ প্রস্তাব ইংরেজিতে পড়েন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সবার। অ্যানি বেসান্ট এ-ঘটনায় খুঁজে পান প্রতীকী তাৎপর্য; তিনি বলেন যে কাদম্বিনীর অংশগ্রহণ 'এমন প্রতীক, যা বুঝিয়ে দেয় যে ভারতেব স্বাধীনতা উন্নীত করবে ভারতের নারীজাতিকে' [দ্র বোর্থউইক (১৯৮৪, ৩৪২)]। কিন্তু ১৮৯০-এর দশকে শুরু হয়ে যায় জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতা, সমাজপতিরা বলতে থাকে যে গৃহই নারীর স্থান। এরপর কংগ্রেস নারীদের নানাভাবে ব্যবহার করেছে, তাদের দিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করিয়েছে, মিছিল করিয়েছে, কারাগারে পাঠিয়েছে, দু-একটি নারীকে প্রচ্ছদ ক'রে তুলেছে, কিন্তু কংগ্রেসি রাজনীতিতে নারী হচ্ছে পুরুষের পরিচারিকা। পরে কিছু নারী ভয়াবহ উদ্যোগ নিয়েছেন, অংশ নিয়েছেন সন্ত্রাসবাদী শিহরণজাগানো ঘটনায়, জয় করেছেন জনচিত্ত, কিন্তু তাঁরাও মুক্ত নারী ছিলেন না; তাঁরাও ছিলেন পুরুষেরই পুতুল।

উনিশশতকে বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলার উন্মেষ ঘটে নি, উন্নত জাতের নারী উৎপাদন করতে মুসলমান সম্প্রদায়কে অপেক্ষা করতে হয় বিশশতকের কয়েক দশক। রোকেয়ার বালিকা বিদ্যালয়ও বাঙালি মুসলমানের বিশেষ উপকারে আসে নি, কেননা ওটি আসলে ছিলো উর্দু বিদ্যালয়। ফজিলতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএ পাশ করেন ১৯২৭-এ, তাঁর পরীক্ষার ফল প্রায় জাতীয় উল্লাসে পরিণত হয়েছিলো; তবু পঞ্চাশ, এমনকি ষাটের দশকের আগে, উন্নত জাতের মুসলমান নারী উৎপাদনের কলটি ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় থাকে নি। মুসলমান সমাজ ছিলো, এখনো আছে, হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের থেকে অনেক অনগ্রসর; নারীমুক্তির কথা এখনো তারা ভাবতে পারে না। বিয়েই ছিলো, আজো আছে, মুসলমান নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য; এবং এর ফলে মুসলমান নারীশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন শুরু হয়েছে কূট প্রতিক্রিয়াশীলতা; আবার অদ্ভুত বোরখায় ঢেকে দেয়া হচ্ছে মুসলমান নারীর মুখমণ্ডল, এবং এভাবে চলতে থাকলে দু-এক দশকের মধ্যেই হয়তো মুসলমান নারী আবার বন্দী হয়ে পড়বে অবরোধে; বাস করবে হারেমে। মুসলমান পিতৃতন্ত্র এখন দেখা দিচ্ছে উগ্র পিতৃতন্ত্ররূপে, নারী হয়ে উঠছে তার শিকার; অনতিবিলম্বেই মুসলমান নারীকে পুরোপুরি মধ্যযুগে পাঠিয়ে দেয়া হবে, এমন আভাস এখন চারপাশে। শিক্ষা এখন সংকট হয়ে উঠছে নারীর জন্যে; সমাজ শিক্ষিত নারীকে আর্থনীতিক নিশ্চয়তা দিচ্ছে না, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতাবশত নষ্ট হচ্ছে শিক্ষিত নারীর প্রথাগত পেশা বা বিয়ের সুযোগ। নবমধ্যযুগীয় তরুণ তার পিতামহের মতো শিক্ষিত নারী এড়িয়ে স্ত্রী হিশেবে খুঁজছে কচি মেয়ে, যার শরীর তার চোখে বেশি আবেদনময়, এবং যার ওপর সে প্রভুত্ব করতে পারবে মধ্যযুগীয় পুরুষের মতো। উনিশশতকে যে-ভদ্রমহিলা প্রজাতিটির উদ্ভব ঘটেছিলো বাঙলায়, মুসলমান পিতৃতন্ত্র যেটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা ক'রেও প্রতিরোধ করতে পারে নি, সেটি আজ বিপন্ন; শিগগিরই হয়ে উঠবে বিপন্নতর, কেননা প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রথম শিকারই হয় নারী।

নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা

নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার বিকাশ গত আড়াই দশকের সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নারীবাদীরা যেমন আক্রমণ করেছেন ও বদলে দিতে চেয়েছেন পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক ও রাজনীতিক কাঠামো, তেমনি আক্রমণ করেছেন ও বদলে দিতে চেয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক সমস্ত লিঙ্গবাদী চিন্তাধারা। পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা, আবেগ, উপলব্ধি, ও প্রচারেব এক প্রধান এলাকা সাহিত্য। গত কয়েক হাজার বছরের বিশ্বসাহিত্য পুরুষতান্ত্রিকতার বিশ্ব; পুরুষ সৃষ্টি করেছে ওই সাহিত্য, তৈরি করেছে তার তত্ত্ব, করেছে মূল্যায়ন। সাহিত্য সৃষ্টি ও ব্যাখ্যার সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে; সেখান থেকে নারী শুধু বাদই পড়ে নি, তাতে তৈরি করা হয়েছে নারীর মিথ্যে ভাবমূর্তি, নিন্দিত হয়েছে নারী। পুরুষ আশা করে নি যে নারী সৃষ্টি করবে সাহিত্য, তবু নারী সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তবে তা মূল্য পায় নি পুরুষের কাছে, বা পুরুষ তার অপব্যাখ্যা করেছে। বিশ্বসংস্কৃতির অজস্র পুরাণে পুরুষকেই দেখানো হয়েছে সৃষ্টিশীল ব'লে; সৃষ্টিশীলতাব সব এলাকায়—ধর্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে স্বীকৃতি পেয়েছে শুধু পুরুষের সৃষ্টিশীলতা। সব ধর্মেই বিধাতা পুরুষ, যে শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করেছে বিশ্ব। শেলি, কোলরিজ, কিট্স্, রাসকিন লেখককে দেখেছেন পুরোহিত, ধর্মপ্রবর্তক, যোদ্ধা, বিধানপ্রণেতা, বা সম্রাটরূপে; অর্থাৎ পুরুষের চোখে পুরুষই সৃষ্টিশীল। পুরুষের চোখে নারীও পুরুষেরই সৃষ্টি। ওই নারীর, পিগম্যালিঅনের আইভরি তরুণীর মতো, কোনো নাম বা সত্তা বা কণ্ঠস্বর নেই। নারী বস্তু, নারী অপর। নারী শুধু বস্তু নয়, পুরুষের চোখে নারী শিল্পকর্ম; নারী মর্মর মূর্তি, বা পুতুল, বা কবিতা, নারী কখনো ভাস্কর বা কবি নয়। শেক্সপিয়রের ওথেলো (৪:২) দেসদিমোনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে : 'এই শুভ্র কাগজ, এই উৎকৃষ্টতম বইটি,/কি তৈরি হয়েছিলো এতে 'বেশ্যা' লেখার জন্যে?' নারী লেখে না, লিখিত হয়, নারী কবিতাকল্পনালতা; নারী আঁকে না, অঙ্কিত হয়; নারী ভাস্কর হয় না, ভাস্কর্য হয়।

হেনরি জেমসের *এক মহিলার ছবিতে* শুদ্ধ এক তরুণীকে বর্ণনা করা হয়েছে 'কাগজের একটি শূন্য পৃষ্ঠা' রূপে; সে 'এতো সুন্দর ও মসৃণ পৃষ্ঠা যে তাকে এক সময় ভ'রে তুলতে হবে মানসিক উন্নতিসাধক পাঠে।' জেমসের চোখে অভিজ্ঞ নারী এমন কাগজ, 'যার ওপর নানান হাত লিখেছে নানান পাঠ।' কনরাডের *বিজয়*-এ অ্যালমা 'এক অপরিচিত ভাষার লিপির মতো', বা 'নিরক্ষরের কাছে যে-কোনো লিপির মতো' [দ্র গুবার (১৯৮১, ২৯৪)]। সমালোচকেরাও সাহিত্যপাঠকে বর্ণনা করেন লৈঙ্গিক ভাষায়। দেরিদা কলমকে শিশ্নের সাথে, আর যোনিচ্ছদকে কাগজের সাথে অভিন্ন ক'রে দেখেছেন। কলম-শিশ্ন লিখে চলে কুমারী পৃষ্ঠার ওপর, এ-বোধের ঐতিহ্য বেশ দীর্ঘ।

এ-বোধ অনুসারে লেখক পুরুষ, ও প্রধান; নারী তার অক্রিয় সৃষ্টি, গৌণ বস্তু, যার নেই কোনো স্বায়ত্তশাসিত সত্তা, যার কখনোবা স্ববিরোধী অর্থ রয়েছে কিন্তু কোনো অভিপ্রায় নেই। এ-ধারা সংস্কৃতিসৃষ্টির প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয় নারীকে, এবং গণ্য করে শিল্পকর্মরূপে। উনিশশতকে অনেক নারী লেখক হ'তে গিয়ে সমস্যায় পড়েন, কেননা কলম তাঁদের জন্যে নয়; কলম ধরা তাঁদের কাছে মনে হয় দানবিক কাজ, তাই তাঁরা নেন নানা কৌশল। এ-কৌশলগুলো সান্ড্রা এম গিলবার্ট ও সুজান গুবার বর্ণনা করেছেন *দি ম্যাড ওম্যান ইন দি অ্যাটিক : দি ওম্যান রাইটার অ্যান্ড দি নাইনটিন্থ-সেঞ্চুরি লিটেবেরি ইমাজিনেশন* (১৯৭৯) বা *চিলেকোঠার পাগলী*তে। সুজান গুবার আইসাক ডিনেসেনের 'শূন্যপৃষ্ঠা' নামের একটি গল্প ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্য বিশ্বাস করে যে নারীর পক্ষে শিল্পী হওয়া অসম্ভব, তবে সে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে শিল্পকর্মে। তিনি আরো দেখিয়েছেন অনেক নারী বোধ করে যে শরীরই তাদের শিল্পসৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম। এর ফলে নারী শিল্পী ও তার শিল্পকর্মের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকে না। নারীদেহ যে-সব রূপক সরবরাহ করে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে রক্তের রূপক, তাই নারীর শিল্পসৃষ্টি হয়ে ওঠে একধরনের যন্ত্রণাকর ক্ষত। প্রসবে ও লেখায় নারীর নিয়তি যন্ত্রণা।

নারীবাদীরা পুরুষের সৃষ্টিশীলতাতত্ত্ব মানেন নি, এবং পুরুষের সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনারীতিকে সংশোধন করার জন্যে গ'ড়ে তোলেন নিজেদের সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনারীতি। এ-ক্ষেত্রে গত আড়াই দশকে সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক কাজ করেছেন তাঁরাই, যদিও পুরুষতান্ত্রিক সমালোচকেরা আজো দ্বিধা করেন তা স্বীকার করতে। অনেকে শুধু দ্বিধা নয় ক্ষুব্ধ বোধ করেন। তাঁদের মতে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার কাজ 'মহৎ পুরুষ লেখকদের ধ্বংস করা'; এটা 'সমালোচনার মুখোশ প'রে নারীবাদী অপপ্রচার'। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার লক্ষ্য সব সময়ই রাজনীতিক; এর প্রচেষ্টা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি বের করা। নারীবাদী সমালোচনার একটি ধারা দেখা দিয়েছিলো মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের *ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্‌স্‌ অফ ওম্যান*-এই (১৭৯২), যেখানে তিনি পুনর্বিচার ও তিরস্কার করেন রুশো ও পুরুষতন্ত্রের নানা মহাপুরুষকে; তবে এর ধারাবাহিক বিকাশ ঘটে নি। তাই উনিশশতকে নারীবাদী সমালোচনা, স্ট্যান্টনের *নারীর বাইবেল* (১৮৯৫) ছাড়া, বিশেষ চোখে পড়ে না। এ-শতকেও ১৯৬৯-এর মধ্যে নারীবাদী সমালোচনার বই বেরোয় গুটিকয় : ভার্জিনিয়া উল্‌ফের *এ রুম অফ ওআন্স ওৌন : কারো নিজের ঘর* (১৯২৭), সিমোন দ্য বোভোয়ারের *দ্বিতীয় লিঙ্গ* (১৯৪৯), ক্যাথরিন এম রজার্সের *দি ট্রাবলসাম হেল্পমেট : বিরক্তিকর সহধর্মিণী* (১৯৬৬), মেরি এলমানের *থিংকিং অ্যাবাউট উইমেন : নারীদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা* (১৯৬৮), এবং কেইট মিলেটের *সেক্সুয়াল পলিটিক্স : লৈঙ্গিক রাজনীতি* (১৯৬৯)। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার বিকাশ ঘটে নারীবাদী সংগ্রামের এক শক্তিশালী অঙ্গরূপে। নারীবাদী সংগ্রাম চায় পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস বা রূপান্তরিত করতে; সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা করতে চায় একই কাজ, ভিন্নভাবে ভিন্ন এলাকায়। তাই তত্ত্ব ও সমালোচনায় নারীবাদীদের মিলন ঘটাতে হয়েছে

রাজনীতি ও সমালোচনার। প্রথাগত পুরুষি সমালোচনার মানদণ্ডে চলতে পারে না নারীবাদী সমালোচকের, তাঁদের খুঁজতে হয়েছে ভিন্ন মানদণ্ড। নারীবাদী সমালোচনা ভালো লাগার কথা নয় প্রথাগত পুরুষ সমালোচক ও পুরুষি প্রতিষ্ঠানগুলোর। নারীবাদী সমালোচকদের সামনে খোলা ছিলো দুটি পথ : প্রচলিত মানদণ্ডের সাথে সন্ধি ক'রে পুরুষের স্বীকৃতি আদায় করা, অথবা প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডগুলোকে ঘৃণাভরে বর্জন ক'রে নিজেদের নতুন মানদণ্ড তৈরি করা। নারীবাদীরা বেছে নেন দ্বিতীয় পথ। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার দুটি ধারা রয়েছে : একটি ইঙ্গমার্কিন, অন্যটি ফরাশি। এর মাঝে ইঙ্গমার্কিন ধারাটিই অর্জন করেছে প্রাধান্য।

বিশশতকের ষাটের দশকের শেষ থেকে, আন্তর্জাতিক নারীবাদের এক প্রবল শাখারূপে, বিপ্লবাত্মক বিকাশ শুরু হয় নারীবাদী সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের, এবং অনেকখানি বদলে দেয় সাহিত্য মূল্যায়নের প্রথাগত রীতি। বিশ্ব জুড়ে এতোকাল ধ'রে নেয়া হয়েছে যে পুরুষই লেখক, পাঠক, সমালোচক; নারীবাদীরা দেখান নারী সমালোচক ও পাঠক সাহিত্য উপলব্ধি করেন ভিন্নভাবে, ও সাহিত্যের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা ভিন্ন। তাঁরা আরো দেখান যে বিশ্ব জুড়েই নারীরা সৃষ্টি করেছেন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য। পুরুষের সভ্যতা জুড়ে কয়েক হাজার বছর ধ'রে সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা থেকেছে পুরুষের অধিকারে, নারীবাদীরা ঢোকেন সেখানে, পুনর্মূল্যায়নের উদ্যোগ নেন পূর্ববর্তী সমগ্র সাহিত্য। নারীবাদী সমালোচনার প্রধান মানদণ্ড লিঙ্গ। নারীবাদীরা বিকাশ ঘটান সাহিত্য সৃষ্টি, পাঠ, ও সমালোচনার লৈঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব। তাঁদের তত্ত্ব ও সমালোচনারীতি কোনো একক উৎস থেকে জন্মে নি, তাঁদের নেই কোনো পুণ্য বা ঐশী গ্রন্থ বা মহামাতা। যেমন রয়েছেন মার্ক্সীয়দের মার্ক্স, সাংগঠনিকদের সোস্যুর, মনোবিজ্ঞানবাদীদের ফ্রয়েড বা লাকঁ, বিসংগঠনবাদীদের দেরিদা, নারীদের নেই তেমন কেউ। নারীরা নিরীশ্বর। একাধিক উৎসকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা নারীসাহিত্য পড়েছেন, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্বে গবেষণারত নারীবাদীদের সাথে ভাববিনিময় ক'রেছেন, প্রচলিত সাহিত্যতত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন, কৌশল ধার করেছেন মার্ক্সবাদ, ভাষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিসংগঠনবাদ থেকে, এবং গ'ড়ে তুলেছেন নিজেদের তত্ত্ব ও রীতি। যদিও আজো কোনো সমন্বিত সাহিত্যতত্ত্ব তাঁরা গ'ড়ে তুলতে পারেন নি– অনেকে তা চানও না, তবু সমন্বিত সাহিত্যতত্ত্বের দিকে তাঁরা এগিয়েছেন অনেকখানি। নারীবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক বা সমালোচককে যে নারীই হ'তে হবে, তা নয়; তবে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার বিকাশ ঘটান নারীরাই; তাঁরাই লড়াই করেন এর জন্যে, কখনো কখনো বিপদগ্রস্তও হন। তাঁরা চেষ্টা করেন তত্ত্ব ও ব্যক্তিতার সমন্বয় ঘটাতে। তাঁরা খোঁজেন নিজেদের একান্ত ভাষা, আঙ্গিক, কণ্ঠস্বর, সংগঠন, যা নিয়ে তাঁরা ঢুকতে পারেন পুরুষাধীন একটি এলাকায়। নারীবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচকেরা কখনো ক্রুদ্ধ আর তিরস্কারমুখর, কখনো আবেগাতুর ও গীতিময়; আর তাঁদের তত্ত্ব ও সমালোচনায় মূর্ত তাঁদের নারীমুক্তির রাজনীতি। নারীবাদ নারীদের মহাজাগরণ, সাহিত্য সমালোচনায় ঘটে ওই মহাজাগরণেরই প্রকাশ। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব, যাতে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত কাঠামো

ভাঙার উত্তেজনা ও নতুন দৃষ্টি আবিষ্কারের সাধনা। তাঁরা প্রকাশ করেছেন নানা নারীবাদী পত্রিকা, যাতে নিয়মিতভাবে বেরোয় নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা বিষয়ক তীব্র মননশীল প্রবন্ধ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে *ক্যামেরা অ্যাবৃস্কিউয়্যারা* : লস অ্যাঞ্জেলেস, *কোন্ডিশন্স* : ব্রুকলিন, *কানেকশন্স* : অকল্যান্ড, *ক্রিটিক্যাল ইনক্যোয়ারি* : শিকাগো, *ডায়াক্রিটিক্স* : ইথাকা, *ফেমিনিস্ট রিভিউ* : লন্ডন, *হেকেট* : কুইন্সল্যান্ড, *হের‍্যাসিজ* : নিউ ইঅর্ক, *এম/এফ* : লন্ডন, *সেইজ* : আটলান্টা, *সিনিস্টার উইজডম* : রকল্যান্ড প্রভৃতি।

নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার উন্মেষের বছরগুলোতে জোর দেয়া হয় পুরুষের লেখা সাহিত্যে লিঙ্গবাদ ও নারীবিদ্বেষের স্বরূপ উদঘাটনের ওপর। তাঁরা দেখান পুরুষ তৈরি করেছে ছকবাঁধা নারীভাবমূর্তি, সৃষ্টি করেছে দেবী ও দানবী; দেখান ধর্মগ্রন্থে, ধ্রুপদী ও জনপ্রিয় সাহিত্যে নারীকে পীড়ন ও অপব্যবহার করা হয়েছে নানাভাবে, আর নারীকে বাদ দেয়া হয়েছে সাহিত্যের ইতিহাস থেকে। সমাজে যেমন চলে নারীপীড়ন, নারী যেমন হয় ধর্ষণের শিকার, তেমনি যুগেযুগে সাহিত্যে পীড়িতধর্ষিত হয়েছে নারী। তাঁরা পুরুষের 'মহৎ' সাহিত্য ঘেঁটে দেখান যে তাতে নারীবিদ্বেষ পুরুষের নিশ্বাসের মতো। প্রচুর মহৎ সাহিত্যের মহিমা তাঁরা হরণ করেন। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কেইট মিলেট। মিলেটের *লৈঙ্গিক রাজনীতি* (১৯৬৯) আধুনিক নারীবাদের সবচেয়ে সাড়াজাগানো বই, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, যাতে মিলন ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনার; আর কাজ করে ধ্বংসাত্মক বোমার মতো। এটি শুধু সাহিত্য সমালোচনা নয়; এর রয়েছে তিনটি ভাগ : 'লৈঙ্গিক রাজনীতি', 'ঐতিহাসিক পটভূমি', এবং 'সাহিত্যিক প্রতিফলন'। প্রথম ভাগে মিলেট দেখান নারীপুরুষের লৈঙ্গিক রাজনীতির স্বরূপ, দ্বিতীয় ভাগে লেখেন উনিশবিশশতকের নারীমুক্তি আন্দোলনের নিয়তির ইতিহাস, তৃতীয় ভাগে উদঘাটন করেন ডি এইচ লরেন্স, হেনরি মিলার, নরমান মেইলার, ও জাঁ জোনের লেখায় লৈঙ্গিক রাজনীতির রূপ। টোরিল মোই (১৯৮৫, ২৪-৩১), যিনি অন্যায়ভাবেই কঠোর সমালোচনা করেছেন মিলেটের, তিনিও স্বীকার করেছেন, 'এটি সৃষ্টি করে যে-অভিঘাত, তাতে এটি হয়ে ওঠে পরবর্তী ইঙ্গমার্কিন নারীবাদী সমালোচনামূলক সমস্ত গ্রন্থের জননী ও অগ্রদূত, এবং ১৯৭০ ও ১৯৮০র নারীবাদীরা কখনোই মিলেটের পথিকৃৎ প্রবন্ধটির কাছে ঋণ স্বীকার বা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে অস্বীকার করেন নি।' মিলেট বেরিয়ে আসেন সে-সময়ের মার্কিন নবসমালোচনার রীতি থেকে; নবসমালোচনা রীতির বিরোধিতা ক'রে তিনি যুক্তি দেন যে ঠিক মতো সাহিত্য বুঝতে হ'লে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশকে। মিলেটের সমালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য অসম্ভব অভাবিত প্রতিভাদীপ্ত সাহস। ১৯৬৯-এ যখন 'মহৎ' লেখকদের কাছে বিনীত থাকাই ছিলো সাহিত্য সমালোচনার আদব, তখন লরেন্স, মিলার, মেইলার, জাঁ জোনের সাথে প্রচণ্ড বেয়াদবি করেন মিলেট। তাঁর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এ-আধুনিকেরা। মিলেট লেখককে বিধাতা হিশেবে মানেন নি; তিনি পাঠককে ক'রে তোলেন লেখকের প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং প্রশ্ন করেন পংক্তিতে পংক্তিতে।

মিলেট সমালোচক-পাঠক হিশেবে বিনীত বা ভদ্রমহিলাসুলভ নন; তিনি লেখকের মুখোমুখি দাঁড়ান উদ্ধত তরুণের মতো, প্রতি মুহূর্তে বিরোধিতা করেন লেখকের আধিপত্যের। তিনি মূর্তিভগ্নকারী; তাঁর সমালোচনা পড়ার পর ওই আধুনিক প্রধানদের ভাবমূর্তি আর আগের মতো থাকে না; তাঁরা তাঁদের কীর্তিসহ ধ'সে পড়েন। মিলেটের রীতির একটু নমুনা দিচ্ছি। মিলেট (১৯৬৯, ২৩৭-২৩৮) ডি এইচ লরেন্স সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে *লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক* (১৯২৮) থেকে উদ্ধৃত করেন প্রচণ্ড লিঙ্গবাদী এ-অংশটুকু :

"তোমাকে আমি দেখতে চাই।"

সে [মেলর্স] তার শার্ট খুলে ফেললো এবং লেডি জেইনের [যোনির অপভাষা] দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়ালো। নিচু জানালা দিয়ে সূর্যরশ্মি ঢুকে তার উরু আর কৃশ উদরকে, এবং জ্বলজ্বলে স্বর্ণ-লাল কেশের ছোটো মেঘের ভেতর থেকে জেগে ওঠা কৃষ্ণাভ ও তপ্ত চেহারার দাঁড়ানো শিশ্নকে আলোকিত ক'রে তুললো।

"কী অদ্ভুত।" সে ধীরে ধীরে বললো। "কী অদ্ভুতভাবে সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে! কী বিশাল! এবং কী কৃষ্ণাভ এবং সুনিশ্চিত! সে কি তার মতো?"

পুরুষটি তার পাতলা শাদা শরীরের সম্মুখভাগের নিচের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ছোট্ট বুকের মাঝখানে কেশের রঙ কৃষ্ণাভ, প্রায় কৃষ্ণ। কিন্তু উদরের মূলদেশে, যেখান থেকে শিশ্নটি মোটা ও ধনুকাকৃতি খিলানের মতো উঠে এসেছে, সেখানকার কেশ সোনা-লাল, ছোটো মেঘের মতো জ্বলজ্বলে।

"কী গর্বিত।" সে গুনগুন করলো, অস্বস্তি। "এবং কী প্রভুসুলভ! এখন বুঝতে পারছি কেনো পুরুষেরা এতো কর্তৃত্বপরায়ণ। কিন্তু সে [শিশ্ন] সত্যিই সুন্দর। আরেকটি মানুষের মতো! একটু ভীতিকর! তবে সত্যিই সুন্দর! এবং সে *আমার* দিকে আসছে!–" সে ভয়ে ও উত্তেজনায় অধর কামড়ে ধরলো।

পুরুষটি নীরবে নিচে তার শক্ত শিশ্নের দিকে তাকালো। ওটি র কোনো বদল ঘটে নি।

. "ভোদা, তুই যা চাস তা অইল ভোদা। ক তুই লেডি জেনরে চাস। জন টমাস [শিশ্নের অপভাষা] লেডি জেনরে চায়।–"

"আহা, তাকে ক্ষেপিয়ো না," বিছানায় হাঁটু ভর ক'রে তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে কোনি বললো। সে দু-হাতে তার কৃশ কটি ধ'রে তাকে নিজের দিকে টানলো যাতে তার ঝুলন্ত আন্দোলিত স্তনদুটি স্পর্শ করলো উত্তেজিত, উত্থিত শিশ্নের শীর্ষ, এবং তাতে লাগলো তরল পদার্থের ফোঁটা। সে পুরুষটিকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলো।

"শোও!" সে বললো। "শোও। আমাকে হ'তে দাও।"

সে এখন খুবই তাড়ার মধ্যে।

মিলেট বলেন *লেডি চাটার্লির প্রেমিক* একটি আপাত-ধর্মীয় রচনা, যাতে এক আধুনিক নারীর আত্মার মুক্তি ঘটানো হয়েছে লেখকের নিজস্ব ধর্মমত 'শিশ্নের রহস্যে'র সাহায্যে। এখানে আবির্ভাব ঘটেছে শিশ্নদেবতার। অলিভার মেলর্স হচ্ছে চূড়ান্ত লরেন্সীয় পুরুষ, মনুষ্যদেব, সে মারাত্মক যৌনপীড়নে সক্ষম, তবে এ-উপন্যাসে কোনো যৌনপীড়ন নেই। এতে কনস্ট্যান্স চাটার্লিকে দেয়া হয়েছে ঈশ্বরদর্শনের অনুমতি। এ-বইটি অলিভার মেলর্সের শিশ্নের পূজানুষ্ঠান; এতে পুরুষের মহিমাকে উন্নীত করা হয়েছে এক অতীন্দ্রিয় ধর্মে। এটা লৈঙ্গিক রাজনীতির সবচেয়ে কর্তৃত্বপরায়ণ রূপ।

লৈঙ্গিক রাজনীতিকদের মধ্যে লরেন্স সবচেয়ে প্রতিভাবান ও একাগ্র; তিনি সবচেয়ে নিপুণও, কেননা তিনি লৈঙ্গিক বার্তা জ্ঞাপন করেন নারীর চেতনার মাধ্যমে। নারীটিই আমাদের জানায় যে সোনালি যৌনকেশের জ্যোতিশ্চক্রের ভেতর থেকে জেগে ওঠা দাঁড়ানো শিশ্নটি সত্যিই 'গর্বিত', আর 'প্রভুসুলভ', এবং সর্বোপরি, 'সুন্দর'। সেটি 'কৃষ্ণাভ এবং সুনিশ্চিত', আর 'ভীতিকর' ও 'অদ্ভুত', যা নারীকে যেমন 'ভীত' করে তেমনি করে 'উত্তেজিত'। শিশ্নের দাঁড়ানো নারীকে দীক্ষিত করে এ-ধর্মে যে পুরুষাধিপত্য শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোনি চমৎকার শিষ্যের মতো সাড়া দেয়, 'এখন বুঝতে পারছি কেনো পুরুষেরা এতো কর্তৃত্বপরায়ণ।' এ-বইয়ের সঙ্গমদৃশ্যগুলো লেখা হয়েছে ফ্রয়েডীয় বিধিমতে যে 'নারী অক্রিয়, পুরুষ সক্রিয়।' এতে শিশ্নই সব, কোনি হচ্ছে 'ভোদা', যে-বস্তুর ওপর ক্রিয়া করা হয়। এভাবে বিশ্লেষণ ক'রে মিলেট লরেন্সকে মহিমাহীন ক'রে তুলেছেন।

মিলেটের মতো তীব্রভাবে না হ'লে একই কাজ করেন মেরি এলমান *থিংকিং অ্যাবাউট উইমেন : নারীদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তায়* (১৯৬৮)। তাঁর বইটি বেরোয় মিলেটের *লৈঙ্গিক রাজনীতির* এক বছর আগে, কিন্তু এটা, একান্তভাবেই সাহিত্যকেন্দ্রিক বই ব'লে, ততোটা সাড়া জাগায় নি। এলমান পিতৃতন্ত্রকে সামাজিক ও রাজনীতিকভাবে আক্রমণ করেন নি, তিনি আক্রমণ করেন সাহিত্যে রূপায়িত পুরুষতান্ত্রিক লিঙ্গবাদকে। মিলেটের *লৈঙ্গিক রাজনীতি* ও তাঁর *নারীদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তায়* জন্মে নারীবাদী সমালোচনার একটি ধারা, যা *নারীভাবমূর্তি সমালোচনা* নামে পরিচিত। পুরুষদের লেখায় নারীর ছক খোঁজেন এলমান, দেখান যে পুরুষ সমালোচকেরা নারীর লেখা বই আলোচনার সময়ও ব্যবহার করেন লৈঙ্গিক ধারণা। তাঁর মতে পশ্চিমি সংস্কৃতির বড়ো বৈশিষ্ট্য 'লৈঙ্গিক সাদৃশ্যমূলক চিন্তা', অর্থাৎ যে-কোনো চিন্তায়ই নারী বা পুরুষ ধারণাটি জেগে ওঠে, আর প্রধান হয়ে ওঠে পুরুষ ধারণাটি। পশ্চিম বা দু-গোলার্ধেরই সমস্ত চিন্তার মূলে আছে লিঙ্গভিন্নতার বোধ। সাহিত্য সমালোচনায়ও, তিনি দেখান, অত্যন্ত প্রবল লৈঙ্গিক চিন্তা; তিনি এর নাম দেন 'ফ্যালিক ক্রিটিসিজম' বা 'শৈশ্নিক সমালোচনা'। তাঁর মতে পুরুষ সমালোচকদের কাছে নারীর লেখা বইও নারী, সম্ভোগের সামগ্রী; ওই বই সমালোচনার নামে তাঁরা মাপামাপি করেন বইয়ের বক্ষ ও নিতম্ব। পুরুষ লেখক-সমালোচকদের লেখায় তিনি খুঁজে পান নারী ও নারীত্বের এগারোটি ছক; সেগুলো হচ্ছে নিরবয়বতা, অক্রিয়তা, অস্থিরতা, বন্দীত্ব, ধার্মিকতা, বস্তুজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, অযৌক্তিকতা, পরের ইচ্ছাপূরণে সম্মতি, দানবী ও মুখরা স্ত্রী।

নারীবাদী সমালোচনার এক উর্বর ধারা *নারীভাবমূর্তিমূলক সমালোচনা*। এ-ধারার অজস্র নিবন্ধ ও বই বেরিয়েছে। ১৯৭২-এ সুজান কোপেলম্যান কোরনিলনের সম্পাদনায় বেরোয় নারীভাবমূর্তিমূলক সমালোচনাসংগ্রহ *ইমেজেজ অফ উইমেন ইন ফিকশন : ফেমিনিস্ট পারস্পেকটিভ্স :: কথাসাহিত্যে নারীভাবমূর্তি : নারীবাদী প্রেক্ষিত।* এ-বইতে উনিশবিশশতকের বেশ কয়েকজন নারী ও পুরুষ ঔপন্যাসিকের আঁকা নারীর

ভাবমূর্তি তুলে ধরে প্রচণ্ড সমালোচনা করা হয় ওই সব অবাস্তব নারীচরিত্রের। অবাস্তব নারী সৃষ্টির জন্যে শুধু পুরুষেরাই অভিযুক্ত হয় নি এ-প্রবন্ধগুচ্ছে, বরং দেখানো হয় যে এ-কাজে পুরুষদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট নারী লেখকেরা। অবাস্তব নারী সৃষ্টি ক'রে নারী লেখকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নিজেদের লিঙ্গের সাথে। এ-ধরনের সমালোচনায় মিলিয়ে দেখা হয় লেখকের ও পাঠকের অভিজ্ঞতাকে; আর পাঠকের অভিজ্ঞতার সাথে যদি না মেলে লেখকের অভিজ্ঞতা, তাহলে অভিযোগ তোলা হয় লেখকের বিরুদ্ধে। নারীভাবমূর্তি সমালোচকেরা আত্মজীবনীকে ব্যবহার করেন সমালোচনার মানদণ্ডরূপে; তাঁরা মনে করেন কোনো সমালোচনাই মুক্ত নয় নিজের মূল্যবোধ থেকে। প্রতিটি মানুষ, এবং লেখকও, কথা বলেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে গ'ড়ে ওঠা বিশেষ অবস্থান থেকে। এ-পরিপ্রেক্ষিত সীমাবদ্ধ, একে সর্বজনীন ব'লে চালানো খুবই আধিপত্যমূলক কাজ। নারীভাবমূর্তি সমালোচনার কাজ সাহিত্যে রূপায়িত মিথ্যে নারীভাবমূর্তির স্বরূপ বের করা। ওই মিথ্যে ভাবমূর্তি যেমন পুরুষ লেখকেরা তৈরি করেছেন, তেমনি করেছেন নারী লেখকেরাও। এতে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার ওপর; মনে করা হয় বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপনই সাহিত্যের লক্ষ্য। তাই এ-সমালোচনা আধুনিকতাবিরোধী, সব ধরনের আধুনিক রীতিকেই আক্রমণ করা এর স্বভাব। তাঁদের মানদণ্ডে সে-সাহিত্যের মূল্য কম, যা তাঁদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়; তাকেই তাঁরা বাতিল করেন যা তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না।

লিঙ্গবাদ ও নারীভাবমূর্তি বের করার পর, ১৯৭৫ থেকে, নারীবাদী সমালোচনার বিষয় হন নারী লেখকেরা; নারীবাদী সমালোচনা হয়ে ওঠে নারীকেন্দ্রিক। নারীবাদীরা আবিষ্কার করেন যে নারী লেখকদের ছিলো নিজেদের এক ধরনের সাহিত্য, যে-সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও বিষয়গত সামঞ্জস্য, আর শৈল্পিক গুরুত্ব স্বীকৃতি পায় নি পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের কাছে। তাঁরা বলেন *নারীকল্পনাপ্রতিভার* কথা। ১৯৭১-এ শোআল্টার দাবি করেন নারী লেখকদের রয়েছে এক বিশেষ ইতিহাস, যা গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য। নারীরা আলোচনা করেন নারীরচিত সাহিত্য, এটা হয়ে ওঠে ইঙ্গমার্কিন নারীবাদী সমালোচনার প্রধান প্রবণতা। সত্তর দশকের শেষের দিকে বেরোয় এ-ধারার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই; যেমন এলেন মোয়ের্সের *লিটেরেরি উইমেন : সাহিত্যিক নারী* (১৯৭৬), ইলেইন শোআল্টারের *এ লিটেরেচার অফ দেয়ার ঔন : তাঁদের নিজেদের সাহিত্য* (১৯৭৭), শিরিল এল ব্রাউন ও কারেন ওলসন সম্পাদিত *ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজম : এসেইজ অন থিয়োরি, পোয়েট্রি অ্যান্ড প্রোউজ :: নারীবাদী সমালোচনা : তত্ত্ব, কবিতা ও গদ্য বিষয়ক প্রবন্ধ* (১৯৭৮), এবং সান্ড্রা গিলবার্ট ও সুজান গুবারের *দি ম্যাডওম্যান ইন দি অ্যাটিক : চিলেকোঠার পাগলী* (১৯৭৯)। এ-বইগুলোতে শনাক্ত করা হয় সাহিত্যে নারী-ঐতিহ্যের পৃথক ধারা; দেখানো হয় নারীর লিঙ্গ নয়, সমাজই স্থির ক'রে দেয় নারীর বিশ্বদৃষ্টি ও সাহিত্যে তার উপস্থাপন। এলেন মোয়ের্স *সাহিত্যিক নারী*তে সবার আগে উদ্যোগ নেন নারীসাহিত্যের ইতিহাস লেখার। তাঁর মতে

পুরুষ-ঐতিহ্যের তলে বা পাশাপাশি নারীসাহিত্য এক গতিশীল ও শক্তিমান অন্তঃস্রোত। বইটিতে কোনো তত্ত্ব প্রস্তাব না ক'রেই তিনি দেখান যে পুরুষের পাশাপাশি দেখা দিয়েছিলেন মহৎ নারী লেখকেরাও, কিন্তু তাঁরা মূল্য পান নি। ইলেইন শোআল্টার *তাঁদের নিজেদের সাহিত্য*-এ বর্ণনা করেন ব্রোন্টিদের থেকে বর্তমান পর্যন্ত লেখা ইংরেজি উপন্যাসের ইতিহাস; দেখান এ-ধারার বিকাশের রীতি সাহিত্যিক উপসংস্কৃতি বিকাশের রীতির মতো। তিনি নির্দেশ করেন এ-ধারা বিকাশের তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বটি হয় বেশ দীর্ঘ; এ-পর্বে *অনুকরণ* করা হয় আধিপত্যশীল ঐতিহ্যকে, এবং *অন্তরীকরণ* করা হয় শিল্পকলার মান ও সামাজিক ভূমিকা; দ্বিতীয় পর্বে দেখা দেয় এসব ধারণা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে *প্রতিবাদ*, দাবি করা হয় স্বায়ত্তশাসন; সব শেষে দেখা দেয় *আত্ম-আবিষ্কার*-এর পর্ব। এ-পর্ব তিনটির নাম তিনি দেন *ফেমিনিন*, *ফেমিনিস্ট* এবং *ফিমেল*। তাঁর মতে ইংরেজি সাহিত্যে ফেমিনিন পর্ব শুরু হয় ১৮৪০-এর দশকে, যখন নারী লেখকেরা দেখা দেন পুরুষছদ্মনামে। এ-পর্ব সমাপ্ত হয় ১৮৮০ সালে জর্জ এলিঅটের মৃত্যুতে। ফেমিনিস্ট পর্বের কাল ১৮৮০ থেকে ১৯২০; এবং ফিমেল পর্ব ১৯২০-এ শুরু হয়ে এখনো চলছে। সাহিত্যের ইতিহাস ও নারীবাদী সমালোচনায় শোআল্টারের বড়ো কৃতিত্ব বিস্মৃত ও উপেক্ষিত নারী লেখকদের পুনরাবিষ্কার।

সান্ড্রা এম গিলবার্ট ও সুজান গুবারের *চিলেকোঠার পাগলী* বিশাল বই। এতে আলোচিত হন জেইন অস্টিন, মেরি শেলি, ব্রোন্টি বোনেরা, জর্জ এলিঅট, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ক্রিস্টিনা রসেটি, এবং এমিলি ডিকিনসন। তাঁরা তুলে ধরেন উনিশশতকের 'সুস্পষ্টভাবে পৃথক নারীসাহিত্যধারা'র প্রকৃতি, এবং প্রস্তাব করেন নারীর সাহিত্য-সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে এক অভিনব তত্ত্ব। তাঁরা দেখান উনিশশতকে পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতা একান্ত পুরুষের গুণ। লেখক রচনার 'জনক', বিধাতার আদলে তিনি স্রষ্টা বা প্রণেতা বা গ্রন্থকার। সৃষ্টিশীলতার এ-শিশ্নতান্ত্রিক উপকথার মধ্যে নারী লেখকদের দাঁড়াতে হয় কঠিন অবস্থার মুখোমুখি। সৃষ্টিশীলতাকে পিতৃতন্ত্র যেহেতু গণ্য করে পুরুষালি কাজ ব'লে, তাই নারীভাবমূর্তিও তৈরি হয়েছে পুরুষের কল্পনায়; নারী অধিকার পায় নি নারী বা নারীত্ব সম্পর্কে ভাবমূর্তি সৃষ্টির, তাদের বাধ্য করা হয়েছে পুরুষের কল্পিত ভাবাদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। গিলবার্ট ও গুবার বিশ্লেষণ করেন পিতৃতন্ত্রে নারীশিল্পীর অবস্থান। তাঁরা দেখান পিতৃতন্ত্রের তৈরি নারীধারণা নারী ও নারীশিল্পীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে, নারী ও নারীশিল্পীর মধ্যে তৈরি করে জটিলতা। এর ফলে নারী লেখক হ'তে গিয়ে ভোগে তীব্র উদ্বেগে, কেননা তার অধিকার নেই লেখক হওয়ার। পিতৃতন্ত্রে লেখক অবধারিতভাবে পুরুষ, আর নারী পুরুষের দাসী; তাই নারী কীভাবে ধরবে কলম, হবে লেখক? নারী লেখকেরা এ-সংকট থেকে মুক্তির জন্যে নেন এক কৌশল : তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের বাহ্যসংগঠন ও আন্তর তাৎপর্যের মধ্যে রাখেন দূরত্ব। বাইরে তাঁরা মেনে নেন পিতৃতন্ত্রের বিধান, কিন্তু ভেতরে গোপন ক'রে রাখেন ধ্বংসাত্মক তাৎপর্য, কাজ করেন পিতৃতান্ত্রিক বিধানের বিরুদ্ধে। এমিলি ডিকিনসন বলেছিলেন, 'সত্য বলো, তবে

তির্যকভাবে বলো'; তাঁরা নেন ওই তির্যক ভঙ্গি। তাঁদের মতে নারীর কণ্ঠস্বর ছলনাময়, তবে সত্য। তাঁরা যে-চিলেকোঠার পাগলীর কথা বলেছেন, সে কে? ওই পাগলীটি আর কেউ নয়, সে নারী লেখকের 'ডবল', নারী লেখকের উদ্বেগ ও ক্রোধের উন্মাদিনী রূপ। পিতৃতন্ত্রের চাপে উনিশশতকের নারী লেখকদের প্রায় প্রত্যেকে সৃষ্টি করেন একেকটি পাগলী, যে তাঁরই আরেক সত্তা। এ-পাগলী সৃষ্টি ছিলো তাঁদের এক সাহিত্যিক কৌশল, যা উনিশশতকের নারীদের লেখা উপন্যাসকে দিয়েছে বিপ্লবাত্মক প্রকৃতি।

নারীবাদীরা নারীসাহিত্যের ওপর যে-গুরুত্ব অরোপ করেন, তাতে দেশে দেশে পুনরাবিষ্কৃত হয় বিপুল পরিমাণে নারীসাহিত্য। সেগুলোকে নতুনভাবে পড়েন তাঁরা। তাঁরা পুনরাবিষ্কার করেন বহু বিস্মৃত নারী লেখককে, প্রকাশ করেন তাঁদের চিঠিপত্র ও দিনপঞ্জি, এবং দেখান যে নারীসাহিত্যের রয়েছে এক বিশেষ স্বভাব। নারীবাদী সমালোচনার প্রথম সুফল পান আঠারোউনিশশতকের নারী লেখকেরা, যাঁদের বই শিকার হয়েছিলো উপেক্ষা আর বিস্মৃতির। নারীবাদী প্রকাশনা থেকে ১৯৭২-এ পুনঃপ্রকাশিত হয় রেবেকা হার্ডিং ড্যাভিসের উপন্যাস *লাইফ ইন দি আয়রন মিলস* (১৮৬১), ১৯৭৩-এ পুনঃপ্রকাশিত হয় শার্লোট পার্কিন্স গিলম্যানের ছোটগল্প 'দি ইয়েলো ওয়ালপেপার' (১৮৯২), বেরোয় বিস্মৃত নারী লেখকদের নানা রচনাসংগ্রহ। এসব লেখায় পাওয়া যায় নীরব বিদ্রোহ, এমনকি আমূলবাদী মনোভাব; এবং নারীবাদীরা খুঁজতে শুরু করেন কেনো এসব লেখা বাদ পড়েছিলো 'প্রধান রচনা'র পংক্তি থেকে? ১৯৭৮-এ বেরোয় নিনা বায়ামের *ওম্যানস ফিকশন : এ গাইড টু নোভেলস বাই অ্যান্ড অ্যাবাউট উইমেন ইন আমেরিকা, ১৮২০-১৮৭০*। এতে দেখানো হয় যে উনিশশতকের অধিকাংশ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকই ছিলেন নারী, তাঁরা 'বেস্ট-সেলার' লিখেছিলেন, কিন্তু বাদ প'ড়ে গেছেন সাহিত্যের প্রধান পংক্তি থেকে। বেস্ট-সেলার উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয় না ঠিকই, কিন্তু নারীবাদীরা মনে করেন ওই নারী লেখকদের কেউ কেউ স্বীকৃতি পেতে পারতেন।

১৯৭০ থেকে নারীবাদীরা বিকাশ ঘটাতে থাকেন *নারীর নন্দনতত্ত্ব* ব'লে একটি ধারণার, তাঁরা বলতে থাকেন নারীর বিশেষ *সাহিত্যচৈতন্য*-এর কথা। অ্যাড্রিয়েন রিচ, মার্জে পিয়ের্সি, জুডি শিকাগো, সুজ্যান গ্রিফিন, অ্যালিস ওয়াকার প্রমুখের রচনায় দেখা দেয় নারীর নন্দনতত্ত্বের ধারণা; তাঁরা দাবি করেন *নারীসংস্কৃতি* ব'লে এক বিশেষ সংস্কৃতি। তবে নারীর নন্দনতত্ত্বের ধারণা নিয়ে বিতর্ক বেধেছে; অনেকে একে নারীসমকামবাদী চৈতন্য, ও নারীসমকামবাদী স্বাতন্ত্র্যবাদের সাথে এক ক'রে দেখেন। অ্যাড্রিয়েন রিচ লিখেছেন [দ্র শোঅল্টার (সম্পাদক ১৯৮৫, ৭)] :

> প্রত্যেক নারীর মধ্যে রয়েছে একটি নারীসমকামী, সে অভিভূত হয় নারীশক্তি দিয়ে, সে আকর্ষণ বোধ করে শক্তিশালী নারীর প্রতি, সে খোঁজে এমন সাহিত্য যাতে প্রকাশ পায় ওই শক্তি ও জোর। আমাদের আন্তর নারীসমকামীটিই আমাদের চালায় কল্পনাদীপ্ত অনুভবের দিকে, আর ভাষায় প্রকাশ করে নারীর সাথে নারীর পূর্ণ সম্পর্ক। আমাদের আন্তর নারীসমকামীটিই শুধু সৃষ্টিশীল, কেননা পিতাদের দায়িত্বশীল কন্যারা ভাড়াটে লেখকমাত্র।

অনেকে অবশ্য মেনে নিতে রাজি হন নি যে নারীসত্তা শুধু একটি বিশেষ সাহিত্যশৈলীর মধ্যেই প্রকাশ পায়, বা নারীর সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ পায় নারীসমকামে। ১৯৮০ থেকে নারীসমকামবাদী নন্দনতত্ত্ব ভিন্ন হয়ে যায় নারীনন্দনতত্ত্ব থেকে।

নারীবাদী সমালোচকেরা নিজেরা পুনর্বিচার ক'রে দেখতে চান সাহিত্যের সব কিছু, তাঁরা রাজি নন পুরুষের মূল্যায়ন বিনীতভাবে মেনে নিতে। তাঁদের বিরুদ্ধে পুরুষের অভিযোগ হচ্ছে তাঁরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চান হাজার বছরের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। নারীবাদী সমালোচকদের একটি চাবিশব্দ 'পুনঃ' বা 'আবার'। 'ইতিহাস পুনর্লিখনের' কথা বলেছেন ভার্জিনিয়া উল্ফ্, অ্যাড্রিয়েন রিচ বলেছেন নারীর লেখা শুরু হ'তে হবে অতীতকে পুনরাবলোকন বা সংশোধন ক'রে, নারীত্ব পুনরাবিষ্কারের কথা বলেছেন ক্যারোলিন হিলবার্ন, জোন কেলি বলেছেন, 'নারীদের পুনরুদ্ধার করতে হবে ইতিহাসে, এবং ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করতে হবে নারীর কাছে' [দ্র গিলবার্ট (১৯৮০, ৩২)]। পুরুষ এতোদিন যেভাবে সাহিত্য পড়েছে, সেভাবে নয়, পড়তে হবে নারীর, নারীবাদীর চোখে; তখন ওই সাহিত্য ভ'রে ছড়ানো দেখা যাবে লিঙ্গের পীড়ন। ওই পীড়নে বিকৃতরূপে গ'ড়ে উঠেছে নারী। সান্ড্রা গিলবার্ট 'নারীবাদী সমালোচকেরা কী চান? অগ্নিগিরি থেকে পোস্টকার্ড' (১৯৮০) প্রবন্ধে বলেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পুরুষ লেখকদের ভাণ্ডার, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পুরুষ লেখকদের সম্পত্তি। ওই সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রায় নেই। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্রষ্টা গম্ভীর পণ্ডিত, সংরক্ত কবি, আর চিন্তাক্লিষ্ট দার্শনিকেরা সবাই পুরুষ, মহাজগত তাঁদেরই উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত সম্পত্তি। তাঁর মতে পুরুষের সব শক্তি ছিলো, ছিলো বাকশক্তিও, কিন্তু নারীদের পালন করতে হয়েছে নীরবতা; পুরুষ তাদের দিয়েছে যে-ভাষা, তা হচ্ছে নীরবতা। যে-নারীরা নীরবতাব্রত পালনে রাজি হন নি, তাঁদের কী হয়েছে? তাঁরা হারিয়ে গেছেন অন্ধকারে, বা তাঁদের ভুল বোঝা আর অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। নারীদের রচনা হয়তো মহৎ সাহিত্য হয় নি, তা হয়তো খুবই বশমানা; তবে ওই লেখার ভেতরে রয়ে গেছে বিপজ্জনক বস্তু, যা অনেক সময় অগ্নিগিরির মতো, এবং গভীরভাবে *রিভিশনারি*–সংশোধনপন্থী।

অ্যানেট কোলোডনিও (১৯৮০) বলেন একই কথা: বলেন যে নারী সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে দেখে তার কোনো ঐতিহ্য নেই। সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্য ব'লে যা গৃহীত, নারী লেখকেরা একাত্ম বোধ করতে পারেন নি তার সাথে, ওই ঐতিহ্যকে মনে কবতে পারেন নি নিজেদের ব'লে। পুরুষ যেমন লিখতে ব'সেই মনে করে একটা মহৎ বস্তু সে উপহার দিচ্ছে মানবজাতিকে, নারী লেখকেরা তা মনে করতে পারেন নি; মহৎ কিছু বা শিল্পকলা সৃষ্টি করছেন, এমন ভাবাও সম্ভব হয় নি তাঁদের পক্ষে; তাঁরা, অধিকাংশ সময়, নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছেন 'লেখকদের' থেকে। তাঁরা বারবার জানিয়েছেন পণ্ডিতদের জন্যে তাঁরা গল্প লিখছেন না, লিখছেন সাধারণদের জন্যে, যারা 'সাহিত্য' থেকে দূরবর্তী। নিনা বায়াম বলেছেন, সবাই আশা করতো যে নারী লেখকেরা লিখবেন নারীদেব জন্যে, তাঁরা সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

তাঁরাও কখনো নিজেদের মিল্টন বা স্পেন্সারের উত্তরসূরী ব'লে মনে করেন নি [দ্র কোলোড্‌নি (১৯৮০, ৪৯)]। ১৮৯৯-এ কেইট শপিনের *দি অ্যাওকেনিং* উপন্যাসটি প্রকাশের পর পাঠকেরা বেশ বিব্রত বোধ করে; উপন্যাসটিতে তিনি বিবাহবহির্ভূত যৌনতার যে-বিবরণ দেন, তা কোনো নারী ঔপন্যাসিকের কাছে পাঠক প্রত্যাশা করে নি। নারীর কাছে চাওয়া হয় 'ভদ্র উপন্যাস'। বায়াম (১৯৮১) দেখান মার্কিন সাহিত্য পাঠ ও সমালোচনায় সক্রিয় যে-তত্ত্ব, তা নারী লেখকদের মহৎ সাহিত্যের পংক্তি, ক্যান্যন, থেকে বাদ দেয়। তিনি দেখান ১৭৭৪-১৭৯৯ কালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আটতিরিশটি উপন্যাস বেরোয়। এগুলোর নটির লেখকের নাম আজো অজানা, হয়তো সেগুলো লিখেছিলেন নারীরাই; বাকি উনতিরিশটি লেখেন আঠারোজন লেখক, যাঁদের চারজন নারী। তাঁদের একজন, সুজানা রোওসন, একাই লেখেন ছটি উপন্যাস। তাঁর উপন্যাস *শার্লোট* প্রথম প্রকাশের দশকে তিনবার, ১৮০০-১৮১০ সালের মধ্যে উনিশবার, উনিশশতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আশিবার ছাপা হয়। হ্যানা মুরের *দি ককেট* উনিশশতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তিরিশবার ছাপা হয়। নারী ঔপন্যাসিক হ্যারিয়েট বিশার স্টৌর *আংকেল টম্‌স্ কেবিন* মার্কিন সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত উপন্যাস। উনিশশতকে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি পঠিত ঔপন্যাসিক ছিলেন ই ডি ই এন সাউথওয়ার্থ, একজন নারী। এসব সত্ত্বেও তাঁরা মার্কিন সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের কাছে মূল্য পান নি; তাঁরা বাইরে থাকেন সাহিত্যের মহৎ ধারার। কেনো এমন হয়েছে? এর এক কারণ, বায়ামের মতে, পক্ষপাত; সমালোচকেরা পছন্দ করেন না নারীদের লেখক হিশেবে দেখতে, তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে নারীরা লেখক হ'তে পারে; তাই চোখের সামনের নারী লেখকদেরও দেখতে পান না তাঁরা। আরেকটি কারণ হয়তো নারী লেখকেরা মহৎ কিছু লিখে উঠতে পারেন নি। পারেন নি এটা অনেকখানি সত্য, তবে না পারার রয়েছে সামাজিক কারণ। এটা ভুলে গিয়ে পুরুষ সমালোচকেরা নারী লেখকদের উপেক্ষা করেন প্রধানত লৈঙ্গিক কারণে; তাঁরা সাহিত্যকে মনে করেন মূলত পুরুষের কাজ ব'লে।

লিলিআন রবিনসনও (১৯৮৩) আক্রমণ করেছেন সাহিত্য মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠিত ক্যান্যন বা মানদণ্ড ও রুচিকে। তাঁর মতে প্রধান/অপ্রধান ব্যাপারগুলো ভদ্রলোকের চুক্তি। ওই ভদ্রলোকেরা সুবিধাভোগী শ্রেণী ও পুংলিঙ্গের অর্ন্তভুক্ত। সাহিত্যের যে-ক্যান্যন স্বীকৃত, তা সম্পূর্ণরূপে ভদ্রলোকদের সৃষ্টি; তাই তাদের রুচির বাইরের কোনো কিছুই মহৎ ব'লে গণ্য হয় না। পশ্চিমের মহৎ বইগুলো সবই পুরুষের লেখা, সেখানে কোনো নারীর বই নেই; কখনো তাতে অস্টিন, ব্রোন্টি বোনেরা, জর্জ এলিঅট, বা এমিলি ডিকিনসনের স্থান হয়, কিন্তু তাঁরাও থাকেন বেশ নিচে। এ-অবস্থা কাটানোর জন্যে লিলিআন রবিনসন নারীবাদী সমালোচনার দুটি দায়িত্ব নির্দেশ করেন : নতুনভাবে পড়তে হবে সমগ্র ঐতিহ্যকে, পুনর্ব্যাখ্যা করতে হবে নারীচরিত্রগুলো, শনাক্ত করতে হবে লিঙ্গবাদী ভাবাদর্শ, এবং দাঁড়াতে হবে তার মুখোমুখি। আর প্রয়াস চালাতে হবে নারী লেখকদের ক্যান্যনভুক্ত করার। মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট, কেইট মিলেট, ইভা ফিজেস,

এলিজাবেথ জেনওয়ে, জারমেইন গ্রিয়ার, ক্যারোলিন হিলব্রুন করেছেন তাই; তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন মহৎ বইগুলোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। মহৎ সাহিত্য পুনর্মূল্যায়ন করলে কি দেখা যাবে নারীর লেখা অনেক মহৎ সাহিত্য বাদ প'ড়ে গেছে সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্য থেকে? তাঁরা কি কোনো *হ্যামলেট, যুদ্ধ ও শান্তি, বা গীতাঞ্জলি* লিখেছেন, যা স্বীকৃতি পায় নি পুরুষের? নিনা বায়াম স্বীকার করেছেন অমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। ১৮২০-১৮৭০ সালের মধ্যে লেখা মার্কিন নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন ওগুলোতে নান্দনিক, মননগত, নৈতিক জটিলতা ও শিল্পিতার অভাব রয়েছে, যা আমরা প্রত্যাশা করি মহৎ সাহিত্যের কাছে। ওই সময়ের নারী ঔপন্যাসিকদের রচনা নানাভাবে আকর্ষণীয়, কিন্তু কোনো বিস্মৃত জেন অস্টিন বা জর্জ এলিঅট আবিষ্কার করা যায় না তাঁদের মধ্যে, বা এমন কোনো উপন্যাস খুঁজে পাওয়া যায় না, যা *দি স্কারলেট লেটার*-এর মানের। তবু তিনি মনে করেন সাহিত্য মূল্যায়নের যে-মানদণ্ড আমেরিকায় ব্যবহৃত হয়, তা পুরুষের কাজের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ। ওই মানদণ্ডে শেলাইয়ের থেকে তিমি শিকার অনেক বেশি মহৎ কাজ ব'লে গণ্য হয়, তাই নারী বাদ পড়ে। এক নতুন ধরনের উপন্যাস দেখা দিয়েছে সম্প্রতি, যেগুলোকে বলা হয় *নারীবাদী উপন্যাস*। ব্যবসায়িকভাবে এগুলো অত্যন্ত সফল। এ-ধরনের উপন্যাস নারীবাদী প্রকাশনাসংস্থা, এমনকি ব্যবসায়িক প্রকাশনাসংস্থা থেকেও বেরোচ্ছে। তবে এগুলোর সবই কি নারীবাদী উপন্যাস? এগুলো কি উপকারে আসছে নারীবাদী আন্দোলনের, নাকি শুধুই প্রথাগত বিনোদন সামগ্রীর কাজ করছে এগুলো? ঔপন্যাসিক নারী হ'লেই নারীবাদী হন, তিনি যা লেখেন তাই কি হয় নারীবাদী উপন্যাস? কিছু উপন্যাস নারীকেন্দ্রিক, তবে নারীকেন্দ্রিক উপন্যাসমাত্রই নারীবাদী উপন্যাস নয়। নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস নতুন ব্যাপার নয়; অনেক আগে থেকেই নারীরা নারীদের জন্যে নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখে আসছেন, যেমন ঘটেছে রোম্যান্টিক উপন্যাসে। ওই সব উপন্যাসের চেতনা, সেগুলোতে চিত্রিত লিঙ্গ, জাতি, ও শ্রেণী-আনুগত্যের ব্যাপারগুলো নারীবাদবিরোধী। তাই নারীকেন্দ্রিক উপন্যাসমাত্রই নারীবাদী উপন্যাস নয়, তা চারিত্রগতভাবে ভিন্ন [দ্র কাওআর্ড (১৯৮০)]।

ইলেইন শোআল্টার (১৯৭৯) দু'টি রীতিতে ভাগ করেছেন নারীবাদী সমালোচনাকে। প্রথম রীতিতে নারীবাদী সমালোচক হচ্ছেন *পাঠক হিশেবে নারী*; তিনি পুরুষ লেখকদের সাহিত্য প'ড়ে তার লৈঙ্গিক ইঙ্গিতগুলো খুঁজে বের করেন। শোআল্টার এ-রীতির সমালোচনাকে বলেন *নারীবাদী সমালোচনা*। এ-রীতিতে বিচার করা হয় ভাবাদর্শগুলো, বের করা হয় নারীভাবমূর্তি ও নারীছক, খোঁজা হয় কোথায় প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে নারী লেখককে, আর রটনা করা হয়েছে নারী সম্পর্কে কুৎসা। দ্বিতীয় রীতির সমালোচনার বিষয় *লেখক হিশেবে নারী;* এতে বিচার করা হয় নারীসাহিত্য, নারীসাহিত্যের ইতিহাস, বিষয়, শ্রেণী, ও সংগঠন। এতে আলোচিত হয় নারীর সৃষ্টিশীলতার প্রকৃতি, ভাষাবিজ্ঞান, নারীর ভাষার সমস্যা, ও বিশেষ বিশেষ নারী লেখক। শোআল্টার এ-রীতির সমালোচনাকে বলেছেন *গাইনোক্রিটিক* বা *গাইনোক্রিটিসিজম*। তাঁর মতে নারীবাদী সমালোচনা রাজনীতিক ও বিতর্কমূলক, যা

বহু কিছু নিয়েছে মার্ক্সীয় সমাজবিজ্ঞান ও নন্দনতত্ত্ব থেকে; আর তাঁর প্রস্তাবিত গাইনোক্রিটিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিরীক্ষাধর্মী। শোঅল্টারকথিত নারীবাদী সমালোচনা অনেকটা আদি টেস্টামেন্টের মতো, যার কাজ 'অতীতের পাপ ও ভুলভ্রান্তি খোঁজা', আর গাইনোক্রিটিক অনেকটা নতুন টেস্টামেন্টের মতো, যার কাজ 'কল্পনাপ্রতিভার শোভা' খোঁজা। প্রথম রীতিটি ন্যায়পরায়ণ, রাগী, ও ভর্ৎসনাপূর্ণ; দ্বিতীয় রীতিটি নিরাসক্ত। দুটি রীতিই দরকারী; কেননা আদর্শের জেবিমাইঅ্যারাই শুধু 'দাসত্বের মিশর থেকে' নারীদের মুক্তি দিয়ে পৌঁছে দিতে পারেন মানবতাবাদের প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে [দ্র শোঅল্টার (১৯৮১, ২৪৩)]।

নারীবাদীরা কতোখানি আগ্রহী সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্বে? তত্ত্ব জিনিশটি পুরুষের সম্পত্তি; সব তত্ত্বের তারাই স্রষ্টা, নারীর তাতে কোনো অংশ নেই, যদিও নারী ধারাবাহিকভাবে হয়েছে তত্ত্বের শিকার। এখন নারীবাদীরা মনে করেন সেখানে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়েও নারীবাদী সমালোচনার কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিলো না; ১৯৭৫-এ শোঅল্টার বলেছিলেন কোনো তত্ত্বই নারীবাদী ভাবাদর্শ ও পদ্ধতি ধারণের জন্যে যথেষ্ট নয়। কোলোড়নি বলেন, নারীবাদী সমালোচনা দেখা দিয়েছে 'কোনো সমঞ্জস ধারা বা সমন্বিত লক্ষ্যের বদলে একরাশ পরস্পরবদলসম্ভব কৌশল হিশেবে।' এর পরও সমন্বিত তত্ত্ব গ'ড়ে ওঠে নি। কৃষ্ণনারীবাদীরা অভিযোগ করেন যে নারীবাদী সমালোচনা কৃষ্ণ ও তৃতীয় বিশ্বের নারী লেখকদের সম্পর্কে পালন করে 'প্রকাণ্ড নীরবতা'; তাঁরা চান কৃষ্ণনারীবাদী সমালোচনা, যা বিবেচনার মধ্যে নেবে জাতিক ও লৈঙ্গিক উভয় ব্যাপার; মার্ক্সীয় নারীবাদীরা গুরুত্ব দেন শ্রেণী ও লিঙ্গ দুয়েরই ওপর; নারীবাদী সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা পুনরুদ্ধার করতে চান এক লুপ্ত ঐতিহ্য; বিসংগঠনবাদীরা চান এমন সমালোচনা, যা একই সঙ্গে পাঠগত ও নারীবাদী। প্রথম দিকে অনেক নারীবাদীই কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করতে চান নি নারীবাদী সমালোচনার; তাঁরা মনে করেছিলেন তত্ত্ব নারীবাদের মতো গতিশীল ব্যাপারকে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলবে। তাঁরা চেয়েছিলেন নারীবাদী সমালোচনাকে খোলা রাখতে। সত্তরের দশকে সাংগঠনিক, উত্তরসাংগঠনিক, বিসাংগঠনিক ইত্যাদি যে-সমস্ত বিতর্ক দেখা দেয়, নারীবাদীদের কাছে সেগুলোকে মনে হয় উষর ও ছদ্মবস্তুনিষ্ঠ। ওই সমস্ত ক্ষতিকর পুরুষতান্ত্রিক রচনার কবল থেকে তাঁরা মুক্ত থাকতে চান। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ থেকে শুরু ক'রে মেরি ড্যালি, অ্যাড্রিয়েন রিচ, মার্গারেট ডুরাস, ও আরো অনেকে উপহাস করেন 'পুংপাণ্ডিত্যের নপুংসক আত্মপ্রেম'কে, এবং মুক্ত থাকতে চান পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিপুজো থেকে। তবে নারীবাদীরা আজ আর তত্ত্ববিমুখ নন। স্যান্ড্রা গিলবার্ট (১৯৮০, ৩৬) বলেন, 'যে-সব ছদ্মপ্রশ্ন ও উত্তর, পাঠ ও যৌনতা, আঙ্গিক ও লিঙ্গ, মনোলৈঙ্গিক সত্তা ও সাংস্কৃতিক সত্তার সম্পর্ককে ছায়াবৃত ক'রে রেখেছে' নারীবাদী সমালোচনা 'সে-সবের পাঠোদ্ধার ও রহস্য উন্মোচন' করতে চায়। সংশোধনপন্থী নারীবাদী সমালোচনা অনেকটা গ'ড়ে উঠেছে চলতি সমালোচনা কাঠামো ভিত্তি ক'রেই। তবু নারীবাদীরা লেগে আছেন পুরুষের সমালোচনা রীতি সংশোধন ও তাকে মানবিক ক'রে তুলতে, এবং তাকে নিরন্তর আক্রমণ ক'রে চলছেন : পুরুষের সমালোচনাতত্ত্ব

হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা, সাহিত্যের ইতিহাস বা সাহিত্য ব্যাখ্যার সে-তত্ত্ব, যার ভিত্তি পুরুষের অভিজ্ঞতা, তবে তা পেশ করা হয় সর্বজনীন ব'লে। শোঅল্টারের (১৯৮১) মতে নারীবাদীরা যতোদিন পুরুষকেন্দ্রিক সমালোচনাকাঠামো ভিত্তি হিশেবে ব্যবহার করবে, এমনকি তা সংশোধন ক'রে যোগ করবে কিছুটা নতুনত্ব, ততোদিন নারীরা নতুন কিছুই শিখবে না। তাঁর মতে পুরুষের ধারণা দিয়ে চলবে না নারীদের; লাকঁ, দেরিদায় নারীর চলবে না; কেননা এতে নারী মেনে চলে পুরুষ প্রভুদেরই। তিনি চান একটি একান্ত নারীবাদী সমালোচনারীতি, যা হবে নারীকেন্দ্রিক, স্বাধীন, ও মননগতভাবে সুসমঞ্জস। তাঁর মতে নারীবাদী সমালোচনাকে 'বের করতে হবে নিজ বিষয়, নিজ পদ্ধতি, নিজ তত্ত্ব, এবং নিজ কণ্ঠস্বর।'

এলেন সিজো বলেছেন, 'আরো দেহ, তাই আরো লেখা।' নারীবাদীদের কেউ কেউ জৈব বা দেহবাদী সমালোচনারও প্রস্তাব করেছেন। এতে দেহই হয়ে ওঠে রচনা বা বই। দেহকে সমালোচনার মানদণ্ড করা বিপজ্জনক, কেননা সব জাতিই বিশ্বাস করে যে নারী দৈহিকভাবে দুর্বল, তার মস্তিষ্কও দুর্বল। জৈব নারীবাদী সমালোচকেরা অবশ্য দৈহিক হীনতা স্বীকার করেন না, কিন্তু মনে করেন নারীর শরীর তার লেখাকেও স্বতন্ত্র ক'রে তোলে। পিতৃতন্ত্রের বিশ্বাস হচ্ছে লেখক জনক, যার কলম অনেকটা শিশ্নের মতোই জন্মদানের হাতিয়ার। গিলবার্ট ও গুবার প্রশ্ন করেছেন, 'যদি কলম হয়ে ওঠে একটি রূপক-শিশ্ন, তাহলে কোন অঙ্গ থেকে নারী উৎপাদন করবে পাঠ বা রচনা?' উত্তরে শোঅল্টার (১৯৮১, ২৫০) বলেছেন, নারী পাঠ বা রচনা জন্ম দেয় মস্তিষ্ক থেকে, বা ওয়ার্ড-প্রসেসর থেকে, যা একটি রূপক-জরায়ু। সাহিত্যিক পিতৃত্বের রূপক নারীদের পীড়ন করছে আবহমান কাল ধ'রে; তবে আঠারোউনিশশতকে সাহিত্যিক মাতৃত্বের রূপকও বেশ বড়ো হয়ে উঠেছিলো, যাতে সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে ওঠে গর্ভধারণ ও প্রসবের মতো ব্যাপার। বিশেষ ক'রে ফ্রান্সে ও আমেরিকায় কোনো কোনো আমূল নারীবাদী মনে করেন এসব রূপককে নিতে হবে গুরুত্বের সাথে, নারীপুরুষের জৈব পার্থক্যকে দেখতে হবে নতুনভাবে, এবং খুঁজতে হবে দেহের সাথে লেখার সম্পর্ক। তাঁরা মনে করেন নারীর লেখা বেরোয় দেহ থেকে, তাদের দৈহিক পার্থক্য তাদের লেখার উৎসও। অ্যাড্রিয়েন রিচ বলেন [শোঅল্টার (১৯৮১, ২৫১)] :

> আমরা এখনো যতোটা বুঝতে পেরেছি, নারীদেহের রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি আমূল তাৎপর্য। পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা তার সংকীর্ণ নির্দেশ অনুসারে নারীদেহকে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলেছে। এ-কারণে নারীবাদী দৃষ্টি স'রে এসেছে নারীর জৈবসংগঠন থেকে; আমি বিশ্বাস করি তা একদিন আমাদের দেহকে নিয়তি মনে না ক'রে সম্পদ ব'লেই গণ্য করবে। পরিপূর্ণ মানবিক জীবন যাপনের জন্যে আমাদের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করাই শুধু আমাদের জন্যে জরুরি নয়, আমাদের স্পর্শ করতে হবে আমাদের দেহের ঐক্য ও অনুনাদকে, যা আমাদের মননের দৈহিক ভিত্তি।

নারীবাদী জৈব সমালোচনায় খোঁজা হয় কীভাবে দেহ ব্যবহৃত হয় চিত্রকল্পের উৎসরূপে; আর নারীবাদী জৈব সমালোচনা, যা উৎসারিত করা হয় সমালোচকের দেহ থেকে, হয়ে থাকে অন্তরঙ্গ, স্বীকারোক্তিমূলক, ও আঙ্গিকগতভাবে অভিনব। তবে নারীসত্তার খোঁজে বেরিয়ে দেহকেই তার কেন্দ্র ব'লে গণ্য করা ভয়ঙ্কর কাজ, কেননা

দেহকেই পুরুষতন্ত্র ব্যবহার করেছে নারীশোষণের প্রধান যুক্তিরূপে। নারীর দেহেই খুঁজতে হবে নারীর সৃষ্টিশীলতা? এর চমৎকার উত্তর দিয়েছেন ন্যান্সি মিলার; তিনি বলেছেন নারীর সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য খুঁজতে হবে 'তার দেহের লেখায় নয়, বরং তার লেখার দেহে' [দ্র শোঅল্টার (১৯৮১, ২৫২)]।

বোনি জিমারম্যান (১৯৮১) 'যা কখনো ছিলো না' নামক একটি তীব্র প্রবন্ধে তুলে ধরেন এমন এক বিষয়, যা পিতৃতন্ত্রের বিধানে নিষিদ্ধ, আর নারীবাদীরাও চান চেপে রাখতে। তিনি আলোচনা করেন নারীসমকামবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনারীতি। নারীসমকামবাদকে উপেক্ষার বিরুদ্ধে তিনি জানান প্রবল প্রতিবাদ। নারীসমকাম নিষিদ্ধ ব্যাপার, তা যে ছিলো আর আছে, তা-ই কেউ স্বীকার করতে চায় নি ও চায় না; কিন্তু সত্য হচ্ছে তা ছিলো, এবং আছে। নারীসমকামবাদী সাহিত্যতত্ত্ব প্রস্তাবের সূচনায়ই প্রশ্ন ওঠে যে নারীর যৌন ও প্রীতির সম্পর্ক কতোখানি প্রভাব ফেলে তার লেখা, পড়া, ও চিন্তার ওপর? নারীসমকামবাদী নন্দনতত্ত্ব কি পৃথক হবে নারীবাদী নন্দনতত্ত্ব থেকে? কী হবে নারীসমকামবাদী সমালোচকের কাজ? সম্ভব কি কোনো নারীসমকামবাদী মানদণ্ড বা বিধান প্রতিষ্ঠা করা? নারীসমকামবাদীরা কি বিকাশ ঘটাতে পারেন এমন কোনো অন্তর্দৃষ্টির, যা ঋদ্ধ করবে সমগ্র সমালোচনাশাস্ত্রকে? নারীসমকামবাদী সমালোচনার কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রায় সব নারীসমকামবাদীই একমত। তাঁরা মনে করেন এমন নয় যে নারীসত্তা স্থির করতে হবে শুধু পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রেই, নারীসাহিত্যকেও যে পুরুষসাহিত্যের সাথে সম্পর্কিত ক'রে দেখতে হবে, তাও নয়; তাঁদের মতে নারীর সাথে নারীর তীব্র সম্পর্কও নারীর জীবনের বড়ো ব্যাপার, এবং নারীর যৌন ও আবেগগত প্রবণতা গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার চেতনা ও সৃষ্টিশীলতাকে। পিতৃতন্ত্র স্বীকার করে শুধু বিষমকামকে; নারীসমকামবাদীদের মতে বিষমকামই একমাত্র স্বাভাবিক যৌন ও আবেগগত সম্পর্ক নয়। বিষমকামকেই শুধু স্বাভাবিক ভাবা পিতৃতন্ত্রের শিক্ষামাত্র। জিমারম্যান দেখান যে নারীবাদীরাও দীক্ষিত পিতৃতন্ত্রের বিষমকামবাদে; তাই নারীবাদী সংগ্রহ থেকে বাদ পড়েন নারীসমকামী রেনি ভিভিয়েন ও র‍্যাডক্লিফ হল, বা সংকলিত হয় ক্যাথেরিন ফিলিপ্‌স, ও অ্যাড্রিয়েন রিচের বিষমকামী বা নিষ্কাম রচনা, যদিও তাঁরা বিখ্যাত নারীসমকামী লেখার জন্যে। জিমারম্যান (১৯৮১, ২০১-২০২) বলেন :

> যখন পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত কোনো সংগ্রহে থাকে স্ত্রী, মাতা, যৌনসামগ্রী, তরুণী, বৃদ্ধা, এবং মুক্ত নারী প্রভৃতি বিভাগ, কিন্তু থাকে না নারীসমকামী– তখন তা বিষমকামবাদ। নারীবাদী সংগ্রহে বিষমকামবাদ–পুংকেন্দ্রিক সংগ্রহে লিঙ্গবাদের মতো– মুছে ফেলে নারীসমকামবাদী অস্তিত্ব এবং লালন করে এ-মিথ্যেটি যে নারী শুধু পুরুষের মধ্যেই খোঁজে কাম ও আবেগের তৃপ্তি, বা একেবারেই খোঁজে না।

নারীসমকামবাদীরা অভিযোগ করেন নারীবাদী পত্রিকা– *ফেমিনিস্ট স্টাডিজ, উইমেন্স স্টাডিজ, উইমেন অ্যান্ড লিটেরেচার* প্রভৃতিতে যে নারীসমকামবাদী রচনা বেরোয় না, তার মূলে রয়েছে বিষমকামবাদ, বা পরিকল্পিত উদ্দেশ্য। অধিকাংশ

নারীসমকামবাদী লেখা প্রথম বেরোয় বিকল্প, অপ্রাতিষ্ঠানিক নারীসমকামবাদী পত্রিকা *সিনিস্টার উইজডম, কোন্ডিশন্স* প্রভৃতিতে। বিষমকামবাদের প্রতাপ দেখা যায় নারীবাদী সমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ সব সংগ্রহে; যেমন *দি অথোরিটি অফ এক্সপেরিএন্স* বা *শেক্সপিয়র্স্ সিস্টার্স্*-এ নেই কোনো নারীসমকামবাদী প্রবন্ধ। নারীবাদী সমালোচকেরা চেপে গেছেন নারীসমকামবাদকে; তাই নারীসমকামবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন নারীসমকামবাদীরাই। ১৯৫৬তে বেরোয় জেনেট ফস্টারের *সেক্স ভ্যারিয়েন্ট উইমেন ইন লিটেরেচার*, ১৯৬৭তে জেন ড্যামন (ছদ্মনাম), জ্যান ওয়াটসন, ও রবিন জর্ডানের *দি লেসবিয়ান ইন লিটেরেচার : এ বিবলিওগ্রাফি।*

নারীসমকামবাদী সমালোচনার মূলে, নারীবাদী সমালোচনার মতোই, রয়েছে রাজনীতিক ভাবাদর্শ। তাঁদের মতে নারীসমকাম এক সুস্থ জীবনপদ্ধতি, নারীরা যা যাপন করেছে ও করছে সব দেশে ও কালে। তাই তাঁরা দূর করতে চান এর ওপর চাপানো নিষেধ। এতে সফল হওয়ার এক উপায় নারীদের পুরুষের মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে একান্তভাবে নারীসমাজভুক্ত করা। এক ধরনের নারীস্থান গ'ড়ে তোলা। র‍্যাডিক্যালেসবিয়ান বা আমূলনারীসমকামবাদীরা মনে করেন যে নারীর কাছে নারীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নারীরা মিলে গ'ড়ে তুলবে এক নতুন চৈতন্য, তারা নিজেদের কেন্দ্র খুঁজবে নিজেদের ভেতরে। তাঁদের মতে বিষমকামবাদ এক রাজনীতিক সংস্থা, তা ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার নয়। নারীসমকামবাদীরা বিকাশ ঘটাতে চান একান্ত নারীসমকামী নারীবাদী প্রেক্ষিত; তাই তাঁদের প্রশ্ন : কখন কোনো রচনা হয়ে ওঠে, বা তার লেখক হন নারীসমকামবাদী? এটা নির্ভর করে *নারীসমকামী* বলতে কী বোঝায়, তার ওপর। নারীসমকামী বলতে কি বোঝাবে শুধু সে-নারীদেরই, অন্য নারীর সাথে যাঁদের যৌন অভিজ্ঞতার প্রমাণ রয়েছে? এটা অসম্ভব কাজ। অনেকেই তো তার কোনো প্রমাণ রেখে যান নি। তাছাড়া এতে নারীসমকাম হয়ে ওঠে শুধুই যৌন ব্যাপার। অ্যাড্রিয়েন রিচের মতে নারীসমকামবাদ শুধু অন্য নারীর সাথে যৌনসংসর্গ নয়, তা নারীর সংসর্গে নারীর অভিজ্ঞতা, নারীর সাথে নারীর আন্তর জীবনের ঐক্য, রাজনীতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নারীদের ঐক্য [দ্র জিমারম্যান (১৯৮১, ২০৫)]। তবে নারীদের সব ধরনের সম্পর্ককেই যদি নারীসমকামী সম্পর্ক বলা হয়, তাতে অসুবিধা দেখা দেয়; নারীদের মধ্যে নারীসমকামী ও অসমকামী সম্পর্কের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। অনেকে নারীসমকামবাদের রাজনীতিক সংজ্ঞাও দিয়েছেন; বলেছেন নারীসমকাম হচ্ছে শক্তি, স্বাধীনতা, ও পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। লিলিআন ফ্যাডারম্যান *সারপাসিং দি লাভ অফ ম্যান : রোম্যান্টিক ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভ বিটুইন উইমেন ফ্রম দি রেনেসাঁস টু দি প্রিসেন্ট* (১৯৮১) বইতে দিয়েছেন নারীসমকামবাদের মাঝপথি সংজ্ঞা [দ্র জিমারম্যান (১৯৮১, ২০৬)] :

> 'নারীসমকামী' বলতে বোঝায় সে-সম্পর্ক, যাতে দুটি নারীর তীব্রতম আবেগ ও প্রীতি ধাবিত হয় পরস্পরের দিকে। এ-সম্পর্কে থাকতে পারে কম বা বেশি যৌন সংসর্গ, এমনকি একেবারে নাও থাকতে পারে। এতে দুটি নারী পছন্দ করে তাদের অধিকাংশ সময় একসাথে কাটাতে এবং জীবনের

অধিকাংশ ব্যাপার তারা যাপন করে পরস্পবেব সাথে।

নারীসমকামবাদী সমালোচকের একটি দায়িত্ব নারীসমকামবাদের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তা হয়ে উঠতে পারে শ্রদ্ধেয়। জেন রুল *লেসবিয়ান ইমেজেজ : নারীসমকামবাদী ভাবমূর্তিতে* (১৯৭৩) প্রথম নারীসমকামবাদের ঐতিহ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এটি নারীসমকামবাদী সমালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। এর পর ডোলোরেস ক্লাইস *ওম্যান প্লাস ওম্যান : নারী যোগ নারী* (১৯৭৪), লুইসে বারনিকোও *দি ওয়ার্ল্ড স্প্লিট্ ওপেন : ফালি ক'রে খোলা পৃথিবী* (১৯৭৪) বইতে প্রতিষ্ঠা করেন নারীসমকামবাদের এক মহৎ ঐতিহ্য। তাঁরা স্যাফো থেকে শুরু ক'রে তাঁদের ধারায় পান মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্, এমিলি ডিকিন্‌সন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, ভিটা স্যাকভিল-ওয়েস্ট, এথেল স্মাইথি, জারট্রুড স্টেইন, র‍্যাডক্লিফ হল, নাটালি বার্নি, কোলেৎ, রেনি ভিভিয়েন, রোমেইন ব্রুক্‌স্, ও আরো অনেককে। নারীসমকামবাদী সমালোচনার এক বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্য আবিষ্কার হ'লেও এই এর একমাত্র লক্ষ্য নয়; নারীসমকামবাদীরা খুঁজেছেন উপন্যাসে নারীসমকামীর ভাবমূর্তি, ছক প্রভৃতি। বার্থা হ্যারিস দেখিয়েছেন উপন্যাসে নারীসমকামী চিত্রিত হয় দানবীরূপে, যে ভেঙেচুরে ফেলে নারীর আনুগত্য, অক্রিয়তা, সতীত্বের প্রথাগত ধারণা। তাঁরা রচনাশৈলী ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষেয়েও কিছু কাজ করেছেন। নারীসমকামবাদীদের কাছে ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা শতাব্দীপরম্পরায় তাদের মুখ খুলতে দেয়া হয় নি, তাদের ভাষা কেড়ে নেয়া হয়েছিলো। এক সময় তাঁরা সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেছেন, এখন চালাচ্ছেন নানা নিরীক্ষা। তাঁদের ব্যাকরণ অপ্রথাগত, কথা বলেন তাঁরা ঘটমান বর্তমান কালে, নিয়মিতভাবে তৈরি করেন নতুন শব্দ।

নারীবাদ, এবং নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ ধারার বিকাশ ঘটে ফরাশিদেশে। একে বলা হয় ফরাশি নারীবাদ। ফরাশি ও বিশ্বনারীবাদের মহত্তম তাত্ত্বিক সিমোন দ্য বোভোয়ার। তাঁর কাছে, অন্যদের মতো, ফরাশি নবনারীবাদীরা ঋণী, ও ঋণস্বীকারে অকুণ্ঠ। তিনি নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনারও সূত্রপাত করেছিলেন *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ, লিঙ্গবাদের রূপ দেখিয়েছিলেন পাঁচজন– মঁথেরলঁ, ডি এইচ লরেন্স, ক্লদেল, ব্রেতোঁ, স্তাঁদাল– লেখকের উপন্যাস ও কবিতায়। তবে ১৯৬৮র ছাত্রবিদ্রোহ থেকে উদ্ভূত ফরাশি নবনারীবাদীরা সাহিত্য সমালোচনায় তাঁকে অনুসরণ করেন নি। ১৯৭০ থেকে ফরাশি নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উৎস হয় দেরিদীয় বিসংগঠন ও লাকঁর ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সাংগঠনিক ভাষ্য। তাঁরা পুরুষ প্রভুদের ধারণা নিয়েই করেন নারীবাদী কাজ। ১৯৭৪-এর মধ্যে ফরাশি নারীবাদীরা তাঁদের ভয়াবহ মননশীল নারীবাদীতত্ত্বের অনেকটা রচনা ক'রে ফেলেন; কিন্তু অতিমননশীলতাভারাক্রান্ত ওই তত্ত্ব বাইরে গৃহীত হ'তে সময় নেয়। মার্ক্স, নিটশে, হাইডেগার, দেরিদা, লাকঁর চিন্তায় তাঁদের তত্ত্ব পরিপূর্ণ, যা অফরাশি পাঠকের কাছে বিপন্নকরভাবে দুরূহ। এলেন সিজোর দুরূহজটিল ভাষারীতি, ল্যুস ইরিগারের গ্রিক বর্ণমালামোহ, জুলিয়া ক্রিস্তেভার এক বাক্যে পাঁচসাতজন তাত্ত্বিককে উল্লেখ করার প্রবণতা পাঠকের মনে ভয় জাগায়।

ইঙ্গমার্কিন নারীবাদীরা যেমন সৃষ্টি করেন বিপুল পরিমাণ নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা, ঠিক সে-ধরনের সমালোচনা ফরাশি নারীবাদীরা লিখেছেন কম ; তাঁরা লিখেছেন পাঠগত, ভাষাতাত্ত্বিক, সাংকেতিক বা মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্বের সমস্যা সম্পর্কে, এবং লিখেছেন এমন রচনা, যাতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কবিতা ও তত্ত্ব। তাঁরা ইঙ্গমার্কিন নারীবাদীদের মতো প্রশ্ন তোলেন নি 'মহৎ' সাহিত্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে, তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন; তাই তাঁরা ইঙ্গমার্কিন নারীবাদীদের মতো সফলভাবে রুখে দাঁড়াতে পারেন নি পুরুষতান্ত্রিক সাহিত্যের পীড়নমূলক সামাজিক ও রাজনীতিক চক্রান্তের মুখোমুখি। পুরুষেরা যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে ফরাশিদেশে, তাঁরাও ব্যস্ত থেকেছেন তা নিয়েই; তবে তা বিশ্লেষণ করেছেন নারীবাদী দৃষ্টিতে। ফরাশি নারীবাদীদের কাছে ভাষা প্রধান গুরুত্বের বস্তু। ফরাশি নবনারীবাদের তিন প্রধান এলেন সিজো, ল্যুস ইরিগারে, ও জুলিয়া ক্রিস্তেভা।

এলেন সিজো ১৯৭৫-১৯৭৭ সময়ের মধ্যে লেখেন একরাশ তাত্ত্বিক রচনা, যাতে খোঁজা হয় নারী, নারীত্ব, নারীবাদ, ও লেখার সম্পর্ক। তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে *ল্য জ্যন নে* (ক্যাথেরিন ক্লেমঁওর সাথে, ১৯৭৫), 'মেদুসার হাস্য' (১৯৭৫), 'নপুংসকীকরণ না শিরচ্ছেদীকরণ?' (১৯৭৬), *ল্য ভ্যন্যু লেক্রিত্যুর : লেখায় আসা* (১৯৭৭)। তাঁর লেখায় কিছু কেন্দ্রীয় ধারণা ও চিত্রকল্প ফিরে ফিরে আসে, আর তাঁর লেখা হয়ে ওঠে এমন যেনো তা সরলরৈখিকভাবে পড়ার জন্যে নয়। তাঁর লেখা কাব্যিক, রূপকভরা, চিত্রকল্পের বিশ্লেষণঅসম্ভব জালের মতো। দেরিদার মতে পশ্চিমি পরাবিদ্যা আলোচনার ভিত্তি পুরুষ, পুরুষের একটি অতিশায়িত আদর্শায়িত রূপ গঠন ক'রে সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে বসানো হয়েছে পুরুষকে। দর্শনের সূচনাকাল থেকে পুরুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন এক জ্ঞানতত্ত্বের কেন্দ্রে, যা গ'ড়ে উঠেছে ক্রমস্তরিকভাবে বিন্যস্ত একরাশ দ্বিমুখি ধারণায়। তাতে পুরুষ সব সময় অধিকার ক'রে আছে সুবিধাজনক স্থান : সত্তা/অপর, কর্তা/কর্ম, উপস্থিতি/অনুপস্থিতি, বিধি বা শৃঙ্খলা/বিশৃঙ্খলা, পুরুষ/নারী প্রভৃতি দ্বিমুখি ধারণায় পুরুষই মূল ধারণা [দ্র জোন্স (১৯৮৫, ৮১)]। ফরাশি নারীবাদীরা দেখান পুরুষ নারীকে এই ক্রমস্তরিক বিন্যাসের ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে, এবং নারীকে জড়িয়ে দিয়েছে সে-সব ধারণার সাথে যেগুলো বোঝায় 'মানুষ-নয়'। পুরুষ এভাবে অধিকার করেছে কেন্দ্রিকতা ও ক্ষমতা। তাঁরা পুরুষাধিপত্যবাদী পরাবিদ্যাকে বুঝিয়ে থাকেন একটি শব্দে, শব্দটি 'ফ্যালোসেন্ট্রিজম' বা 'শিশ্নকেন্দ্রিকতা', যাতে শিশ্নই কেন্দ্র, পুরুষই সব। পিতৃতন্ত্রে নারীপুরুষের মূল্য কী, তা দেখানোর জন্যে সিজো পেশ করেছেন তাঁর 'পিতৃতান্ত্রিক দ্বিমুখি বৈপরীত্য'-এর তালিকা : সক্রিয়/অক্রিয়, সূর্য/চন্দ্র, সংস্কৃতি/প্রকৃতি, দিন/রাত, পিতা/মাতা, মস্তিষ্ক/আবেগ, বোধগম্য/ভাবাবেগপরায়ণ প্রভৃতি; এবং দেখিয়েছেন এ-তালিকার ধনাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলো সবই পুরুষের, ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলো নারীর। এ-ধরনের চিন্তায় সিজো সক্রিয় দেখেছেন মৃত্যুকে। তাঁর মতে দ্বিমুখি বৈপরীত্যের একটি ধারণাকে অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্যে দরকার অপরটির বিনাশ; তাই আধিপত্যের জন্যে লড়াই ক'রে চলছে ধারণাগুলো। এতে বিজয় = সক্রিয়তা, আর পরাজয় = অক্রিয়তা। পিতৃতন্ত্রে

পুরুষই সব সময় বিজয়ী। তাই নারী অভিন্ন মৃত্যুর সাথে। সিক্সো সৃষ্টি করতে চেয়েছেন *এক্রিত্যুর ফেমিনিন* বা *নারীর লেখা* ব'লে একটি ধারণা। তাঁর মতে নারীর লেখার অভিমুখ ভিন্নতার দিকে, যার লক্ষ্য শিশ্নবাক্যকেন্দ্রিক– *ফ্যালোগোসেন্ট্রিক*– যুক্তি উপেক্ষা করা। তিনি নির্দেশ করেছেন লেখারও লিঙ্গ; তবে ওই লিঙ্গ লেখকের লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর মতে অনেক নারীই এমন লেখা লিখেছেন, যা আসলে পুংলিঙ্গ। তবে তিনি লিঙ্গ ধারণাই ত্যাগ করতে চান।

ল্যুস ইরিগারের প্রথম বই *চিত্তভ্রংশতার ভাষা* (১৯৭৩) বেশ সুদূর নারীবাদী লক্ষ্য থেকে, কিন্তু দ্বিতীয় বই *অপর নারীর অবতল দর্পণ*-এ (১৯৭৪) তিনি নারীবাদের জন্যে পেশ করেন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, এবং এ-বইয়ের জন্যে তিনি বহিষ্কৃত হন লাকঁর ফ্রয়েডীয় ইস্কুল থেকে। বইটি অতিবিতর্কিত। ১৯৭৭-এ বেরোয় *এই লিঙ্গ যা একটি নয়*, এর পর বরোয় *এবং একজন অপরজনকে ছাড়া আলোড়িত হয় না* (১৯৭৯), *ফ্রিডরিখ নিটশের জলীয় প্রেমিক* (১৯৮০), *মায়ের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ* (১৯৮১), *প্রাথমিক সংরাগ* (১৯৮২)। তাঁর *অবতল দর্পণ*-এর প্রথম ভাগে রয়েছে ফ্রয়েডের নারীমনোবিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা, তবে তিনি মিলেটের মতো মনোবিজ্ঞানকে সহজাতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে বাদ দেন নি। বইটি তিনি ফ্রয়েডকে দিয়ে শুরু এবং প্লাতোকে দিয়ে শেষ ক'রে নষ্ট ক'রে দেন স্বাভাবিক কালানুক্রম। এ-বইয়ের গঠনের সাথে মিল রয়েছে স্ত্রীরোগবিদদের ব্যবহৃত অবতল দর্পণের, যা দিয়ে তারা নারীদেহের নানা রন্ধ্র পর্যবেক্ষণ করে। তাঁর রচনাপদ্ধতি বিসাংগঠনিক। জুলিয়া ক্রিস্তেভা বুলগেরীয়, ১৯৬৬তে আসেন প্যারিসে। রোলাঁ বার্ত তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'জুলিয়া ক্রিস্তেভা বস্তুর স্থান বদলে দেন: তিনি ধ্বংস করেন অতিসাম্প্রতিক পূর্বধারণা...তিনি ধ্বংস করেন কর্তৃত্ব, একযৌক্তিক বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব' [দ্র মোই (১৯৮৫, ১৫০)]। তাঁর বইয়ের মধ্যে রয়েছে *কাব্যভাষার বিপ্লব* (১৯৭৪), *ভাষায় কামনাবাসনা* (১৯৮০), *বিভীষিকার ক্ষমতা* (১৯৮০) প্রভৃতি। ক্রিস্তেভার প্রধান প্রবণতা ভাষার সমস্যা বিশ্লেষণ। তাঁর মতে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ভাবাদর্শগত ও দার্শনিক ভিত্তিটি কর্তৃত্বপরায়ণ ও পীড়নবাদী। ক্রিস্তেভা, রুশ ভাষাবিজ্ঞানী ভোলোসিনোভের মতো, ভেঙে দিতে চান ভাষাবিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র ও কাব্যতত্ত্বের মধ্যবর্তী দেয়াল, এবং তৈরি করতে চান একটি নতুন ক্ষেত্র, যার নাম *পাঠগত তত্ত্ব*।

নারীদের নারীরা : নারীদের উপন্যাসে নারীভাবমূর্তি

উপন্যাসের উদ্ভব ঘটেছিলো নানা উদ্দেশ্যে; তার একটি নারীদের নীতিশিক্ষা দেয়া, অর্থাৎ শুরু থেকেই উপন্যাসের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু নারীরা। পশ্চিমের পুঁজিবাদী পুরুষেরা চেয়েছিলো নারী উপন্যাস উপভোগ ও উপন্যাসের ফল ভোগ করবে, সতী হবে, এবং রমণীর গুণে সুখে ভ'রে উঠবে সংসার। তখন তারা ভাবে নি ওই নারীও উপন্যাস লিখবে একদিন, শোনাবে নিজের মর্মান্তিক পুরুষপীড়িত জীবনকাহিনী। পুরুষ নারীর সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাস করে নি কখনো, আজো সন্দেহের চোখে দেখে নারীর সমস্ত সৃষ্টিকে; সাধারণত তাকে স্বীকৃতি দেয় না, বা দেয় নিজেরই স্বার্থে। বাঙলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস লেখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এক বিদেশিনী, হেনা ক্যাথেরিন মুলেন্স্, যিনি *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২) নামের একটি উপন্যাস-খসড়ায় নারীদের দিতে চেয়েছিলেন খ্রিস্টীয় করুণার শিক্ষা, পুরুষের ছক অনুসারে ঢালাই করতে চেয়েছিলেন নারীদের। বাঙালি নারীরা যখন প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করে, তখন পুরুষ এ-কাজকে অনাচার ব'লেই গণ্য করে; আজো বাঙালি পুরুষ তাদের সম্পূর্ণরূপে স্বীকার ক'রে নেয় নি। তবে বাঙালি নারী উপন্যাসে হাত দিতে দেরি করে নি; পুরুষের প্রথম উদ্যোগের দু-দশকের মধ্যেই বেরোয় নারীর প্রথম উপন্যাস : স্বর্ণকুমারী দেবীর *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬)। তাঁর অন্য কয়েকটি উপন্যাস *ছিন্ন মুকুল* (১৮৭৬), *বিদ্রোহ* (১৮৯০), *স্নেহলতা* (১৮৯২), *ফুলের মালা* (১৮৯৪), *হুগলীর ইমামবাড়ী* (১৮৯৪), *কাহাকে* (১৮৯৮)। অল্প পরেই দেখা দেন জনপ্রিয় অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী, তাঁরা দুজনে লেখেন প্রচুর উপন্যাস। নিরুপমার উপন্যাস *অন্নপূর্ণার মন্দির, দিদি* (১৯১৫), *বিধিলিপি* (১৯১৭), *শ্যামলী* (১৯১৮); অনুরূপার উপন্যাস *মন্ত্রশক্তি* (১৯১৫), *মহানিশা* (১৯১৯), *মা* (১৯২০), *গরিবের মেয়ে, পথহারা, ত্রিবেণী* (১৯২৮), *জ্যোতিঃহারা, চক্র*; এবং দেখা দেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, ও আরো অনেকে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বলেছিলেন যে উপন্যাস নারীর একান্ত শিল্পাঙ্গিক, বাঙালি নারীরা তাঁর কথাকে অনেকখানি সত্যে পরিণত করেছে।

বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস জনপ্রিয় হয়েছিলো, কিন্তু তা পুরুষের কাছে গুরুত্ব পায় নি; বরং উপহাসের সামগ্রী হয়েছে। তাঁরা প্রচুর উপন্যাস লিখেছেন, বিক্রিও হয়েছে প্রচুর; তবে তা হয়ে আছে এক উপসংস্কৃতিধারা, যেনো তা নারীদের জন্যে নারীদের লেখা, পুরুষের মূলধারার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র নারীদের উপন্যাসকে দেখেছেন আত্মম্ভরী পুংসুলভ করুণা ও উপহাসের চোখে। তিনি বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকদের গোণার মধ্যেই ধরেন নি, তখনো তাঁরা দেখা দেন নি ব'লেই শুধু নয়,

দেখা দিলেও পুছতেন না তিনি তাঁদের; তিনি পশ্চিমের প্রধান নারী ঔপন্যাসিকদেরও করুণা করেছেন। *কমলাকান্তের দপ্তর*-এ (১৮৭৫) 'মনুষ্য ফল' রচনায় কমলাকান্তের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

> তার পরে মালা– এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা– কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অষ্টেন্ বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন–মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালাব মাপে।

কমলাকান্তের মতকে বঙ্কিমের মত ব'লেই ধরতে পারি, এতে প্রকাশ পেয়েছে উগ্র পুংতান্ত্রিক মনোভাব। যে-জর্জ এলিয়টকে 'মালার মাপের' ঔপন্যাসিক ব'লে বাতিল ক'রে দিয়েছেন বঙ্কিম, বাঙলার প্রথম নারী ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারীর দেবীর *কাহাকে* (১৮৯৮) উপন্যাসের চরিত্ররা তাঁকে নিয়ে তর্ক করেছে, তুলনা করেছে শেক্সপিয়রের সাথে। স্বর্ণকুমারী ডাক্তার বিনয়কুমারের মুখে দিয়েছেন তাঁর নিজেরই কথা, যা পুরুষতান্ত্রিকদের কাছে গণ্য হবে ক্ষমার অযোগ্য অবিনয় ব'লে। এটা বুঝিয়ে দেয় নারীরা সব সময়ই সন্দেহ বোধ করেছে পুরুষের মূল্যায়ন সম্বন্ধে; তারা নিজেরাও মূল্যায়ন করেছে সব কিছু, যদিও তা প্রকাশ করার সুযোগ ও সাহস পায় নি। সুযোগ পেলেই তারা ভিন্ন মত প্রকাশ করতে দ্বিধা করে নি। স্বর্ণকুমারীর চোখে জর্জ এলিয়ট এক শেক্সপিয়র, তাঁর চোখে বঙ্কিম কী, তা জানা যায় নি; কিন্তু তিনি যদি জর্জ এলিয়ট ও বঙ্কিমের তুলনা করতেন, তাহলে বঙ্কিমকে হয়তো গণ্য করতেন জর্জ এলিয়টের তুলনায় খুবই তুচ্ছ ঔপন্যাসিকরূপে। পুরুষ মেনে নিতে পারে নি নারীর সাহিত্যসাধনাকে, কেননা এটা পুরুষের এলাকা; তাই নারীকে পুরুষ বার বার ফেরত পাঠাতে চেয়েছে ঘরের ভেতরে, সরাসরি রান্নাঘরে। যেমন জগদীশ্বরী দেবীর *দ্রৌপদী* কাব্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন (১৩১২, ৪০০) বলেছেন :

> গ্রন্থকর্ত্রী যদি কাব্যশালা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রন্ধনশালার ভার গ্রহণ করেন, তবে অনেক উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে– সে স্বাভাবিক পন্থা ছাড়িয়া তিনি ভিন্ন উপায়ে লোকরঞ্জনের প্রয়াসী হইয়া মোটেই ভাল করেন নাই।

দীনেশচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় ব'সে ভুলতে পারেন নি যে কবিটি নারী, তাঁর কাজ রান্না করা। পশ্চিমের পুরুষতান্ত্রিক সমালোচকেরা নারীসাহিত্য সমালোচনার নামে সাধারণত মাপেন বইয়ের বক্ষ ও নিতম্ব, সম্ভোগ করেন নারীদের বই; বাঙালি সমালোচকেরা তা পারেন না সমাজিক কারণে, তাই তাঁরা খাদ্যের মতো আস্বাদন করেন নারীসাহিত্য। স্বামী হিশেবে যেমন তাঁরা পরখ করেন স্ত্রীর রান্না, সমালোচক হিশেবে তেমনি স্বাদ নেন সাহিত্যরান্নার। বাঙালি পুরুষের কাছে নারীসাহিত্য এক ধরনের পাকপ্রণালি, যা আসল পাকপ্রণালির থেকে নিকৃষ্ট। রান্নাবান্নার থেকে উৎকৃষ্ট, নারীর জন্যে শ্রেষ্ঠ, কাজ হচ্ছে স্বামীসেবা; তাই নারীসাহিত্য তখন প্রশংসা পেয়েছে, যখন তা স্বামী ও সংসারসেবার গান গেয়েছে। *ভারতী*তে (১৩১৬, ৪৬৮) অজ্ঞাতনাম এক সমালোচক শরৎকুমারীর *শুভবিবাহ* উপন্যাসটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'সাহিত্য-সেবারতা, নিষ্ঠাবতী শরৎকুমারীর পতিভক্তি ও সংসারপালনদক্ষতা প্রভৃতি

প্রকৃতই অনুকরণীয়।' তাঁর সাহিত্যের মূল্য নেই, মূল্যবান তাঁর পতিভক্তি ও সংসারপালনদক্ষতা। নারী কিছু লিখেছে, এটাই আপত্তিকর; তার ওপর যদি তাতে থাকে পাণ্ডিত্য, তবে তা হয়ে ওঠে দ্বিগুণ আপত্তিকর। পুরুষের প্রিয় হচ্ছে মূর্খ নির্বোধ নারী, পুরুষের কাছে প্রিয় নারীর শান্ত সরলতা; নারী যখন শান্ত সরলতার সীমা পেরিয়ে যায়, তখন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে পুরুষের পক্ষে। শরৎচন্দ্র, যিনি নারীর পক্ষে লিখেছিলেন *নারীর মূল্য* (১৩২০), তিনিও নারীর পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ সহ্য করতে পারেন নি। অনিলা দেবী ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র লেখেন 'নারীর লেখা' (১৩১৯) নামে একটি নারীসাহিত্যবিদ্বেষী প্রবন্ধ। নারীনামের ছদ্মবেশে লুকিয়ে নারীকে আক্রমণ করা পুরুষের এক প্রিয় হীন স্বভাব। এতে তিনি উপহাস করেন নারী লেখকদের– আমোদিনী ঘোষজায়া, অনরূপ দেবী ও নিরুপমা দেবীকে; পরিহাস করেন তাঁদের পাণ্ডিত্যকে, উপহাস করেন তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাবকে। ধরেন তাঁদের নানা রকমের ভুল, এবং উড়িয়ে দেন নারীসাহিত্যকে, যেনো সাহিত্যচর্চা নারীদের জন্যে অনধিকারচর্চা। কুমুদিনীমোহন নিয়োগী (১৩২৯, ৬৮৫) এক লেখিকাকে প্রশংসা ক'রে লিখেছেন : 'তাঁর রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব– সরলতা আর শান্ত সংযত ভাব। অনেক নারীর রচনায় দেখি, পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ এম্‌নি তীব্র হল্কা ফুটাইয়া রহিয়াছে যে গা একেবারে জ্বলিয়া যায়। এই ঝাঁজ ইন্দিরা দেবীর রচনায় মোটেই নাই।' ঝাঁজ সৃষ্টির অধিকার শুধু পুরুষের; নারী ঝাঁজ সৃষ্টি করবে না, এমন কিছু করবে না যা পুরুষের অহমিকাকে পীড়িত করতে পারে। নারী যদি সাহিত্য সৃষ্টি করতেই চায়, তাহলে সে এমনভাবে করবে, যা উপাদেয় হবে পুরুষের রসনায়।

প্রভুর দর্শনে দীক্ষিত হয় অসংখ্য দাসদাসী, অসংখ্য নারীও দীক্ষিত হয় পুরুষের মন্ত্রে; আজো অনেক নারী গলগল ক'রে উচ্চারণ করে প্রভুপুরুষের মন্ত্র। যেমন, নগেন্দ্রবালা সরস্বতী *নারীধর্ম* কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, 'সংসারে রমণীগণ প্রেমপ্রীতির আকরস্বরূপ। তাহাদেরই স্নেহ-মমতা-পবিত্রতায় সংসার শান্তিময়, এই জন্যই হিন্দু সংসারে রমণীগণ দেবীবৎপূজনীয়া। কিরূপে রমণীগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন পূর্ব্বক নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া– সংসারে অমৃত স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন, কিরূপে নারীচরিত্রে প্রকৃত দেবীচরিত্র প্রতিভাত হইতে পারে, এই নারীধর্ম্মে তাহারই আলোচনা করিয়াছি।' এতে খুব প্রীত হওয়ার কথা পুরুষের, যেমন হয়েছেন চন্দ্রশেখব মুখোপাধ্যায় (১৩১০, ১৯৯)। তিনি *নারীধর্ম*-এর প্রশংসা করেছেন এভাবে :

> মোটের উপব এগ্রন্থ পাঠে আমরা বড় প্রীত হইয়াছি–প্রীত হইবার আব একটি বিশেষ কারণ এই যে, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা এতদিন কবিতার আলোচনা কবিয়া যশঃসঞ্চয়ে ব্রতিনী ছিলেন– এখন তিনি সংসারধর্ম্মের সংস্কাবে মন দিয়াছেন; নিরবচ্ছিন্ন কবিতা রচনাই যে রমণীজীবনের চরম লক্ষ্য নহে, এবং তাহাতে যে রমণীর তৃপ্তি হয় না, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন।

কবিতা লিখতে গিয়ে নগেন্দ্রবালা যে ভুল ও অপরাধ করেছিলেন, তা বুঝতে পেরে তিনি যে আবার মন দিয়েছেন 'রমণীজীবনের চরম লক্ষ্য' সংসারধর্মে, এতে সমগ্র পুরুষসমাজেরই প্রীত বোধ করার কথা। নারীর সাহিত্যচর্চা পুরুষের চোখে বিকার,

নারীর বিখ্যাত হওয়ার বাসনা অমার্জনীয় অপরাধ; তবু নারী সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। এ-অপরাধের শাস্তি নারীর প্রাপ্য; পুরুষ তাকে শাস্তি দিয়েছে তার সাহিত্যকে অস্বীকার ক'রে।

পুরুষসমাজের এ-স্বভাব, এবং তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত সংসারধর্মী অজস্র নারীর নারীপ্রতিভাবিরোধিতা বুঝতে পেরেছিলেন *ভারতীর* 'বঙ্গনারী' (১৩৩৯, ৬৩৭)। তিনি 'স্ত্রীলেখিকা' নামের এক রচনায় লিখেছিলেন :

> মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের দেশে লিখিতে সমর্থ,– সুতরাং "শিক্ষিতা"দের মধ্যেও Mrs. Grundyর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া দমিয়া যাইতে হয়। ইহা অবশ্য আশ্চর্য্যের কথা নহে,– সকল দেশেই ইহাঁদের দর্শন পাওয়া যায়; এবং সর্ব্বত্রই ইহাঁরা করতালি পাইয়া থাকেন। তবে মেয়েদের উঠিতে হইলে ঘরে বাহিরে কি পরিমাণ বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, ইহাঁরা কেবল তাহাই মনে করাইয়া দেন। মেয়েদের বিষয় যে রকম অসঙ্কোচে হীনভাবে ইহাঁরা বলিতে পারেন, পুরুষের পক্ষে অবশ্য তাহা সম্ভব নয়। আর সর্ব্বত্রই ইহাঁদের বদ্ধ ও স্থূল দৃষ্টি এবং মনের পরিধির সঙ্কীর্ণতা পীড়া দেয়। 'দাস মনোভাব' যে ইহাঁদের কতটা মজ্জাগত তাহা বলাই বাহুল্য।... বাস্তবিকই, বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী নারী-জাগরণের দিনে তাহার কোন তরঙ্গই ইহাদের স্পর্শও করে নাই, বাঙ্গালী ঘরের বদ্ধ একাও দূষিত, হীন, খুঁটিনাটি ছাড়াইয়া কল্পনাও একতিল উপরে উঠিতে পারে নাই।... ইহাঁদের মধ্যে কাহারও কাহারও মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অপূর্ব্ব কিছু করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ইহাঁরা তাহাতেই একটী মৌলিক পথ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহাঁরা ধারণা করিতে পারেন না,– ইহাও তাঁহাদের "নারীত্ব" হইতে প্রাপ্ত অদ্ভুত কোন পদার্থ নয়,–অপর পক্ষেরই শিখানো বুলি। তাঁহারাই ত মেয়েদের "পুরুষের মত" করিয়া কিছু করিতে জোরের সহিত বারণ করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিকই ইহাঁদেরও মেয়েদের সকল শিক্ষাদীক্ষা গোড়া হইতে মেয়েলি করিয়া ফেলিবার আগ্রহ দেখিয়া দুঃখও হয়। ইহাঁরা অপর পক্ষের চাবটী বেশ গিলিয়াছেন বোঝা যায়। মেয়েরা ইহাঁদের মতে চলিয়া "বুদ্ধিমতী" না হইয়া "প্রাণময়ী" বনিতে থাকিলে তাঁহাদের আর সুনিদ্রা ব্যাঘাত হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

নারীর শত্রু শুধু পুরুষ নয়, তাদের শত্রু হিশেবে রয়েছে পুরুষমন্ত্রে দীক্ষিত একপাল নারীও। এরা পুরুষের চর হিশেবে কাজ করে, নারীর সাংঘাতিক ক্ষতি করে।

বাঙালি পুরুষ, সব জাতির পুরুষের মতোই, নারীসাহিত্যকে অনুমোদন করে নি, নারীসাহিত্যকে দেখেছে রান্নাবান্না বা সংসারসেবারূপে; নারী লেখকদের মধ্যে তারা খুঁজেছে আদর্শ স্ত্রীকে। নারী লেখক, বা তার লেখা মূল্যবান নয় পুরুষের কাছে; তাই বাঙালি নারীসাহিত্যের কোনো ইতিহাস আজো লেখা হয় নি, তাঁদের প্রতিভার প্রকৃতি বিচার ও মূল্যায়ন হয় নি; এমনকি তাঁদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যও বেশ দুষ্প্রাপ্য। স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী ও আরো অনেকের সব বইয়ের নামও খুঁজে পাওয়া যায় না আজ, পাওয়া যায় না তাঁদের বইয়ের প্রকাশের তারিখ। তাঁরা শিকার হয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক উপেক্ষার। পুরুষ সমালোচকেরা ধ'রেই নেন তাঁদের সাহিত্য অপাঠ্য; বিশেষ ক'রে যাঁদের বই জনপ্রিয় হয়েছিলো তাঁরা সম্পূর্ণ অপাঠ্য, এমন একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে। তাঁদের বইয়ে সমালোচকেরা, যেমন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬৯, ২৮১), খোঁজেন 'নারীর

সুর-বৈশিষ্ট্যের' পরিচয়। এ-'সুর বৈশিষ্ট্য' কিন্তু নারীর নিজস্ব সুর নয়, তাঁরা খোঁজেন নারীর কণ্ঠ থেকে কতোখানি উঠেছে পুরুষের শেখানো সুর। তাঁরা খোঁজেন পুরুষের বিধিবদ্ধ নারীত্ব, যা এক বানানো জিনিশ। পুরুষ তৈরি করেছে নারীর একরাশ ছক : নারী দেবী বা দানবী, নারী অক্রিয়, নারী মাতা, স্ত্রী, কন্যা, সেবিকা, নারীর জীবন ধন্য হয় আত্মোৎসর্গে। পুরুষের চোখে নারী চূড়ান্ত মর্ষকামী, যে ধন্য বোধ ও স্বর্গলাভ করে চরম পীড়নের মধ্যে। নারী এ-ছক মানে নি, কিন্তু বাধ্য হয়েছে মেনে নিতে। বাঙলার নারীরা যখন উপন্যাস লেখায় হাত দেন, তখন কি তাঁরা এ-ছক মেনে চলেন? তাঁরা কি পুরুষতন্ত্রের দীক্ষাকেই পুনঃপ্রচারের জন্যে ধরেন লেখনি? সব নারী ঔপন্যাসিকের সব উপন্যাস আমি প'ড়ে উঠতে পারি নি,-তাঁদের বই আজ দুষ্প্রাপ্য; বহু কষ্টে আমি সংগ্রহ করেছি ছটি উপন্যাস : স্বর্ণকুমারী দেবীর *কাহাকে* (১৮৯৮), শৈলবালা ঘোষজায়ার *জন্ম-অপরাধী* (?), অনুরূপা দেবীর *মন্ত্রশক্তি* (১৯১৫), নিরুপমা দেবীর *দিদি* (১৯১৫), ও *শ্যামলী* (১৯১৮), শান্তা দেবীর *জীবনদোলা* (?)। এঁরাই আমাদের আদি নারী ঔপন্যাসিক। এঁরা কেউ জর্জ এলিয়ট, বা বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর নন; বাঙলা উপন্যাসধারার কোনো শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাঁরা কেউ লেখেন নি। তাঁরা বেশ গৌণ ঔপন্যাসিক; তবে তাঁদের গৌণতার মূলে কোনো সহজাত কারণ নেই, রয়েছে সামাজিক কারণ। যে-নারীর সৃষ্টিশীলতাকেই স্বীকার করে নি পুরুষ, তাঁরা কলম ধ'রেই মহান সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, এটা আশা করা অন্যায়। তবে ইংরেজি উপন্যাসে যেমন নারী ঔপন্যাসিকেরা তেমনি তাঁরাও পুরুষ-ঐতিহ্যের পাশাপাশি সৃষ্টি করেন একটি গতিশীল অন্তঃস্রোত, সুস্পষ্টভাবে পৃথক এক নারীসাহিত্যধারা। তাঁদের সাহিত্য বহুলাংশে আমূলবাদী, এবং নারীকেন্দ্রিক; এমনকি যাঁরা রক্ষণশীল, তাঁরাও নারীর দুর্দশার কথা ভুলে যান নি। আদি বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকেরা সাধ্বী স্ত্রীরূপে কলম ধরেন নি, তাঁরা কলম ধরেন পুরুষতন্ত্রের বহু ছক ভেঙে ফেলার জন্যে। তাঁরা বিশ্বাস করেন নি পুরুষের তৈরি নারীভাবমূর্তিতে, শুরু থেকেই বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকেরা ভাবমূর্তির থেকে বেশি গুরুত্ব দেন নারীর বাস্তবতার ওপর, এবং লিপ্ত থাকেন পুরুষের সঙ্গে নিরন্তর বিরোধে। এ-বিরোধ স্বর্ণকুমারী, শৈলবালা, শান্তার মধ্যে তীব্র; অনুরূপা ও নিরুপমা যদিও অনেকখানি দীক্ষিত ছিলেন পুরুষের বিধানে, কিন্তু নারীপুরুষের যখন বিরোধ বেধেছে তখন তাঁরাও পক্ষ নিয়েছেন নারীর। পুরুষ, স্বামী, বিধাতা প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণের সময় নারী ঔপন্যাসিকেরা ভক্তির থেকে অভক্তিই দেখিয়েছেন বেশি, আর জ্ঞাপন করেছেন এমন বাণী যে নারীর দুর্দশার মূলে রয়েছে পুরুষ। নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস প্রধানত পুরুষদ্রোহিতার উপন্যাস, যাতে এমন একটি ইঙ্গিত মেলে যে পৃথিবীতে পুরুষ না থাকলে নারীর জীবন সুখের হতো। নারী ঔপন্যাসিকদের নারীদের জীবনে ভয়াবহ শব্দ 'বিবাহ', যা নারীদের প্রধান সংকট, যা সম্পন্ন না হ'লে তাদের জীবন ধ্বংস হয়, আর সম্পন্ন হ'লেও ধ্বংস হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম বাঙালি নারী ঔপন্যাসিক, এবং তিনিই আমার নেয়া পাঁচজনের মধ্যে আধুনিকতম চেতনাসম্পন্ন, শিল্পিতায়ও শ্রেষ্ঠ। তাঁর যে-উপন্যাসটি আমি

নিয়েছি, সেটির নাম *কাহাকে* (১৮৯৮), যাতে কাজ করেছে প্রবল নারীবাদী মনোভাব। দ্য বোভোয়ার নারীর জীবনে প্রেমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছেন বায়রনের যে-দুটি পংক্তি, Man's love is of man's life a thing apart/'Tis woman's whole existence, স্বর্ণকুমারী তাঁর উপন্যাস শুরু করেছেন সে-পংক্তি দুটি উদ্ধৃত ক'রে, এবং তাঁর নায়িকা মণি বলেছে :

> এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি একজন পুরুষ। পুরুষ হইয়া রমণীব অন্তর্গত প্রকৃতি এমন হুবহু ঠিকটি কি করিয়া ধরিলেন, ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়। আমি ত আমার জীবনের দিকে চাহিয়া এ কথার সত্যতা অনুভব করি। যতদূর অতীতে চলিয়া যাই, যখন হইতে জ্ঞানের বিকাশ মনে করিতে পারি তখন হইতে দেখিতে পাই-কেবল ভালবাসিয়াই আসিতেছি, ভালবাসা ও জীবন আমাব পক্ষে একই কথা; সে পদার্থটাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে-আমার আমিত্বই লোপ পাইয়া যায়।

প্রেম সম্পর্কে মণির ব্যাখ্যা অবশ্য দ্য বোভোয়ারের ব্যাখ্যার মতো নয়, তবে সে ক্রমশ এগিয়েছে সে-দিকেই। মণি বা মৃণালিনী *কাহাকে*র নায়িকা, সে নিজের প্রেম ও বিয়ের উপাখ্যান বলেছে নিজেই। নিজের জীবন, প্রেম, ও বিয়ের কাহিনী সে যেভাবে অকপটে বলেছে, তাতেই নষ্ট হয়ে গেছে লজ্জাবতী নারীর ছকটি। মণি অক্রিয় নয়, নিজের গল্প অকপটে বলার মধ্যেই তার সক্রিয়তার পরিচয় মেলে, এবং সে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণও করে পরিস্থিতি। সারা উপন্যাসেই টের পাওয়া যায় যে তার শুধু হৃদয় নয়, একটি মস্তিষ্ক রয়েছে, এবং মস্তিষ্কটিই বেশি সক্রিয়। তার জীবনকাহিনী জটিল নয়, এবং সে বাঙলার অধিকাংশ নারীর দুটি অভিশাপ থেকে মুক্ত;-সে দরিদ্রকন্যা নয়, ও অশিক্ষিত নয়; তবু বিয়েই সৃষ্টি করে তার জীবনের সমস্যা। মণি ছোটো বা বিনয়কুমারের সাথে তার বাল্যপ্রেম, যৌবনে ব্যারিস্টার রমানাথের সাথে ব্যর্থ প্রণয়, অবশেষে বাল্যপ্রেমিক ডাক্তার বিনয়কুমারের সাথে রোমাঞ্চকর রোম্যান্টিক মিলনের কাহিনী অকপটে বলেছে। মণির কথা বলার ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় নারীমুক্তি আন্দোলনের বাণীর সাথে সে পরিচিত, আমূল নারীবাদী না হ'লেও সে নারীবাদী। সে পুরুষবিদ্বেষী নয়, কিন্তু পুরুষের সাথে তার লিঙ্গের যে বিরোধ রয়েছে, সেটা কখনো স্পষ্ট কখনো প্রচ্ছন্নভাবে সে জানাতে দ্বিধা করে নি। শুরুতেই নিজের বয়সের কথা বলতে গিয়ে সে বলে, 'তখন আমার বয়স কত? সাল তারিখ ধরিয়া এখনি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না।...পুরুষে সম্ভবতঃ আমার সারল্যে অবিশ্বাস করিয়া ইহার মধ্য হইতে গূঢ় অভিপ্রায় টানিয়া বাহির করিবেন, কিন্তু স্ত্রীলোক বুঝিবেন, বাস্তবিক পক্ষে সাল তারিখ মনে করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে কিরূপ কঠিন ব্যাপার।' সে ধ'রেই নিয়েছে নারীরা তার কথায় বিশ্বাস করবে, কিন্তু 'পুরুষে সম্ভবতঃ' অবিশ্বাস করবে; অর্থাৎ পুরুষ ও নারী বিশ্বাস করে না পরস্পরকে, তারা জড়িত অবিশ্বাসের সম্পর্কে। শুধু পুরুষকে নয়, পুরুষের মধ্যে যে প্রধান, তাকেও মণি দেখে একই দৃষ্টিতে; সে বলে, 'বিধাতা পুরুষ তাহা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন।' যা সম্ভব হ'তে পারতো, হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো, তা যে অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে একটি পুরুষ-বিধাতাপুরুষ, যে নারীর প্রতিপক্ষ। সে যেভাবে নিজের বয়স জানিয়েছে, তাতে ও

সে ভেঙে ফেলেছে প্রথাগত নারীভাবমূর্তি, প্রকাশ করেছে পুরুষের সাথে বিরোধ; সে বলেছে, 'ধরিয়া লওয়া যাক, আমার বয়স তখন আঠার উনিশ, আমি এখনো অবিবাহিত। শুনিয়া কি কেহ আশ্চর্য্য হইতেছেন?' বোঝা যায় তার লক্ষ্য পুরুষ, তার আইবুড়ীত্বে বিস্মিত হবে পুরুষই, কেননা সেটি এক ভিন্ন প্রজাতি।

মণি তার প্রেমের কথা বলেছে অকপটে, প্রেমে প্রথাগত অক্রিয়তার বদলে পালন করেছে সক্রিয় ভূমিকা, অমান্য করেছে পিতৃতান্ত্রিক বিধান যে নারীর প্রেম শুধু স্বামীরই জন্যে। মণি বলেছে, 'আমি ভালবাসি, বিবাহের পূর্ব্বেই ভালবাসি, তিনি যে স্বামী হইবেন, এমনতর আশা করিয়াও ভালবাসি নাই। কেবল তাহাই নহে, এই ভালবাসাই আমার একমাত্র প্রথম ও শেষ ভালবাসা নহে।' উনিশশতকের শেষ দশকের পক্ষে খুবই ভয়ঙ্কর কথা বলেছে সে অবলীলায় যে সে ভালোবেসেছে বিয়ের আগেই, পুরুষটিকে ভবিষ্যৎ স্বামী ভেবেও ভালোবাসে নি, এবং চরম ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে সে প্রেমে পড়েছে একাধিকবার। নিষ্ঠাবতী সতী নারীর ভাবিমূর্তি সে ভেঙেচুরে দিয়েছে। প্রেমে সে বিশ্বাস করে সাম্যে, শুধু নারীই পুজো করবে প্রেমিককে, আর প্রেমিক পুজো করবে না প্রেমিকাকে, এটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; সে বলে : 'সে রমণীই ধন্য–যে তাহার মনোদেবতার সন্ধান পাইয়া এই পরিপূর্ণ উথলিত আবেগময় প্রাণের পূজায় জীবন সার্থক করিতে পারে; আর সেই পুরুষই ধন্য, যে এই পূজারতা হৃদয়ের দেবতারূপে বরিত হইয়া তাহার পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে, আর সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম, যাহা এই উভয়ের আত্মহারা পূজায় অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবলভাবে চিরাবিরাজমান।' পুরুষ অবশ্য এমন প্রেমে বিশ্বাস করে না, পুরুষ চায় বহু হৃদয় ও দেহের দেবতা হ'তে। প্রেম সম্পর্কে প্রথাগত ধারণা সে বাতিল ক'রে দিয়েছে স্পষ্টভাবে, শৈশবের প্রেমও যে ইন্দ্রিয় কামনাতুর হ'তে পারে, তাও সে জানিয়েছে; বলেছে, 'শৈশব ও যৌবনপ্রেমে তফাৎ অল্পই', বলেছে, 'ভাবিতাম, ছোটু ত আমাকে চুম্বন করে না; তবে বাবার মত আমাকে ভালবাসে না, আমি কেন তবে ভালবাসিব?' শৈশবের নিষ্পাপতার মধ্যে সে মিশিয়ে দিয়েছে একটু পাপ, এবং যৌবনের প্রেমকে স্থান দিয়েছে পিতৃপ্রেমের ওপরে : 'আমি পিতাকে ভালবাসি, তাঁহার সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত নহি–কিন্তু তিনি এখন আর আমার জীবনের একমাত্র সুখদুঃখ আশ্রয় অবলম্বন, আকাঙক্ষা কামনা পূজা আরাধনা, দেবতাসর্ব্বস্ব নহেন।' পিতাকে সরিয়ে দিয়ে সে প্রথাগত কন্যার ভাবমূর্তি বিপন্ন করেছে সম্পূর্ণরূপে। পিতৃতন্ত্রের ভালো লাগতো যদি সে বলতো পিতাই তার দেবতাসর্বস্ব, কিন্তু মণি সেখানে বসিয়েছে তার প্রেমকে, প্রেমিককে। প্রেম তার কাছে যেরূপে দেখা দিয়েছে, তাও সে জানিয়েছে : 'তাহার পর আট দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাহার পর আমি ভালও বাসিয়াছি, শৈশবের স্নিগ্ধ কোমল ভালবাসা নহে, যাহাকে লোকে বলে প্রেম– যৌবনের সেই জ্বলন্ত অনুরাগ–তাহারও অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।' মণি অভিনব নারী, যে ছক ভেঙেছে, স্বায়ত্তশাসিত মানুষ হয়ে উঠেছে।

প্রেমে পড়ার প্রথাগত রোম্যান্টিক সূত্রটিকেও সে অস্বীকার করেছে; বলেছে, 'প্রথম

দর্শনেই কি আমি প্রাণসমর্পণ করিয়াছিলাম? মোটেই নহে।' সে প্রেমে পড়েছে ধীরে ধীরে, তার বাল্যস্মৃতি তাকে যৌবনে ঠেলে দিয়েছে প্রেমের দিকে। বাল্যকালে পাঠশালায় তার প্রথম প্রেমিক ছোটু যে-গানটি তাকে শুনিয়েছিলো, সেটি অনেক বছর পর সে শুনতে পায় রমানাথের কণ্ঠে; তার ফল হচ্ছে : 'কিন্তু গানটি গাহিলেই সমস্ত বিপর্য্যয় হইয়া পড়িত।... গানটির যে কি মোহ ছিল জানি না, শুনিতে শুনিতে বাল্যের স্মৃতিধারা পূর্ণ প্রবাহে উথলিয়া কুমারীহৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেমাকাঙক্ষাকে স্ফীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল।... তিনি চলিয়া যাইবার পরেও সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কেমন মেঘাচ্ছন্ন থাকিতাম—স্বপ্নে জাগরণে ঐ একইরূপ ভাব আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিত; পরদিন নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সে ভাব অল্পে অল্পে দূর হইয়া যাইত।' তবে প্রেম নারীজীবনের বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা বিয়ে; মণির জীবনেও বিয়েই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। সে দেখতে পায় যাকে সে হৃদয় দিয়েছে, সমাজের চোখে সে তার স্বামী হওয়ার যোগ্য হ'লেও তার হৃদয়ের যোগ্য নয়। ফলে যে-সংকট দেখা দেয় তার জীবনে, তাতে সে এমন এক আন্তর-বাহ্যিক লড়াইয়ে নামে যাতে সে বদলে দেয় প্রথাগত নারীর ভাবমূর্তি। বিয়ে হচ্ছে একটি স্বামীর জন্ম, মণিও চারদিকে পরিবৃত হয়ে পড়ে স্বামীর ভাবমূর্তি দিয়ে : 'চারিদিক হইতেই আমি শুনিতে লাগিলাম, বুঝিতে লাগিলাম, তিনি আমার স্বামী হইবেন, কোন বঙ্গবালার মনে এই বিশ্বাসের কিরূপ প্রবল প্রভাব, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক আছে কি?' স্বামী সম্পর্কে শিশুকাল থেকেই মেয়েদের মনে তৈরি করা হয় এক দেবভাবমূর্তি, মেয়েরা বড়ো হয় ওই মূর্তিটিকে পুজো ক'রে ক'রে, মণিও তার বাইরে নয়। স্বামীর যে-ছক তার সামনে ছিলো, সেটি সম্বন্ধে সে বলেছে : 'স্বামী যেমনই হৌন, তিনি রমণীর একমাত্র পূজ্য আরাধ্য দেবতা, প্রাণের প্রিয়তম, জীবনের সর্বস্ব-এই বাক্য, এই ভাব, এই সংস্কার আজন্মকাল হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে, সুতরাং বিশেষ কারণে স্পষ্ট বীতরাগ না থাকিলে এই বিশ্বাসই প্রেমাঙ্কুরিত করিবার যথেষ্ট কারণ।' মণি, অন্য মেয়েদের মতো, বড়ো হয়েছে স্বামী ভাবমূর্তির পদতলে, ওই পায়ের নিচে নিজের মাথাটি রেখেই বেড়েছে সে; এবং 'আত্মদানে অন্যকে সুখী করিব নারীপ্রকৃতির এই যে সর্ব্বগ্রাসী আকাঙক্ষা, ইচ্ছাপ্রবণতা, নারীপ্রেমের শিরায় মজ্জায় যে আকাঙক্ষা শোণিতাকারে প্রবাহিত বর্ত্তমান, তাহার সফলতাতেই, তাহার বিশ্বাসেই রমণী-হৃদয় পরিপূর্ণ, বিকসিত, জীবনজন্ম সার্থক, চরিতার্থ; আবার এ বিশ্বাসেই সে ভ্রান্ত, কলঙ্কিত, মহাপাপী। প্রেমময়ী রমণী ইহার জন্য কতদূর আত্মত্যাগ করিতেছে; আর কতদূর না করিতে পারে?' তবে স্বামী ভাবমূর্তির পায়ে আত্মদানের পাশাপাশি সব নারীই পোষে স্বামী ভাবমূর্তির সাথে একটা বিরোধ, এটা নারী ঔপন্যাসিকদের প্রায় সব উপন্যাসেই স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে দেখা যায়, এবং মণির মধ্যে তা স্পষ্ট দেখা দেয় প্রেমে পড়ার অল্প পরেই।

বাঙালি নারীকে পিতৃতন্ত্র দিয়েছে স্বামীভক্তির পাঠ, পুরুষে আস্থা; কিন্তু বাঙালি নারীপুরুষের সম্পর্ক একটু ঘাঁটলে ধরা পড়ে তাদের পারস্পরিক অনাস্থা। পুরুষ তার নারী-অনাস্থা উচ্চকণ্ঠে প্রচার ক'রে আসছে পিতৃতন্ত্রের শুরু থেকে, নানা সংহিতা

লিখেছে নারীঘৃণার; আর নারী তা বিষের মতো লালন ক'রে এসেছে নিজের বুকে। মণি যার ওপর আস্থা স্থাপন করতে যাচ্ছিলো, অচিরেই তার ওপর তার আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। যে-রমানাথের সঙ্গে সে প্রণয়ে জড়িত, যে তার স্বামী হ'তে যাচ্ছে, মণি জানতে পারে সে সৎ নয়; বিলেতে সে এক নারীকে কথা দিয়েছিলো। মণি বলেছে, 'স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমার বিবাহ হইতেছে, আমি আগ্রহদৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিলাম, কিন্তু মনে হইল, এ সে নহে।' শুরু হয় তার সংকট; সে নতুন প্রজাতির নারী, যে প্রথাগত ছক অনুসারে চলে না। তার প্রেম বিপর্যস্ত, তবে সে নিজে বিপর্যস্ত নয়। সে বলেছে, 'কিন্তু এ নৈরাশ্যে করুণ কষ্টের দারুণতা, অসহনীয়তা উপলব্ধি কবিলাম না; কিংবা সে যেমনই হৌক, তবু আমার দেবতা-তবু তাঁহার চরণে হৃদয় বিকাইব, মনে এমনতর ভাবেরও উদয় হইল না। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রতারিত বোধ করিয়া এ যেন প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষুক দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় গর্ব্বাহত নিরাশাক্ষুব্ধ হইলাম, প্রতারকের উপর ভীষণ ক্রোধের উদয় হইল। কেবল তাহার উপর নহে, নিজের উপরেও ক্রুদ্ধ হইলাম-কি করিয়া আমি এমন লোককে দেবতা মনে করিয়াছিলাম!' প্রথাগত কতকগুলো বিশ্বাস ও বোধ সে ত্যাগ করেছে : প্রণয়সম্পর্ক নষ্ট হওয়ায় সে 'করুণ কষ্টের দারুণতা, অসহনীয়তা উপলব্ধি' করে নি, যা তার কাছে প্রত্যাশিত ছিলো, এবং 'সে যেমনই হৌক, তবু আমার দেবতা–তবু তাঁহার চরণে হৃদয় বিকাইব, মনে এমনতর ভাবেরও উদয় হইল না।' সে পুরুষের ছক অনুসারে তৈরি নয়, প্রতারককে দেবতা গণ্য করার বদলে তার ওপর সে হয় ক্রুদ্ধ। তার বোন তার মতো নয়, সে পুরুষের ছক অনুসারী; তার দিদি তার কাছে তুলে ধরে পুরুষতান্ত্রিক বাস্তব পরিস্থিতি : 'সে পুরুষ মানুষ, তার কি, তোর সঙ্গে না হ'লে এখনি অন্য আর একজন সেধে মেয়ে দেবে, আর তোর নামে এ থেকে এত কথা উঠবে যে, পরে বিয়ে হওয়াই ভার হবে।' পুরুষতন্ত্রে পুরুষ চিরনিষ্পাপ, সে দণ্ডিত হওয়ার বদলে পায় পুরস্কার; তার জন্যে নারীর অভাব হয় না, বরং নারীরাই অভাব বোধ করে তার। মণি ছকভাঙা; সে জানায়, 'নাই বা বিয়ে হ'ল, আমি ত সেজন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নই।' ছক থেকে স'রে এসেছে সে, বিয়েকে সে নিয়তি মনে করে না।

নারীর জন্যে পুরুষ মানদণ্ড স্থির ক'রে রেখেছে, তাকে হ'তে হবে সতীসাধ্বী; মণি স্বামীর জন্যে স্থির করে নতুন মানদণ্ড : 'যে আমার ক্ষমার পাত্র, সে আমার প্রণয়ী আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে; আমার স্বামীতে আমি সুর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই। সংসার যেমনই হৌক, পৃথিবীতে সে আমাকে স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব।' পুরুষ যেমন জন্মজন্মান্তর ধ'রে সতী চায়, মণিও চায় সৎ পুরুষ : 'আমার স্বামীর বর্ত্তমানটুকু লইয়াই আমি সন্তুষ্ট নহি, অতীতে, বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত জীবনে আমি আপনাকে বিরাজিত দেখিতে চাই, তাঁহার জীবনের কোন ভাগ যে আমাছাড়া ছিল বা তাহার সম্ভাবনা আছে, আমার সর্ব্বগ্রাসী প্রেমাকাঙ্ক্ষা এ চিন্তা সহ্য করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়, পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমন আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।' এতোদিন

ধ'রে নারীর কাছে পুরুষ যা চেয়ে এসেছে, মণি তা-ই দাবি করে পুরুষের কাছে; দ্বৈতমানদণ্ড লোপ ক'রে দিয়ে সে হয়ে উঠেছে পুরুষের সমান : 'আমি কি করিয়া বুঝাইব যে, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি, বিবাহ করিতে পারি– তিনি আমার স্বামী হইতে পারেন। কিন্তু আমার হৃদয়ের আদর্শ আকাঙক্ষা তিনি পূর্ণ করিতে পারিবেন না,... রমণীতে এরূপ পৌরুষিক হৃদয়ভাবের কি সহানুভূতি আছে?' মণি তার হৃদয়ভাবকে 'পৌরুষিক' ব'লে আখ্যা দিয়েছে, তবে সেও জানে ভাবে কোনো লৈঙ্গিক পার্থক্য নেই; সংস্কৃতিই ওই পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। সে অস্বীকার করেছে ওই লৈঙ্গিক পার্থক্যটুকু।

মণি নতুন মূল্যবোধসম্পন্ন অভিনব নারী, তার বিচারও অভিনব; তা গভীর সত্যকে বের ক'রে আনে। রমানাথ আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে জানায় সে ইংরেজ নারীটিকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় নি, ওই নারীই তার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছিলো; তাই সে কোনো অপরাধ করে নি। তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সাথে সায় দেয় প্রথাগত সবাই, কিন্তু মণি সায় দিতে পারে নি; সে বরং সহানুভূতি বোধ করেছে প্রতারিত ইংরেজ নারীটির প্রতি : 'তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে সেই ইংরাজ-ললনার উপরই বর্ত্তমান সমাজপ্রথার দোষ অধিক পৌঁছায়।... জানি না, এই বিবরণের জন্য সকলে সেই মুগ্ধা অভিযুক্তা রমণীকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমার কিন্তু এ কথায় তাঁহার উপর বরঞ্চ মমতা হইল এবং অভিযোগীর উপর যে বড় শ্রদ্ধা বাড়িল–তাহাও নহে।' সে জানে বর্তমান সমাজপ্রথা যাকে অপরাধ মনে করে, তা আসলে অপরাধ নয়; আর যাকে অপরাধ মনে করে না, তাই আসলে অপরাধ। নারীর এক ছক হচ্ছে নারী ক্ষমাশীল, তার কাজ পুরুষকে ক্ষমা ক'রে দেবতার পংক্তিতে বসানো। মনি এর বিরোধী : 'যেন ভালবাসিলে লোকে ন্যায়ান্যায় জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, অন্যায়কে-দোষকে পূজা করাই যেন ভালবাসা! আমি তাঁহাকে যেরূপ ভাল লোক মনে করিয়া ভালবাসিয়াছিলাম–তিনি যে তাহা নহেন, সে যেন আমারি দোষ!' মণি পুরুষের অত্যাচার ও নারীর অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত : 'যাহারা স্ত্রীলোকের আবদার সহ্য করিতে না পারিয়া খড়গহস্তে তাহার দমন করিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তের জন্য যদি কেবল তাঁহারা দিব্যহৃদয় লাভ করিয়া অনুভব করিতে পারেন,... তবে সংসারের রূপ এবং স্ত্রীলোকের ভাগ্য যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই!' সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে, তবে চায় এমন স্বামী, যা পিতৃতন্ত্র তখনো তৈরি করার কথা ভাবে নি; তার জন্ম হয়েছে শুধু মণির মতো নারীবাদীর ভাবনায় : 'যাঁহাকে একবার স্বামী মনে করিয়াছি– তিনিই আমার স্বামী হইবেন। তাঁহাকে বিবাহ করিব-কিন্তু প্রতারণা করিব না; আমার মনের ভাব খুলিয়া বলিব, যদি ইহাতেও তিনি আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন, আমি তাঁহারি। সমস্ত শুনিয়াও অবশ্যই তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন, তাঁহার প্রেম অটল অচল, আমি যাহাই হই, তিনি দেবতা, তাঁহার প্রেমে তিনি পতিত– আমাকে উদ্ধার করিবেন।' প্রথাগত নারীর যে-বাসনার কোনো অধিকার নেই, মণি তা-ই দাবি করেছে।

মণির একটি সুবিধা হচ্ছে বিয়ে না হ'লেও সে দুর্দশায় থাকতো না, বিয়ে না হ'লে তার জীবন বিপন্ন হতো না; তবে তার অবস্থায় থেকেও অধিকাংশ তরুণীই ব্যারিস্টার

রমানাথের গলায় মালা দিতে ব্যগ্র হতো, কেননা তারা পিতৃতন্ত্রের বাণীতে দীক্ষিত, এবং শারীরিক সুখের জন্যে তারা দ্বিধাহীনভাবে বিক্রি করতে পারে নিজেদের দেহ। রমানাথ যখন তাকে জানায় যে বিয়ে না হ'লে মণির অসুবিধা হবে, তখন সে প্রত্যাখ্যান করে রমানাথকে; বলে, 'সুবিধার জন্য আমি বিবাহ করতে চাই নে– আপনার সুখ যখন এর উপর নির্ভর কচ্ছে না– তখন আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করি।' পুরুষ তাকে দয়া ক'রে বিয়ে ক'রে উদ্ধার করবে, এমন উদ্ধার সে চায় না। মৃণালিনী যদিও জানে 'সুপাত্রে ন্যস্ত হওয়াই কন্যাজীবনের চরম সৌভাগ্য, পরম সার্থকতা', তবু সে বলতে রাজি হয় নি যে 'আপনি ভাল বাসুন না বাসুন, তাতে কিছু আসে যায় না, আমার মঙ্গলের জন্যই আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত।' রমানাথের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর যার সাথে সে প্রেমে, এবং শেষে বিয়েতে জড়িত হয়, সে-ডাক্তার বিনয়কুমার বিলেতের নারীদের প্রশংসা ক'রে বলেছে, 'আমার সবচেয়ে ভাল লাগত সে দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভর ভাব। দিন দিন সে দেশে স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র বাড়ছে– এমন কি, পলিটিক্সে পর্য্যন্ত তাহারা হস্তক্ষেপ করেছে।' এটা মণিরও ভালো লাগে, সেও চায় নারীকে ঘর থেকে বাইরে যেতে দেখতে। স্মরণ করতে পারি যে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে-বাঙালি নারী প্রথম অংশ নিয়েছিলেন, তিনি মণির স্রষ্টা বা মূলসত্তা স্বর্ণকুমারী দেবী। পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠে এক সময় যে মণি তার বাবাকে চিঠি লেখে : 'বাবা আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই;...আমি খুব ভাল করিয়া হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিতেছি, বিবাহে আমার সুখ নাই।' এটা শুধু কথার কথা নয়, আসলে বিয়েতে নারীর কোনো সুখ নেই, যদিও বিয়ে করা ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প সুখও নেই। তবে তার পিতা তাকে দিয়েছে বাস্তবসম্মত পরামর্শ : 'আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা, অবিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষেই বরঞ্চ এসব কাজে বাধা বিঘ্ন অধিক।... স্ত্রীলোকের ঐহিক, পারমার্থিক, সকল প্রকার মঙ্গলের জন্যই বিবাহ শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত পথ।' এবং সে মেনে নিয়েছে, 'আমি মর্ম্মে মর্ম্মে দুর্ব্বল বঙ্গনারী, আজ্ঞাবর্ত্তী দুহিতা। জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি– কিন্তু ইহার পরে বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব।' পরে সে রোমঞ্চকরভাবে বিয়ে করেছে ডাক্তার বিনয়কুমারকে, এবং উপন্যাসের সুপরিকল্পিত প্লট অনুসারে দেখতে পেয়েছে তার প্রথম প্রেমই অনন্ত প্রেম, ডাক্তার বিনয়কুমারই তার বাল্যপ্রেমিক ছোটু। তবে মণি ভেঙে দিয়েছে কুমারীর প্রথাগত ভাবমূর্তি, সে স্বামীকে দেবতা ব'লে মনে করে নি, বিয়েতেই নারীজীবনের সার্থকতা ব'লে বিশ্বাস করে নি, এবং বিশ্বাস করে নি পিতৃতান্ত্রিক সতীত্বে।

শৈলবালা ঘোষজায়ার *জন্ম-অপরাধী* নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এক অসামান্য, সম্ভবত বাঙলা ভাষায় অনন্য, উপন্যাস। নামকরণ থেকে শেষ পংক্তি পর্যন্ত এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে পিতৃতন্ত্রের হাতে নারীর নিপীড়িত হওয়ার শোচনীয় উপাখ্যান। শৈলবালার আর কোনো বই আমি পড়ি নি, তিনি প্রথাগত না প্রথাবিরোধী ছিলেন তাও জানি না, জানি না নারীমুক্তির বাণীতে তিনি দীক্ষিত ছিলেন কিনা, কিন্তু *জন্ম-অপরাধী*তে নারীজীবনের যে-মর্মস্পর্শী রূপ তিনি এঁকেছেন, তা এটিকে হয়তো বাঙলা ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ নারীবাদী উপন্যাসে পরিণত করেছে। তিনি বিদ্রোহ বা

প্রতিবাদের রূপ আঁকেন নি, নারীমুক্তির কৃত্রিম কৌশল উদ্ভাবন করেন নি, যেমন করেছেন বেগম রোকেয়া ও শান্তা দেবী; তিনি লিখেছেন নারীর অবিরাম পীড়িত দণ্ডিত জীবনী। এ-পীড়িত রূপ কাজ করে কল্পিত বিদ্রোহী রূপের থেকে অনেক তীব্র মর্মস্পর্শীভাবে। *জন্ম-অপরাধী* নামটিই প্রগাঢ় তাৎপর্যপূর্ণ, তা নির্মমভাবে তুলে ধরে পিতৃতন্ত্রে নারীর অস্তিত্বের বিভীষিকা। শৈলবালা উপস্থাপিত করেছেন পীড়ন আর পীড়নের রূপ, যেনো পিতৃতন্ত্র নারীর ওপর যতো পীড়ন করেছে তা একযোগে ভোগ করেছে তার নায়িকা অপেরা। অপেরাকে তিনি ক'রে তুলেছেন পীড়িত নির্যাতিত সমগ্র বঙ্গনারীর আদিরূপ। তিনি ছক ভাঙেন নি, ছকের মধ্যে রেখেই পীড়নের মধ্য দিয়ে ভেঙে দিয়েছেন নারী-ছকটি। শৈলবালা ঘোষজায়ার নায়িকা অপেরার জন্ম-অপরাধ দুটি : প্রথম অপরাধ সে নারী, দ্বিতীয় অপরাধ সে দরিদ্র ঘরের অনাথ মেয়ে। তার বিয়ে হয়েছিলো প্রকৌশলী বিনোদলালের সাথে, তবে তার স্বামী এক হিংস্র পাষণ্ড। অপেরা বিদ্রোহী নয়, সে পুরুষতন্ত্রের ছক মেনে নিয়েই বেঁচে থাকতে চেয়েছে; কিন্তু তাকে বাঁচতে দেয়া হয় নি। তাই সে মনে দাগ কাটে প্রতিবাদীর থেকে অনেক বেশি, তার শোচনীয় জীবনই হয়ে ওঠে এক নিরন্তর নিঃশব্দ বিদ্রোহ। 'সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়া সহস্র অপমান তিরস্কার সহিয়াও সে উদ্ধতভাবে কখনও প্রতিবাদ করিত না'; সে চেয়েছে শুধু একটু বেঁচে থাকতে। তার পিতামাতা নেই, তার বোন ও ভগ্নিপতি তাকে স্নেহেই পালন করে, এবং প্রথাগতভাবে সৎপাত্রে দানও করে। কিন্তু বিয়ের পরই তার জীবন হয়ে ওঠে নরক। সে জীবন যাপন করেছে শুধু বাল্যকালে : 'এক বছর বয়সে মা ও চার বছর বয়সে তাহার বাবা মারা গিয়াছেন।...একটুখানি জ্ঞান হইতেই বই শ্লেট বগলে করিয়া গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাতায়াত-বছর বছর ফার্ষ্ট হইয়া ক্লাশে ওঠার তীব্র আনন্দ উত্তেজনা! এমন করিয়া কোন দিক দিয়া কয় বছর কাটিয়া যাইবার পর যখন থার্ড ক্লাশের সীমা ডিঙ্গাইয়া সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিল, তখন হঠাৎ তাহার স্কুল যাওয়া বন্ধ হইল.. .সূর্য্য-চন্দ্র-যম-বরুণ-বাসবের সমকক্ষ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের পত্নীত্ব পদে সমারূঢ় হইয়া রাঁচিতে চলিয়া আসিল।' সে বইশ্লেট হাতে ইস্কুলে যেতো, বছর বছর শ্রেণীতে প্রথম হতো, পুরুষ হ'লে তার জীবন হতো সাফল্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু তার অপরাধ সে নারী। তাই তার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শৈলবালা পাতায় পাতায় শ্লেষ করেছেন পুরুষ, ঈশ্বর, ধর্মকে– সমগ্র পুরুষতন্ত্রকে; কথায় কথায় ব্যবহার করেছেন পরিহাসসূচক বিস্ময়চিহ্ন, যেমন এখানে অপেরার বরটিকে পরিহাস করেছেন 'সূর্য্য-চন্দ্র-যম-বরুণ-বাসবের সমকক্ষ শিক্ষিত বাঙ্গালী' যুবক ব'লে। বিয়ের পর সম্ভাবনাময় কিশোরীটির জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় তার জীবনই। তার জীবনের নাম পীড়ন।

পিতৃতন্ত্রে নারীর কোনো সম্মান নেই, অপেরারও কোনো সম্মান নেই শ্বশুরবাড়িতে : 'অপেরা খুব ভাল করিয়াই জানে, এ বাড়ীতে তাহার সম্মানের মূল্য কতটুকু!– অতএব নিষ্ফল মনস্তাপ বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত অন্যায় অপমান নিঃশব্দে মাথায় তুলিয়া লইয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত কুটুম্ব-সন্তানকে সাদর শিষ্টাচার জানাইয়া– শ্বশুরবাড়ীর সম্মান বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য একটা বিপদের দায় ঘাড়ে তুলিয়া লইতে হইবে।' শ্বশুরবাড়িতে তার

সম্মান নেই, কিন্তু তার দায়িত্ব শ্বশুরবাড়ির সম্মান রাখা। অপেরার স্বামী শিক্ষিত পাষণ্ড, ধর্ষকামী; তার কাজ অপেরারকে নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন করা; যেমন, '"দূর হয়ে যাও– স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীলোক!"– বলিয়া বিনোদ সক্রোধে অপেরার বাঁ পাঁজরে সজোরে কনুইয়ের গুঁতা মারিলেন। অপেরা ছিট্‌কাইয়া গিয়া মেঝের উপর পড়িল।' অপেরা এ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী করতে পারে? সে প্রতিবাদ করবে? সে যে-প্রতিবাদ জানায়, তা পিতৃতন্ত্রের জন্মকাল থেকে জানিয়ে এসেছে নারী : 'মুহূর্ত্তে তাহার শান্ত নম্র মুখমণ্ডলে দৃপ্ত-বিদ্রোহের বিদ্যুদগ্নি ঝলসিয়া উঠিল,– কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্যই! পরক্ষণেই সংযত হইয়া নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিল।' শৈলবালা নারীর অব্যক্ত বিদ্রোহের আবেগ সকাতর ভাষায় প্রকাশ করেছেন : 'হায় গো বিধাতা, তোমার সুপবিত্র বিধানের নিকট সশ্রদ্ধ সম্মানে মাথা নোয়াইয়া হাসিমুখে যেখানে আত্মোৎসর্গ করিয়া চলাই নারীহৃদয়ের স্বভাব-ধর্ম্ম-সেখানে কেনই যে এমন অস্বাভাবিক অধর্ম্মের উত্তেজনায় বর্ব্বর নৃশংসতা জাগিয়া ওঠে, সে প্রশ্নের উত্তর তুমিই জান নারায়ণ!' বিনোদলাল আনন্দ পায় স্ত্রীনির্যাতনে; যেমন, 'অমনি তিনি হঠাৎ বিছানা ছাড়িয়া লাফাইয়া পড়িয়া, চক্ষের নিমেষে মেঝে হইতে একপাটি পম্প-সু তুলিয়া লইয়া, বিনা বাক্যে অপেরার কর্ণমূলে সশব্দে ফটাস করিয়া বসাইয়া দিলেন।' বিনোদলাল পাষণ্ড, কিন্তু সে পুরুষ ও সম্মানিত; তাই লেখক তার পাশবিকতা বর্ণনার সময়ও ব্যবহার করেছেন সম্মানসূচক ক্রিয়ারূপ 'দিলেন'; অপেরার কোনো সম্মান নেই, তাই নির্যাতিত হয়ে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার জন্যে ক্রিয়ারূপ হচ্ছে সম্মানহীন 'আসিল'। অপেরার সবই অপরাধ; অপেরা বাপের বাড়ি গেছে, তাই তার স্বামীর কথা হচ্ছে, 'তার মত স্ত্রীর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, তাকে খুন করে ফেলা।' শুধু তার স্বামী নয়, তার শ্বশুরবাড়ির অন্য পুরুষেরাও সমান হিংস্র; তার বট্‌ঠাকুর বলে, '"আমার পরিবার যদি ওরকম হত, তাহলে আমি তাকে লাথির ওপর লাথি, জুতোর ওপর জুতো, ঝাঁটার ওপর ঝাঁটা মারতাম!– লাঠির চোটে ভূত জব্দ, মেয়েমানুষ তো কোন ছার! শাসন থাকলে মেয়েমানুষ কখনো অমন স্বেচ্ছাচারিণী হতে পারে!"' পুরুষের যে-হিংস্রতার ছবি এঁকেছেন শৈলবালা, তা পুরুষ সম্পর্কে তাঁর মৌল ধারণার প্রকাশ; তিনি পুরুষকে দেখেছেন হিংস্র পশুরূপে। নারীপুরুষের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কও পশুবৃত্তি : 'শুধু পশুবৃত্তির উত্তেজনায় যে ক্ষণিক আকর্ষণ, ক্ষণিক সম্মিলন–তাহাই কি দাম্পত্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা? ধিক্, এত বড় সাংঘাতিক প্রবঞ্চনা, এত বড় মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা মানুষের জীবনে যে আর নাই!'

অপেরার সবই অপরাধ; সে কিছুটা লেখাপড়া জানে, এটা তার অপরাধ; সে একটু পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকতে চায়, এও তার অপরাধ। তার স্বামী লেখাপড়া সম্পর্কে পোষে এমন শ্রদ্ধাবোধ : 'মেয়ে মানুষের লেখাপড়া শেখা! দুচক্ষে যা দেখতে পারি নে, তাই জুটেছে ঘরে!... জুতিয়ে অম্নি মুখ ছিঁড়ে দিতে পারি!' সে বিশ্বাস করে, 'যে মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শিখেছে, তার কি ভদ্রস্থ আছে? সে ত বেশ্যা!' সে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নও থাকতে পারবে না, কেননা তাও নারীর অপরাধ। শৈলবালা প্রশ্ন করেছেন, 'হিন্দুসমাজের কোন্ শাস্ত্রের কোন্ খানে এক জায়গায় বুঝি লেখা আছে, এমনতর পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতার 'বাই' যে মেয়েমানুষের থাকে, তাহারা নাকি নিতান্ত শীঘ্রই আধঃপাতে যায়!' তার জীবনই অপরাধ, তাই তার প্রাপ্য নিরন্তর শাস্তি : 'কিন্তু নিরুপায় সে! হতভাগ্য বাংলা দেশের ভদ্রগৃহস্থ গৃহের, হতভাগিনী বধু সে! গুরুজনের সম্মান লঙ্ঘনের অপরাধ-আশঙ্কা তাহার পায়ে পায়ে!– মিথ্যা সাক্ষ্য ও অন্যায় প্রমাণের জোরে, বিনা অপরাধে সহস্র দণ্ড ভোগ করিতে হইলেও, নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ তাহার মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করিবার অধিকার নাই.– তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! জাতিনাশের চেয়েও বেশী অপরাধের দায়ে তাকে পড়িতে হইবে! ইহাই আমাদের বাংলা দেশের ভদ্রগৃহস্থ গৃহের গার্হস্থ্যবিধি! বাংলা দেশের অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেই একটা সুমহান মোটা নীতি শিখিয়াছে,– "হলুদ জব্দ শিলে আর বউ জব্দ কীলে" ।'

অপেরার, সমস্ত নির্যাতিত নারীর মতোই, প্রতিবাদের অধিকার নেই; এমনকি অধিকার নেই চোখের জলের : 'কেহ আসিয়া দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। ছিঃ, একি চপলতা করিতেছে? স্বামীর অসদ্ব্যবহার– ইহাই যে তাহার প্রাক্তন! এ কর্ম্মভোগ নারী-জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া শান্ত সহিষ্ণু ভাবে বহন করিতে হইবে।' নারীজীবন পেয়েছে সে জীবনের বদলে পীড়ন উপভোগের জন্যে. তাই পীড়নভোগই তার পুণ্য। অপেরা মষকামী নয়, পীড়িত হয়ে সে কোনো সুখ পায় না; অন্য সমস্ত নারীর মতো পীড়ন ভোগ করাই তার প্রতিবাদ। তার ভেতরটা যখন গর্জন ক'রে ওঠে, তখনও তাকে থাকতে হয় নিঃশব্দ নারী : 'অপেরার স্তব্ধ-ব্যথাহত নারীত্ব দৃপ্ত-অভিমানে অন্তরের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিল,–কিন্তু সেটা প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার নাই! তাহা হইলেই না কি– স্বামীর গুরু-সম্মানকে লঘূ করিয়া দেওয়ার পাপে পড়িতে হইবে!' পীড়ন সহ্য করতে একদিন সে রূপান্তরিত হয়ে যায় : 'এখন কাঁদিয়া হাল্কা হইতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না, লজ্জা করে রাগও হয়!' এটা প্রতিবাদের বিপরীত রূপ, পীড়ন ভোগ করেই সে জানায় তার প্রতিবাদ।

শৈলবালা পুরুষকে দেখেছেন হিংস্র অমানবিক জন্তুরূপে, যাদের কাজ নারীপীড়ন :

> সংসারের শক্তিমান, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, সুখ-সম্ভোগ-বিলাসী, মহারত্ন পুরুষগুলির ফরমাস অনুসারে সৃষ্টিকে নিখুঁত সুন্দর রূপে গড়িয়া তোলা বিধাতার শক্তিতে কুলাইয়া উঠে নাই। কাযেই সে-হেন বিশিষ্টগুণ সম্পন্ন প্রবল শক্তিমান পুরুষেরা যখন তাঁহাদের ইচ্ছা অভিরুচির ক্রীতদাসী দুর্ব্বল প্রাণীগুলিকে. তাঁহাদের মত যথেচ্ছাচার সহিবার পক্ষে একান্ত অযোগ্য–অলস, নির্জ্জীব, অথবা বিদ্রোহভাবাপন্ন হইতে দেখেন, তখন তাঁহারা বিধাতার মুণ্ড ভোজনে উদ্যত হন! স্বেচ্ছাচারী পুরুষ তাঁহারা–তাঁহারা কি বিধাতার স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারেন? তাই তাঁহারা বিধির বিধান উল্টাইয়া দিবার জন্য অপরূপ বিধানের সৃষ্টি করেন! তাঁহাদের ফরমাসী মাপের অযোগ্য যে জন একান্ত নিরুপায় ভাবে তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়া পড়ে–সেটাকে চাবকাইয়া দুরস্ত করিবার জন্য তাঁহারা অমানুষিক শক্তিতে বন-মানুষী প্রতিভা দেখাইবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

পুরুষের প্রকৃতি সম্পর্কে এখানে শৈলবালা প্রকাশ করেছেন তীব্রতম ঘৃণা; পুরুষ স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, যে-বিধাতার বিধানকেও বদলে দেয় নারীপীড়নের জন্যে। নারী কী ক'রে এর প্রতিবাদ করবে, যেখানে সব কিছুই নারীর বিপক্ষে? শৈলবালা এটা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

বাঙ্গালাব পল্লীগৃহে অকাটমূর্খ ভদ্রনামের ইতর শ্রেণীর স্বামীস্ত্রীর বিবাদে মারধোর গালমন্দের পর এমনই ভাবে বাড়ী হইতে খেদাইয়া দিবার প্রথা প্রচলিত আছে বটে, তবে সেটা– সে শ্রেণীর মূর্খ-ইতর স্বামীদেব পক্ষেও শোভনীয়,–স্ত্রীদের পক্ষেও সহনীয়! স্বামীদের এই অত্যাচার সমর্থনার্থে, কোন শাস্ত্র হইতে নাকি সার-সঙ্কলন করিয়া, মূর্খে নয়, অনেক বিদ্বানেও নাকি প্রবল বিজ্ঞতা সহ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, স্বামী সহস্র অন্যায় করুন কিন্তু স্ত্রী যদি তাহাব বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ কবে, তবে পবজন্মে তাহাকে কুক্কুরীব গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার পব মূর্খ, অধম, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, তৃণাদপি তুচ্ছ নারী জাতি কোন সাহসে কথা কহিবে? পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই যাহাদেব একটা মহৎ অপবাধ বলিয়া গণ্য–সূতিকাগাব হইতে মৃত্যুকামনাই যাহাদের আত্মীয় স্বজনের কর্ত্তব্য, সে-হেন 'মেয়েগুলা' যে দুনিয়ার বাজাবে কোন্ স্পর্দ্ধায় বাঁচিয়া থাকে, ইহাই ত একটা ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপাব!

শৈলবালা আক্রমণ করেছেন সমগ্র পিতৃতন্ত্রকে, পিতৃতন্ত্রের শাস্ত্রকে, যা নারীকে শুধু পীড়নের বিধান দিয়েই পরিতৃপ্ত নয়, পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকেও নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছে। বিধানে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অপেরার মনে জাগে প্রতিবাদ। তখন 'নির্দ্দয় শক্তিতে বজ্রনিষ্পেষণে অপেরার হাত টিপিয়া ধরিয়া কঠোর ভ্রূভঙ্গী করিয়া রূঢ় স্বরে তিনি (স্বামী) বলিলেন, "দেখ, মেয়েমানুষের অতটা তেজ ভাল নয়।" তখন :

অপেবাব গ্রহদেবতা বিরূপ'–কোথা হইতে দুষ্ট সবস্বতী আসিয়া তাহাব স্কন্ধে চাপিয়া বসিলেন,–অপেরা ধৈর্য্য হারাইল'– চির-অনাদৃতা চিব-অবজ্ঞাতা স্ত্রীলোকেব কতটা তেজ যে ভাল, অপেরা সে হিসাবেব অঙ্কটা জানিয়া বুঝিয়া, বিজ্ঞতা প্রকাশেব অবসব লইল না,– এইবার অকুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিল– "তেজ! একেও তোমবা তেজ বল্‌বে? বেশ, তোমাদেব বিচাবই ভাল! কিন্তু রক্তে মাংসে গড়া মানুষ আমি, আমাব মন পাথর দিয়ে গড়া নয় সেটা মনে বেখো–"

অপেরা মুক্ত নারীর জীবন চায় নি, সে প্রথা মেনেই যাপন করতে চেয়েছে তার দণ্ডিত জীবন। সে বলেছে, 'স্বামী তুমি তোমার স্থান আমার মাথার উপর, সে একবার নয় একশো বার আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।' তবে তারও যে সামান্য অধিকার আছে, তা সে জানাতে চেয়েছে; বলেছে 'স্ত্রী বলে আমারও কি–', কিন্তু বাক্য সে শেষ করতে পারে নি, জানাতে পারে নি তাব কী আছে? এক সময় পীড়ন তার সহ্য হয়ে যায়, আর অসহ্য হয়ে ওঠে কৃত্রিম আদর : 'লাথির উপর লাথি, জুতোর উপর জুতো, ঝাঁটার উপর ঝাঁটা, যার জন্যে প্রেস্‌কৃপসন্ ঠিক হয়ে আছে, তাকে শান্ত সহিষ্ণুভাবে তার ন্যায্য প্রাপ্যটা গ্রহণ করিতে দাও– মাঝে মাঝে খেয়াল মত এমন যথেচ্ছ অনুগ্রহ দেখিয়ে কেন তার মাথা খারাপ করে স্পর্দ্ধা বাড়াও?–এতে তোমার কোন গ্লানি বোধ না হতে পারে, কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম সত্যি বলছি, ঝাঁটা লাথি সহ্য করবার জন্যে যার মন কঠিন ভাবে প্রস্তুত হয়েছে, এ আদর অনুগ্রহ তার অসহ্য।' নারী যেমন পীড়নের শিকার হয় পুরুষের, তেমনি হয় পুরুষের সোহাগেরও শিকার; প্রেমহীন সোহাগ তার জন্যে শোচনীয়তম অপমান। পুরুষ সোহাগ করে নিজেকেই পরিতৃপ্ত করার জন্যে, নিজেরই প্রভুত্বকে ভিন্নভাবে নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে; তাতে নারীর কোনো সুখ নেই। নারী কি কোনো তেজ দেখাতে পারে, তার কি সে-অধিকার আছে? নেই। বুকে যখন একটু প্রতিবাদের অগ্নিকণা জন্ম নেয়, তখন

'অপেরার মনে হইল, সত্যই ত, মেয়েমানুষের এত তেজ, এ যে বাস্তবিকই একটা বিষম স্পর্দ্ধা!' মেয়েমানুষ কী করবে? তার জন্যে রয়েছে আত্মদমন : 'নিজের এই অস্বাভাবিক দুঃসাহসিকতার জন্য অপেরা মনে মনে ত্রাহি মধুসূদন জপিতে জপিতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল,.. তাহার মন উষ্ণ উত্তেজনায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে,– সামান্য সংঘর্ষে এখনই হয়ত সে বজ্রপাত ঘটাইয়া বসিবে। প্রাণপণে আত্মদমন করিবার জন্য অপেরা আড়ষ্ট নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল।' ক্রীতদাসী ক্ষুব্ধ হ'তে পারে, তবে ক্ষোভ বিপন্ন করে তার জীবন, তাই নিজের ক্ষোভকে দমন করাই তাঁর বেঁচে থাকার পদ্ধতি।

মেয়েমানুষের অবস্থান কোথায় শৈলবালা তা বারবার নির্দেশ করেছেন :

[ক] গোটা দুই ধমক ও একটা পদাঘাতে যাহাকে কাবু করিয়া ফেলিতে পাবা যায়, সে কি আবার মানুষ। বিশেষতঃ মেয়ে মানুষ ত জন্তু জানোয়াবের সামিল নগণ্য জীব।– তবে সভ্য জগতে? ওঃ, সে আলাদা কথা।– আর আমাদেব ঘরে এই সব "মাগী ছাগী"– উহাদের জীবন মূল্যহীন। উহাদেব ধমনীতে যে তরল পদার্থটা প্রবাহিত হয়, সে ত রক্ত নয়,–অসাব পদার্থ, লাল জল মাত্র।

[খ] স্ত্রীলোকের ভাগ্য নিশ্চল জড় পদার্থ!... পুরুষ মানুষেব চবিত্র সহস্র অসৎ কাযে, সহস্র হীনতা, নীচতায়,– কখনও অপবিত্র হইবার নয়, সোণাব মাকড়ী বুঝি বাঁকা হইলে ক্ষতি আছে? কি স্পর্দ্ধা বে' আর স্ত্রী চবিত্র?–সত্যযুগ হইতে প্রমাণ চলিয়া আসিতেছে,–দ্বিতীয় বাক্য নিষ্প্রয়োজন! পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত চবিত্রহীনতাব জন্য যত লক্ষ কোটি অপরাধ ঘটিয়াছে, সে শুধু স্ত্রীজাতির একান্ত নিজস্ব কলঙ্ক! সে কলঙ্কের সহিত পুরুষ জাতির কোন পুরুষেও তিলার্দ্ধ সংস্রব নাই। বেশী কথা কি, ঐ কঠোব অপরাধী জাতিটার চরিত্র এমনই অবিশ্বাস্য ও মন এতই দুবভিসন্ধিপূর্ণ যে, মৃত্যুব পরও উহাদের বিশ্বাস কবা নিষেধ। দেহটা চিতার আগুনে ভস্মসাৎ হইয়া বাতাসে যখন ছাই উড়িয়া যাইবে, তখন নির্ভয়!

[গ] যেহেতু বসুন্ধরাব সর্ব্বোত্তম জীব পুরুষ-মানুষবা স্বতঃসিদ্ধ – অথবা সোজা ভাষায় যাহাকে স্বেচ্ছাচারী বলা যায়, তাহাই। সুতরাং তাহারা ত কাহারও সুবিধা বা মঙ্গলের মুখ চাহিয়া নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ও মন্দ অভ্যাস সংশোধন করিতে বাধ্য নন,– তা, তাহাতে সৃষ্টি রসাতলেই যাক, আর সৃষ্টিকর্ত্তা কাবাগারে, দ্বীপান্তরে যেখানে খুশী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকুন, কোন ক্ষতি নাই।– কিন্তু বসুন্ধরাব অধমাধম জীব মেয়ে-জাতটার প্রত্যেক জনকে যে এক একটি স্বেচ্ছাচারীর ছন্দ মাত্রা প্রকরণ অনুসারে, ঠিক মাপ মিলাইয়া নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে স্বতন্ত্র ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে, সে বিধান অবশ্য প্রতিপাল্য!'... বেচারা অপেবা চুপ কবিয়া যতই সহিতে লাগিল, তাহার অন্তঃকরণ ততই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল।

[ঘ] পুরুষ মানুষের চটি জুতাব স্থানটা যেখানে, বিবাহিতা স্ত্রীর স্থান যে তাহাব ঢেব নীচে...

[ঙ] স্বামীর সহিত সদ্ভাব না থাকিলে, স্বামী অত্যাচার-পরায়ণ নিষ্ঠুর নির্দ্দয় হইলে, স্ত্রী পৃথক্ হইবে? ওমা, একি অসম্ভব কথা!'...যে দেশে নারীব স্থান বুট, গোবতোলা, পাম্পসু, প্রভৃতি দামী জুতার নীচে নয়,– একেবারে সব চেয়ে অধম চটিজুতাব নীচে বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, যে সমাজে নারীব জন্মগ্রহণ মহা অপরাধ– বাঁচিয়া থাকার ত কথাই নাই; সে দেশের সে সমাজের কোনও নারী যদি অত্যাচারী স্বামীব উৎপীড়নের হাত এড়াইয়া স্বচ্ছন্দ শান্তিতে সৎভাবে জীবনটা কাটাইবার জন্য, সাহস করিয়া পৃথক হইয়া যায়, তবে সে দুঃসাহসের দণ্ডের পরিমাণ কতখানি?

আক্রমণ, শ্লেষ, বিদ্রূপ, বর্ণনার মধ্য দিয়ে পুরুষের পাশবিকতা ও নারীর শোচনীয় অবস্থানটিকে শৈলবালা মর্মস্পর্শীভাবে নির্দেশ করেছেন; অপেরার জীবনের ভেতর দিয়ে

শৈলবালা তুলে ধরেছেন সমগ্র পীড়িত নারীর যন্ত্রণার রূপ। পুরুষ তাঁর চোখে নৃশংস দানব। লৈঙ্গিক রাজনীতির চরম রূপটি চিত্রিত করেছেন শৈলবালা; দেখিয়েছেন পুরুষের স্বৈরাচারের ফলে নারীর অবস্থা শোচনীয় হ'তে পারে কতোখানি। তিনি দেখিয়েছেন নারী-পুরুষ, স্ত্রী-স্বামীর মধ্যে রয়েছে এক অনাদি বিরোধ, যার শিকার নারী। নারী এ-বিরোধ সৃষ্টি করে নি, পুরুষই নিজের স্বেচ্ছাচারিতায় নারীকে শত্রু ক'রে তুলেছে; পুরুষপ্রজাতির সাথে নারীর জীবনযাপন এক অসম্ভব পীড়াদায়ক ব্যাপার। স্বামী কি নারীর সুখ? শৈলবালা লিখেছেন, 'স্বামীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ অপেরার মনে হইল, ইনিই যত অনিষ্টের মূল।' এক অপেরার অনুভবের মধ্য দিয়ে তিনি নির্দেশ করেছেন সমস্ত নারীর জীবনের অনিষ্টের মূলটি। অপেরা পীড়নের প্রতিবাদও করতে পারে না, পীড়নে পীড়নে সে শিশুর মতো অসহায় হয়ে ওঠে : 'অভিমানী শিশু যেমন তুচ্ছ ছুতা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই কাঁদিবার জন্য ব্যাকুল হয়-অপেরার বুকের ভিতর তেমনই একটা অর্থহীন ব্যাকুলতার আবেগ ঠেলিয়া উঠিল।' পিতৃতন্ত্র নারীকে শিশুই মনে করে, যে-নারী শিশু হ'তে চায় না তাকে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে পরিণত করে অবোধ অসহায় শিশুতে।

শৈলবালা শুধু অপেরার স্বামীকে নয়, প্রায় সব পুরুষই দেখেছেন অমানুষরূপে; এক চিকিৎসকের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : 'তাহার উপর তিনি নিষ্ঠাবান জ্ঞানাভিমানী পুরুষ, পৃথিবীতে মেয়েমানুষদের বাঁচিয়া থাকাটা অত্যন্ত ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় বলিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষুতে প্রতিভাত হইত।' পুরুষ এতো অমানুষ যে স্ত্রীকে খুন করার পর তার স্বামী বক্তৃতা দেয় : ' আজ কালকার মেয়েরা যে ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়া, হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য ভুলিয়া, ঘোরতর অহিন্দু আচার অবলম্বন করিয়া, অসদুপায়ে বিষ খাইয়া, গলায় দড়ি দিয়া, জলে ডুবিয়া ও কেরোসিন তৈলে পুড়িয়া মরিতেছে, তৎসম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় বিস্তর নিন্দাবাদ করিতেছেন!' নারী কী কী উপায়ে পুরুষের হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করছে, তার তালিকাটি তিনি উপস্থিত করেছেন এখানে। পুরুষের কবল থেকে নারীর নিজেকে উদ্ধারের উপায় আত্মহত্যা; অপেরা জানে, 'এই চির পরাধীন জীবনের অবস্থা!– এদের স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশ্বাস ফেলবার অধিকার পর্য্যন্ত নেই... এরা জন্মেছে শুধু সংসারের সকলের অসন্তোষ বিরক্তির জ্বলায় উৎপীড়িত হয়ে,– আত্মগ্লানির ধিক্কারে আত্মহত্যা করতে!' অপেরা বলেছে, 'আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যে আমায় যথার্থ ভালবাসে, সে যেন আমার মৃত্যুর প্রার্থনাই করে!' জন্ম-অপরাধী অপেরার এ-প্রার্থনা যে পূর্ণ হবে, তাতে সন্দেহের কারণ নেই; উপন্যাসের শেষে সে ঢ'লে পড়ে অপমৃত্যুর কোলে। মৃত্যুই তার মুক্তি, মৃত্যুই তার চরম বিদ্রোহ : 'অপেরা নিরুত্তর!– আজ সে তাঁহার (স্বামীর) শাসন বাধ্যতার আইনের কবল চিরদিনের মত এড়াইয়া নির্ভয়ে অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইযাছে! আজ সে আর উত্তর দিবে না!' জীবন অপেরাকে যে-অধিকার দেয় নি, মৃত্যু দিয়েছে তাকে সে-অধিকার : পুরুষের অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা। শৈলবালা এঁকেছেন পুরুষের নারীপীড়নের রূপটি, অপেরাকে ক'রে তুলেছেন সমস্ত নিপীড়িত বাঙালি নারীর আদিরূপ। নারী কোনো অপরাধ না ক'রেও যে পুরুষতন্ত্রের কাছে অপরাধী, জন্মদণ্ডিত, এর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনের আয়োজন না ক'রেও শুধু একটি নারীর শোচনীয়

জীবন চিত্রিত ক'রে শৈলবালা জানিয়েছেন প্রবল প্রতিবাদ; এবং রচিত হয়েছে একটি অসাধারণ নারীবাদী উপন্যাস।

অনুরূপা দেবী হিন্দু বিধানে দীক্ষিত প্রথাগত ঔপন্যাসিক; *মন্ত্রশক্তি* (১৯১৫) লিখেছেন তিনি বেদমন্ত্রের মহাশক্তি প্রমাণের জন্যে; কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও নারীপুরুষের বিরোধ স্পষ্ট। তিনি তাঁর নায়িকা বাণীকে শেষে পুরুষের পায়েই সঁপে দিয়েছেন, তবে এঁকেছেন নারীপুরুষের দীর্ঘ লৈঙ্গিক রাজনীতি বা বিরোধের চিত্র। তাঁর *মন্ত্রশক্তি*ও নারীকেন্দ্রিক; তাঁর নায়িকা রাধারাণী বা বাণীর বিয়ে ও স্বামীর সাথে অপসম্পর্ক এর বিষয়। রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভের বংশে এক বড়ো সমস্যা দেখা দেয় পুত্র রমাবল্লভের ঘরে কোনো সন্তান জন্ম না নেয়ায়। তবে 'হরিবল্লভ বাবু সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে পৌত্রমুখ সন্দর্শনের আশায় হতাশপ্রায় হইয়া তাঁহার বিপুল ধনৈশ্বর্য্য পরমার্থে উৎসর্গের কল্পনা করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছেন, এমন সময় পুত্রবধূ কৃষ্ণপ্রিয়া একটি পুষ্পকোরকতুল্য সন্তান প্রসব করিলেন। শিশুটি পুত্র সন্তান নহে, কন্যা সন্তান। তথাপি এই 'হাপুত্রে'র ঘরে তাহার আদরের সীমা রহিল না।' একটি পুত্র জন্ম নিলে যা হতো স্বর্গীয় আনন্দ, কন্যার জন্মের ফলে তা হয়ে ওঠে মহাসংকট। অনুরূপা জানিয়েছেন, এবং বিবরণও দিয়েছেন যে মেয়েটিকে হরিবল্লভ থেকে রমাবল্লভ অসীম আদর করে, কিন্তু মেয়েটির জীবনে ওই আদর নিরর্থক। হরিবল্লভ আদর ক'রেও বাণীর জীবনকে ধ্বংস ক'রে যেতে দ্বিধা করে নি। রমাবল্লভ সন্তানের-পুত্রের-আশায় আরেকটি, বা অনেক বিয়ে করতে পারতো, তবে 'পিতার বিরাগভাজন হইয়াও কেবল এই হতভাগিনীর মুখ চাহিয়াই গৃহে পুনর্ব্বার সৌভাগ্যবতী নব বধূ আনয়ন করেন নাই।' এই শুধু কারণ নয়; অনুরূপা আরেকটি নব বধু আনতে দেন নি, কেননা তিনি এ-'হতভাগিনী'র থেকে অনেক বেশি 'হতভাগিনী' আয়োজনের কাহিনী বলতে চেয়েছেন। অনুরূপা প্রথাগত বিধানের প্রতিপক্ষ নন; তিনি জানেন 'পতিব্রতা হিন্দুরমণী নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে বড় করিয়া দেখিতে জানেন না।' রমাবল্লভের স্ত্রী 'অনেক অনুনয় অনুরোধেও স্বামীকে পুনর্ব্বিবাহে সম্মত করাইতে পারেন নাই।' পুরুষকে একটু দেবতা ক'রেই এগিয়েছেন অনুরূপা।

বিয়ে মায়ের জীবনে সমস্যা সৃষ্টি না করলেও কন্যার জীবনকে নষ্ট ক'রে দেয়। সমস্যা যোগ্য পাত্রের অভাব; ন-বছর বয়স থেকেই বাণীকে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়, কিন্তু তেরো বছর বয়সেও তা সম্ভব হয় নি। পিতৃতন্ত্র নারীর বিয়ের আবশ্যিক বিধান দিয়েছে, এবং পিতৃতন্ত্রের এক বড়ো পুরোহিত হরিবল্লভ স্নেহ করা সত্ত্বেও পিতৃতন্ত্রের স্বার্থে পৌত্রীর জীবন নষ্ট ক'রে যেতে দ্বিধা করে নি। পিতৃতন্ত্র হরিবল্লভের হাতে লিখিয়ে নেয় নারীপীড়নের একটি উইল : 'যদি পঞ্চদশ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহার পৌত্রী রাধারানী কোন সমশ্রেণীর সমান ঘরে কুলীনসন্তানের সহিত বিবাহিতা হয়, তবেই সে অথবা তাহার সন্তান সন্ততিগণ দেবসেবা ব্যতিরেকে আয়ের সমুদয় উপস্বত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতে পারিবে। কিন্তু যদি তাহা না হয়– অর্থাৎ অসমান ঘরে বিবাহ হয় অথবা উক্ত সময়মধ্যে বিবাহ না হয়, তাহা হইলে রাধারানীর পঞ্চদশ বৎসব পূর্ণ হওয়ার পর দিবস প্রাতঃকালেই তাঁহার সুদূর কুটুম্বপুত্র মৃগাঙ্কমোহন

সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। রমাবল্লভ যাবজ্জীবন সহস্র মুদ্রা মাসহারা পাইবেন মাত্র, এই পৈতৃক গৃহে সেইদিন হইতে তাঁহার কোনই অধিকার থাকিবে না।' এমন একটি নিষ্ঠুর উইল করতে তার হাত কাঁপে নি, অথচ সে খুব ভালোবাসতো তার নাতনীকে; বাণী যদি নাতী হতো, হতো পাষণ্ড, তাহলেও সে এমন উইল করতে পারতো না। বোঝা যাচ্ছে কোনো মেয়েকে স্নেহ করা আসলে তাকে উপহাস করা। নাতনীর কোনো মূল্য নেই, স্নেহেরও মূল্য নেই; মূল্যবান হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের বিধান। জমিদার তার প্রিয় নাতনীকে বনবাসে পাঠিয়ে নির্দ্বিধায় সম্পত্তি উইল ক'রে গেছে এক কুটুম্বপুত্রের নামে, যাকে সে কখনো আদর করে নি, কাছেও পায় নি, এমনকি পছন্দও করে না। তাই দেখতে পাই পিতৃতন্ত্রের পুরোহিতদের কাছে স্নেহের পাত্রীর থেকে অনেক প্রিয় হচ্ছে পুত্র, তা তার নিজের হোক বা যারই হোক। বাণীর জীবনেকে পিতৃতন্ত্রের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সে পরলোক চ'লে যায়। অল্প বয়সে বিয়ে না হওয়ায় বাণী অবশ্য এমন কিছু সুখ ভোগ করেছে, যার সুযোগ হিন্দু মেয়েরা পায় না : 'কুমারী জীবনের যে সুখাস্বাদে হিন্দু বালিকারা চিরবঞ্চিতা, সেই অনুপমেয় শান্তির আস্বাদ গ্রহণে সে নিজেকে চরিতার্থ মনে করিতেছিল।'

ধনী পরিবারে মেয়েদের স্বামীর বিকল্প হয়ে ওঠে কোনো দেবতা; রাধারাণীর বিকল্প স্বামী হয় কৃষ্ণ, যার পুজোয় সে নিজেকে সমর্পণ করে। অনেক উপাখ্যানে দেখা যায় যে অবিবাহিত বালিকারা মেতে উঠেছে পুজোয়, বিশেষ ক'রে কৃষ্ণের পুজোয়। অবিবাহিত বালিকাদের মন্দির নিয়ে মেতে ওঠার, বিশেষ ক'রে কৃষ্ণের পুজোয় নিজেদের বিলিয়ে দেয়ার ভেতরে লুকিয়ে আছে এক গোপন তাৎপর্য : কৃষ্ণ চরিতার্থ করে তাদের কাম; কৃষ্ণপ্রেমের ভেতর দিয়ে তারা জানায় তাদের পুরুষ ও স্বামীবিদ্বেষ। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন রাধারাণী বলে, 'আমার কৃষ্ণ ত দিনরাত্তির আমার কাছেই রয়েছেন,... তোরা তোদের স্বামীকে কি এমন করে সাজাতে পারিস? না, এমন ভালই বাসতে পারিস? তারা পান থেকে চুণ খসলে ঝগড়া করে, দাসীর মত খাটিয়ে নিয়ে দুটো ভাল কথাও সকল সময় কয়ে উঠতে ফুরসৎ পায় না।... আমি তাই স্বয়ম্বরা হয়েছি।' যেনো সব নারীর মতোই তার জানা আছে পুরুষের পাশবিকতা, তাই পুরুষকে প্রত্যাখ্যান ক'রে গ্রহণ করে সে কৃষ্ণকে; বলে, 'আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ জন্মে বিবাহ করিব না।' নারীর একমাত্র একান্ত সম্পদ তার দেহ, যার প্রতি পুরুষের একমাত্র মোহ। নারীর পুরুষবিরোধিতার একটি রূপ হচ্ছে সে তার দেহটিকে রক্ষা করতে চায় পুরুষের গ্রাস থেকে; সে বোধ করে তার দেহটি যদি পুরুষের কবলে পড়ে তখন তার আর নিজের ব'লে কিছু থাকে না। তার দেহ নষ্ট হয়, সেও নষ্ট হয়। নারী তখন হয়ে ওঠে কামবিরূপ, কামশীতল। এটাও নারীর এক বড়ো বিদ্রোহ। রাধারাণী জানে তার দেহটি তুলে দিতে হবে পুরুষের ক্ষুধার কাছে; তার পিতামহ যে-দলিল ক'রে যায়, তা হচ্ছে পুরুষকে দেহদানের অনিবার্য নির্দেশ। তার জীবনের করুণ পরিহাস : 'তাহার দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিত মনঃপ্রাণ কোন এক ক্ষুদ্র মানব চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সমর্পিত এ জীবন যৌবন নরভোগ্য করিয়া তবেই এ আশৈশবের আশ্রয় ক্রয় করা।' কিন্তু তা সে চায় না, তার সাধ হয় : 'এই ঐশ্বর্য্য সে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত

পরিত্যাগ করিবে সেও ভাল, তবু এ দেহ কাহাকেও দান করিতে পারিবে না।... কোথাকার কে একটা মানুষ! সে তাহার মালিক মোক্তার হইয়া বসিবে?' অনুরূপা দেহের ওপর বেশ জোর দিয়েছেন, নারীদেহকে 'নরভোগ্য' হ'তে দেয়ার অর্থ ওই দেহকে দূষিত করা, এমন একটি মনোভাব তিনি জ্ঞাপন করেছেন।

বাণী বিয়ে করতে রাজি হয় এক শর্তে : যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, তার সঙ্গে সে একরাতও কাটাবে না। সে দেহ দিতে পারবে না পুরুষকে, দাসীত্ব করতে পারবে না পুরুষের; সে বলে, 'এই জন্যই বিবাহে বিতৃষ্ণা হয়। সাধ করে কি বলি, বিবাহের নামই দাসীত্ব।' তবে তার জীবনের ট্র্যাজেডি হচ্ছে নিজেকে সম্পদের মধ্যে রাখার জন্যে তাকে বিয়ে করতে হয় এমন একজনকে, যাকে সে একদিন বরখাস্ত করেছে মন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্ব থেকে। তার নাম অম্বরনাথ। অম্বরনাথের অবশ্য নায়কোচিত সব গুণ রয়েছে, যদিও সে দরিদ্র। বাণীর সংকট দুটি, সে পুরুষবিরূপ, এবং অম্বরনাথের ওপর বিরূপ; তবু 'তাহারই মন্দিরের অযোগ্য পুরোহিত বলিয়া এই সে দিন মাত্র সে তাহাকে অক্ষমতার জন্য তিরস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছে,–সেই ব্যক্তিরই পায়ে ধরিয়া তাহার পিতা তাহাকে দান করিবেন?– আর এই দেব-চরণে উৎসর্গিত শরীর,– তৎকর্তৃক লাঞ্ছিত সেই ভিখারীকেই সমর্পণ করিতে হইবে? বাণী ভাবিল, এ কথা শুনিবার পূর্ব্বে সে মরিয়া গেল না কেন?' বাণী যে কামশীতল, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই; বাণী যে পুরুষকে দেহদানের কথা বার বার ভেবেছে, ঘেন্না বোধ করেছে দেহ দিতে, এটা তার পুরুষের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ। 'সে বড় নিশ্চিন্ত ছিল যে, মানুষকে কোনমতেই সে বিবাহ করিবে না', এবং সারা উপন্যাসে সে পুরুষকে তার দেহ দেয় নি। এক সময় ঔপন্যাসিক হস্তক্ষেপ করেন, তিনি যে-দিকে বাণীকে নিয়ে যেতে চান সে-দিকে যাওয়াব ব্যবস্থা করেন; মানুষ তাকে যাতে রাজি করাতে পারে নি, সেখানে প্রকৃতি হস্তক্ষেপ করে : 'মহাপ্রকৃতি রাধা স্মিতমুখে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'পাপিষ্ঠা! প্রকৃতি স্বয়ং পুরুষের দাসী, তুই এমন কি যে, ঠাকুরালী হইয়া থাকিবি,– দাসী হইবি না?'' অতিপ্রাকৃতের সহায়তায় অনুরূপা পিতৃতন্ত্রে দীক্ষিত করতে থাকেন বাণীকে। কিন্তু বাণী তার দেহ রক্ষা করতে চায় পুরুষের কামকলুষ থেকে : 'তখন অশ্রুপরিপ্লুত নেত্রে যুক্তপাণি বাণী দেবতার উদ্দেশ্যে কহিল, তুমি কি শুনিতেছ, আমি অন্য কাহাকেও স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না? তুমি যদি আমার পণ না রাখ, আমি নিজেই রাখিব। যদি বিবাহ করিতেই হয়, করিব। কিন্তু এ দেহ প্রাণ যখন তোমায় দিয়াছি, তখন এ কেবল তোমারি থাকিবে।' শরীরই তার অমূল্য সম্পদ : 'তাহার এ শরীরটাও সে অন্যের নিকট বেচিতে পারিবে না।' বাণী তার দেহশুচিতা রক্ষায় যে-প্রয়াস চালিয়েছে, তা নারীর গভীর পুরুষবিরূপতার প্রকাশ। অনুরূপার বাণী নিজের দেহটিকে দূষিত করতে চায় না, কেননা দেহই তার পবিত্রতম সম্পদ; কিন্তু পুরুষতন্ত্র নির্দেশ দিয়েছে এটিকে দূষিত করতে হবে পুরুষ দিয়ে। তাই পুরুষ হয়ে উঠেছে ঘৃণার পাত্র, কেননা কাজ দূষণ।

কিন্তু পুরুষের সঙ্গে তাকে জড়িত হ'তে হয়, এবং বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সে দেখতে পায় নারীকে বন্দী করার কৌশল : 'অম্বর যখন প্রথম দাঁড়াইয়াছিল, তখন–

অম্বরের উত্তরীয়ে গাটছড়া বাঁধা– কাজেই বাণীকেও সেই সঙ্গে বাধ্য হইয়াই দাঁড়াইতে হয়। সে অমনি ঘোর বিরক্ত হইয়া ভাবিল,– এই ত প্রভুত্ব আরম্ভ হইয়া গেল দেখিতেছি!– উনি দাঁড়াইলে দাঁড়াইতে হইবে, চলিলে চলিতে হইবে। আমায় যেন কিনিয়া ফেলিয়াছেন।' অম্বরনাথ তার অযোগ্য, তাকে সে বিয়ে করেছে সম্পত্তি রক্ষার জন্যে; মহৎ অম্বরনাথও স্বামীর অধিকার দাবি না ক'রে রাজি হয়েছে তাকে উদ্ধার করতে; তবু বাণীর 'মনে হইতে লাগিল, আজ এ গৃহের সম্রাজ্ঞী সে হইলেও এ ব্যক্তি তাহার প্রভু। তাহার উপর যেন ইহার একটা দখলী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে।' তার মনে জাগে হিন্দু নারীর মহাপ্রশ্ন : 'হিন্দুর সব ভাল, কেবল এইটিই বড় মন্দ। বিবাহ করিতে হইবে। কেন,– এমন কঠোর নিয়ম, কেন? মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া এতই কি মহাপাতক করিয়াছি... যিনি আমারই অন্নে প্রতিপালিত হইবেন, তিনিই হইবেন, আমার প্রভু?' যে-বিয়েকে এতো ঘেন্না করে নারী, তাতেই বসতে হয় তাকে। বিয়ের পর বাণী মিলিত হয় নি স্বামীর সাথে, তার স্বামী দেবতার অধিক মহত্ত্ব দেখিয়ে দূরে চ'লে গেছে। তবে অনুরূপা দেবী এর পর বাণী ও নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বাণীকে দীক্ষিত করতে থাকেন পিতৃতন্ত্রের বিধিবিধানে, স্বামীকে ক'রে তুলতে থাকেন দেবতা। তিনি ছক ভেঙেছেন শুধু ছকটিকে আরো শক্ত ক'রে নির্মাণ করার জন্যে। তিনি বাণীর মধ্যে ঢোকাতে থাকেন বেদমন্ত্র, তাকে ক'রে তুলতে থাকেন মহাসতী : 'বাণী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। হিন্দুর মেয়ে যে স্বামীর সহিত হাসিমুখে কেমন করিয়া জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া বিচ্ছেদের শান্তি করিত আজ তাহা বুঝিলাম। এ যে কি অচ্ছেদ্য বন্ধন!... সেই যে কালমন্ত্র... সেই অনুজ্ঞার সম্মোহনবিদ্যা প্রভাবে লুপ্তচৈতন্যবৎ হইয়া পত্নী সেই দিনই পতির হৃদয়ে হৃদয়, চিন্তায় বাক্যে চিন্তা বাক্য সমস্তই সঁপিয়া দেয়; তাহার আর স্বাতন্ত্র্য কিছুই বাকি থাকে না।' অনুরূপা বাণীর কানে বাজাতে থাকেন পিতৃতন্ত্রের গীতিকা : 'তাহার কানের কাছে সেই মুহূর্ত্তে যেন বাজিয়া উঠিল, "স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন অন্য সুখ নাই, অন্য কামনা নাই, এমন কি, অন্য দেবতাও নাই।"– সে ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল। এ কি মার কথা– না দেবতার আদেশ?' এটা আসলে পিতৃতন্ত্রে দীক্ষিত অনুরূপার চক্রান্ত।

অনুরূপা বেদমন্ত্র দিয়ে বাণীকে পুরুষপুজোয় আগ্রহী ক'রে তোলেন : 'যদি প্রতিমায় তাহার পূজা করি, তবে মানুষের মধ্যেই বা না করি কেন?' লেখিকা বাণীকে ক্রমশ দীক্ষিত করতে থাকেন পিতৃতান্ত্রিক বিধানে, আলোর নামে তাকে ঠেলে দিতে থাকেন অন্ধকারে : 'এইরূপে তাহার জীবনে একসঙ্গে দুইটী আলো জ্বলিয়া উঠিতেছিল,– নারীজীবনের সারধর্ম্ম পতিপ্রেম, অপরটী সকল প্রেমের সার ভগবৎপ্রেম।' বাণীর মধ্যে তিনি জাগিয়ে তোলেন ছকবাঁধা এক নারীকে : 'স্বামী স্ত্রীর গুরু কেন, আজ তাহা বুঝিতেছি। আর কে আমায় এমন করিয়া এ শিক্ষা দিতে পারিত?' অনুরূপা কাজ করেছেন পুরুষতন্ত্রের চর হিশেবে; তিনি নারীকে প্রথম নিজের অধিকার দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পরে বেঁধেছেন শেকলে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নিজের লিঙ্গের সাথে। তাঁর চক্রান্তে বাণী হয়ে ওঠে পুরুষের প্রিয় ছকবাঁধা নারী : 'সেই ভস্মমুষ্টি পরে পতিপ্রেমের অমৃতাভিষেকে এবং নির্ব্বাসিত অম্বরের মন্ত্রশক্তি তেজে তপঃপূত-চরিত্রা,

ব্রহ্মচারিণী, স্নেহ প্রেম করুণার জীবন্ত মূর্ত্তি এক সতী নারীর প্রতিষ্ঠা করিল।' বাণী সমগ্র নারীজাতিকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে স্বামী ও পিতৃতন্ত্রের পায়ে : '"হ্যাঁ, তোমার বাণী, তোমারই স্ত্রী, তোমারই দাসী, তোমারই সহধর্ম্মিনী।...আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, তবু আমি তোমার স্ত্রী, তোমার শিষ্যা-তোমার দাসী। আমায় ক্ষমা করিবে না কি?"' যে-বাণী স্বামীর দেহও কখনো ছোঁয় নি, সে মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্যে অবতীর্ণ হয় সতীরূপে : 'এ নূতন জন্মে মৃত্যুর কাছে তোমায় ভিক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে তোমায় আমি আমার কর্‌ব। পার্‌ব না? কেন পার্‌ব না? সাবিত্রী তার মৃত স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন,– আর আমি পার্‌ব না?– কেন, আমি কি সতী স্ত্রী নই?' বেদমন্ত্রদীক্ষিত এ-আধুনিক সতী তার স্বামীকে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রয়োগ করে এ-পদ্ধতি : 'তাহার মনের মধ্যে কোথা হইতে এ প্রতীতি সুদৃঢ় হইয়া উঠিল, যে তাহা হইলেই সে তাহার এই মৃত-কল্প স্বামীকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিবে। তাহার শোণিতোষ্ণতাহীন নীল শিরার উপর সে নিজের উষ্ণশোণিত প্রবাহিত ধমনী একাগ্রচিত্তে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল, যেন সেই সঙ্গে কোন্ অদৃশ্য শক্তিবলে সে আপনার শরীর হইতে তপ্ত শোণিত ধারা তাঁহার অঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া দিতেছে,... সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার এক সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল সেই সর্ব্বসমাহিত সতী চিত্তের সমুদয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সে তাহার মৃতবৎ স্থির স্বামীর দেহে আপনার জীবন হইতে জীবনী-ধারা ঢালিয়া দিতে চাহিতেছিল।' বেদমন্ত্র চিকিৎসাপদ্ধতিতে সে সফল হয়েছে কিনা অনুরূপা দেবী তা বলেন নি, তবে তিনি সফলভাবে একটি নারীকে বিন্যস্ত করেছেন পিতৃতন্ত্রের ছকে। নারীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে অনুরূপা অর্জন করেছিলেন জনপ্রিয়তা।

নিরুপমা দেবীর *দিদি* (১৯১৫) চেতনায় ও কাঠামোয় অনুরূপার *মন্ত্রশক্তির* সাথে অভিন্ন; এতেও প্রচার করা হয়েছে পিতৃতন্ত্রের বিধান। অনুরূপা ও নিরুপমা, দুজনেই, ব্যবহার করেছেন একই ছক : *মন্ত্রশক্তিতে* বাণী সারা উপন্যাস জুড়ে নিজের দেহ রক্ষা করেছে স্বামীর কবল থেকে, শেষে আত্মসমর্পণ করেছে মৃত স্বামীর পায়ে; *দিদির* সুরমাও স্বামীকে দেহ দেয় নি, কিন্তু উপন্যাসের শেষ পাতায় আশ্রয় নিয়েছে স্বামীর পায়ে। তাঁদের উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়গুলো নারীর জন্যে প্রলোভন, মাঝের অধ্যায়গুলো নারীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত, আর শেষ পৃষ্ঠাগুলো বিশ্বাসঘাতকতা। কালিগঞ্জের জমিদারকন্যা সুরমা দাসীর বিয়ে হয় মাণিকগঞ্জের জমিদারপুত্র ডাক্তার অমরনাথের সাথে। তারা একটি বাসর রাত কাটিয়েছিলো পরস্পরকে না ছুঁয়ে– 'যথারীতি পাকস্পর্শ ফুলশয্যা সমস্ত হইয়া গেল। অমরনাথ ফুলশয্যার দিন জড়সড়ভাবে কোন রকমে খাটের এক পার্শ্বে শুইয়া রাত কাটাইয়া দিল। তাহার লজ্জা করিতেছিল। কন্যাটি নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়; তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে পারে।' পরে আকস্মিকভাবে অমরনাথ বিয়ে করে অনাথ চারুলতাকে। সুরমা এজন্যে স্বামীকে ক্ষমা করে নি; স্বামীকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হয় নি তার পক্ষে, তবে স্বামীকে সে গণ্য করেছে পরপুরুষ হিশেবেই। *বিষবৃক্ষ*-এ কুন্দকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিলো, *দিদি* যেনো তার উত্তর; চারুলতাকে আত্মহত্যা করতে হয়

নি, বরং সে-ই উপভোগ করে অমরনাথের স্ত্রীর ভূমিকা। সুরমা হয় তার দিদি। অমরনাথ ও সুরমা এক বাড়িতে থেকেও কখনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আসে নি। নারীদের উপন্যাসে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার স্বামী-স্ত্রীর দূরত্ব, এ-উপন্যাসে তা চরম রূপ নিয়েছে।

অমরনাথ চারুলতাকে বিয়ে করার পর তার পিতা তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছে, কিন্তু সে পুত্র, তাকে ত্যাগ করা অসম্ভব; বরং তার পিতা মৃত্যুর আগে পুত্রবধু সুরমাকে দেবীর বেদিতে বসিয়ে উৎসর্গ ক'রে যায় সুরমার জীবনটি : 'মা, আমি একে তোমার হাতে দিয়া গেলাম। এ তোমার ছোট বোন। ছোট-বৌমা, তোমার দিদিকে প্রণাম কর। ইনি দেবী।' সুরমা চরম ঘৃণায় মেনে নেয় দেবীর ছক, সে হয় এমন দেবী যে ঘৃণা করে স্বামীকে : 'অমরকে যে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া সে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিয়া একটি বিজয়ানন্দে সুরমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।' নিঃশব্দ বিরোধই হয়ে ওঠে তাদের জীবন। এতে অবশ্য অমরনাথের জীবনে কোনো শূন্যতা দেখা দেয় নি, সে চারুলতাকে নিয়মিতভাবে গর্ভবতী করেছে; চরম শূন্যতায় দিদির দেবী মহিমার জ্বালার মধ্যে বাস করেছে সুরমা। দেহ তাকেও পীড়িত করেছে; কিন্তু তার কাজ সহ্য করা : 'জীবনের প্রথম-যৌবনের আকুল বাসনার পুষ্পগুলি পরার্থপরতার দীপ্ত হোমানলে ভস্ম করিয়া ফেলিয়া তাহার হৃদয় কি একটুও বলিষ্ঠ হয় নাই? জীবনের স্নেহ, ভালবাসা, আশা, তৃষ্ণা এতগুলি জিনিস এক নিমেষে পান করিয়া তাহার মৃত্যুঞ্জয় কঠিন প্রাণ কি এখনও এত দুর্ব্বল? না, এ প্রাণকে সবল করিতেই হইবে।' সে জানে, 'তাহার জীবনের সমস্তটা একটা খরচেরই তালিকা–তাহার জমার ঘর একেবারে খালি।' তার স্বামীও তাকে মনে করে আত্মোৎসর্গিত দেবী : 'অমর ভাবিত, চারু– চারু– চারুই তাহার স্ত্রী,... সুরমার কাহারও সহিত বিবাহ হয় নাই, হইতে পারে না, কেন না পৃথিবীর কেহ কি সে? না। সে দেবী, শুধু স্নেহ দিবার জন্যই সে সংসারের সহিত আবদ্ধ।' কিন্তু তার চোখে অমরনাথ 'সপত্নীপ্রণয়ে অবিচারক স্বামী'। অমরনাথ এক সময় প্রলুব্ধ বোধ করে সুরমার প্রতি, সুরমা তা প্রত্যাখ্যান করে; কেননা 'বলা কি যাইত না, "আজ তুমি আমায় যাহা দিতে আসিয়াছ, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোথায় ছিল? আমার নবীন বাসনাময় তরুণ-যৌবনের প্রথম আগ্রহ যে অন্ধের মত চাহিয়া দেখে নাই বা দেখিতে ইচ্ছা করে নাই, সেই তুমি! সেই অবিচারক তুমি!... যাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যের চরণতলে উপহার দিয়াছিলে, তাহাই আবার আজ আমায় দিতে চাও?' স্বামীর সাথে বাঙালি নারীর সম্পর্ক যে পারস্পরিক প্রতিপক্ষের, তা সুরমাও বোধ করে : 'তাহাকে সুরমার এখন তাহার জীবনের সুখস্বর্গ হইতে ভ্রষ্টকারী দুরদৃষ্ট বলিয়া জীবনের সর্ব্ব জ্বালাযন্ত্রণার মূলীভূত রুষ্ট কুগ্রহ বলিয়া, জন্মের সুখদুঃখের নিয়ন্তা, জন্মকেন্দ্রস্থিত দুষ্ট নক্ষত্র বলিয়া মনে করিত।' বাঙালি নারীর চোখে দেবতা হয়ে ওঠে দুষ্ট নক্ষত্র, একে যুগান্তর বলা যায়।

কিন্তু এ-সুরমাকে অবশেষে নিরুপমা বিন্যস্ত করেন পুরুষতন্ত্রের ছকে; চাপিয়ে দেয়া দেবীর ভূমিকা পালন ক'রে যে ক্লান্ত, যার জীবনে পুরুষের প্রয়োজন প্রায় কেটে গেছে,

নিরুপমা বিশ্বাসঘাতকতা করেন তার সাথে, উদ্যোগ নেন তাকে অনিচ্ছায়-মেনে-নেয়া দেবীর আসন থেকে দাসীর আসনে বসানোর। তবে তিনি দাসীর গ্লানিকে অস্বীকার করেন নি : 'একদিন একস্থানে একজনকে সে 'না' বলিয়া গিয়াছিল, সেইস্থানে সেই ব্যক্তিকে আর একবার বলিতে হইবে 'হ্যাঁ'। বলিতে হইবে, নারী-জন্মের দোষ, ভাগ্যের দোষ, সর্ব্বোপরি বিধাতার দোষ। বলিতে হইবে "হে দেব, তোমারই জয় হইয়াছে!– আর কেন– সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছি, সব পুড়িয়া গিয়াছে, এখন এ হোমাগ্নি নিবাও।" প্রণাম করিয়া বলিতে হইবে, "ভস্ম তিলক ললাটে প্রসাদচিহ্ন-স্বরূপ নির্ম্মাল্য-স্বরূপ দাও। তুমি তৃপ্ত হইয়াছ, এখন আমায় মুক্তি দাও।' নারীজন্মের অপমান ও যন্ত্রণাকে নিরুপমা অস্বীকার করেন নি, তবে মেনে নিয়েছেন; তিনি যেনো জানেন জয় নারীর জন্যে নয় : 'তাহার পরাজয় যেন তাহারা দিব্যচক্ষে দেখিয়াই বসিয়া আছে। এমনি নারী-জন্ম লইয়া সে আসিয়াছে! ধিক!' সুরমা নিজের জীবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর উপন্যাসের শেষে বিসর্জন দেয় তার অস্তিত্বকেও; বলে, 'নারীর দর্প তেজ অভিমান কিছু নেই,... কেবল ভালবাসা, কেবল দাসীত্ব... ।' নিরুপমা সুরমাকে অবশেষে বসিয়েছেন পুরুষতন্ত্রের পদতলে : 'সুরমা সহসা নতজানু হইয়া স্বামীর পাদমূলে বসিয়া পড়িল। দুই হস্তে অমরের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া অজস্রবাষ্পবারিসিক্ত মুখ ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "কেবল-- এইটুকু, আর কিছু নয়। আমায় কোথায় যেতে বল? আমার স্থান কোথায়? আমি যাব না।"' নিরুপমা তাঁর অপচয়িত দেবীকে পরিণত করেন অসহায় দাসীতে, জানিয়ে দেন যে নারীর মুক্তি নেই; নারীকে বন্দী থাকতেই হবে ছকে ও যন্ত্রণায়। নিজের লিঙ্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার এটা এক স্মরণীয় উদাহরণ।

নিরুপমা *শ্যামলীতে* (১৯১৮) নিয়েছেন শ্যামলী নামের এক 'কালা বোবা পাগলী'কে, কাব্যিক নামটি ছাড়া আর সবই যার শোচনীয়। তাঁর নায়িকা যে কালা বোবা পাগলী, এটা তাৎপর্যপূর্ণ। নিরুপমা হয়তো এমন একটি নায়িকা বেছে নিয়েছিলেন চরম ভাবাবেগ উৎপাদনের জন্যে, কিন্তু এটাকে আমার মনে হয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ . নারীমাত্রই, পুরুষতন্ত্রের কাছে, কালা বোবা পাগলী; তারা যতোই শুনতে বলতে চিন্তা করতে পারুক। পুরুষতন্ত্র সব নারীকেই কালা বোবা পাগলী ক'রে রেখেছে। শ্যামলী কালা বোবা পাগলী, তবে তাকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত হয়েছে সব কিছু। শ্যামলী নারীর চরম দুর্দশার রূপ, তবে নিরুপমা তাকে দিয়েছেন এমন একটি স্বামী, যে তাকে মানুষের জীবন দিয়েছে। পুরুষের ওপর দিয়েছেন তিনি কালা বোবা পাগলীকে অর্থাৎ নারীকে মানুষ ক'রে তোলার ভার। এ-কাহিনী বাস্তবের নয়, ইচ্ছাপূরণের; সব নারীই যদি পেতো এমন পুরুষ, তাহলে তাদের জীবন মানুষের জীবন হয়ে উঠতো। শ্যামলী নারী, তার জীবন নিষ্ফল হওয়ার জন্যে এ-ই যথেষ্ট, তার ওপর সে কালা বোবা পাগলী; অন্যরা ও নিরুপমা তাকে বার বার 'জন্তু', 'জানোয়ার' ব'লেই নির্দেশ করেছেন। সমস্ত নারীর মতো বিয়েই তার প্রধান সংকট। তার বিয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিলো না; কিন্তু তার পিতার এক উন্মত্ততায় তার বিয়ে হয়ে যায় তারই ছোটোবোনোর বর অনিলের সাথে। শ্যামলী নিজের জন্যে যতোটা সমস্যা, তার চেয়ে

বড়ো সমস্যা পিতার জন্যে : 'কিন্তু কালা বোবা এবং পাগল এই ত্রিবিশেষণ-বিশিষ্টা কন্যাকে নামে মাত্র সম্প্রদানের জন্য ও স্বজাতি এবং সমকুলস্থ এমন কোন পাত্রই তিনি তখন খুঁজিয়া পাইলেন না যে তাঁহাকে জাতিচ্যুতি হইতে রক্ষা করে।' তাই পিতা এক অদ্ভুত উন্মাদের কাজ করে; তার ভাষায়, 'আমি সমাজের এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যই এই অভাগা জীবটাকে একবার গোটাকতক মন্ত্র পড়িয়ে বিজলীর বিয়ের আগে সম্প্রদান করে নিলাম মাত্র।' শ্যামলী তার বাবার চোখেও 'একটি জানোয়ার মাত্র'। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সে মন্ত্র পড়িয়ে নেয়, তবে মেয়েকে বাঁচানোর কোনো আগ্রহ তার নেই; সে অনিলকে বলে, 'এখন এ ঘটনা তুমি মন থেকে শীগ্‌গিরই মুছে ফেলো, ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কোরো– সুখী হয়ো, এই আমার তোমায় আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।' অনিল আদর্শবাদী পুরুষ; সে শ্যামলীর ছোটো বোন বিজলীকে আর বিয়ে করতে রাজি হয় নি, বরং তখনি বিজলীর বিয়ের ব্যবস্থা করেছে বন্ধু শিশিরের সাথে। এরপর নিরুপমা দীর্ঘ কাহিনী ব'লে একটি আদর্শবাদী স্বামীকে দিয়ে শ্যামলীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীবনে। নিরুপমা নারীকে প্রথাগত ছক অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সাথে সাথে প্রকাশ করেছেন নারীর বেদনা। অনিল তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসার পর শ্যামলীর অব্যক্ত আর্তনাদে প্রকাশ পায় সব নারীর যন্ত্রণা : 'মাগো– কোথায় তুমি! এ আমি কোথায় আসিলাম মা?... এখানে যে আমি আর একদণ্ডও বাঁচিতে পারিতেছি না।' পৃথিবীতে পা দিয়ে প্রতিটি নারীই এমনভাবে চিৎকার ক'রে উঠতে পারে।

শ্যামলীর ভাগ্য ভালো সে অনিলের মতো দেবতার পায়ে পড়েছে। অনিল আর বিয়ে করতে রাজি হয় নি, এটা তার মহত্ত্ব; তবে শ্যামলীর কি রয়েছে আবার বিয়ের অধিকার? অনিলের মনে নিরুপমা যে-প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন, সেটি আসলে নারীর প্রশ্ন : 'সমাজ পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিবে আর স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা খাটিবে না, সেই জন্যই কি এ ব্যবস্থা? এই অর্দ্ধমনুষ্য প্রাণীটির পক্ষেও কি এই নিয়ম! অনিলের যদি এ বিবাহ অসিদ্ধ হয়, তাহারই বা কেন না হইবে? তাহাকে আর কেহ বিবাহও করিবে না এবং যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহারও গ্রহণযোগ্য সে হইবে না? তবু অনিলকে মনে মনে স্বামী বলিয়া তাহাকে চিরদিন জানিতে হইবে। তাহার বিবাহের সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্য ভয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, সেইজন্যই তাহার জানিতে হইবে তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার স্বামী আছে, অমুক তাহার স্বামী!' অনিলের বন্ধু ব্যক্ত করেছে পুরুষতন্ত্রের সিদ্ধান্ত : 'তুমিও জান এবং আমিও জানি যে স্ত্রীপুরুষের এ সাম্যবাদের নীতি বহু দেশে বহু তর্কের সঙ্গে চললেও সমত্ব কখনই মানুষে তাদের দিতে পারবে না। কিসে পারবে-প্রকৃতিই যে তাদের দুর্ব্বল করে রেখেছে।... হাজার শিক্ষা দাও, সুবিধা দাও, স্বাধীনতা দাও, ভগবান তাদের নীড় বাঁধবার জন্যেই তৈরী করেছেন; তর্ক মীমাংসা শ্রুতি স্মৃতি ঘাঁটবার জন্যে বা যুদ্ধ করবার জন্যে নয়।... সাধারণতঃ নারীদের ভগবান স্নেহদুর্ব্বল স্বভাবদুর্ব্বল করে যে সৃষ্টি করেছেন।...গৃহের মেরুদণ্ড স্বরূপেই ভগবান স্ত্রীজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা শিক্ষাদীক্ষা বা অন্যান্য সব অধিকারে পুরুষের তুল্য হোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁরা এই

গৃহকে না অতিক্রম করেন, তাঁদের নারীত্ব না ভুলে যান! তা হলেই ধর্ম্মনাশ হবে!' নিরুপমা প্রথাগত, তবে তিনিও পুরুষতান্ত্রিক এ-বক্তৃতায় বিশ্বাস করেন না।

অনিল আদর্শবাদী হ'লেও নিরুপমা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়েই শুধু অনিলকে দিয়ে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়েছেন শ্যামলীকে। অনিলকে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত ক'রে কুৎসিত পুরুষে রূপান্তরিত করেন। যখন সে সুদর্শন ছিলো, যোগ্য ছিলো যে-কোনো রূপসী তরুণীব স্বামী হওয়ার, তখন সে তার আদর্শবাদ সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় শ্যামলীকে স্ত্রী হিশেবে গ্রহণ করতে পারে নি, পেরেছে বসন্তে বিকৃত হয়ে যাওয়ার পর। একটি বিকৃত কুদর্শন পুরুষ একটি 'অর্দ্ধমনুষ্য', 'অসম্পূর্ণ জীব'কে স্ত্রী হিশেবে নিতে পারে, এটা সমাজের কাছে স্বস্তিকর; একটি যোগ্য পুরুষ গ্রহণ করবে একটি অযোগ্য নারীকে, এটা স্বস্তিকর নয়। সে জন্তুর সমতুল্য হ'লেও মাঝে মাঝে দেখা যায় তার 'কেমন এক রকম দৃষ্টি,– মুখের ও সারা অঙ্গের বিদ্রোহসূচক ভাব!' অনিল তাকে মূক-বধিরদের শেখানোর রীতিতে শিক্ষা দিতে থাকে, জাগিয়ে তুলতে থাকে তার 'প্রকৃত নারীত্ব'। তার নারীত্ব জেগে ওঠে ঈর্ষার মধ্য দিয়ে : 'এই অর্দ্ধমনুষ্য জীবটি, যাহাকে এতদিন উন্মাদ জড় বলিয়াই সকলে জানিত, অনিলও যাহাকে এতদিন পূর্ণ নারী বলিয়া অনুভব করিতে পারে নাই, যাহার বুদ্ধি স্নেহ ভালবাসা রাগ বা দুঃখ সমস্ত একেবারে এতদিন বালকের মতই ছিল, সেই শ্যামলীতে নারীত্বের এই নিকৃষ্ট অংশটি সহসা এমনই ভাবে কি ফুটিতে পারে? সে হিংসা করিতেছে?' নিরুপমা প্রশ্ন করেছেন : 'এই ঈর্ষা, নারীত্বের এই রহস্য, এ যে বিধাতারই নিজহস্তে দত্ত নারী-জীবনের অভিশাপ!– ইহা হইতে কোন্ নারী মুক্ত?' বিধাতা যে-শ্যামলীকে জন্তু হিশেবে সৃষ্টি করেছিলো, অনিল, এক পুরুষ, তাকে পুনরায় সৃষ্টি করে মানবী ও দেবীরূপে : 'সেই জড়বুদ্ধিসম্পন্না অর্দ্ধোন্মাদ শ্যামলীতে প্রথমে মানবীত্ব আনিয়া পরে ক্রমশঃ তাহতে আজিকার এই দেবীত্বের স্ফুরণ ইহাও অনিলের জীবন-ঢালা ব্রতেরই ফল বলিয়া রেবার মনে হইল।' *শ্যামলী*তে একটি জন্তুকে উন্নীত করা হয়েছে ছকবাঁধা নারীর স্তরে, এতে ভূমিকা পালন করেছে একটি পুরুষ; পুরুষই হয়ে উঠেছে নারীর স্রষ্টা।

শান্তা দেবীর *জীবনদোলা* (?১৯৩৮) সচেতনভাবে লেখা হয়েছে নারীমুক্তির বাণী প্রচারের জন্যে, তবে তিনি বিধবার বিয়ের অধিকারকেই গণ্য করেছেন মুক্তি ব'লে। উপন্যাসটি আট বছর বয়সে বিবাহিত বালবিধবা গৌরীর উপাখ্যান। দু-খণ্ডে তিনি কাহিনী বলেছেন : প্রথম খণ্ডে দিয়েছেন বালিকা গৌরীর বিধবাজীবনের দুর্দশার বিবরণ, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণনা করেছেন ওই জীবন থেকে মুক্তির কাহিনী। প্রথম খণ্ডটির কোনো কোনো অংশ মর্মস্পর্শী, তবে দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি গৌরীকে মুক্ত করার জন্যে যে-কাহিনী তৈরি করেছেন, তা আবেদন জাগায় না। রচনা হিশেবে আলোচিত ছটি উপন্যাসের মধ্যে *জীবনদোলাই* সবচেয়ে দুর্বল। শান্তা দেবী জীবন উপস্থাপনের থেকে প্রচারে বেশি মন দিয়েছেন ব'লে লক্ষ্য অর্জনেও তিনি সফল হন নি; তবে তাঁর কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি নারীকে মুক্ত ক'রে ছক থেকে বের ক'রে আনতে চেয়েছেন। শুরু থেকেই তিনি বিয়ে ও পুরুষবিরোধী মনোভাব প্রচার করেছেন; তাঁর অবোধ বালিকা গৌরী বলে, 'ছাই বর! আমাকে মার কাছ থেকে আবার নিয়ে যাবে!... আমি ধুতি পরব, চুল কেটে ফেল্‌ব;

মেয়েমানুষ হব না। আমি ঘরে-ঘরে বিয়ে কর্‌ব।' গৌরী যেনো প্রতিশোধ নিতে চায় পুরুষের ওপর। বিয়ের পর গৌরী একবার শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিলো : 'একরাত্রি নয় আট রাত্রি এই অজানা পুরীতে ভয়ে শোকে দুঃখে অনিদ্রায় অর্দ্ধনিদ্রায় মাতৃক্রোড়চ্যুতা গৌরীর প্রাণ কাঁদিয়াছিল', ফেরার পর দু-বছরেও তার 'মন হইতে শ্বশুরবাড়ীর সে বিভীষিকার ছবি' মোছে নি। গৌরীর ভাগ্য সে 'বাড়ীর বড় আদরের মেয়ে'। তার বাবা 'আট বছরের মেয়েটাকে দান করে পুণ্য সঞ্চয়' করতে গিয়েছিলো; তার জন্যে যা পুণ্য গৌরীর জন্যে তা হয়ে ওঠে বিনাশ। তার শ্বশুরবাড়ি খবর যায় যে 'বিধবা মেয়েকে হরিকেশব সধবা বেশে ত রাখিয়াছেনই তাহার বৈধব্যের খবর পর্য্যন্ত তাহাকে জানিতে দেন নাই।' এটা গৌরীর শ্বশুরবাড়িতে উত্তেজনা সৃষ্টি করে; এক আশ্রিতা বিধবা ব'লেই বসে, 'তোমার বেয়াই মেয়েকে কল্‌মা পড়াবে, নিকে দেবে।' নারীর বিরুদ্ধে নারীও কাজ করতে পারে নিপুণ ও নিষ্ঠুরভাবে। গৌরীর বাবা পুরুষ, তবে মানুষ; তাই মেয়ের জীবনকে কিছুটা স্বস্তিকর ক'রে তোলার জন্যে তিনি মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তীর্থভ্রমণে। তার বাবা জানে, 'তারা [পুত্ররা] যে পুরুষ। সংসারে তারা লড়তে জন্মেছে, সংসার তাদের লড়বার অধিকারও দিয়েছে। আর এ অসহায় শিশু বালিকা; মেয়ে হ'য়ে জন্মানোই এদেশে তার এক পরম দুর্ভাগ্য, তার উপর নূতন একটা দুর্ভাগ্যের বোঝা আজীবনের জন্য তার কচি মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।' গৌরী অবশ্য জানে না সে বিধবা, সে বোঝে না বিধবা কাকে বলে; তবে পিতৃতন্ত্র তাকে এর মাঝেই বিধবার শাস্তি দেয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছে।

শান্তা দেবী গৌরীর বাবামার মনে প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন : 'সেই তরুণ শৈশবের দেখা অপরিচিতপ্রায় একটি বালকের তিরোধানে তাহার জীবনমুকুল সমাজের চক্ষে চির-অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে?... কিন্তু অচেনা মানুষের অজানা মৃত্যুতে শিশুকেও যে চির-সন্ন্যাসের বোঝা বহিয়া অপমান ও লাঞ্ছনায় আজীবন কৃত্রিম শোকের অভিনয় করিয়া যাইতে হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হয়, সে-কথা তাঁহার এই আদরিণী অভিমানিনী বালিকা কন্যাকে তিনি কি করিয়া বুঝাইবেন?' গৌরী যখন জানতে পায় যে সে বিধবা, তখন তার অবস্থা : 'বাঙ্গালীর মেয়ে সে আপনার বঞ্চিত জীবনের কথা যতটুকু বুঝিল তাহাতেই নিরানন্দের ম্লান ছায়ায় তাহার ফুলের মত মুখখানি অন্ধকার হইয়া গেল। অজানা সেই মানুষের মৃত্যু তাহার কাছে যতই অর্থহীন হোক পৃথিবীর কাছে তাহার বহু অধিকার যে সেই মানুষটিই হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে হিন্দুর মেয়ের মনে সেকথা ধরা পড়িলই।' শান্তা দেবী চিরস্বামীত্বের ধারণাটিকে স্পষ্টভাবেই বাদ দিয়েছেন। এমনকি গৌরীর প্রথাগত মায়ের মনেও হিন্দুবিবাহের বিধান সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছেন : 'তরঙ্গিনীর স্বামীর কথা মনে পড়িল, "আবার যদি ওর বিয়ে হয়।" এমন পাপ কথা মনে আনিতে তাঁহার যতখানি ঘৃণা যতখানি লজ্জা হওয়া উচিত ছিল, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন কই সে লজ্জা, সে ঘৃণা ত তাহার মনে আসিল না।' শান্তা দেবী পুত্র ও কন্যার জীবনের দুই মেরুরূপের চিত্রও এঁকেছেন : 'এই ত্যাগ সমাজ তাহার নিকট জোর করিয়া আজীবন নিষ্ঠুর মহাজনের মত আদায় করিবে; তাহার পাঁচ ভাই যখন পিতার ঐশ্বর্য্যে ভোগ বিলাসে মাতিয়া থাকিবে তখন এই সকলের ছোট

বোনটি বঞ্চিত জীবনের বোঝা বহিয়া বিস্মৃত স্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করিবে।' গৌরী বোঝে না যে সে বিধবা, কিন্তু তার মুখে শান্তা এমন কথা দিয়েছেন, যেমন, 'আমার মেয়েকে আমি কখ্‌খনো বিয়ে দেব না। বাবা, শেষকালে যদি বিধবা হ'য়ে যায়' বা 'বিধবা হ'তে আমার ভাল লাগে না। কেন মা, আমি বাইরের লোকের জন্যে বিধবা হব?', যা তুলে ধরেছে পিতৃতান্ত্রিক বিধানের নিষ্ঠুরতা। শান্তা গৌরীকে আত্মোৎসর্গিত বিধবার ছকের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার মনে জাগিয়ে দিয়েছেন মুক্তির অভিলাষ : 'গৌরী ঠিক করিল এমন করিয়া পুতুলের মত দিন সে কাটিতে দিবে না। যেমন করিয়াই হউক একটা পথ তাহাকে করিতে হইবে।... তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে।' দ্বিতীয় বা *মুক্তি*খণ্ডে শান্তা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন গৌরীর মুক্তির গল্প বানাতে : তৈরি করেছেন তিনটি স্বদেশী যুবক, প্রতিষ্ঠা করেছেন হৈমবতীর কন্যাশ্রম, সেখানে বহু দুর্গত তরুণীর সাথে রেখেছেন গৌরীকে, এবং তরুণতরুণীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন প্রেমাবেগ। নারীকে মুক্ত করার জন্যে পরিশেষে দিয়েছেন দুটি প্লটবাঁধা যুগ্ম বিয়ে : বিধবা গৌরীকে বিয়ে দিয়েছেন সঞ্জয়ের সাথে, আর সঞ্জয়ের পিতার অবৈধ কন্যা চঞ্চলাকে বিয়ে দিয়েছেন গৌরীর ভাই শঙ্করের সাথে। ভাইয়েরা উদ্ধার করেছে পরস্পরের বোনদের। তিনি ছক ভেঙেছেন, নতুন ভাবমূর্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন; কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন উপন্যাস লিখতে এবং নারীর সপক্ষে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে।

নারীর ভবিষ্যৎ

নারী কি বিপন্ন? নারী কি এমন কোনো প্রজাতি, যা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে, বা ব্যাপক নিধনের ফলে পৌঁচেছে অবলুপ্তির প্রান্তে, যাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে? না, নারী এমন কোনো প্রজাতি নয়; নারী সংখ্যায় হ্রাস পাচ্ছে না, ব্যাপক সংহারেরও শিকার নয়, বরং গ্রহ জুড়ে বাড়ছে নারীর সংখ্যা। তবে প্রতি প্রজন্মের রক্ষণশীলেরাই আর্তনাদ করেছে : এখন আর খাঁটি নারী নেই, যারা ছিলো সুখ শান্তি কল্যাণ সতীত্ব পাতিব্রত্য প্রভৃতি রমণীয়তার আধার, তারা অবলুপ্ত হয়েছে। প্রতি প্রজন্মের প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের চারপাশে প্রাচীন পুণ্যময়ী নারীর বদলে বিকশিত হ'তে দেখেছে দানবী, যারা নষ্ট করছে সংসার, পতিকে পদচ্যুত করছে দেবাসন থেকে, এবং সন্দেহজনক যাদের সতীত্ব। উনিশশতকের বাঙলায় প্রাচীনার অবলুপ্তিতে আর্তনাদ করেছে পুরুষতন্ত্র; দিকে দিকে, সংসারবৃক্ষের ডালে ডালে, ঝুলতে দেখেছে 'বিষময় ফল'। বিষাক্ত নারী ফুল ফুটিয়েছে ফল ধরিয়েছে বিষবৃক্ষের। পুরুষের চোখে চিরকালই নারী নয়, নারীত্ব বিপন্ন, তাই পুরুষ সব সময়ই চেষ্টা করেছে নারীকে আদিম অবস্থায় রেখে দিয়ে 'নারীত্ব' উপভোগ করতে। নারীর মৃত্যুতে তাদের দুঃখ নেই, তাদের উদ্বেগ নারীত্বের মৃত্যুতে। নারীর সামনে সময় থাকে, নারীর বয়স বাড়ে, সময়ের কামড় বোধ করে নারী; কিন্তু নারীর কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না। পুরুষ এগোয় ভবিষ্যতের দিকে, নারী এগোয় বার্ধক্য ও ভবিষ্যৎহীনতার দিকে; তাই বিশশতকের শেষ দশকে পৌঁছেও মনে হয় নারীর কোনো ভবিষ্যৎ নেই, যদি নারী তা সৃষ্টি করতে না চায়। পুরুষের হাতে নারীর ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেয়ার অর্থ বিপন্নতা, পুরুষের হাতে পর্যুদস্ততা। প্রগতির অগ্রগতি ধারাবাহিক ব্যাপার নয়, প্রগতির পর প্রতিক্রিয়াশীলতা মাঝেমাঝেই দেখা দেয়; বিশশতকের শেষাংশে প্রতিক্রিয়াশীলতাই হয়ে উঠছে প্রবল, তাই তা নারীর জন্যে বড়ো আতঙ্কের কারণ। সব ধরনের প্রগতিশীলতা নারীর জন্যে শুভ, প্রতিক্রিয়াশীলতা অশুভ। পিতৃতন্ত্র যতো সংস্থা তৈরি করেছে,– পরিবার, বিয়ে, সমাজ, ধর্ম, বিদ্যালয় সবই মর্মমূলে প্রতিক্রিয়াশীল, এগুলোকে অনেক শতকেও প্রগতিশীল করা যায় নি; কেননা সমাজরাষ্ট্রে যারা অধিকার ক'রে আছে, তাদের জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলতাই আধিপত্য রক্ষার উপায়। কয়েক সহস্রক ধ'রে নারী ভবিষ্যৎহীন, বিশশতকের শেষাংশেও নারী ভবিষ্যৎহীন। তার সামনে অনেক শতাব্দী, কিন্তু তার সামনে ভবিষ্যৎ নেই।

পৃথিবী জুড়ে আগের থেকে নারীর অবস্থা কিছুটা ভালো, অবশ্য খারাপও হয়েছে অনেক দেশে : ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ও কয়েকটি মুসলমান রাষ্ট্রে দু-তিন দশক আগের থেকে অনেক শোচনীয় এখন নারীর অবস্থা। তবে অধিকাংশ দেশে আগের থেকে কিছুটা ভালো আছে নারী, কিন্তু বেশি ভালো নেই; এখন এমন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন মহাদেশে যে শিগগিরই নারীর অবস্থা হবে খুবই খারাপ। নারী এখন

কয়েকটি মুসলমান দেশ ছাড়া একা ঘর থেকে বেরোতে, ভোট দিতে, শিক্ষা লাভ করতে, কিছু পেশায় জড়িত হ'তে পারে, এবং কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে। শোনা যায় পৃথিবীর খুব উন্নতি ঘটেছে, ঘ'টে চলছে দ্রুত পরিবর্তন; কিন্তু ওই উন্নতি আর পরিবর্তন যতোটা কিংবদন্তি ততোটা বাস্তব নয়। গত আড়াই শো বছরের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর ঘটেছে নানা বাহ্যিক পরিবর্তন; মানুষ চাঁদে গেছে, ঘরে ব'সে আজ সারা পৃথিবী দেখা যায়, টেস্টটিউবে উৎপাদিত হচ্ছে শিশু, কিন্তু নারীকে এখনোও রেখে দেয়া হয়েছে আদিম অবস্থায়ই। সংখ্যাধিক্যবশত পৃথিবী নারীদেরই গ্রহ, কিন্তু তারা এখনো এখানে পরবাসী, পুরুষের শোষণসামগ্রী। পুবপশ্চিমে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, পুরুষতন্ত্রের কাছ থেকে কিছুটা সুবিধা আদায় ক'রে নিয়েছে কিছু নারী, কিন্তু অধিকাংশ নারীর অবস্থা শোচনীয়। গত দুশো বছরে গৃহপালিত পশুর অবস্থার যতোটা উন্নতি ঘটেছে নারীর অবস্থার ততোটা উন্নতি ঘটে নি। কিছু নারী এখন বিখ্যাত, কিছু নারী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তিধর, কিন্তু তা নারীর অবস্থার সূচক নয়; বিখ্যাত ও শক্তিধর নারীরাও পুরুষাধীন, পুরুষশোষিত; কেননা পৃথিবী পুরুষতান্ত্রিক।

নারীপুরুষের বিশুদ্ধ সাম্য কোথাও এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি; নারী তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার অধিকার পায় নি, যদিও তার অধিকার আন্দোলনের বয়স দুশো বছর। নারীর সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা ও বিধান তৈরি করছে এখনো পুরুষই, পুরুষই স্থির করছে কী মঙ্গলজনক নারীর জন্যে। শোষণমুক্তির জন্যে শোষিতরা এক সময় স্বপ্ন দেখেছে সমাজতন্ত্রের, কিন্তু সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা মুক্তির স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনাও নষ্ট ক'রে দিয়েছে; এবং যারা মনে করছে সমাজসংগঠন সম্পূর্ণ বদলে দিতে না পারলে মুক্তি আসবে না নারীর, তারা নারীমুক্তিকে সমর্পণ করছে অনিশ্চিত সময়ের হাতে। আসলে তারা চায় প্রথমে পুরুষের মুক্তি, পরে ভেবে দেখবে নারীর মুক্তি, সাম্য, অধিকার প্রভৃতির কথা। কবে সমাজসংগঠন সম্পূর্ণ বদলাবে, তার জন্যে যদি অপেক্ষা করতে হয় নারীকে, তাহলে হয়তো নারী সম্পূর্ণ ভুলে যাবে নিজের মুক্তির কথা। নারীমুক্তিকে সময়ের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না; সম্পূর্ণ সমাজসংগঠন বদলের অপেক্ষায়ও স্থগিত ক'রে রাখা যায় না নারীর মুক্তি। আর সমাজসংগঠন বদলালেই যে মুক্তি পাবে নারী, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই; কেননা দেখা গেছে সামজতন্ত্রের মধ্যেও নারী পুরুষের সমান অধিকার পায় নি। তবে সব ধরনের সমাজতন্ত্রই নারীর জন্যে মঙ্গলজনক, যদিও তা-ই যথেষ্ট নয়; নারীমুক্তির জন্যে দরকার সমাজতন্ত্রাতিরিক্ত কিছু: এবং গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের মধ্যেও অর্জন করা সম্ভব অনেক অধিকার। নারীর কোনো ভবিষ্যৎ নেই শুধু ধর্মতান্ত্রিক মৌলবাদের মধ্যে, মৌলবাদ নারীর চরম শত্রু। আড়াই শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো পৃথিবীর বাহ্যিক বদল ঘটিয়েছে, আভ্যন্তর বদল বিশেষ ঘটাতে পারে নি; মানব মন ও সমাজের আজো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি, মৌলিক বদল ঘটানো ওই আবিষ্কারগুলোর লক্ষ্যও নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর থেকে আজো মানুষের ওপর বেশি প্রভাবশালী পুরোনো পুরুষাধিপত্যবাদী সংহিতাগুলো, বিজ্ঞানকে ওগুলোকে প্রতিরোধ করার কাজেও ব্যবহার করা হয় নি; বরং বিজ্ঞানকে নতজানু ক'রে রাখা হয়েছে ওই সব পুরোনো কুসংস্কারের কাছে। তাই আধুনিক পৃথিবীও

যথেষ্ট আধুনিক নয়; এর ভেতরে আদিমতারই প্রাধান্য। নারী ওই আদিমতারই শিকার। বিজ্ঞান পুরুষতন্ত্রের নিজস্ব জিনিশ, তাই ব্যবহৃত হচ্ছে পুরুষতন্ত্র ও বিশেষ একগোত্র পুরুষের স্বার্থে।

যে-সব ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে পুরুষাধিপত্য ও নারী-অধীনতা, সেগুলো হচ্ছে পরিবার, বিয়ে, শিক্ষা, পেশা, রাজনীতি, ও ধর্ম। পিতৃতান্ত্রিক সব সংঘ আর ব্যবস্থাই নারীর বিরুদ্ধে। এগুলো প্রথাগত সমাজব্যবস্থা স্থায়ী ক'রে রাখার প্রয়াসে লিপ্ত। পুরুষাধিপত্য টিকিয়ে রাখার ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান পরিবার, বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র; রাষ্ট্র কাজ ক'রে চলছে পরিবারের মধ্য দিয়ে, তাই পুরুষতন্ত্র খুবই ব্যাকুল পরিবারসংগঠন অপরিবর্তিত রাখার জন্যে। পরিবারে আজো প্রধান পুরুষ; সমাজ তাকে এ-প্রাধান্য দিয়েছে, এবং এমন ব্যবস্থা করেছে, যাতে রক্ষা পায় তার প্রাধান্য। পুরুষকে দিয়েছে আর্থনীতিক অধিকার; আজো পুরুষই সাধারণত আয় ও সংসার ভরণপোষণ করে, তাই পুরুষই আধিপত্য করে সংসারে। নারী পরিশ্রম করে পুরুষের থেকে অনেক বেশি, তার শ্রম পুরুষের শ্রমের থেকে অনেক বেশি ক্লান্তিকর, কিন্তু তা নিরর্থক। দরিদ্র নারীদেব শ্রমের শেষ নেই, সংসার সচল রাখার পেছনে তাদের শক্তি তারা পুরোপুরি নিয়োগ করে; কিন্তু তাদের সাংসারিক শ্রমের কোনো মূল্য নেই। পৃথিবী জুড়ে এখন প্রধান শ্রমিক শ্রেণী নারী, তারা উৎপাদন করে দেশের অধিকাংশ সম্পদ, কিন্তু তাদের পারিশ্রমিক ন্যূনতম। বাঙলাদেশে এবার বৈদেশিক আয়ের প্রায় সবটাই উপার্জন করেছে নাবীরা, বস্ত্রবালিকারা; কিন্তু তারা তার ভাগ পায় নি, পরিবারেও তাদের স্থান গৌণ, সমাজে তারা অসম্মানিত। যে-বস্ত্রবালিকার আয়ে সংসার চলে, তার স্বামী বা পিতা হয়তো কোনো আয়ই করে না, কিন্তু সেই প্রাধান্য করে পরিবারে ও সমাজে। শিক্ষিত নারীদের বেলা একই ঘটনা ঘটে, তারা তাদের যোগ্যতাব থেকে আয় করে অনেক কম। তাদের, দরিদ্র নারীদের থেকেও, অনেক বেশি নির্ভর করতে হয় স্বামীর আয়ের ওপর; একা নিজের আয়ের ওপর নির্ভর করতে হ'লে অধিকাংশ শিক্ষিত নারীই বস্তিজীবন কাটাতে বাধ্য হতো। শিক্ষা আজো নারীকে আর্থনীতিক স্বনির্ভরতা দেয় নি; কাজে আসে নি নারীমুক্তিতে।

এক শ্রেণীর শিক্ষিত নারীই সহযোগিতা ক'রে চলছে পুরুষাধিপত্য ও নারী-অধীনতা রক্ষায়; ওই নারীরা পরগাছা, তারা আজো সুখ পায় সুখকর ক্রীতদাসীত্বে। নারীর প্রধান শত্রু শিক্ষিত গৃহিণীরা, যারা শিক্ষিত কিন্তু শুধুই গৃহিণী। ওই নারীরা শুধুই মাংস, তারা পুরুষের প্রমোদসঙ্গিনী, স্বামীর প্রমোদবালা; তারা বেছে নিয়েছে অধীনতা। তারা অনেক বেশি অসহায় শ্রমিক নারীর থেকেও, শ্রমিক নারী যে-স্বাধীনতা ভোগ করে তারা তাও ভোগ করে না, এবং স্বামী তাদের ছেড়ে দিলে পথনারী হওয়া ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা তাদের থাকে না। তারা এটা জানে, তাই নিজেদের স্বার্থে সেবা ক'রে চলে পুরুষতন্ত্রের; তাবা সুবিধার বিনিময়ে বাতিল ক'রে দেয় নিজেদের সত্তা ও স্বাধীনতা। শুধু নিজেদের নয়, তারা শত্রুতা ক'রে চলে স্বাধীন নারীর সাথে, নিজের স্বাধীনতা হারানোর পর অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট করা হয় তাদের কাজ। শিক্ষিত ধনী গৃহিণীরা

যে-সচ্ছলতার মধ্যে থাকে শিক্ষিত কর্মজীবী নারীরা সাধারণত ততোটা সচ্ছলতায় থাকে না; তারা বিচিত্র বিলাসের মধ্যে থেকে উপহাস ক'রে চলে কর্মজীবী শিক্ষিত নারীদের। তাদের কৃতিত্ব তারা ধনী স্বামী ধরতে পেরেছে। একটি শিক্ষিত নারী যখন দেখে সে কাজ করে, কিন্তু ওই বিলাস নেই তার জীবনে, তখন তার মনে এমন বোধ জন্ম নেয়া স্বাভাবিক যে শিক্ষিত না হয়ে বা পেশা গ্রহণ না ক'রে একটি ধনী স্বামী ধরাই ছিলো অনেক ভালো। এ-বোধটা আরো প্রবল হয়ে উঠতে পারে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে;–কোনো বালিকা যখন দেখে তার মায়ের মতো পেশা গ্রহণ ক'রে কষ্ট করার চেয়ে পাশের বাড়ির মহিলাটির মতো একটি ধনী স্বামী ধরলে জীবন অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, তখন সে স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছে ছেড়ে দিতে পারে। এমন ঘটছে এখন বাঙলাদেশে। পরগাছারা এখন এতো আকর্ষণীয় যে অনেক বালিকাই নিজের শেকড় গভীরে ছড়ানোর অভিলাষ ছেড়ে দিয়ে সোনালি পরগাছা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। পরগাছারা ওই বিলাস কেনে নিজেদের সত্তার বিনিময়ে, তারা সুস্বাদু মাংসের থেকে বেশি মূল্য পায় না।

বিয়ে ও সংসার আজো নারীর জন্যে প্রধান পেশা হয়ে আছে, প্রতিক্রিয়াশীলতা যেভাবে প্রবল হচ্ছে তাতে অচিরেই তা আবার একমাত্র পেশা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সমাজ নারীকে আজো হ'তে বলে সুগৃহিণী ও সুমাতা, তার কাছে দাবি করে সতীত্ব ও পাতিব্রত্য। সমাজ পুরুষকে দেয় বাস্তব শর্ত, অর্থাৎ পুরুষের কাজ সংসার চালানো; নারীকে দেয় নৈতিক শর্ত, তাকে হ'তে হবে সুমাতা, সুগৃহিণী, সতী। নারীর সুমাতা, সুগৃহিণীত্বকে ঐশী ভাবাদর্শে পরিণত করা হয়েছে নারীকে পুরুষাধীন রাখার জন্যে। মা হওয়ার অর্থ গর্ভধারণ, তবে সুমাতার অর্থ নারী গর্ভধারণ করবে সমাজসম্মতভাবে, সমাজের জন্যে, নিজের জন্যে নয়। গর্ভধারণ করবে নারী বিবাহিত হয়ে, বিবাহিত না হয়ে নারী সন্তান চাইতে পারবে না। এর অর্থ তার শরীর, তার জরায়ু তার নয়, তার মালিক পুরুষ ও পিতৃতন্ত্র। পুরুষ এসব বিধি প্রচার করেছে বিধাতার নামে, তবে এসব হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের সমাজ সংরক্ষণের বিধিনিষেধ। নারীর গর্ভধারণ একান্ত পাশবিক কাজ। নারীকে কি চিরকালই ধারণ ক'রে যেতে হবে গর্ভ, পালন ক'রে যেতে হবে পশুর ভূমিকা? গর্ভবতী নারী দেখতে অনেকটা গর্ভবতী পশুরই মতো, দৃশ্য হিশেবে গর্ভবতী নারী শোভন নয়, আর গর্ভধারণ নারীর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এক দিন হয়তো গর্ভধারণ গণ্য হবে আদিম ব্যাপার ব'লে, মানুষ বেছে নেবে সন্তানসৃষ্টির বিকল্প উপায়; তখন গর্ভধারণই নারীত্ব ব'লে মনে হবে না। নারী গর্ভধারণে আনন্দ পায় না। পুরুষতন্ত্রের শিক্ষার ফলে নারী আজো মনে করে গর্ভধারণেই তার জীবনের সার্থকতা, কিন্তু এটা তা নয়। অধিকাংশ নারী এখনই গর্ভধারণপ্রক্রিয়া থেকে রক্ষা পেলে আনন্দে তা গ্রহণ করবে; গর্ভবতী হওয়ার মধ্যে জীবনের কোনো সার্থকতা, মহত্ত্ব, পুণ্য নেই। এক সময় নিয়ত গর্ভিণী থাকাই ছিলো নারীর কাজ; এখন গর্ভের সংখ্যা কমেছে, তাতে ক্ষতি হয় নি, বরং সমাজরাষ্ট্র এই চায়। আমূল নারীবাদীরা মনে করেন মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নারীর নয়,

পুরুষকে উদ্ভাবন করতে হবে সন্তানসৃষ্টির বিকল্প পথ; এবং কয়েক শো বছর পর গর্ভধারণ যে আদিম পাশবিক কাজ ব'লে গণ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সুমাতার ভুল ধারণাও আজো প্রবল সমাজে। উনিশশতকে মনে করা হতো যে সুমাতার কাজ মহাপুরুষ জন্ম দেয়া ও লালনপালন করা। পুরুষতন্ত্রের 'মহাপুরুষেরা' নারীর কাছে বারবার সুমাতা দাবি করেছে. সমাজকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে নারী যদি তাদের সুমাতা দেয়, তবে তারা দেশকে উন্নতির চুড়োয় পৌঁছে দেবে। এর অর্থ নারী নষ্ট হয়ে গেছে. তার জরায়ুর অপরাধেই মহাপুরুষেরা সম্পন্ন করতে পারছে না দেশের উন্নতি; অর্থাৎ যে-অপরাধ তাদের, তারা তা চাপিয়ে দিয়েছে নারীর ওপর। উনিশশতক নারীর কাছে দাবি করে দলে দলে নেপোলিয়ন, জর্জ ওয়াশিংটন বিয়োনো; কিন্তু কারো পক্ষে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ওয়াশিংটন বা আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথ বা একটি একনায়ক জন্ম দেয়া সম্ভব নয়। আর যে-মায়েরা এ-ধরনের মহাপুরুষ জন্ম দিয়েছেন, তাঁরা যে সুমাতা ছিলেন, তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের মা তো রবীন্দ্রনাথকে লালনপালনই করেন নি, ওই মহাকবি পালিত হয়েছেন ভৃত্যদের দ্বারা। এটা প্রমাণ করে যে মহাপুরুষ লালনের জন্যে কোনো 'সুমাতা' দরকার করে না: এবং কোনো মায়ের পক্ষে লালনপালন ক'রে মহাপুরুষ তৈরি করা সম্ভব নয়। লালনপালনের ওপর মানুষের বিকাশ খুব নির্ভর করে না। সুমাতা বলতে সমাজ বোঝায় এমন মা. যে এমনভাবে চালাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া. যার ফলে তার সন্তানরা মেনে নেবে সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধ, এবং রোধ করবে সমাজের বিবর্তন। সুমাতার সন্তানরা পৃথিবীকে বদলায় না, তারা পৃথিবীকে অচল ক'রে রাখে। শিশু অবশ্যই মায়ের এবং পিতার কাছে থেকে স্নেহপ্রীতি ও অনেক কিছু পাবে. এটা তাদের অধিকার; কিন্তু প্রথাগত সুমাতা দরকার শুধু প্রথাগত সমাজ রক্ষার জন্যে।

প্রথাগত সমাজের আরেক রোগের নাম সুগৃহিণী। সুগৃহিণী হচ্ছে সে-নারী, যার জীবন নানা নিরর্থক কাজে ভারাক্রান্ত; যে একই কাজ বারবার করে, যার কাজ কখনো শেষ হয় না, যার জীবন হচ্ছে একই দিনের আমৃত্যু একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। এক সময় গৃহিণীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হতো সংসারের সমস্ত কাজ. এখন দরিদ্র নারীদের ওপরও ততোটা কাজের ভার নেই। সুগৃহিণীর সারাটি জীবনই অপব্যয়. এবং এক সময় তা হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর, নিঃসঙ্গ, নির্জীব। এক বালিকার যদি বিয়ে হয় আঠারো বছর বয়সে, বাইশ বছর বয়সের মধ্যে সে যদি দুটি সন্তান প্রসব ক'রে মুক্তি নেয় গর্ভধারণ থেকে. তাহলে চৌত্রিশ বছর বয়সে সে দেখবে তার সন্তান দুটি নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, স্বামী ব্যস্ত উন্নতি ও অন্য নারী নিয়ে, শুধু তারই হাতে কোনো কাজ নেই। সে যদি আরো ত্রিশ বছর বাঁচে, তাহলে ওই ত্রিশ বছর তাকে কাটাতে হবে অসীম ক্লান্তির মধ্যে। তখন তার পক্ষে অসম্ভব মানসিক রোগগ্রস্ত না হওয়া। তার জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, তার কোনো সত্তা নেই। এমনকি তার যৌন জীবনও তখন বিপন্ন। নারীকে ছেড়ে দিতে হবে গৃহিণীর ভাবমূর্তি যদি সে জীবনকে ক'রে তুলতে চায় তাৎপর্যপূর্ণ। এর মানে এ নয় যে সে স্বামীকে তালাক ও সন্তানদের ছেড়ে দিয়ে একলা

জীবন শুরু করবে এ-মুহূর্তেই। জরুরি হচ্ছে নারীকে একটি পেশা নিতেই হবে, আর সে-পেশাটি কিছুতেই সংসার হবে না।

দরিদ্র দেশগুলো যেমন দরিদ্র, তেমনই প্রথাগত্র। অধিকাংশ দেশে নারীর পেশা গ্রহণের সুযোগ নেই। বাঙলাদেশ এমন এক দেশ। শিক্ষিত নারীদেরই এখানে পেশা গ্রহণের সুযোগ কম, দরিদ্র নারীদের সুযোগ আরো অনেক কম; তবু এখানে দরিদ্র নারীরাই জীবিকার জন্যে পেশা গ্রহণ করে বেশি। তা গৃহপরিচারিকার পেশা হ'তে পারে, হ'তে পারে ছাইঅলির পেশা, বা ইঁটভাঙানির, বা বস্ত্রবালিকার পেশা। কোনো পেশাই নারীর জন্যে অস্বাভাবিক নয়;– পুরুষ যে-সব পেশা দখল ক'রে আছে, তার প্রতিটির জন্যেই নারী উপযুক্ত; এমনকি শারীরিক শ্রমের পেশায়ও। নারীর শারীরিক অশক্তি অনেকটা পুরুষতন্ত্রেরই সৃষ্টি; পুরুষ তার কাছে চেয়েছে অশক্তি, তাই নারী অশক্ত দুর্বল হওয়াকেই নিজের গুণ ব'লে মনে করেছে। নারীর পক্ষে হাল চাষ, মাছ ধরা, নৌকো বাওয়া কঠিন কাজ নয়; তবে নারী সাধারণত এসব করে না, কেননা সমাজ নারীকে তা করতে দেয় না। এক সময় নারীর জন্যে সমস্ত পেশাই নিষিদ্ধ ছিলো, আজ নিষিদ্ধ অধিকাংশ পেশা, যার ফলে রক্ষা পাচ্ছে পুরুষের প্রাধান্য। বাঙলায় নারীশিক্ষা এগিয়েছে অজস্র প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে, কিন্তু পুরুষতন্ত্র তা ব্যর্থ ক'রে দিতে কোনো আয়োজন বাকি রাখে নি। নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে বড়ো চক্রান্ত নারীর শিক্ষা নিষিদ্ধ করা নয়, সবচেয়ে বড়ো চক্রান্ত হচ্ছে শিক্ষিত নারীকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দিয়ে তাকে নিজের, পরিবার, ও সমাজের কাছে বোঝা ক'রে তোলা। এটা করা হয়েছে শিক্ষা ও পেশার থেকে বিয়েকে নারীর জন্যে প্রধান ক'রে রেখে। শিক্ষা যদি নারীকে আর্থনীতিকভাবে স্বাবলম্বী করে, তখন বিয়ে হয়ে ওঠে ঐচ্ছিক ব্যাপার; নারী তার শারীরিক বা মানসিক প্রয়োজনে বিয়ে করতে পারে, না‌ঃ করতে পারে। করা না-করা তার নিজের পছন্দ; কিন্তু শিক্ষিত নারীকেও পুরুষের ওপর আর্থনীতিকভাবে নির্ভরশীল ক'রে ব্যর্থ ক'রে দেয়া হয়েছে শিক্ষাকে; সফল ক'রে রাখা হয়েছে বিয়ে ও সংসারকে।

নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে এখন চলছে সুগভীর সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। বাঙালি মুসলমান সমাজে কয়েক দশকের নারীশিক্ষা নারীকে পরিণত করেছে পুরুষের শিক্ষিত প্রমোদসহচরী, শিক্ষিত পরিচারিকায়, অর্থাৎ নারীশিক্ষা উপকারে এসেছে পুরুষের, নারীর নয়। এক সময় নারীশিক্ষার যে-যৌনাবেদন ছিলো, বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্বে নারীশিক্ষা সে-আবেদনও হারিয়ে ফেলছে; শিক্ষিত স্ত্রী আর তরুণদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না। শিক্ষিত তরুণেরা এখন আকর্ষণ বোধ করছে অল্পশিক্ষিত কচি কিশোরীদের প্রতি, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত নারীর সাথে বসবাসের প্রাপ্তবয়স্কতা হারিয়ে ফেলছে তরুণেরা। এর ফলে নারীর প্রথাগত পেশাটি নষ্ট হচ্ছে, তার সংসারের সম্ভাবনা কমছে; আবার সে যে আর্থনীতিকভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করবে, তার সুযোগও নেই। রাষ্ট্র পুরুষদেরই কোনো পেশা দিতে পারছে না, নারীকে কোনো পেশা দেয়ার কথা তার জন্যে দুঃস্বপ্ন। এর ফলে নারীর উচ্চশিক্ষা শুধু ব্যর্থই হচ্ছে না, তা পরিহাস ও পরিহারের

বিষয় হয়ে উঠছে। প্রবেশিকা পাশের আগে থেকেই মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়ছে পিতামাতা, এমনকি প্রগতিশীলেরাও নিজেদের কন্যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগেই বিয়ে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করছেন। উচ্চশিক্ষিত নারীরা হয়ে উঠছেন সমাজের কৌতুক, করুণা, ও নিজের জন্যে বোঝা। এভাবেই চলছে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রিক-সামাজিক চক্রান্ত।

পিতৃতান্ত্রিক সতীত্বের ধারণা এখনো প্রবলভাবে রক্ষা ক'রে চলছে তার মধ্যযুগীয় চরিত্র। সব পিতৃতন্ত্রেই সতীত্ব নারীর জন্যে প্রথম বিধান, সতীত্বই নারীত্ব; কিন্তু পুরুষের জন্যে সততা বা কামনিষ্ঠা গৌণ ব্যাপার। পৃথিবী জুড়েই পুরুষের বিবাহপূর্ব ও বিবাহবহির্ভূত কামতৃপ্তির ব্যবস্থা রয়েছে, সফল পুরুষ মানেই বহুনারীভোগে সাফল্যমণ্ডিত; খুব কম পুরুষই পাওয়া যাবে, যাদের বিবাহপূর্ব কামের অভিজ্ঞতা নেই, এবং বিবাহবহির্ভূত কামের সুযোগ নেয় নি। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ ক'রে প্রথাগত সমাজগুলোতে, নারীর বিবাহপূর্ব পুরুষসংসর্গ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বিপজ্জনক। তাই নারীর কামতৃপ্তির একমাত্র পথ বিয়ে, যদিও বিয়েও পুরুষেরই কামতৃপ্তির জন্যে আয়োজিত হয়; নারীর তৃপ্তি ওপরিপাওনামাত্র, না পেলেও তা উদ্বেগের কারণ নয়। নারী বহু শতাব্দী ধ'রে প্রথাগত সতীর ভাবমূর্তি বহন ক'রে ক্লান্ত, প্রথাগত সতীর ধারণা তাকে মুক্ত হ'তে দিচ্ছে না, প্রথাগত সতীর ভাবমূর্তি নারীর জন্যে ক্ষতিকর। প্রথাগত সতী পুরুষের এমন দাসী, যার শরীরটিও তার নিজের নয়; একটি পুরুষের। প্রথাগত সতীর ধারণা চূড়ান্তে নিয়ে গিয়েছিলো হিন্দুরা, যারা নারীর দেহকে জন্মজন্মান্তর ধ'রে একটি পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলো, যার সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে ব্যবস্থা করেছিলো সতীদাহের। পশ্চিমে এখন প্রথাগত সতী নেই, কেউ চায়ও না; কিন্তু উগ্র পিতৃতন্ত্রগুলোতে সতীত্ব আজো ঐশী ব্যাপার। এ-পিতৃতন্ত্রগুলো দ্বৈত মান বজায় রাখার জন্যে ব্যস্ত; পুরুষের জন্যে এক নৈতিকতা, নারীর জন্যে আরেক নৈতিকতা এগুলোর আদর্শ। এ-অনৈতিক নৈতিকতার কবল থেকে নারী বাঁচতে পারে শুধু আর্থনীতিকভাবে স্বাধীন হয়ে। সব অঞ্চলের নারীই, পুরুষের মতোই, নিজের শরীর উপভোগ পছন্দ করে; নারী জৈবিকভাবে একপুরুষতৃপ্ত নয়, যদিও পুরুষতন্ত্র এটা ভাবতে পছন্দ করে। একটি মাত্র পুরুষের সংসর্গকে নারী তার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য মনে করে না; পুরুষের মতো নারীও বহু শরীরের সংসর্গ কামনা করে। বদ্ধ সমাজের নারী যখন মুক্ত সমাজে যায়, তার তখনকার যৌন আচরণ বুঝিয়ে দেয় যে সতীত্ব তার কাছে মূল্যবান নয়; শুধু সমাজের পীড়নেই সে সতীর ভূমিকায় অভিনয় করে। সতীত্ব অনেকটা অভিনয়। প্রথাগত সমাজগুলো নারীকে সতী ক'রে রেখেছে দুটি প্রক্রিয়ায় : দারিদ্র্য ও কঠিন বিধিনিষেধে। যেমন, বাঙলাদেশে নারী বাধ্যতামূলকভাবে সতীর ভূমিকায় অভিনয় করছে দারিদ্র্যবশত, এটি সচ্ছল সমাজ হ'লে অনেক আগেই ভেঙে পড়তো ওই দেয়ালটি; আব সৌদি আরবে নারী সতীর ভূমিকায় অভিনয় করছে হিংস্র বিধানের ফলে। সমাজ যদি কামসততা চায়, তবে চাইতে হবে নারীপুরুষ উভয়েরই জন্যে; শুধু নারীর জন্যে সতীত্বের বিধান হচ্ছে নারীপীড়ন।

মানুষের প্রধান শত্রু এখন মৌলবাদ; নারীরও প্রধান শত্রু এখন মৌলবাদ; তবে নারীর জন্যে মৌলবাদ অনেক বেশি মারাত্মক। সব ধরনের মৌলবাদেরই লক্ষ্য নারীকে আবার অবরোধে ঢুকিয়ে পুরুষের ভোগ্যবস্তু ও দাসী ক'রে তোলা। মৌলবাদীর কাছে নারীপুরুষের এলাকা ও ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীত; মৌলবাদী বিশ্বাস করে না মুক্তি ও সাম্যে। নারী থাকবে গৃহে, অবরোধের মধ্যে, পালন করবে ভোগ্যবস্তু ও গর্ভধারিণীর ভূমিকা, এ-ই মৌলবাদীর স্থির সিদ্ধান্ত। শিক্ষা নারীকে মুক্তি দেয় এ-ভূমিকা ও অবস্থান থেকে, যা মৌলবাদীর কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর; তাই মৌলবাদী প্রচণ্ড প্রতিপক্ষ নারীর শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, ও মুক্তির। মুসলমান দেশগুলোতে মৌলবাদীরা এখন শরিয়া আইন প্রবর্তনের জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, কারণ ওই আইনের সাহায্যেই তারা নারীকে চূড়ান্তরূপে পর্যুদস্ত করতে পারবে। নারীকে আবার অন্ধ বোরখা পরানো হচ্ছে, বোরখায় জানালা লাগানো হচ্ছে, সামান্য বিচ্যুতির জন্যে নারীকে দেয়া হচ্ছে লোমহর্ষক শাস্তি; কিন্তু শাস্তির বাইরে থেকে যাচ্ছে পুরুষ। ইসলামে *জিনা* [অবৈধ সঙ্গম] নারীর জন্যে মারাত্মক অপরাধ। নারী একা জিনা করতে পারে না, কিন্তু এ-অপরাধের জন্যে দণ্ডিত হয় শুধু নারী। পুরুষটি সাধারণত মুক্তি পেয়ে যায়, কারণ সে নিজের শরীরে জিনার কোনো চিহ্ন রাখে না; কিন্তু নারীটি পায় কঠোর দণ্ড, কারণ নারী জিনার প্রমাণ অনেক সময় অবৈধ সন্তানরূপে ধারণ করে গর্ভে। পাকিস্তানে সাফিয়া বিবির ঘটনা মৌলবাদী পুরুষতন্ত্রের অন্ধ নির্বিবেক নারীপীড়নের এক ভয়ঙ্কর উদাহরণ। সাফিয়া, আঠারো বছরের অন্ধ চাষীকন্যা, দাসীর কাজ করছিলো জমিদার বাড়িতে। তাকে প্রথম ধর্ষণ করে জমিদারপুত্র, তারপর জমিদার নিজেই। সাফিয়া এর ফলে জন্ম দেয় এক অবৈধ সন্তান। সাফিয়ার বাবা তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনে, কিন্তু শরিয়া আইনের বিধি অনুসারে পুরুষ দুটি মুক্তি পায়, ধরা পড়ে নারীটি · তার গর্ভই প্রমাণ করে সে অপরাধী, সে ইসলামি আইন অমান্য করেছে। শরিয়া বিচারক ওই অন্ধ ধর্ষিত নারীটিকে ব্যভিচারের অপরাধে দণ্ডিত করে প্রকাশ্যে ১৫টি বেত্রাঘাত, ৩ বছর কারাদণ্ড, ও ১০০০ টাকা জরিমানায় [মমতাজ ও শহীদ (১৯৮৯, ৫১-৫২)]। এ হচ্ছে মৌলবাদীর শরিয়াপ্রয়োগ। ইরানে নারী এখন নৃশংস পুরুষতন্ত্রের শিকার; এক সময়ের মুক্ত ইরানি নারী এখন বোরখার ভেতরে ঢুকে প্রশংসা করতে পারে শুধু আল্লা, মেহেদি ও আয়াতুল্লার।

ইসলামে নারী *ফিৎনা* বা বিশৃঙ্খলা, যে তার কাম দিয়ে বিপর্যস্ত করে সমাজ; তাই তাকে অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে হবে অবরোধে। ফাতিমা মেরনিস্সির (১৯৭৫, ৩৪) মতে নারীপুরুষ সম্পর্কে ইসলামি সমাজে রয়েছে দুটি তত্ত্ব, একটি স্পষ্ট, আরেকটি অন্তর্নিহিত : স্পষ্ট তত্ত্বটি হচ্ছে পুরুষ সক্রিয়, আক্রমণাত্মক; নারী অক্রিয়, মর্ষকামী; অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি হচ্ছে নারীর কাম অসীম। অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির চূড়ান্ত রূপ মেলে গাজ্জালির *ইহয়া উলুম আল-দিন* বা *ধর্মতত্ত্বের পুনরুজ্জীবন*-এ। তাঁর মতে সভ্যতা নিরন্তর সংগ্রাম ক'রে চলছে নারীর সর্বগ্রাসী সর্বনাশী শক্তির সাথে; তাই পুরুষ যাতে অবিচলিতভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্যে দরকার নারীকে

নিয়ন্ত্রণ করা। সমাজ টিকে থাকতে পারে এমন সব সংস্থা তৈরি ক'রে, যেগুলোর কাজ নারীকে অবরুদ্ধ ও পুরুষের বহুবিবাহের ব্যবস্থা ক'রে পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। নারীপুরুষ সম্পর্কে ইসলামি স্পষ্ট তত্ত্বটি হচ্ছে পুরুষ নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ; পুরুষের প্রবণতা জয়লাভ ও আধিপত্য করা; নারীর প্রবণতা পরাভূত, অধীনস্থ হওয়া। ইসলামি মৌলবাদীর মধ্যে এ-দুটি বিশ্বাসই কাজ করে; সে নারীকে যেমন ভয় পায়, নারীর মুখোমুখি যেমন অসহায় বোধ করে, তেমনই তাকে অবরুদ্ধ, পর্যুদস্ত ক'রে রাখতে চায়। শুধু ইসলামি মৌলবাদী নয়, সব মৌলবাদীর স্বপ্নই এক : নারীকে পর্যুদস্ত করা। হিন্দু মৌলবাদী নারীকে মনুসংহিতানুসারে আবদ্ধ ও দগ্ধ করতে চায়; খ্রিস্টান মৌলবাদী নারীর ওপর চাপাতে চায় মানুষের সমস্ত পাপের ভার।

বাঙলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীলতার যে-বিস্তার ঘটছে, তা প্রগতির জন্যে উদ্বেগজনক, এবং নারীর জন্যে বিশেষভাবেই ভীতিকর। চারপাশে এখন কালো বোরখার ভৌতিক প্রচ্ছায়া দেখা যাচ্ছে, নারীদের এখন বেরোতে হয় আগের থেকে অনেক সাবধানে, নারী এখন আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে নিজের শরীর ঢেকে রাখতে বাধ্য হয়; এবং সবচেয়ে শোচনীয় হচ্ছে অনেক নারীও দীক্ষিত হচ্ছে মৌলবাদে। শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে তরুণীদের জন্যে কারাগার, প্রতিক্রিয়াশীলতায় দীক্ষার মন্দির, যেখানে তাদের বাধ্য করা হয় পুরুষাধিপত্য ও মধ্যযুগীয়তা মেনে নিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বোরখা প'রে যে-ছাত্রীরা আসে, তারা বিবাহিত বা জামাতের সদস্য;– এ-দুটির একটি, বা দুটিই; বোরখাপরা বিবাহিত ছাত্রীরা কেউ বিয়ের আগে বোরখা পরতো না, বিয়েই তাদের তুলে দেয় মধ্যযুগের হাতে। এতে তারা সবাই খুবই পীড়িত বোধ করে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল পরিবার টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা বাধ্য হয় মধ্যযুগকে মেনে নিতে। কিছু কিছু মেয়ের জন্যে এটা এতো পীড়াদায়ক যে তারা আক্রান্ত হয় মানসিক রোগে। আধুনিক তরুণীর মুখের ওপর কালো বোরখা চাপিয়ে তাকে কেমন বিকৃত ক'রে দেয়া হয়, তার কিছু অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে, তার মধ্যে একটি কখনো ভুলবো না। কয়েক বছর আগে জাতীয় উদ্যানে বিভাগীয় বনভোজনে একটি ঝোপের মাঝে দুটি অত্যন্ত রূপসী আকর্ষণীয় প্রাণবন্ত তরুণী আমাকে ঘিরে ধরে। তারা জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের চিনলেন, স্যার?' আমি তাদের চিনতে পারি নি। তখন তারা আরেকটুকু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, 'যে-দুজনকে ক্লাশে আপনি বোরখাপরা দেখেছেন, যাদের মুখ কখনো দেখেন নি, আমরা সে-দুজন।' আমি অত্যন্ত আহত বোধ করি এজন্যে যে এমন সুন্দর প্রাণবন্ত দুটি তরুণী বোরখাচাপা প'ড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে নিষ্প্রাণ। তারা কেনো বোরখা পরে জানতে চাইলে তারা জানায়, কারণ হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি ও এক অধ্যাপক-চিকিৎসক চাচা। বনভোজনে ওই তরুণী দুটি ছিলো সবচেয়ে প্রাণবন্ত, তারা উদ্যানের নিসর্গের স্তরে স্তরে সেদিন প্রাণসঞ্চার করেছিলো, কিন্তু জীবনে তারা বোরখাচাপা প'ড়ে নিজেরাই থাকে নিষ্প্রাণ। এ-ক-বছরে হয়তো তারা সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে পড়েছে, বা শিকার হয়েছে মনোব্যাধির। এখন বোরখা বেড়ে চলছে, ষাটের দশকে বোরখা খুঁজে পাওয়া যেতো না কলাভবনে, এখন কলাভবনের বারান্দায় চলে অন্ধ বোরখার মিছিল।

মুসলমান পিতৃতন্ত্র একটি কথার ব্যাপক প্রচার দিয়েছে যে সপ্তম শতক থেকে ইসলামই নারীকে মুক্তি দিয়েছে; নারীকে দিয়েছে সামাজিক অধিকার। পাকিস্তানপর্ব থেকে এ-প্রচারটি ধ্রুবপদের মতো উচ্চারিত হ'তে থাকে এ-অঞ্চলে; নারীরাও এতে বিশ্বাস করে, এবং কী অধিকার দিয়েছে, সে-সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না ক'রে তারাও এটা আবৃত্তি করে। কোনো ধর্মই নারীকে প্রকৃত অধিকার দেয় নি, ইসলামও দেয় নি; চোদ্দো শো বছর ধ'রে নারীর অধিকার যতোটা বুলি ততোটা বাস্তব সত্য নয় [দ্র 'পিতৃতন্ত্রের খড়্গ']। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নারীর অবস্থা দেখলেই তা বোঝা যায়। ইসলামের আগে আরবে নারীর অবস্থা যতোটা খারাপ ছিলো ব'লে প্রচারিত, ততোটা খারাপ ছিলো না; ঐতিহাসিকদের মতে নারী অনেক বেশি স্বাধীন ছিলো অন্ধকার যুগের আরবে [দ্র ফাতিমা (১৯৭৫, ৬৪-৭৩)]। বাঙলাদেশে কিছু শিক্ষিত নারীও না বুঝে, বা কপটতাবশত, বা নিজেদের সুবিধার জন্যে চোদ্দো শো বছর ধ'রে নারীর অধিকার ও ধর্মের জয়গানে এমন মুখর হয় যে সমগ্র পরিবেশ অতিপ্রাকৃতিক হয়ে ওঠে। টেলিভিশনে পুরুষতন্ত্রের আজ্ঞায় এবং কিছুটা লোভে যে-নারী ধর্মের গাথা প্রচার করে, সে জানে না অন্যদের আত্মত্যাগের ফলে সে ধর্মের অনেক কঠোর বিধি অমান্য করতে পেরেছে ব'লেই টেলিভিশনে যেতে পেরেছে; যদি তার প্রশংসিত ধর্মের সব বিধি তার ওপর আবার চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাকে অবরুদ্ধ থাকতে হবে অন্ধকারে। মৌলবাদ যেদিন সমস্ত প্রগতিশীলতাকে ধ্বংস ক'রে, সেদিন কখনো না আসুক, তাকে মানতে বাধ্য করাবে সমস্ত বিধান, সেদিন সে শুধু টেলিভিশন নয়, অন্য কোথাও কোনো কথা বলার অধিকার পাবে না। সে জানে না ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যে সে কাজ ক'রে চলছে নিজের, ও নারীমণ্ডলির বিরুদ্ধে।

রাজনীতি সবখানেই আজো পুরুষতান্ত্রিক; মৌলবাদী রাজনীতি উগ্র পুরুষাধিপত্যবাদী; আর গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রও আজো পুরুষের কবল থেকে মুক্তি পায় নি। চিরকালই নারী থেকেছে রাজনীতিক ক্ষমতার বাইরে; ইতিহাসে মাত্র কয়েকজন নারীর নাম মেলে, যাঁরা রাজ্য শাসন করেছেন; তবে তাঁরা এতো মুষ্টিমেয় যে পরিণত হয়েছেন রূপকথায়। শাসক ও শাসিতদের মাঝামাঝি চিরকাল থেকেছে একদল মধ্যস্থতাকারী, তাদের অধিকাংশ সরকারি আমলা, এবং কিছু থাকে অসরকারি ব্যক্তি, যারা ব্যক্তিগত সম্পর্কবশত প্রভাব বিস্তার করে শাসকদের ওপর। ব্যক্তিগত সম্পর্কবশত শাসকদের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপদেষ্টাদের মধ্যে নারীই বেশি; তারা রানী, স্ত্রী, রক্ষিতা হিশেবে শাসকদের প্রভাবিত করেছে, আজো করে। তবে রানী, ও স্ত্রীদের থেকে রক্ষিতারা শাসকদের প্রভাবিত করেছে অনেক বেশি, কেননা রানী ও স্ত্রীদের থেকে রক্ষিতারাই বেশি প্রিয় শাসকদের। পুরুষতন্ত্র 'রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রানী' তত্ত্বে বিশ্বাস করে, কারণ এটা রক্ষিতার কাজ; পুরুষ নারীকে রক্ষিতা হিশেবেই দেখতে পছন্দ করে, সরাসরি শাসক হিশেবে দেখতে পছন্দ করে না। শাসকদের উপদেষ্টার ভূমিকায় নারী এসেছে রক্ষিতারূপে; তাই নারীশাসকেরা উপদেষ্টা হিশেবে নারী নেয় না, তাদের উপদেষ্টামণ্ডলিতে সাধারণত নিয়োগ করে পুরুষই।

আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তির পর শুধু রাজা নয়, দেখা দিয়েছে বিচিত্র ধরনের শাসক, যারা রাজনীতিক, সংসদসদস্য, মন্ত্রী, আমলা ও আরো নানা ভূমিকায় ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু এটা হয়ে থাকে পুরুষের অধিকার, নারীর নয়। বিশশতকের দ্বিতীয় দশকের আগে পশ্চিমের সর্বজনীন মানবাধিকারবাদীরাও নারীদের কোনো রাজনীতিক অধিকার দেয় নি; এমনকি দেয় নি প্রায়-নিরর্থক ভোটাধিকারও। আজো, নব্বইয়ের দশকেও, নারীর বিরুদ্ধে রাজনীতিক বৈষম্যের অভাব নেই; নারী আজো রাজনীতিতে অনভিপ্রেত, যদিও পুরুষতন্ত্র নিজের সুবিধার জন্যে তাকে কাজে লাগায়। পুরোনো কুসংস্কার আজো এতো প্রবল যে নারী আজো রাজনীতিতে প্রবেশাধিকারহীন; অনেক দেশ রয়েছে যেখানে নারীর রাজনীতিক অধিকার সাংবিধানিকভাবেই নিষিদ্ধ। আরব আমিরাত, ইয়েমেন, ওমান, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সৌদি আরব প্রভৃতি মুসলমান রাষ্ট্রে নারীকে রাখা হয়েছে রাজনীতির বাইরে; তারা ভোটও দিতে পারে না, অবশ্য অনেক দেশে ভোট দেয়ার ব্যাপারই নেই।

এখন অধিকাংশ দেশে নারী ভোট দিতে পারে, তবে এর মানে নয় যে নারী তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে স্বাধীনভাবে। অনেক মুসলমান রাষ্ট্রে ভোটাধিকার থাকা সত্ত্বেও নারী ভোট দেয় না, বা দিতে পারে না, বা দেয় পুরুষ অভিভাবকের নির্দেশমতো। নারী এখন অধিকাংশ দেশে ভোট দিতে পারে, তার রাজনীতিক অধিকারও রয়েছে, কিন্তু সে-তুলনায় তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের হার অত্যন্ত তুচ্ছ। আজো নারী রাজনীতিক রূপকথা বা রাজনীতিতে উৎকট দৃশ্য। এখন পৃথিবীর ৯৬ শতাংশ নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ দেশে রাজনীতিক পদে অধিষ্ঠিত নারীর সংখ্যা শোচনীয়রূপে স্বল্প। অধিকাংশ দেশে সংসদে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা খুবই কম; কোনো কোনো দেশে–যেমন বাঙলাদেশ, পাকিস্তান, ঘানায়-সংসদে নারীদের জন্যে আসন সংরক্ষিত রাখা হয় এ-বোধ থেকে যে নারীরা সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য। সংরক্ষিত নারী আসনগুলো নারীমুক্তির পক্ষে নয়, বিরুদ্ধে; এর ফলে দেখা দেয় এমন সুবিধাবাদী নারী, যারা শুধু ক্ষমতাশালীদের অনুগত থাকার ফলেই ওই আসন লাভ করে। তাদের কোনো রাজনীতিক যোগ্যতা থাকে না, তারা হয়ে থাকে সুযোগসন্ধানী সুবিধাবাদী, পুরুষ রাজনীতিকদের মতোই দুশ্চরিত্র; তারা নারীদের যোগ্যতা অর্জনের বদলে শুধু শক্তিশালীদের অনুগত, এমনকি রক্ষিতা, হ'তে শেখায়। গত কয়েক দশকে কয়েকটি দেশে নারী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে : শ্রীলঙ্কায় শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, ইসরাইলে গোল্ডা মেয়ার, ভারতে ইন্দিরা গান্ধি, আর্জেন্টিনায় ইসাবেলা পেরন, যুক্তরাজ্যে মার্গারেট থ্যাচার, ফিলিপিনসে কোরাজান অ্যাকিনো, পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টো, বাঙলাদেশে খালেদা জিয়া অধিকার করেছেন সর্বোচ্চ রাজনীতিক ক্ষমতা। কিন্তু তাঁরা, গোল্ডা মেয়ার ও মার্গারেট থ্যাচার বাদে, সবাই ক্ষমতায় এসেছেন কোনো মৃত বা নিহত পুরুষের উত্তরাধিকারী ও পুরুষতন্ত্রের পুতুলরূপে। কেউ কেউ অবশ্য পুতুল হয়ে থাকেন নি; যেমন ইন্দিরা গান্ধি। তাঁরা যতোটা রূপকথা ততোটা বাস্তব নন; তাঁরা অনেকাংশে নারীর জন্যে পুরুষের থেকেও ক্ষতিকর। পুরুষতন্ত্রের কোনো পীড়িত পক্ষ

যখন পুরুষতন্ত্রের অন্য কোনো হিংস্র পক্ষের দ্বারা পর্যুদস্ত হ'তে থাকে, তখন তারা ব্যবহার করে এমন কোনো নারীকে যে সম্পর্কিত কোনো কিংবদন্তিতুল্য পুরুষের সাথে। এভাবেই উদ্ভব ঘটেছে শ্রীমাভো, ইন্দিরা, ইসাবেলা, কোরাজান, বেনজির, খালেদার। এসব দেশে নারীর অবস্থা খুবই শোচনীয়, কিন্তু শবপুজোবাদী রাজনীতির ফলে তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন; তাই তাঁরা নারীমুক্তির উদাহরণ নন, সম্ভাবনাও নন। রাজনীতি এখন সম্পূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক, রাজনীতিতে শক্তিশালী নারীরাও পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিনিধি; তাই তাঁরা নারীদের উপকারে আসছেন না। নারীকে নিজের স্বাধীনতা ও অধিকারের জন্যে বিশ্বাস করতে ও সক্রিয় হ'তে হবে প্রগতিশীল রাজনীতিতে, নারীবাদী রাজনীতিতে। পুরুষদের জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা সুবিধাজনক ব্যাপার, নারীর জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

নিজের ভবিষ্যতের জন্যে নারীকে ত্যাগ করতে হবে পিতৃ-ও পুরুষ-তন্ত্রের সমস্ত শিক্ষা ও দীক্ষা; ছেড়ে দিতে হবে সুমাতা, সুগৃহিণী, সতীর ধারণা; তাকে আয়ত্ত করতে হবে শিক্ষা, এবং গ্রহণ করতে হবে পেশা। তাকে হ'তে হবে আর্থনীতিকভাবে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত; তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে সব ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতার সাথে লড়াইয়ের জন্যে। তাকে কান ফিরিয়ে নিতে হবে পুরুষতন্ত্রের সমস্ত মধুর বচন থেকে, তাকে বর্জন করতে হবে পুরুষতন্ত্রের প্রিয় নারীত্ব। তাকে সাবধান থাকতে হবে পুরুষতন্ত্রের সমস্ত মহাপুরুষ সম্বন্ধে, সন্দেহের চোখে দেখতে হবে সবাইকে, কেননা কেউ তার মুক্তি চায় নি। তাকে মনে রাখতে হবে সে মানুষ, নারী নয়; নারী তার লৈঙ্গিক পরিচয় মাত্র; মনে রাখতে হবে পুরুষের সাথে তার পার্থক্য মাত্র একটি ক্রোমোসোমের, এবং একটি ক্রোমোসোমের জন্যে একজন প্রভু ও আরেকজন পরিচারিকা হয়ে উঠতে পারে না। নারীকে ঘৃণা করতে শিখতে হবে সম্ভোগের সামগ্রী হ'তে, এবং হ'তে হবে সক্রিয়, আক্রমণাত্মক। নিজের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে নিজেকেই, পুরুষ তার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করবে না। নারীর ভবিষ্যৎ মানুষ হওয়া, নারী হওয়া নারী থাকা নয়।

নারীবাদ, ও নারীবাদের কালপঞ্জি

নারীপুরুষ সমান, তাদের অধিকার অভিন্ন : এ হচ্ছে নারীবাদ। একে মনে হয় সরল, দিবালোকের মতো স্বচ্ছ, সত্য ব'লে; কিন্তু পিতৃতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে মানা হয় নি এ-সরল সত্যটুকু। নারীবাদীরা মনে করেন মৌল যোগ্যতায় কোনো পার্থক্য নেই নরনারীতে; নারী ও পুরুষের মূল পরিচয় তাদের স্ত্রী বা পুংলিঙ্গ নয়, তাদের মূল পরিচয় তারা মানুষ। মানুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা লিঙ্গনিরপেক্ষ। কিন্তু পিতৃতন্ত্র এটা মানে নি। নারীবাদীদের বিদ্রোহ নারীপুরুষের অসাম্যের ধারণা ও অসম অধিকারের বিরুদ্ধে; তাঁরা মনে করেন প্রথাগতভাবে নারীপুরুষকে যে মনে করা হয় অসম ব'লে, এবং নারীদের যে রেখে দেয়া হয়েছে নিকৃষ্ট সামাজিক অবস্থানে, তা অন্যায়। তাঁরা সবাই মনে করেন পরিবর্তন ঘটাতে হবে এ-ব্যবস্থার, তবে কী পরিবর্তন ঘটাতে হবে, সে-সম্পর্কে তাঁরা পোষণ করেন নানা মত। নারীমুক্তির জন্যে কী কৌশল নিতে হবে, সে-সম্পর্কেই শুধু তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন না; তাঁদের ভিন্নতা আরো গভীর স্তরের। নারীর প্রকৃত স্বার্থ কী, কী হ'লে প্রকৃতই মুক্তি ঘটবে নারীর, এ-সম্পর্কে বিভিন্ন নারীবাদী তাত্ত্বিক পোষেণ বিভিন্ন মত। নারীবাদে চোখে পড়ে বেশ কয়েকটি তত্ত্বাদর্শ, প্রতিটিই বিশ্বাস করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে দরকার নারীর স্বাধীনতা ও পুরুষের সাথে সাম্য; কিন্তু বিভিন্ন মৌল বিষয়ে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নানা ভিন্নতা। প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্য কী, মানুষ বা নারীর প্রকৃত স্বভাব বা প্রকৃতি কী, রাষ্ট্রের দায়িত্ব কী হবে, এসব বিষয়ে তাঁদের মধ্যে রয়েছে দার্শনিক ভিন্নতা। নারীমুক্তি সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্বাদর্শ রয়েছে; এগুলো হচ্ছে 'রক্ষণশীল মতবাদ', 'উদার (মানবতাবাদী) বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীবাদ', 'মার্ক্সীয় নারীবাদ', 'আমূল নারীবাদ'। রক্ষণশীল মতবাদটি নারীর মুক্তিবিরোধী, এটি ছাড়া অন্যগুলো বিশ্বাস করে নারীমুক্তিতে।

রক্ষণশীল মতবাদ : এটি নারীমুক্তির বিরোধী, এটি পোষে প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাস যে নারী যেভাবে যে-অবস্থানে আছে, তাই ঠিক। নারীবাদের লড়াই এ-মতবাদের বিরুদ্ধেই। এ-মতবাদ মেলে পিতৃতন্ত্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে : ধর্মগ্রন্থ, আইন, দর্শন সবখানেই এ-মতবাদ ছড়িয়ে আছে। এ-মতবাদ অনুসারে নারীরা যে-অসাম্য ভোগ করছে, তা অন্যায় ন্যায়; এই চিরন্তন শাশ্বত। রক্ষণশীলদের মতে কোনো কোনো নারী পোহায় নানা দুর্ভোগ, তবে সমাজ নারীদের সুপরিকল্পিতভাবে পীড়ন করে না। রক্ষণশীলেরা মনে করেন নারীর যে-অবস্থা, তা প্রকৃতিনির্ধারিত, বা বিধাতার নির্দিষ্ট; প্রকৃতি বা বিধাতাই ঠিক ক'রে দিয়েছে যে নারীপুরুষ অসম; পুরুষ প্রভুত্ব করবে, নারী থাকবে তার অনুগত। এটা কোনো অন্যায় নয়, এটা ধ্রুব বিধান। রক্ষণশীলদের মধ্যে যাঁরা এতোটা বর্বর নন, তাঁরা একই কথা একটু মধুর ক'রে বলেন। তাঁদের মতে,

নারীপুরুষ কেউ অসম নয়, তাদের কারো ভূমিকা কম মূল্যবান নয়; তাদের উভয়ের ভূমিকাই সমান মূল্যবান, তবে তাদের ভূমিকা ভিন্ন। তারা সমান, তবে পরস্পরের পরিপূরক। রক্ষণশীলেরা মনে করেন নারী ও পুরুষের ভূমিকা ভিন্ন; ভিন্ন ভূমিকা ঠিক মতো পালন করাই তাদের সার্থকতা। তাঁরা শুধু নারীপুরুষের ভিন্নতা ও ভিন্ন ভূমিকায়ই বিশ্বাস করে না, তাঁরা মনে করেন সমাজরাষ্ট্রে বিধিবিধান প্রবর্তন ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভিন্নতা। তাঁরা বিশ্বাস করেন নারীপুরুষের সহজাত ভিন্নতায়, ও অসাম্যে; পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বে, নারীর নিকৃষ্টতায়। তাঁরা মনে করেন নারীপুরুষ একই কাজের উপযুক্ত নয়, নারী উপযুক্ত নিকৃষ্ট কাজের, তাই সেগুলোই পালন করবে নারী। তাঁদের চোখে এটা অন্যায় তো নয়ই, বরং এটাই ন্যায়সঙ্গত; কেননা নিকৃষ্টকে নিকৃষ্টরূপেই রাখাই ন্যায়।

উদার (মানবতাবাদী) বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীবাদ : এ-মতবাদের উদ্ভব ঘটে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের *ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস্ অফ ওম্যান*-এ (১৭৯২), এবং পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে জন স্টুয়ার্ট মিলের *দি সাবজেকশন অফ উইমেন*-এ (১৮৬৯)। এ-মতবাদটিই এখনো প্রধান নারীবাদী ধারা, কেননা পশ্চিমের গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের সাথে এটি বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। এ-মতবাদের লক্ষ্য বিভিন্ন বিধান প্রণয়ন ক'রে সামাজিক রাষ্ট্রিকভাবে নারীর অবস্থান উন্নত করা। গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার; তাই এ-মতবাদের মূলকথা হচ্ছে পুরুষ যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থির করে নিজের ভূমিকা, নারীকেও তেমনই দিতে হবে সমাজে প্রতিষ্ঠার ও নিজের ভূমিকা স্থির করার অধিকার। উনিশশতকে এঁদের লক্ষ্য ছিলো ভোটাধিকার পাওয়া, কিন্তু তা পাওয়া সত্ত্বেও নারী আজো অনেক অধিকার পায় নি; কেননা রয়ে গেছে নানা আইন ও প্রথাগত বাধা। এসব বাধার ফলে নারী রাজনীতি, ব্যবসা, সামরিক ও অন্যান্য পেশায় সফল হ'তে পারছে না। উদার নারীবাদীদের দাবি হচ্ছে আইন ক'রে দূর করতে হবে এ-সমস্ত বাধা, প্রতিষ্ঠা করতে হবে সমান নাগরিক অধিকার। এ-মতবাদের বক্তব্য হচ্ছে কোনো ভূমিকায় প্রতিষ্ঠার জন্যে বিবেচনা করতে হবে শুধু ব্যক্তিকে, ব্যক্তির যোগ্যতাকে, আর কিছু নয়। প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণের কোনো মূল্য নেই; তাই বিচার করতে হবে শুধু ব্যক্তিটিকে। উদার নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্র যতো কম হাত দেয়, ততোই ভালো; তাই রাষ্ট্রের নারীর ওপর অভিভাবকত্বের কোনো দরকার নেই। নারীকে আগে থেকেই বিশেষ কোনো ভূমিকায় আটকে ফেলা অন্যায়; নারী সব ভূমিকায় নিজেকে পরখ ক'রে একদিন নিজেই দেখবে সে কোন ভূমিকার উপযুক্ত।

উদার নারীবাদে সাম্য হচ্ছে প্রতিটি নারী ও পুরুষের নিজের ইচ্ছে ও শক্তি অনুসারে নিজের ভূমিকা বেছে নেয়ার অধিকার; স্বাধীনতা হচ্ছে নারীর নিজের ইচ্ছেমতো ভূমিকা অর্জনের পথে কোনো বাধা না থাকা। তবে এ-বিষয়ে পুরোনো ও আধুনিক উদার নারীবাদীদের মধ্যে মতের ভিন্নতা রয়েছে। আধুনিকদের মতে, আইন নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করতে তো পারবেই না, তার সাথে এমন আইন তৈরি করতে হবে যে সব

রকম বৈষম্য অবৈধ। অসম বেতনহার নিষিদ্ধ করতে হবে, যে-সমস্ত পেশায় নারীবিরোধী আইন রয়েছে, সেগুলো অবৈধ করতে হবে, বিশেষ বিশেষ পেশায় নারী নিয়োগ না ক'রে পুরুষ নিয়োগের যে-রীতি রয়েছে, তা নিষিদ্ধ করতে হবে। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে নারীর স্বার্থবিরোধী সমস্ত আইন। আধুনিক উদার নারীবাদীরা অনেক ক্ষেত্রে নারীর পক্ষে বৈষম্য সৃষ্টির পক্ষপাতী। তাঁরা দাবি করেন, এতো দিনের বৈষম্য দূর করার জন্যে, এখন অনেক পেশায় পুরুষ না নিয়ে নিতে হবে নারী, এবং বাইরের কাজে অক্ষম নারীদের দিতে হবে বিশেষ ভাতা। যেমন : নারীদের দিতে হবে প্রসব ছুটি ও ভাতা। এটা দয়া নয়, তার প্রাপ্য; কেননা সন্তান জন্ম দেয়া একটি সমাজ সেবা। তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতবিরোধী আইনেরও বিরোধী, কেননা এগুলো ক্ষুণ্ন করে নারীর অধিকার। শিশুপালনের ব্যাপরটিকে তাঁরা দেন বিশেষ গুরুত্ব। তাঁরা মনে করেন শিশুপালন শুধু নারীর কাজ নয়, তা পুরুষেরও কাজ; তাই পুরুষকেও তাতে অংশ নিতে হবে। তাঁরা এও মনে করেন যতোদিন পুরুষের জন্যে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, ততোদিন তা বাধ্যতামূলক করতে হবে নারীর জন্যেও। নারীপুরুষের কোনো বৈষম্যকে তাঁরা প্রাকৃতিক ব'লে মনে করেন না, মনে করেন সমাজের সৃষ্টি, এবং শিক্ষা আরো বাড়িয়েছে ওই বৈষম্য। তাই নারীপুরুষকে দিতে হবে একই শিক্ষা, যাতে তারা তাদের শক্তি ও সম্ভাবনা যাচাই করতে পারে। উদার নারীবাদীদের কাছে নারীস্বাধীনতা হচ্ছে নারীর সামাজিক ভূমিকা নিজে স্থির করার, এবং পুরুষের সাথে সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে এ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে সুষ্ঠুভাবে ঘটতে পারে, তার ব্যবস্থা কর। তাঁরা মনে করেন না যে নারীমুক্তির জন্যে বদলে দিতে হবে সমগ্র সমাজসংগঠন; এও মনে করেন না যে সব নারী একই সময়ে লাভ করবে মুক্তি। তাঁরা মনে করেন সবাই মুক্তি পাওয়ার অনেক আগেই কোনো কোনো নারী মুক্তি পেতে পারে। তাঁরা মনে করেন নারীমুক্তি শুধু নারীরই মুক্তি ঘটাবে না, ঘটাবে পুরুষেরও মুক্তি; এতে পুরুষের কিছু অবৈধ সুবিধা কমলেও পুরুষ মুক্তি পাবে সংসারের ভরণপোষণ ও দেশরক্ষার দায়িত্ব থেকে।

মার্ক্সীয় নারীবাদ : মার্ক্সীয় মতবাদ অনুসারে নারীশোষণ, ঐতিহাসিকভাবে এবং বর্তমানে, ব্যক্তিমালিকানার ফল; তাই নারীকে মুক্ত করা সম্ভব শুধু ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্ত ক'রে। মার্ক্সীয়দের মতে নারীমুক্তি-আন্দোলন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপক সংগ্রামের একটি অংশ। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অনেক কারণ রয়েছে, নারীবাদ ওই কারণগুলোর একটি। তাঁদের মতে নারী ও শ্রমিকের স্বার্থ একই, কেননা নারী ও শ্রমিক একই রকমে শোষিত। মার্ক্সীয় নারীবাদের উদ্ভব ঘটে এঙ্গেলসের *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* (১৮৮৪) সন্দর্ভে। মার্ক্সবাদ অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকাংশ মানুষই শোষিত, কেননা উৎপাদনের উপকরণগুলো কিছু মানুষের অধিকারে। তারা উপকরণের জোরে আধিপত্য করে সমাজের অধিকাংশ মানুষের ওপর, যারা বেঁচে থাকার জন্যে শস্তায় বেচে দিতে বাধ্য হয় তাদের শ্রমশক্তি। নারীও এ-শোষণের শিকার। মার্ক্সীয়রা স্বীকার করেন যে নারী শিকার হয় আরো বিশেষ কিছু শোষণের, পুরুষ যা থেকে থাকে মুক্ত; তবে শোষণের মূল রয়েছে পুঁজিবাদে, তাই পুঁজিবাদ

উৎখাত নারীর জন্যে আরো বেশি জরুরি। মার্ক্সবাদ অনুসারে নারী বিশেষভাবে শোষিত হয় প্রথাগত পরিবারের জন্যে : নারী হচ্ছে পারিবারিক দাসী, সে বাইরের কোনো উৎপাদনমুখি কাজে অংশ নিতে পারে না। একপতিপত্নী বিয়ে উদ্ভাবনই করা হয়েছিলো কতিপয়ের মুঠোতে ধন জড়ো করার উদ্দেশ্যে; ওই কতিপয় পুরুষ। তাঁদের মতে পরিবার গঠিত হয়েছিলো শ্রেণীভিভক্ত সমাজে পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে। পুরুষই পরিবারে সার্বভৌম। এঙ্গেলসের (১৮৮৪, ২২৯) মতে, একপতিপত্নী বিয়েনির্ভর 'আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য অথবা গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির উপব দাঁড়িয়ে আছে।' তবে এ-বিয়ে নামে মাত্র একপতিপত্নী বিয়ে; এতে নারীকেই থাকতে হয় সতী, কিন্তু পুরুষের কাছে যৌনসততা চাওয়া হয় না।

মার্ক্সীয়রা বলেন না যে নারীশোষণ পুঁজিবাদের সৃষ্টি; তবে তাঁদের মতে পুঁজিবাদ নারীশোষণ বহুগুণে বাড়িয়েছে, এবং নারীকে অবনতির শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁদের মতে পুঁজিবাদ আর পুরুষাধিপত্য অবিচ্ছেদ্য, একটি শক্তিশালী করে আরেকটিকে। এঙ্গেলস (১৮৮৪. ২২৯, ২৩০) বলেছেন, 'সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্ত্রী-ই হল প্রথম ঘরোয়া ঝি', এবং 'সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রীজাতিকে আবার নিয়ে আসাই হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত।' তখন নারী আর স্বামীর ওপর ভরণপোষণের জন্যে নির্ভর করবে না, নারী স্বাধীন হবে। তবে এর জন্যে দরকার সমাজের মৌলিক রূপান্তর। নারী আজ যে-সকল কাজ করে-ঘরকন্না, শিশুপালন সব কিছুকে নিয়ে আসতে হবে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে। তাঁরা মনে করেন নারীমুক্তির জন্যে দরকার পরিবার সংগঠনটির মৌলিক পরিবর্তন। এর জন্যে পরিবারের আর্থিক কাজগুলো পালন করতে হবে রাষ্ট্রকে; রাষ্ট্রই বহন করবে পরিবারের ভার। পুঁজিবাদ এ-ভার নেবে না; এ-ভার নিতে পারে শুধু সাম্যবাদ। তাই শুধু সাম্যবাদের মধ্যেই নারী পেতে পারে প্রকৃত মুক্তি; সেখানে আর পরিবারের মধ্যে স্বামীটি থাকবে না বুর্জোয়া, আর স্ত্রীটি প্রলেতারিয়েত। সাম্যবাদে ধ্বংস হয়ে যাবে 'আর্থ একক'রূপে বিরাজমান একপতিপত্নীক পরিবার, তবে তা টিকে থাকবে 'সামাজিক একক' রূপে। সাম্যবাদেও বিয়ে থাকবে, তবে তা এখনকার মতো আর্থ চুক্তি থাকবে না; তখনও পরিবার থাকবে, তবে তা গ'ড়ে উঠবে নারীপুরুষের পরস্পরিক আকর্ষণে। তখন নারী ও পুরুষ হবে প্রকৃতই মুক্ত।

আমূল নারীবাদ : আমূল নারীবাদ নারীপীড়নের সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করে একটি মূল ধারণা দিয়ে, সেটি হচ্ছে *লৈঙ্গিক পীড়ন*। উদার নারীবাদীরা মনে করেন নারীর সমস্যা রাজনীতিক সামাজিক অধিকারহীনতা, কিন্তু আমূল নারীবাদীরা তা মনে করেন না; মার্ক্সীয়দের মতো তাঁরা মনে করেন না যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজই নারীর দুরবস্থার মূলে। তাঁরা মনে করেন নারীর দুরবস্থার মূল কারণ জৈবিক : গর্ভধারণ করতে গিয়েই নারী মেনে নিতে বাধ্য হয় পুরুষের অধীনতা। তাঁদের মতে পরিবারের উৎপত্তি ঘটেছে জৈবিক কারণে, পরিবার একটি জৈবসংগঠন। তাঁরা মনে করেন ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে আদি ও মৌলিক পীড়ন হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক শারীরিকভাবে নারীকে নিজের

অধীনে নিয়ে আসা। তাঁরা যেনো মনে করেন যে দেহই নারীর নিয়তি, তবে নারীকে মুক্তি পেতে হবে এ-নিয়তি থেকে। তাঁরা মনে করেন জৈবপরিবারে যে-শক্তির সম্পর্ক দেখা দেয়, তাই শক্তির মৌল কাঠামো; তাঁদের মতে জৈবপরিবারই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মূলে। তাঁদের মতে পুঁজিবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই গৌণ ব্যাপার, মূল লড়াই হচ্ছে লিঙ্গবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। আমূল নারীবাদী ভাবনার উন্মেষ বোভোয়ার, মিলেট, গ্রিয়ার ও আরো অনেকের মধ্যে দেখা যায়, তবে তা প্রবল রূপ পায় টাই-গ্রেস অ্যাটকিনসন ও শুলামিথ ফায়ারস্টোনের লেখায়। তাঁদের মতে নারী-অধীনতা মূলত জৈবিক, তাই নারীমুক্তির জন্যে দরকার জৈবিক বিপ্লব। তাঁরা মনে করেন মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম প্রযুক্তিবিদ্যার এমন উন্নতি হয়েছে যে তার সাহায্যে নারীকে মুক্ত করা সম্ভব সন্তানধারণ ও পালনের মৌলিক অসাম্য থেকে। তাঁরা মনে করেন গর্ভধারণ নারীর জন্যে অবধারিত নয়, মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নারীর নয়। যদি মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হয়, তবে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে পুরুষকেও। নারী আর গর্ভধারণ করবে না, শিশুপালন করবে না; কৃত্রিম উপায়ে জন্ম দিতে হবে সন্তান, আর সমাজ বহন করবে তার পালনের দায়িত্ব।

এ-মৌলিক পরিবর্তনের সাথে রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক প্রভৃতি গৌণ ব্যাপারেও বদল ঘটাতে হবে; নারীকে দিতে হবে আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার। তাঁরা মনে করেন সমাজের সমস্ত কাজে নারীকে সম্পূর্ণরূপে জড়িত করতে হবে, এবং দিতে হবে যৌন স্বাধীনতা। তাঁদের মতে প্রযুক্তি শুধু নারীকে গর্ভধারণের দায় থেকে মুক্তি দেবে না, পরিশেষে তা মুক্তি দেবে নারীপুরুষ উভয়কেই কাজ করার দায় থেকে। প্রযুক্তি ধ্বংস ক'রে দেবে পরিবারের জৈবিক ও আর্থ ভিত্তি, বাতিল হয়ে যাবে পরিবার, নারীপুরুষের বিভিন্ন ভূমিকা, ও শক্তির সম্পর্ক। তাঁরা মনে করেন নারীকে নিজের ভূমিকা বেছে নেয়ার অধিকার দেয়াই যথেষ্ট নয়; জৈবিক বিপ্লবের মাধ্যমে বিলুপ্ত ক'রে দিতে হবে সমস্ত 'ভূমিকা'। তাঁদের মতে জৈবিক পরিবার বিলুপ্ত হ'লে যৌন পীড়নও লোপ পাবে। তখন কে কার সাথে, ও কোন ধরনের যৌনসম্পর্কে জড়িত হবে, তা স্থির করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রতিটি নরনারীর। তখন সমকাম–পুরুষের সাথে পুরুষের, নারীর সাথে নারীর–নিন্দিত থাকবে না, বিকল্প ব'লেও গণ্য হবে না; যে যার রুচি মতো বেছে নেবে বিশেষ ধরনের যৌনসম্পর্ক। উদার নারীবাদীদের মতে সমকাম বিষমকামের বিকল্প, মার্ক্সীয়দের মতে সমকাম পুঁজিবাদী বিকৃতি; আমূল নারীবাদীদের মতে এটা স্বাভাবিক। তাঁদের মতে জৈবিক বিপ্লবের ফলে 'সমকাম', 'বিষমকাম' প্রভৃতি ধারণাই লোপ পাবে; লোপ পাবে 'যৌনসঙ্গম' নামের 'সংস্থাটি'ও, যাতে নারীপুরুষ পালন করে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা। সাম্য বলতে আমূলবাদীরা শুধু সুযোগসুবিধার সাম্য বোঝেন না, বোঝেন সন্তানধারণ না করারও সাম্য। তবে সন্তানকে ভালোবাসার অধিকার থাকবে তাদের। জৈবিক বিপ্লব বাস্তবায়িত হ'লে রাষ্ট্র লোপ পাবে; এর ফলে এমন মানুষ দেখা দেবে, যা আগে কখনো দেখা যায় নি। এ-বিপ্লব শুধু নারীকে মুক্ত করবে না, মুক্ত করবে পুরুষকেও; পুরুষ মুক্তি পাবে ভরণপোষণের ভার থেকে, কিন্তু তারাও সন্তান ধারণ ও লালনে পালন করবে সমান দায়িত্ব।

আমূল নারীবাদের একটি ধারা হচ্ছে 'নারীসমকামী স্বাতন্ত্র্যবাদ'। তাঁদের মতে পুরুষাধিপত্য বিলুপ্ত করার উপায় হচ্ছে পুরুষের সাথে কোনো সম্পর্কে না আসা। তাঁদের একদলের মতে, এটা সাময়িক ব্যবস্থা; আরেক দলের মতে, এটা হবে সব সময়ের ব্যবস্থা। তাঁদের মতে কে কার যৌনসঙ্গী, এটা কোনো গুরুত্বের ব্যাপার নয়; তবে এখনকার পুরুষাধিপত্যবাদী সমাজে যৌনসঙ্গী নির্বাচনও রাজনীতি। তাই পুরুষাধিপত্য প্রতিরোধ করার জন্যে নারী পুরুষকে প্রত্যাখ্যান ক'রে যৌনসঙ্গী হিশেবে বেছে নেবে নারীকে। তাঁদের মতে বিষমসম্পর্কের ভেতরেই গোপন রয়েছে এমন বিশ্বাস যে পুরুষ প্রভুত্ব করবে নারীর ওপর। অনেক নারীসমকামী স্বাতন্ত্র্যবাদী আবার প্রতিষ্ঠা করতে চান মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, কেননা তা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার থেকে উন্নত। সম্প্রতি মার্ক্সীয় নারীবাদ কিছুটা ভিন্ন রূপ নিয়েছে, যা ধ্রুপদী মার্ক্সীয় নারীবাদের সাথে যুক্ত কবেছে কিছু নতুনত্ব। তাঁরা সন্তানধারণে প্রস্তুত, এবং আমূল নারীবাদকে গণ্য করেন ইউটোপীয় ধারণা ব'লে। তাঁরা মনে করেন সাম্যবাদই নারীমুক্তির পূর্বশর্ত, তবে সাম্যবাদই যথেষ্ট নয়; কেননা সাম্যবাদী সমাজেও বিরাজ করতে পারে লিঙ্গবাদ। তাই নারীমুক্তির জন্যে বদলে দিতে হবে সামাজিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ রূপটিকেই।

১৭৯২ মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌-এর (১৭৫৯-১৭৯৭) *ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্‌স্‌ অফ ওম্যান*। *ভিণ্ডিকেশন* নারীমুক্তি আন্দোলন বা নারীবাদের প্রথম মহাইশতেহার; একে মার্কিন 'ডিক্লেয়ারেশন অফ ইন্ডিপেনডেন্স্‌'-এর সাথে তুলনা ক'রে 'নারীবাদী স্বাধীনতার ঘোষণা'ও বলা হয়। প্রকাশের পর মেরি নিন্দিত, প্রশংসিত, ধিকৃত, অভিনন্দিত হন; রক্ষণশীলেরা মেতে ওঠে ধিক্কারে, প্রগতিশীলেরা জানায় অভিনন্দন। তেরো পরিচ্ছেদের তীব্র তীক্ষ্ণ এ-বইটির মূল দাবি নারী মানুষ, বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, নারী যৌনপ্রাণী নয়; তাকে দিতে হবে স্বাধিকার। আঠারোশতকের শেষভাগে যখন পুরুষেরা দেশে দেশে বিপ্লব ক'রে চলছিলো, সংগ্রাম ক'রে চলছিলো মানুষের অর্থাৎ পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে, তখন তেত্রিশ বছরের তরুণী মেরি ঘোষণা করেন নারীমুক্তির ইশতেহার। তাঁর বই সাথে সাথে কোনো বিপ্লব ঘটায় নি, তবে সূচনা ক'রে এক দীর্ঘ বিপ্লবের, যা আজো অসম্পূর্ণ।

১৮১৮ রামমোহন রায়ের *সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ*। রামমোহন সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম নারীবাদী পুরুষ, যিনি নারীকে দিতে চেয়েছিলেন বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু, পিতৃতন্ত্র যা দিতে চায় নি।

১৮১৯ রামমোহন রায়ের *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ*।

১৮২২ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের *স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক*। বিদ্যালঙ্কার বলেন :

> যদি বল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প এ কারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতামাতও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্যোগ করেন না, একথা অতি অনুপযুক্ত। যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা

স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ব্যবসায় ছয়গুণ কহিয়াছেন।...এদশের লোকেরা বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন না বরং তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ কবে তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরব মাত্র সিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করান।

১৮২৫ সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক উইলিয়ম টমসন-এর *মানবজাতির অর্ধেক, নারীদের, দাবি মানবজাতির অন্য অর্ধেক, পুরুষদের, দুরহঙ্কারের বিরুদ্ধে।* তিনি বলেন, নারীদের পরিণত করা হয়েছে 'অনিচ্ছুক প্রসবযন্ত্র ও গৃহদাসীতে'; 'গৃহ হচ্ছে গৃহিণীর কারাগার'। তিনি ডাক দেন : 'ইংল্যান্ডের নারীরা, জাগো! নারী, যে-দেশেই তুমি অধীনস্থ, জাগো। যখন তোমার সম্পূর্ণ মন ও শরীরের চর্চা ও বিকাশ ঘটবে, তখন তোমার জন্যে যে-সুখ অপেক্ষা ক'রে আছে, তার জন্যে জাগো।' এর বিনিময়ে তিনি পান অবজ্ঞা ও উপহাস।

১৮২৯ সতীদাহ নিষিদ্ধ : ৪ ডিসেম্বরে লর্ড বেন্টিংকের সতীদাহ নিষেধ বিধিতে স্বাক্ষর।

১৮৩১ *বিদ্যাদর্শন*-এ নামহীন পতিতার পত্র; কৌলীন্য প্রথার মুখোশ-উন্মোচন।

১৮৩৭ আমেরিকায় প্রথম দাসপ্রথাবিরোধী নারীসম্মেলন। দাসপ্রথারহিতকরণ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মার্কিন নারীরা প্রবেশ করেন রাজনীতিতে, গ'ড়ে তোলেন সংঘ, জনসভায় ভাষণের সুযোগ পান, এবং বিকাশ ঘটান সমাজে তাঁদের স্থান ও অধিকার সম্বন্ধে মতাদর্শ। উনিশশতকের প্রথম তিন দশক ধ'রে দাসমুক্তি আন্দোলন ও নারীমুক্তি আন্দোলন ছিলো পরস্পরনির্ভর। প্রথম যুগের মার্কিন নারীবাদীরা : গ্রিম্‌কে বোনেরা, লুসি স্টোন্, এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন, লুক্রেশিয়া মোট, সুসান বি অ্যান্থনি ছিলেন নিষ্ঠাপরায়ণ দাসপ্রথারহিতকরণবাদী।

১৮৩৮ গ্রিম্‌কে বোনদের, এঞ্জেলিনা ই গ্রিম্‌কের *ক্রীতদাসপ্রথা ও দাসপ্রথারহিতকরণ সম্পর্কে প্রবন্ধের উত্তরে ক্যাথেরিন বিচারের কাছে পত্রাবলি*, এবং সারাহ্ এম গ্রিম্‌কের *নারীপুরুষের সাম্য ও নারীর অবস্থা সম্পর্কে পত্রাবলি।* এ-দু মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ বোন ক্রীতদাস ও নারীর মুক্তিকে অভিন্ন ক'রে দেখে সমস্যার একই সমাধান দাবি করেন। তবে দাসপ্রথারহিতকরণবাদী পুরুষেরা ক্রীতদাসের মুক্তিতে বিশ্বাস করলেও নারীর মুক্তিতে বিশ্বাস করতো না; গৃহযুদ্ধে সাফল্যের পর তারা নারীদের প্রতারণা করতে দ্বিধা করে নি।

১৮৪৮ জুলাইয়ের ১৯ ও ২০ তারিখে নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফল্‌স্-এ প্রথম নারী অধিকার সম্মেলন। এতে অংশ নেন তিন শোর মতো নারীপুরুষ। এ-সম্মেলনে মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণার আদলে নারীমুক্তির ঘোষণা ক'রে বারোটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঘোষণার রচয়িতা এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন। ঘোষণায় বলা হয় :

আমরা মনে করি এগুলো স্বতঃসিদ্ধ সত্য : যে সব পুরুষ ও নারীকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে; স্রষ্টা তাদের ভূষিত করেছে কতিপয় হস্তান্তরঅযোগ্য অধিকারে; এগুলোর মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা, এবং সুখলাভের প্রয়াস..

মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে নারীর ওপর পুরুষের পৌনপুনিক পীড়ন ও বলপ্রয়োগের ইতিহাস, যাব লক্ষ্য নারীর ওপর পুরুষেব চরম স্বৈবাচার প্রতিষ্ঠা। এটা প্রমাণের জন্যে অকপট বিশ্বের কাছে পেশ করতে চাই তথ্য। সে [পুরুষ] তাকে [নাবী] কখনো তার সহজাত অধিকার ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার দেয় নি।

সে তাকে সে-সব বিধান মানতে বাধ্য করেছে, যা প্রণয়নে তার কথা শোনা হয় নি.

সে তাকে বিবাহিত অবস্থায়, আইনের চোখে, আইনগতভাবে মৃত ব'লে নির্দেশ কবেছে. .

সে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে সম্পত্তিব মালিক হওয়ার সব অধিকার, এমনকি নিজের উপার্জিত পারিশ্রমিকের ওপবের অধিকাব।. .

সে তাকে পবিণত করেছে নৈতিক দায়িত্বহীন প্রাণীতে, কেননা সে স্বামীব উপস্থিতিতে যে-কোনো অপবাধ ক'রে অব্যাহতি পেতে পাবে শাস্তি থেকে।...

সে নিজের জন্যে একচেটে বেখেছে সমস্ত লাভজনক পেশা, এবং নারীর জন্যে রেখেছে যে-সমস্ত কাজ, তার পারিশ্রমিক অত্যন্ত তুচ্ছ...

সে পুরুষ ও নারীর জন্যে ভিন্ন নৈতিকতা বিধি দিয়ে জনগণেব মধ্যে সৃষ্টি করেছে মিথ্যা ভাবাবেগ...

সে জোর ক'রে নিজে অধিকার কবেছে জিহোভার সমস্ত অধিকার, দাবি করেছে যে নারীর জন্যে এক পৃথক এলাকা বরাদ্দ করা তার অধিকার...

সে সব রকমে চেষ্টা করেছে নারীর আত্মবিশ্বাস ধ্বংস ক'বে দিতে, তার আত্মসম্মানবোধ খর্ব করতে, এবং তাকে স্বেচ্ছায় পরাশ্রিত ও শোচনীয় জীবনযাপনে সম্মত হ'তে।...

এ-সম্মেলনের একটি লক্ষ্য ছিলো নারীর ভোটাধিকার অর্জন, তবে ভোটাধিকারের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় নি। অনেকে মনে করেছিলেন ভোটাধিকার চাইতে গেলে তাঁরা তা তো পাবেনই না, বরং অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনেও ব্যর্থ হবেন। তবে এলিজাবেথ স্ট্যান্টন ও ফ্রেডারিক ডগলাস মনে করেন শাসক নির্বাচন ও আইন প্রণয়নের অধিকার পেলেই অন্য অধিকারগুলোও পাওয়া যাবে, তাই তাঁরা প্রস্তাবটি পাশ করাতে যারপরনাই চেষ্টা করেন। এর পর প্রায় প্রতি বছরই একেক শহরে অনুষ্ঠিত হয় নারী অধিকার সম্মেলন। তাঁদের আন্দোলন যতোই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে, রক্ষণশীলেরা হ'তে থাকে ততোই ক্ষিপ্ত। তাঁদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলেরা পত্রপত্রিকায়, গির্জায় আক্রমণ চালাতে থাকে অকথ্য ভাষায়। প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদপত্রগুলো তাঁদের উপকারে আসবে না ব'লে তাঁরা প্রকাশ করেন নিজেদের সাময়িকী : *দি লিলি, দি ইউনা, ওম্যান্‌স্ অ্যাডভোকেট* প্রভৃতি। রক্ষণশীলেরা নারীবাদীদের আক্রমণ করতো অশ্লীল ভাষা ও পবিত্র বাইবেল দিয়ে। তারা আদি মার্কিন নারীবাদী ফ্যানি রাইটকে আখ্যা দেয় 'ধর্মহীনতার লাল বেশ্যা', এরনেস্টিন রোজকে বলে 'বেশ্যার থেকে হাজার হাজার গুণ নিচের পতিতা'। পাদ্রিরা নারীবাদী সম্মেলনে হানা দিয়ে বাইবেল উঁচিয়ে ধ'রে

চিৎকার করতো, 'সেইন্ট পল বলেছেন..., সেইন্ট পিটার বলেছেন... ।'

১৮৪৯ বাঙলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সূচনা। মে মাসে জে ই ডি বেথুন কলকাতায় স্থাপন করেন ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল, পরে এটি পরিচিত হয় বেথুন স্কুল নামে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেন :

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল,
ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদেব তেমন পাবে॥
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে॥

লেখাপড়া শিখে মেয়েরা 'বিন্দু বিন্দু ব্রান্ডি খাবে' ব'লেও আকর্ষণীয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। শিক্ষিত মেয়েদের নিয়ে কবিতায় কৌতুক করলেও ঈশ্বর গুপ্ত নারীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তাঁর *সম্বাদপ্রভাকর*-এ তিনি নারীশিক্ষার পক্ষে লিখতেন। সারা পৃথিবীর পুরুষদের মতো বাঙালি পুরুষেরাও যখন মেনে নেয় নারীশিক্ষা, স্ত্রীদের উৎসাহ দেয় শিক্ষায়, তখন তারা নারীশিক্ষাকে পণ্ড ক'রে দেয়ার জন্যে চমৎকার যাদু সৃষ্টি করে, নারীশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ক'রে তোলে 'উৎকৃষ্ট গৃহিণী ও মাতা' উৎপাদন। তারা স্টুয়ার্ট মিলকে ছেড়ে গ্রহণ করে রাস্‌কিনের ক্ষতিকর আদর্শ; 'ভদ্রমহিলা' উৎপাদন ক'রে ক'রে নষ্ট ক'রে দেয় নারীশিক্ষাকে।

১৮৫৫ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (প্রথম পুস্তক) ও *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (দ্বিতীয় পুস্তক)। রামমোহন নারীদের দিতে চেয়েছিলেন প্রাণ, বিদ্যাসাগর দিতে চান জীবন।

১৮৫৬ ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন।

১৮৬৬ মারিয়া দেসরাইস্‌মে প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম ফরাশি নারী-অধিকার সংঘ।

১৮৬৮ সুসান বি অ্যান্থনি ও এলিজাবেথ স্ট্যান্টন-এর নারীবাদী সাময়িকী *দি রেভোলিউশন।* এর মূলমন্ত্র ছিলো : 'পুরুষ, তার অধিকার এবং এর বেশি নয়; নারী, তার অধিকার এবং এর কম নয়।' ভোটাধিকার ছাড়া এতে আলোচিত হতো বিয়ে, আইন, প্রথাগত ধর্ম প্রভৃতি।

১৮৬৯ জন স্টুয়ার্ট মিল-এর *দি সাবজেকশন অফ উইমেন।*

১৮৬১তে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ দেখা দিলে নারীবাদীরা নিজেদের আন্দোলন স্থগিত রাখেন, কিন্তু দেখেন যুদ্ধের পর নিগ্রোদের অধিকার মানা হ'লেও নারীদের অধিকার মানা হয় না। তাদের চোখে নারী নিগ্রোর থেকেও নিকৃষ্ট।

যুদ্ধের পর তাঁরা ভোটাধিকারকেই প্রধান লক্ষ্য ব'লে গণ্য করেন; কিন্তু ১৮৬৯-এ নারীমুক্তি আন্দোলন আদর্শ ও কৌশলগত কারণে বিভক্ত হয় দুটি শিবিরে। মে মাসে সুসান বি অ্যান্থনি ও এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন গঠন করেন 'জাতীয় নারী ভোটাধিকার সংঘ'; নভেম্বরে লুসি স্টোন গঠন করেন 'মার্কিন নারী ভোটাধিকার সংঘ'। মার্কিন সংঘটি শুধু ভোটাধিকারেই নিজেদের সীমিত রাখে; জাতীয় সংঘটি ভোটাধিকারের সাথে অন্যান্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামেও নিজেদের ব্যাপৃত রাখে।

১৮৭১ বিদ্যাসাগরের *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার*।

১৮৭৩ বিদ্যাসাগরের *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার*–দ্বিতীয় পুস্তক।

১৮৭৯ হেনরিক ইবসেন-এর *পুতুলের খেলাঘর*। নায়িকা নোরা হয়ে ওঠে নারীবাদের কণ্ঠস্বর।

জর্মন ভাষায় আউগুস্ট বেবেল-এর *নারী ও সমাজতন্ত্র*। প্রথম সংস্করণ গোপনে প্রকাশিত। ১৮৮৩তে সংশোধিত সংস্করণ : *নারী : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* নামে। জর্মন নারীবাদী ক্লারা জেটকিন এ-বই সম্পর্কে বলেছেন : 'ডিনামাইট যেমন চুরমার ক'রে দেয় কঠিনতম আদিম পাথর, তেমনই এ-বইয়ের বক্তব্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে গভীরতম কুসংস্কারকে।'

১৮৮৩ প্রথম বি এ : কাদম্বিনী বসু [ব্রাহ্ম]।

১৮৮৪ প্রথম এম এ : চন্দ্রমুখী বসু [খৃস্টান]।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি। তিনি দেখান পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও ব্যক্তি মালিকানাই নারীর বিপর্যয়ের কারণ।

১৮৮৯ পুনায় মহারাষ্ট্রি নারীবাদী পণ্ডিত রমাবাইয়ের নারীমুক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা। পুরুষদের হামলায় বক্তৃতা স্থগিত; রবীন্দ্রনাথ, যদিও নারীমুক্তিবিরোধী, লেখেন 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে' (*রর* : ১২, ৪৫০-৪৫৫)।

১৮৯০ প্রথম এম বি : বিধুমুখী বসু [খ্রিস্টান]।

দুটি সংঘ মিলে গঠিত হয় 'জাতীয় মার্কিন নারী ভোটাধিকার সংঘ'। প্রথম সভাপতি স্ট্যান্টন।

১৮৯১ কৃষ্ণভাবিনী দাসের প্রবন্ধ 'শিক্ষিতা নারী'। তিনি পেশ করেন একটি সরল ছোটো বক্তব্য :

> পরোপকার ও অন্যের জন্য জীবন ধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।

১৮৯৫ স্ট্যান্টন ও আরো তেইশজন নারীর *ওম্যানস্ বাইবেল* : নারীর বাইবেল। স্ট্যান্টন ভোটাধিকারকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, তবে তাঁর বিশ্বাস ছিলো

গির্জা আর ধর্মই নারীর প্রধান শত্রু, কেননা নারীবাদবিরোধীদের প্রধান যুক্তিই ছিলো : নারী-অধীনতা ঈশ্বরের বিধান। দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৯৮। এতে আক্রমণ করা হয় বাইবেলে নারীর ভূমিকা ও ভাবমূর্তিকে। তাঁরা বলেন, 'দীর্ঘকাল ধ'রে আমরা বাইবেলকে অন্ধভক্তির বস্তু ক'রে তুলেছি। এখন সময় এসেছে এটিকে অন্যান্য বইয়ের মতোই পড়ার, নিতে হবে এর ভালোটা বাদ দিতে হবে খারাপটা।' স্ট্যান্টন 'পাঁজরের হাড়ে'র উপাখ্যানকে 'তুচ্ছ শল্যচিকিৎসা' ব'লে দেখান যে সম্পূর্ণ বাইবেলই হাওয়া বা নারীর পাপের ওপর ভিত্তি ক'রে তৈরি। তিনি বলেন :

> সাপটিকে, ফলগাছটিকে এবং নারীটিকে নিয়ে নাও, তখন আর কোনো পতন, রাগী বিচারক, নরক, চিরকালীন শাস্তি কিছুই থাকে না;–তাই কোনো ত্রাতাবও দবকার পড়ে না। এভাবে খ'সে পড়ে সমগ্র খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের তলদেশ। এ-কারণেই সমস্ত বাইবেল গবেষণা ও উচ্চতর সমালোচনায় পণ্ডিতেবা কখনো নারীর অবস্থানটিকে স্পর্শ করেন না।

এ-বই প্রকাশের পর হৈচৈ প'ড়ে যায়, রক্ষশীলেরা একটি ভালো শিকার পেয়ে মেতে ওঠে: অ্যান্থনি ও আর কয়েকজন ছাড়া ভোটাধিকার সংঘের সদস্যরাও স্ট্যান্টনকে অস্বীকার করেন। এর মাত্র ন-বছর পর বাঙলায় এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের নারী রোকেয়া বলেন, 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।...এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

১৮৯৮ শার্লোট পার্কিন্স গিলম্যানের *নারী ও অর্থনীতি*।

১৯০৩ এমেলিন প্যাংকহার্স্টের নেতৃত্বে যুক্তরাজ্যে নারীর সামাজিক ও রাজনীতিক ইউনিয়ন গঠন; নারীমুক্তি আন্দোলনের চরম রূপ। তাঁদের ঘোষণা : 'অবিলম্বে ভোটাধিকার'। ১৯০৫-এ আন্দোলনকে তীব্র, ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ, করার জন্যে লিবারেল দলের নির্বাচনী জনসভায় প্যাংকহার্স্টের মেয়ে ক্রিস্টাবেল 'তোমরা কি নারীদের ভোটাধিকার দেবে?' প্লাকার্ড বহন করে, গ্রেফতার হওয়ার জন্যে পুলিশের মুখে থুতু দেয়। দেশে সৃষ্টি হয় প্রবল আন্দোলন।

১৯০৪ বেগম রোকেয়ার বিপ্লবী প্রবন্ধ 'আমাদের অবনতি' [*নবনূর*, ২:৫]। *মতিচূর* (১৯০৫) গ্রন্থে 'স্ত্রীজাতির অবনতি' নামে সংকলিত। এ-প্রবন্ধেই ভাবতে প্রথম ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে পেশ করা হয় তীব্র বক্তব্য। রোকেয়া বলেন :

> যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।...আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি।...আমাদিগকে অন্ধকাবে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।...এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।...এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত

মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।

তাঁর বক্তেব্য রক্ষণশীলেরা উন্মত্ত হয়ে ওঠে,– তবে এখনকার মতো নয়, ব্রিটিশরাজে রক্ষণশীলদের উন্মত্ততারও সীমা ছিলো; গ্রন্থে প্রকাশের সময় তিনি আপত্তিকর অংশ বাদ দিতে বাধ্য হন। ওই আপত্তিকর ও নিষিদ্ধ অংশটুকুই হচ্ছে রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ রচনা। পৃথিবীর একটি পরিহাস হচ্ছে এখানে শ্রেষ্ঠরা নিয়ন্ত্রিত হন নিকৃষ্টদের দ্বারা।

১৯১১ কলকাতায় ১৬ মার্চে রোকেয়ার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা।

১৯১৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *নারীর মূল্য* [*যমুনা*, ১৩২০]। বেরিয়েছিলো অনিলা দেবীর ছদ্মনামে। গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৯২৪-এ। শরৎচন্দ্র বলেন :

নারীত্বের মূল্য কি? অর্থাৎ. কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণ, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ, তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন। দাম কষিবার এ ছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিতে পারি।...

সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুণ নাই। সব দেশের পুরুষই এ কথা বোঝে, এটা পুরুষের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় সামগ্রী।... এই সতীত্ব যে নারীর কতবড় ধর্ম হওয়া উচিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে সে কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে।...এখানে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত সতীত্বের দাপটে কতবার অস্থির হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত তর্কই একতরফা– একা নারীরই জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রে এলিস পল নামে এক তীব্র তরুণীর আমূলবাদী সংঘ 'কংগ্রেসনাল ইউনিয়ন' [পরবর্তী নাম 'ওম্যানস পার্টি']। ভোটাধিকার লাভের জন্যে তিনি প্রয়োগ করেন সব কৌশল : তাঁর দল প্যারেড, গণবিক্ষোভ, অনশন ধর্মঘট করে; তাঁর দলের সদস্যরা কারাগারে যায়। তিনিই মার্কিন নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনকে অবসন্নতা উদ্ধার করেন।

যুক্তরাজ্যে নারী ভোটাধিকার আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। তারা রাতে দেয়ালে দেয়ালে দাবি লেখে, ডাকবাক্সে জ্যাম ঢেলে ডাকবিভাগকে বিব্রত করে, চিত্রশালায় ঢুকে ছবি নষ্ট করে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে ফেলে, মিথ্যা দমকলঘন্টা বাজায়, প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের বাড়ির ক্ষতিসাধন করে, রেলস্টেশন স্টেডিয়াম গির্জায় আগুন লাগায়। জুনের ৮ তারিখে এপসম ডাউন্সে রাজার রেসের ঘোড়া যখন দৌড়োচ্ছিলো, তখন এমিলি ওয়াইল্ডিং ডেভিসন দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। আহত এমিলি চার দিন পর মারা যান। এমিলি নারীবাদের প্রথম শহীদ।

১৯১৭ ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার দাবি; জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি।

১৯১৮ যুক্তরাজ্যে ত্রিশোর্ধ নারীরা ভোটাধিকার পান; ১৯২৮-এ তাঁদের ভোটাধিকার বয়স কমিয়ে পুরুষের সমান, ২১ বছর, করা হয়।

১৯১৯ জর্মন নারীবাদের জনপ্রিয়তম নেত্রী, তাত্ত্বিক, বক্তা ডক্টর রোসা লুক্সেমবুর্গ ডানপন্থী সৈন্যদের হাতে নিহত [১৫ জানুয়ারি]।

১৯২০ আগস্টের ২৬ তারিখে মার্কিন কংগ্রেস নারী ভোটাধিকার (১৯তম) সংশোধনী বিল পাশ করে। ১৮৭৮ থেকে 'অ্যান্থনি সংশোধনী' নামে এটি কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনে উত্থাপিত হয়, কিন্তু গৃহীত হ'তে লাগে বেয়াল্লিশ বছর! এর সাথে আমেরিকায় ঘটে নারীবাদের মৃত্যু; পুনরুজ্জীবিত হ'তে লাগে চল্লিশ বছর।

১৯২১ ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার লাভ। প্রথমে মাদ্রজ প্রদেশে, ১৯২১-এ; ১৯২৯-এর মধ্যে সব প্রদেশে। বাঙলায় ১৯২৫-এ। তাঁরা ভোটাধিকার পান, তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার পান আরো পরে।

১৯২৭ প্রথম বাঙালি মুসলমান এম এ : ফজিলতুন্নেসা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম।

১৯২৯ ভার্জিনিয়া উলফ্-এর *এ রুম অফ ওয়ান্স্ ঔন।* তাঁর এ-বইয়ের বিষয় *নারী ও কথাসাহিত্য*; তিনি এ-বক্তৃতাগ্রন্থে একটিই প্রশ্ন করেন– নারী কেনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে নি? তাঁর উত্তর হচ্ছে– দারিদ্র্য। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত।

১৯৪৯ আধুনিক আমূলবাদী নারীবাদের মহাগ্রন্থ সিমোন দ্য বোভোয়ার-এর *দ্বিতীয় লিঙ্গ*। বোভোয়ার উগ্র ঝাঁজালো নন, তিনি গভীর মননশীল এবং আধুনিক নারীবাদের শ্রেষ্ঠ নারী; তাঁর প্রজ্ঞা অতুলনীয়, লক্ষ্য অবিচল। তাঁর বইয়ের দর্শন সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদ। এ-বইয়ে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে ইতিহাস ভ'রে নারী পরিণত হয়েছে পুরুষের সামগ্রীতে : নারীকে তৈরি করা হয়েছে পুরুষের 'অপর'রূপে, অস্বীকার করা হয়েছে তার নিজস্বতা, এবং নিজ দায়িত্বভারের অধিকার। বার বার তিনি, অস্তিত্ববাদী পরিভাষায়, বলেছেন, পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ নারীকে দেখে 'সীমাবদ্ধ' আর পুরুষকে 'অসীম' বা 'সীমাতিক্রান্ত'রূপে। এটি পরবর্তী নারীবাদী সমস্ত চিন্তা ও গ্রন্থের জননী। বইটি লেখার সময় তাঁর বিশ্বাস ছিলো সমাজতন্ত্রের বিকাশই সমাধান করবে নারীর সব সমস্যার, তাই তিনি নারীবাদী নন, তিনি সমাজতান্ত্রিক। ক্রমশ তাঁর বিশ্বাস ভেঙে যায়, ১৯৭২-এ তিনি যোগ দেন নারীবাদী আন্দোলনে, এবং প্রথমবারের মতো নিজেকে ঘোষণা করেন নারীবাদী ব'লে। তিনি বলেন [দ্র মোই (১৯৮৫, ৯১-৯২)] :

> ১৯৭০-এ এমএলএফ [নারীমুক্তি আন্দোলন] স্থাপিত হওয়ার আগে ফ্রান্সে যে-সব নারীসংঘ ছিলো, সেগুলো ছিলো সাধারণত সংস্কার ও আইনবাদী। তাঁদের সাথে জড়িত হওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার হয় নি। তুলনায় নবনারীবাদ আমূলবাদী।...

দ্বিতীয় লিঙ্গ-এব শেষভাগে বলেছিলাম আমি নারীবাদী নই, কেননা আমি বিশ্বাস কবতাম যে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সাথে আপনাআপনি সমাধান হয়ে যাবে নারীর সমস্যা। নারীবাদী বলতে আমি বোঝাতাম শ্রেণীসংগ্রামনিরপেক্ষভাবে বিশেষ নারীসমস্যা নিয়ে লড়াইকে। আমি আজো একই ধাবণা পোষণ কবি। আমাব সংজ্ঞায় নারীবাদীরা এমন নারী-বা এমন পুরুষও-যাঁরা, সংগ্রাম কবছেন নাবীব অবস্থা বদলেব জন্যে, সাথে থাকছে শ্রেণীসংগ্রাম; এবং তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামনিবপেক্ষভাবেও, সমস্ত সমাজবদলেব ওপর নির্ভব না ক'রে, নারীর অবস্থা বদলের জন্যে সংগ্রাম করতে পারেন। আমি বলবো এ-অর্থেই আমি আজ নারীবাদী, কেননা আমি বুঝতে পেরেছি যে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়াব আগে নারীর পরিস্থিতিব জন্যে আমাদেব লড়াই করতে হবে, এখানে এবং এখনই।

১৯৫৯ দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, প্রায় দেড় শো বছর স্বেচ্ছায় ভুলে থাকার পর, সেইন্ট প্যাংক্রাস পুরোনো গির্জায় মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য। অর্পণ করে ফসেট সমিতি।

১৯৬০ নারী সরকার প্রধানদের আবির্ভাব : শ্রীমাভো বন্দরনায়েক (শ্রীলঙ্কা, প্রধান মন্ত্রী, ১৯৬০), ইন্দিরা গান্ধি (ভারত, প্রধান মন্ত্রী, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭১, ১৯৮১), গোল্ডা মেয়ার (ইসরায়েল, প্রধান মন্ত্রী, ১৯৬৯), ইসাবেলা পেরন (আর্জেন্টিনা, রাষ্ট্রপতি, ১৯৭৪), মার্গারেট থ্যাচার (যুক্তরাজ্য, প্রধান মন্ত্রী, ১৯৭৯, ১৯৮৩, ১৯৮৭), কোরাজান অ্যাকিনো (রাষ্ট্রপতি, ফিলিপাইনস, ১৯৮৬), বেনজিব ভুট্টো (পাকিস্তান, প্রধান মন্ত্রী, ১৯৮৮), খালেদা জিয়া (বাঙলাদেশ, প্রধান মন্ত্রী, ১৯৯১), শেখ হাসিনা (বাঙলাদেশ, প্রধান মন্ত্রী, ১৯৯৬)। তবে এঁরা নারবাদী নন, পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিনিধি; অধিকাংশই নারীর জন্যে ক্ষতিকর।

১৯৬৩ বেটি ফ্রাইডান-এর *দি ফেমিনিন মিস্টিক*। মার্কিন নবনারীবাদের প্রথম বই এটি, তিনি দেখান কীভাবে বিলাসে নষ্ট হচ্ছে মার্কিন গৃহিণীরা।

১৯৬৬ ফ্রাইডানের 'ন্যাশনাল অরগানাইজেশন অফ উইমেন' (নাউ)।

১৯৬৮ মেরি এলমানের *নারীসম্পর্কে ভাবনা* : নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা।

১৯৬৯ কেইট মিলেট-এর *লৈঙ্গিক রাজনীতি*; অ্যান কোড্‌ট্‌-এর 'যোনীয় পুলকের উপকথা'। কেইট মিলেটই প্রথম নারীপুরুষের সম্পর্ককে নির্দেশ করেন রাজনীতিক সম্পর্ক ব'লে, যার নাম দেন তিনি 'লৈঙ্গিক রাজনীতি'। এটি তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, একই সাথে মননশীল ও প্রচণ্ড। *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এর পর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও প্রেরণাদায়ক গ্রন্থ। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার জন্যেও উল্লেখযোগ্য : লরেন্স, মিলার, মেইলার, জাঁ জোনের সাহিত্য আলোচনা ক'রে দেখান তাঁদের রুগ্ন পুরুষতান্ত্রিকতা।

১৯৭০ জারমেইন গ্রিয়ার-এর *দি ফিমেল ইউন্যাক*; শুলামিথ ফায়ারস্টোন-এর *লিঙ্গ দ্বান্দ্বিকতা : নারীবাদী বিপ্লবের পক্ষে*।

১৯৭২ সুজান কোপেলম্যান কোরনিলন সম্পাদিত নারীবাদী সমালোচনাসংগ্রহ

কথাসাহিত্যে নারীভাবমূর্তি। তাঁরা দেখান, কথাসাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে 'অসত্য' নারীচরিত্র; এ-কাজে পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছেন নারী লেখকেরা, তাঁরা পুরুষদের থেকেও নিকৃষ্ট; বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাঁরা নিজ লিঙ্গের সাথে।

১৯৭৩ আন্তর্জাতিক নারীবাদী সম্মেলন।

১৯৭৫ জাতিসংঘের নারী-অধিকার দশক।

ফাতিমা মেরনিস্‌সির *বোরখা পেরিয়ে*। মরোক্কোর এ-তীব্র নারীবাদী দেখান মুসলমান নারীদের শোচনীয়তা, ধর্মকে আক্রমণ করেন বিস্ময়কর সাহসের সাথে। ১৯৮৪তে বেরোয় তাঁর প্রচণ্ডতর বই *মুসলমানের অবচেতনায় নারী*, লেখেন ফাতনা এ সাবাহ্ ছদ্মনামে।

১৯৭৮ শেরিল এল ব্রাউন ও কারেন ওলসন সম্পাদিত নারীবাদী সমালোচনাসংগ্রহ *নারীবাদী সমালোচনা : তত্ত্ব, কবিতা ও গদ্য বিষয়ক প্রবন্ধ*।

১৯৮০ মিশরি নারীবাদী নওঅল এল সাদাওয়ির *হাওয়ার লুকোনো মুখ : আরববিশ্বে নারী*। আমূল নারীবাদী নওঅল চিকিৎসক, ছিলেন মিশরের গণস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান; কিন্তু নারীবাদের অপরাধে সাদাতের কালে চাকুরি হারান, কারারুদ্ধ হন।

১৯৯৫ ১৯ নভেম্বর। *নারী* নিষিদ্ধ।

২০০০ ৭ মার্চ। উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক *নারী*র নিষিদ্ধকরণ আদেশকে অবৈধ ঘোষণা

রচনাপঞ্জি

Almenas-Lipowsky, Angeles J

1975 *The Position of Indian Women in the Light of Legal Reform.* Franz Steiner Verlag : Wiesbaden.

Altekar, A S

1959 *Position of Women in Hindu Civilization* Reprinted 1983 Motilal Banarsidass . Delhi

Amal Rassam

1984 'Toward a Theoretical Framework for the Study of Women in the Arab World.' In *Women in the Arab World* Frances Pinter : London, and Unesco : Paris 1984

Azizah Al-Hibri (Ed.,)

1982 *Women and Islam.* Pergamon Press : Oxford

Basch, Francoise

1974 *Relative Creatures . Victorian Women in Society and the Novel 1837-67.* Translated by Anthony Rudolf. Allen Lane : London.

Baym, Nina

1981 'Melodramas of Beset Manhood : How Theories of American Fiction Exclude Women Authors.' In Showalter (ed., 1985).

Block, Ivan

1958 *Sexual Life in England* Translated by W H Forstein. Reprinted 1967. Corgi Books.

Borthwick, Meredith

1984 *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905.* Princeton University Press . Princeton, N.J.

Cline, Sally, and Spender, Dale

1987 *Reflecting Men At Twice Their Natural Size.* Reprinted 1988. Fontana/Collins.

Coward, Rosalind

1980 'This Novel Changes Women's Lives : Are Women's Novels Feminist Novels?' In In Showalter (ed., 1985).

Cooper, Elizabetg

1915 The Harim and the Purdah : Studies on Oriental Women Reprinted 1983. Bimla Publishing House : New Delhi.

de Beauvoir, Simone

1949 *The Second Sex* Translated and Edited by H M Parshley. Reprinted 1974. Penguin Books

Dwarkanath Mitter

1913 *The Position of Women in Hindu Law.* Reprinted 1984. Inter-India Publications . New Delhi.

Fatima Mernissi

1975 *Beyond the Veil : Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society.* Reprinted 1987 Indiana University Press : Bloomington.

1982 'Virginity and Patriarchy'. In Azizah (ed., 1982).

1984 *Women in the Muslim Unconscious.* Published under the pseudonym Fatna A Sabbah. London

Figes, Eva

1970 *Patriarchal Attitudes.* Faber and Faber London.

Freeman, Jo (ed .)

1975 *Women . A Feminist Perspective.* Mayfield Publishing Company : California.

Freud, Sigmund

1933 'The Psychology of Women'. In *New Introductory Lectures on Psycho-Analysis.* Translated by W J S Sprott Fifth Impression 1957. The Hogarth Press Ltd . London.

Friedan, Betty

1963 *The Feminine Mystique.* Reprinted 1968. Penguin Books

Friedman, Jean E, and Shade William G (eds.)

1973 *Our American Sisters · Women in American Life and Thought.* 4th Printing 1974 Allyn and Bacon, Inc . Boston

Ganong, W F

1989 *Review of Medical Physiology* 14th edition. Prentice-Hall International Inc.

Gilbert, Sandra M

1980 'What Do Feminist Critics Want? Or a Postcard from the Volcano.' In Showalter (ed., 1985).

Greene, Gayle, and Coppélia Kahn (eds.,)

1985 *Making a Difference Feminist Literary Criticism.* Methuen : London and New York.

1985b 'Feminist Scholarship and the Social Construction of Women.' In Greene, Gayle, and Coppelia Kahn (eds , 1985)

Greer, Germaine

1971 *The Female Eunuch.* Reprinted 1973. Paladin.

Gubar Susan

1981 ''The Blank Page' and the Issues of Female Creativity ' In Showalter (ed.. 1985)

Hole, Judith and Levine, Ellen

1973 'The First Feminists.' In Freeman (ed., 1975)

Hughes. Thomas Patrick

1885 *Dictionary of Islam.* Reprinted 1978. Cosmo Publications : New Delhi

Jaggar, Alison

1979 'Political Philosophies of Women's Liberation.' In Wasserstrom, R A (ed., 1979)

Jones, Ann Rosalind

1981 'Writing the Body : Toward an Understanding of *l'Ecriture feminine*.' In Showalter (ed., 1985)

1985 'Inscribing Femininity : French Theories of the Feminine.' In Greene, Gayle, and Coppélia Kahn (eds., 1985).

Kaplan, Cora

1985 'Pandora's Box . Sujectivity, Class and Sexuality in Socialist Feminist Criticism.' In Greene, Gayle, and Coppélia Kahn (eds., 1985).

Kaplan, Sydney Janet

1985 'Varieties of Feminist Criticism.' In Greene, Gayle, and Coppelia Kahn (eds., 1985).

Keohane, Nannerl O, Michelle Z Rosaldo, and Barbara C Gelpi (eds.,)

1981 *Feminist Theory : A Critique of Ideology*. Reprinted 1982. The Harvester Press.

Kinsey, A C, Pomeruy, W B, and Marti, C E

1948 *Sexual Behavior in the Human Male*. Philadelphia : W B Saunders.

1953 *Sexual Behavior in the Human Female*. Philadelphia : W B Saunders

Kolodny, Annette

1980 'A Map for Rereading : Or, Gender and the Interpretation of Literary Texts.' In Showalter (ed., 1985).

1980b 'Dancing Through the Minefield : Some Observations on the Theory, Practice, and Politics of a Feminist Literary Criticism.' In Showalter (ed., 1985).

Krishan Kumar

1987 *Utopia and Anti-Utopia in Modern Times*. Basil Blackwell . Oxford.

Levin, Gerald

1964 *Prose Models* 6th edition.1984. Harcourt Brace Jovanovich.

LLewellyn-Jones, Derek

1971 *Everywoman : A Gynaecological Guide for Life*. Reprinted 1989. Faber and Faber : London.

Mackinnon, Catherine A

1981 'Feminism, Marxism, Method, and the State : An Agenda for Theory'. In Keohana et al (1981).

Masters, W H and Johnson, V E

1966 *Human Sexual Response* Reprinted 1986. Bantam Books.

M Hidayatullah, and A Hidayatullah

1906 *Mulla's Principles of Mahomedan Law*. 18th Edition 1977. N M Tripathi Private Ltd., : Bombay.

Miles, Rosalind

1988 *The Women's History of the World*. Michael Joseph : London.

Mill, John Stuart

1869 *The Subjection of Women* Third edition 1870. Longmans, Green, Reader, and Dyer : London.

Miller, Casey, and Swift, Kate

1976 '"Manly" and "Womanly"'. In Levin (ed., 1964).

Miller, Nancy K

1981 'Emphasis Added · Plots and Plausibilities in Women's Fiction.' In Showalter (ed , 1985).

Millet, Kate

1969 *Sexual Politics*. Reprinted 1972 Abacus : London.

Mitchell, Juliet and Oakley, Ann (eds)

1976 *The Rights and Wrongs of Women*. Reprinted 1986. Penguin Books.

Moi, Toril

1985 *Sexual Textual Politics Feminist Literary Theory*. Reprinted 1988. Routledge.

Munich, Adrienne

1985 'Notorious Signs, Feminist Criticism and Literary Tradition ' In Greene, Gayle, and Coppélia Kahn (eds., 1985)

Narendranath Bhattacharyya

1975 *Ancient Indian Rituals and Their Social Contents* Curzon Press · London

Nawal El Saadawi

1980 *The Hidden Face of Eve . Women in the Arab World*. Zed Books Ltd., London.

Nelson, Mary

1975 'Why Witches were Women ' In Freeman (ed , 1975).

Newland, Kathleen

1979 *The Sisterhood of Man*. W W Norton & Co : New York.

O'Brien, Mary

1982 'Feminist Theory snd Dialectical Logic.' In Keohane et al (1982).

Okin, Susan Moller

1979 *Women in Western Political Thought*. Princeton University Press : Princeton.

Porter, Roy

1986 'Rape_Does it have a Historical Meaning?' In Tomaselli et al (Ed., 1986)

Praz, Mario

1933 *The Romantic Agony* Translated by Angus Davidson. 2nd Edition 1970. Oxford University Press : London.

Rayner, Claire

1986 *Woman*. Hamlyn.

Robinson, Lillian S

1983 'Treason Our Text : Feminist Challanges to the Literary Canon ' In Showalter (ed.. 1985).

Rousseau, Jean Jacques

1762 *Emile.* Translated by Barbara Foxley. Reprinted 1969. Everyman's Library : London.

Ruskin, John

1865 *Sesame and Lilies.* Introduction by Henry Martin. 1925. Ram Narain Lal : Allahabad.

Sandy, Peggy Reeves

1986 'Rape and the Silencing of the Feminine'. In Tomaselli et al (Ed , 1986)

Showalter, Elaine

1979 'Toward a Feminist Poetics.' In Showalter (ed., 1985)

1981 'Feminist Criticism in the Wilderness ' In Showalter (ed., 1985).

1985 *The New Feminist Criticism . Essays on Women, Literature, and Theory.* Editor. Pantheon Books : New York.

Soha Abdel Kader

1984 'A Survey of Trends in Social Sciences Research on Women in the Arab Region, 1960-1980.' In *Women in the Arab World.* Frances Pinter . London, and Unesco . Paris. 1984.

Tannshill, Reay

1980 *Sex in History* Reprinted 1992 Abacus : London.

Tennyson, Lord

1847 *The Princess, A Medley* In *Poems and Plays* 1975 Oxford University Press : London.

Temkin, Jennufer

1986 'Women, Rape and Law Reform' In Tomaselli et al (Ed., 1986).

Thornhill, Randy et al

1986 'The Biology of Rape'. In Tomaselli et al (Ed., 1986)

Tomaselli, Sylvana and Roy Porter (Ed.,)

1986 *Rape* : An Historical and Cultural Enquiry. Reprinted 1989. Basil Blackwell . New York.

Wasserstrom, R A (ed.,)

1979 *Today's Moral Problems.* 2nd edition. Macmillan Publishing co : New York.

Williams, Juanita H

1977 *Psychology of Women* W W Norton & Company Inc : New York.

Wollstonecraft, Mary

1792 *Vindication of the Rights of Woman.* Edited by Miriam Brody. Reprinted 1983. Penguin Books.

Woolf, Virginia

1929 *A Room of One's Own* Thirteenth Impression, 1959. The Hogarth Press : London

Zimmerman, Bonnie

1981 'What Has Never Been : An Overview of Lesbian Feminist Criticism.' In Showalter (ed., 1985), and in Greene, Gayle, and Coppélia Kahn (eds., 1985).

অজ্ঞাতনাম

১৩১৬ শুভবিবাহ-রচয়িত্রী। ভারতী, অগ্রহায়ণ।

অনন্যা সেনগুপ্ত

১৩৯৪ *সামাজিক ও সাহিত্যিক বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ (১৮৮০-১৯১৪)*। জিজ্ঞাসা : কলকাতা।

অনুরূপা দেবী

? *মন্ত্রশক্তি*। পঞ্চম সংস্করণ ১৩৩০। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলকাতা।

অশোক রুদ্র

১৯৮৩ *ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন*। পিপলস্ বুক সোসাইটি : কলকাতা।

আহমদ শরীফ

১৯৭৭ *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। মুক্তধারা : ঢাকা।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

১৯২০ *নারীর উক্তি*। পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৪। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ : কলকাতা।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

১৩৭৪ *আল-কুরআনুল করীম*। ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৯৯০। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন : ঢাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

? 'বাল্যবিবাহের দোষ'। সংকলিত : *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*। সম্পাদনা : তীর্থপতি দত্ত। ১৯৮৭। তুলি-কলম : কলকাতা।

১৮৫৫ক *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*। ওই।

১৮৫৫খ *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব– দ্বিতীয় পুস্তক*। ওই।

১৮৭১ *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার*। ওই।

১৮৭৩ *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার– দ্বিতীয় পুস্তক*। ওই।

১৮৯২ 'প্রভাবতীসম্ভাষণ'। ওই।

১৮৮৪ 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'। ওই।

১৮৮৪ *ব্রজবিলাস*। ওই।

এঙ্গেলস, ফ্রেডারিখ

১৮৮৪ 'পরিবার,ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'। মার্কস ও এঙ্গেলস-এ (?) সংকলিত।

কাজী নজরুল ইসলাম

? 'পূজারিণী'। *দোলন-চাঁপা* (১৩৩০)।

কুমুদিনীমোহন নিয়োগী

১৩২৯ 'ইন্দিরা দেবী'। *ভারতী,* ৪৬:৭, কার্তিক।

কেতকীকুশারী ডাইসন

১৯৮৫ *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে।* নাভানা : কলকাতা।

কে মমতাজ ও এফ শহীদ

১৯৮৯ 'পাকিস্তানে নারীর মর্যাদার আইনগত অবনতি'। সংকলিত : হাসিনা আহমেদ অনূদিত *বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ।* ১৯৮৯। সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র : ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ

১৯৮৩ *Reluctant Debutante . Response of Bengali Women to Modernization. 1849-1905.* Sahitya Samsad : Rajshahi.

১৯৮৫ *সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া : ১৯৪৯-১৯০৫।* বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১৩১০ 'গ্রন্থসমালোচনা'। *বঙ্গদর্শন* (নবপর্য্যায়), ৩:৪, শ্রাবণ।

চিত্রা দেব

১৯৮৪ *অন্তঃপুরের আত্মকথা।* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা।

দীনেশচন্দ্র সেন

১৩১২ *দ্রৌপদী।* *ভারতী,* শ্রাবণ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৭৪ *সাহিত্যে ছোটগল্প।* ৪র্থ সংস্করণ। ডি এম লাইব্রেরী : কলকাতা।

নিরুপমা দেবী

? *শ্যামলী।* দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৮। এম সি সরকার এণ্ড সন্স : কলকাতা।

নূর মোহাম্মদ আ'জমী

১৯৮৭ *মেশকাত শরীফ।* ৬ষ্ঠ জিল্‌দ। এমদাদিয়া লাইব্রেরি : ঢাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

? 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন'। *লোকরহস্য* (১৮৭৪)। *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড)। অষ্টম মুদ্রণ ১৩৯০। সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

? 'প্রাচীনা ও নবীনা'। *বিবিধ প্রবন্ধ* (প্রথম খণ্ড, ১৮৮৭)। *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড)। অষ্টম মুদ্রণ ১৩৯০। সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

? 'মনুষ্য ফল'। *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫)। *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড)। অষ্টম মুদ্রণ ১৩৯০। সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

বঙ্গনারী

১৩২৯ 'স্ত্রী লেখিকা'। *ভারতী,* ৪৬:৭, কার্তিক।

বাইবেল সোসাইটি

? *পবিত্র বাইবেল।* পুরাতন ও নূতন নিয়ম। ঢাকা।

বিনয় ঘোষ

১৯৭৩ *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ।* পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৪। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড : কলকাতা।

বেগম রোকেয়া (সাখাওয়াত হোসেন)

১৯৭৩ *রোকেয়া-রচনাবলী।* আবদুল কাদির সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

বেদব্যাস

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্‌ (১-৬)। আর্যশাস্ত্রী, ১৩৮৭-১৩৮৮। মহামিলন মঠ : কলকাতা।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
১৯৪৬ *ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি*। ৩য় খণ্ড। বর্মণ পাবলিশিং হাউস : কলকাতা।
মহেশচন্দ্র পাল (সম্পাদক)
১৯৮০ *বাৎস্যায়নের কামসূত্র*। বঙ্গানুবাদ : গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর। প্রথম প্রকাশ ১৩১৩। নবপত্র প্রকাশনা : কলকাতা।
মার্ক্স, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেডারিখ
? *রচনা-সংকলন*। ২য় খণ্ড : ১ম অংশ। প্রগতি প্রকাশন : মস্কো।
মুবারিমোহন সেনশাস্ত্রী
১৯৮৫ *মনুসংহিতা*। দীপালী বুক হাউস : কলকাতা।
মোশফেকা মাহমুদ
১৯৬৫ *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।
মোহাম্মদ মজিবর রহমান
১৯৮৯ *মুসলিম ও পাবিবারিক আইন পরিচিতি*। বাদশা পাবলিশার্স : নেত্রকোনা।
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৩৬০ *বঙ্গের মহিলা কবি*। ২য় সংস্করণ। এ মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ : কলকাতা।
রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদক)
১৯৮৯ *ভারত-ইতিহাসে নাবী*। কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কো : কলকাতা।
রফিকউল্লাহ (সংকলক-সম্পাদক)
১৯৭৯ *হাদীস শরীফ*। ২য় সংস্করণ ১৯৮৭। হরফ প্রকাশনী : কলকাতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৮৮ *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। বর : ১*, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১২৯৮ *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। রর : ১*, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১২৯৬ 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে'। *সমাজ, রর : ১২*, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭। বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১২৯৮ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'। *সমাজ, রর : ১২*, পুনবমুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭। বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১২৯৯ 'সোনার বাঁধন'। *সোনার তরী, রর : ৩*, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭১, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১২৯৯ *চিত্রাঙ্গদা। রর : ৩*, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭১, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৩০২ 'মানসী'। *চৈতালি, সঞ্চয়িতা*, ১৯৬৯। বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৩২১ 'কোন ক্ষণে সৃজনের সমুদ্রমন্থনে'। *বলাকা, রর : ১২*, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭। বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৩২৩ *ঘরে-বাইরে। রর : ৮*, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮০, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৩০৯ 'মা ভৈঃ'। বিচিত্র প্রবন্ধ। ১৩৮৯। বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৯১৯ *জাপানযাত্রী। রর : ১৯*, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৩৩৬ *যাত্রী : পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। রর : ১৯*, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৩৩৯ *দুই বোন। রর : ১১*, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৯, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৩৩৯ 'সাধারণ মেয়ে'। *পুনশ্চ, সঞ্চয়িতা*, ১৯৬৯। বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৩৪৩ 'নারী'। *কালান্তর, বর : ২৪*, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
১৯৩৭ 'নারী'। *সানাই, রর : ২৪*, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, বিশ্বভারতী : কলকাতা।
রাজনারায়ণ বসু
১৮৭৪ *সেকাল আর একাল*। পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৮। ডিএম লাইব্রেরি : কলকাতা।

রামমোহন রায়

১৮১৮ *সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ*। *রামমোহন রচনাবলী*। প্রধান সম্পাদক : অজিতকুমার ঘোষ। ১৯৭৩। হরফ প্রকাশনী : কলকাতা।

১৮২২ 'Brief Remarks Regarding Modern Encrochments on the Ancient Rights of Females According to the Hindoo Law of Inheritence.'

১৮১৯ *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ*। ওই।

১৮২৬ 'Brief Remarks on the Rights of Hindoo Females.'

১৮২৯ 'সহমরণ বিষয়'। ওই।

১৮৩০ 'Abstract of the Arguments Regarding the Burning of Widows, Considered as a Religious Rite.'

রাসসুন্দরী

? *আমার জীবন*। পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৩। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩১৯ 'নারীর লেখা'। সংকলিত : *শরৎসাহিত্যসমগ্র* [২]। সুকুমার সেন সম্পাদিত। ১৩৯৩। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড : কলকাতা।

১৩২০ 'নারীর মূল্য'। সংকলিত : *শরৎসাহিত্যসমগ্র* [২]। সুকুমার সেন সম্পাদিত। ১৩৯৩। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড : কলকাতা।

শান্তা দেবী

?১৯৩৮ *জীবনদোলা*। এম সি সরকার এণ্ড সন্স : কলকাতা।

শৈলবালা ঘোষজায়া

? *জন্ম-অপরাধী*। নামপত্র ছিন্ন ব'লে অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায় নি।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস

১৯৬৪ *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*। সংশোধিত সংস্করণ। সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৬৯ *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা।

শ্রীপান্থ

১৯৮৮ *কেয়াবাৎ মেয়ে*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

১৯৮৯ 'প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ'। রত্নাবলী ও গৌতম-এ (সম্পাদক ১৯৮৯) সংকলিত।

সৈয়দ শামসুল হক

১৯৮১ *নীলদংশন/নিষিদ্ধ লোবান*। সব্যসাচী : ঢাকা।

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৩৮৪ *কাহাকে*। *স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী*। বাণী রায় সম্পাদিত। রামায়ণী প্রকাশ ভবন : কলকাতা।

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

১৯৮০ *হিন্দুদের দেবদেবী*। তৃতীয় পর্ব। ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড : কলকাতা।

ক্ষিতীশ সরকার (অনুবাদক)

১৯৮২ *সহস্র এক আরব্য রজনী*। মৌসুমী প্রকাশনী : কলকাতা।

নির্ঘণ্ট